লোকায়ত দর্শন

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৩

প্রকাশক
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
২২, ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট
অজিত গুপ্ত

মুদ্রক
রণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

পনেরো টাকা
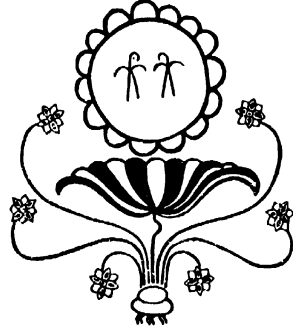
লোকায়ত-দর্শন

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

স্মরণে

From tribes there developed nations and states. Law and politics arose, and with them the fantastic reflection of human things in the human mind: religion. In the face of all these creations, which appeared in the first place to be products of the mind, and which seemed to dominate human society, the more modest productions of the working hand retreated into the background, the more so since the mind that plans the labour process already at a very early stage of the development of society was able to have the labour that had been planned carried out by other hands than its own. All merit for the swift advance of civilisation was ascribed to the mind, to the development and activity of the brain......and so arose in the course of time that idealistic outlook on the world which, especially since the decline of the ancient world, has dominated men's minds. F. ENGELS.

Division of labour only becomes truly such from the moment when a division of mental and material labour appears. From this moment onwards consciousness *can* really flatter itself that it is something other than consciousness of existing practice, that it is *really* conceiving something without conceiving something real; from now on consciousness is in a position to emancipate itself from the world and to proceed to the formation of "pure" theory, theology, philosophy, ethics etc. K. MARX & F. ENGELS.

The truth of the matter is, not that these ancient Greeks anticipated the results of modern science, but that modern scientists have succeeded in reaffirming certain fundamental but forgotten truths and establishing them securely on the basis of experimental proof. The early Greek philosophers stood near the beginning of class society; the modern bourgeois scientists stand near its end.... The primitive dialectics of these early Greek materialists stands to the dialectical materialism of the present day in the same relation as primitive communism stands to modern communism. G. THOMSON.

Owing to a certain judicial blindness even the best intelligences absolutely fail to see the things which lie in front of their noses. Later, when the moment has arrived, we are surprised to find traces everywhere of what we failed to see.......look beyond the middle ages into the primitive age of each nation, and *that corresponds to the socialist tendency* although these learned men have no idea that the two have any connection. They are therefore surprised *to find what is newest in what is oldest*......K. MARX.

প্রস্তাব

সমাজ-বিকাশের পটভূমিতে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি দিক এই গ্রন্থে বিচার করবার চেষ্টা করেছি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ইতিহাস—বিশেষত মাতৃপ্রাধান্য—সংক্রান্ত গবেষণা আজো অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে এবং বিশেষত ব্যক্তিগত যোগ্যতার অনুপাতে বর্তমান প্রচেষ্টা অবশ্যই দুঃসাহসের মতো। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব অসামান্য; তাই বর্তমান গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি যদি সমালোচনা-প্রসঙ্গেও বিষয়টির প্রতি দক্ষতর বিদ্বানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তাহলেই আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হবে।

মুদ্রণ কাজ স্বভাবতই সময় সাপেক্ষ হয়েছে; তাই শেষাংশে পৌঁছে প্রথমাংশকে নানাভাবে সংশোধন করবার আগ্রহ জাগলেও তার সম্ভাবনা ছিলো না। বৌদ্ধ আজীবিক ও ঔলুক্য দর্শনের উৎস সন্ধান প্রাসঙ্গিক হলেও তার জন্য স্থান সংকুলান হয়নি। অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের *First Philosophers* আরো আগে হাতে পেলে তার গবেষণা থেকে আরো বেশি লাভবান হবার সুযোগ পেতাম। কিন্তু এ-সব বিষয়ে আক্ষেপও অনেকাংশে অর্থহীন। কেননা সংশোধনাদির সম্ভাবনা সবসময়েই থাকে এবং নূতন যুক্তি ও নূতন তথ্য সংযোজনার প্রয়োজন কখনোই শেষ হয় না।

ঋণ-স্বীকারের জন্য খুব বেশি নাম উল্লেখ করবার সুযোগ পাচ্ছি না বলেও দুঃখ করে লাভ নেই। কেননা সংখ্যায় স্বল্প হলেও যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের আন্তরিকতা গভীরতায় প্রায় অপরিসীম। শ্রীযুক্ত প্রশান্ত সান্যালের কাছ থেকে ব্যক্তিগত উৎসাহ না পেলে গ্রন্থটির কাজ হয়তো শুরুই হতো না এবং শ্রীযুক্ত হরি সিংহরায় ও শ্রীযুক্ত রমাকৃষ্ণ মৈত্রের নানামুখী সাহায্য না পেলে এর কাজ শেষ করা নিশ্চয়ই অসম্ভব হতো। শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র, শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত মণি চক্রবর্তীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি—ব্রাত্য, যজমান ও ঋত্বিক শব্দের আদি তাৎপর্যের প্রতি শ্রীযুক্ত মণি চক্রবর্তীই প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সিংহরায় যে-ধৈর্য দেখিয়েছেন এবং আমাকে যতোখানি স্বাধীনতা দিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। শ্রদ্ধেয় অবনীমোহন মুখোপাধ্যায় অকৃপণ ভাবে গ্রন্থাদি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। অন্যান্য স্বীকৃতি গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছি।

সিটি কলেজ
কলকাতা-৯
২০শে আগস্ট, ১৯৫৬

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড : ভাববাদ

ভূমিকা

লোকায়ত, মাধবাচার্য ও আধুনিক গবেষণা

গোড়ায় ভেবেছিলাম, লোকায়তর—অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ বা *materialism*-এর—একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনার চেষ্টা করবো। কিন্তু এ-দায়িত্ব যে কতো কঠিন সে-বিষয়ে তখন সত্যিই ধারণা ছিলো না।

অবশ্যই জানা ছিলো, লোকায়ত সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত বিরল এবং এগুলি একান্তই খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত। লোকায়ত-প্রসঙ্গে অনিশ্চয়তার মহাসমুদ্রে একমাত্র যে-কথা জোর করে বলা যায় তা হলো, লোকায়তিকদের নিজস্ব কোনো রচনাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো কালে এ-জাতীয় কোনো রচনা একান্তই ছিলো কিনা—সে-বিষয়েও বিদ্বানেরা একমত নন। রিস্-ডেভিড্স্[১] এ-সম্ভাবনাকে সন্দেহ করেন, যদিও গার্বে[২], তুচি[৩] এবং দাসগুপ্ত[৪] তাঁর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন। সে-সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যদিই বা স্বীকার করতে হয় যে, এককালে এ-জাতীয় গ্রন্থ সত্যিই ছিলো তবুও কিন্তু মানতেই হবে যে তা বিলুপ্ত হয়েছে—হয়তো বিপক্ষেরা সেগুলি স্বেচ্ছায় ধ্বংস করেছিলো। এ-অবস্থায় রিস্-ডেভিড্স্[৫] যখন দাবি করেন লোকায়তিকদের নিজস্ব কোনো রচনা আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে বড়ো জোর একটা অস্থায়ী প্রকল্পের উপর নির্ভর করা সম্ভব,—তখন তাঁর উক্তি না-মেনে উপায় নেই।

রিস্-ডেভিড্স্ এ-কথা লিখেছিলেন ১৮৯৯ সালে। তারপর আজ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, ও-জাতীয় কোনো গ্রন্থ আবিষ্কৃত হবার আর কোনো সম্ভাবনাও নেই। অবশ্যই ১৯২১ সালে এফ. ডাব্‌লিউ. টমাস বৃহস্পতি-সূত্র বলে একটি গ্রন্থ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও তর্জমা করে প্রকাশ করেন। ঐতিহ্য অনুসারে বৃহস্পতিই লোকায়ত-মতের প্রবর্তক; তাই এ-গ্রন্থ বিদ্বান-মহলে লোকায়ত-সংক্রান্ত পুরোনো কৌতূহলকে নতুন করে নাড়া দিয়েছিলো। কিন্তু গ্রন্থটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, এর চরিত্র মোটেই অকৃত্রিম লোকায়তিক নয়। বরং লোকায়ত-বিরোধিতাই[৬] এর প্রধান প্রতিপাদ্য। অধ্যাপক তুচির[৭] ভাষায়, গ্রন্থটি স্পষ্টই ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব প্রণোদিত—*it bears a clear Brahmanical character*। কিন্তু সেইসঙ্গেই তিনি দাবি করলেন, তবুও এই গ্রন্থে লোকায়ত-প্রসঙ্গে এমন কিছু কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায় যেগুলি সম্ভবত কোনো প্রাচীন কিন্তু বিলুপ্ত গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছিলো এবং সেই বিলুপ্ত গ্রন্থটির চরিত্র ছিলো স্পষ্টই লোকায়তিক—*a peculiar lokayata character*.

কিন্তু আসল সমস্যা তো এই নিয়েই: লোকায়তিক চরিত্র বলতে আমরা ঠিক কী বুঝবো এবং কোথা থেকেই বা তার নির্দেশ পাবো?

এ-বিষয়ে আমাদের একমাত্র সম্বল বলতে বিরোধী সম্প্রদায়গুলির লোকায়ত-খণ্ডন। অর্থাৎ, বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা লোকায়তর খণ্ডন-প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার থেকেই লোকায়ত-মতকে পুনর্গঠন করবার চেষ্টা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই। অধ্যাপক

বেলভেলকার ও রানাডে[৮] তাই আক্ষেপ করে বলছেন, এ-সম্প্রদায়ের এমনই দুর্ভাগ্য যে একমাত্র বিপক্ষের রচনা থেকেই আমাদের পক্ষে একে বোঝবার চেষ্টা করা সম্ভব।

স্বভাবতই, বিপক্ষের প্রধান উৎসাহ লোকায়ত-খণ্ডন; লোকায়ত-বর্ণন নয়। ফলে এই সূত্রে লোকায়ত-সংক্রান্ত যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা যে অবিকৃত এবং নৈর্ব্যক্তিক হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা বিভিন্ন সমস্যা-প্রসঙ্গে লোকায়ত-খণ্ডনের আয়োজন করেছেন; ফলে তাঁদের রচনায় লোকায়ত-সংক্রান্ত যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাও নেহাতই খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত—লোকায়তর কোনো সামগ্রিক বা ধারাবাহিক পরিচয় নয়। একমাত্র মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ, শঙ্করাচার্য রচিত বলে খ্যাত সর্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ এবং হরিভদ্রসূরীর ষড়দর্শনসমুচ্চয়—প্রধানতই প্রথম গ্রন্থটি—এই উক্তির আপাত-ব্যতিক্রম। কিন্তু মাধবাচার্যের লোকায়ত-বর্ণনা কতোখানি নির্ভরযোগ্য সে-আলোচনা আমরা একটু পরেই তুলবো।

বলাই বাহুল্য, লোকায়ত-সংক্রান্ত এ-জাতীয় কথা ভারতীয় দর্শনের ছাত্রমাত্রের কাছে সুবিদিত। অতএব, যখন কাজ শুরু করেছিলাম তখন মনে হয়েছিলো সমস্যাটা প্রধানতই হবে তথ্যের অপ্রাচুর্য নিয়ে। অর্থাৎ, বিপক্ষের রচনায় পাওয়া ওই খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলি থেকেই লোকায়তর সামগ্রিক রূপটি পুনর্গঠন করবার প্রয়াস করতে হবে। সে-কাজও নিশ্চয়ই যথেষ্ট দুরূহ। কিন্তু কিছুটা অগ্রসর হয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে হলো, আসল সমস্যাটি আরো অনেক কঠিন। কেননা ওই তথ্যগুলি শুধু খণ্ড ও বিক্ষিপ্তই নয়; তাছাড়াও অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য; এমনকি অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে অনেকাংশেই অসংলগ্ন ও পরস্পর-বিরোধী। বস্তুত, আধুনিক বিদ্বানেরা প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদ প্রসঙ্গে অনেকাংশেই অসংলগ্ন ও পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত যে হয়েছেন, তার একটি প্রধান কারণ আলোচ্য তথ্যের এই আপাত-অসংলগ্নতাই। অর্থাৎ, গবেষক-বিশেষ যে-নির্বাচিত তথ্যের উপর ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার সঙ্গে অপর গবেষক নির্বাচিত তথ্যান্তরের অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে সঙ্গতি নেই; ফলে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যেও যেন আকাশ-পাতাল তফাত।

তফাত যে বাস্তবিকই কতোখানি তার কিছু নমুনা দেখা যেতে পারে।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ এবং মুয়ার উভয়েই লোকায়তকে প্রাচীন ভারতের চিন্তারাজ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করতে চান; কিন্তু এই সংযোগটির কথা দু'জনে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবেই কল্পনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণণের[৯] মতে মহাকাব্যের যুগে,—অর্থাৎ, ৬০০-২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে,—ভারতে শ্রুতি-শাসনের কঠোরতা ভেঙে চিন্তার মুক্তি ঘোষিত হয়েছিলো এবং তারই পরিণাম হলো ওই চূড়ান্ত নাস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায়টি। অপরপক্ষে, মুয়ার[১০] মনে করেন অতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতের ধ্যানরাজ্যে চিন্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিলো; উত্তরকালে লোকায়তিক ও বৌদ্ধদের নাস্তিক্য-বাহুল্যের ফলেই আস্তিকেরা শঙ্কিত বোধ করেন এবং কঠোর শ্রুতি-শাসন প্রবর্তন করেন। অতএব, রাধাকৃষ্ণণের মতে যে-লোকায়ত শ্রুতি-শাসন ভেঙে পড়বার পরিণাম, মুয়ার-এর মতে সেই লোকায়তই হলো শ্রুতি-শাসন প্রবর্তিত হবার কারণ।

কিন্তু অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের[১১] সিদ্ধান্ত অনুসারে লোকায়তর মূলে ছিলো একরকম সংস্কার-পদ্ধতিগত বিশ্বাস—চিন্তাজগতের মুক্তি বা স্বাধীনতা-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারই নয়। এবং এই সংস্কার-পদ্ধতিটি আদিতে ভারতীয়ও ছিলো না—তার বদলে

প্রাচীন সুমেরীয়ায় তা প্রচলিত ছিলো। কালক্রমে ওই সৎকার-পদ্ধতি-গত বিশ্বাসটি ভারতে এসে পড়ে এবং ভারতের জমিতে তার কিছু পরিবর্তনও ঘটে।

অধ্যাপক তুচির[১২] সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের চিন্তা-স্বাধীনতা কিংবা সুমেরীয় ইতিহাসের সৎকার-পদ্ধতি—কোনো কিছুরই সম্পর্ক নেই। তিনি অনুমান করছেন, লোকায়ত বলতে প্রাচীন ভারতের রাজোপদেশক পুরোহিতদের প্রজ্ঞা বোঝাতো। তখনো ধর্ম এবং অর্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু কালক্রমে সে-বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে; তখন অর্থ যেন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তারই পরিমাণ হিসাবে দেখা দেয় নিরীশ্বর ও ভোগসর্বস্ব লোকায়ত দর্শন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[১৩] অনুমান করছেন, লোকায়তর সঙ্গে কামসাধনার—অতএব বামাচারী কাপালিকাদি সম্প্রদায়ের—একটা গভীর সম্পর্ক বা এমনকি ঐক্যও স্বীকারযোগ্য। অতএব তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে লোকায়ত আজো ভারতভূমি থেকে বিলুপ্ত হয়নি—দেহবাদী ও কামসাধক সম্প্রদায় সহজিয়া বৈষ্ণব প্রভৃতি নামান্তরের আড়ালে আজো তা আমাদের দেশে বর্তমান রয়েছে।

অবশ্যই রিস্-ডেভিড্‌স্[১৪] অনেকদিন আগেই যে-সিদ্ধান্ত করেছিলেন তা স্বীকার করতে পারলে আজকের দিনে আমাদের পক্ষে লোকায়ত নিয়ে এতো রকম মতবাদের আবর্তে পড়ে বিভ্রান্ত বোধ করবার সম্ভাবনা থাকতো না। কেননা তাঁর মতে লোকায়ত বলে ভারতবর্ষে কোনো কালেই কোনো রকম দার্শনিক মতবাদ ছিলো না। স্বভাবতই, আমরা যদি রিস্-ডেভিড্‌স্‌কে অনুসরণ করে লোকায়তর সমস্যাটিকেই অস্বীকার করতে পারতাম তাহলে তার সমাধান নিয়েও কোনো হাঙ্গামা থাকতো না।

বলাই বাহুল্য, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম, ভারত-তত্ত্ববিদ্ হিসেবে তাঁরা সকলেই এতোখানি শ্রদ্ধেয় যে, কারুর কথাই আমরা অসংকোচে অগ্রাহ্য করতে পারি না। অপরপক্ষে, সকলের সিদ্ধান্তই সমানে স্বীকার করবার সুযোগ আমাদের নেই; কেননা এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়াও সাধ্যাতীত। অতএব এ-ক্ষেত্রে সুযোগ্য বিদ্বানদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান হবার অপ্রিয় দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায় না। অপরপক্ষে, এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, ভারততত্ত্ববিদ্-হিসেবে যাঁরা অমন শ্রদ্ধেয় তাঁরা কেউই বিনা-তথ্যে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার চেষ্টা করেননি এবং আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো এই সিদ্ধান্তগুলি যতো পরস্পর বিরোধীই হোক না কেন, কোনোটিকেই একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কেবল, বিভিন্ন বিদ্বান যে-সব বিভিন্ন তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেগুলির মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে সঙ্গতি নেই। ফলে সঙ্গতি নেই তাঁদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যেও।

প্রাচীন লোকায়ত প্রসঙ্গে আধুনিক বিদ্বানদের সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আর একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিষয়টি হলো, পরস্পরের সিদ্ধান্তের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ যতোই থাকুক না কেন, আধুনিক বিদ্বানেরা মোটের উপর একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ, একই পদ্ধতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও বিভিন্ন তথ্যের উপর বিভিন্নভাবে গুরুত্ব আরোপ করবার ফলেই তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি পরস্পর-বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই মনে হয়েছিলো এমন হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে যে, আমরা যদি কোনো নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারতাম তাহলে হয়তো আলোচ্য তথ্যের

আপাত-অসংলগ্নতাও আমাদের সামনে থেকে দূর হতো। কেননা, বিশিষ্ট বিদ্বানেরা এই যে-সব বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলিকে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই; অতএব সেগুলির মধ্যে বাস্তব অসংলগ্নতা থাকাও স্বাভাবিক নয়। আমাদের মনে হয়েছিলো, অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের সাম্প্রতিক গ্রন্থাবলীতে এই জাতীয় নূতন পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তারিতভাবে এই পদ্ধতিটির আলোচনা করেছি। কিন্তু তার উল্লেখ করবার আগে লোকায়তর পুনর্গঠনে সাবেক পদ্ধতিটি কেন গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, সে-কথা ব্যাখ্যা করা দরকার।

আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে সাধারণভাবে স্বীকৃত ওই পদ্ধতিটি ঠিক কী?

মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শন-সংগ্রহে চার্বাক বা লোকায়ত নাম দিয়ে একটি দার্শনিক মতের বর্ণনা দিয়েছেন। আধুনিক বিদ্বানেরা তারই উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। লোকায়ত-প্রসঙ্গে অধ্যাপক গার্বে[১৫] যেমন বলছেন, এ-বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের প্রধানতম উৎস হলো সর্বদর্শন-সংগ্রহের প্রথম পরিচ্ছেদ। এইভাবে মাধবের রচনা থেকে লোকায়তর মূল ধারণাটি সংগ্রহ করে আধুনিক বিদ্বানেরা তারই আলোয় অন্যান্য-সূত্রে-পাওয়া অন্যান্য তথ্যের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। লোকায়তর পুনর্গঠন-প্রসঙ্গে তাঁদের পদ্ধতি বলতে এইটিই। অবশ্যই রিস্‌-ডেভিড্‌স্[১৬] সচেতনভাবে এ-পদ্ধতি বর্জন করতে চেয়েছেন। কেননা তাঁর ধারণায়, সর্বদর্শন-সংগ্রহের লোকায়ত-বর্ণন স্পষ্টই মাধবের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু শুনতে যতোই আপাত-বিরোধী মনে হোক না কেন, আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো যে, মাধবের বিরুদ্ধে রিস্‌-ডেভিড্‌স্-এর এই আপত্তির অন্তরালে মাধবের উপরই ঐকান্তিক নির্ভরতার পরিচয় প্রচ্ছন্ন আছে।

মাধবের বর্ণনা থেকে শুরু করবার অবশ্যই দুটি সুবিধা আছে।

প্রথমত, মাধব যে-ভাবে লোকায়তর বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তা নেই। তাঁর বর্ণনাটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ: লোকায়তিকেরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ছাড়া জ্ঞানের আর কোনো উৎস স্বীকার করে না, ফলে তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জড়জগৎটি ছাড়া আর কিছুর সত্তাও মানে না, অতএব তাদের কাছে ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ ছাড়া আর কোনো রকম পুরুষার্থের অর্থও থাকতে পারে না। অতএব, মাধবের লোকায়ত-বর্ণন তাঁর মনগড়া হোক আর নাই হোক—এর মধ্যে একটা সামগ্রিক সঙ্গতি আছে। সেখান থেকে শুরু করতে পারলে অনেকাংশেই সুনিশ্চিত বোধ করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক বিদ্বানদের কাছে বস্তুবাদের এই বর্ণনা একটা সুপরিচিত ও অভ্যস্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। কেননা সাধারণভাবে আধুনিক বিদ্বানদের মনে বস্তুবাদ সংক্রান্ত যে-ধারণা—এবং বিশেষত বস্তুবাদের বিরুদ্ধে যে-বিদ্বেষ—মাধবের বর্ণনাটি তার সঙ্গে সহজেই খাপ খায়। মাধবের বর্ণনা অনুসারে লোকায়তিকেরা অত্যন্ত স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া আর কোনো উচ্চতর আদর্শ স্বীকার করে না এবং আধুনিক বিদ্বানেরাও সাধারণভাবে বস্তুবাদীদের সম্বন্ধে এই রকমই একটা বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করেন।

এই বিদ্বেষের দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবো।

লোকায়তর ব্যাখ্যায় জনৈক আধুনিক বিদ্বান[১৭] বলছেন,—A man who wanted to convert—let us say 'pervert'—a woman to his materialistic opinion...ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ, লেখকের কাছে বস্তুবাদ একটা বিকার-মাত্র, perversion। এবং এ-মন্তব্য যেন এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে, নেহাত আনুষঙ্গিকভাবে

তার উল্লেখ করাই যথেষ্ট—কথাটা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে কোনো রকম যুক্তিতর্কের প্রশ্ন ওঠে না।

বস্তুবাদের প্রতি মোটের উপর একই মনোভাব পোষণ করেন বলেই অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ[১৮] লোকায়তর পুনর্গঠনে শুধু যে প্রবোধচন্দ্রোদয় বলে রূপক নাটকটির উপর অত্যন্ত মৌলিকভাবে নির্ভর করেছেন তাই নয়, তাছাড়াও সহজ-স্বাভাবিকভাবেই বলছেন যে, উক্ত নাটকেরই একটি চরিত্রের উক্তি থেকে লোকায়ত-মতের সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ করা যায়। লেখক নিশ্চয়ই জানেন, এ-প্রস্তাব অনেকাংশেই এ্যারিস্টোফেনিসের নাটক থেকে সক্রেটিসের মত ও চরিত্রের কথা উদ্ধার করবার মতো। কেননা, এরিস্টোফেনিস যেমন সক্রেটিসকে নিয়ে শুধুই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে চেয়েছেন অনেকটা সেইভাবেই কৃষ্ণমিশ্রও তাঁর ওই নাটকটিতে বেদান্তমতের প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত, কাপালিক প্রভৃতি বেদান্তবিরোধী মতগুলি নিয়ে শুধুমাত্র ব্যঙ্গবিদ্রূপই করবার চেষ্টা করেছেন[১৯]। প্রবোধচন্দ্রোদয় থেকে বৌদ্ধ বা জৈন মতের সারমর্ম উদ্ধার করবার প্রস্তাব কোনো আধুনিক বিদ্বান নিশ্চয়ই করবেন না ; অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ তো ননই। কিন্তু লোকায়তর বেলায় অন্য রকম। এই মতের সারমর্ম এবং এই মত নিয়ে প্রহসন—দুয়ের মধ্যে প্রভেদ করবার প্রয়োজন হয় না। কেননা, লেখকের রুচি ও বিচার অনুসারে মতটাই প্রহসনের মতো। এবং আধুনিক বিদ্বানদের প্রায় সকলেরই এই মনোভাব। এই কারণেই মাধবের লোকায়ত-বর্ণন তাঁদের কাছে একটা পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

কিন্তু এই দুটি আপাত-সুবিধা সত্বেও আমরা মাধবের বর্ণনায় আস্থা স্থাপন করতে দ্বিধা বোধ করেছি। তার কারণ শুধু এই নয় যে, আধুনিক বিদ্বানদের পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তগুলি অনেকাংশেই এ-আস্থার পরিণাম। তাছাড়াও তাঁর রচনার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য এবং তাঁর রচনা-বহির্ভূত অন্যান্য তথ্যও সুস্পষ্টভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে যায়। সেগুলির আলোচনা তোলবার আগে দেখা যাক, আধুনিক বিদ্বানদের সিদ্ধান্তগুলির পরস্পর-বিরোধিতার জন্য মাধবের উপর নির্ভরতা কীভাবে বা কতোখানি দায়ী।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ[২০] বলছেন, মহাকাব্যের যুগে—অর্থাৎ তাঁর হিসেবে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ২০০-র মধ্যে—ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় নানা রকম তোলপাড় শুরু হয়েছিলো এবং তারই পরিমাণ হিসেবে চিন্তাক্ষেত্রে লোকায়ত-মতের আবির্ভাব হয়। এই যুগটিতে অনেক শতাব্দীর পুরোনো বিশ্বাস ভেঙে পড়ছিলো, টলে উঠছিলো শ্রুতির শাসন। ফলে রকমারি দার্শনিক মত ও নিষ্ফল কল্পনার আবির্ভাব হয়। একদিকে দেখা যায় লোকায়তিকেরা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপরই আশ্রয় গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে। অপরদিকে বৌদ্ধরা উচ্চাঙ্গের মনস্তত্ত্বমূলক ও নীতিশাস্ত্রগত শিক্ষা প্রচার করছে। এই পরিস্থিতিটিকে মনে রাখলে বুঝতে পারা যাবে, লোকায়তিকদেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিলো—পুরোনো কালের আনুষ্ঠানিক ধর্ম এবং জাদুবিশ্বাসের প্রভাব বর্জন করে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ঘোষণা করবার ভূমিকা। অতীতের যে-বোঝা তখনো মানুষকে নিষ্পেষিত করে রেখেছিলো তা থেকে মুক্তি পাবার আশায় চার্বাক-দর্শন যেন একরকম উন্মত্ত ব্যবহার ; তবু কূপমণ্ডূকতা দূর করে এ-দর্শন মানবাত্মার মহান সৃজনী সম্ভাবনাকে মুক্তি দিয়েছিলো। অর্থাৎ, অন্ধ উন্মত্ত বিক্ষোভের মতো হলেও উত্তরকালের মহান

দার্শনিক প্রচেষ্টার জন্যই লোকায়ত-মতের একটা প্রয়োজন ছিলো, যদিও সে-প্রয়োজন নেহাতই নেতিবাচক।

এই সিদ্ধান্তটির প্রধান গুণ অবশ্যই সারল্য এবং সে-সারল্যের প্রধান কারণ হলো মাধবের উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা—লেখককে যেন প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে লোকায়ত-সংক্রান্ত যে-সব তথ্য মাধবের বর্ণনার সঙ্গে খাপ খায় না সেগুলিকে অবজ্ঞা করতেই হবে। অতএব লোকায়ত-প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ সর্বদর্শনসংগ্রহ ছাড়া কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় এবং শঙ্করাচার্য-বিরচিত বলে খ্যাত (যদিও এগ্‌লিং-এর মতে[২১] এ-খ্যাতি ভিত্তিহীন) সর্বসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ বলে গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন: সর্বদর্শনসংগ্রহের মতোই এ-দুটিও অর্বাচীন রচনা, এ-দুটিও বেদান্তমত প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যেই রচিত এবং এ-দুটিও লোকায়তকে নেহাতই নেতিমূলকভাবে বর্ণনা করেছে—লোকায়ত অনুমান মানে না, ঈশ্বর আত্মা পরকাল পরলোক মানে না, ধর্ম ও মোক্ষ বলে পুরুষার্থ মানে না। লোকায়তর শুধু এই নিছক নেতিমূলক বর্ণনাকে গ্রাহ্যের মধ্যে এনেছেন বলেই, এবং বৌদ্ধ জৈন ও এমনকি রামায়ণ মহাভারত উপনিষদাদি গ্রন্থের সাক্ষ্যকেও প্রায় সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন বলেই লোকায়তর ব্যাখ্যায় অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের কাছে একমাত্র প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দাঁড়ালো: প্রাচীন ভারতে এ-রকম চূড়ান্ত নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব কী করে সম্ভব হয়েছিলো এবং ঐতিহাসিকভাবে তার সার্থকতাই বা কতোটুকু? সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে পুরোনো কালের বিশ্বাস ভেঙে পড়ছিলো—এমন কোনো যুগের প্রকল্প তাঁর প্রথম প্রশ্নটির উত্তর যোগাতে পেরেছে। এবং এরই উপর নির্ভর করে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন, লোকায়ত-মত যতোই নেতিবাচক হোক না কেন প্রাচীনকালে তা আমাদের দেশের ধ্যানরাজ্যে মুক্তি ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলো।

শ্রীযুক্ত জে. মুয়ারও[২২] প্রধানতই মাধবের নেতিমূলক বর্ণনাটির উপর নির্ভর করেছেন বলেই তাঁর কাছেও লোকায়ত প্রাচীন ভারতের ধ্যানরাজ্যে মুক্তি ও স্বাধীনতার পরিচায়ক। কিন্তু তাঁর মতে এ-মুক্তি শ্রুতি-শাসন ভেঙে পড়বার পরিণাম নয়, বরং শ্রুতি-শাসন কঠোর ও সংহত হবার কারণ। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তের এই প্রভেদটির কারণ কী? আসলে, মাধবের বর্ণনা ছাড়াও তিনি লোকায়ত-সংক্রান্ত আরো কিছু প্রাচীনতর তথ্যকে স্বীকার করবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু এই বাড়তি তথ্যের সঙ্গে মাধবের বর্ণনার অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রকট বৈষম্য চোখে পড়ে। অথচ শ্রীযুক্ত মুয়ারের মনে মাধবের প্রতি নিষ্ঠাই সবচেয়ে মৌলিক। ফলে তিনি এমন একটি প্রকল্পে উপনীত হবার চেষ্টা করেছেন যার সাহায্যে ওই আপাত-বৈষম্যটুকুর ব্যাখ্যা করা যায়।

বাড়তি তথ্য হিসেবে তিনি দেখছেন, অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ-দেশে নাস্তিক—অতএব লোকায়তিক—চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি রামায়ণেও[২৩] দেখা যায় ব্রাহ্মণ জাবালি রামচন্দ্রকে যে-উপদেশ দিচ্ছেন তা নাস্তিকতায় ভয়ঙ্কর। অমন ভয়ানক নাস্তিক্য-মূলক বলেই এ-উপদেশকে শ্রীযুক্ত মুয়ার লোকায়তিক বলে সনাক্ত করছেন—অবশ্য এই সনাক্তিকরণের পিছনে তাঁর মনে শুধুই যে মাধবের প্রভাব আছে তাই নয়, বিষ্ণুপুরাণ-বর্ণিত[২৪] মায়ামোহপ্রচারিত লোকায়ত-মতের সঙ্গে জাবালির উপদেশটির নিকট সাদৃশ্যও তিনি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু মাধবের বর্ণনার সঙ্গে রামায়ণের এই তথ্যটির অসঙ্গতি কোথায়? রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে জাবালি ছিলেন ব্রাহ্মণ। অতএব শ্রীযুক্ত মুয়ার মনে করছেন, রামায়ণের এই অংশ যদি প্রক্ষিপ্ত না হয় (এবং তাঁর মতে অংশটি সত্যিই

প্রক্ষিপ্ত নয়) তাহলে মানতে হবে যে, রামায়ণ রচিত হবার যুগেও একজনের পক্ষে ব্রাহ্মণ হয়ে থাকা সত্ত্বেও লোকায়ত-মত পোষণ করায় বাধা ছিলো না। কিন্তু তা কী করে সম্ভব হতে পারে? মুয়ার মনে করছেন, একমাত্র এই সর্তে ঘটনাটি সম্ভব হতে পারে যে, তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে শুধু কয়েকটি আনুষ্ঠানিক দিক বজায় রাখাই যথেষ্ট, কিন্তু তার সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ মানা-না-মানার বাধ্যবাধকতা ছিলো না—অর্থাৎ তখনো চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বর্তমান ছিলো। অতএব, অতি সুদূর অতীত থেকেই ভারতবর্ষে চিন্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়ে আসছে, রামায়ণ রচনার যুগেও চিন্তার উপর হস্তক্ষেপ করা হতো না। চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে অনেক পরে। আসলে, বৌদ্ধ লোকায়তিক প্রভৃতি নাস্তিকদের আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠার পর থেকেই আস্তিক্য বা বেদপন্থীরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং অত্যন্ত কঠোর শ্রুতি-শাসন প্রবর্তন করতে চাইলেন। অতএব মাধবের লোকায়ত-বর্ণনের সঙ্গে লোকায়ত-সংক্রান্ত কিছু বাড়তি তথ্যের সঙ্গতি খুঁজতে গিয়ে শ্রীযুক্ত মুয়ার অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন: লোকায়ত-মত চিন্তারাজ্যে শ্রুতি-শাসন প্রবর্তনের কারণ, শ্রুতি-শাসন ভেঙে পড়বার পরিণাম নয়।

এবং একই কারণে—অর্থাৎ, মাধবের বর্ণনার সঙ্গে কিছু বাড়তি তথ্যের সঙ্গতিরক্ষার চেষ্টায়—অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তও লোকায়ত-সংক্রান্ত তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যদিও বাড়তি তথ্য হিসেবে তিনি বিশেষ করে যেটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা অনেকাংশে অভিনব বলেই অধ্যাপক দাসগুপ্তের সিদ্ধান্তটিও অভিনব হয়ে দাঁড়ালো। তিনি কোন্ তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন? ছান্দোগ্য-উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ: অসুরদের প্রতিনিধি বিরোচন মনে করেছিলেন দেহই আত্মা, এই কারণেই অসুরেরা মৃতব্যক্তির দেহ সুশোভিত করে এবং খাদ্যাদির সম্ভার সহকারে তার কবর দেয়। অধ্যাপক দাসগুপ্তের ধারণায় অসুর বলতে প্রাচীন সুমেরীয়দের বুঝতে হবে এবং উক্ত সংকার-পদ্ধতি তাদেরই বৈশিষ্ট্য। এই সংকার-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত দেহাত্মবাদই কালক্রমে আমাদের দেশে এসে লোকায়ত-মতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু লোকায়ত-সংক্রান্ত তথ্যের মধ্যে অধ্যাপক দাসগুপ্তের কাছেও মাধবের বর্ণনাই প্রধানতম অবলম্বন বলেই তিনি এখানে একটিমাত্র সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন: ছান্দোগ্য-বর্ণিত ওই অসুরমত কীভাবে কালক্রমে মাধব-বর্ণিত লোকায়ত-মতে পরিণত হলো? ঐতিহাসিক বিবর্তন-মূলক একটি প্রকল্পের সাহায্যে তিনি এ-সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন। আমরা গ্রন্থমধ্যে (পৃ. ৪৩৪-৪৪৪) অধ্যাপক দাসগুপ্তের এই সিদ্ধান্তটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি এবং লোকায়তর সঙ্গে অসুরমতের সাদৃশ্যমূলক ইংগিতটির তাৎপর্য কী হতে পারে তারও আলোচনা তুলেছি (পৃ. ৫৩৩—৫৪০)

অধ্যাপক তুচি[২৫] সিদ্ধান্ত করছেন, শুরুতে লোকায়ত ছিলো রাজোপদেশক পুরোহিত শ্রেণীরই প্রজ্ঞা—তখনো পুরুষার্থ হিসেবে ধর্ম ও অর্থের মধ্যে বিরোধ ফুটে উঠেনি। অর্থ বলতে তিনি এখানে রাজার দণ্ডনীতি ইত্যাদি বুঝতে চেয়েছেন এবং তাঁর ধারণায় এ-জাতীয় রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক খুব বেশিদিন টিকতে পারে না। রাজ-নীতিকদের মধ্যে কেউ কেউ ক্রমশই ধর্ম-শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে লাগলেন এবং দাবি করলেন পার্থিব ব্যাপারে ঈশ্বর ও পুরোহিতদের হস্তক্ষেপ স্বীকার করা হবে না। এ-অবস্থায় সাধারণত যা ঘটে এক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। শুধুই যে ধর্মের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলো তাই নয়, অর্থ যেন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। এবং এই-

ভাবেই কালক্রমে লোকায়তর আদিরূপটি পরিবর্তিত হয়ে মাধব-বর্ণিত ওই সুখবাদী নিরীশ্বর ও জড়বাদী দর্শনে পরিণত হলো।

অবশ্যই অধ্যাপক তুচি ধর্ম ও অর্থের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধের এই কাহিনীটির পক্ষে বিশেষ কোনো তথ্য, যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থিত করেননি; উপস্থিত করা একান্তই সম্ভব কিনা তাও হয়তো সন্দেহের কথা। অতএব প্রশ্ন ওঠে, তিনি কেন এ-জাতীয় একটি কাহিনী রচনা করতে বাধ্য হলেন? তাঁর রচনা বিশ্লেষণ করলে এর কারণ দেখতে পাওয়া যায়। মাধবের চেয়েও অনেক পুরোনো সূত্রে তিনি লোকায়ত-সংক্রান্ত এমন কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন যার সঙ্গে মাধবের এই বর্ণনাটি খাপ খায় না—পাদটীকায়[২৬] এ-জাতীয় তথ্যের নমুনা দেওয়া গেলো। এই গরমিল থেকে অধ্যাপক তুচি অবশ্যই মাধবের বর্ণনাটিকে সন্দেহ করতে পারতেন; কিন্তু অন্যান্য আধুনিক বিদ্বানদের মতোই তাঁর কাছেও এ-বর্ণনাই চূড়ান্ত মূল্যবান। ফলে তাঁর পক্ষেও এমন কোনো প্রকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন হলো যার সাহায্যে প্রাচীনতর সূত্রে পাওয়া লোকায়তর আদিরূপটিই কীভাবে কালক্রমে মাধব-বর্ণিত লোকায়তে পরিণত হয়েছিলো সে-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও[২৭] মাধবের বর্ণনাটি থেকেই শুরু করেছেন। 'লোকায়ত' নামে তাঁর ক্ষুদ্র কিন্তু অমূল্য পুস্তিকার প্রারম্ভেই তিনি বলছেন, সর্বদর্শন-সংগ্রহ বলে গ্রন্থটি অনেকদিন আগেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো এবং আমি অচিরেই চার্বাক-দর্শন সংক্রান্ত পত্তাংশটুকু মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। স্বভাবতই, মহামহোপাধ্যায় তাঁর পুস্তিকাটির প্রথমাংশে সর্বদর্শন-সংগ্রহের ভিত্তিতেই লোকায়তর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর মতো বিদ্বানের পক্ষে লোকায়তর পুনর্গঠন-প্রসঙ্গে স্বভাবতই এটুকুর মধ্যে আবদ্ধ থাকা সম্ভব হয়নি। তাই অন্যান্য সূত্রে লোকায়ত-সংক্রান্ত আর কী তথ্য পাওয়া যায় তিনি সে-প্রশ্ন তুলেছেন। এবং এ-জাতীয় তথ্যের অন্বেষণে অগ্রসর হয়ে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়কর কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন, বৃহস্পতি-সূত্রে[২৮] বলা হয়েছে অর্থ-সাধন ব্যাপারে লোকায়তই একমাত্র শাস্ত্র এবং সেই সঙ্গে—মহামহোপাধ্যায়ের বর্ণনায়, প্রায় একনিঃশ্বাসে—বলা হয়েছে যে, কামসাধন ব্যাপারে কাপালিকই একমাত্র শাস্ত্র। স্বভাবতই মহামহোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে, এইভাবে একনিঃশ্বাসে লোকায়ত ও কাপালিক—অর্থসাধন ও কামসাধন—দুয়ের উল্লেখ করবার পিছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইংগিত থাকাই সম্ভবপর। এবং সে-ইংগিতটির তাৎপর্য আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে জৈন লেখক গুণরত্নের[২৯] রচনায়। গুণরত্ন বলছেন, লোকায়তিকেরা মদ্যপান করে, মাংস ভক্ষণ করে তারা মৈথুনাসক্ত। শুধু তাই নয়, তারা গায়ে ভস্ম মাখে, তারা যোগী। এবং প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে অবাধ মৈথুনে প্রবৃত্ত হবার উদ্দেশ্যে তারা একত্রে মিলিত হয়। এ-বর্ণনা স্বভাবতই মহামহোপাধ্যায়কে বামাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়গুলির কথা মনে করিয়েছে এবং তিনি জানেন যে, এ-জাতীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায় আমাদের দেশ থেকে আজো বিলুপ্ত হয়নি। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করছেন সহজিয়া বৈষ্ণব ইত্যাদি নামান্তরের আড়ালে লোকায়ত সম্প্রদায় আজো আমাদের দেশে টিকে রয়েছে। সেই সঙ্গেই কিন্তু তিনি বলছেন, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি অধঃপতিত মহাযান-বৌদ্ধধর্মেরই স্মারকমাত্র। এবং বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের কারণটা[৩০] হলো প্রাকৃতজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—লোকেষু আয়ত্ত—হয়ে পড়া। এইভাবে স্থূল লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় বৌদ্ধধর্মের মহান

আদর্শগুলি নষ্ট হলো এবং ক্রমশই তা বীভৎস কামবিকারে পরিণত হয়ে পড়লো। সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি সংক্রান্ত মহামহোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রন্থমধ্যে (পৃঃ ৪৬০-৪৬৮) আলোচনা করেছি।

যদি তাই হয়, তাহলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে, মাধব-বর্ণিত লোকায়তর সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক কী, সাদৃশ্য কোথায়? এবং যদি কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে তাঁর উক্ত সিদ্ধান্তের দিক থেকে মাধবের লোকায়ত-বর্ণনাকে সন্দেহ করবার প্রয়োজন হবে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, মাধবের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা কতোখানি গভীর! অতএব, মাধবের বর্ণনা সন্দেহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে তিনি এ-প্রশ্নটিই তুললেন না। তার দরুন কিন্তু তাঁর পুস্তিকার প্রথমাংশের সঙ্গে শেষাংশের কোনো সঙ্গতি রইলো না: তিনি যেন তথ্যের খাতিরে সিদ্ধান্তের অসঙ্গতিকেই স্বীকার করে নিলেন।

প্রধানত তাঁর ওই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির উপর নির্ভর করেই ডাক্তার দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী[৩১] ভারতীয় বস্তুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন এবং মহামহোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের অসঙ্গতিকেও সাধ্যমতো সঙ্গত করে নেবার চেষ্টা করেছেন। কী ভাবে তা করা যায়? কী করে মাধবের বর্ণনার সঙ্গে কামাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়গুলির কথা খাপ খাওয়ানো সম্ভব হতে পারে? ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর যুক্তিটি মোটের উপর এই: মাধব বলছেন লোকায়তিকেরা ইন্দ্রিয়ভোগ ছাড়া আর কোনো আদর্শ মানতো না, অতএব এই ভোগবাদের প্রভাবেই দেশে নীতিগর্হিত অবাধ মৈথুনের উৎসাহ দেখা দিলো। কিন্তু সমস্যা হলো, এ-জাতীয় বামাচারী ধ্যানধারণার প্রভাব ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতো ব্যাপক ও গভীর তার একটি প্রমাণ উড়িষ্যা প্রভৃতির মন্দির-ভাস্কর্য। ভারতীয় সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যকে যদি শুধুমাত্র মৈথুনাসক্তিরই পরিচায়ক মনে করতে হয় এবং এই মৈথুনাসক্তিকে যদি ভোগসর্বস্ব লোকায়ত-মতের প্রভাব-পরিণাম বলেই গ্রহণ করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান করবার প্রয়োজন পড়ে যে, পুরো দেশটাই যেন লোকায়ত-মতের প্লাবনে ভেসে গিয়েছিলো। ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এই রকমই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি বলছেন, লোকায়ত ছিলো সুখবাদ, আনন্দ-উজ্জ্বল; তারই প্রভাবে ভারতীয় ইতিহাসের সেই যুগে মন্দির আর রাজদরবার, শিল্প আর সাহিত্য ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার উৎসাহে ভরপুর হয়েছিলো, সারা দেশ জুড়ে দেখা দিয়েছিলো কামসর্বস্বতার প্লাবন—ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত, রাজা থেকে ভিখিরি পর্যন্ত সকলেই মদনোৎসবে মেতে উঠতো, সে-উৎসবের মূল কথা হলো মদন বা কামের উপাসনা। আমরা গ্রন্থমধ্যে (পৃ. ৪৪৪-৪৪৯) ডক্টর শাস্ত্রীর এই সিদ্ধান্তটি বিচার করবার চেষ্টা করেছি।

যদিও ঠিক কবে, কোন যুগে, সমগ্র ভারত এ-ভাবে লোকায়ত-মতের প্রভাবে প্লাবিত হয়েছিলো লেখক সে-কথা আমাদের বলেননি, তবুও নিশ্চয়ই রাজা থেকে ভিখিরি পর্যন্ত সকলের পক্ষে একটি মতবাদ নিয়ে এমনভাবে মেতে ওঠবার কাহিনী অত্যন্ত রোমাঞ্চকর মনে হতে বাধ্য। তাই এর পর লোকায়ত-সংক্রান্ত রিস্-ডেভিড্স্-এর সিদ্ধান্তটি শুনতে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনকই মনে হবে। কেননা তিনি বলছেন, কোনোকালেই এ-দেশে লোকায়ত-দর্শন বলে কোনো কিছুই ছিলো না। সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রে লোকায়ত-সংক্রান্ত যতো তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি[৩২] মন্তব্য করছেন,

Throughout the whole story we have no evidence of any one

who called himself a Lokayatika....And of the real existence of a school of thought, or of a system of philosophy that called itself by that name, there is no trace.

অবশ্যই, নিজেকে লোকায়তিক বলছেন এমন কারুর কথা কোথাও পাওয়া যাক আর নাই যাক অপরকে লোকায়তিক বলে সনাক্ত করবার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই বিরল নয়। এসব ক্ষেত্রে লোকায়ত বলতে কী বোঝা দরকার? রিস্-ডেভিড্‌স্ বলছেন, *folk-lore* বা *nature-lore*।

After the early use of the word in some such sense as Nature-lore or folk-lore, there is a tone of unreality over all the statements we have...In the middle period, the riddles and quibbles of the nature-lorists were despised. In the last period the name Lokayata, Lokayatika became hobby horses, pegs on which certain writers can hang the views that they impute to their adversaries, and give them, in doing so, an odious name.[৩৩]

প্রশ্ন হলো, রিস্-ডেভিড্‌স্ কেন এ-জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন? অন্যান্য বিদ্বানদের মতো তাঁর বেলাতেও কি এ-কথা খাটে যে, মাধবের উপর নির্ভরতাই এর প্রধান কারণ? আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, তা হতে পারে না। কেননা আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই মাধবের এ-বর্ণনাকে সরাসরি কাল্পনিক বলতে চেয়েছেন :

His very able description has all the appearance of being drawn from his own imagination.[৩৪]

তবুও, শুনতে যতোই আপাত-অসম্ভব মনে হোক না কেন, মাধব সম্বন্ধে এই তীব্র মন্তব্য সত্ত্বেও, মাধবের উপর প্রচ্ছন্ন নির্ভরতার দরুনই তিনি শেষ পর্যন্ত লোকায়তকে এ-ভাবে অলীক মনে করেছেন। যেন মাধবের যাথার্থ্যের উপরই লোকায়তর সত্তা নির্ভর করছে—তাঁর বর্ণনা যদি কাল্পনিক হয় তাহলে লোকায়তই কাল্পনিক হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ, মাধবের এই বর্ণনাটিই লোকায়ত প্রসঙ্গে আমাদের একমাত্র সম্বল এবং এ-সম্বলটি কাল্পনিক বলেই সামগ্রিকভাবে লোকায়তকে কাল্পনিক মনে করা প্রয়োজন।

রিস্-ডেভিড্‌স্-এর যুক্তিটি ভালো করে বিশ্লেষণ করলে এ-কথা বুঝতে পারা যাবে। তিনি লক্ষ্য করছেন, বৌদ্ধ-গ্রন্থাবলী অনুসারে যে-ক'টি বিষয়ে পারদর্শিতা বিদ্বান ব্রাহ্মণের পক্ষে অপরিহার্য বলে বিবেচিত, তার মধ্যে একটি হলো ওই লোকায়ত।

...the description of the good Brahmana, as put in the Buddhist Suttas, into the mouth of the Brahmanas themselves, mentions *lokayata* as one branch of his learning. The whole paragraph is

complementary. And though the exact connotation of one or two of the other terms is doubtful, they are all descriptive of just those things which a Brahmana would have been rightly proud to be a master of.[৩৫]

বলাই বাহুল্য, উত্তরকালে ব্রাহ্মণ-শ্রেণী বলতে আমাদের যে সাধারণ ধারণা তার সঙ্গে এ-জাতীয় তথ্য খাপ খায় না। তাই এ-জাতীয় তথ্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হলে বৌদ্ধশাস্ত্র-বর্ণিত ব্রাহ্মণ বলতে আমাদের চলতি ধারণাটির সংশোধন প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তাছাড়া আরো একটি সম্ভাবনাও রয়েছে। আমাদের মনে সাধারণত লোকায়ত বলতে যে-ধারণা আছে হয়তো সেটিও সংশোধন-সাপেক্ষ—এবং এই ধারণাটি মূলতই মাধবের কাছ থেকে পাওয়া।

প্রসঙ্গান্তরে ব্যক্ত[৩৬] রিস্-ডেভিড্স্-এর মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে, ব্রাহ্মণ সংক্রান্ত চলতি ধারণাটিকে সংশোধন করতে তিনি হয়তো আমাদের উৎসাহিতই করবেন। বৌদ্ধ-ভারতে জাতিভেদ ব্যবস্থার পরিস্থিতি এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ সংক্রান্ত তাঁর সিদ্ধান্তগুলি মনে রাখলে বৌদ্ধভারতে ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদবিরোধী অর্থে নাস্তিক হওয়ার সম্ভাবনা খুব খাপছাড়া মনে না হতেও পারে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হলো, প্রধানতই মাধবের কাছ থেকে পাওয়া লোকায়ত-সংক্রান্ত আমাদের চলতি ধারণাটি সংশোধন করবার কথা। রিস্-ডেভিড্স্-এর যুক্তিটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তিনি এই সংশোধন-সম্ভাবনায় বিশ্বাসী নন। তাঁর যুক্তির তাৎপর্য অনুসারে মাধবের বর্ণনাটিকে কাল্পনিক মনে করলে সামগ্রিকভাবে লোকায়তকেও অলীক মনে করা প্রয়োজন—যেন লোকায়তর পুনর্গঠনে মাধব ছাড়া আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়, মাধবকে মানতে পারা-না-পারার উপরই লোকায়তকেও মানতে পারা-না-পারা নির্ভর করছে। কিন্তু এইভাবে লোকায়তকে অলীক মনে করলেও প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত লোকায়ত শব্দটির একটা ব্যাখ্যা চাই। লেখক বলছেন, লোকায়ত বলতে প্রথমে বোঝাতো *nature-lore* বা *folk-lore*, কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব বা দার্শনিক মত নয়। ক্রমশ ফোক্‌লোর নিন্দিত হয় এবং শেষপর্যন্ত লোকায়ত শব্দটিই শুধু একটা গালিগালাজের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। ফোক্‌লোর মানে কী, তার মধ্যে কোনো আদিম পর্যায়ের বিশ্বাস ও তত্ত্বের পরিচয় আছে কিনা এবং কী ভাবে ও কেন আমাদের দেশের ইতিহাসে তার আদি-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে লাগলো—এ-সব প্রশ্ন বাদ দিয়েও আমরা বর্তমানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, আমাদের দার্শনিক সাহিত্যের সাক্ষ্য অনুসারেই রিস্-ডেভিড্স্-এর এই মন্তব্য গ্রহণ করায় বাধা আছে। প্রথমত, আমরা আগেই দেখেছি যে, লোকায়তিকদের নিজস্ব রচনা বিলুপ্ত হলেও আমরা এ-কথা মানতে বাধ্য যে, কোনো এককালে এ-জাতীয় রচনা যে সত্যিই ছিলো সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, সে-রচনা বিলুপ্ত হলেও লোকায়ত-খণ্ডনের নিদর্শন দুর্লভ নয় এবং এগুলি একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের—প্রধানতই দেহাত্মবাদের—খণ্ডন। শঙ্করাচার্যের[৩৭] রচনাই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, শঙ্করাচার্য যে-মতটি খণ্ডন করছেন তার আসল নাম লোকায়ত নয় এবং তার আসল নামটি উহ্য রেখে কেবল একটা সুবিধাজনক গালাগালি হিসেবেই তিনি একে লোকায়ত

ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ-জাতীয় কথা স্পষ্টই কষ্টকল্পিত হবে। কিন্তু রিস্-ডেভিড্‌স্-এর সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে হলে এ-জাতীয় কথা কল্পনা না করেও উপায় নেই।

আধুনিক বিদ্বানদের কয়েকটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা গেলো এবং দেখা গেলো সিদ্ধান্তগুলি আপাত-দৃষ্টিতে যতোই পরস্পর-বিরোধী ও অসংলগ্ন হোক না কেন, মোটামুটি একই পদ্ধতির পরিণাম : আধুনিক বিদ্বানেরা লোকায়তর পুনর্গঠনে মাধবের বর্ণনাকেই প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তার সঙ্গে অন্যান্যসূত্রে পাওয়া লোকায়ত-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—কেননা ওই বিভিন্ন তথ্য সত্যিই বিচিত্র, এমনকি আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী ও অসংলগ্ন। মাধবের বর্ণনাটির প্রভাব মুক্ত হয়ে লোকায়তর পুনর্গঠনে এ-জাতীয় আপাত-অসংলগ্ন তথ্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো সত্যিই যায় কিনা—সে-প্রশ্ন তোলবার আগে আমরা মাধবের বর্ণনাটিকে খুঁটিয়ে বিচার করবার চেষ্টা করবো।

দুটি প্রধান কারণে মাধবের বিরুদ্ধে প্রাথমিক সংশয় জাগতে পারে।

প্রথমত, মাধব ছিলেন খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর লেখক ; অপরপক্ষে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র[৩৮] এবং ব্রহ্মজালসুত্ত[৩৯] প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে লোকায়তর উল্লেখ থেকেই অনুমান করা অসংগত নয় যে, মাধবের প্রায় দু'হাজার বছর আগেও এদেশে লোকায়ত-মত সুপ্রচলিত ছিলো। অধ্যাপক বেলভেলকার ও রানাডে[৪০] এমনকি এ-কথা মনে করছেন যে, ঋগ্বেদেও বস্তুবাদী চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং 'প্রাক্-বৌদ্ধ যুগেও যে বিশুদ্ধ বস্তুবাদের প্রচারক এ-দেশে ছিলেন সে-বিষয়ে সুস্পষ্ট ইংগিত আছে'। একথা মনে করবার নিশ্চয়ই কোনো কারণ নেই যে, এই সুদীর্ঘ যুগের মধ্যে লোকায়ত-মতের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অতএব, মাধবের সময়ে এবং বিশেষত ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে লোকায়ত-মতের যে-পরিণতি ঘটেছিলো মাধব বড়ো জোর তারই বর্ণনা করেছেন[৪১] এবং এই রূপটিই লোকায়তর আদি-অকৃত্রিম রূপ নাও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত মাধবের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কথাও অগ্রাহ্য করা যায় না। ভ্রাতা সায়নাচার্যের মতোই তিনিও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও মন্ত্রী ছিলেন ; শুধু তাই নয়, এমন কথাও সন্দেহ করা হয় যে, এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য শঙ্কর মঠ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ তিনিই সংগ্রহ করেছিলেন[৪২]। অতএব রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি গভীরভাবে লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর দার্শনিক উৎসাহটুকুও এ-রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়াই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে, নামেই প্রকাশ যে, লোকায়ত হলো জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ধ্যানধারণা। রাজনীতিতে যিনি অভিজাতশ্রেণীর এমন সমর্থক, তাঁর পক্ষে জনসাধারণের ধ্যানধারণাকে অবিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করবার মতো সহানুভূতি থাকা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নয়।

উত্তরে মাধবের পক্ষ থেকে বলা যায় এই দুটি প্রাথমিক আপত্তির মধ্যে একটিরও গুরুত্ব বেশি নয়। আদি-লোকায়ত ও মাধবের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেকখানি হতে পারে ; কিন্তু ভারতীয় দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্যই হলো অনেক যুগ ধরে তা মূলতই অপরিবর্তিত থাকে। আদি-লোকায়তর মধ্যে যে চিন্তা বীজাকারে ছিলো মাধবের সময়ে তা হয়তো পত্রে-পুষ্পে বিকশিত হয়েছে এবং হয়তো অনেকাংশেই সংহত ও সুশৃঙ্খল হয়েছে ; কিন্তু

তার মানেই এই নয় যে, দুয়ের মধ্যে কোনো রকম গুণগত পার্থক্য অনুমান করবার সুযোগ আছে। দ্বিতীয়ত, এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মাধব ব্যক্তিগতভাবে লোকায়তর প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিহীন ছিলেন। কিন্তু আপত্তিটা শুধু মাধবের বেলাতেই বা কেন? আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, বিপক্ষের রচনা ছাড়া লোকায়ত-সংক্রান্ত কোনো তথ্যই সংগ্রহ করবার উপায় নেই। এবং বিপক্ষের মধ্যে অন্যেরা হয়তো মাধবের মতো অমন প্রকটভাবে রাজনীতিতে উৎসাহী ছিলেন না; কিন্তু তাঁদের ধর্মগত ও সম্প্রদায়গত উৎসাহও কম তীব্র নয়—ফলে লোকায়ত-প্রসঙ্গে অন্য কারুর উক্তি যে মাধবের চেয়ে বেশি নৈর্ব্যক্তিক হবে এমন সম্ভাবনা সত্যিই সংকীর্ণ।

কিন্তু এই দুটি প্রাথমিক আপত্তির বিরুদ্ধে মাধবকে সমর্থন করা সম্ভব হলেও আমরা তাঁর লোকায়ত-বর্ণনকে সন্দেহ করতে বাধ্য হয়েছি। কেননা তাঁর রচনার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য এবং বিশেষত তাঁর রচনা-বহির্ভূত আনুষঙ্গিক তথ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে যায়।

আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হিসেবে আমরা প্রধানত দুটি বিষয়ের আলোচনা করবো। এক: মাধবের রচনাভঙ্গি। দুই: অনুমান-প্রসঙ্গে লোকায়ত-মত।

মাধবের রচনাভঙ্গি। অধ্যাপক ই. বি. কাওয়েল[৪৩] লিখছেন, বিপক্ষের মতবাদ আলোচনা করবার সময় মাধব এক অদ্ভুত পরিহাস-রসের পরিচয় দেন—তিনি যেন বিপক্ষের স্থান নিজেই গ্রহণ করেন এবং এমন একটা ভঙ্গিতে তর্ক করেন যে, আসলে যে-মতবাদের সঙ্গে তাঁর সত্যিই কোনো সম্পর্ক নেই সাময়িকভাবে তিনি যেন সেই মতবাদটিই গ্রহণ করেছেন!

অধ্যাপক কাওয়েল-এর এ-মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণও। এর থেকে বোঝা যায়, সৃজনী চিন্তার প্রতিভায় মাধব অসামান্য ছিলেন; কিন্তু এর থেকেই অনুমান করা প্রয়োজন যে, মাধবের বর্ণনা থেকে তাঁর বিপক্ষ-মতকে বোঝবার চেষ্টা বিপজ্জনক। যেমন, প্লেটোর তুলনায় জেনোফেন অনেক কম প্রতিভাশালী ছিলেন বলেই সক্রেটিসের মত নৈর্ব্যক্তিকভাবে বোঝবার জন্য জেনোফেনের বর্ণনার উপর নির্ভর করা তুলনায় নিরাপদ,—অনেকটা সেই রকম; যদিও অন্যান্য দিক থেকে দুটি পরিস্থিতিতে বহু প্রভেদ আছে।

মাধবের ওই প্রতিভাই তাঁর রচনার নৈর্ব্যক্তিকতার অন্তরায়। লোকায়তিকেরা ঠিক কী ভাবে তর্ক করেন, ঠিক কী তত্ত্ব প্রতিপন্ন করতে চান—শুধুমাত্র তারই একটা সহজ পরিচয় দিয়ে সন্তুষ্ট থাকা মাধবের মতো প্রতিভাশালীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার বদলে তিনি যেন এ-কথা বলতেই অনেক বেশি ব্যস্ত যে, তিনি নিজে যদি লোকায়তিক হতেন তাহলে ঠিক কী ভাবে তর্ক করতেন, কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করতেন। এককথায়, নিজস্ব সৃজনী চিন্তার বন্যায় তিনি যেন ভেসে যান; ফলে লোকায়তর বাস্তব বর্ণনাটুকুর মধ্যে আবদ্ধ থাকা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না।

এর ফলে নানা রকম অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। মাধব নিজে ছিলেন বৈদান্তিক; এবং লোকায়তিকের তর্কপদ্ধতি আর যাই হোক বৈদান্তিকের মতো হতে পারে না। কেননা, বেদান্ত-মতে শ্রুতিই চূড়ান্ত প্রমাণ, অতএব শ্রুত্যনুগৃহীত তর্কের মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু শুধু-তর্ক অপ্রতিষ্ঠ[৪৪]। এই কারণে বৈদান্তিকেরা

আত্মপক্ষ সমর্থনে নানা রকম যুক্তিতর্ক দিলেও শেষ পর্যন্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করেই নিজেদের বক্তব্যকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। বলাই বাহুল্য, এ-পদ্ধতি লোকায়ত-স্বীকৃত হতে পারে না; কেননা মাধবের রচনা ছাড়াও অন্যান্য সূত্রে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে, লোকায়তিকেরা শ্রুতি-বিরোধী ছিলেন। অতএব, লোকায়তিকেরা যে আত্মপক্ষ সমর্থনে শ্রুতি উদ্ধৃত করবেন এমন সম্ভাবনা নিশ্চয়ই প্রবাদ-বচনের 'ভূতের মুখে রাম নামের' চেয়েও সুদূরপরাহত। অথচ নিজের তর্কপদ্ধতি নিয়ে মাধব এমনই বিভোর যে, লোকায়তিকদের মুখে শ্রুতিবাক্য বসিয়ে দিতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি: "তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি। তেভ্য এব দেহাকারপরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবচ্চৈতন্যমুপজায়তে। তেষু বিনষ্টেষু সৎসুস্বয়ং বিনশ্যতি। তদাহুঃ—'বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি'॥ বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২. ৪. ১২॥"[৪৫] বলাই বাহুল্য, বৃহদারণ্যকের এই উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য যাই হোক না কেন, লোকায়তিকেরা যে তারই সাহায্যে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করবেন—একথা কল্পনাতীত। অথচ, মাধব অতি অনায়াসেই তা লোকায়তিকদের উপরেও আরোপ করেছেন! এবং মাধবের রচনাভঙ্গি যদি এইরকমই হয় তাহলে তাঁর বর্ণনার উপর নির্ভর করে লোকায়তর অকৃত্রিম পরিচয় পাবার সম্ভাবনা সত্যিই কতোটুকু?

মাধবের রচনার আর একটি আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বিচার করা যাক। আমরা সাধারণত ধরে নিই যে, লোকায়তিকেরা অনুমানকে অসিদ্ধ মনে করেন এবং অতএব প্রমাণ হিসেবে অনুমান-নির্ভর শ্রুতি প্রভৃতিরও মূল্য অস্বীকার করে তাঁরা শুধু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেন। আমাদের এই চলতি ধারণাটি প্রধানতই মাধবের কাছ থেকে পাওয়া এবং লোকায়তিকেরা যে কীভাবে অনুমানকে অপ্রতিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করতে চান এ-বিষয়ে মাধব একটি সুচিন্তিত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন[৪৬]। বলাই বাহুল্য, এ-রকম চূড়ান্ত অর্থে অনুমানের মূল্য অস্বীকার করলে তর্কপদ্ধতিরই কোনো রকম নির্ভরযোগ্যতা থাকে না। ফলে, লোকায়তিকদের জবাব দেওয়াও অনেক সহজ হয়: তোমরাই বলো অনুমানের কোনো মূল্য নেই অথচ তোমরাই আবার তর্ক করে সে-কথা প্রমাণ করতে চাও। কিংবা, নৈয়ায়িক উদয়ন[৪৭] যেমন বলছেন, লোকায়তিকদের এ-দাবি মানলে এমনকি ব্যবহারিক জীবনও অসম্ভব হয়ে পড়ে, কেননা ঠিক বর্তমান মুহূর্তে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেটুকু জানা যাচ্ছে তা ছাড়া আর কিছুর সত্তাই মানা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, লোকায়তিকদের দিয়ে এ-ভাবে যুক্তিতর্কের মূল্য সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করানোর ব্যাপারে মাধব সত্যিই কতোখানি বস্তুনিষ্ঠ? অর্থাৎ, সত্যিই কি লোকায়তিকেরা এমন চূড়ান্ত অর্থে অনুমানের মূল্য অস্বীকার করেছেন যে, তাঁদের দাবি অনুসারে যুক্তি-মাত্রই নিষ্ফল হয়ে দাঁড়ায়? না, এখানেও মাধব তাঁর নিজস্ব ধারণাই লোকায়তিকদের উপর আরোপ করবার আয়োজন করছেন?

পঞ্চদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ টীকাকার[৪৮] লোকায়তকে 'বিতণ্ডা-বাদ-সত্থ' বলে বর্ণনা করেছেন। সত্থ মানে শাস্ত্র। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[৪৯] প্রশ্ন তুলেছেন, একই সঙ্গে লোকায়ত কীভাবে বিতণ্ডা এবং বাদ উভয় শাস্ত্র হতে পারে? কেননা, নৈয়ায়িকদের ব্যাখ্যা অনুসারে 'বিতণ্ডা' হলো কোনো নির্দিষ্ট মত প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা না করে শুধুই নেতিমূলক কূটতর্ক; এবং 'বাদ' হলো একটি নির্দিষ্ট মত স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সুস্থ তর্ক। উত্তরে

অধ্যাপক দাসগুপ্ত বলছেন, বৌদ্ধরা 'বিতণ্ডা' এবং 'বাদ' দুয়ের মধ্যে এ-জাতীয় প্রভেদ করতেন না। তাই যদিও নৈয়ায়িক অর্থে লোকায়ত শুধু বিতণ্ডাই ছিলো তবুও বৌদ্ধরা তাকে 'বাদ' বলতেও দ্বিধা করেননি। অবশ্যই এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বৌদ্ধরা লোকায়তকে এই রকমই বৃথা-তর্কে ব্যাপৃত বলে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু সে-বর্ণনা যে অনেকাংশেই কাল্পনিক এ-কথা সন্দেহ করবারও কারণ আছে। কেননা বৌদ্ধরা লোকায়তিকদের উপর এমন কিছুকিছু তর্ক আরোপ করেছেন যা স্পষ্টতই আজগুবি এবং অসম্ভব। যেমন: কাক সাদা, কেননা তার হাড় সাদা; বক লাল কেননা তার রক্ত লাল[৫০]। বলাই বাহুল্য, লোকায়তিকেরা যদি এ-জাতীয় আজগুবি তর্কে ব্যাপৃত থাকতেন তাহলে তাঁদের কথা খণ্ডন করবার জন্য বিপক্ষের এমন মাথা-ব্যথা থাকতো না। তাছাড়া অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে এ-কথাও অনুমান করবার সুযোগ আছে যে, লোকায়তিকেরা শুধুমাত্র নিষ্ফল কূটতর্ক করতেন না। শুক্রনীতিসার[৫১] অনুসারে নাস্তিক-শাস্ত্র তর্কবিদ্যায় পারদর্শী। মনুস্মৃতির টীকাকার মেধাতিথি[৫২] চার্বাকদের তর্কবিদ্যার উল্লেখ করেছেন এবং স্বয়ং মনু[৫৩] হেতুশাস্ত্র এবং হৈতুকাঃ শব্দ ব্যবহার করছেন এবং অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[৫৪] অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বলছেন যে, এখানে লোকায়তিকদেরই উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, কেননা নৈয়ায়িক এবং মীমাংসকদেরও যদিও হৈতুকাঃ বা তার্কী বলে উল্লেখ করবার দৃষ্টান্ত আছে তবুও এগুলি আস্তিক সম্প্রদায়; অপরপক্ষে মনু-উল্লিখিত হৈতুকরা নাস্তিক ছিলেন। ভাগবতপুরাণেও[৫৫] নাস্তিক এবং পাষণ্ডীদের সঙ্গেই হৈতুকদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অবশ্যই মনু[৫৬] এই হৈতুকদের বিরুদ্ধে কঠিন বিধান দিয়েছেন। কিন্তু তার থেকে শুধু এটুকুই প্রমাণ হয় যে, লোকায়তিকেরা বেদ-বিরোধী তর্ক করতেন; অর্থাৎ এ-কথা প্রমাণ হয় না যে, তাঁরা নিষ্ফল বিতণ্ডায় ব্যাপৃত থাকতেন। অপরপক্ষে কৌটিল্য[৫৭] সাংখ্য ও যোগের সঙ্গেই আন্বীক্ষিকী হিসেবেই লোকায়তর উল্লেখ করেছেন এবং লোকায়ত সেখানে নিন্দিত নয়। তাছাড়া, দীঘনিকায় (৩. ১. ৩) এবং অঙ্গুত্তর (১. ১৬৩) বলে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে লোকায়তরও উল্লেখ পাওয়া যায়, হয়তো এখানেও লোকায়ত-শাস্ত্র বলতে তর্কশাস্ত্রই বোঝানো হয়েছে।

এ-জাতীয় তথ্য থেকে অন্তত এটুকু কথা অনুমান করবার সুযোগ থাকে যে, তর্কের—তথা অনুমানের—প্রতি লোকায়তিকদের দৃষ্টিভঙ্গিটা মূলতই নেতিবাচক ছিলো না। অথচ, মাধবের লোকায়ত-বর্ণনের তাৎপর্য তাই-ই। ফলে এদিক থেকেও মাধবের বর্ণনাটিকে সন্দেহ করবার অবকাশ আছে। শুধু তাই নয়; লোকায়তিকেরা ঠিক কী বলেন এবং কী ভাবে তা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন তার নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা দেবার চেয়েও মাধবের বড়ো উৎসাহ হলো, তিনি নিজে লোকায়তিক হলে কী বলতেন এবং কী ভাবে সে-কথা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতেন। সেইহেতু অনুমানের—তথা তর্কের—প্রামাণ্য-প্রসঙ্গে লোকায়তিকদের উপর তিনি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করছেন যা সত্যি বলতে প্রচ্ছন্ন-ভাবে তাঁর নিজেরই—অর্থাৎ বৈদান্তিকেরই—দৃষ্টিভঙ্গি। কেননা ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে একমাত্র বেদান্ত-সম্প্রদায়ই তর্কের প্রামাণ্যের প্রতি এ-রকম চূড়ান্ত নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। বেদান্ত সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা উত্তরকালে অনুমান-প্রসঙ্গে যে-মন্তব্যই করুন না কেন, আমাদের পক্ষে বাদরায়ণের রচনার উপর নির্ভর করেই বেদান্তের মূল কথা বোঝা দরকার এবং বাদরায়ণ বলছেন তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। কেননা প্রমাণ হিসেবে একমাত্র শ্রুতিরই মূল্য আছে। যদি সামগ্রিকভাবে তর্কই অপ্রতিষ্ঠ হয় তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান-পদ্ধতির

কোনো প্রতিষ্ঠা স্বীকার করা যায় না। অতএব, অনুমানও অপ্রতিষ্ঠ। এবং এটি মাধবের মত, যদিও তিনি তা লোকায়তিকদের উপরই আরোপ করেছেন। অপরপক্ষে, কৌটিল্য প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, তর্কের প্রতি লোকায়তিকদের দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই এমন নেতিবাচক ছিলো না; বরং তাঁরাই হয়তো ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তর্ক-বিদ্যার প্রবর্তক ছিলেন। কেননা এর চেয়ে কোনো পুরোনো সূত্রে আন্বীক্ষিকী হিসেবে আর কোনো দার্শনিকদের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তর্কের প্রামাণ্যের প্রতি এ-রকম মূলতই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলেও লোকায়তিকেরা হয়তো শুধুমাত্র নেতিবাচক উদ্দেশ্যেই—ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুসারে শুধুমাত্র বিতণ্ডা হিসেবেই[৫৮], তর্কের ব্যবহার করতেন। মহামহোপাধ্যায় হর-প্রসাদ শাস্ত্রী[৫৯]—যেমন বলছেন, they have a few doctrines to defend but a lot to assail, ইত্যাদি। এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ নেই যে, লোকায়তিকদের সম্বন্ধে আমরা প্রধানত এই রকমই একটা ধারণা পেয়েছি। কিন্তু মনে রাখা দরকার, লোকায়ত সংক্রান্ত তথ্যের উৎস বলতে বিপক্ষের রচনাই এবং বিপক্ষেরা স্বভাবতই লোকায়তিকদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই লোকায়তিকদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন; অর্থাৎ, লোকায়তিকেরা তাঁদের দাবিগুলি যে-ভাবে খণ্ডন করতে চান তারই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। ফলে, লোকায়ত-সংক্রান্ত আমাদের তথ্যটুকুই প্রধানত নেতিবাচক—লোকায়তিকেরা কী কী মানেন না তারই পরিচয়। অতএব, আমাদের মনেও এমন একটা ধারণা জন্মানো অস্বাভাবিক নয় যে, লোকায়তিকেরা বিশেষ কিছুই মানেন না, তার বদলে সব কিছুই যেন শুধু অস্বীকার করতে চান। কিন্তু লোকায়ত-সংক্রান্ত আমাদের ধারণার এই অসম্পূর্ণতাকে লোকায়তের বৈশিষ্ট্য মনে করা ঠিক হবে না।

সুখের বিষয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[৬০] তর্ক ও অনুমানের প্রতি লোকায়তিকদের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন: তথ্যটির বিশেষ গুরুত্ব এই যে, এখানে তর্ক ও অনুমানের প্রতি লোকায়তিক দৃষ্টিভঙ্গিটি জনৈক লোকায়তিকের নামের সঙ্গেই সংযুক্ত। তাঁর নাম পুরন্দর এবং অধ্যাপক তুচি[৬১] ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত উভয়েই স্বীকার করছেন যে, পুরন্দর স্বয়ং লোকায়তিক ছিলেন। অধ্যাপক দাসগুপ্ত[৬২] বলছেন, পুরন্দর

> admits the usefulness of inference in determining the nature of all worldy things where perceptual experience is available; but inference cannot be employed for establishing any dogma regarding the transcendental world, or life after death or the laws of *Karma*, which cannot be available to ordinary perceptual experience. The main reason for upholding such a distinction between the validity of experience in our practical life of ordinary experierce, and in ascertaining transcending truths beyond experience lies in this, that an inductive generalization is made by observing a large number of cases of agreement in presence, together with agreement

> in absence, and no case of agreement in presence can be observed in the transcendent sphere ; for even if such spheres existed they could not be perceived by the senses. Thus, since in the supposed supra-sensuous transcendent world no case of a *hetu* agreeing with the presence of its *sadhya* can be observed, no inductive generalization or law of concomitance can be made, relating to this sphere.

ঠিক কী কী তথ্যের নির্ভরে অধ্যাপক দাসগুপ্ত এই মতকেই পুরন্দরের মত বলে ব্যাখ্যা করছেন তা অবশ্যই চিত্তাকর্ষক : এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দাসগুপ্তের ব্যাখ্যা পাদটীকা[৬৩] দ্রষ্টব্য।

আপাতত আমাদের মন্তব্য হলো, এই যদি পুরন্দরের মত হয় এবং পুরন্দর যদি স্বয়ং লোকায়তিক হন, তাহলে মানতে হবে অনুমান-প্রসঙ্গে মাধব লোকায়তিকদের উপর যে-মত আরোপ করছেন তা বহুলাংশেই মাধবের কল্পনা প্রসূত।

পুরন্দর-প্রসঙ্গ মাধবের রচনা-বহির্ভূত সাক্ষ্যের আলোচনায় আমাদের উপনীত করলো। এবার সেদিক থেকে দেখা যাক মাধবের লোকায়ত-বর্ণনকে কতোখানি বস্তুনিষ্ঠ মনে করবার সুযোগ আছে।

অধ্যাপক রিচার্ড গার্বে[৬৪] বলছেন, এ-কথা মনে করাই স্বাভাবিক যে, বিপক্ষের রচনা থেকে লোকায়ত সংক্রান্ত যেটুকু তথ্য আমরা পাচ্ছি লোকায়ত আদিতে তার চেয়ে অনেক গভীর তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং লোকায়তর দার্শনিক পরিণতিও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিলো।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে-কথা মনে করাই স্বাভাবিক কেন? অধ্যাপক বেলভেলকার ও রানাডের[৬৫] রচনা থেকে প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়। লোকায়ত-প্রসঙ্গে তাঁরা বলছেন,

> its great seductive charm and extensive vogue cannot be readily explained on the usual assumptions regarding the purely negative and destructive character of its tenets.

প্রধানত মাধবের প্রভাবেই যে আমরা লোকায়তকে এ-রকম চূড়ান্ত নেতিমূলক বলে মনে করে থাকি সে কথা অত্যন্ত স্পষ্ট বলেই বোধ হয় লেখকদ্বয় আর তার ব্যাখ্যা করেননি। আমাদের যুক্তি হবে, লেখকদ্বয় যাকে লোকায়তর *seductive charm and extensive vogue* বলে বর্ণনা করছেন তাই মাধবের লোকায়ত-বর্ণনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

আমাদের দেশে লোকায়তর প্রভাব যে বিশাল ও গভীর ছিলো—সে-বিষয়ে নানা প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব। প্রথমত, লোকায়ত নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ : সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, এই অর্থেই নাম লোকায়ত। মনে রাখা প্রয়োজন যে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক কাওয়েল[৬৬] এই অর্থেই লোকায়ত নামটিকে গ্রহণ করেছেন। মাধব[৬৭] নিজেও জানতেন যে, লোকেষু আয়ত অর্থেই এর নাম লোকায়ত। কিন্তু নামটির

এ-তাৎপর্যকে তিনি হেয়ত্ব-সূচক অর্থেই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন: সাধারণ লোক অর্থ ও কাম ছাড়া আর কিছু বোঝে না বলেই পরলোক অস্বীকার করে চার্বাক মতের অনুগমন করে—এই কারণেই চার্বাক-মতের নাম লোকায়ত। গুণরত্ন এবং শঙ্করাচার্যের রচনাতেও জনসাধারণের মধ্যে লোকায়ত-মতের ব্যাপক ও বিশাল প্রভাবকে এই রকমেরই অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা দেখা যায়। গুণরত্ন[৬৮] বলছেন, সাধারণ লোক নির্বিচার বলেই এ-মত গ্রহণ করে থাকে। শঙ্করাচার্য[৬৯] বলছেন, এ-মত প্রাকৃত-জনের পক্ষেই স্বাভাবিক।

কিন্তু এ-ধরনের অবজ্ঞাসূচক অর্থ যে নেহাতই অলীক সে-বিষয়ে অনেক প্রমাণ দেওয়া যায়।

মহাভারতের[৭০] বনপর্বে দ্রৌপদী বলছেন: "পূর্বে পিতা একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আপনার ভবনে বাস করাইয়াছিলেন; তিনি এই বৃহস্পতিপ্রোক্ত নীতি তাঁহার নিকট কহিয়াছিলেন ও ভ্রাতৃগণকে অভ্যাস করাইয়াছিলেন, আমিও তৎকালে তাঁহাদের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আমি যখন ঐ সমস্ত বিষয় শুনিবার মানসে কোনো কার্যোদ্দেশে পিতার ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তখন সেই ব্রাহ্মণ আমাকে সান্ত্বনা করিয়া এই সকল নীতি কহিতেন"।

বলাই বাহুল্য, ভারতীয় ঐতিহ্যকে অত্যন্ত মৌলিকভাবে অস্বীকার না করলে, মানতে হবে বৃহস্পতিপ্রোক্ত নীতি এবং লোকায়ত-মত স্বতন্ত্র নয়। তাছাড়া, রিস্-ডেভিড্স্[৭১] যেমন দেখাচ্ছেন, মহাভারতে (১.২৮৮৯=হরিবংশ, ১৪০৬৮) দেখা যায় at the end of a list of the accomplishments of learned Brahmanas, they are said to be masters of the Lokayata। অতএব, লোকায়ত বলতে যাই বোঝাক না কেন, তাকে প্রাকৃত-জনের নির্বিচার ভোগপ্রিয়তার পরিণাম মনে করবার কারণ নেই।

দ্রৌপদী ছিলেন পাঞ্চালী—পঞ্চাল-কন্যা। বৌদ্ধ-ভারতের মানচিত্রে আমরা কুরু ও পঞ্চালদের পরিচয় পাই। অধ্যাপক গার্বে[৭২] প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানেরা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, ভারতের এই উত্তরপূর্ব এলাকাটিতে—অর্থাৎ, যাকে আমরা সাধারণত বৌদ্ধ ভারত বলে উল্লেখ করি, সেখানে—বৈদিক প্রভাব অনেক পরে প্রবেশলাভ করেছে ও সংহত হয়েছে। ফলে প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে—অর্থাৎ, সে-যুগে এবং ভারতের ওই অঞ্চলে—ব্রাহ্মণ বলতে যাই বোঝাক না কেন, তার সঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্র-বর্ণিত ব্রাহ্মণের হুবহু সাদৃশ্য আশা করা সঙ্গত নয়। এ-বিষয়ে অধ্যাপক রিচার্ড ফিক্[৭৩] ইতিপূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি দেখাচ্ছেন, মনুর মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃষিকাজ গর্হিত; অথচ জাতকের গল্পে ব্রাহ্মণ প্রধানতই কৃষিকর্মে ব্যাপৃত।

অবশ্যই বৌদ্ধ-ভারতে ব্রাহ্মণ শব্দের তাৎপর্য ঠিক কী ছিলো, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু মাধবাচার্যের লোকায়ত-বর্ণনের বিরুদ্ধে যুক্তি শুধু এই নয় যে, বৌদ্ধ ভারতে যাঁদের ব্রাহ্মণ বলা হতো তাঁরা লোকায়তর চর্চা করতেন; আরো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হলো প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুসারে এই ব্রাহ্মণেরা—যাঁরা লোকায়তর চর্চা করতেন—তাঁরা বিদ্বান বলেও পরিগণিত ছিলেন। অর্থাৎ, লোকায়তর জ্ঞান বিদ্বান ব্রাহ্মণদের পক্ষে অপরিহার্য বলে পরিগণিত হতো। এ-বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই রিস্-ডেভিড্স্-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি। পাঞ্চালী দ্রৌপদীও বলছেন, লোকায়ত-বিদ্যা শেখাবার জন্য তাঁর পিতা জনৈক বিদ্বান আচার্যকে

নিয়োগ করেছিলেন। যদি তাই হয় তাহলে লোকায়তকে প্রাকৃত-জনের স্বভাব-স্থূল অর্থ-কামপ্রবণতার পরিচায়ক মনে করা যায় না।

শুধু ব্রাহ্মণই বা কেন। রিস্-ডেভিড্স্[৭৪] বলছেন, মিলিন্দর এক জায়গায় উপাখ্যানের নায়কের উপর লোকায়ত জ্ঞান আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া হর্ষচরিত-এর[৭৫] এক জায়গায় জ্ঞানী ও তপস্বীদের একটি দীর্ঘ তালিকার মধ্যে বৌদ্ধ, শ্বেতাম্বর জৈন, কপিল-শিষ্য, কণাদ-শিষ্য প্রমুখের সঙ্গেই লোকায়তিকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং এ-জাতীয় উল্লেখের উপর নির্ভর করেও আমরা অনুমান করতে পারি, লোকায়ত-মতের বিশাল ও গভীর প্রভাবের—*seductive charm and extensive vogue*-এর—প্রকৃত ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, শঙ্কর ও মাধবের মতো বৈদান্তিক-প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি স্বীকারযোগ্য না-হওয়াই সম্ভব।

বিশেষত বৈদিক প্রভাব বহির্ভূত অঞ্চলে লোকায়তর এই *seductive charm and extensive vogue*-এর সঙ্গে বেদপন্থীদের পক্ষ থেকে লোকায়তর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের তুলনা করলে হয়তো এমন কথা সন্দেহ করবার অবকাশ থাকে যে, ওই ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের সঙ্গে লোকায়তর সংঘাত যেন অনেকাংশেই দুটি বিরুদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে সংঘাতের ইংগিত দেয়।

মহাভারতের শান্তিপর্বের[৭৬] একটি উপাখ্যান থেকে আলোচনা শুরু করা যাক।

> "পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশকালে সহস্র সহস্র পুরবাসী প্রজা দর্শনাকাঙ্খী হইয়া তথায় আগমন করিতে লাগিল।…ঐ সময় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে ধর্মরাজকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যে দুর্যোধনের সখা দুরাত্মা চার্বাক রাক্ষস ভিক্ষুকরূপ ধারণপূর্বক অবস্থান করিতেছিল। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অপকার করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণগণ নিস্তব্ধ হইলে তাঁহাদিগকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই নির্ভীকচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গর্বিত বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, 'মহারাজ! এই ব্রাহ্মণগণ আপনাকে জ্ঞাতিঘাতী ও অতি কুৎসিত রাজা বলিয়া ধিক্কার প্রদান করিতেছেন। ফলতঃ এইরূপ জ্ঞাতিসংহার ও গুরুজনদিগের বিনাশ সাধন করিয়া আপনার কী লাভ হইল? এক্ষণে আপনার মৃত্যুই শ্রেয়।'…তখন তত্রত্য অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ চার্বাকের সেই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ, ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে তদবস্থ দেখিয়া…কহিলেন,…আমি অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব, আপনারা আর আমাকে ধিক্কার প্রদান করিবেন না।
>
> তখন সেই ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্মরাজ! আমরা আপনাকে ধিক্কার প্রদান করি নাই, আপনার মঙ্গল হউক। তপোনুষ্ঠানসম্পন্ন বেদবেত্তা দ্বিজাতিগণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানচক্ষুদ্বারা চার্বাককে বিশেষ জ্ঞাত হইয়া পুনরায় ধর্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি আপনার প্রতি কটূক্তি করিল, ঐ দুরাত্মা দুর্যোধনের পরম বন্ধু চার্বাক নামে রাক্ষস…
>
> অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ চার্বাকের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করত হুঙ্কার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন চার্বাক সেই মহাত্মাদিগের ক্রোধাগ্নিতে

দগ্ধপ্রায় হইয়া আপনি দগ্ধ পাদপের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপাতিত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন।…"

চার্বাক-বধের এই উপাখ্যান একাধিক দিক থেকে চিত্তাকর্ষক।

এখানে চার্বাক বা লোকায়তর যে-নীতিকথার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে অবশ্যই মাধব-বর্ণিত ঋণং-কৃত্বা-ঘৃতং-পিবেৎ জাতীয় স্থূল ভোগলিপ্সার লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। তার বদলে এখানে শুধু জ্ঞাতিহত্যার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ও নির্ভীক একটা প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। এদিক থেকে লোকায়তিক নীতিবোধের সঙ্গে প্রাচীন জ্ঞাতিভিত্তিক* সমাজের মূলমন্ত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়। সে-সমাজে জ্ঞাতিহত্যাই চূড়ান্ত মহাপাতক। অবশ্যই, বেদবেত্তা দ্বিজাতিগণ ওই জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের মূল-নীতি অবদলিত করে, সে-নীতির সমর্থককে দগ্ধ করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরই মহিমা কীর্তন করেছেন। হয়তো কুরুক্ষেত্রের কাহিনীর অন্তরালে ওই জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর রাজশক্তির আবির্ভাব-কাহিনীর আভাস আছে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখে এই নবপরিস্থিতির নতুন নীতিবোধাদির মহিমা কীর্তিত হতে শোনা যায়। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন, হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্[৭৭]। উত্তরকালে যাঁরা বৈদিক ঐতিহ্যের বাহক বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন সেই বেদবেত্তা দ্বিজাতিগণের মূলমন্ত্র যদি এই হয় এবং এই মূলমন্ত্রের উপর নির্ভর করে তাঁরা যদি জ্ঞাতিহত্যারও একটা নৈতিক সমর্থন উদ্ভাবন করতে পেরে থাকেন, তাহলে মাধবাচার্য লোকায়তিকদের উপর যে-স্থূল ভোগবাদ আরোপ করছেন তা আসলে চার্বাক-বধকারী ওই ব্রাহ্মণদের উপরই কতোখানি প্রযোজ্য সে-কথা ভেবে দেখবার অবকাশ থাকে নাকি? কিন্তু আপাতত জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের সঙ্গে লোকায়ত-মতের সম্পর্কের ইংগিতটির দিকেই আমরা দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে চাই। কেননা, আমরা গ্রন্থমধ্যে (চতুর্থ পরিচ্ছেদে) দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানবোন্নতির এই জ্ঞাতিভিত্তিক বা প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়ে মানবচেতনাও সাধারণভাবে প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী—যদিও এই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী চেতনার বিকাশ বিচিত্র হতে পারে এবং জাদুবিশ্বাসের জটিলতায় তা আমাদের কাছে অনেকাংশেই দুর্বোধ্য ও অর্থহীন মনে হতে পারে। আমরা আরো দেখাবার চেষ্টা করেছি (পৃ. ২৪২-৩০২), দেশের রাষ্ট্রাকাশে সাম্রাজ্যের উত্থান পতন সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবন থেকে ওই প্রাক্-বিভক্ত সমাজের স্মারক অসম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হয়েছে—অতএব ওই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী পর্যায়ের চেতনাই সাধারণ মানুষের মধ্যে *seductive charm and extensive vogue* প্রসারিত করেছে। অর্থাৎ, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেন দুটি স্পষ্ট ধারা[৭৮] স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। একদিকে অধ্যাত্মবাদের মহিমা-মুখর শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শাসক-শ্রেণীর সংস্কৃতি। অপরদিকে প্রাক্-অধ্যাত্মবাদের—এবং, অতএব প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়ের—স্মারক-বহুল গণ-সংস্কৃতি। দ্বিতীয়টিই লোকেষু আয়ত এবং সেই অর্থে লোকায়ত।

এদিক থেকে লোকায়ত-প্রসঙ্গে রিস্-ডেভিড্স্-এর সিদ্ধান্তটিকে নতুনভাবে বোঝবার অবকাশ থাকতে পারে। কেননা, লোকায়তকে সংকীর্ণ অর্থে একটি নির্দিষ্ট দার্শনিকমত

---

* প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, বৌদ্ধ যুগেও ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলটিতে—যে-অঞ্চলে তখনো তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব আপেক্ষিকভাবে অপ্রতিষ্ঠিত এবং লোকায়তও নিন্দিত নয়—জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজ বহুলাংশেই অক্ষুণ্ণ ছিলো।

হিসেবে সনাক্ত করা সত্যিই সম্ভব কিনা তা সন্দেহের কথা। রিস্-ডেভিড্স্ বলছেন, লোকায়ত বলতে *folk-lore* বোঝাতো—কালক্রমে এই ফোক্-লোর নিন্দিত হয়েছিলো এবং শেষ পর্যন্ত লোকায়ত নামটিই গালিগালাজের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু ফোক্-লোর কেন নিন্দিত হলো সে-প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। অপরপক্ষে, গণ-সংস্কৃতির নামান্তর হিসেবে বোঝবার চেষ্টা করলে এ-প্রশ্নের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে, কেননা, ওই তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যনীতির প্রচারকদের পক্ষ থেকে লোকায়তকে অবদমন করবার জন্য অত্যন্ত ব্যাপক ও বিচিত্র আয়োজন হয়েছিলো : আইনকারেরা লোকায়তর বিরুদ্ধে কঠিন বিধান দিয়েছিলেন, পুরাণকারেরা লোকায়তর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে অতিকথা রচনা করেছিলেন, নাট্যকারেরা রচনা করেছিলেন ব্যঙ্গবিদ্রূপ। সংকীর্ণ অর্থে একটি নির্দিষ্ট মতবাদের খণ্ডন হিসেবে বিশেষত দেশের আইনকার ও পুরাণকারদের এতো রকম প্রচেষ্টা অসামঞ্জস্যমূলকই মনে হয় না কি ?

কিছুকিছু নমুনা দেখা যায়। লোকায়তর বিরুদ্ধে মনুর বিধান প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জে. মুয়ার[৭৯] বলছেন,

> Such heretics appear to have been numerous when the Institutes were compiled, as the faithful are warned (IV : 61) against living in a village 'overrun with heretics'; 'a kingdom in which *sudras* predominate, overrun with nihilists and *destitute* of Brahmins' is said (VIII : 22) to be doomed to destruction ; a king who is a nihilist is threatend with perdition (VIII. 309) and it is enjoined (IX : 225) that heretics shall be banished. Allusion is said to be made in V, 89, 90 and VIII, 363 to female anchorites of a heretical religion.

একই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[৮০] বলছেন,

> Manu says that the Brahmin who, through a greater confidence in the science of logic (*hetu-sastra)* disregards the authority of the Vedas and the *smriti*, are but *nastikas* who should be driven out by good men...Again in Manu IV. 30, it is said that one should not even speak with the heretics (*pasandino*) transgressors of caste disciplines (*vikramasthan*), hypocrites (*vaidal-vratika*), double-dealers and sophists (*haituka*).

শ্রীযুক্ত মুয়ার এবং অধ্যাপক দাসগুপ্ত উভয়ের মতেই, মনুর এই বিধানগুলি লোকায়তিকদের প্রতিই প্রযুক্ত। অতএব প্রশ্ন উঠতে পারে : প্রাচীনকালের আইনকর্তারা যদি সত্যিই এতোভাবে লোকায়তিকদের দমন করবার আয়োজন করে থাকেন, তাহলে কি এগুলিকে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট মতবাদের খণ্ডন-প্রচেষ্টা বলে গ্রহণ না করে, তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতাদের পক্ষে লোকসংস্কৃতিকে অবদলিত করবার এবং তার উপর

ওই ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির মহিমাকেই প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা বলেই সন্দেহ করবার অবকাশ থাকে না?

লোকায়তর বিরুদ্ধে পুরাণকারদের প্রচার প্রচেষ্টাও এই সন্দেহকেই দৃঢ়তর করতে চায়।

বিষ্ণুপুরাণে[৮১] বলা হয়েছে, অসুরদের মোহগ্রস্ত করবার উদ্দেশ্যেই মায়ামোহ তাঁদের মধ্যে এই মারাত্মক মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন। এরই মোহে পড়ে অসুরেরা বৈদিক জ্ঞানকে উপহাস করতে শিখলেন; অতএব তাঁদের দারুণ অধঃপতন ঘটলো। সেই অবকাশে দেবতারা শক্তি সঞ্চয় করে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন এবং সহজেই অসুরদের পরাজিত করলেন।

মৈত্রী উপনিষদেও[৮২] মোটের উপর একই পৌরাণিক উপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়। উপনিষদের এই উপাখ্যানটি অনুসারে দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরগুরু শুক্রের ছদ্মবেশ ধারণ করে ইন্দ্রের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই অসুরদের মধ্যে এই মারাত্মক ও অবিদ্যা-মূলক মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন—সেই অবিদ্যার প্রভাবেই অসুরেরা অধর্মকে ধর্ম এবং ধর্মকে অধর্ম মনে করতে শুরু করেন।

পৌরাণিক কাহিনী অবশ্যই ইতিহাস নয়। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে ঐতিহাসিক তথ্যের ইংগিত পাওয়াও অসম্ভব নয়। লোকায়ত-প্রসঙ্গে আমরা যে-পৌরাণিক কাহিনীর সন্ধান পাই সেগুলির মূল ইংগিত হলো, লোকায়ত-মত আসলে অসুরদেরই মত—অসুর-মত।

এই দিক থেকে লোকায়ত-প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সিদ্ধান্তটিকে নতুনভাবে বোঝবার অবকাশ থাকতে পারে। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি—এবং গ্রন্থমধ্যে (পৃ. ৪৩৪-৪৪৪, এবং ৫৩৩-৫৪০) এ-বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবারও চেষ্টা করেছি—যে প্রধানতই ছান্দোগ্য-উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদের উপর নির্ভর করে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তও লোকায়ত-মতকে অসুরমত বলেই সনাক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক দাসগুপ্ত মনে করেন, অসুর বলতে এখানে প্রাচীন সুমেরীয়দেরই উল্লেখ করা হয়েছে। এ-বিষয়ে অবশ্যই অন্যান্য ভারততত্ত্ববিদেরা তাঁর সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু অসুর বলতে যাঁদেরই বোঝাক না কেন, তাঁদের সংস্কৃতি যে-বেদবিরোধী ছিলো এবং অতএব বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকেরা অন্তত পরবর্তীকালে যে তাঁদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন—এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলছেন,

> দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
> দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ১৬.৬॥
> প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
> ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ১৬.৭॥

এর সঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ, মৈত্রী উপনিষদ প্রভৃতিতে ব্যক্ত অসুরমতের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের তুলনা করা যায়।

সুখের বিষয় উপনিষদ এবং গীতায় এই ঘৃণা-বিদ্বেষের পরিচয় ছাড়াও অসুরমত সংক্রান্ত কয়েকটি নির্দিষ্ট তথ্যেরও আভাস পাওয়া সম্ভব; লোকায়তর পুনর্গঠন-প্রচেষ্টায় সেগুলি আমাদের সহায়ক হতে পারে।

আমরা এ-জাতীয় দুটি তত্ত্বের উল্লেখ করবো। এক: আত্মতত্ত্ব। দুই: সৃষ্টিতত্ত্ব। এবং আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, উভয় তত্ত্বের দিক থেকেই এই অসুরমতের—তথা লোকায়ত মতের—সঙ্গে তন্ত্রের আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। অতএব, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লোকায়তর সঙ্গে তান্ত্রিকাদি সম্প্রদায়গুলির যে-অভিন্নতা প্রতিপাদন করবার চেষ্টা করেছেন তার তাৎপর্য লঘুমূল্য নয়।

প্রথমত আত্মতত্ত্বের কথাটা দেখা যাক।

মৈত্রী উপনিষদের (৭. ১০) উপাখ্যান অনুসারে দেব ও অসুর উভয়েই আত্মকাম হয়ে (আত্মজ্ঞানের উদ্দেশ্যে) ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মাকে নমস্কার করে তাঁরা বললেন, ভগবন্, আমরা আত্মকাম হয়েছি, আমাদের (আত্মতত্ত্ব) বলুন। ব্রহ্মা অনেকক্ষণ চিন্তা করে স্থির করলেন, এই অসুরেরা ভ্রান্ত আত্মতত্ত্বেরই যোগ্য। তাই তিনি তাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত উপদেশ দিলেন। অতএব এই অসুরেরা মিথ্যাকেই সত্য বলে জেনে জীবনযাপন করে—ইন্দ্রজালের প্রভাবে যে-রকম অনৃতই সত্য বলে প্রতীয়মান হয় সেই রকম।

অসুরদের আত্ম-তত্ত্ব ব্রহ্মার কাছ থেকেই শেখা কিনা এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও মৈত্রী উপনিষদের উপাখ্যান থেকে একটি কথা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায়: এখানে উপনিষদের ঋষি অসুরমতের মধ্যে বিশেষ করে আত্মতত্ত্বটিকেই ভ্রান্ত ও হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্যই অসুরদের আত্মতত্ত্ব বলতে ঠিক কী বোঝাতো সে-কথা মৈত্রী উপনিষদে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি—কেননা, ব্রহ্মা অসুরদের মধ্যে কোন্ নির্দিষ্ট মতবাদ প্রচার করেছিলেন সে-প্রশ্নের উত্তর মৈত্রী উপনিষদে পাওয়া যায় না।

কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে এই প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যায়। আমরা গ্রন্থমধ্যে (পৃ. ৪৩৮—৪৩৯) ছান্দোগ্যর ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদটি উদ্ধৃত করেছি। এখানে শুধুমাত্র এটুকু উল্লেখ করলেই হবে যে, ছান্দোগ্যর উপাখ্যান অনুসারে অসুরদের এই আত্মতত্ত্ব বলতে দেহাত্মবাদ বা দেহতত্ত্বই বোঝাতো—বস্তুত এইদিক থেকেই অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লোকায়তর সঙ্গে অসুরমতের অভিন্নতা অনুমান করেছেন।

মাধবাচার্যের বর্ণনা অনুসারেও এই দেহতত্ত্বই লোকায়তিকদের একটি প্রধান প্রতিপাদ্য। কিন্তু নানা কারণে আমরা মাধবের এই বর্ণনাটির উপর আস্থা স্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেছি। তবু এই দেহাত্মবাদই যে লোকায়তিকদের প্রধানতম প্রতিপাদ্য ছিলো সে-বিষয়ে মাধবাচার্যের রচনার চেয়েও অনেক পুরোনো প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব। আমরা দুটি প্রমাণের উল্লেখ করবো। এক, শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য দুই, প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য তিনবার লোকায়তিকদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনবারই তিনি লোকায়ত-মত হিসেবে দেহাত্মবাদকেই সনাক্ত করতে চেয়েছেন। যথা: "দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ (১. ১. ২)"; "লোকায়তিকানামপি চেতন এব দেহোঽচেতনানাং রথাদীনাং প্রবর্তকো দৃষ্ট…(২. ২. ২)"; "অত্রৈকে দেহমাত্রাত্মদর্শিনো লোকায়তিকা দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽভাবং মন্যমানাঃ সমস্তব্যস্তেষু বাহ্যেষু পৃথিব্যাদিষ্বদৃষ্টমপি চৈতন্যং শরীরাকারপরিণতেষু ভূতেষু স্যাদিতি সম্ভাবয়ন্তস্তেভ্যশ্চৈতন্যং মদশক্তিবদ্বিজ্ঞানং চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চাহুঃ (৩. ৩. ৫৩)"। অতএব, শঙ্করাচার্যের এই উক্তিগুলি থেকে অনুমিত হয়

যে, তাঁর সময় পর্যন্ত এই দেহাত্মবাদই লোকায়তমতের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়েছিলো।

লোকায়ত-মতের এই ব্যাখ্যার উল্লেখ করেই রিস্-ডেভিড্‌স্[৮৩] মন্তব্য করছেন,

> A very similar, if not indeed the very same view is also controverted in the *Brahmajala Sutta* and is constantly referred to throughout the Pitakas under the stock phrase *tam jivam tam sariram* (for instance in *Mahali* and *Jaliya Suttas*...)

রিস্-ডেভিড্‌স্-এর তর্জমা[৮৪] অনুসারে ব্রহ্মজাল সুত্ত প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত এই দেহাত্মবাদের বর্ণনা হলো,

> In the first place, brethren, some recluse or Brahman puts forth the following opinion, the following view : "Since, Sir, this soul has form, is built up of the four elements, and is the offspring of father and mother, it is cut off, destroyed, on the dissolution of the body ; and does not continue after death ; and then, Sir, the soul is completely annihilated."...

যদি প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে বারবার এই দেহাত্মবাদেরই উল্লেখ পাওয়া যায় তাহলে অন্তত এটুকু অনুমিত হতে বাধ্য যে, বৌদ্ধ-ভারতে এ-জাতীয় একটি মতবাদ নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিলো। এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই—এবং স্বয়ং রিস্-ডেভিড্‌স্-ই সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—যে ওই প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রেই 'লোকায়ত' এবং 'লোকায়তিক' শব্দের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু রিস্-ডেভিড্‌স্ বলছেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রের কোথাও উপরোক্ত দেহাত্মবাদই যে লোকায়তিকদের মতবাদ এ-কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। অর্থাৎ, দেহাত্মবাদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে এবং লোকায়ত নামেরও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে না। আর তা যাচ্ছে না বলেই রিস্-ডেভিড্‌স্ দাবি করছেন, দুয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক অনুমিত হতে পারে না। ফলে, রিস্-ডেভিড্‌স্-এর যুক্তি[৮৫] অনুসারে, শঙ্করাচার্য যখন লোকায়ত-মত হিসেবে এই দেহাত্মবাদেরই উল্লেখ করতে চান তখন তাঁর উক্তি ভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক :

> Samkara, in setting forth his theory of the soul, controverts a curious opinion which he ascribes to Lokayatikas,—possibly wrongly, as the very same opinion was controverted ages before in the Pitakas, and not there called Lokayata, though the word was used in Pitaka times.

কিন্তু আমরা রিস্-ডেভিড্‌স্-এর এ-যুক্তি স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেছি। পিটকে

এই দেহাত্মবাদের খণ্ডনই আছে, পিটকে ওই লোকায়ত নামও আছে; কিন্তু লোকায়ত বলতে যে দেহাত্মবাদই বোঝাতো তা স্পষ্টভাবে বলা নেই। এ-কথা নিশ্চয়ই স্বীকার-যোগ্য; কিন্তু এর থেকেই রিস্-ডেভিড্স্-এর সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না। যদি পিটক-সাহিত্যে ওই দেহাত্মবাদেরই নামান্তর পাওয়া যেতো, কিংবা, লোকায়ত নামের সঙ্গে তত্ত্বান্তরের সম্পর্ক নির্দিষ্ট হতো,—তাহলে তাঁর সিদ্ধান্তটি সমর্থনযোগ্য হতে পারতো। সে-জাতীয় কোনো ইংগিত বৌদ্ধ শাস্ত্রে নেই। এক্ষেত্রে রিস্-ডেভিড্স্-এর সিদ্ধান্তটি মানতে হলে কল্পনা করা প্রয়োজন যে, বৌদ্ধ ভারতে এই দেহাত্মবাদের প্রভাব প্রভূত হলেও তার কোনো স্বতন্ত্র নাম ছিলো না, কিংবা অন্তত বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রণেতারা সে-নামটি উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করেননি। আরো কল্পনা করা প্রয়োজন যে, বৌদ্ধভারতে লোকায়ত বলতে অন্য কোনো তত্ত্ব বোঝাতো; কিন্তু বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রণেতারা শুধুমাত্র লোকায়ত নামটি ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হতেন—লোকায়ত বলতে যে-তত্ত্ব বোঝাতো তার উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু উভয় সম্ভাবনাই কষ্টকল্পিত হতে বাধ্য।

অপরপক্ষে, এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের সাক্ষ্যকেও এতোখানি লঘু মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই। কেননা, রিস্-ডেভিড্স্-এর মন্তব্য মানতে হলে স্বীকার করা প্রয়োজন যে, শঙ্করাচার্য যে-মতটির নাম দিচ্ছেন লোকায়ত সেটির নাম আসলে লোকায়তই নয়, অন্য কিছু; কিংবা হয়তো তার নিজস্ব কোনো নামই ছিলো না। যদি তাই হয় তাহলে তা সত্ত্বেও শঙ্করাচার্য কেন একে লোকায়ত আখ্যা দিলেন, সে-প্রশ্নের একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। ব্যাখ্যা হিসেবে রিস্-ডেভিড্স্ হয়তো বলবেন, ইতিমধ্যে লোকায়ত শব্দটিই গালিগালাজের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু সে-বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া, গালিগালাজ হিসেবে ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে অন্যান্য শব্দের প্রচলন বিরল নয়।

বরং রিস্-ডেভিড্স্ নিজেই এই যে-সব তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার থেকেই এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক যে, লোকায়ত বলতে প্রধানতই এই দেহাত্মবাদ বোঝাতো: বৌদ্ধশাস্ত্রে এ-দেহাত্মবাদের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়, লোকায়ত নামের উল্লেখও বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিরল নয়; এবং দুয়ের মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্কের যে-উল্লেখ বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যাচ্ছে না, তা শঙ্করাচার্যের রচনায় পাওয়া যায় বলেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, এ-বিষয়ে শঙ্করাচার্যের উক্তিগুলি বৌদ্ধ তথ্যের পরিপূরক হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত।

অতএব, এইভাবে লোকায়তর পুনর্গঠনে আমরা একটি সুনিশ্চিত মন্তব্যে উপনীত হতে পারি: লোকায়তিকদের একটি প্রধানতম তত্ত্ব বলতে দেহাত্মবাদই বুঝতে হবে। বিষ্ণুপুরাণ, মৈত্রী উপনিষদ প্রভৃতির সাক্ষ্য অনুসারে অনুমান হয় যে, প্রাচীনেরা এই লোকায়তকেই অসুরমত বলে বর্ণনা বা নিন্দা করেছিলেন। এবং অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত যেমন দেখাচ্ছেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যান অনুসারেও অসুরমত বলতে এই দেহাত্মবাদই।

কিন্তু, আমরা একটু আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি, লোকায়তর সঙ্গে তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির সংঘর্ষ অনেকাংশেই দুটি বিরুদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে সংঘর্ষের আভাস দেয়। এবং লোকায়ত নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও হলো, সাধারণ লোকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অধ্যাপক বেলভেলকার এবং রানাডে লোকায়তর ***extensive vogue and seductive charm***-এর

উল্লেখ করছেন। অতএব প্রশ্ন ওঠে, ভারতীয় ইতিহাসে বৈদিক ঐতিহ্য-বিরুদ্ধ এমন কোনো সাংস্কৃতিক ধারার পরিচয় কি আমরা পাই যা শুধু সুপ্রাচীনই নয়, তা একাধারে দেহাত্মবাদী এবং লোকেষু আয়ত, দুই-ই।

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়,—বৈদিক ও তান্ত্রিক। দ্বিতীয়টি প্রসঙ্গে আধুনিক বিদ্বান[৮৬] বলছেন,

> In the popular knowledge and belief they have practically superseded the Vedas over a large part of India...

এইদিক থেকে তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণাকেই লোকেষু আয়ত আখ্যা দেওয়া যায় কিনা তা ভেবে দেখবার অবকাশ থাকতে পারে। বিশেষত, বাংলা দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ-রকমই একটা সন্দেহ দৃঢ় হতে চায়: "সে-সব খাঁটি বাংলার জিনিস যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাও, তবে বাঙালীর বৈষ্ণব ধর্ম, সহজিয়া ধর্ম এবং বাংলার তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্ম বুঝিবার এবং জানিবার চেষ্টা কর"।[৮৭] এবং, "ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাঙলায় অনেক জাল জুয়াচুরি চলিয়াছিল, ঘটক ঠাকুরেরা অনেক সত্যের গোপন করিয়াছিলেন, স্মার্ত নাটোর ও নদীয়ার ব্রাহ্মণ রাজাদের প্রভাবে ও চেষ্টায় আরও অনেক গোলমাল ও গোলযোগ স্মৃতিশাস্ত্রের রূপার তবকে ঢাকা পড়িয়াছে"[৮৮]। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আরো দেখাচ্ছেন, যদিও উত্তরকালে ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার প্রচারকেরা তন্ত্রের সঙ্গে নানান আপোষ করেছিলেন এবং যদিও কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু মনীষা তন্ত্রের উপর "একটা নূতন ধর্মের প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন," তবুও তন্ত্র অতি প্রাচীন—বৌদ্ধ ধর্মের চেয়েও প্রাচীন—এবং আদিতে তা ব্রাহ্মণ্য বিরোধী তথাকথিত ইতর জাতিদের মধ্যেই প্রচলিত ছিলো[৮৯]।

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে তন্ত্রকেই কেন বৈদিক ঐতিহ্যের বিরোধী লোকায়তিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক মনে করা অসঙ্গত নয়, এ-বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি। অতএব এখানে প্রশ্ন হলো, লোকায়তিক সংস্কৃতি বলতে যদি এই তন্ত্রকেই বুঝিয়ে থাকে তাহলে তার সঙ্গে আলোচ্য দেহাত্মবাদের সম্পর্ক কী? শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের[৯০] রচনা থেকেই আমরা এ-প্রশ্নের উত্তর উদ্ধৃত করতে পারি: "যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে—'ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে'। ইহাই সকল তন্ত্রের সিদ্ধান্ত।...তন্ত্র বলিতেছেন যে, যখন ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ড একই পদ্ধতি অনুসারে, একই রকমের উপাদান সাহায্যে নির্মিত, উভয়ের মধ্যে একইভাবে নানা শক্তির খেলা হইতেছে, তখন দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি তোমার অনুকূল, সহায়ক হইবে।...এ দেশের সিদ্ধগণ বলেন যে, মনুষ্যদেহের মতন পূর্ণাবয়ব যন্ত্র আর নাই; এমন যন্ত্র আর কেহ গড়িতে পারে না, এমন যন্ত্র নির্মাণ করাও মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব এই যন্ত্রস্থ সকল গুপ্ত এবং সুপ্ত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে, অন্য কোনো স্বতন্ত্র যন্ত্র ব্যতিরেকে তোমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।" তাই তন্ত্রসাধনার নাম কায়াসাধনা, তন্ত্রতত্ত্বের নাম দেহতত্ত্ব। এবং এই দেহতত্ত্বের কথাই যদি *in the popular knowledge and belief...have practically superseded the Vedas over a large part of India,* তাহলে বিপক্ষ দার্শনিকদের পক্ষে এই মতটিকেই লোকায়ত আখ্যা দেওয়া স্বাভাবিক হয় না কি?

কিন্তু মহাভারতের চার্বাক-বধ বৃত্তান্তটি অবলম্বন করে আমরা দেখেছি,

এই লোকায়ত-মতের সঙ্গে প্রাক্-বিভক্ত জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের ধ্যানধারণার একটা সম্পর্কও অনুমান করা অসম্ভব নয়। এবং গ্রন্থমধ্যে তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার উৎস-সন্ধানে অগ্রসর হয়ে আমরা ওই প্রাক্-বিভক্ত সমাজের আলোচনাতেই গিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অসুর-মত সংক্রান্তই আর একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়; লোকায়তর পুনর্গঠনে সেটিও আমাদের পক্ষে সহায়ক হতে পারে। এই তত্ত্ব হলো অসুরদের সৃষ্টি-তত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান অসুর-মত হিসেবে যে-মতটির উল্লেখ করছেন, শ্রীধরস্বামী[৯১] বলছেন সেটি আর কিছুই নয় লোকায়ত-মত মাত্র। অন্যান্য সূত্রেও অসুর-মতের সঙ্গে লোকায়তর সম্পর্কের ইংগিত পাওয়া যায়; তাই শ্রীধরস্বামীর এই মন্তব্যকে অবজ্ঞা করবার কোনো কারণ নেই।

এই অসুর-মত—তথা লোকায়ত-মতের—ব্যাখ্যায় শ্রীভগবান বলছেন,

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ১৬.৮॥

প্রথম পঙক্তিটির ব্যাখ্যা নিয়ে মতান্তর থাকতে পারে; সম্ভবত এর তাৎপর্য হলো ঈশ্বর-সৃষ্ট বা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত অর্থে জগৎ সত্য নয়, কেননা ঈশ্বর নেই। কিন্তু দ্বিতীয় পঙক্তিটির অর্থ অস্পষ্ট নয় এবং আমাদের বর্তমান আলোচনায় এই দ্বিতীয় পঙক্তিটিই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এর অর্থ হলো, জগৎ স্ত্রী-পুরুষের মিলনজাত এবং কামোদ্ভূত। অসুরদের—তথা লোকায়তিকদের—সৃষ্টিতত্ত্ব বলতে যদি এই বোঝায় তাহলে লোকায়ত-মতকে সনাক্ত করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হবার কথা নয়। কেননা, তন্ত্রসাহিত্যে আমরা ঠিক এই সৃষ্টিতত্ত্বেরই পরিচয় পাই: "যে পদ্ধতিক্রমে নরনারীর সংযোগে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়, সেই পদ্ধতিক্রমে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে বিশ্বসংসারের উদ্ভব হইয়াছে।...মহাকাশে যাহা স্পন্দন, নরনারীর মধ্যে তাহা কাম ও মদনের লীলা।...কাম ও মদন জন্য যেমন নূতন জীবের নাম ও রূপের বিকাশ হয়, তেমনিই পুরুষপ্রকৃতির মধ্যে কাম ও মদনের স্পন্দন জন্য বিশ্বব্যাপী নাম ও রূপের বিকাশ হইয়াছে।...তন্ত্রবিশেষে বিশ্বসৃষ্টির জন্য শিবশক্তির এবং জীবসৃষ্টির জন্য নরনারীর মিলনের একতা পদে পদে খুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আছে।"[৯২]

তাহলে, সৃষ্টিতত্ত্বের দিক থেকেও শ্রীভগবান-উক্ত অসুরমতকে—তথা লোকায়ত-মতকে—তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার সঙ্গে অভিন্ন মনে করবার অবকাশ আছে। আমরা গ্রন্থমধ্যে (পৃ.৫৩৩—৫৪০) এ-বিষয়ে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ করেছি। অবশ্যই এ-জাতীয় তথ্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য বলতে গুণরত্নের লোকায়ত-বর্ণন (পৃ.৪৩৪-৩৫)। এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রধানত তার উপর নির্ভর করেই লোকায়তর সঙ্গে কাপালিক, সহজিয়া প্রভৃতি তান্ত্রিক ধ্যানধারণার সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছেন।

অবশ্যই লোকায়তকে এইভাবে ব্যাপক অর্থে তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণা বলে সনাক্ত করবার চেষ্টায় নানা বাধা আছে। প্রধান বাধা হলো, লোকায়ত-সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা এবং তন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা—দুয়ের মধ্যে সঙ্গতি নেই। কিন্তু

লোকায়ত-সংক্রান্ত আমাদের প্রচলিত ধারণাটি প্রধানতই মাধবের কাছ থেকে পাওয়া ; এবং আমরা দেখেছি মাধবের উপর ঐকান্তিক নির্ভরতায় বাধা আছে। অপরপক্ষে, গ্রন্থমধ্যে আমরা তন্ত্রতত্ত্বের আলোচনায় অগ্রসর হয়ে দেখেছি যে, তন্ত্র-সংক্রান্ত আমাদের প্রচলিত ধারণাটিও বহুলাংশেই সংশোধন-সাপেক্ষ। কেননা, তন্ত্রের-আদি অকৃত্রিম রূপটির উপর উত্তরকালে নানা প্রকার বৌদ্ধ ও হিন্দু ধ্যানধারণা অধ্যস্ত হয়েছে এবং তারই ফলে আমরা অনেক সময় এই অধ্যস্ত ধ্যানধারণাগুলিকেই তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ভুল করে থাকি। তন্ত্রের উপর উত্তরকালে অধ্যস্ত ওই ধ্যানধারণাগুলির প্রভাব মুক্ত হয়ে আমরা যদি তন্ত্রের আদিরূপটির অনুসন্ধান করি তাহলে হয়তো আমরা অধ্যাত্মবাদের পরিবর্তে পরিচয় পাবো বস্তুবাদেরই—সে বস্তুবাদ যতো অস্ফুট ও যতো প্রাকৃতই হোক না কেন, যতোই স্থূল হোক না কেন তার বাস্তব জ্ঞানের দৈন্য। অতএব, মাধবের প্রভাব মুক্ত হয়ে লোকায়তকে এবং এই অধ্যস্ত ধ্যানধারণাগুলির প্রভাব মুক্ত হয়ে তন্ত্রের আদি অকৃত্রিম রূপকে আমরা যদি চেনবার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো দুয়ের মধ্যে অসঙ্গতি অমন প্রকট মনে হবে না।

কিন্তু, প্রশ্ন উঠবে, তন্ত্র-সংক্রান্ত আমাদের উত্তরকালের ধ্যানধারণাকে যেভাবেই সংশোধন করা যাক না কেন, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে, তন্ত্র প্রধানতই একটি সাধনপদ্ধতি ; তার তত্ত্বের দিকটুকু এই সাধনপদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সংযুক্ত। অর্থাৎ, তন্ত্রের এই আনুষ্ঠানিক দিকটিই প্রধান। এবং যদি তাই হয় তাহলে লোকায়তর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সঙ্গতি কোথায় ?

উত্তরে বলা যায়, লোকায়ত নামেরও হয়তো এককালে কিছু আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য ছিলো। এ-বিষয়ে প্রাচীন রচনার কিছুকিছু ইংগিত উল্লেখ করা যায়।

প্রাভাকর মীমাংসকদের সমালোচনা করে কুমারিল ভট্ট বলছেন, "প্রায়েণৈব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তিকৃতা। তম্ আস্তিকপথে কর্তুম্ অয়ম্ যত্নঃ কৃতো ময়া" (বার্তিক : ১০)। অর্থাৎ, লোকে মীমাংসাকে প্রায় লোকায়তরই সামিল করে তুলেছিলো, আমি তাকে আস্তিক-পথে নিয়ে আসতে যত্নবান হয়েছি। প্রশ্ন হলো, কুমারিল এখানে লোকায়ত-শব্দকে ঠিক কোন অর্থে ব্যবহার করছেন ? আধুনিক বিদ্বানেরা[৩৩] বলেন, প্রাভাকর মীমাংসকেরা নিরীশ্বর-বাদী ছিলেন এবং সেই অর্থেই কুমারিল তাঁদের প্রায়-লোকায়তিক বলে বর্ণনা করছেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিক দিকের উপর একান্ত গুরুত্ব আরোপ করবার উৎসাহ ছাড়া পূর্বমীমাংসার কথা ভাবা যায় না—প্রাভাকর এবং ভাট্ট উভয় সম্প্রদায়ের বেলাতেই এই কথা। অতএব, এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, কুমারিল এখানে লোকায়ত শব্দের সাহায্যে শুধুমাত্র নিরীশ্বরবাদই বোঝাতে চাইছেন না, ঈশ্বর-বিহীন অনুষ্ঠান-পরায়ণতার কথাই উল্লেখ করছেন।

ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন হলেও অসুরেরা—তথা লোকায়তিকেরা—যে কোনো-না-কোনো প্রকার অনুষ্ঠান-পরায়ণই ছিলো এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য করা যায় না। অসুর-প্রসঙ্গেই শ্রীভগবান বলছেন,

যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৬.১৭ ॥

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, দাম্ভিক অসুরেরা নামেই যজ্ঞ করে থাকে। বলাই বাহুল্য, বেদ-বাহ্য বলেই ঈশ্বর-বিহীন অসুরদের যজ্ঞকে বেদপন্থীদের পক্ষ থেকে

নামেমাত্র যজ্ঞ বলে নিন্দা করা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের আলোচনায় বর্তমানে যে-কথা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক তা হলো শ্রীধরস্বামীর নির্দেশ অনুসরণ করে আমরা যদি গীতার শ্রীভগবান-বর্ণিত অসুরমতকে লোকায়ত-মত বলেই—এবং অতএব ওই অসুরদের, লোকায়তিক বলেই—সনাক্ত করতে সম্মত হই তাহলে আমাদের পক্ষে একথাও স্বীকার করা প্রয়োজন যে, বেদবাহ্য এবং ঈশ্বরবিহীন হলেও লোকায়তর সঙ্গে কোনো-না-কোনো রকম যজ্ঞ কর্মের সম্পর্ক ছিলো। অসুরদের যজ্ঞ-প্রসঙ্গে আমরা (পৃ. ৫৩৭-৩৮) ঋগ্বেদের একটি চিত্তাকর্ষক সাক্ষ্যেরও উল্লেখ করেছি। ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে : তুমি মায়াসমূহের দ্বারা, যাহারা নিজেদের মুখে স্বধা (অন্নহবিঃ) প্রদান করিত, সেই মায়াবীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলে। ভাষ্যে সায়নাচার্য কৌষীতকী ও বাজসনেয়ীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কৌষীতকী বলেন, অসুরেরা অগ্নিকে পরাভূত করিয়া নিজেদেরই হোম করিত। বাজসনেয়ী বলেন, দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্ধাযুক্ত হইল, তাহার পর অসুরেরা অভিমান ভরে ঠিক করিল, 'আমরা কাহাকেও হোম করিব না'; অতএব নিজেদের মুখে হবিপ্রদান করিয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং অবমাননা করিল। প্রশ্ন হলো, এখানেও কি অসুর বলতে লোকায়তিকদের—অর্থাৎ, ব্যাপক অর্থে তান্ত্রিকদেরই—বুঝতে হবে? সে-প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। কিন্তু তন্ত্রসাধনার পঞ্চমকারের মধ্যে চারটি মকার—মদ্য, মাংস, মীন, মুদ্রা—নিজেদের মুখেই হবিপ্রদানের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে এ-হবি যতোই নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য মনে হোক না কেন!

॥ দুই ॥

এইভাবে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে এবং আরো কিছুকিছু প্রাচীন তথ্যের ইংগিত অনুসরণ করে আমরা লোকায়ত বলতে প্রধানতই তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণাকে বোঝবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আধুনিক রুচি-বিচারে তন্ত্র অনেকাংশেই বীভৎস বিকৃতি বলেই প্রতীয়মান হয়। অপরপক্ষে, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই তন্ত্রেরই প্রভাব সুবিশাল ও সুগভীর। অতএব প্রশ্ন ওঠে, ওই বীভৎস বিকৃতিই যদি তন্ত্রের আদি-অকৃত্রিম তাৎপর্য হয় তাহলে তা এতো বড়ো একটা দেশকে এতো শতাব্দী ধরে এমন গভীরভাবে কী করে প্রভাবিত করলো? অবশ্যই আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকে তন্ত্রের উপর জটিল অধ্যাত্মতত্ত্ব আরোপ করে যেন তন্ত্রের নগ্নতা-নিবারণ করতে চেয়েছেন; কিন্তু এ-জাতীয় ব্যাখ্যা আমাদের কাছে কৃত্রিম মনে হয়েছে বলেই আমরা তা গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করেছি।

তার বদলে আমরা সন্দেহ করতে বাধ্য হয়েছি, আধুনিক বিচারের মানদণ্ডে যা অমন বীভৎস বিকৃতি বলেই প্রতীয়মান হয় তারই আদি-তাৎপর্য অন্য কিছু হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো, সে-আদি-তাৎপর্যের সন্ধান করা যাবে কী করে, কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে? আমাদের মনে হয়েছে, অধ্যাপক জর্জ টমসনের সাম্প্রতিক রচনায় এই বাঞ্ছিত পদ্ধতিটির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাঁর পদ্ধতিই গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু সে-পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টায় আমাদের আলোচনা অনিবার্যভাবেই নানান দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। কেননা, আমরা এমন কয়েকটি প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হয়েছি লোকায়তর আলোচনায়—তথা ভারতীয় দর্শনের আলোচনায়—সাধারণত যা তোলা হয় না। ফলে আমাদের প্রাথমিক পরিকল্পনাটিকেই অনেকাংশে সংশোধন করবার প্রয়োজন হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা-প্রচেষ্টার পরিবর্তে আমাদের আলোচনা প্রধানত কয়েকটি অনভ্যস্ত সমস্যার সূত্র ধরেই অগ্রসর হতে চেয়েছে। এখানে এ-জাতীয় সমস্যার কিছুকিছু পরিচয় দেবো।

প্রথমত অবশ্যই, যে-গুহ্য সম্প্রদায়গুলিকে সাধারণত ব্যাপক অর্থে তান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া হয় সেগুলির উৎস এবং আদি-তাৎপর্য সংক্রান্ত সমস্যা। তন্ত্রের উৎস-সন্ধানে অগ্রসর হয়ে আমরা মানবসমাজের আদিম পর্যায়ের বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার আলোচনায় গিয়ে পড়েছি এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে মানবমনের যে প্রাকৃত বিশ্বাস এবং সাধনপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকেই তন্ত্রের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়ত প্রশ্ন ওঠে, তন্ত্র যদি আদিম সমাজেরই স্মারক হয় তাহলে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এতোদিন ধরে—এমনকি অত্যন্ত সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত—তার প্রভাব এমনভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে কী করে? অতএব আমরা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছি এবং এই বৈশিষ্ট্য বলতে প্রধানত দুটি বিষয়ের আলোচনা উত্থাপন করেছি।

এক: অসমান উন্নতির নিয়ম বা *law of uneven development*। অর্থাৎ, সমগ্র ভারত জুড়ে সবমানুষেরই উন্নতি একইভাবে এবং সমান তালে ঘটেনি। তাই এমনকি আজকের দিনেও আমাদের দেশের এলাকা-বিশেষে প্রাচীন ট্রাইব্যাল সমাজের পরিচয় অক্ষুণ্ণ আছে—ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার-এর লেখক একেই *fragments of a prehistoric wold*[১৪] বা *remnant to our own day of the Stone Age*[১৫] আখ্যা দিয়েছিলেন।

> India thus forms a great museum of races, in which we can study man from his lowest to his highest stages of culture. The specimens are not fossils or dry bones, but living communities...[১৬]

সাম্প্রতিক ভারত সংক্রান্ত এ-মন্তব্য প্রাচীন-ভারত প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই আরো প্রযোজ্য হবে। অতএব, এ-অনুমানে বাধা নেই যে, বহুদিন থেকেই আমাদের দেশে উন্নত ও সভ্য সমাজের পাশাপাশিই প্রাকৃত প্রাচীন সমাজ সহাবস্থান করেছে। অতএব, বিশেষত পুরাকালে এই সহাবস্থানের ফলে প্রাচীন সমাজের প্রাকৃত বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান যে সভ্য সমাজের সংস্কৃতির মধ্যেও সংক্রমিত হবে এতে বিস্ময়ের অবকাশ নেই।

বস্তুত, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই দেখাবার চেষ্টা করেছেন, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ভারতীয় আদিবাসীদের ধ্যানধারণা এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব। আধুনিক বিদ্বানেরা সাধারণত এই আদিবাসীদের অনার্য বা আর্য-পূর্ব বা আর্যেতর বা দ্রাবিড়—বা ওই ধরনের কোনো নাম দিয়ে থাকেন। অতএব,

তাঁদের পরিভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আর্যেতর জাতিদের অবদান।

কিন্তু ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছি বলেই আমাদের কাছে এ-বিষয়ে আরো কিছু সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য-মাত্রেরই বাস্তব ভিত্তি থাকতে বাধ্য। অতএব, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যদি ট্রাইব্যাল সংস্কৃতির প্রভাব অমন গভীর হয় তাহলে অনুমান করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় - সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও ওই ট্রাইব্যাল-সমাজের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশেই অক্ষুণ্ণ থেকেছে। ফলে, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য-প্রসঙ্গে আমরা আরো একটি বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করেছি।

দুই: বাধাপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক বিকাশ ও ট্রাইব্যাল সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ট্রাইব্যাল-পর্যায়ের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের প্রভাব যে এতো ব্যাপক ও গভীর তার ব্যাখ্যায় শুধুমাত্র এটুকু আলোচনাই যথেষ্ট নয় যে, এ-দেশে সভ্য ও প্রাচীন বা ট্রাইব্যাল সমাজ পাশাপাশি অবস্থান করেছে; তাছাড়াও অনুমিত হয় যে, রাষ্ট্রশাসনভুক্ত সভ্য এলাকাতেও বাস্তব ট্রাইব্যাল-সমাজের স্মারক অনেকাংশেই অক্ষুণ্ণ থেকেছে! কীভাবে তা সম্ভব হতে পারে? কৌটিল্যের[৯৭] সংঘবৃত্ত এবং প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র[৯৮] থেকে আমরা এ-প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে পারি। এগুলির সাক্ষ্য অনুসারে অনুমিত হয় যে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কদের একটি মূল নীতি ছিলো আশপাশের ট্রাইব্যাল-সমাজগুলিকে আক্রমণ করে তাদের রাষ্ট্রশাসনভুক্ত করা। অতএব, অর্থনৈতিক উন্নতির স্বাভাবিক পরিণাম হিসেবে এই ট্রাইব্যাল-সমাজের মানুষেরা রাষ্ট্রশাসিত সভ্য-সমাজের আওতায় এসে পড়েনি; তার বদলে বাইরে থেকে আক্রান্ত হয়ে—অতএব কৃত্রিমভাবেই—তারা সভ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। ফলে তাদের জীবন থেকে মাত্র অসমাপ্তভাবেই বিলুপ্ত হয়েছে ট্রাইব্যাল সমাজের বৈশিষ্ট্য। আমরা গ্রন্থ মধ্যে (পৃ. ২৪২—২৯৯) দীর্ঘভাবে ট্রাইব্যাল-সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ সংক্রান্ত প্রকল্পটির আলোচনা করেছি এবং তার সাহায্যেই আমরা বোঝবার চেষ্টা করেছি যে, তন্ত্রের উৎসে প্রাচীন পর্যায়ের প্রাকৃত বিশ্বাস এবং ধ্যানধারণার পরিচয় থাকলেও তা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে এতো দীর্ঘ দিন ধরে ও এমন গভীরভাবে কী করে প্রভাবিত করেছে।

তৃতীয়ত, তন্ত্রের আলোচনায় অগ্রসর হয়ে আমাদের পক্ষে সাংখ্য-দর্শনের উৎস ও আদিরূপ সংক্রান্ত সমস্যাও উত্থাপন করতে হয়েছে। কেননা, তন্ত্রের মতোই সাংখ্য-মতেও প্রকৃতিই প্রধান, জগৎকারণ। এবং তন্ত্রের মতোই সাংখ্য-মতেও এই প্রকৃতি বহুলাংশে নারীরূপে কল্পিত: "বাচ্যবস্তুটিকে স্ত্রীরূপেই সাংখ্য কল্পনা করিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষকে মোহিত করে—যেমন নারী পুরুষকে বশ করে; প্রকৃতির ক্রিয়াও নারীর লাস্য ও হাস্য এবং হাব ও ভাবের অনুরূপ কল্পিত হইয়াছে"[৯৯]। অপরপক্ষে অধ্যাপক বেলভেলকার ও রানাডে[১০০] দেখাচ্ছেন, কালক্রমে সাংখ্যের পুরুষ বলতে যাই বোঝাক না কেন আদিতে তা পুরুষ-মানুষ-বোধকই ছিলো। যদি তাই হয় তাহলে সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে কোনো বড়ো প্রভেদ নেই। সাংখ্যকারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ[১০১] বলছেন, যথা স্ত্রী-পুরুষসংযোগাৎ সুতোৎপত্তিস্তথা প্রধানপুরুষসংযোগাৎ সর্গস্যোৎপত্তি। স্বভাবতই সাংখ্যের এই সৃষ্টিতত্ত্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান-বর্ণিত অসুর-মতের—অতএব শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে লোকায়ত-মতেরও—কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বস্তুত, সাংখ্যের সঙ্গে লোকায়তর পার্থক্য

যে নেহাতই সামান্য, এ-বিষয়ে জৈন লেখকেরা ইতিপূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[১০২] দেখাচ্ছেন, শীলাঙ্ক-রচিত সূত্রকৃতাঙ্গসূত্রের ভাষ্যে সাংখ্য ও লোকায়তর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য স্বীকৃত হয়নি। অতএব, তন্ত্র—তথা লোকায়ত—প্রসঙ্গেই আমরা সাংখ্যদর্শনের উৎস ও আদিরূপ সংক্রান্ত বহু মতবাদসমাকীর্ণ সমস্যার মধ্যেও প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছি এবং যতো আংশিকভাবেই হোক না কেন, একটি সমাধানেরও সন্ধান করেছি।

চতুর্থত, তন্ত্র ও সাংখ্যের উৎস-সংক্রান্ত সমস্যা যতোই জটিল হোক না কেন, তারই সমাধান-প্রচেষ্টায় আমরা জটিলতর একটি সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছি—প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রধান সমাজ এবং সাম্প্রতিক যুগেও তার স্মারকের সমস্যা। তন্ত্র ও সাংখ্য নারীপ্রধান ধ্যানধারণা বলেই তার মধ্যে মাতৃপ্রধান বা নারীপ্রধান—কিংবা, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন-এর[১০৩] মতে এদেশে যাকে ক্ষেত্রপ্রধান বলা হতো সেই—সমাজ-বাস্তবের প্রতিবিম্ব অনুমেয়। অতএব এই মাতৃপ্রধান সমাজবাস্তবের পটভূমি ছাড়া তন্ত্র ও সাংখ্যকে সম্যকভাবে বিচার করা যায় না।

বস্তুত, আমরা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে, লোকায়ত—তথা তন্ত্র ও সাংখ্য সংক্রান্ত অনেক ধারণা যে আজো আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে আছে তার প্রধানতম কারণ হলো ভারতে মাতৃপ্রধান সমাজ এবং মাতৃপ্রধান ধ্যানধারণা বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা এখনো অসম্পূর্ণ। অবশ্যই, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দকে অনুসরণ করে স্যর জন মার্সাল[১০৪] মোহেনজোদারোর ধর্মপ্রসঙ্গে এ-বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া, ডক্টর এরেন্‌ফেল্‌স্[১০৫] তাঁর 'মাদার-রাইট-ইন্-ইণ্ডিয়া' এবং শ্রীযুক্ত দীক্ষিত[১০৬] তাঁর 'মাদার-গডেস্' গ্রন্থে ভারতে মাতৃপ্রধান সমাজ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রতিবিম্ব সংক্রান্ত বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু মাতৃপ্রাধান্য-প্রসঙ্গে মর্গান, এঙ্গেলস্ এবং বিশেষ করে ব্রিফল্ট-এর গবেষণা বিদ্বানমহলে আজো অনাদৃত বলেই এতো অজস্র তথ্যের ব্যাখ্যাও অস্পষ্ট ও অসন্তোষজনক হয়ে থেকেছে।

পঞ্চমত, প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী—এবং সেই অর্থে প্রাকৃত পর্যায়ের বস্তুবাদী—চিন্তাচেতনার সমস্যাও। কেননা, তন্ত্র ও সাংখ্য শুধুমাত্র নারী প্রাধান্যের পরিচায়ক নয়, প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী চেতনারও পরিচায়ক। জগৎকারণ ওই প্রধান শুধুই *female principle* নয়, *material principle*ও। অবশ্যই উত্তরকালে তন্ত্রের উপর বিবিধ অধ্যাত্মতত্ত্ব আরোপিত হয়েছে; তবুও তন্ত্রের মূল তত্ত্ব বলতে দেহতত্ত্ব: যাহা আছে দেহভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। এবং আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানবদেহকেই এইভাবে উপমা হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে বলেই তন্ত্রের আদি-অকৃত্রিম রূপটির মধ্যে অধ্যাত্মবাদের অবকাশ নেই। অপরপক্ষে সাংখ্যকেও উত্তরকালে আস্তিক—এমনকি সেশ্বর—করে নেবার আয়োজন হয়েছে। কিন্তু বাদরায়ণের সাংখ্য-খণ্ডন প্রভৃতি সাংখ্যের প্রাচীনতর পরিচয়গুলিকে পরীক্ষা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় সাংখ্য-মতের আদিরূপটির মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্বের স্থান থাকা সম্ভব নয়।

অতএব, আদিতে তন্ত্র এবং সাংখ্য উভয়ই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী চিন্তাচেতনার—অচেতনকারণবাদের—পরিচায়ক। লোকায়তিক ধ্যানধারণার এই বৈশিষ্ট্যটিকে আমরা কিছুটা পরোক্ষ পদ্ধতি অনুসরণ করে বোঝার চেষ্টা করেছি। প্রশ্ন তুলেছি, অধ্যাত্মবাদ ও চেতনকারণবাদের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে। আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানবসমাজে

শ্রেণীবিভাগ ফুটে উঠবার ফলেই মানব-চেতনায় অধ্যাত্মবাদের বা চেতনকারণবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। অতএব, প্রাক্-বিভক্ত সমাজের স্বাক্ষর বহন করছে বলেই লোকায়তিক ধ্যানধারণা প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী হয়ে থেকেছে।

॥ তিন ॥

বলাই বাহুল্য, উপরোক্ত সমস্যাগুলি অত্যন্ত জটিল এবং আমাদের পক্ষে কোনোটিরই পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়নি। বস্তুত, পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেবার চেষ্টা আমাদের উদ্দেশ্যও ছিলো না। কেননা আমাদের ধারণায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সংক্রান্ত গবেষণা আজো অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্যান্য বিষয়ের মতোই লোকায়ত-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির পূর্ণাঙ্গ সমাধান-সন্ধান কিছুটা অকাল-প্রচেষ্টা বলে প্রতীয়মান হতে বাধ্য। তার বদলে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এ-বিষয়ে প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলির বিচার এবং প্রকৃত সমস্যাবলীর স্বরূপ-নির্ণয়। বর্তমান গ্রন্থে আমরা প্রধানত এই চেষ্টাই করেছি।

তবুও আমরা এমনকি এ-কথাও দাবি করতে পারি না যে, লোকায়ত-সংক্রান্ত সমস্ত প্রাসঙ্গিক সমস্যাই আমাদের পক্ষে উত্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। প্রাসঙ্গিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা যে-সমস্যাগুলি উত্থাপন করতে পারিনি তার মধ্যে প্রধান হলো পালি পুঁথি বর্ণিত ছ'জন নাস্তিকদের নিয়ে সমস্যা। এঁদের নাম : পুরণ কস্‌সপ, মক্খলি গোসাল, অজিত কেশকম্বলী, পকুধ কাচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলথিপুত্ত, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত। সাধারণত এঁদের,—বিশেষ করে এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজনকে—লোকায়তিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। অতএব ভূমিকায় আমরা এঁদের মতামতের সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো এবং আমাদের পক্ষে কেন এঁদের সমস্যা সম্যকভাবে উত্থাপন করা সম্ভব হয়নি তাও ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করবো।

এঁদের কার মতবাদ যে ঠিক কী রকম ছিলো সে-কথা সঠিকভাবে সনাক্ত করা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন। কেননা বিভিন্ন গ্রন্থে এঁদের উপর বিভিন্ন মতামত আরোপিত হতে দেখা যায়। এ-বিষয়ে অধ্যাপক ব্যাসাম্[১০৭] একটি চিত্তাকর্ষক ছক তৈরি করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, দীঘ-নিকায়র সামাঞ্ঞফলসুত্তে এঁদের যে-পরিচয় পাওয়া যায় খুব সম্ভব সেইটিই সবচেয়ে মৌলিক।

সামাঞ্ঞফলসুত্তের[১০৮] আখ্যায়িকাটি মোটের উপর এই :

বুদ্ধ তখন ১২৫০ জন ভিক্ষু নিয়ে মগধের রাজধানী রাজগহতে অবস্থান করছেন। সে-সময়ে রাজা অজাতসত্তু আধ্যাত্মিক উপদেশের প্রয়োজন বোধ করলেন। প্রশ্ন হলো, কার কাছে এ-উপদেশ পাওয়া সম্ভব? রাজার ছ'জন মন্ত্রী একে একে ওই ছ'জন জ্ঞানীর নাম উল্লেখ করলেন এবং প্রত্যেককেই সুবিখ্যাত, গণাচারিয়ো, তিত্থকারো, সাধুসম্মতো, চিরপব্বজিতো প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করলেন। কিন্তু এঁদের নাম শুনে রাজা কোনো উৎসাহ দেখালেন না। অবশেষে রাজকুমারদের চিকিৎসক জীবক বুদ্ধের নাম প্রস্তাব করলেন। রাজা তাতে সম্মত হলেন এবং বুদ্ধের কাছেই গমন করলেন।

যে-প্রশ্ন রাজার চিত্তকে চঞ্চল করেছিলো তা এই : বৈষয়িক ক্রিয়াকর্মের ফলাফল তো স্পষ্টই দেখা যায়; কিন্তু সন্ন্যাসের কোনো সুফল কি প্রদর্শন করা সম্ভব? রাজা

বুদ্ধকে বললেন, ইতিপূর্বে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের কাছে তিনি এ-প্রশ্ন করেছেন; কিন্তু কোনো সুফল পাননি। বুদ্ধ রাজাকে অনুরোধ করলেন, উপরোক্ত ছ'জন নাস্তিক এ-প্রশ্নের কী কী উত্তর দিয়েছেন তা খুলে বলতে। উত্তরে রাজা যা বললেন প্রধানত তারই উপর নির্ভর করে আমরা পুরণ-কস্সপ প্রমুখের মতামত বোঝবার চেষ্টা করে থাকি।

উত্তরগুলি বিচার করে আধুনিক বিদ্বানেরা[১০৯] সিদ্ধান্ত করছেন যে, এর মধ্যে নিগণ্ঠ নাতপুত্তর মতটি বর্ধমান মহাবীরের মতের সঙ্গে অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক; অতএব তাঁকে লোকায়তিক না বলে জৈন বলাই বাঞ্ছনীয়। সঞ্জয়ের উত্তর অত্যন্ত দুর্বোধ্য : অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া[১১০] তাঁকে গ্রীক দার্শনিক ফিরোর শিষ্যদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই অর্থে সঞ্জয় চূড়ান্ত সন্দেহবাদী—কোনোরকম জ্ঞানের সম্ভাবনাই তিনি স্বীকার করেন না। কিন্তু লোকায়ত বলতে এ-রকম চূড়ান্ত অবিশ্বাসবাদ বোঝবার কোনো কারণ নেই।

অজিত কেশকম্বলীর মতবাদ যে ঠিক কী সে-বিষয়েও অন্তত কিছুটা অস্পষ্টতা আছে। সামাঞ্ঞফলসুত্তের[১১১] বর্ণনা অনুসারে অজিতের মত হলো,

> দান যজ্ঞ হোম এবং সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম সমূহের কোনো ফলবিপাক নাই। ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। মাতা নাই, পিতা নাই, উপপত্তিক কোনো সত্তাও নাই। ইহলোকে সম্মগ-গতো (সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন?) কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ নাই,—যাঁহারা সম্যক গমন করেন, যাঁহারা স্বয়ং অভিন্ন সাক্ষ্য দ্বারা ইহলোক এবং পরলোকগুলিকে অনুধাবন করিতে পারেন এবং নিজেদের জ্ঞান অপরের কাছে বিতরণ করিতেও পারেন।
>
> চারি মহাভূত-বিশিষ্ট পুরুষ যখন মারা যায় তখন তার কায়ার পৃথিবী পৃথিবীতে প্রবেশ করে, কায়ার জল জলে প্রবেশ করে, কায়ার তেজ তেজে প্রবেশ করে, কায়ার বায়ু বায়ুতে প্রবেশ করে এবং ইন্দ্রিয়গুলি শূন্যে বিলীন হয়। চারজন শববাহী—এবং শবাধার হলো পঞ্চম—তাহার মৃতদেহকে লইয়া যায় এবং সৎকারস্থান পৌঁছোনো পর্যন্ত মানুষেরা তাহার গৌরব কীর্তন করে। তাহার অস্থিগুলি কপোতের ন্যায় হইয়া যায় (পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়) এবং তাহার আহুতিগুলি ভস্মে পরিণত হয়। ভিক্ষা অথবা দান—যাহারা এইরূপ তুচ্ছ মিথ্যা প্রলাপ বকে তাহাদিগকে আস্তিক্যবাদী বলা হয়। মৃত্যুর পর মূর্খ ও পণ্ডিতের মধ্যে প্রভেদ ছিন্ন হয় এবং মরণের পর আর কিছুই থাকে না।

অজিতের এই মতটিও অনেকাংশে দুর্বোধ্য। সেই কারণেই এর নানারকম ব্যাখ্যা হয়েছে। যেমন, বুদ্ধঘোষ[১১২] বলছেন, অজিত পরলোক মানতেন, কিন্তু মানুষের পক্ষে পরলোক-প্রাপ্তির সম্ভাবনা মানতেন না। এ-ব্যাখ্যা ঠিক হলে অজিতকে লোকায়তিক বলতে বাধা হবে; কিন্তু এ-ব্যাখ্যা ঠিক কিনা সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি না। অবশ্যই, এ-জাতীয় ব্যাখ্যার জটিলতায় প্রবেশ না করেও সামাঞ্ঞফলসুত্তের অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট নির্দেশগুলির উপর নির্ভর করে প্রশ্ন তোলা যায়, অজিতকে লোকায়তিক বলে সনাক্ত করা কতোখানি যুক্তিসঙ্গত হবে? তাঁর মতে দান, যজ্ঞ, হোম, সুকৃত—সমস্তই নিরর্থক

মানুষ চতুর্ভূত-বিশিষ্ট দেহ ছাড়া কিছুই নয়—মৃত্যুর পর এই চতুর্ভূত প্রকৃতিতেই প্রত্যাবর্তন করে, কিছুই বাকি থাকে না। এ-জাতীয় বক্তব্যের সঙ্গে অন্তত মাধববর্ণিত লোকায়ত মতের সাদৃশ্য আছে ; কেননা মাধবের বর্ণনা অনুসারে লোকায়তিকেরা যাগযজ্ঞকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল মনে করেন এবং বলেন, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ? কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, মাধবের ওই লোকায়ত-বর্ণনা সংশয়াতীত বলে গ্রহণ করাও নিরাপদ নয়। তাছাড়া, সামাঞ্ঞফলসুত্ত-বর্ণিত অজিতের মতের সঙ্গে মাধব-বর্ণিত লোকায়ত-মতের সাদৃশ্য আংশিকমাত্র, অজিতের অন্যান্য মন্তব্যের সঙ্গে মাধব-বর্ণিত লোকায়তের মিল নেই। অজিতের মতে ইহলোকও নেই, পরলোকও নেই। মাতা নেই, পিতা নেই এবং তজ্জাত-নয় এমন কোনো সত্তাও নেই। শ্রমণ নেই, ব্রাহ্মণ নেই ; জ্ঞান নেই, জ্ঞানের উপদেশ নেই। দেহাতিরিক্ত সত্তা বলেও কোনো-কিছু নেই ; শ্মশানগমনেই সবকিছুর চূড়ান্ত পরিণতি।

এ-জাতীয় মতবাদকে লোকায়তিক না বলে বরং চূড়ান্ত অর্থে সন্দেহবাদ বা *scepticism* আখ্যা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বস্তুত, রিস্-ডেভিড্স্ও[১১৩] অজিতের মতকে লোকায়তিক না বলে *the view of a typical sophist* হিসেবেই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

সামাঞ্ঞফলসুত্ত বর্ণিত নাস্তিকদের মধ্যে বাকি থাকে আরো তিনজনের কথা : পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল এবং পকুধ কাচ্চায়ন। এঁরা তিনজনেই মোটামুটি একই মতবাদ পোষণ করতেন এমন কথা অনুমান করবার অবকাশ আছে :

> In certain other passage of the Pali canon the distribution of doctrines among the six teachers is significantly altered, in a way which strongly suggests that the credos ascribed in the *Samanna-phala Sutta* to Makkhali, Purana and Pakudha were aspects of a single body of teaching.[১১৪]

এখন, জৈন পুঁথিপত্র থেকে এই তিনজনের মধ্যে মক্খলি গোসাল-এর মতবাদ এবং সাধন-পদ্ধতি সংক্রান্ত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তার কারণ, মক্খলি গোসাল দীর্ঘদিন ধরে মহাবীরেরই অনুগামী ছিলেন[১১৫] যদিও নানান বিবাদ-বিসংবাদের পর শেষপর্যন্ত মহাবীরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়েছিলো। এই কারণে জৈন লেখকেরা মক্খলিকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন এবং এমনকি অনেকাংশে উপহাসের পাত্র হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই কারণেই জৈন পুঁথিতে—বিশেষত ভগবতীসূত্রে—মক্খলির জীবনী এবং মতামত সংক্রান্ত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তথ্যগুলি অবশ্যই অলৌকিক কাহিনীর আবর্জনায় অনেকাংশেই অস্পষ্ট ; তবুও এগুলির মধ্যে থেকে অন্তত কিছুপরিমাণ বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করা অসম্ভব নয়। অধ্যাপক ব্যাসাম্ প্রধানত এইজাতীয় তথ্যের উপর নির্ভর করেই মক্খলি-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়টির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন। তিনি[১১৬] দেখাচ্ছেন, ষষ্ঠ খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের মতোই মক্খলি একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার নাম আজীবিক সম্প্রদায়। মৌর্য যুগেই এ-সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত সাফল্য ঘটেছিলো। তারপর সম্প্রদায়টি ভেঙে যায়। কিন্তু

অনেক পরে দক্ষিণ ভারতে চোল-রাজাদের আমলে এই আজীবিক সম্প্রদায়েরই পুনর্বিকাশ ঘটে ; তারই ফলে তামিল ভাষায় লেখা আজীবিকদের গ্রন্থ পাওয়া যায়।

আজীবিক নামটির অর্থ[১১৭] অনেকাংশেই অনিশ্চিত ; আধুনিক বিদ্বানেরা তার নানারকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। আজীবিকদের সাধনপদ্ধতিও[১১৮] অনেকাংশে দুর্বোধ্য ; কেননা তার মধ্যে নগ্নতা, নাচ, গান—এমনকি হয়তো কামাচারেরও স্থান ছিলো। কিন্তু আজীবিকদের দার্শনিক মতবাদ অনেকাংশেই স্পষ্ট। তার নাম নিয়তিবাদ। অধ্যাপক ব্যাসাম্[১১৯] এই নিয়তিবাদের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন :

> The fundamental principle of Ajivika philosophy was Fate, usually called *Niyati*. Buddhist and Jaina sources agree that Gosala was a rigid determinist, who exalted *Niyati* to the status of the motive factor of the universe and the sole agent of all phenomenal change. This is quite clear in our *locus classicus*, the *Samanna-phala Sutta*...
>
> Fatalism proper finds no place in orthodox Hinduism, Buddhism, or Jainism...The Indian doctrine of *karma*, as it is usually interpreted, provides a rigid framework within which the individual is able to move freely and to act on his own decision...
>
> This doctrine Gosala opposed. For him, belief in free will was a vulgar error. The strong, the forceful, and the courageous, like the weakling, the idler, and the coward, were all completely subject to the one principle which determined all things...
>
> The path of transmigration was rigidly laid out and every soul was fated to run the same course through a period of 8,400,000 *mahakalpas*. This figure is corroborated by independent testimony, and is a measure of the gigantic and weary universe of the Ajivika cosmologists.

আজীবিকদের দার্শনিক তত্ত্ব বলতে যদি প্রধানতই এই হয় তাহলে তাদের লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া কতোখানি সঙ্গত হবে ?

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, সামাঞ্ঞফল-সুত্তে আমরা যে-ছ'জন নাস্তিকের উল্লেখ পাই তাদের কাউকেই নিঃসংশয়ে লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না।

কিন্তু আমরা গ্রন্থমধ্যে এঁদের কথা আলোচনা যে উত্থাপন করতে পারিনি তার কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আসলে এঁদের কথা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আদিরূপের সঙ্গে—এবং বৌদ্ধ-ভারতের পরিস্থিতির সঙ্গে—এমনভাবে জড়িত যে, তার আলোচনা বাদ দিয়ে এঁদের কারুর কথাই সম্যকভাবে আলোচনা করবার উপায় নেই। কিন্তু নানা কারণে আমাদের পক্ষে এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মের উৎস সংক্রান্ত সমস্যা তোলা সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে প্রধান কারণ অবশ্যই গ্রন্থের কলেবর। লোকায়ত-প্রসঙ্গে অন্যান্য সমস্যাগুলির আলোচনা তুলতে গিয়েই এ-কলেবর রীতিমতো বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রাসঙ্গিক হলেও আমরা বৌদ্ধ-ভারতের দার্শনিক পরিস্থিতির কথা তুলতে সমর্থ হইনি।

প্রথম খণ্ড

পটভূমি

প্রথম পরিচ্ছেদ

লোকায়ত-র অর্থবিচার

ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যটির তাৎপর্য সত্যিই বিস্ময়কর।

আমাদের দেশে জনসাধারণের দর্শন আর বস্তুবাদী দর্শন—এই দুটি কথা বোঝাবার জন্যে দুটি স্বতন্ত্র নামের প্রয়োজন হয় নি। নাম পাওয়া যায় একটিই: লোকায়ত। লোকায়ত মানে জনসাধারণের দর্শন, লোকায়ত মানেই আবার বস্তুবাদী দর্শন। অবশ্যই জনসাধারণের দর্শন যখন বলা হচ্ছে তখন পুরোটাই যেন ঠেস দিয়ে বলবার চেষ্টা: সাধারণ মানুষের বুদ্ধিটা তেমন সরেস নয়, তাই জন্যেই এই মাটির পৃথিবীকেই তারা চরম সত্য মনে করে। তবু ছোটো করবার উৎসাহে বলা হলেও কথাটা ছোটো নয়: জনসাধারণের সঙ্গে বস্তুবাদের সম্পর্ক যে এতো নিবিড় তার ইঙ্গিত আর কোনো দেশের দার্শনিক পরিভাষার মধ্যে টেকে আছে কি না খুবই সন্দেহের কথা। তাই লোকায়ত-দর্শনের আলোচনার শুরুতে এই ইঙ্গিতটিকেই স্পষ্টভাবে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে।

'জনগণের দর্শন' ও 'বস্তুবাদী দর্শন'

লোকায়ত বলতে বোঝায় সাধারণ লোকের দর্শন, জনসাধারণের দর্শন। লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ। অর্থাৎ কিনা, সাধারণ লোকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই এ-দর্শনের ওই রকম নাম। মাধবাচার্যের লেখা সর্বদর্শন-সংগ্রহ বলে সংস্কৃত পুঁথির ইংরেজী তর্জমা করবার সময় অধ্যাপক কাওয়েল লোকায়ত শব্দকে এই রকমই একটা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সে-চেষ্টার পিছনে প্রাচীনদের সমর্থনেরও অভাব নেই। দিব্যাবদান নামের বৌদ্ধ পুঁথির ব্যাখ্যাবিশেষে লোকায়ত শব্দের সোজাসুজি এই অর্থই করা হয়েছে। জৈন লেখক হরিভদ্রের ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ের উপর টীকা রচনা করবার সময় গুণরত্ন বলেছেন, যারা সাধারণ লোকের মতো

নির্বিচার আচরণ করে তাদেরই বলে লোকায়ত। কিন্তু শুধুমাত্র নাস্তিকদের নজিরই নয়; লোকায়ত বলতে যে জনগণেরই দার্শনিক চেতনা বুঝতে হবে এ-কথা অগ্রণী আস্তিকরাও বারবার স্বীকার করেছেন। স্বয়ং মাধবাচার্য[৪] বলছেন, এই সম্প্রদায়ের পক্ষে লোকায়ত নামটি বেশ মানানসই হয়েছে, কেননা সাধারণ লোক নীতিকামশাস্ত্র নিয়ে বিভোর হয়ে অর্থ ও কামকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে আর তাই আমল দেয় না পরলোকের কথাকে,—ফলে তাদের চার্বাক-মতানুসারী মনে করাই ঠিক। মাধবাচার্যের ঢের আগে শঙ্করাচার্যও[৫] লোকায়তিক ও প্রাকৃতজন—এই দুটি শব্দকে একসঙ্গে আর একনিশ্বাসে উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিয়েছেন দু'-এর মধ্যে সম্পর্ক কতো ঘনিষ্ঠ।

কিন্তু ওই লোকায়ত নামেরই আরো মানে হয়। লোকায়ত হলো ইহলোক-সংক্রান্ত দর্শন: যারা পরলোক মানে না, আত্মা মানে না, ধর্ম মানে না, মোক্ষ মানে না, তাদেরই বলে লোকায়তিক। তারা মনে করে জল-মাটি-আগুন-হাওয়া দিয়ে গড়া এই মূর্ত পৃথিবীটাই একমাত্র সত্য, আত্মা বলতে দেহ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। কথায় বলি বটে আমার দেহ, যেন আমি আর দেহ দুটো আলাদা কিছু। কিন্তু এ হলো নেহাতই কথার কথা। যেমন কিনা বলা হয় রাহুর মাথা। আসলে রাহু তো আর সত্যিই মাথাটুকু ছাড়া কিছুই নয়।

তাহলে এই মানে অনুসারে লোকায়ত হলো দেহাত্মবাদ, বস্তুবাদ। ইংরেজী পরিভাষায় যাকে বলে মেটিরিয়ালিস্‌ম্।

অধ্যাপক তুচি[৬] দেখাবার চেষ্টা করেছেন, ব্যুৎপত্তির দিক থেকেও লোকায়ত শব্দ এই রকমই একটা অর্থের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অবশ্য বৃদ্ধসম্মতি হিসেবে এ-কথার পক্ষে তিনি যে-নজিরটি দিচ্ছেন তা কিছুটা জটিল: বুদ্ধঘোষ[৭] বুঝি আয়ত শব্দটাকে আয়তন অর্থে ব্যবহার করেছেন—আয়তন বলতে বোঝায় ভিত্তি। তাই যে-মতবাদের ভিত্তি হলো এই ইহলোক,—মাটির পৃথিবী,—তাকেই বলে লোকায়ত।

বলাই বাহুল্য, অধ্যাপক তুচির পক্ষে এই অর্থটি প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা যতোখানিই কষ্টকল্পিত হোক না কেন, লোকায়ত নামটিকে আমরা সাধারণত বস্তুবাদ-সূচক অর্থেই গ্রহণ করে থাকি। লোকায়ত বলতে বস্তুবাদই বোঝায়। আর তা বোঝবার জন্যে খুব একটা ঘোরালো প্রমাণের সত্যিই দরকার নেই। কেননা, হরিভদ্র[৮] ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে লোকায়তমত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, লোক বলতে শুধু সেইটুকুই যা কি না ইন্দ্রিয়গোচর: এতাবানেবলোকোঽয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ। টীকাকার মণিভদ্র[৯] কথাটাকে আরো পরিষ্কার করে বলছেন, লোক মানে নিরূক পদার্থসার্থ বা পদার্থসমূহ।

তার মানে, প্রত্যক্ষে যেটুকু ধরা পড়ে লোকায়তিকরা শুধুমাত্র সেইটুকুকেই সত্যি বলে স্বীকার করেন। তারই নাম লোক। লোকই একমাত্র সত্য।

প্রত্যক্ষ ও প্রবঞ্চনার প্রতিষেধক

কিন্তু কেন? যেটুকুকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যাচ্ছে সেটুকু ছাড়া আর কিছুই ওঁরা সত্যি বলে মানতে চাননি কেন? এ-প্রশ্নের জবাব হিসেবে মণিভদ্র দুটি যুক্তি উল্লেখ করছেন, দুটিরই তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, অবশ্যই ধর্মের প্রবঞ্চনাটা এড়াবার জন্যে। অনুমান, আগম ইত্যাদি জ্ঞানের তথাকথিত অন্যান্য উৎসের দোহাই দিয়ে পরবঞ্চনপ্রবণ ধর্মছদ্মধূর্তের দল সাধারণ মানুষের মনে স্বর্গাদি প্রাপ্তি সম্বন্ধে একটা মোহের সঞ্চার করে। এই সংকট থেকে বাঁচতে হলে সাধারণ লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণকে স্বীকার করা নিরাপদ নয়। মণিভদ্রের ভাষায়:

> এবম্ অমী অপি ধর্মচ্ছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনপ্রবণা যৎ কিম্চিৎ অনুমানাগমাদিদার্ঢ্যম্ আদর্শ্য ব্যর্থম্ মুগ্ধজনান্ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্যভোগাভোগপ্রলোভনয়া ভক্ষ্যাভক্ষ্য-গম্যাগম্যহেয়োপাদেয়াদিসংকটে পাতয়ন্তি, মুগ্ধধার্মিকান্ধ্যম্ চ উৎপাদয়ন্তি...১০

দ্বিতীয়ত,—এবং ওই দ্বিতীয় যুক্তিটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ,—লোকায়তিকেরা নাকি বলতেন, অপ্রত্যক্ষকে (অর্থাৎ কি না যা প্রত্যক্ষভাবে জানা যাচ্ছে না তাকেও) যদি সত্যের সম্ভাবনা দিতে হয় তাহলে দরিদ্রের পক্ষে তার দারিদ্র্যের কথা ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়, অসম্ভব নয় দাসের পক্ষে দাসত্বের কথা ভুলে যাওয়া। কেননা যে দরিদ্র তার পক্ষে দারিদ্র্যটুকুই প্রত্যক্ষ, যে দাস তার কাছে দাসত্বটুকুই প্রত্যক্ষ। কিন্তু যদি অপ্রত্যক্ষকেও অস্তিত্বের সম্ভাবনা দিতে হয় তাহলে দরিদ্রও 'স্বর্ণরাশির মালিক হয়েছি' এমন কথা কল্পনা করে নিজের তুচ্ছ অবস্থাকে অবহেলায় দলন করতে পারে, দাস মনে করতে পারে সে আর দাস নয়, স্বামী। এক কথায়, এইভাবে দরিদ্র-ধনিভাব ও সেব্য-সেবকভাব সব কিছুই নস্যাৎ হয়ে যায়। মণিভদ্রের ভাষায়:

> কিম্ চ অপ্রত্যক্ষম্ অপি অস্তিতয়া অভ্যুপগম্যতে চেৎ জগৎ অনপহ্নুতম্ এব স্যাৎ, দরিদ্রঃ হি স্বর্ণরাশিঃ মে অস্তি ইতি অনুধ্যায় হেলয়া এব দৌঃস্থ্যম্ দলয়েৎ,

দাসঃ অপি স্বচেতসি স্বামিত্বাম্ অবলম্ব্য কিংকরতাম্ নিরাকুর্য্যাৎ ইতি।...এবং ন কশ্চিৎ সেব্য-সেবকভাবঃ দরিদ্রধনিভাবঃ বা স্যাৎ।[১১]

তার মানে কি এই যে লোকায়তিকেরা প্রত্যক্ষের উপর এতোখানি জোর যে দিতে চেয়েছিলেন তার কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন এইভাবেই দরিদ্রকে তার দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন রাখা যাবে, দাসকে সচেতন রাখা যাবে দাসত্ব সম্বন্ধে? এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে, অজিত কেশকম্বলী, মক্ষলি গোসাল, পূর্ণ কস্সপ প্রমুখ যে-ক'জন দার্শনিককে সাধারণত বস্তুবাদী বা লোকায়তিক বলে স্বীকার করা হয় তাঁরা শুধু যে ক্রীতদাস ছিলেন তাই নয়, দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছিলেন। দাসত্ব-চেতনা মন থেকে মুছে গেলে এ-বিদ্রোহ নিশ্চয়ই সম্ভবপর নয়।

অবশ্যই মণিভদ্র কোথা থেকে লোকায়তিকদের এই যুক্তিগুলি সংগ্রহ করেছিলেন তা জানতে পারলে ওই প্রশ্নের জবাব ভালো করে বুঝতে পারা যেতো। কিন্তু তা জানবার কোনো উপায় নেই। কেননা, লোকায়তিকদের লেখা সমস্ত পুঁথিপত্রই বিলুপ্ত হয়েছে।

বিলুপ্ত পুঁথির কথা

কোনো কালে লোকায়তিকদের লেখা পুঁথিপত্র বলতে সত্যিই কি কিছু ছিলো? ছিলো। তার প্রমাণ, ওই বৌদ্ধ পুঁথি দিব্যাবদান। তার প্রমাণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য। খোঁজ করলে হয়তো আরো প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এ-দুটি প্রমাণই বা কম কিসের?

দিব্যাবদানে[১২] স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে: লোকায়তং ভাষ্য-প্রবচনম্। লোকায়তের উপর এমন কি ভাষ্য ছিলো, প্রবচনও ছিলো। কতোদিন আগে ছিলো? কী নাম সেই ভাষ্যের? এই দুটি প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যায়। কোথা থেকে? পতঞ্জলির মহাভাষ্য থেকে। আধুনিক পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার অন্তত দেড় শ' বছর আগে পতঞ্জলি তাঁর এই বিখ্যাত বইটি লিখেছিলেন। আর ওই বইতেই[১৩] ব্যাকরণের একটি নিয়ম ব্যাখ্যা করবার প্রসঙ্গে তিনি লোকায়তের উপর ভাগুরি নামের বর্তিকা বা ভাষ্যের উল্লেখ করেছেন: বর্নিকা শব্দ স্ত্রী লিঙ্গে নাকি বর্তিকাও বোঝাতে পারে, যেমন, 'বর্নিকা ভাগুরি লোকায়তস্য, বর্তিকা ভাগুরি লোকায়তস্য'। এর থেকে নিঃসন্দেহেই প্রমাণ হয় যে যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার অন্তত দেড় শ' বছর আগে

পর্যন্ত লোকায়ত-শাস্ত্র নিশ্চয়ই ছিলো, এবং তার উপর অন্তত একটি ভাষ্যও নিশ্চয়ই ছিলো, সে ভাষ্যের নাম ভাগুরি।[১০]

কিন্তু এই নামটাই টেকে আছে। পুঁথিগুলি বিলুপ্ত হয়েছে।

কেন বিলুপ্ত হলো? সত্যি বলতে, তেমন জোর গলায় এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দেবার উপায় নেই। তবে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু[১১] বলছেন, খুব সম্ভব উত্তরযুগে পুরোহিতদল এবং সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীরা ভারতবর্ষে বস্তুবাদীদের অনেক পুঁথিপত্র ইচ্ছে করে নষ্ট করেছিলো। যদি তাই হয় তাহলে নিশ্চয়ই মানতে হবে সেকালেও যে-মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে দেশশাসনের ক্ষমতা ছিলো তারাও জনগণের এই দর্শনটি সম্বন্ধে—অর্থাৎ লোকায়ত বা বস্তুবাদী দর্শন সম্বন্ধে,—খুব সহনশীলতার পরিচয় দেয় নি। তার মানে, একালের সঙ্গে সেকালের যতো তফাতই থাক না কেন, অন্তত একটা বিষয়ে মিল আছে: জনসাধারণের ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে শাসক-সম্প্রদায়ের কঠিন বিধান।

অথচ ওই কথাটিই আবার পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু মানতে রাজী নন, তাই তাঁর উক্তি স্ববিরোধী। প্রাচীন ভারতকে আবিষ্কার করতে এগিয়ে তিনি সেকালের যে-ছবিটি আমাদের সামনে তুলে ধরতে চান তার মূল কথা হলো,

> I imagine, however, that in spite of the vast mental and cultural differences between the small thinking minority and the unthinking masses there was a bond between them, or, at any rate, there was no obvious gulf. The graded society in which they lived had its mental gradations also and these were accepted and provided for. This led to some kind of social harmony and conflicts were avoided.[১২]

মোদ্দা কথায়, চিন্তাশীল বলতে সেকালে ছিলো মাত্র মুষ্টিমেয় মানুষ। বাকি মূঢ় জনতার মধ্যে কোনো রকম চিন্তার বালাই ছিলো না। কিন্তু এ-দু'-এর মধ্যে মানসিক ও সাংস্কৃতিক তফাতটা বিরাট হলেও একটা বন্ধনও ছিলো। অন্তত কোনো প্রকট খাদ ছিলো না। ক্রমানুসারে সাজানো যে-সমাজটিতে তারা বাস করতো সে-সমাজে মানসিক ক্রমানুসারও ছিলো। সেগুলি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিলো এবং তার জন্যে ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিলো। এরই দরুন দেখা দিয়েছিলো একটা সামাজিক সামঞ্জস্য এবং সম্ভব হয়েছিলো সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া।

চিত্রটি মনোরম। সন্দেহ নেই। একালের বাস্তবটাও যদি ওই

কাল্পনিক অতীতের অনুরূপ হতো—যদি সংঘাত না থাকতো, যদি শুধু সামঞ্জস্যই থাকতো—তাহলে আজকে অনেকে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। কিন্তু সেকালের ওই সরল-সুন্দর ছবিটি এঁকে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু আমাদের মনে যেটুকু নেশা ধরিয়েছিলেন তা তিনিই এক মুহূর্তে ভেঙে দিলেন লোকায়তিকদের লেখা পুঁথিপত্রগুলি ধ্বংস করবার কথা উল্লেখ করে।

বিতণ্ডাবাদী

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু যাদের মূঢ় জনতা বলে বর্ণনা করছেন তাদেরই দার্শনিক চেতনাটুকু নিয়ে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। কেননা, প্রাচীনেরা বারবার লিখে গিয়েছেন যে লোকায়ত বলতে শুধুই বস্তুবাদী দর্শন মনে করা চলবে না, মনে রাখতে হবে এই হলো দেশের জনসাধারণের দর্শন।

অবশ্যই এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মাধবাচার্যই বলুন আর শঙ্করাচার্যই বলুন—লোকায়ত দর্শনকে যখন তাঁরা সাধারণ লোকের দর্শন বলে উল্লেখ করেছেন তখন তাঁদের আসল উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই জনসাধারণকে তাদের প্রকৃত দার্শনিক ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া নয়; তার বদলে লোকায়ত-দর্শনকে ওই বলে খাটো করবার বা ছোটো করবার চেষ্টাই।

মূঢ় জনতা। তাদের বোধটা নেহাতই স্থূল, তাই তারা মনে করেছে দেহ ছাড়া আত্মা বলে কিছুই নেই। তাদের দৃষ্টিটা নেহাতই সংকীর্ণ, তাই তারা ইহলোক ছাড়িয়ে পরলোক বা পরকালকে দেখতে পায় নি। তাদের রুচিটা নেহাতই কদর্য, তাই তারা মনে করেছে অর্থ ও কামই পরম পুরুষার্থ—ধর্ম ও মোক্ষের কথা শুনলে তারা ভয় পেয়েছে, ভেবেছে মাথায় হাত বোলাতে এসেছে বুঝি।

কিন্তু লোকায়তিকদের লেখা পুঁথিপত্রগুলি বিলুপ্ত হলেও তাঁদের বিদ্রূপ করবার জন্যেই বিপক্ষরা তাঁদের সম্বন্ধে যতটুকু টুকরো-টাকরা সংবাদ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন সেগুলিকে পরীক্ষা করলে সন্দেহ হয়, লোকায়তিকেরা যে-সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করতেন সেগুলির মধ্যে এই রকমের হাবাগোবা বোকাসোকা মনোভাবের পরিচয় ছিলো না। এমন কি, মনে রাখা দরকার, লোকায়তিকদের বর্ণনায় স্বয়ং বুদ্ধঘোষ[১১] বিতণ্ডাবাদী বলে বিশেষণ ব্যবহার করে গিয়েছেন। অন্যান্য পালি পুঁথিতেও হুবহু এই কথাই লেখা

আছে[১৮]। এখন বিতণ্ডা আর বাদ—এই ছুটি কথাই যে একসঙ্গে কেমন করে ব্যবহার করা যায় তাই নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা খুবই সমস্যায় পড়েন। কেননা, ন্যায়সূত্র[১৯] অনুসারে বিতণ্ডা মানে হলো নিছক নেতিবাচক তর্ক—একটা মত খণ্ডন করবার জন্যে তর্ক করা হচ্ছে কিন্তু কোনো পাল্টা-মত স্থাপন করবার উৎসাহে নয়। আর বাদ বলতে বোঝায় ঠিক এর উল্টো : একটা মত স্থাপন করবার উদ্দেশ্যেই বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করবার চেষ্টায় তর্ক। তাই সমস্যা হলো, একই সঙ্গে লোকায়তিকদের সম্বন্ধে ছুটো কথাই কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? একালের পণ্ডিতেরা তাঁদের ওই সমস্যা নিয়ে থাকুন। আমাদের যুক্তির পক্ষে আপাতত যেটা খুবই জরুরী কথা সেটা হলো, লোকায়তিকেরা রীতিমতো ভালো যুক্তিতর্ক করতে জানতেন। তাঁদের যুক্তিতর্কগুলি ছিলো খুবই ধারালো। সে-সব যুক্তিতর্কের কিছুকিছু নমুনা পাবেন মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহে,[২০] আরো নানান বইতে[২১]। এমনকি, আমরা পরে দেখবো, এ-কথা অনুমান করবারও অবকাশ রয়েছে যে প্রাচীন ভারতে যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন লোকায়তিকেরাই।

তাই চিন্তার জড়তার দরুনই তাঁরা এই জড় জগৎটাকে একমাত্র সত্য মনে করেছেন, এ-কথা বললে তথ্যবলের চেয়েও দেহবলের পরিচয় দেওয়া হবে। লোকায়তিকদের বিপক্ষরাই তাঁদের সম্বন্ধে যে-সব কথা লিখে গিয়েছেন তা থেকেই বোঝা যায় তাঁরা চিন্তা করতে জানতেন, এবং সে-চিন্তা খুবই তীক্ষ্ণ। লোকায়ত-দর্শনের ধ্বংসস্তূপ থেকে যখন তার পুনর্গঠন করবার চেষ্টা করবো তখন এ-কথার আরো ভালো নজির দেখানো সম্ভব হবে।

কিন্তু সে-সব কথা না হয় আপাতত ছেড়েই দিলাম। আপাতত না হয় মেনেই নিলাম যে জনসাধারণ মূঢ়, প্রাকৃত, উচ্চাঙ্গের চিন্তার অযোগ্য। আর তাই জন্যেই তারা ও-রকম স্থূল কথাবার্তাকেই,—বস্তুবাদকেই,—সত্য বলে মনে করেছে। তাহলেও, অন্তত এটুকু তো মানতেই হবে যে, যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, আমাদের দেশে বস্তুবাদী দর্শন আর জনসাধারণের দর্শন—ছুটো কথা আলাদা কথা নয়। তার বদলে, একই কথার এপিঠ-ওপিঠ। কেননা, প্রাচীনেরাও বারবার লিখে গিয়েছেন, আর আধুনিক পণ্ডিতেরাও স্বীকার করছেন, লোকায়ত কথার মানে একটা নয়। জনসাধারণের দর্শন। বস্তুবাদী দর্শন। ছুই-ই।

ভারতের ঐতিহ্য

সেকাল থেকে একালের কথায় আসা যাক। একালের কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কেননা, লোকায়ত দর্শনের পুঁথিপত্রগুলি যতোকাল আগেই বিলুপ্ত হয়ে যাক না কেন, হাজার হোক আমরা তো আজকের দিনেই সেই লোকায়ত দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি। তাই আজকের দিনে এ-আলোচনার তাৎপর্য কতোখানি সে-কথাও ভেবে দেখা দরকার বই কি।

আজকের দিনে আমরা বারবার শুনতে পাই, বস্তুবাদী দর্শনটার সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। এ-দর্শন নেহাতই বিদেশী ব্যাপার, পশ্চিমী ব্যাপার—দেশের জমিতে এর কোনো শিকড় ছিলো না। আমাদের দেশের ইতিহাস আলাদা, জীবনের আদর্শ আলাদা,—সব কিছুই অন্য রকমের। পশ্চিমের আদর্শটা হলো বস্তুবাদী আদর্শ, ভোগের আদর্শ,—ভুল আদর্শ। তারই মোহে পড়ে আজকের পশ্চিমী সভ্যতা কী রকম উন্মাদের মতো আত্মনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। তার বদলে, আমাদের দেশের আদর্শ হলো ত্যাগের আদর্শ, অধ্যাত্ম-চেতনার আদর্শ। আজ বরং আমাদের দেশের এই আদর্শকেই গ্রহণ করতে পারলে পশ্চিমী সভ্যতা অমন ভয়াবহ ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু তার বদলে আমরা যদি আমাদের নিজস্ব আদর্শটিকে ছেড়ে এই প্রাচ্যের জমিতে ওই পশ্চিমী বস্তুবাদের বীজ বুনতে যাই তাহলে অঘটন ঘটবে, জন্মাবে এক বিষবৃক্ষ,—তার ফল আমাদের কল্যাণ করবে না।

এই কথাগুলিই এতোবার, এতোভাবে[২২], আমাদের বলা হয়েছে যে শুনতে শুনতে অনেকেই মনে করেছেন, সত্যিই হয়তো বা তাই। সত্যিই বুঝি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বস্তুবাদী দর্শনের কোনো স্থান নেই, সত্যিই বুঝি আমাদের দেশের জমিতে শুধু অনাবিল অধ্যাত্মবাদেরই বিকাশ ঘটেছে।

অথচ এতোগুলি কথার মধ্যে একটিও সত্যি কথা নয়।

প্রথমত, পাশ্চাত্য দর্শন যে বস্তুবাদী দর্শন, এই কথাটাই ভুল। আজকের পাশ্চাত্য দেশগুলি যে বস্তুবাদের মোহে পড়েই অমন আত্মনাশের পথে এগিয়ে চলেছে, সে-কথাটা আরো বেশি ভুল। আত্মনাশের আয়োজন যে নেই তা নয়: পৃথিবীর বুক থেকে একটা মহাযুদ্ধের ক্ষত শুকোতে না শুকোতে শোনা যায় আর একটা মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠছে। কিন্তু তার সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনের সম্পর্কটা কী রকম? ঐকান্তিক বিরোধের সম্পর্কই। কেননা আজকের দিনে যাঁরা সত্যিই এই মৃত্যুর মহাযজ্ঞের বড়ো বড়ো যজমান তাঁদের কাছে বস্তুবাদী দর্শনই একটা বিরাট বিভীষিকার মতো। তাই তাঁদের মুখপাত্ররা বস্তুবাদকে হাজারবার খণ্ডন করেও স্বস্তি পান না, আবার নতুন করে

খণ্ডন করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন[২৩]। এবং বস্তুবাদকে খণ্ডন করে অধ্যাত্মবাদী আর ভাববাদী মতবাদকে রকমারি মুখোস পরিয়ে রকমারি উপায়ে প্রচার করতেই তাঁরা আজ ব্যস্ত। অবশ্যই, আজকের ইয়োরোপের দার্শনিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করবার অবকাশ আমরা এই বইতে পাবো না। যাঁরা সে-বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এবং দেখাচ্ছেন আজকের দিনে স্বার্থান্ধ যুদ্ধবাদীরা কী ভাবে বস্তুবাদকে ধূলিসাৎ করে তারই ধ্বংসস্তূপের উপর অধ্যাত্মবাদ আর ভাববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়,—পাদটীকায় তাঁদের বই-এর নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হলো[২৪]।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হলো অপর প্রশ্নটি : ভারতীয় দর্শন সত্যিই কি অনাবিল অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী দর্শন ?

কাদের ধ্যানধারণা ?

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দর্শন-বিষয়ে একটি দু'খণ্ডের বই প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেশ-বিদেশের নানা দার্শনিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। এই ভূমিকায় তিনি ঘোষণা করেছেন, ভারতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য হলো বহির্জগতের চেয়ে মানুষের অধ্যাত্মজগতের প্রতিই অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া।

> The characteristic of Indian thought is that it has paid greater attention to the inner world of man than to the outer world.[২৫]

ভারতবর্ষে যে বস্তুবাদী চিন্তাধারার কোনো রকম পরিচয়ই ছিলো না এ-কথা অবশ্য ও-বইতে সরাসরি বলা হয় নি। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন বলে একটা কিছু ছিলো বই কি। এমন কি আলোচ্য গ্রন্থে লোকায়ত দর্শনের জন্যে ১০৭৯ পাতার মধ্যে রীতিমতো ৬ পাতা জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবু প্রশ্ন ওঠে, এই লোকায়ত দর্শনের মর্যাদাটা নিয়ে। আমাদের দেশে সত্যের সন্ধানে মানুষের যে-বিচিত্র অভিযান তার মধ্যে লোকায়ত-দর্শনের তাৎপর্য ঠিক কতোটুকু ? এ-দর্শন কাদের দর্শন ছিলো ?

ভারতীয় দর্শনের যে-কোনো একটি পাঠ্যপুস্তক উল্টে দেখতে পারেন। দেখবেন লেখা আছে, লোকায়ত দর্শন ছিলো মাত্র মুষ্টিমেয় অধঃপাতে-যাওয়া

সুখান্বেষীর মনের কথা। নিছক নিজেদের ভোগবিলাস ছাড়া তারা আর কোনো আদর্শকেই আদর্শ বলে মানতো না। তারা শুধু ঘি খাবার তালেই ঘুরতো,—তা সে ধার করেই হোক আর যে করেই হোক।

এ-হেন মতবাদ যে নৈতিক চরিত্রের পতন ঘটাবে, সে-কথা কি আর খুলে বলবার দরকার আছে? তবু দেখবেন, ভারতীয় দর্শনের বেশির ভাগ বইতে লেখা আছে, সেকালের ঋষিরা লোকায়ত দর্শনের এই ভয়াবহ পরিণামটির কথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার ব্যাপারেও আলস্যের পরিচয় দেন নি। কেননা, লোকায়ত দর্শনের উৎপত্তি নিয়ে মৈত্রায়ণ উপনিষদে[১১] একটি অদ্ভুত গল্প আছে। একবার নাকি অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা কিছুতেই পেরে উঠছিলেন না। তখন দেবগুরু বৃহস্পতি এক ফন্দি আঁটলেন। তিনি অসুরগুরু শুক্রের ছদ্মবেশ ধরে অসুরশিবিরে প্রবেশ করে প্রচার করলেন এই বস্তুবাদী মতবাদ। ফলে অসুরদের নৈতিক পতন ঘটলো, আর তারই দরুন তারা দেবতাদের কাছে পরাজিত হলো।

লোকায়ত দর্শনকে দেশের লোকের সামনে এই ভাবে এক ভয়াবহ ব্যাপার বলে প্রচার করবার চেষ্টা শুধু উপনিষদে নয়, পৌরাণিক সাহিত্যেও। কাহিনীটা মোটের উপর একই[১৭]।

অবশ্যই এই কাহিনীর মধ্যে দেবগুরুর নিজস্ব যে-নীতিবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা সত্যিই ভালো না মন্দ, সে-প্রশ্নের আলোচনা উপনিষদাদির পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। কেননা কাহিনীটির মূল উদ্দেশ্য হলো, লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে একটা ভীতি প্রচার করা। শুধুমাত্র এই ভীতিপ্রচারই নয়। এমন কি, সেকালের আইন-কর্তারাও এ-দর্শনের বিরুদ্ধে রীতিমতো আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। প্রমাণ মনুস্মৃতি। মনু[১৮] বলছেন, অতিথিযোগ্য কালেও যদি লোকায়তিকেরা (হৈতুকাঃ = বেদবিরোধিতর্ক-ব্যবহারিণঃ) উপস্থিত হয় তাহলে এমন কি বাক্যদ্বারাও এদের সম্ভাষণ করা চলবে না। লোকায়তিকদের বিরুদ্ধে মনুর আরো নানারকম কঠিন কঠিন বিধান[১৯] আছে।

তবুও, লোকায়ত নামটির অর্থ বিচার করতে গিয়েই দেখা গেলো, আতঙ্কজনক গল্প প্রচার করে, আইন করে, বই পুড়িয়ে—আরো হাজারো রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে সাধারণ মানুষের মন থেকে সেকালের শাসকেরা এই দর্শনকে সত্যিই সরাতে পারে নি। লোকায়ত দর্শন মানে শুধু বস্তুবাদ নয়, জনগণের দর্শনও। জনসাধারণের সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনের সম্পর্ক যে কতো নিবিড় সে কথা আজো আমাদের দেশে এই নামটির মধ্যেই পরিষ্কার ভাবে টেকে রয়েছে।

তাই এ-কথা বলা মোটেই ঠিক নয় যে ভারতীয় দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য

হলো বাস্তব জগৎটাকে ছেড়ে মানুষের অধ্যাত্ম জগৎটির দিকেই মনোযোগ দেবার চেষ্টা।

তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদী দর্শনের বিকাশ ঘটে নি। নিশ্চয়ই ঘটেছিলো। কিন্তু সে-দর্শন ছিলো একটি সংকীর্ণ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ, দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ ছিলো না। সেই সংকীর্ণ শ্রেণীর হাতে দেশের শাসন-ক্ষমতা ছিলো বলেই ওই অধ্যাত্মবাদী দর্শনের পুঁথিপত্রগুলিকে পুড়িয়ে ফেলবার কোনো কারণ তো ঘটেই নি; বরং এ-জাতীয় দার্শনিক রচনার প্রচার যাতে প্রশস্ত হয় তার জন্যেও দেশে নানাবিধ ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু তাই বলে শুধুমাত্র ওই ধরনের পুঁথিপত্রগুলিকেই দেশের দার্শনিক চিন্তাধারার একমাত্র পরিচায়ক মনে করাটা কি ঠিক? যে-সব পুঁথি বিলুপ্ত হয়েছে সেগুলির সাক্ষ্যকেও তো উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

আমাদের দেশে অধ্যাত্মবাদী দর্শন যে শুরুতে শুধুমাত্র শাসক-শ্রেণীর চেতনাতেই প্রতিভাত হয়েছিলো এ-কথা উপনিষদের ঋষিরা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষাতেই বলে গিয়েছেন। প্রমাণ: ছান্দোগ্য-উপনিষদের শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদ (॥ ৫। ৩ ॥)। এখানে উপনিষদের গল্পটির মূল কথাটুকু উল্লেখ করা যাক:

> শ্বেতকেতু আরুণেয় এক সময়ে পাঞ্চাল সমিতিতে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রবাহণ জৈবলি তাঁকে প্রশ্ন করলেন: হে কুমার, তোমার পিতা তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন কি? শ্বেতকেতু বললেন, নিশ্চয়ই দিয়েছেন। প্রবাহণ তখন শ্বেতকেতুকে পরলোকতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিদ্যা-সংক্রান্ত পরের পর পাঁচটি প্রশ্ন করলেন। শ্বেতকেতু একটিরও জবাব দিতে পারলেন না। তখন প্রবাহণ বললেন; তবে কেন বলছিলে যে তুমি উপদিষ্ট হয়েছো? ফলে মনের দুঃখে শ্বেতকেতু পিতার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, সেই রাজন্যবন্ধু আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তার একটিরও জবাব দিতে পারি নি। পিতা স্বীকার করলেন, তিনি নিজেও এ-সব প্রশ্নের উত্তর জানেন না—জানলে নিশ্চয়ই উপদেশ দিতেন।
>
> তারপর গৌতম (শ্বেতকেতুর পিতা) নিজেই রাজভবনে গেলেন। রাজা অভ্যাগতকে সমাদর করলেন। সকালে রাজা সভায় উপস্থিত হলে গৌতমও সেখানে গেলেন। রাজা তাঁকে বললেন, মনুষ্যসম্বন্ধী বিত্তের বর প্রার্থনা করুন। গৌতম বললেন, মনুষ্যসম্বন্ধী বিত্ত আপনারই থাকুক। আপনি আমার ছেলের কাছে যে-কথা বলেছিলেন আমাকে তাই বলুন। শুনে রাজা বিষণ্ণ হলেন। রাজার আজ্ঞায় গৌতম সেখানে দীর্ঘকাল বাস করলেন। তারপর রাজা তাঁকে বললেন, আপনি যে আমাকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনার পূর্বে

> পুরাকালে কোনো ব্রাহ্মণই এই বিদ্যা লাভ করে নি। (এ-বিদ্যা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়গণেরই জানা ছিলো)। এই জন্যেই সর্বত্র রাজ্যশাসন করবার ক্ষমতা ক্ষত্রিয়দের হাতেই রয়েছে।

"তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূৎ"—ওই অধ্যাত্মবিদ্যার দরুনই সর্বত্র ক্ষত্রিয়দের শাসনক্ষমতা ছিলো। ক্ষত্রিয় বলতে যে সেকালের শাসক-শ্রেণী এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহ নেই। প্রশাসন বলতে যে রাজ্য শাসনই বোঝাচ্ছে এ-কথা ডয়সন স্পষ্ট ভাবেই প্রমাণ করেছেন। ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে শাসক-শ্রেণীর সম্পর্ক শাসক-শ্রেণীরই সাহিত্যে আর কোথাও এমন স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে কিনা খুবই সন্দেহের কথা।

ভেবে দেখা দরকার বিশেষ করে একটি বিষয়ের কথা: অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে শাসনক্ষমতার সম্পর্কটা শাসক-শ্রেণীর সাহিত্যে উল্টো ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা? অর্থাৎ, প্রশ্ন হলো, অধ্যাত্মবাদের দরুনই শাসনক্ষমতা, না, শাসনক্ষমতার দরুনই অধ্যাত্মবাদ? এ-বিষয়ে শেষ পর্যন্ত মীমাংসা যাই হোক না কেন, অন্তত উপনিষদে যেটুকু কথা লেখা রয়েছে সেটুকুকেও কেউই উড়িয়ে দিতে পারবেন না: অধ্যাত্মবাদ শুধুমাত্র শাসক-শ্রেণীর দর্শনই নয়, সেই শ্রেণীর কাছে শাসনের হাতিয়ারও।

অধ্যাত্মবাদের উৎস

অধ্যাত্মবাদী দর্শনের উৎস কেন শুধুমাত্র শাসক-শ্রেণীর মানুষের চেতনায়?—এ-প্রশ্ন পরে তোলা যাবে। আপাতত তার চেয়েও জরুরী প্রশ্ন হলো, বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে জনসাধারণের নাড়ির যোগটা নিয়ে। এই যোগাযোগ সম্ভব হলো কেমন করে?

ভারতীয় দর্শনের দলিলপত্র থেকেই এ-প্রশ্নের একটা ভারি আশ্চর্য জবাব পাওয়া যাচ্ছে। খুব মোটা ভাষায় বললে বলা যায়, দেশের সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়ায় বিশ্বাস হারায় নি, তাই।

কিন্তু খেটে খাবার প্রশ্ন উঠছে কেন? দার্শনিক আলোচনার আসরে এ-ধরনের প্রসঙ্গ খুবই স্থূল আর খাপছাড়া শোনায় না কি?

তবু উপায় নেই। লোকায়ত দর্শনের ধ্বংসস্তূপ থেকে যে-দু'চারটে ভাঙা-চোরা চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তার থেকেই ও-দর্শনের আসল রূপটিকে চেনবার চেষ্টা করতে হবে। আর এই সব চিহ্নের মধ্যে একটি চিহ্ন সত্যিই ওই খেটে খাবার প্রসঙ্গই তুলছে।

চিহ্নটা কী রকম ?

বার্হস্পত্যসূত্রম[৩০], প্রবোধচন্দ্রোদয়[৩১] ইত্যাদি পুরোনো কালের একাধিক পুঁথিপত্রে লেখা আছে, লোকায়ত মত অনুসারে বার্তাই হলো একমাত্র বিদ্যা। (অবশ্যই, শুধু বার্তার কথাই নয়, তার সঙ্গে দণ্ডনীতিও।) লোকায়ত দর্শনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার ব্যাপারে এই সূক্ষ্ম সূত্রটি যে কতো জরুরী সে-কথায় আমরা বারবার ফিরতে বাধ্য হবো। আপাতত দেখা যাক, এই কথাটি থেকেই খেটে খাবার প্রসঙ্গ কেন উঠতে বাধ্য।

বার্তা মানে কী ? কৌটিল্য[৩২] বলছেন, বার্তা মানে হলো কৃষি, পশুপালন আর বাণিজ্য। অবশ্যই, বাণিজ্য বলতে আজকাল আমরা যা বুঝি কৌটিল্যের যুগেও,—অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় সোয়া তিন শ' বছর আগেও,—তাই বোঝাতো কিনা খুবই সন্দেহের কথা। কিন্তু সে-কথা ছেড়ে দিলেও এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো তর্ক উঠবে না যে বার্তা শব্দের মুখ্য অর্থ হলো চাষবাস।

তাহলে, লোকায়তিকদের কাছে চাষবাসের কথাটাই ছিলো সবচেয়ে জরুরী।

এই মনোভাবটির সঙ্গে দেশের শাসকশ্রেণীর মনোভাবটির যে কতোখানি তফাত তা স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। মনু[৩৩] বলছেন, ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃষিকাজ নিষিদ্ধ। একবার নয় আধবার নয়, বারবার বলছেন। আর শুধু মনুর আইনই নয়, পুরোনো কালের অন্যান্য আইনের বইতেও[৩৪] সরাসরি লেখা আছে যে বেদজ্ঞানের সঙ্গে কৃষিকর্মের সঙ্গতি নেই।

শ্রম বা কর্মজীবন সম্বন্ধে শাসক-সমাজের মনোভাবটা এইজাতীয় আইন-কানুন থেকেই আন্দাজ করা যাবে। এবং এইখান থেকে মূলসূত্র পেয়েই আরো একটি কথা বুঝতে পারা যাবে : ওই শাসক সমাজের দার্শনিক চেতনা যখন চূড়ান্ত ভাববাদের রূপ পেলো তখন কেন ঘোষিত হলো যে, যে-কোনো রকম কর্মই প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞানের পক্ষে অন্তরায় মাত্র[৩৫]।

ওরা কাজ করে

জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক নিয়ে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিলো। তার বিস্তারিত দলিলপত্র সংগ্রহ করা কঠিন নয়। সাধারণভাবে, দর্শনের একটি মূল সমস্যাকে বোঝবার জন্যে এই দলিলগুলি মহামূল্যবান। দর্শনের ওই মূল সমস্যাটি হলো বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের সমস্যা : চেতনা আগে না বস্তুজগৎ আগে, চেতনা প্রাথমিক না বস্তু প্রাথমিক ? আমাদের

দেশের দার্শনিক পরিভাষায় সমস্যাটা অনেক সময় চেতনকারণবাদ-বনাম-অচেতনকারণবাদ হিসেবে দেখা দিয়েছে: চেতনপদার্থকেই বা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই পরম সত্য বলবো, না, অচেতন পদার্থকেই পরম সত্য বলা হবে?

আমাদের দেশের দার্শনিক দলিলগুলিকে বিচার করলে দেখা যায়, চিন্তানায়কদের সঙ্গে স্বাভাবিক কর্মজীবনের যোগসূত্র যতোই বিচ্ছিন্ন হয়েছে ততোই তাদের চেতনা থেকে বিলুপ্ত হয়েছে বহির্বাস্তবের অমোঘ যাথার্থ্যের কথা। অর্থাৎ কিনা, কর্মকে নীচবৃত্তি মনে করতে পারবার দরুনই মানুষ ভাববাদের দিকে অগ্রসর হতে পেরেছে। কিন্তু সব মানুষই তো আর কর্মকে খাটো করতে পারে না। তাহলে যে সমাজ টিকবে না, পৃথিবীর বুক থেকে মানুষের চিহ্ন মুছে যাবে। অন্ন-উৎপাদনের দায়িত্বটা অন্তত একদল মানুষকে গ্রহণ করতেই হবে। বস্তুত, যতোক্ষণ না একদল মানুষ ওইভাবে অন্ন উৎপাদনের দায়িত্বটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে ততোক্ষণ পর্যন্ত আর একদলের পক্ষে এ-কাজকে হীন, অধমের লক্ষণ বলে মনে করা সম্ভবই নয়। তাই কর্মকে শুধু সেই শ্রেণীর মানুষই খাটো করতে পারে যে-শ্রেণী কিনা কর্মের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী দর্শনে সমাজের সব-শ্রেণীর মানুষের চেতনাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার বদলে পাওয়া যায় শুধু মাত্র সেই শ্রেণীর চেতনা যে শ্রেণী কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ না করেও অপরের কর্মফলটুকু উপভোগ করবার অধিকার পেয়েছিলো।

এই তত্ত্বটিকে বোঝবার জন্যে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দলিলপত্র এতো রয়েছে যে অন্য কোনো দেশে তা খুঁজে পাওয়া সম্ভবই নয়। তার কারণ, আমাদের দেশে সমাজ-ইতিহাসের ওই পর্যায়ের বিকাশ—যে-পর্যায়ে ধীরে ধীরে পরান্নজীবী শ্রেণীর উৎপত্তি—খুবই দীর্ঘদিনস্থায়ী হয়েছিলো। ফলে অজস্র রচনায় তা প্রতিফলিত হয়েছে। অন্য কোনো দেশে এমনটা হয়েছে কিনা খুবই সন্দেহের কথা। আর সেই কারণেই দলিলগুলি সত্যিই মহামূল্যবান। কেননা, ভারতীয় ইতিহাসে যে-কথা স্পষ্ট ও প্রকট ভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তারই সাহায্যে অন্যান্য দেশের ইতিহাসে যে-কথা অস্পষ্ট আর আবছা হয়ে গিয়েছে তা বুঝতে পারবার সুযোগ হতে পারে।

ভাববাদের উৎস নিয়ে আলোচনা তুলতে হবে। কিন্তু আমাদের যুক্তির এই অবস্থায় যেটুকু কথা একান্ত প্রাসঙ্গিক সেটুকু হলো, জনসাধারণের দর্শন আর বস্তুবাদী দর্শন এই দুটি কথা আমাদের ক্ষেত্রে কেন দুটো আলাদা নাম পায় নি।

যারা মাটি আঁকড়ে পড়ে ছিলো মাটির পৃথিবীটাকেই তারা সত্যি বলে

মেনেছে। লোকায়তিকদের কাছে বার্তা বা চাষবাসের চেয়ে বড়ো বিদ্যা আর কিছুই ছিলো না। আর তাই জন্যেই তাদের চেতনায় এই মূর্ত মাটির পৃথিবীই সবচেয়ে বড়ো সত্যি।

তাই বলছিলাম, খুব মোটা কথায় বললে বলা যায়, দেশের সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়ায় বিশ্বাস হারায় নি। আর তাই জন্যেই তারা বস্তুবাদী দর্শনকে অমনভাবে আপন করে নিয়েছিলো।

সত্যিই কী আশ্চর্য ওই 'লোকায়ত' নামটি। এই নামের মধ্যেই খেটে খাওয়ার ইঙ্গিতটুকুও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। কেননা, নামটার মূলে রয়েছে দুটি শব্দ: লোক + আয়ত। তার মধ্যে আয়ত কথাটা কী করে পাওয়া সম্ভব তাই ভাবতে ভাবতে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[৮৩] বলছেন 'আ + যৎ + অ' করে কথাটা সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। এখন 'আ' উপসর্গের অর্থ হলো 'সম্যক ভাবে'। আর 'যৎ' ধাতুর মানে হলো চেষ্টা করা, উদ্যম করা, কাজ করা। তাই আয়ত বলতে 'সম্যকভাবে চেষ্টা করবার' অর্থও বোঝাতে পারে বই কি। এই তো গেলো 'আয়ত' শব্দের মানে। আর ওই 'লোক' বলে কথাটার মানে কী? এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্‌[৮৪] বলছেন, 'লোক' কথাটির সঙ্গে লাতিন শব্দ *lucus* এবং লিথুনিয়ান *laucus* শব্দের তুলনা করা যায়। লিথুনিয়ান শব্দটির মানে, চাষের জমিই। আর লাতিন শব্দটির মানে, a clearing of forest—চাষের জন্যে জঙ্গল-সাফ-করা জায়গা। সংস্কৃততেও 'লোক' শব্দের আদি ও অকৃত্রিম অর্থের সঙ্গে যে চাষের-জমির সম্পর্ক ছিলো না, এমন কথাও খুব জোর করে বলা যায় না। কেননা মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্‌-ই বলছেন, শুরুতে লোক শব্দের আগে একটা উ থাকতো—উলোক। এই উলোক = উরুলোক। এবং তার মানেই হলো জমি, মাঠ ইত্যাদি।

তাই লোকায়ত মানেও যা, বার্তাকেই একমাত্র বিদ্যা মনে করাও তাই। একই কথা। কৃষকদের কথা।

ওরা কাজ করে। ওরা মাটির বুকে ফসল ফলায়। তাই ওদের চেতনার নাম হলো লোকায়ত।

লোকায়ত-দর্শন আজো বিলুপ্ত হয় নি

বিপক্ষের লেখায় ঘৃণা আর বিদ্রূপের খোরাক যোগাবার মতো দু'চারটে টুকরো কথা বাকি রেখে এই বার্তা-বাদী সম্প্রদায়টির সমস্ত লিখিত পুঁথি দেশ থেকে

বিলুপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু ওই বার্তা-নিরত মানুষগুলি? তারা তো আর সত্যিই সেই সঙ্গে দেশ থেকে বিলুপ্ত হয় নি। তাই লোকায়তিক পুঁথিপত্র দেশ থেকে বিলুপ্ত হলেও লোকায়তিক চেতনাটি বিলুপ্ত হবার কথা নয়।

আর সত্যিই তা হয় নি।

এই সত্যটি আবিষ্কার করলেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর আবিষ্কার সাম্প্রতিক ভারততত্ত্বে এক প্রকাণ্ড বিস্ময়।

তিনি,—এবং বোধহয় তাঁর মতো বড়ো ভারততাত্ত্বিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম,—অনুভব করলেন যে শুধুমাত্র লিখিত দলিলের রাজ্যে বাস করে দেশের চিন্তাধারার পুরো পরিচয় পাওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়। তাছাড়াও তিনি বুঝেছিলেন যে, যে-মুষ্টিমেয় মানুষ সমাজের সদর-মহলকে আলো করে রেখেছেন,—যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা গুণী, যাঁরা বিদ্বান, যাঁরা বিদগ্ধ,—শুধুমাত্র তাঁদের ধ্যানধারণার খবর পেলেই দেশের ধ্যানধারণাগুলিকে পুরোপুরি জানা সম্ভব হবে না। কেননা, দেশের পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলগুলিতে এবং সমাজের নিচের তলায় মানুষদের মধ্যে আজো বেঁচে রয়েছে এমন সব ধ্যানধারণা যার সঙ্গে উপরতলার আভিজাতিক ধ্যানধারণাগুলির মিল হয় না। এবং মহামহোপাধ্যায়ের পক্ষে যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার সেটা হলো, দেশের ওই পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলগুলিতে, ওই ছোটো জাতের মানুষদের মনে, যে-চেতনা আজো সত্যিই বেঁচে রয়েছে তা আসলে লোকায়তিক চেতনাই। মহামহোপাধ্যায় লিখছেন :

> The influence of the Lokayatikas and the Kapalikas is still strong in India. There is a sect and a numerous one too, the followers of which believe that *deha* or the material human body is all that should be cared for, and their religious practices are concerned with the union of men and women and their success (*siddhi*) varies according to the duration of the union. They call themselves *Vaisnavas*, but they do not believe in *Vishnu* or *Krishna* or their incarnations. They believe in *deha*. They have another name *Sahajia*, which is the name of a sect of Buddhists which arose from Mahayana in the last four centuries of their existence in India.[৩৮]

অর্থাৎ, ভারতবর্ষে আজো লোকায়তিক আর কাপালিকদের প্রভাব খুব প্রবল। আজো এমন অনেক সম্প্রদায় টিকে রয়েছে যার অনুগামীরা মনে করে দেহই হলো একমাত্র সত্য; তাদের ধর্মে স্ত্রী-পুরুষের মিলনই একমাত্র অনুষ্ঠান এবং তাদের মতে সিদ্ধি নির্ভর করছে এই মিলনের দীর্ঘস্থায়িত্বের উপর।

তারা নিজেদের বৈষ্ণব বলে; কিন্তু বিষ্ণু বা কৃষ্ণ বা তাঁর কোনো অবতার তারা মানে না। তারা বিশ্বাস করে শুধু দেহতে। তাদের আর একটা নাম হলো সহজিয়া, ভারতবর্ষে শেষ চার শতাব্দী ধরে মহাযান বৌদ্ধদের যে-অস্তিত্ব ছিলো তার থেকেই এ-নামের সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিলো।

মহামহোপাধ্যায়-এর এই শেষ মন্তব্যটি স্পষ্টভাবে বোঝা গেলো না। তিনি বলছেন, লোকায়ত মত-ই আজো নানান নামের অন্তরালে, নানান সম্প্রদায় হিসেবে, আমাদের দেশে টেকে রয়েছে। তার মধ্যে একটির নাম হলো সহজিয়া। আবার, সেই সঙ্গেই তিনি বলছেন, এই সহজিয়া নামটাই মহাযানী বৌদ্ধদের একটি সম্প্রদায়ের নাম। এ-কথা কেমনভাবে সম্ভব হতে পারে? কিংবা, যদি সত্যিই তাই হয় তাহলে বৌদ্ধদের সঙ্গে লোকায়তিকদের সম্পর্কটা ঠিক কী রকম? মহামহোপাধ্যায়ের মন্তব্য থেকে এই জাতীয় নানান প্রশ্ন ওঠে।

কিন্তু এ-সব প্রশ্নের চেয়ে ঢের আকস্মিক মনে হবে ওইভাবে একনিশ্বাসে লোকায়তিকদের নামের সঙ্গে কাপালিকদের নাম উল্লেখ করা। শুধু তাই নয়, মহামহোপাধ্যায় বলছেন, লোকায়তিক সম্প্রদায়গুলি যে-ভাবে আজো আমাদের দেশে টেকে আছে, তারা শুধুই যে দেহতত্ত্বে আস্থাবান তাই নয়, তাদের আর একটি পরিচয় হলো কামসাধনা: স্ত্রী-পুরুষে মিলন।

তার মানে, খুব ব্যাপকভাবে আমরা যে-মতবাদগুলিকে বলি তান্ত্রিক মতবাদ। বামাচার।

কিন্তু বস্তুবাদের সঙ্গে এই বামাচারের সম্পর্ক কী? এ-প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কেননা, মহামহোপাধ্যায় যে ওইভাবে বামাচারী কাপালিকদের সঙ্গে লোকায়তিকদের এক করে দিচ্ছেন তার পেছনে রয়েছে পুরোনো পুঁথির নজির। পুরোনো পুঁথিতে লেখা আছে, লোকায়ত আর কাপালিক একই।[৩৯] এ-নজিরকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বামাচার-এর তাৎপর্য

তাহলে লোকায়ত দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে হলে নানান রকমের প্রশ্ন না তুলে উপায় নেই। প্রথমত, বিপক্ষের লেখায় লোকায়তিকদের সম্বন্ধে যে সব ছোটো ছোটো বিচ্ছিন্ন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে শুধুমাত্র সেগুলি থেকেই লোকায়ত দর্শনের বিলুপ্ত রূপটিকে খুঁজে পাবার আশা নেই। পুঁথির গণ্ডি

পেরিয়ে দেশের মানুষদের দিকেও চেয়ে দেখতে হবে—বিশেষ করে সেই সব মানুষদের, যারা চাষ করে। কেননা, তাদের মধ্যে লোকায়ত দর্শন আজো বেঁচে রয়েছে,—যদিও সমাজের সদরমহলের বিদগ্ধ পুঁথিপত্রের আসরে কোনো এককালে তার যে-স্থান ছিলো সে-স্থান আজ আর নেই।

এইভাবে লোকায়ত-দর্শনের উৎস সন্ধানে বেরুলে দেখা যায় বামাচারী মতামত ও আচার-আচরণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আর ঠিক এইখানটিতে এসেই যেন ঠেকে যেতে হয়। কেননা, আমাদের আজকালকার শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিবোধের কাছে ওই সব মতবাদ ও আচরণের মতো কদর্য ও বিকৃত ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না।

তাহলে উপায়? আমাদের আধুনিক রুচিবোধের খাতিরে লোকায়তের উৎস অনুসন্ধানটাকে কি ছেড়ে দিতে হবে?

অবশ্য, আর একটা সম্ভাবনাও বাকি থাকে। এমন তো হতেই পারে যে আমাদের রুচিবোধ, নীতিবোধ নেহাতই একালের ব্যাপার। অর্থাৎ কিনা, সমাজ-বিকাশের উন্নততর পর্যায়ের অবদান। অপরপক্ষে, বামাচারী মতাদর্শ সেকালের ব্যাপার। যদিও আজকের দিনেও তা টেকে রয়েছে তবুও তা অনেকাংশেই আজকের পৃথিবীরই আনাচে-কানাচে আদিম মানুষদের পক্ষে টেকে থাকবার মতোই। তার মানে এ-ধরনের ধ্যানধারণার উৎস সমাজ-বিকাশের অনেক পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের মধ্যে। একালের রুচিবোধ ও নীতিবোধকে সেকালের পক্ষেও সত্য বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই। আর যদি তাই হয় তাহলে এমনটা হওয়া সত্যিই অসম্ভব নয় যে, যে-উদ্দেশ্য থেকে সমাজের ওই পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে বামাচারী ধ্যানধারণার জন্ম হয়েছিলো তা বুঝতে পারা যাবে না শুধুমাত্র আধুনিক কালের লাম্পট্য-ব্যবহারকে মনে রাখলে।

কিন্তু এই বামাচারী ধ্যানধারণাগুলির উৎস সন্ধান করা যাবে কী ভাবে? কোন সূত্রে এগিয়ে?

সিদ্ধিদাতার অনুসরণে

খবর পাওয়া গেলো, তান্ত্রিক সাহিত্যের আসর জমিয়ে রয়েছেন খোদ গণেশ বা গণপতি। তন্ত্ররাজ্যে তাঁর এমনই খ্যাতি[১] যে অষ্টশতনামের মহিমা না জুটলেও অন্তত পঞ্চাশটি[২] চিত্তাকর্ষক নাম তাঁর নিশ্চয়ই জুটেছিলো।

তাই আশা হলো, সিদ্ধিদাতার শরণাপন্ন হলে হয়তো তন্ত্র-রহস্যও বুঝতে পারা অসম্ভব হবে না।

আর সত্যিই যেন সিদ্ধিদাতা! আপনি যদি গণপতির পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগোতে থাকেন তাহলে সেকালের ভারতবর্ষের কতো অপরূপ দৃশ্যই না দেখতে পাবেন—দেখতে পাবেন কতো সব আশ্চর্য মানুষ, কতোই না তাদের আশ্চর্য বিশ্বাস।

এমনকি, ভারতীয়-দর্শনের অনেক জটিল রহস্যের কিনারা পাবার চেষ্টাকে এই গণপতিই হয়তো শেষ পর্যন্ত সফল করতে পারেন।

শুধুমাত্র সংকীর্ণ অর্থে লোকায়তিক বা চার্বাক দর্শনের সমস্যার কথাই বলছি না। বামাচারী ধ্যানধারণার উৎস নিয়ে সমস্যাটুকুও নয়। সিদ্ধিদাতার শরণাপন্ন হলে ভারতীয় দর্শনের আরো অনেক জটিল প্রশ্নের কিনারা হতে পারে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বিশেষ করে দুটি বিষয় সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়েছে।

প্রথমত, লোকায়তিকদের সঙ্গে সাংখ্য-দর্শনের সম্পর্ক।

দ্বিতীয়ত, লোকায়তের সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যের সম্পর্ক।

বিষয় দুটি কেন অতো বিস্ময়কর মনে হয়েছে এখানে তার সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যায়।

লোকায়ত ও সাংখ্য

এক : সাংখ্য। সাংখ্য-দর্শনের মূল কথাগুলি সামগ্রিকভাবে ভারতীয় চিন্তাধারাকে কতোখানি প্রভাবিত করেছে সে-কথা ভারতীয় দর্শনের ছাত্রমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু এর জন্মবৃত্তান্ত আজো অস্পষ্ট—বেলভেকার[১১], রানাডে[১২], জনস্টন[১৩] প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতেরা সে-বৃত্তান্তের সন্ধানে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত কী রকম যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন,—খুব জোর গলায় কোনো কথা বলতে পারছেন না। তার প্রধান কারণ হলো, এ-বিষয়ে প্রাচীন পুঁথিপত্রের কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশকে এঁরা সকলেই অগ্রাহ্য করছেন। একটি নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে, জৈনদের লেখা থেকে। সূত্র-কৃতাঙ্গ-সূত্র[১৪] নামের জৈন পুঁথিতে লোকায়ত নাস্তিকদের ঠিক পরেই সাংখ্য মতের আলোচনা তোলা হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গেই ভাষ্যকার শীলাঙ্ক[১৫] বলছেন, লোকায়ত ও সাংখ্যের মধ্যে খুব কিছু তফাত নেই।

কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কেননা এই নিরীশ্বর-প্রধানকারণবাদের সঙ্গে পরের যুগে ঈশ্বরতত্ত্ব জুড়ে দিয়ে একে যতোই আস্তিক সাজাবার চেষ্টা করা হোক না কেন, আদি অকৃত্রিম অবস্থায় এর সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের সম্পর্ক যে ছিলোই না এ-কথা আশা করি ভারতীয় দর্শনের ছাত্রমাত্রেই স্বীকার করবেন। মূল সাংখ্যের সঙ্গে লোকায়তিকদের ঘনিষ্ঠতার কথা পুরোনো কালেরই আরো কিছু কিছু বইতে স্পষ্টভাবে রয়েছে। সেগুলির আলোচনা পরে তোলা হবে।

আপাতত যে-কথা হচ্ছিলো : সিদ্ধিদাতা গণেশই আমাদের মনে করিয়ে দেন, আজ আমরা ব্যাপক অর্থে যে-সব ধ্যানধারণাকে বামাচারী বলে উল্লেখ করে থাকি তার সঙ্গে মৌলিক সাংখ্যের সম্পর্ক ছিলো কি না তা ভালো করে ভেবে দেখা দরকার।

প্রথমে দেখা যাক, তান্ত্রিক শক্তিবাদের সঙ্গে সিদ্ধিদাতার সম্পর্কটা কী রকম?

গোপীনাথ রাও-এর[৭৩] 'এলিমেণ্টস্ অব হিন্দু আইকনোগ্রাফি'-র পাতা ওল্টালেই চোখে পড়বে ভারতবর্ষের কতো জায়গায় কতো দেবালয়ে আজো গণেশকে দেখতে পাওয়া যায় এক নগ্ন নারীমূর্তির সঙ্গে মৈথুনরত অবস্থায়। এই মূর্তিগুলির নাম শক্তি-গণপতি। অবশ্যই আজকের দিনে আমি-আপনি গণেশকে ওই অবস্থায় দেখে চোখ নামিয়ে নেবো, কিন্তু যাঁরা ওই মূর্তি রচনা করেছিলেন তাঁদের মনে আধুনিক যুগের, আধুনিক সমাজের, রুচিবোধ বা নীতিবোধ নিশ্চয়ই ছিলো না। কেননা তাহলে তাঁরা এ-জাতীয় মূর্তিকে অন্তত দেবালয়ে স্থান দিতে পারতেন না। তাই প্রাচীন কালের,—অর্থাৎ কিনা, সমাজবিকাশের অতি প্রাচীন স্তরের—ধ্যানধারণাগুলিকে বুঝতে হলে এই শক্তি-গণপতির সাক্ষ্যকেও তো সত্যিই উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। শক্তিকে ওইভাবে আঁকড়ে ধরে গণপতি যেন বলছেন : এই হলো সৃষ্টির মূলতত্ত্ব,—সৃষ্টিরহস্য যদি জানতে চাও তাহলে এই শক্তিকে চেনো।

সৃষ্টির মূলে শক্তি। নারী। প্রকৃতি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওই শক্তির সঙ্গে সাংখ্যের প্রকৃতির কি কোনো মিল নেই? আপনি বলবেন, সাংখ্যের প্রকৃতি নেহাতই অমূর্ত দার্শনিক ধারণামাত্র, আমাদের দেশের মানুষ তাকে কখনোই তান্ত্রিক শক্তির মতো মূর্ত নারীমূর্তি হিসেবে কল্পনা করে নি।

কিন্তু আজকের দিনে এ-কথাও আপনি খুব জোর গলায় বলতে পারবেন না। কেননা, সিন্ধু আর ইরাবতীর কিনারা থেকে হাজার কয়েক বছরের পুরোনো ধুলো সরিয়ে সম্প্রতি নানারকম নারীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এবং অন্তত স্যর জন মার্শেল[৭৭] তো দাবি করছেন, এগুলিকে

প্রকৃতিমূর্তি বলেই সনাক্ত করতে হবে। তাছাড়া মনে রাখবেন, ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্বমূলক কাজ যতোখানি হওয়া দরকার তার তুলনায় কিছুই যেন হয় নি। তাই কোনখানে মাটির তলায় যে কোন ধরনের সাক্ষী পা চাকা দিয়ে রয়েছে তার হদিস সত্যি আমরা জানি না। দেশে যে ঠিক কী নেই এ-কথা বলবার আগে কিছুটা হুঁশিয়ার হওয়া দরকার।

লোকায়ত ও বৈদিক ঐতিহ্য

দুই : লোকায়তিক চেতনার সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যের সম্পর্ক। সিদ্ধিদাতাকে অনুসরণ করতে করতেই এ-বিষয়ে যে-তথ্য পাওয়া যায় তা সত্যিই পরমাশ্চর্য। কথাটা একটু খুলেই বলি।

বৈদিক ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। উত্তর যুগে যাঁরা এ-ঐতিহ্যের বাহক বলে নিজেদের পরিচয় দিলেন তাঁরা লোকায়তিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে ঘৃণায়-বিদ্বেষে মুখর। এবং লোকায়তিকদের পক্ষ থেকেও বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে যে বিদ্রূপ তাও কম তীক্ষ্ণ নয়। উত্তরকালের এই পরিস্থিতি দেখে মনে হয় লোকায়তের সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্কই নেই। কিংবা যা একই কথা, সম্পর্কটা নেহাতই অহিনকুলের মতো।

কিন্তু সিদ্ধিদাতার পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগোতে এগোতে দেখা গেলো, উত্তরকালের এই পরিস্থিতিটি সনাতন নয়,—নিছক উত্তরকালেরই ব্যাপার। তার মানে, সুদূর অতীতে লোকায়তিক চিন্তাধারার সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যের বিরোধ ছিলো কিনা তা একান্তই সন্দেহের কথা। কেননা, বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই লোকায়তিক ধ্যানধারণার রাশিরাশি চিহ্ন থেকে গিয়েছে। তার মানে, বৈদিক চিন্তাধারারও একটা ইতিহাস আছে। এবং সে-ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় উত্তর যুগে এ-ঐতিহ্যের বাহকেরা যে-সব ধ্যানধারণাকে ঘৃণার চোখে দেখতে শিখেছিলেন, আদিকালে তাঁদেরই পূর্বপুরুষেরা ওই সব ধ্যানধারণাকেই সত্য বলে মনে করেছেন।

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ নামের যে সাহিত্যরাশি তা রাতারাতি রচিত হয় নি, অনেক যুগ সময় লেগেছিলো,—ঠিক যে কতো শতাব্দী তার নিখুঁত হিসেব দেবার মতো ঐতিহাসিক গবেষণা এখনো বাকি আছে। কিন্তু সন-তারিখের হিসেব নিয়ে সুনিশ্চিত হতে না পারলেও অন্তত এটুকু কথা জোর গলায় বলবার মতো দলিল রয়েছে যে ওই কয়েক শতাব্দী ধরে বৈদিক মানুষেরা একই রকমের সমাজ-ব্যবস্থায় বাস করেন নি। তাঁদের সমাজজীবনে অনেক অদলবদল হয়েছে এবং সেই

অদলবদলের পরিণাম হিসেবেই তাঁদের ধ্যানধারণাতেও অনেক রকম মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। এইভাবে বদলাতে বদলাতে বৈদিক ঐতিহ্য শেষ পর্যন্ত উপনিষদের অধ্যাত্মবাদের রূপ পেলো, এবং তারো অনেক পরের যুগে শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিকেরা নিজেদের চূড়ান্ত ভাববাদী দর্শনকে পেশ করবার সময় প্রচার করবার প্রাণপাত চেষ্টা করলেন যে তাঁদের ভাববাদটা নিছক ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক চিন্তাই। বেদের শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো বলেই উপনিষদের আর একটি নাম বেদান্ত। এবং, শঙ্কর প্রমুখ দার্শনিকদের রচনা সাধারণভাবে দেশে এই ধারণাই সৃষ্টি করেছে যে বৈদিক সাহিত্যের আগাগোড়াই বুঝি ওই রকমের নিটোল অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদ।

সিদ্ধিদাতা কিন্তু এই ধারণাটিকে সন্দেহ করতে শেখান। কেননা, গণপতিকে দেখতে পাবেন খোদ সংহিতাসাহিত্যের মধ্যেই। ঋগ্বেদ[68]-এ পাবেন। যজুর্ব্বেদ[69]-এ পাবেন। এবং, যেটা আরো বিস্ময়কর ব্যাপার, ঋগ্বেদ[70]-এ দেখবেন স্বয়ং বৃহস্পতির সঙ্গে গণপতির কোনো তফাত নেই। কথাটা জরুরী। কেননা, লোকায়ত দর্শনের আদিগুরু বলে যাঁর খ্যাতি তাঁর নামও বৃহস্পতিই।

আপত্তি উঠবে, নামে কী এসে যায়? ঋগ্বেদের ওই বৃহস্পতির সঙ্গে লোকায়ত-দর্শনের সত্যিই কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা খুবই সন্দেহের কথা। অন্তত কোনো রকম বাস্তব সম্পর্ক আজো ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয় নি।

তা অবশ্য হয় নি। কিন্তু এতোদিন ধরে দেশে যে-ঐতিহ্যটা চলে আসছে তাকেও এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া তো যায় না।

তাছাড়া, কথা হলো বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে লোকায়তিক ধ্যানধারণার সম্পর্ক শুধুমাত্র ওই নামটিকে আশ্রয় করেই নেই। বস্তুবাদী চেতনার,—এমনকি ওই বামাচারী চেতনারও,—অজস্র স্মারক বৈদিক সাহিত্যে ছড়ানো রয়েছে। এতো অজস্র যে সেগুলিকে খুঁজে পাবার জন্যে খুব বড়োসড়ো বেদজ্ঞ পণ্ডিত হবারও প্রয়োজন নেই। এই বই-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই এ-ধরনের কিছু কিছু চিহ্ন বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি।

ভাবাজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্র

অথচ, আশ্চর্যের ব্যাপার বলতে হবে, দেশবিদেশের এতো বড়ো বড়ো সংস্কৃতজ্ঞরা বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে অমন নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও

এই জাতীয় চিহ্নগুলির তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনাই তোলেন নি। অনুমানে মনে হয়, তার আসল কারণ হলো তাঁরা একালের ধ্যানধারণাকেই একমাত্র সম্বল করে বৈদিক-সাহিত্য পাঠ করেছেন। ফলে, ওই স্মারকগুলির,—বিশেষ করে বামাচারের স্মারকগুলির,—কোনো রকম তাৎপর্য নির্ণয় করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি: অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা বৈদিক সাহিত্যের শুধু শব্দ-রাশিই গ্রহণ করেছেন। কেননা, বৈদিক সাহিত্য আর যাই হোক একালের ব্যাপার নয়। তাই শুধুমাত্র একালের ধ্যানধারণার সাহায্য নিলেই বৈদিক শব্দরাশি সম্বন্ধে হাজার স্পষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বৈদিক চিন্তাজগতের পুরো খবরটা পাওয়া সম্ভব হবে না। আর্থার এ্যাভেলন, ওরফে স্যর জন উড্রফ্[১১], তন্ত্র-প্রসঙ্গেই বলেছিলেন, শুধুমাত্র ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে হিন্দুশাস্ত্র বুঝতে পারা যাবে না, ভাষাজ্ঞান ছাড়াও আরো কিছুর দরকার আছে:

> ...more is required for the understanding of a Hindu Shastra than linguistic talent, however great.

বলাই বাহুল্য, ভাষাজ্ঞানকে কোনো ভাবে ছোটো করবার চেষ্টায় তাঁর এই উক্তি উদ্ধৃত করছি না। বস্তুত, ভারতীয় পুঁথিপত্র বোঝবার ব্যাপারে দেশ-বিদেশের দিকপাল বিদ্বানেরা গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে অসামান্য পরিশ্রম এবং অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তার উপর নির্ভর করতে না পারলে আজ আমরা অনেকাংশেই অন্ধ হয়ে থাকতাম। কিন্তু প্রাচীনেরাই বলেছেন, বেদবেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবার পথে শব্দার্থরাশি-গ্রহণ প্রথম সোপান হলেও সব নয়[১২], তারপর আরো কিছুর দরকার পড়ে।

বৈদিক সাহিত্য বিচারে এ-কথা যে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা প্রতিপদেই দেখতে পাবো। আর সেই সঙ্গে দেখতে পাবো, ঠিক কোন অর্থে কথাটা সত্যি। কেননা, প্রাচীনেরা যে-অর্থে কথাটা বলতেন তা ঠিক নয়।

এখানে অবশ্যই সব কথা আলোচনা করা যাবে না: বাক্যজন্য-জ্ঞান ছাড়াও প্রাচীন পুঁথিপত্রকে বোঝবার জন্যে আরো কী প্রয়োজন, শুধুমাত্র তার ইঙ্গিতটুকু দেওয়া যায়।

কিসের প্রয়োজন? একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির। তাই সমস্যা হলো, কোথা থেকে তা পাওয়া যাবে?

সমস্যাটা যদি কেবল আমাদের দেশের পুরোনো পুঁথিপত্রের তাৎপর্য খোঁজবার সমস্যা হতো তাহলে না হয় অন্য কথা ছিলো। কিন্তু তা নয়। যে-কোনো দেশেরই পুরোনো কালের পুঁথিপত্র বোঝবার ব্যাপারে সমস্যা ওঠে,

এবং মানবজাতির অভিজ্ঞতাটা যেহেতু সবদেশেই মোটের উপর এক ধরনের সেইহেতু সব দেশের বেলাতেই এ-সমস্যা মোটামুটি একই।

সমস্যাটা মোটের ওপর সমান বলে এমন তো হতেই পারে যে আমাদের দেশের পুরোনো পুঁথিপত্রগুলিকে বোঝবার জন্যে অন্য কোনো দেশের পুঁথিপত্র নিয়ে আলোচনা খুবই জরুরী হবে। কেননা যদি কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে অন্য কোনো দেশের পুরোনো দলিল নিয়ে আলোচনা সার্থক হয়ে থাকে তাহলে সেই পদ্ধতির প্রয়োগ করেই প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার অনেক দুর্বোধ্য বিষয় আমরা হয়তো বুঝতে পারবো।

আর এইদিক থেকেই আমার সবচেয়ে বড়ো ঋণ অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের কাছে। যদিও তিনি ভারততত্ত্ববিদ্‌ নন, সংস্কৃতজ্ঞ নন,—গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। বস্তুত আজকের পৃথিবীতে তাঁর মতো বড়ো গ্রীকতত্ত্ববিদ খুব কমই আছেন।

বৈদিক সাহিত্য নিয়ে আমরা যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হই অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন গ্রীক সাহিত্য নিয়েও মোটের উপর তার অনুরূপ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত কোন পদ্ধতির সাহায্যে তিনি এ-সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন তার আলোচনা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই করেছি। কেননা, এই পদ্ধতির কথাটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এবং আমার স্থির বিশ্বাস, একালের ওই গ্রীকতত্ত্ববিদের অভিজ্ঞতা থেকে ভারততত্ত্ববিদেরাও যদি লাভবান হতে রাজী হন তাহলে ভারততত্ত্বের আলোচনাতেও যুগান্তর আসবে। ব্যক্তিগত সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েও আমি যে প্রাচীন পুঁথিপত্রের নানান রকম দুর্বোধ্য কথাবার্তার অর্থ নির্ণয়ে সাহসী হয়েছি তা প্রধানত এই পদ্ধতির সাহসেই।

কিন্তু যে-কথা হচ্ছিলো: বৈদিক সাহিত্যে লোকায়তিক চেতনা এবং এমন কি বামাচারী ধ্যানধারণার স্মারক নিয়ে কথা। এ-ধরনের স্মারক যে অজস্র রয়েছে তার প্রমাণ হলো বৈদিক সাহিত্যই, নমুনা দেখা যাবে পরের পরিচ্ছেদে। অথচ, উত্তরকালে আমাদের দেশে বৈদিক ও লোকায়তিক ঐতিহ্য এমনই বিরুদ্ধ হয়েছে যে খোদ বৈদিক সাহিত্যেই এ-জাতীয় স্মারক গর্বের মধ্যে ভূতের মতো মনে হতে পারে। এমন ব্যাপার কী করে সম্ভবপর হলো?

মানুষ আর মানুষের ধ্যানধারণা

আপনি যদি মানুষের কথা বাদ দিয়ে মানুষের ধ্যানধারণাগুলিকে বোঝবার চেষ্টা করেন তাহলে এ-সমস্যার, এবং এই জাতীয় আরো অনেক সমস্যার, কোনোদিনই কোনো রকম কিনারা খুঁজে পাবেন না।

আপনি যদি মানুষের কথা মনে রেখে মানুষের ধ্যানধারণাগুলিকে বুঝতে রাজী হন তাহলে এ-সমস্যার, এবং এই রকম আরো অনেক সমস্যার, কিনারা খুঁজে পাবেন।

তাহলে শুরুতেই ঠিক করা দরকার, কোন পথে এগোবার চেষ্টা করবো।

আমাদের দেশে অনেকদিন ধরেই বলা হয়েছে, বেদ অপৌরুষেয়। অর্থাৎ কিনা, কোনো মানুষের রচনা নয়। এই কথা যে ঠিক নয় আশা করি তা খুব বড়ো করে আলোচনা করবার দরকার নেই। আধুনিক পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই একমত হয়ে বলবেন, এটা নেহাতই সেকেলে কুসংস্কার। কেননা খ্রীষ্টান পৃথিবীতেও আজকাল যে-রকম মেরী মাতার বিশুদ্ধ গর্ভধারণের বিস্ময়কর কাহিনীতে বিশ্বাস ক্ষয়ে গিয়েছে হিন্দু পৃথিবীতেও সেই রকম বেদের অপৌরুষত্বে বিশ্বাস শুকিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ওই একই কুসংস্কার কী ভাবে অন্য মূর্তিতে আজকের দিনেও অনেক বিদ্বানের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা ভালো করে দেখা দরকার।

কেউ কেউ মনে করেন, ধ্যানধারণার আলোচনায় শুধুমাত্র ধ্যানধারণার কথাটুকুই প্রাসঙ্গিক। তাই যাদের মাথায় এই ধ্যানধারণাগুলি এসেছিলো তারা কী খেতো, কী পরতো, কেমনভাবে বাঁচতো, অন্যান্য মানুষদের কোন চোখে দেখতো,—এই জাতীয় প্রশ্ন তোলা অবান্তর। যাঁরা আজো এ-কথা বলেন তাঁরা আসলে ওই পুরোনো কুসংস্কারেরই এক আধুনিক সংস্করণে আস্থাবান। কেননা ধ্যানধারণাগুলিকে এই চোখে দেখতে গেলে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতেই হবে ওগুলি যেন স্বয়ম্ভু, নিরালম্ব—আকাশে ফোটা ফুলের মতো। কিন্তু আকাশকুসুমটা ঠাট্টার কথা, বাস্তবের বর্ণনা নয়। কেননা আকাশে সত্যিই ফুল ফোটে না। তেমনি, আসমান থেকে ধ্যানধারণার জন্ম হয় না, শুধুমাত্র মানুষের মাথাতেই ধ্যানধারণার বিকাশ হয়। এবং সেগুলির উৎসে রয়েছে মানুষের পারিপার্শ্বিক। ধ্যানধারণার আলোচনা তাই যাদের ধ্যানধারণা তাদের কথা এবং তাদের মূর্ত পারিপার্শ্বিকের কথা বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

ধ্যানধারণাগুলিকে খিলানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। খিলান শূন্যে ভর করে থাকতে পারে না, তার জন্যে ভিত্তিস্তম্ভ প্রয়োজন। এই ভিত্তিস্তম্ভ হলো মানুষের মূর্ত সমাজজীবন। ধ্যানধারণাকে এইভাবে বোঝবার চেষ্টার নাম দেওয়া হয় ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা[৩]। আজকের দিনে অবশ্য নানা কারণে এবং নানাভাবে এই ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হয়।

অথচ, এ-ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করাও যা বেদকে অপৌরুষেয় মনে করাও তাই। একই কুসংস্কার, শুধু রূপের তফাত—একটা সেকেলে, অপরটা একেলে। কিন্তু দু'-এরই মূল কথাটা হলো মানুষকে বাদ দিয়েও মানুষের ধ্যানধারণাকে বোঝা সম্ভবপর—ধ্যানধারণাগুলো যেন স্বয়ম্ভু, গগনকুসুমের মতো।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে সত্য বলে মেনে অগ্রসর না হলে ভারতীয় দর্শনের নানা দুর্বোধ্য সমস্যার কোনো কিনারা করার চেষ্টাই অসম্ভব। কেন? তা বলবার অবকাশ পাবো পুরো বইটি জুড়েই। আপাতত, বৈদিক সাহিত্যে লোকায়ত ও বামাচারী চিন্তাধারার বিস্ময়কর স্মারকগুলির প্রসঙ্গে কথাটা যতোটুকু ওঠে শুধু সেইটুকুর উল্লেখ করা যায়।

ধর্মবিশ্বাসের আগে

আপাত দৃষ্টিতে দেখলে এই স্মারকগুলিকে যতো বিস্ময়করই মনে হোক না কেন, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় আস্থা নিয়ে অগ্রসর হলে আর তেমন বিস্ময়কর মনে হয় না। কেননা, ওই বৈদিক ধ্যানধারণার মতোই লোকায়তিক ও বামাচারী ধ্যানধারণাগুলিও সত্যিই অপৌরুষেয় নয়—সমাজ-বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে মানুষের মাথায় এগুলি দেখা দিয়েছিলো। বামাচারের কথাই বিশেষ করে বলি। আধুনিক চোখে দেখলে মনে হয়, শুধুমাত্র বীভৎস কামবিকার। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার ঠিক কোন পর্যায়ে এগুলির উৎস তা যদি খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হয় তাহলে আর এগুলিকে কামবিকার বা লাম্পট্য-ব্যবহার বলে মনে করবার কোনো অবকাশই থাকে না। কেননা, সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বোঝা যায় এগুলি সেই সমাজের মানুষের কাছে শুধুই যে উদ্দেশ্যমূলক তাই নয়, বাঁচা-মরার সমস্যার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সমাজ-বিকাশের সেই পর্যায় থেকে

এগুলিকে উপড়ে যদি আজকের সমাজে, কিংবা সমাজ-বিকাশের কোনো পরবর্তী পর্যায়ের আবহাওয়ায়, নিয়ে আসবার চেষ্টা করা যায় তাহলে অবশ্যই ওই আদি-গুরুত্বের দিকটা মরে যাবে, মুছে যাবে—যা ছিলো উদ্দেশ্যমূলক তাই হয়ে দাঁড়াবে উদ্দেশ্য-বিরোধী কামবিকার। অর্থাৎ কিনা ধ্যানধারণাগুলি বিপরীতে পরিণত হবে। যেমনটা হয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকাংশ লিখিত পুঁথিপত্রের বেলায়। কিন্তু ওই বামাচারী ধ্যানধারণাগুলির উৎস সমাজ-বিকাশের যে-পর্যায়ে তা লেখার হরফ আবিষ্কার হবার আগেকার পর্যায়। তাই বামাচারকে বোঝবার জন্যে তন্ত্রশাস্ত্রের লিখিত পুঁথিপত্রগুলিকে একমাত্র সম্বল মনে করলে আধুনিক গবেষক ভুল করবেন।

আরো কথা আছে। সমাজ-বিকাশের সেই প্রাচীন পর্যায়টির কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখলে বোঝা যায়, সে-অবস্থায় মানুষের মাথায় ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারা জন্মাবার অবকাশই পায় নি। হয়তো, সেই স্তরের চিন্তাধারাকে কোনো রকম দার্শনিক সংজ্ঞা দিতে যাওয়া ভুল হবে। কেননা, এ-চেতনা বহুলাংশেই অস্ফুট ও অব্যক্ত। এই স্তরের চেতনায় বাস্তব প্রকৃতির বাস্তব নিয়মকানুন সম্বন্ধে মানুষের প্রকৃত জ্ঞান নেহাতই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎ: জ্ঞানের ওই দৈন্য সে-অবস্থার মানুষের বাস্তব দৈন্যেরই অনুরূপ। সমান করুণ। তবুও, যেটা হলো আসলে জরুরী কথা, এ-অবস্থায় মানুষের চেতনায় ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার জন্মই সম্ভবপর হয় নি। মানুষ তখনো দেবতার পায়ে মাথা কুটতে শেখে নি, পরলোকতত্ত্বের আলেয়ায় ভুলে সংসারকে অসার মনে করবার অবকাশ পায় নি, অবসর পায় নি দুনিয়াটা মনগড়া কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার। তাই যতো মূক, যতো অস্পষ্ট, যতো অব্যক্তই হোক না কেন,—সমাজ-বিকাশের এই স্তরে মানুষের চেতনাটা লোকায়তিকই, দেহাত্মবাদীই।

কিন্তু, সমাজ-বিকাশের এ-রকম কোনো পর্যায়ের কথা কি সত্যিই বাস্তব? এ-রকম কোনো পর্যায়ের কথা কি সত্যিই জানা গিয়েছে?

গিয়েছে। কেননা, পুরো পৃথিবীর বুক জুড়ে সমস্ত মানুষই সমান তালে উন্নত হতে পারে নি। আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে নানা জায়গায় মানুষের দল আদিম দশাতেই পড়ে রয়েছে। এবং তাদের দিকে দেখলে বোঝা যায় তাদের মাথায় ঈশ্বরের ধারণা জন্মায় নি, তারা প্রার্থনা করতে শেখে নি,—এক কথায় তারা এখনো অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদী চিন্তাধারার পরিচয় পায় নি।

Religion is characterised by belief in God and the practice of prayer or sacrifice. The lowest savages known to us have no

gods and know nothing of prayer or sacrifice. Similarly whenever we can penetrate the prehistory of civilised peoples we reach a level at which again there are no gods and no prayer or sacrifice.[৫৪]

ধর্মের লক্ষণ হলো ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং উপাসনা ও বলিদান-মূলক ক্রিয়াকাণ্ড। যে-সব মানবদলকে সবচেয়ে আদিম অবস্থায় থাকতে দেখা গিয়েছে তাদের কোনো ঈশ্বর নেই এবং তারা প্রার্থনা বা বলিদানের কথা কিছুই জানে না। তেমনি, সভ্য মানুষদের প্রাক্-ইতিহাস পর্যন্ত যখনই পৌঁছোনো যায় তখন আমরা এমন এক স্তরে পৌঁছুই যেখানে ঈশ্বর নেই, উপাসনা নেই, বলিদান নেই।

ভারতীয় ধ্যানধারণার ইতিহাসে যদি লোকায়তিক চেতনার উৎস সন্ধান করা যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত সমাজ-বিকাশের একটি এই রকম স্তরেই গিয়ে পৌঁছতে হয়। তার সাক্ষী স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ।

তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে লোকায়তিক চিন্তাধারা চিরকালই ওই রকম মূক, অব্যক্ত ও অচেতন অবস্থায় পড়েছিলো। বস্তুত, ওই রকমই একটা অস্ফুট ও অচেতন দেহতত্ত্ব হিসেবে তার জন্ম হলেও ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় দেখা যায়, কোনো একটা যুগে এই লোকায়তিক চেতনাই রীতিমতো সচেতন বস্তুবাদী দর্শনে পরিণত হয়। পুঁথি লেখা হয়েছিলো, ভাষ্য রচনা হয়েছিলো এবং তার যে-সব ভাঙাচোরা টুকরো আজো পাওয়া যাচ্ছে তা দেখে বোঝা যায় লোকায়তিকদের যুক্তিতর্ক একটা যুগে কী রকম শানানো-সবল হয়ে উঠেছিলো। কী করে যে তা সম্ভবপর হয়েছিলো তা আজো আমরা পুরোপুরি জানতে পারি নি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা আজো অনেক বাকি আছে।

কিন্তু তার আগে, যে-প্রসঙ্গ থেকে এতো কথা উঠেছে সেটুকুর আলোচনা সেরে নেবার চেষ্টা করা যাক।

বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে লোকায়তিক ঐতিহ্যের তফাতটা উত্তর যুগে এতো প্রকট হওয়া সত্ত্বেও বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে বামাচারী ও এমনকি লোকায়তিক চেতনার এতো অজস্র স্মারক কি করে টেকে রয়েছে?

তার কারণ নিশ্চয়ই লোকায়তিক ধ্যানধারণাও যে-রকম আকাশ থেকে জন্মায় নি, উত্তর যুগের বৈদিক অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদী ধ্যানধারণাও সেই রকমই আকাশ থেকে জন্মায় নি। উভয়ের উৎসই হলো সমাজ-বিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্যে। এখন, সমাজ-বিকাশের যে-সব বিভিন্ন পর্যায় সেগুলির মধ্যে বাঁধাধরা সম্পর্ক আছে: কোন পর্যায় আগের এবং কোন পর্যায়

পরের, শুধু এইটুকুই সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নয়, এমন কি কোনো দেশের কোনো মানুষই আগের পর্যায়কে লঙ্ঘন করে একেবারে পরের পর্যায়ে উঠে যেতে পারে নি। তার মানে, পশুর রাজ্য পিছনে ফেলে এগিয়ে চলতে চলতে মানুষ যে শেষ পর্যন্ত সভ্যতার আওতায় এসে পৌঁছলো তা একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়েই, কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপ পেরিয়েই। এই দিক থেকে সব দেশের মানুষের অভিজ্ঞতাই মোটের উপর এক রকমের। তাই আজকের দিনেও পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষেরা যে-অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেই দিকে চেয়ে দেখলে এগিয়ে-যাওয়া মানুষের দল তাদের বিস্মৃত অতীতটাকে খুঁজে পাবে। কেননা, এগিয়ে-যাওয়া মানুষেরাও এককালে ঠিক ওই রকমেরই পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে ছিলো—সে-পর্যায় না পেরিয়ে একেবারে সরাসরি উন্নত পর্যায়ে উঠে আসা কোনো দেশের বা কোনো জাতের মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি।

এ-কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করলেন লুইস্ হেনরি মর্গান। তাঁর 'প্রাচীন সমাজ' নামের বই শুধুই যে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ তাই নয়, যে-কোনো দেশের প্রাচীন পুঁথিপত্রের প্রকৃত তাৎপর্য-নির্ণয়ে অপরিহার্য হাতিয়ারও।

মানুষের ধ্যানধারণার সঙ্গে সমাজ-বিকাশের পর্যায়-বিশেষের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের কথা এবং এই পর্যায়-পরম্পরায় অনিবার্য ধারাবাহিকতার কথা মনে রাখলে বৈদিক সাহিত্যে বামাচারী ও লোকায়তিক ধ্যানধারণার স্মারকগুলি দেখে খুব বেশি বিস্ময়ের অবকাশ থাকবে না। কেননা, সমাজ-বিকাশের যে-পর্যায়ে লোকায়তিক ও বামাচারী ধ্যানধারণার উৎস, বৈদিক মানুষেরাও এককালে তার মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সে-পর্যায়কে পিছনে ফেলে এলেও তাঁদের সাহিত্য থেকে তার স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছে যায় নি। এই স্মৃতি হিসেবেই সে-পর্যায়ের ধ্যানধারণার অনেক চিহ্ন বৈদিক সাহিত্যে টেকে গিয়েছে। তার মানে, বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকরা উত্তর যুগে যে-সব ধ্যানধারণাকে অমন ঘৃণার চোখে দেখতে শিখেছিলেন, এককালে তাঁদের নিজেদের মনেই—অর্থাৎ তাঁদেরই পূর্বপুরুষদের মনে—সেগুলি চরম সত্যের মর্যাদা পেতো।

আর্য-অনার্য মতবাদের সংকট

আর ঠিক এই কথাটিকে স্পষ্টভাবে চেনবার পথে বিঘ্ন ঘটায় আধুনিক পণ্ডিত-মহলে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি মতবাদ। মতবাদটি

হলো, আর্য-অনার্য বা আর্য-দ্রাবিড়-সংক্রান্ত মতবাদ : অনার্যদের এই দেশে প্রবেশ করবার পর শিক্ষিত ও সংস্কৃত আর্যদের চিন্তাধারার মধ্যে কিছু কিছু অসংস্কৃত অনার্য-বিশ্বাস প্রবেশ করেছিলো। কী করে করলো? তাই নিয়ে অবশ্য নানা মুনির নানা মত। ক্ষিতিমোহন সেন[৭৫] বলছেন, এ হলো করুণাময়ের লীলা। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু[৭৬] বলছেন, এর কারণ হলো আগন্তুক আর্যদের অসীম সহনশীলতা। এ. বি. কীথ[৭৭] অতো ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাই করছেন না, শুধু ঘোষণা করছেন যে স্থানীয় অসভ্য মানুষদের নানান ধ্যানধারণা আর্যদের ধ্যানধারণার রাজ্যে 'সেঁদিয়ে' গিয়েছিলো।

এখন এই আর্য-অনার্য মতবাদ যে শেষ পর্যন্ত ধোপে কতোখানি টেঁকবে তা খুব সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এককালে বিদগ্ধ সমাজ এ-মতবাদ নিয়ে যতোখানি উৎসাহ দেখিয়েছিলো আজকের দিনে তার তুলনায় উৎসাহ অনেক কমেছে[৭৮]। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় পণ্ডিতমহলের ঝোঁকটা দিক বদল করছে : এককালে ঝোঁক ছিলো যা কিছু উন্নত ধরনের চিন্তা তাকেই আর্য আখ্যা দেবার, একালে যেন তথাকথিত দ্রাবিড়দের প্রতিই শ্রদ্ধা ও পক্ষপাতটা বেশি[৭৯]।

অবশ্যই আমাদের পক্ষে এ-জাতীয় তর্কবিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ হবে না, প্রয়োজনও নেই। আমাদের পক্ষে যেটুকু কথা প্রাসঙ্গিক সেটুকু হলো ভবিষ্যতে এই আর্য-অনার্য মতবাদের কপালে যাই থাকুক না কেন বর্তমানে এ-মতবাদ সত্য নির্ণয় প্রচেষ্টায় যে বাধা সৃষ্টি করতে পারে সে-সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। আসলে আর্যই বলুন, বৈদিক মানুষই বলুন, বা যাই বলুন না কেন—তাদের নিজেদেরও একটা অসভ্য অতীত ছিলো, এবং সে-অতীতের নানান স্মারক পরের যুগের বৈদিক সাহিত্যেও টেঁকে থাকতে বাধ্য; তাই সেগুলিকে নির্বিচারে অনার্য বা দ্রাবিড়দের কাছ থেকে গৃহীত মনে করা চলবে না। অর্থাৎ কিনা, এই আর্য-অনার্য মতবাদ সত্যই হোক আর ভ্রান্তই হোক—তারই মোহে আমরা যেন বৈদিক মানুষদেরই নিজস্ব অতীতটার সন্ধান প্রচেষ্টায় উদাসীন না হই।

সমাজবিকাশের ধারা

লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস-সন্ধানে অগ্রসর হয়ে আমরা সমাজ-বিকাশের কোনো এক প্রাক্-সভ্য পর্যায়ে গিয়ে পড়েছি। কিন্তু সে-কথার

তাৎপর্য ঠিক কী? তার মানে কি এই যে প্রাচীন সমাজের সেই মানুষেরা বুদ্ধিশুদ্ধির দিক থেকে এমনই খাটো বা নিকৃষ্ট ধরনের ছিলো যে অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার মহিমাটা তারা বুঝতেই পারে নি? এক কথায় প্রশ্ন হলো,—এর কারণটা কি এই যে তাদের মগজের গড়নটাই বাজে রকমের ছিলো, তাই তারা ইহলোক ছাড়া আর কিছুই সত্যি বলে ভাবতে পারেনি? তাদের লোকায়তিক চেতনাটা কি শুধুই স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক?

তা নয়। আসল কারণটা মগজের গড়ন নয়, সমাজের গড়ন। সমাজের গড়নটা বদলেছে বলেই মানুষের মাথায় এক ধরনের ধ্যানধারণার বদলে আর এক ধরনের ধ্যানধারণার উদয় হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান[৯০] অনুসারে গত হাজার তিন-চার বছরের মধ্যে মাপ বা গড়ন কোনো দিক থেকেই মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের খুব উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তবুও তার চিন্তাচেতনায় আকাশ-পাতাল তফাত দেখা দিয়েছে। কী করে তা সম্ভব হলো? তার কারণ, যদিও মানুষের চিন্তাচেতনা তার স্নায়ুতন্ত্রের উপরই নির্ভরশীল, তবুও এই স্নায়ুতন্ত্রের উপরই পারিপার্শ্বিকের যে-অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে তার কথা বাদ দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের স্বরূপটাই বুঝতে পারা সম্ভব নয়। এ-কথায় যাঁদের মনে সন্দেহ আছে তাঁরা পাভ্‌লভের[৯১] রচনাবলী থেকে প্রমাণগুলি দেখে নেবেন।

লোকায়তিক ধ্যানধারণাকে পিছনে ফেলে মানুষ যে এককালে অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী ধ্যানধারণার আওতায় এসে পৌঁছেছিলো তার আসল কারণ তার স্নায়ুতন্ত্রে কোনো রকম আকস্মিক পরিবর্তন নয়,—আসলে তার সমাজ-সংগঠনের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন। অধ্যাত্মবাদের জন্মবৃত্তান্ত জানতে হলে এই পরিবর্তনটাকে ভালো করে বোঝা দরকার।

মানবসমাজের ইতিহাসটা একবার আগাগোড়া দেখবার চেষ্টা করা যাক।

আজ পর্যন্ত মানবসমাজের যে-ইতিহাস তাকে আমরা মোটের উপর তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি :

এক : আদিম প্রাক-বিভক্ত সমাজ
দুই : বর্তমান শ্রেণী-সমাজ
তিন : আগামী কালের শ্রেণীহীন সমাজ

প্রাক-বিভক্ত সমাজটাকে বলা হয় আদিম সাম্যসমাজ। তার কারণ, এ-সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিচয় নেই, পরিচয় নেই রাষ্ট্রব্যবস্থার। শোষক নেই, শোষিত নেই, শাসক নেই, শাসিত নেই। সবাই স্বাধীন, সবাই

সমান, মানুষে-মানুষে সত্যিই ভাই-ভাই ভাব। এ-রকম সমাজ যে কল্পনা নয়, বাস্তব—তার প্রমাণ? প্রমাণ হলো, আজো পৃথিবীর নানান জায়গায় এ-রকম সমাজ সত্যিই রয়েছে, তাই সে-সমাজ স্বচক্ষে দেখা যায়। লুইস্ হেনরি মর্গান এ-সমাজ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পাবার জন্যেই জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই এ-হেন সমাজের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এ-কথাও তিনি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করলেন যে পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মানুষ আজ সভ্যতার যতো উচ্চ-স্তরেই পৌঁছোক না কেন, কোনো এক অস্পষ্ট অতীতে তারাও এই সমাজেই বাস করেছিলো।

এ-হেন প্রাচীন সমাজ সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য কেন? কেননা, এ-অবস্থায় মানুষের উৎপাদন-শক্তি এতো অনুন্নত যে সকলে মিলে প্রাণপণ পরিশ্রম করে দলের সকলের জন্যে কোনোমতে নিছক প্রাণ-ধারণের উপাদানগুলি প্রকৃতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে। হাতিয়ার যদি উন্নত হয় তাহলে একজন মানুষের পক্ষে প্রচুর পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু হাতিয়ার যখন স্থূল ও প্রাকৃত তখন একজন মানুষ প্রাণপাত পরিশ্রম করে যেটুকু জিনিস উৎপাদন করতে পারে তাই দিয়ে কোনোমতে শুধু নিজেকে বাঁচানো সম্ভব। এ-অবস্থায় মানুষের শ্রম উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে শেখে নি, তাই এ-সমাজে উদ্বৃত্তজীবী বলে কোনো শ্রেণীর আবির্ভাবও সম্ভব নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সমানে-সমান সম্পর্ক। শুধু তাই নয়। এ-অবস্থায় কারুর পক্ষে একাএকা বাঁচবার চেষ্টাও অসম্ভব: প্রকৃতিরাজ্যে বিঘ্ন-বিপর্যয়ের অন্ত নেই, স্থূল হাতিয়ার হাতে দুর্বল মানুষদের একমাত্র ভরসা হলো সংখ্যা। মানুষের চেতনারও তাই ঝোঁকটা একের উপরে নয়, ব্যক্তির উপরে নয়, ব্যষ্টির উপরে নয়। তার বদলে, পুরো দলের উপর, সকলের উপর, সমষ্টির উপর। সমষ্টির চেষ্টাতেই মানুষের পক্ষে এ-অবস্থায় বাঁচা সম্ভবপর। তাই শ্রমে অংশ গ্রহণ করবার দিক থেকে সকলের সঙ্গে সকলে সমান, শ্রমের ফল ভোগ করবার দিক থেকেও সকলের সঙ্গে সকলে সমান।

কিন্তু মানুষের উৎপাদন-কৌশল চিরকাল একই অবস্থায় টেঁকে থাকে নি। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেই মানুষের হাতিয়ার শানিত হয়েছে, উন্নত হয়েছে। এবং এইভাবে উন্নত হতে হতে একটা অবস্থায় পৌঁছে দেখা গেলো মানুষকে কোনোমতে টায়েটুয়ে বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে যতোটুকু দরকার তার চেয়েও বেশি জিনিস মানুষ উৎপাদন করতে পারছে। এই অবস্থাতেই প্রথম দেখা দিলো শ্রম-বিভাগ: কিছু কিছু মানুষ শুধুমাত্র কারিগরির কাজ নিয়ে থাকবে, অন্ন-উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্বটা আর তাদের নিজেদের উপর থাকবে না, কেননা বাকি মানুষের উৎপন্ন অন্নের উদ্বৃত্ত অংশটুকু থেকে তাদের খাবার যোগান দেওয়া হবে। এই শ্রমবিভাগের

দরুনই মানুষের উৎপাদন-কৌশল দ্রুত উন্নত হতে লাগলো, কেননা, অন্ন উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে যারা মুক্তি পেলো তারা উন্নততর উৎপাদন-যন্ত্র উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করতে পারলো।

তারপর এইভাবে এগোতে এগোতে মানুষ এসে পৌঁছলো একেবারে নতুন ধরনের এক অবস্থায়। শ্রমবিভাগের এমন এক নতুন পর্যায় দেখা দিলো যার সঙ্গে আগেকার শ্রমবিভাগের গুণগত ও মৌলিক প্রভেদ। নতুন পরিস্থিতিটা কী রকম? একদিকে উৎপাদন-কর্মের সংগঠক আর একদিকে যারা বাস্তবিকই উৎপাদন করবে তারা। যারা সংগঠক তারা নিজেরা উৎপাদন-কাজে অংশগ্রহণ করবে না, নিজেরা পরিশ্রম করবে না, গতর খাটাবে না। তার বদলে তারা মাথা খাটাবে—সংগঠনের জন্যে শুধু মাথা খাটানোরই প্রয়োজন।

এই সংগঠকশ্রেণী থেকেই ক্রমশ দেখা দিলো পুরোহিত-শ্রেণী[৩২]। শুরুতেই তারা নিশ্চয়ই উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক হয়ে বসে নি: তার বদলে তাদের দায়িত্ব ছিলো উৎপাদন কাজের তদারক করা এবং উৎপাদনের ওই উপায়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা—মাথা খাটিয়ে, ভেবেচিন্তে, পুরো সমাজের উৎপাদন কাজটির পরিচালনা করা। এ-দায়িত্ব তাদের স্বভাবতই অনেকখানি কর্তৃত্বের অধিকারী করেছিলো। কর্তৃত্বশক্তি না থাকলে পুরো সমাজটার কাজকর্ম পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়।

এই কর্তৃত্বশক্তির প্রভাবেই কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত আর উৎপাদন কাজের পরিচালক রইলো না, উৎপাদনের উপায়গুলির শুধুমাত্র রক্ষক রইলো না। তারা ক্রমশই এগুলির মালিক হয়ে দাঁড়ালো। আর এইভাবেই আদিম প্রাক-বিভক্ত সাম্যসমাজ ভেঙে গিয়ে দেখা দিলো নতুন ধরনের সমাজ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। একদিকে মালিক-শ্রেণী,—তারা মাথা ঘামাবে, কিন্তু গতর খাটাবে না। অপর দিকে শ্রমিক-শ্রেণী,—তারা শুধুই গতর খাটাবে, কিন্তু মাথা ঘামাবার সুযোগ-সুবিধে তাদের জন্যে নয়[৩৩]।

অর্থাৎ কিনা, সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার দরুন শুধুই যে মালিকে-শ্রমিকে তফাত দেখা দিলো তাই নয়, তারই অনিবার্য অঙ্গ হিসেবে দেখা দিলো শ্রমের সঙ্গে চিন্তার বিচ্ছেদ, গতর খাটানোর সঙ্গে মাথা খাটানোর বিচ্ছেদ, কায়িক শ্রমের সঙ্গে মানসিক শ্রমের বিচ্ছেদ।

আর এই তথ্যটুকু মনে না রাখলে অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী ধ্যানধারণার জন্মকাহিনী সত্যিই বুঝতে পারা যাবে না। এঙ্গেলস্[৩৪] বলছেন:

> With each generation, labour itself became different, more perfect, more diversified. Agriculture was added to hunting and cattle breeding, then spining, weaving, metal-working, pottery

and navigation. Along with trade and industry, there appeared finally art and science. From tribes there developed nations and states. Law and politics arose, and with them the fantastic reflection of human things in human mind : religion. *In the face of all these creations which appeared in the first place to be products of the mind, and which seemed to dominate human society, the more modest productions of the working hand retreated into the background, the more so since the mind that plans the labour-process already at a very early stage of development of society...was able to have the labour that had been planned carried out by other hands than its own.* All merit for the swift advance of civilization was ascribed to the mind, to the development and activity of the brain. Men became accustomed to explain their actions from their thoughts, instead of from their needs—(which in any case are reflected and come to consciousness in the mind)—*and so there arose in the course of time that idealistic outlook on the world which, especially since the decline of the ancient world, has dominated men's minds.*

অর্থাৎ, বংশপরম্পরায় শ্রমের রূপান্তর হতে লাগলো ; শ্রম আরো নিখুঁত আরো বিচিত্র হয়ে উঠতে লাগলো। শিকার ও পশুপালনের সঙ্গে সংযুক্ত হলো কৃষি ; তারপর সুতোকাটা, কাপড় বোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্প, নৌচালনা। বাণিজ্য ও শিল্পের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আবির্ভাব হলো চারুকলা ও বিজ্ঞানের। গোষ্ঠী বদলে দেখা দিলো জাতি ও রাষ্ট্র। আইন এবং রাজনীতির আবির্ভাব হলো, আর সেই সঙ্গে মানব-মনে মানব-ব্যাপারেরই কাল্পনিক প্রতিবিম্ব : ধর্ম। এইসব সৃষ্টির পাশে,—যেগুলি কিনা মুখ্যত মনের সৃষ্টি বলেই প্রতীয়মান হয়েছিলো এবং মানবসমাজ নিয়ন্ত্রণে যেগুলির প্রভাবই সবচেয়ে বেশি মনে হয়েছিলো,—মানবহাতের অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে কীর্তিগুলি পিছিয়ে পড়তে লাগলো, এবং ততোই বেশি পিছিয়ে পড়তে লাগলো যতোই কিনা যে-মন শ্রমের পরিকল্পনা করেছে সেই মনই নিজের হাত ছাড়াও অপরের হাতের সাহায্যে এই পরিকল্পিত শ্রমকে সফল করিয়ে নিতে শিখেছে—সমাজবিকাশের খুব পুরোনো পর্যায় থেকেই এ-ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছে। সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির সমস্ত কৃতিত্ব গিয়ে পড়তে লাগলো মনের উপর, মগজের বিকাশ ও ক্রিয়ার উপর। প্রয়োজনের দিক থেকে চিন্তার ব্যাখ্যা করবার বদলে মানুষ ধ্যানধারণা দিয়েই চিন্তার ব্যাখ্যা করতে শিখলো (শেষ পর্যন্ত যদিও প্রয়োজনই ধ্যানধারণা হিসেবে মনের উপর প্রতিবিম্বিত হয়েছে ও চেতনায় ধরা দিয়েছে) ;—এইভাবেই কালক্রমে প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হলো, এবং বিশেষ করে প্রাচীন যুগ শেষ হবার পর থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গিই মানবমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদের জন্মকাহিনী আর কোথাও এর চেয়ে স্পষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিনা খুবই সন্দেহের কথা। এবং, ভবিষ্যতে "দ্বিজ" নামের পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাবো ভারতীয় দর্শনের দলিলপত্র কতো অভ্রান্তভাবে এই কথাগুলিই প্রমাণিত করে: আমাদের দেশে সমাজের সদরমহল থেকে কায়িক শ্রমের মর্যাদা যতোই মুছে গিয়েছে ততোই মানুষের চেতনায় জন্ম হয়েছে ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণার।

তাই এ-কথা মনে করলে ভুল করা হবে যে সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার আগে পর্যন্ত মানুষের মাথায় অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী ধ্যানধারণার আবির্ভাব হবার কোনো অবকাশ ছিলো। শ্রম বা কর্ম বস্তুতন্ত্র। শঙ্করাচার্যের** সমস্ত বিরুদ্ধ যুক্তি সত্ত্বেও তাই। এ-কথা পরে প্রতিপন্ন করবার অবকাশ পাবো। আপাতত, যে-প্রশ্ন সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক সেটা হলো আদিম সাম্যসমাজের—প্রাক-বিভক্ত সমাজের—মানুষদের ধ্যানধারণার কথা।

যে-সমাজে উৎপাদন-কর্মের সঙ্গে,—শ্রমের সঙ্গে,—সমস্ত মানুষেরই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সে-সমাজের চিন্তাচেতনাটা,—যতোই মূক ও অস্ফুট হোক না কেন,—প্রাক-অধ্যাত্মবাদী, অতএব লোকায়তিকই হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? ভারতীয় দর্শনের দলিলপত্র তো তাই-ই প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু এখানে সমস্ত দলিল পেশ করবার অবকাশ নেই। তার বদলে সমস্যাটাকে আর একদিক থেকে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

মানুষের উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতিই তাকে আদিম প্রাক-বিভক্ত সমাজ থেকে শ্রেণীসমাজের আওতায় নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি সেইখানেই শেষ হয় নি। এই উন্নতিই মানুষকে শ্রেণীসমাজের কাঠামোর মধ্যেই একের পর এক পর্যায় পার করে এগিয়ে নিয়ে চলেছে: দাস-সমাজ, সামন্ত-সমাজ, ধনতান্ত্রিক-সমাজ। ধনতান্ত্রিক-সমাজের পূর্ণ বিকাশই শ্রেণীসমাজের শেষ সীমানা। কেননা, এই অবস্থায় পৌঁছে মানুষ দেখছে তার উৎপাদন শক্তি এমন অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে যে শ্রেণীসমাজের কাঠামোর মধ্যে একে আর কিছুতেই ধরে রাখা সম্ভব নয়। মানুষের উৎপাদন শক্তি যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে মানুষে-মানুষে বর্তমান সম্পর্কের বিরুদ্ধে, শ্রেণী-সম্পর্কের বিরুদ্ধে**। আজকের দিনে ধনতান্ত্রিক সমাজে যে সংকট প্রকট হয়েছে তার সমাধান আগামীকালের শ্রেণীহীন সমাজে। এই শ্রেণীহীন সমাজের কথা আজ আর স্বপ্নকথা নয়, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ আজ সচেতনভাবে সেইদিকে এগিয়ে চলেছে।

এই হলো মানব ইতিহাসের তিনটি মূল স্তর: অতীতের প্রাক-বিভক্ত সমাজ, বর্তমানের শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, আগামীকালের শ্রেণীহীন সমাজ।

অতীতের সেই প্রাক-বিভক্ত সমাজের সঙ্গে আগামীকালের শ্রেণীহীন

সমাজের সম্পর্কটা কী রকম? আজকের মানুষ কি শ্রেণীসমাজের জ্বালায় যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে অতীতের প্রাক-বিভক্ত সমাজে ফিরে যেতে চাইবে নাকি?

—দাও ফিরে সে-অরণ্য, লও এ-নগর?

নিশ্চয়ই নয়।

আদিম সাম্যসমাজের আসল ভিত্তি ছিলো দারিদ্র্যের। সবাই সমান, কেননা, সবাই সমান গরিব। আর সবাই সমান গরিব, কেননা, উৎপাদনের পদ্ধতি তখন এমনই করুণ যে সবাই মিলে প্রাণপাত পরিশ্রম করে কোনোমতে সবাইকে টায়ে-টুয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

আগামীকালের সাম্যসমাজের ভিত্তিতে প্রাচুর্য। কেননা, গত কয়েক হাজার বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় মানুষ তার উৎপাদন শক্তিকে এমন অবিশ্বাস্য ভাবে বাড়িয়ে ফেলেছে যে তারই সাহায্যে আজ অভাবনীয় ধনসম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব। তা সত্ত্বেও আজকের দিনে মানুষের দুঃখদৈন্য ঘুচছে না। তার কারণ ওই ধনসম্পদ আজ মানুষের অভাবমোচনে নিযুক্ত নয়। লাভে বিক্রি করবার জন্যেই এগুলি তৈরি করা হয়। তার বদলে, মানুষের অভাব মোচনের উদ্দেশ্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুসারে এই অবিশ্বাস্য উৎপাদন শক্তিকে কাজে লাগালে আজ যার-যা-দরকার তাই পাওয়া সম্ভব হবে। অভাব বলে কথাটিকে মানুষ ভুলে যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা তোলবার সময় আমরা দেখবো, ঠিক এই প্রসঙ্গেই কার্ল মার্কস্ বলছেন, finding what is newest in what is oldest,—যা কিনা সবচেয়ে পুরোনো তারই মধ্যে যা সবচেয়ে নতুন তাকে দেখতে পাওয়া। সবচেয়ে নতুন মানে?—ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভাব, শ্রেণীশোষণের অভাব। সবচেয়ে পুরোনোর মধ্যেও—আদিম সাম্যসমাজেও—তাই-ই চোখে পড়ে।

কার্ল মার্কস্-ই প্রথম প্রমাণ করলেন, মানুষের ধ্যানধারণার চরম উৎস হলো তার সমাজ-ব্যবস্থায়। আর তাই, সমাজ-বিকাশ সম্বন্ধে যে-কথা ধ্যানধারণার ইতিহাস সম্বন্ধেও তাই হওয়াই শুধু স্বাভাবিক নয়, অনিবার্যও।

তার মানে?

আগামীকালের সাম্যসমাজ অতীতের সাম্যসমাজটার দিকে ফিরে যাবার চেষ্টা নয়। কিন্তু তবুও অতীত যুগের সেই সমান-সহজ সম্পর্কটাকে ফিরে পাবার চেষ্টা নিশ্চয়ই: অভাবের ভিত্তিতে নয়, প্রাচুর্যের ভিত্তিতে; নিচুস্তরে নেমে গিয়ে নয়, অতীত যুগের সমান সম্পর্কটাকে উচ্চস্তরে তুলে এনে। মর্গান[১১] বলছেন:

It will be a revival, in a higher form, of the liberty, equality and fraternity of the ancient gentes.

অর্থাৎ, সেই প্রাচীন সমাজের গোষ্ঠীগুলিতে যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা ছিলো আগামী কালের সমাজে, উচ্চতর পর্যায়ে, তার পুনরাবির্ভাব হবে।

দার্শনিক ধ্যানধারণার আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

মানুষের কথা বাদ দিয়ে মানুষের ধ্যানধারণাকে বোঝবার অবকাশ যদি সত্যিই থাকতো তাহলে দর্শনের ইতিহাস প্রসঙ্গে সমাজ ইতিহাসের এই বহিঃরেখার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হতো। কিন্তু অবান্তর নয়। ধ্যানধারণার কথা জানতে গেলে যাদের মাথায় ধ্যানধারণার আবির্ভাব হয়েছে তাদের কথাও জানা দরকার।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গণ্ডি ছেড়ে আজকের মানুষ শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগিয়ে যাবার সময় সচেতনভাবে অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী ধ্যানধারণাকে পরিত্যাগ করে বস্তুবাদী দর্শনে প্রতিষ্ঠা খুঁজছে। ওই শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তিতে কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রম,—কর্ম আর জ্ঞান,—দু'-এর ভিতরকার হারানো সম্পর্ক আবার ফিরে আসবে, আর সেই সঙ্গেই দূর হবে ভাববাদের বাস্তব ভিত্তি। মানুষ আর অধ্যাত্মবাদের আলেয়ায় ভুলে প্রবঞ্চনার জলাভূমিতে গিয়ে ডুবে মরবে না, ভাববাদের কথায় মোহগ্রস্ত হয়ে অবাস্তবের পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বাস্তব সুখদুঃখগুলোকে ভুলে থাকবে না। তার বদলে, বাস্তব দুনিয়াকে একমাত্র সত্য বলে জেনে দিনের পর দিন একে এমন ভাবে বদল করে চলবে যাতে মানুষের সামনে খুলে যায় প্রকৃত কল্যাণের অসীম দিগন্ত।

আর এই দিক থেকে ভারতীয় দর্শনের দলিলপত্রগুলিকে সত্যিই পরমাশ্চর্য মনে হয়। কেননা, সেগুলি থেকে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই, সমাজ ইতিহাসের আবর্তনের সঙ্গে দার্শনিক চেতনার আবর্তনটি কতো ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত: কেননা, প্রাক-বিভক্ত সমাজের ধ্যানধারণা যে প্রাক-অধ্যাত্মবাদীই এ-কথা ভারতীয় দার্শনিক পুঁথিপত্রের মধ্যে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট দেখতে পাওয়া যায়।

আগামীকালের নিঃশ্রেণীক সমাজের মধ্যে অতীতের সাম্যসম্পর্ককে অনেক উন্নত পর্যায়ে তুলে আনবার পরিচয়; আগামীকালের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদও সেই রকমই প্রাক্-বিভক্ত সমাজের লোকায়তিক চেতনাকেই উচ্চতর পর্যায়ে ফিরিয়ে আনবে,—অবশ্যই মূক ও অচেতন দেহতত্ত্ব হিসেবে নয়, সচেতন ও সমৃদ্ধ বস্তুবাদী দর্শন হিসেবে।

জানি, সমাজ-ইতিহাসের সঙ্গে দর্শনের ইতিহাসকে এইভাবে মিলিয়ে

বোঝবার চেষ্টার বিরুদ্ধে নানা রকম আপত্তি উঠবে। বিশেষত এই কারণে উঠবে যে শ্রেণীসমাজের কাঠামোর মধ্যেই বস্তুবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঐতিহাসিক ভাবে ঘটেছে। ভবিষ্যতে এই আপত্তি নিয়ে আলোচনা তোলবার অবকাশ পাবো। আপাতত, লোকায়ত-দর্শনের আলোচনায় এগিয়ে যে-অভিজ্ঞতাটিকে খুবই বিস্ময়কর মনে হয়েছে সেটুকুই বর্ণনা করা যাক।

ভাববাদী চিন্তার জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে এঙ্গেল্‌স্‌-এর যে-উক্তিটি উদ্ধৃত করেছি তার থেকেই একটি সমস্যার সূত্রপাত হয়: সমাজের সদর-মহল থেকে শ্রমনিরত মানুষগুলির মর্যাদা ক্ষোয়া যাবার দরুনই যদি ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণার জন্ম হয় তাহলে প্রাগ-বিভক্ত সমাজের,—যৌথ শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের—মানুষদের মাথায় নিশ্চয়ই ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণা বিকশিত হবার কোনো অবকাশই ছিলো না। আর তা যদি না থাকে তাহলে সে-পর্যায়ের ধ্যানধারণাগুলি বস্তুবাদী হওয়াই সম্ভবপর,—এ-বস্তুবাদ যতো মূক ও অব্যক্তই হোক না কেন। কেননা, সাম্প্রতিক দার্শনিকদের হাজার রকম বাঙময় বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মানতেই হবে, ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের একমাত্র পাল্টা-চেতনা হলো বস্তুবাদ।

লোকায়তিক চেতনার উৎস সন্ধানে এগিয়ে দেখা গেলো, সত্যিই তাই। নানান দিক থেকে এ-বস্তুবাদের দারিদ্র্য অসহ্য ও এমন কি অভাবনীয়। তবুও এ-চেতনা প্রাক-অধ্যাত্মবাদী, কেননা, এর উৎসে প্রাগ-বিভক্ত যৌথ শ্রমের সমাজ।

প্রয়োজন

এই পরিচ্ছেদ শেষ করবার আগে আর মাত্র দু'-একটা কথা তোলা দরকার।

আমাদের দেশে বহুদিন ধরেই প্রথা চলে আসছে, দার্শনিক আলোচনার শুরুতে চারটি কথা খুব খোলাখুলিভাবে বলে নেওয়া: অধিকার, বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন। বিষয় ও সম্বন্ধের কথা কিছুটা বলা হয়েছে। প্রয়োজন ও অধিকারীর কথাও তোলা দরকার।

লোকায়ত দর্শন নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনটা কী? প্রয়োজনের প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই স্থান-কাল নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই, প্রশ্নটা হবে, আজকের দিনে আমাদের দেশে লোকায়ত দর্শনের চর্চার কী প্রয়োজন?

দেশের বাস্তব পরিস্থিতির কথা থেকেই শুরু করা দরকার।

সাধারণ মানুষ,—যারা কাজ করে, আমাদের দেশে সে-শ্রেণীর

মানুষের ধ্যানধারণারই নাম লোকায়তিক,—তারা নানা রকম সমস্যার ঘূর্ণিতে পড়ে শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছে। ফলে, অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী ধ্যানধারণা বর্জন করে তারা চাইছে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের কাছ থেকেই পথনির্দেশ পেতে। কিন্তু সেই সঙ্গেই শোনা যায় আর একদল বলছেন, এ সবই শুধু বিদেশ থেকে আমদানি করা মতবাদ। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্যবাদেরও সম্পর্ক নেই, বস্তুবাদেরও নয়।

সাধারণ মানুষের পক্ষে তাই আজ ভেবে দেখা প্রয়োজন, এই আপত্তিগুলি সত্যি কিনা। প্রয়োজনটা শুধুমাত্র জ্ঞানের খাতিরে নয়। জীবনের তাগিদেও।

সাম্যসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন অতীত কোনো দেশের বা কোনো জাতিরই হতে পারে না। তার কারণ, আগেই বলা হয়েছে, পশুর রাজ্য পিছনে ফেলে এগিয়ে আসবার পথটা পৃথিবীর সব-দেশের সব-মানুষের পক্ষেই এক। আজকের দিনের যে-কোনো জাতি সভ্যতার যতো উঁচু শিখরেই পৌঁছুক না কেন, এককালে তাকে আদিম সাম্য-সমাজেই বাস করতে হয়েছে। এদিক থেকে অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তফাত প্রধানত ছুটো। প্রথমত, আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে আজো নানান রকম মানুষ সেই পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় টিকে আছে, এ-ঘটনা পৃথিবীর সমস্ত দেশে দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের উন্নত ও সংস্কৃত মানুষদের রচনাতেও এমন অনেক চিহ্ন থেকে গিয়েছে যেগুলিকে এই আদিম সাম্যসমাজের স্মারক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু বস্তুবাদ? বস্তুবাদের কথা তো আগেই তুলেছি। এমন কথা একবার নয়, বহুবার বহুভাবে বলা হয়েছে যে আমাদের দেশের ঐতিহ্যটা বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবাদ—এ-দেশে অধ্যাত্মবাদী চিন্তা যেন তৈলধারার মতোই অবিচ্ছিন্ন।

কিন্তু এ-কথা কি ঠিক? উত্তরটা নিশ্চয়ই নির্ভর করবে, দেশের ঐতিহ্য বলতে ঠিক কী বোঝায়, এই প্রশ্নের উপর। কার চিন্তাধারা,—কোন শ্রেণীর মানুষের? যদি শোষক-শ্রেণীর চেতনাকেই দেশের একমাত্র দার্শনিক ঐতিহ্য বলে মনে করেন তাহলে মানতেই হবে দেশের ঐতিহ্যে বস্তুবাদী চেতনার কোনো স্থান ছিলো না। কিন্তু সাধারণ মানুষ কোন ধরনের ধ্যানধারণায় বিশ্বাস করেছে?—এ-প্রশ্ন যদি দেশের দার্শনিক ঐতিহ্য নির্ণয় করবার সময় প্রাসঙ্গিক হয় তাহলে মানতেই হবে বস্তুবাদী চেতনা আমাদের দেশের দার্শনিক ঐতিহ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলো।

কেননা, সাধারণ মানুষ ভাববাদে বিশ্বাস করে নি, বিশ্বাস করেছে দেহাত্মবাদেই, বস্তুবাদেই। প্রমাণ, প্রাচীনদের অজস্র উক্তি। তাঁরা বলেছেন,—বারবার বলেছেন,—লোকায়ত মানে হলো সাধারণ মানুষের দর্শন, আর এই দর্শন অনুসারে মূর্ত জড় জগৎটাই একমাত্র সত্য : আত্মা নেই, ঈশ্বর নেই, পরলোক নেই, পুরুষার্থ বলতে শুধু অর্থ ও কাম।

তাই দেশের সাধারণ মানুষ যদি তাদের নিজেদের দার্শনিক ঐতিহ্যটি চিনতে চায় তাহলে লোকায়ত দর্শনের আলোচনা বাদ দিয়ে চলবে কী করে?

কিন্তু লোকায়ত দর্শন নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন শুধুমাত্র এই নয় যে দেশের জনসাধারণ নিজেদের দার্শনিক ঐতিহ্যটিকে স্পষ্টভাবে জানতে ও চিনতে পারবে। প্রয়োজন আরো আছে। আরো একটি বড়ো প্রয়োজন হলো আজকের দিনে ওই লোকায়তিক চিন্তাধারার সংকীর্ণতাকে স্পষ্টভাবে জানতে হবে, এবং তাকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের পর্যায়ে তুলে আনবার চেষ্টা করতে হবে।

যেমন ধরুন, আদিম সাম্যবাদের নজিরের উপর আধুনিক সাম্যবাদী অতোখানি জোর দেন কেন? তা কি এই কারণে যে আজকের দিনে সেই সাম্যসমাজে ফিরে যাবার কোনো তাগিদ আছে? নিশ্চয়ই নয়। তার বদলে আসল প্রয়োজন হলো, বিরুদ্ধ-প্রচারকে খণ্ডন করে এইটুকুই দেখানো যে ব্যক্তিগত-সম্পত্তি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি সনাতন নয়। মানুষের ইতিহাসে একটা সময় ছিলো যখন এগুলির জন্মই হয়নি। মানুষের ইতিহাসে এমন একটা সময় আসছে যখন এগুলির কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদ লুইস হেনরী মর্গানকে কেউই অবশ্য সাম্যবাদের প্রচারক বলবেন না। তার বদলে তাঁকে বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্বের প্রবর্তকই বলতে হবে। কিন্তু ভূয়োদর্শনের প্রভাবে তিনি কী স্পষ্টভাবেই না এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন[৮৮] :

> A mere property career is not the final destiny of mankind if progress is to be the law of the future as it has been of the past. The time which has passed away since civilization began is but a fragment of the past duration of man's existence and but a fragment of the ages yet to come. The dissolution of society bids fair to become the termination of a career of which property is the end and aim because such a career contains the elements of self-destruction.

অর্থাৎ, অতীতের মতোই ভবিষ্যতেও যদি প্রগতির নিয়মই সত্য হয় তাহলে

> মানতেই হবে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই মানুষের চরম নিয়তি হতে পারে না। সভ্যতার শুরু থেকে যেটুকু সময় কেটেছে তা মানুষের পুরো অতীতটার তুলনায় যে-রকম চোখের পলক সেই রকমই চোখের পলক হলো পুরো ভবিষ্যৎটার তুলনায়। যে-সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য শুধু সম্পত্তিই তার শেষ ঘনিয়ে এসেছে; কেননা, সে-উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে আত্মনাশের বীজ।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি সনাতন নয়—আদিম সমাজের দিকে চেয়ে দেখলে এই কথাটি আমরা স্পষ্ট ভাবে জানতে পারি। জানতে পারবার দরকার আছে। সেইদিকে পিছু হটবার জন্যে নিশ্চয়ই নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাবমুক্ত আগামীকালের সমাজ-ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলবার জন্যেই।

আমাদের দেশের লোকায়তিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজনও প্রায় অনুরূপ। এই পরিচয়ের ভিত্তিতেই আমরা বুঝতে পারবো যে ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী চিন্তার ঐতিহ্যই দেশের একমাত্র দার্শনিক ঐতিহ্য নয়। কিন্তু তাই বলে, ওই লোকায়তিক ধ্যানধারণার দিকে পিছু হটবার কোনো তাগিদই থাকতে পারে না। মনে রাখতে হবে, উৎপাদন-পদ্ধতির এক অতি অনুন্নত পর্যায়ে এই ধ্যানধারণার জন্ম হয়েছিলো। মনে রাখতে হবে, সে অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যেটুকু সম্যক পরিচয় তা অতি নগণ্য। তাই, বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক থেকে এই লোকায়ত-দর্শনের একেবারেই দীনহীন দশা। প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সংবাদ লোকায়তিকেরা উদ্ধার করতে পারেন নি, সেটুকুকে কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নেবার চেষ্টা ছাড়া তাঁদের পক্ষে আর কোনো উপায় ছিলো না। এই রকমই একটা কল্পনা থেকে বামাচারী বিশ্বাসের জন্ম। এবং, ওই অবস্থায় প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের দৈন্য যে কী ভয়াবহ তা ওই বামাচারী বিশ্বাস থেকেই প্রমাণ হয়।

আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক তথ্যে সমৃদ্ধ যে-বস্তুবাদের দিকে মানুষ এগিয়ে যাবে তার তাৎপর্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই অতীতের ওই লোকায়তিক চেতনার কোনো তুলনাই হয় না। তাই সেদিকে ফেরা নয়, বস্তুবাদী চেতনাকেই উন্নত পর্যায়ে নিয়ে আসা—এই প্রয়োজনটির কথা মনে রেখে লোকায়ত দর্শনের আলোচনা করতে হবে।

অধিকারী

প্রয়োজন ছাড়াও অধিকারীর কথা।

লোকায়ত-দর্শনের আলোচনায় কি অধিকার-ভেদের কথা সত্যিই

তোলা উচিত ? প্রশ্নটাকে সোজাসুজি এইভাবে পাড়লে নিশ্চয়ই জবাব দেবার অসুবিধে হবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই একটি কথা উত্থাপন করবার অবকাশ পাওয়া যায়। কথাটা জরুরী।

লোকায়ত-দর্শনের আলোচনায় আমরা যতোই অগ্রসর হবো ততোই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে দেখতে পাবো যে আলোচনার অনেক দলিলই সমাজ-বিকাশের এমন এক পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত যে-পর্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা রাষ্ট্রব্যবস্থার আবির্ভাব হয় নি। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা রাষ্ট্রব্যবস্থা অনাদি, সনাতন—এ-রকম কোনো ধারণা নিয়ে এগোলে দলিলগুলির তাৎপর্য চোখে পড়া কঠিন হবে। সাম্প্রতিক যুগে আমাদের দেশে এবং বিদেশেও, দিকপাল ভারততত্ত্ববিদ তো বড়ো কম জন্মান নি। এবং, দলিলপত্র বলতে আমরা যেটুকু সংগ্রহ করেছি তার সবটুকুর সঙ্গেই তাঁদেরও পরিচয় ছিলো। কিন্তু তবুও ব্যক্তিগত-সম্পত্তিকে তাঁরা সনাতন মনে করেছেন আর এই কুসংস্কারের দরুনই তাঁদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ হয়েছে। ফলে দলিলগুলি চোখের সামনে থাকলেও সেগুলির প্রকৃত তাৎপর্য দেখতে পাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কার্ল মার্কস্[৩৯] এক জায়গায় এই সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেই বলছেন,

> Owing to a certain judicial blindness even the best intelligences absolutely fail to see the things which lie in front of their noses.
>
> একরকমের আইনগত অন্ধতার দরুনই এমন কি সবচেয়ে উঁচুদরের বুদ্ধিমানেরাও একেবারে নাকের গোড়ায় যা রয়েছে তা মোটেই দেখতে পান না।

মার্কস্-এর কথায় পরে ফিরতে হবে। আপাতত শুধু এইটুকুই বলা দরকার যে মানব সমাজে যা কিনা নিছক আধুনিক যুগের অবদান সেইটুকুকে সনাতন বলে ভুল করলে প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্রের অনেক তাৎপর্যই চোখে পড়বে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে যিনি চিরন্তন মনে করেন তিনি লোকায়ত দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য কোনোদিনই বুঝতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পদ্ধতি-প্রসঙ্গে

লোকায়ত দর্শনের আলোচনায় যে-পদ্ধতি অনুসরণ করেছি তার জন্যে আমি একান্তভাবেই অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের কাছে ঋণী। তাঁর নাম আমাদের পণ্ডিতমহলে মোটেই সুপরিচিত নয়, তাই শুরুতে আমি তাঁর সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন

অবশ্যই, তিনি ভারততত্ত্ববিদ নন, বর্তমানে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক-এর অধ্যাপক। প্রাচীন গ্রীক বিষয়ে ব্যুৎপত্তির দিক থেকে আজকের ইয়োরোপে তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত সত্যিই মুষ্টিমেয়। এ-কথা যাঁরা অধ্যাপক টম্‌সনের সবচেয়ে বড়ো নিন্দুক তাঁরাও নিঃসংকোচে স্বীকার করেন। কিন্তু শুধু এইটুকু বললে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না।

কেননা, অধ্যাপক জীবনের প্রথমার্ধেই তিনি প্রাচীন গ্রীকতত্ত্বে অসামান্য ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তখনই তিনি প্রাচীন গ্রীক পুঁথিপত্রের উপর যে-সব টীকাভাষ্য রচনা করেছিলেন সেগুলি বিদগ্ধ সমাজে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়েছিলো। অথচ, অমন প্রামাণ্য রচনার স্রষ্টা হয়েও উত্তর-জীবনে তিনি অনুভব করলেন, প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলিকে সত্যিই ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। ইয়োরোপে বহুদিন ধরে গ্রীক-বিষয়ে উচ্চাঙ্গের গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও সে-যুগের পুঁথিপত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধার করবার সবচেয়ে মৌলিক কাজটি তখনো বাকি থেকে গিয়েছে। এই চেতনা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে হতে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনে এক গভীর সংকটের রূপ নেয়। দিনের পর দিন তিনি অন্বেষণ করে চলেন এমন কোনো পদ্ধতির যার সাহায্যে ওই সুদূর অতীতকে সম্যকভাবে চিনতে পারা সম্ভব হবে। শেষ পর্যন্ত সে-পদ্ধতি তিনি খুঁজে পেলেন। প্রাচীন গ্রীস তাঁর সামনে একেবারে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

এ-বিস্ময় বড়ো কম নয়। তাঁর ওই আবিষ্কারের কাহিনী তাঁর মুখেই শুনেছিলাম।

সে-রাতটার কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না। চোখ বন্ধ করলে পুরো দৃশ্যটি আজো স্পষ্ট দেখতে পাই।

রাত এতো গভীর হয়েছে যে কর্মমুখর বার্মিংহাম শহর নিস্তব্ধ, নিঝুম। আগুনের সামনে পা-দুটো এগিয়ে দিয়ে অধ্যাপক টম্‌সন কথা বলে চলেছেন। কথা বলতে বলতে একজন মানুষ কী তন্ময়ই না হয়ে যেতে পারেন! অথচ কল্পনা নয়, কবিত্ব নয়—বিজ্ঞানের ধারালো বিশ্লেষণ। যেন দুই আর দুই মিলে চার হচ্ছে, তারই হিসেব। এতো স্বচ্ছ, এতো তীক্ষ্ণ তাঁর প্রত্যেকটি কথা যে শুনতে শুনতে মনে হয় মাথার ভিতর একটার পর একটা কপাট খুলে যাচ্ছে। যে-সব কথার মানে থাকতে পারে বলে আগে কোনোদিনই ভাবতে পারি নি,—ভাববার মতো চিন্তার সঙ্গতি ছিলো না,—সে-সব কথার সহজ তাৎপর্যটা তিনি যেন একেবারে চোখের সামনে তুলে ধরেন। বলেন, এই দিক থেকে ভেবে দেখো, দেখবে এতোটুকুও অস্পষ্ট নয়।

কথায় কথায় নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তুললেন। নিজেকে বাদ দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাটিকে মানুষ কতো স্পষ্ট ভাবেই না বর্ণনা করতে পারে!

প্রাচীন পুঁথিপত্রে যা লেখা আছে তার মানে হয়, প্রতিটি কথার মানে হয়। সে-তাৎপর্য উদ্ধার করা সম্ভব,—এবং উদ্ধার বলতে একালের ধ্যানধারণাকে সেকালের লেখার ওপর চাপিয়ে দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করা নয়। তার বদলে কোনো-না-কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, যার সাহায্যে বুঝতে পারবো সেকালের মানুষ ঠিক কেন, ঠিক কী ভেবে, সেকালের ওই সব পুঁথিপত্র রচনা করেছিলো। এই চেতনাই ক্রমশ তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার পুরো ষোলো আনা হয়ে দাঁড়ালো।

সে যেন এক চরম সংকট। গ্রীক সাহিত্যের ঠিক যে-বিষয়টি সম্বন্ধেই তাঁর তখন অমন খ্যাতি সেই বিষয়টিরই প্রকৃত তাৎপর্য কিনা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! বিষয়টি হলো, এস্কাইলাসের নাটক। অধ্যাপক টম্‌সন বলতে লাগলেন, একটা এস্পার-ওস্পার না-হলেই নয়। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, হয় এস্কাইলাস বুঝবো আর না হয় তো ছেড়ে দেবো। এমন সময় হাতে এলো একটি বই, ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল-এর "ইলিউশন্‌ এ্যাণ্ড রিয়ালিটি"[১]।

মনে হলো, অকূলে কূল পাওয়া যাচ্ছে। কড্‌ওয়েল-এর বই আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেলো মার্ক্সবাদ-এর দিকে। পড়লাম এঙ্গেল্‌স্‌-এর 'দি ওরিজিন অব্‌ দি ফ্যামিলি'—'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'[২]। এঙ্গেল্‌স্‌-এর বই আমাকে পৌঁছে দিলো মর্গান-এর 'এন্সেন্ট সোসাইটি' বা 'প্রাচীন সমাজ'[৩] পর্যন্ত। কূল পেলাম। এস্কাইলাস্‌ আর ছাড়তে হলো না।

এর পর গ্রীক বিষয়ে তিনি যে-দুটি বই লিখেছেন বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। বই দুটির নাম: 'এস্কাইলাস্‌ এ্যাণ্ড এথেন্স' এবং 'স্টাডিস্‌ ইন্‌ এন্সেন্ট গ্রীক সোসাইটি'[৪]।

অবশ্যই, মর্গান নিজে গ্রীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু 'প্রাচীন সমাজ' বলে তাঁর ওই বই-এর প্রধান আলোচনাটা আমেরিকার আদিবাসীদের নিয়ে। আদিবাসী-সংক্রান্ত এই গবেষণা কেমন ভাবে আজকের দিনে একজন শ্রেষ্ঠ গ্রীকতত্ত্ববিদের হাতে গ্রীক সাহিত্য-জগতের তোরণদ্বার উদ্‌ঘাটন করবার চাবিকাঠি যুগিয়েছে সে-অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। তাঁর দিকে চেয়ে দেখলে আপনার মনে হতো, সেকালের গ্রীক-সমাজ তিনি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন সে-সমাজের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত, টাল-বেটাল। আর তারই আবর্তে পড়ে তখনকার অনেক নাট্যকার কেন এক নির্দিষ্ট মতাদর্শে মেতে উঠলেন,—অন্য কোনো রকম রচনা কেন তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হলো না,—অধ্যাপক টম্‌সনের মুখে সে-কথা শুনলে আপনার মনে হতো, তিনি কথা বলছেন না—ছবি আঁকছেন! এমনই নির্মল, এমনই প্রত্যক্ষ তাঁর অনুভূতি!

আমার জীবনে এর চেয়ে বড়ো বিস্ময় সত্যিই ঘটেনি।

বিস্ময় শুধু এই কারণে নয় যে এ-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর মুখ থেকে তাঁর এই অসামান্য অভিজ্ঞতার কথাটা শুনতে পেয়েছিলাম। আরো বড়ো বিস্ময় এই কারণে যে আমার নিজের কাছে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন নিয়ে যেগুলি ছিলো সবচেয়ে কঠিন আর সবচেয়ে জটিল সমস্যা তাঁর ওই উপলব্ধি আমাকে সেগুলির সমাধান খোঁজবার পথ দেখিয়ে দিলো।

সেদিন রাতে মনে হয়েছিলো, কাঁচের একটা কুঁচো খুঁজতে এ-দেশে,—এতোদূরে,—এসেছিলাম। তার বদলে পেয়ে গেলাম একেবারে হীরের টুকরো। এ-হীরে জীবনভোর আমার সমস্ত প্রচেষ্টার মূলধন হতে পারবে।

পদ্ধতি-প্রসঙ্গে

মর্গান-এর মূলসূত্র অনুসরণ করে কী ভাবে প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধার করা সম্ভব তার নির্দেশ পাওয়া যায় অধ্যাপক জর্জ টমসনের সাম্প্রতিক গ্রন্থাবলী থেকে। তাঁরই পদ্ধতি অনুসরণ করে লোকায়ত-দর্শনের কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আমি এই আলোচনার খসড়া তৈরি করেছি। বলাই বাহুল্য, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের তুলনায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেহাতই নগণ্য। এদিক থেকে আমার সম্বল হলো পূর্বগামী ভারততত্ত্ববিদদের মৌলিক গবেষণা। মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ। কালিদাসের কাছে এ-কথা অতিরঞ্জিত বিনয় হোক আর নাই হোক, আমার কাছে নিছক আত্মোপলব্ধি।

তবু সাহসী যে হয়েছি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। একটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে, এবং প্রাচীন পুঁথিপত্রের সঙ্গে অনেক সময় পরোক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতেই, আমি এই পদ্ধতির প্রয়োগ নিয়ে যে-পরীক্ষা করেছি তার পিছনে প্রধান উৎসাহ অবশ্যই পদ্ধতিটির সম্ভাবনা সম্বন্ধে দক্ষতর বিদ্বানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমাদের বিদগ্ধ-সমাজে এ-পদ্ধতি সুপরিচিত নয়। অথচ, এর সম্ভাবনা যেন সীমাহীন। যোগ্যতর বিদ্বান বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে দুর্বোধ্য কোণ-গুলিকেও উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করতে পারবেন। শুধু তাই নয়। সামগ্রিক ভাবে মানবজাতির ইতিহাস রচনায় প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্রগুলির সাক্ষ্য অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ, মানবজাতির অগ্রগতি-পথের একটি বিশেষ স্তরের লিখিত দলিলপত্র ভারতবর্ষে এমন ভাবে টিকে আছে যা একমাত্র চীন ছাড়া আর কোনো দেশে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা খুবই সন্দেহের কথা। তাই অন্যান্য দেশের ইতিহাসে যে-কথা আবছা আর অস্পষ্ট হয়ে এসেছে সেগুলিকে বোঝা যেতে পারে ভারতীয় ইতিহাসে আজো যা স্পষ্ট ভাবে বেঁচে রয়েছে তারই সাহায্যে।

বলাই বাহুল্য, লোকায়ত-দর্শনের এই আলোচনায় যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি ঘটে থাকে তাহলেই প্রমাণ হবে না পদ্ধতিটি ভ্রান্ত। কেননা, পদ্ধতির ফলপ্রসূতা ছাড়াও প্রয়োগ-পটুত্বের কথা রয়েছে। তবু, আত্মশক্তি সম্বন্ধে মনে কোনো মোহকে প্রশ্রয় না দিয়েও এটুকু ভেবেছি যে, ভুলের ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকলে আমরা কোনোদিনই সত্যে পৌঁছতে পারবো না। এ-বিষয়ে অধ্যাপক টমসনেরই একটি উক্তি[৩] মনে পড়ে :

We cannot reach truth unless we risk error.

হঠকারিতার বরাভয় নয়, অন্বেষীর কাছে আশ্বাসবাণী।

অধ্যাপক টম্‌সনের পদ্ধতিটি ঠিক কী এই পরিচ্ছেদে তার পরিচয় দিতে চাই। তার আগে দেখা দরকার লোকায়ত-দর্শন প্রসঙ্গে সত্যিই এমন সমস্যা ওঠে যার সমাধান পাবার জন্যে একটি কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজন আছে।

লোকায়ত-প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

লোকায়তিকদের নিয়ে কী এমন সমস্যা উঠছে যে সমাধানের খোঁজে এইভাবে কালাপানি পার হতে হবে?

আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ভারততত্ত্ববিদের রচনা থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'লোকায়ত'* নামে ইংরেজীতে একটি ছোট্ট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯২৫-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রবন্ধটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে লোকায়তিকদের সম্বন্ধে এমন কয়েকটি উক্তি সংগ্রহ করেন যার সঙ্গে লোকায়ত-দর্শন সংক্রান্ত আমাদের সাধারণ ধারণার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এ-জাতীয় তথ্য তাই ভারতীয় দর্শনের ছাত্রের কাছে সমস্যা সৃষ্টি না করে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো সে-সমস্যাকে তুচ্ছ মনে হবে; কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যায়, তা নয়।

সমস্যা যে ওঠে এ-বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন। বস্তুত, সে-সমস্যার সমাধান দেবার চেষ্টা তিনি নিজেই করেছেন। তাছাড়া, তাঁর ওই ছোট্ট পুস্তিকাটির ভিত্তিতেই শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী 'ভারতীয় বস্তুবাদ, ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ ও ভোগবাদ'[৬] নামের ইংরেজী বইতে লোকয়তিকদের সম্বন্ধে কিছু কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একটুখানি এদিক-ওদিক তাকালেই,—অর্থাৎ কিনা, ভারতবর্ষের অন্যান্য কিছুকিছু প্রাচীন পুঁথিপত্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেই,—বোঝা যায় এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসু মনকে সত্যিই সন্তুষ্ট করতে পারে না। সমাধান হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার বদলে এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত কিছু কিছু নতুন সমস্যারই সৃষ্টি করে।

মহামহোপাধ্যায় লোকায়তিকদের সম্বন্ধে কী রকম তথ্য সংগ্রহ করেছেন? তার থেকে কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়? সে-সমস্যার সমাধান হিসেবে তিনি, বা তাঁকে অনুসরণ করে শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, যা বলছেন তা কেন সন্তোষজনক মনে হয় না?

তথ্যগুলির বর্ণনা থেকেই শুরু করা যাক।

প্রথমত, বার্হস্পত্যসূত্রম্-এর[৮] সাক্ষ্য। স্বয়ং বৃহস্পতির নামের সঙ্গে জড়িত এই পুঁথিটির সঙ্গে আধুনিক পণ্ডিতমহলের পরিচয় খুব বেশি দিনকার নয়। সম্প্রতি কালে ডক্টর এফ. ডব্লিউ. টমাস এটি সংগ্রহ করেন এবং তাঁরই লেখা দীর্ঘ ভূমিকা ও ইংরেজী তর্জমা সম্বলিত হয়ে ১৯২১-এ পাঞ্জাব থেকে এটি প্রথম ছাপানো হয়। ভূমিকায় ডক্টর টমাস আলোচনা করেছেন, পুঁথিটিকে যে-অবস্থায় আমরা পাচ্ছি তার কোনো কোনো অংশ যেমনই প্রাচীন আবার কোনো কোনো অংশ তেমনি অর্বাচীন। ডক্টর টমাসের মতে, প্রাচীনতম অংশগুলিতে লোকায়ত-দর্শনের আদি ও অকৃত্রিম রূপটি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় বলছেন, পুঁথিটির যে-অংশগুলিকে ডক্টর টমাস অর্বাচীন মনে করেন তার সাক্ষ্যও কম মূল্যবান নয়।

এখানে পুঁথিটির স্তর-বিচার করবার চেষ্টা করলে আলোচনা অনেকখানি বিক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা। তাই, সে-আলোচনা মুলতবী রেখে দেখা যাক, পুঁথিটির ঠিক কোন সাক্ষ্যের দিকে মহামহোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান।

এই পুঁথির দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরের পর দুটি সূত্রে,—তাই মহামহোপাধ্যায়ের ভাষায়, যেন এক-নিশ্বাসে,—লোকায়তিক এবং কপালিকদের সম্বন্ধে দুটি কথা বলা হয়েছে :

সর্বথা লোকায়তিকমেব শাস্ত্রমর্থসাধনকালে ॥ ২ ॥ ৫
কাপালিকমেব কাম সাধনে ॥ ২ ॥ ৬

—অর্থাৎ, অর্থসাধনকালে সর্বত্র লোকায়তিকই হলো শাস্ত্র, কামসাধনে সর্বত্র কাপালিকই শাস্ত্র।

মহামহোপাধ্যায় বলছেন, এই ভাবে এক-নিশ্বাসে দুটি কথা বলা থেকেই বোঝা যায় কথা দুটি আলাদা নয়। অর্থাৎ, লোকায়তিক ও কাপালিক আলাদা নয়। তাঁর এই উক্তির পক্ষে অবশ্যই আরো একটি যুক্তি দেখানো যায়। বৃহস্পতি-সূত্রের লেখক যদি সত্যিই স্বীকার করেন যে কামসাধনার শাস্ত্র বলতে একমাত্র কাপালিকই, তাহলে তাঁর পক্ষে লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিকদের কোনো বড়ো রকমের তফাত স্বীকার করা সম্ভব হবে না। কেননা, মাধবাচার্য প্রমুখ সমস্ত লেখকের মতেই, লোকায়তিকেরা পুরুষার্থ বলতে স্বীকার করেন শুধু অর্থ এবং কাম[৯]। আর, যদি তাই হয় তাহলে কাপালিক বা কামসাধনশাস্ত্র লোকায়তের সঙ্গে অভিন্ন হবারই কথা।

কিন্তু লোকায়তের সঙ্গে কাপালিকের অভিন্নতা প্রমাণ করবার জন্যে বৃহস্পতি-সূত্রের সাক্ষ্যই একমাত্র নয়। শাস্ত্রী মহাশয় আরো একটি সাক্ষ্যের কথা তুলছেন এবং এই দ্বিতীয় সাক্ষ্যের সনতারিখ সম্বন্ধেও স্পষ্ট মত ব্যক্ত করছেন।

হরিভদ্র ছিলেন অনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর জৈন লেখক। তাঁর লেখা ষড়দর্শনসমুচ্চয়-এর উল্লেখ প্রথম পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। এ-বইতে তিনি লোকায়তমতের ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গেই তাঁর টীকাকার গুণরত্ন লোকায়তিকদের সম্বন্ধে অনেক কিছু বিস্ময়কর তথ্য দিয়েছেন। অবশ্যই, মহামহোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে গুণরত্নের কথাগুলির বিস্তৃত বিবরণ বা বিশ্লেষণ দেন নি। সে-আলোচনায় আমরা পরে ফিরবো। আপাতত, গুণরত্নের মন্তব্যের ঠিক যতোটুকু মহামহোপাধ্যায় নিজে উল্লেখ করছেন ততোটুকুর উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা যাক।

মহামহোপাধ্যায় বলছেন, যদিও বৃহস্পতির রচনায় লোকায়তিক ও কাপালিকদের কথা স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখিত হয়েছে তবুও গুণরত্নের মতে এ-দু'-এর মধ্যে কোনোই তফাত নেই[১০]। মহামহোপাধ্যায়ের হিসেবে গুণরত্ন ছিলেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক। এবং মহামহোপাধ্যায় বলছেন, তাঁর লেখা পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁর সময়েও লোকায়তিক সম্প্রদায় দেশ থেকে বিলুপ্ত হয় নি। কথাটি বিশেষ করে উল্লেখ করলাম এই কারণে যে মহামহোপাধ্যায়ের নিজের লেখা সম্বন্ধেও একই কথা প্রজোয্য। অর্থাৎ, তাঁর ধারণায় তাঁর নিজের যুগেও অন্তত বাংলা দেশে নামান্তরের আড়ালে লোকায়তিকের দল সত্যিই টিকে রয়েছে। এই চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের আলোচনায় আমরা একটু পরেই ফিরবো। আপাতত, কাপালিকদের কথাটা ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। কেননা, গুণরত্ন লোকায়তিকদের সঙ্গে এদের অভিন্নতা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত নন, লোকায়তিকদের এমন বর্ণনা দিচ্ছেন যা ওই কাপালিকদের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় : লোকায়তিকেরা নাকি গায়ে ভস্ম মাখে, মদ খায়, মাংস খায়, তারা মিথুনাশক্ত ও যোগী[১১]।

সর্বশেষ বিশেষণটিই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। লোকায়তিকদের সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু সাধারণ ধারণা তার সঙ্গে আর যাই হোক যোগী শব্দটা কিছুতেই খাপ খায় না। অথচ পুঁথিতে লেখা রয়েছে,—কথাটাকে তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও চলবে না। তাহলে পুঁথিতে যা লেখা রয়েছে তাকে গুরুত্ব দিতে হলে শুধু লোকায়ত নয়, 'যোগী' সম্বন্ধেও আমাদের সাধারণ ধারণাকে শুধরে নেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু শুধরে যে নেবো তা তো দলিল-দস্তাবেজের উপর নির্ভর করেই। অবশ্যই, দলিলের অভাব নেই। আমরা যতোই অগ্রসর হবো ততোই দেখতে পাবো ভারতীয়

দর্শন সম্বন্ধে বহুদিন ধরে প্রচলিত আমাদের সাধারণ ধারণার সঙ্গে খাপ-খায় না এমনতরো দলিল রয়েছে রাশি রাশি। কিন্তু শুধু দলিল থাকলেই হয় না। দলিলগুলির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করার জন্যে একটা কোনো অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও প্রয়োজন। আমি বলতে চাই, সে-পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের গ্রন্থাবলী থেকে। উক্ত পদ্ধতির সাহায্যে লোকায়ত ও যোগী উভয় শব্দকেই কী রকম নতুন আলোয় দেখা সম্ভব তার আলোচনা পরে তুলবো। আপাতত, শুধু এইটুকুই দেখাতে চাইছি যে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ যে সব ধারণা তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা কোনো কাজের কথা নয়। কেননা, তাহলে ভারতীয় দর্শনের পুঁথিপত্রগুলিতেই যা লেখা আছে তাও অস্বীকার করা দরকার।

লোকায়ত ও কাপালিক

যোগীর কথা ছেড়ে দিলেও কাপালিক নামটিকেই দেখুন না। প্রাচীনেরা বলছেন, লোকায়ত আর কাপালিক একই কথা। কিন্তু আমাদের মনে কাপালিক ও লোকায়ত সম্বন্ধে যেটুকু সাধারণ ধারণা তার সঙ্গে এ-কথার কোনো রকম সঙ্গতি কি খুঁজে পাওয়া যায়?

লোকায়তিকদের সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু সাধারণ ধারণা তার প্রায় চোদ্দ আনাই মাধবাচার্যের লেখা সর্বদর্শনসংগ্রহ থেকে সংগৃহীত। এই বইতে লেখা আছে, লোকায়তিকেরা অনুমান মানে না, আত্মা মানে না, পরলোক মানে না, ঈশ্বর মানে না। তার বদলে তারা মনে করে প্রত্যক্ষই হলো একমাত্র প্রমাণ, দেহই আত্মা, ইহলোকই সব, সুখভোগ ছাড়া আর কোনো পুরুষার্থ নেই। মাধবাচার্যের এই লেখা থেকে লোকায়তিকদের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। কিন্তু তার সঙ্গে কাপালিক-সংক্রান্ত ধারণার যোগাযোগ কোথায়? অবশ্যই, কাপালিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটুকু সত্যিই খুব স্পষ্ট নয়—যেটুকু স্পষ্ট তা শুধুমাত্র ভয়াবহ বীভৎসতার একটা ছবি। চীন পর্যটক হুয়েন্‌সাঙ[১২] ভারতবর্ষে বহু কাপালিক দেখেছিলেন—তাদের গলায় মড়ার খুলির মালা, মড়ার খুলি ভরে তারা মদ খায়। হুয়েন্‌সাঙ-এর ঢের আগেই বরাহমিহির[১৩] (ষষ্ঠ শতাব্দীতে) তাঁর বৃহৎসংহিতায় কাপালিকদের কথা যেটুকু উল্লেখ করেছেন তার থেকে এর চেয়ে স্পষ্ট আর কোনো ছবি পাওয়া যায় না। অবশ্যই, কাপালিক সম্বন্ধে আমাদের চলতি ধারণাটা প্রধানতই নাটক-নভেল থেকে পাওয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা[১৪] মনে আছে? মনে আছে, কাপালিকদের সেই নিষ্ঠুর বীভৎসতার চিত্র? কাপালিকদের সম্বন্ধে এই

রকম ঘৃণার ভাব শুধুই বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল-এ নয় ; তাঁর ঢের আগেকার যুগের নাটকেও। একাদশ শতাব্দীতে লেখা কৃষ্ণমিশ্রের[১৫] প্রবোধচন্দ্রোদয়-এ দেখতে পাই একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও একজন দিগম্বর জৈন সাধুর সংযম পরীক্ষা করবার জন্যে এক কাপালিক আর এক কাপালিকীর চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে ; অবশ্যই, তাদের স্বভাবচরিত্রের কোনো বালাই নেই—তাই মঞ্চের উপরেই তারা কামসাধনা শুরু করে দিলো! তারও আগে, সম্ভবত খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে লেখা ভবভূতির মালতীমাধব[১৬] নাটকে দেখা যায় নায়িকা মালতীকে প্রলুব্ধ করার, এবং শেষ পর্যন্ত তার সর্বনাশ সাধন করার, দায়িত্ব এক কাপালিকীর উপরই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জাতীয় নাটক-নভেল পড়েশুনে কাপালিকদের সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো রকম স্পষ্ট ধারণা হোক আর নাই হোক অন্তত একটা তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব যে জন্মায় সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্যই, লোকায়তিকদের সম্বন্ধেও যেটুকু খাপছাড়া খবর পাওয়া যায় তার মধ্যেও বিদ্বেষের ভাবটা খুবই প্রকট। দার্শনিক পুঁথিপত্রের কথা ছাড়াও এমনকি দেশের খোদ আইনকর্তা বিধান দিয়েছেন, সাধু-সমাজ থেকে লোকায়তিকদের দূর করে দিতে হবে। কিন্তু শুধু সেই কারণেই,—দুই-এর বিরুদ্ধেই বিদ্বেষের ভাব রয়েছে বলেই,—লোকায়ত ও কাপালিক যে এক এ-কথা বলাও বুদ্ধিমানের লক্ষণ হবে না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমাধান

তাহলে, লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিকদের সম্পর্ক নিয়ে একটা সমস্যা উঠছে। অবশ্যই, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের সাধারণ বইতে এ-সমস্যার স্বীকৃতি নেই। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় সাধারণ লেখক নন। তাই তাঁর চোখে এই সমস্যাটি ধরা পড়েছে এবং তিনি এর একটা সমাধান দেবারও চেষ্টা করেছেন।

কী রকম সমাধান ?

কাপালিক মানে ঠিক কী,—এ-প্রশ্ন নিয়ে খুব বেশি আলোচনা না তুলেও মোটের উপর বার্হস্পত্যসূত্রম্ অনুসরণ করেই তিনি ধরে নিচ্ছেন কাপালিক বলতে কামসাধকই বোঝায়। বলাই বাহুল্য, এ-কথায় খুব বেশি তর্কের অবকাশ নেই। কেননা, কাপালিকেরা যে একরকমের বামাচারী তান্ত্রিক তা সকলেই স্বীকার করবেন। এবং বামাচারী মানেই হলো কামাচারী। কেননা, বাম কথাটির রকমারি অর্থ সম্ভব হলেও অন্তত এই প্রসঙ্গে বাম মানে 'কাম'—বাঁ-হাত বা বাঁ-দিকের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

প্রমাণ, আনন্দগিরির শঙ্কর-বিজয়[১৭]। বামাচারীদের বর্ণনায় তিনি বলছেন 'বামবাহুল্যাৎ', এবং এই বামবাহুল্যের যে-বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা কামবাহুল্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, বামাচারী বা কামাচারীর অর্থ কি? কাম শব্দটিকে আধুনিক কালে যে-অর্থে গ্রহণ করা হয় বামাচার প্রসঙ্গেও কি সেই অর্থটুকুই পর্যাপ্ত হবে?

এই কাম শব্দটিকে আজকাল আমরা যে-অর্থে বুঝি মহামহোপাধ্যায় কাপালিক-প্রসঙ্গেও সেই অর্থেই বুঝতে চান। আজকালকার দিনে কাম নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন আমরা তাঁদের বলি কামবিজ্ঞানী বা কামশাস্ত্রজ্ঞ। বাৎসায়নের রচনা এই অর্থেই কামশাস্ত্র। কিন্তু ওই কাপালিক সম্প্রদায় বাৎসায়নের চেয়ে অনেক কালের পুরোনো। মহামহোপাধ্যায় তাই সিদ্ধান্ত করছেন, কাপালিকরাই হলো প্রাচীন ভারতে কামবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা।

কিন্তু তাহলে লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিকদের সম্পর্কটা কী রকম? মহামহোপাধ্যায় আবার বার্হস্পত্যসূত্রম্-এর সাক্ষ্যই উদ্ধৃত করছেন: এ-বইতেই বলা হয়েছে লোকায়তিকদের মতে বার্তাই একমাত্র বিদ্যা। বার্তা মানে? কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে[১৮] কথাটার সংজ্ঞা পাওয়া যায়: কৃষি পশুপাল্যে বাণিজ্যা চ বার্তা। অর্থাৎ, বার্তা বলতে বোঝায় কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য। অবশ্যই, এখানে বাণিজ্য মানে ঠিক কী তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, কেননা, কৌটিল্য ছিলেন চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের লেখক এবং তখনকার কালে বাণিজ্য বলতে অন্তত আজকাল যা বোঝায় তা বোঝাতো কিনা খুবই সন্দেহের কথা। তাছাড়া, গণ বা সঙ্ঘের আলোচনা প্রসঙ্গে পরে দেখতে পাবো বার্তা শব্দের প্রধানতম অর্থ শুধু কৃষিই। সে যাই হোক, মহামহোপাধ্যায় বলছেন, লোকায়তিকেরা যদি কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যকেই একমাত্র বিজ্ঞান মনে করে থাকে তাহলে মানতেই হবে এরাই ছিলো ভারতবর্ষের আদি 'ইকনোমিস্ট' বা অর্থনীতি-বিজ্ঞানী।

এই হলো মহামহোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত: "লোকায়তিকেরা যেমন তাঁদের বস্তুবাদী দর্শনের সাহায্যে অর্থনীতি-বিজ্ঞানের সূত্রপাত করেছিলেন তেমনিই কাপালিকেরা,—কী ধরনের দর্শনের সাহায্যে তা অবশ্য জানা নেই,—ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন কাম-বিজ্ঞানের।"

> ...as the Lokayatas with their Materialistic Philosophy made the beginnings of the Science of Economics, so the Kapalikas, with what system of philosophy we do not know, made the beginning of the Science of Erotics.[১৯]

কিন্তু এই উক্তিকেই তাঁর চরম সিদ্ধান্ত হিসেবে স্বীকার করতে হলে একের পর এক সমস্যা উঠবে। প্রথমত, কামশাস্ত্রপ্রণেতা স্বয়ং বাৎস্যায়ন[২০] লোকায়তিকদের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন; তাই লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিকদের সম্পর্ক যদি সত্যিই গভীর হয় তাহলে কাপালিকদের আর যাই বলা যাক কামশাস্ত্রের আদি-গুরু বলা নেহাতই অসংগত হবে। আদিগুরুকে গালমন্দ করার দৃষ্টান্ত ভারতীয় ঐতিহ্যে চোখে পড়ে না। কিন্তু এ-ছাড়াও মহামহোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আরো মৌলিক সমালোচনা ওঠে। তিনি শুরু করলেন এই বলে যে প্রাচীন-পুঁথিপত্রে লেখা রয়েছে লোকায়ত ও কাপালিক আলাদা নয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত যখন করছেন তখন বলছেন একটি সম্প্রদায় হলো অর্থনীতি-বিজ্ঞানের প্রবর্তক এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় হলো যৌনবিজ্ঞানের প্রবর্তক। এই দুটি কথাকে যদি এক করতে হয় তাহলে মানতেই হবে অর্থনীতির আলোচ্য—অর্থাৎ ধন-উৎপাদন—এবং কামবিজ্ঞানের আলোচ্য—অর্থাৎ মিথুন ও প্রজনন—অন্তত প্রাচীন যুগের চেতনা অনুসারে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলো। আমাদের আধুনিক ধ্যান-ধারণা অনুসারে কথাটা নিশ্চয় হাস্যকর শোনাবে: ধন-উৎপাদনের সঙ্গে সন্তান-উৎপাদনের সম্পর্ক আবার কী? কিন্তু যে-পুঁথিপত্র নিয়ে আলোচনা তা একালের নয়, সেকালের। এবং সেকালের ধারণা যে হুবহু একালের মতোই হবে তা ভাববার কারণ নেই। বরং প্রাচীনেরা যখন বার্তা-বাদী লোকায়তিকদের সঙ্গে কামাচারী কাপালিকদের এক করতে চাইছেন তখন আধুনিক গবেষকের কাছে নিশ্চয়ই প্রধান প্রশ্ন এই হবে যে একালের ধ্যানধারণাটা যতো পৃথকই হোক না কেন, মানবজাতির ক্রমোন্নতি-পথে সত্যিই কি এমন কোনো স্তরের কথা জানা আছে যখন মানুষের ধারণায় ধন-উৎপাদনের সঙ্গে মিথুনের ও সন্তান-উৎপাদনের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কই ছিলো? যদি তা জানা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে: কাপালিকদের সঙ্গে বা লোকায়তিকদের সঙ্গে মানব-ইতিহাসের সে-রকম কোনো স্তরের যোগাযোগ আছে কি না?

মহামহোপাধ্যায়ের কাছে কিন্তু এ-জাতীয় কোনো প্রশ্ন ওঠবার অবকাশ ছিলো না। তার কারণ তিনি ধরেই নিয়েছেন, কাম বা মিথুনকে আজকের দিনে আমরা যে-চোখে দেখি প্রাচীনেরাও ঠিক সেই চোখেই দেখতেন এবং আজকের দিনে আমরা যৌন-আচরণের উদ্দেশ্য বলতে যা বুঝি প্রাচীনেরাও ঠিক তাই বুঝতেন। ফলে কামবিষয়ে অত্যধিক উৎসাহ হয় লাম্পট্য, না হয়তো নিছক ভোগাশক্তি,—খুব বেশি সমীহ করে বললে বড়ো জোর বলা যায় কামবিজ্ঞানের ভিত্তি-স্থাপনা। বস্তুত, কাপালিকদের সম্বন্ধে—তথা, সমস্ত রকম বামাচারী সম্প্রদায় সম্বন্ধেই,—

আধুনিক কালে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ তার মূলে প্রধানতই হলো এদের কামবাহুল্য।

আর ঠিক ওই কথাটাই ভুল। কেননা, প্রাচীনেরা কাম ও মিথুনকে যে-চোখে দেখেছেন, এই ক্রিয়ার যে-উদ্দেশ্য কল্পনা করেছেন, তার সঙ্গে আমাদের আজকালকার ধ্যানধারণার মিল হয় না। তার কারণ খুব সহজ: প্রাচীনেরা ছিলেন প্রাচীন, আধুনিক নন। তাই আধুনিক ধ্যানধারণাও তাঁদের মধ্যে থাকবার কথা নয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন পুঁথিপত্রেই এ-কথার রাশি রাশি প্রমাণ আছে। যেহেতু পরের যুগে আস্তিকেরা, অর্থাৎ বেদপন্থীরা, নাস্তিকদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ বেদনিন্দুকদের বিরুদ্ধে, বিদ্বেষ প্রচার করবার জন্যে এই কামবাহুল্যের নজিরটাকেই অতো বড়ো করে দেখিয়েছেন সেইহেতুই এখানে এ-বিষয়ে বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্যটুকুই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হবে। বলাই বাহুল্য, বৈদিক সাহিত্য ভালো কি মন্দ, সুনীতিপরায়ণ কি দুর্নীতিপরায়ণ—এই জাতীয় প্রশ্ন তোলা আমাদের যুক্তির পক্ষে অবাস্তর। আমরা শুধু এইটুকুই দেখাতে চাই, যৌনব্যবহার সম্বন্ধে আধুনিক কালের ধারণা দিয়ে প্রাচীন কালের ধারণাকে বোঝবার কোনো উপায় নেই, এবং এ-বিষয়ে প্রাচীনকালের ধ্যানধারণাগুলির চিহ্ন শুধুই যে বেদনিন্দুক ও বৈদিক-ঐতিহ্য-নিন্দিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে টিকে আছে তাই নয়, এমনকি বৈদিকসাহিত্যের মধ্যেই তার অজস্র নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত, বামাচারের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝবার পক্ষে বৈদিক সাহিত্যের এই নিদর্শনগুলির গুরুত্বই যেন বেশি: বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদে যে-কথা লেখা আছে তারই সাহায্যে কাপালিকাদির মধ্যে প্রচলিত ব্যবহারের অলিখিত তাৎপর্য অনুমান করা সম্ভব হতে পারে।

বৈদিক সাহিত্যে বামাচার

> ...all understanding of primitive conditions remains impossible so long as we regard them through brothel spectacles[১১] : Engels.
>
> অর্থাৎ গণিকালয়ের ঠুলি পরে আদিম অবস্থার তাৎপর্য বোঝা অসম্ভব।

আধুনিক যুগের রুচিবোধের কাছে বামাচার যে কী সাংঘাতিক বিক্ষোভ-বিতৃষ্ণার

উদ্রেক করে তার নিদর্শন হিসেবে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। গুহ্যসমাজ বা তথাগত গুহ্যক নামে একটি বৌদ্ধ বামাচারী পুঁথি সম্বন্ধে তিনি বলছেন, এই পুঁথিতে এমন সব মতবাদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এমন সব ক্রিয়াকর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে মানুষের জঘন্যতম প্রবৃত্তিও এর চেয়ে ঘৃণিত ও ভয়াবহ কিছুই কল্পনা করতে পারে না এবং তার পাশে গত শতাব্দীর বিলিতি বটতলা বা হলিওয়েল স্ট্রিটের অশ্লীল সাহিত্যও একান্ত পবিত্র মনে হয়।

> ... theories are indulged in, and practices enjoined which are at once the most revolting and horrible that human depravity could think of, and compared to which the words and specimens of Holiwell Street literature of the last century would appear absolutely pure.[২২]

কথাগুলি নিশ্চয়ই মিথ্যে নয়। তবুও কিন্তু এ-জাতীয় মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হলে প্রাচীন সাহিত্যের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধার করা অসম্ভব। তার কারণ, যে-নীতিবোধ ও রুচিবোধের মধ্যে এ-জাতীয় মন্তব্যের উৎস সেটা একান্তই আধুনিক কালের, আধুনিক যুগের অবদান। প্রাচীনেরা ছিলেন প্রাচীন, তাই আমাদের নীতিবোধ বা রুচিবোধের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিলো না। তাঁরা যে-সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন তা তাঁদের রুচিবোধের অনুপাতেই। তাই আমরা যদি একালের নীতিবোধ নিয়ে তাঁদের সাহিত্যের দিকে চেয়ে দেখি এবং বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণায় একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠি তাহলে তাঁদের কথার প্রকৃত তাৎপর্য কিছুতেই খুঁজে পাবো না। তাঁরা ঠিক কী ভেবে এ-জাতীয় কথাবার্তা লিখেছিলেন তা জানতে হবে, এবং সে-কথা জানতে হলে অন্তত সাময়িক ভাবে আমাদের রুচিবোধকে মুলতবী রেখে ভেবে দেখতে হবে তাঁদের উদ্দেশ্যটা কী হওয়া সম্ভব।

বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের নিদর্শন নিয়ে আলোচনা তোলবার আগে কথাগুলি বিশেষ করে তুলছি ; কেননা, একালের ধ্যানধারণাগুলিকে সম্বল করে এগোলে বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের নিদর্শনগুলিকে অত্যন্ত বীভৎস কামবিকার ও কুৎসিৎ লাম্পট্যের নমুনা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ বৈদিক ঋষিদের কাছে কথাগুলি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক। তাই একালের লাম্পট্য-ব্যবহারটার পটভূমিতে সেকালের ঋষিদের এই সব কথাবার্তার প্রকৃত তাৎপর্য অনুমান করা অসম্ভব।

বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদের তাৎপর্য খুঁজতে হলে আজকালকার বটতলা-সাহিত্য থেকে কোনোরকম মূলসূত্র পাওয়া সম্ভব নয়—এই কথাটি স্পষ্টভাবে মনে রেখেই বৈদিক সাহিত্যে বামাচার বা কামাচারের নিদর্শনগুলিকে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক।

একটি নিদর্শন: শুক্ল-যজুর্বেদ (বাজসনেয়ী সংহিতার) ২৩॥২২ থেকে ২৩॥৩১। এই দশটি বেদমন্ত্রেরই আক্ষরিক অনুবাদ দেবার দরকার নেই। আমরা শুধুমাত্র দুটি মন্ত্রের তর্জমা উদ্ধৃত করবো, কেননা, ওই দুটির মধ্যেই খুব প্রয়োজনীয় একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে—বাকি আটটি মন্ত্রে বারবার একঘেঁয়ে ভাবে, একই কথাবার্তা পাওয়া যাচ্ছে। কিসের কথাবার্তা? মৈথুনের। কেবল মনে রাখবেন, এই মৈথুন-দৃশ্যে ও মৈথুন-সংলাপে যাঁরা অংশগ্রহণ করছেন তাঁরা কেউই আজকালকার লম্পটের মতো লোক নন। তার বদলে পাঁচজন যজ্ঞীয় ঋত্বিক: অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, ইত্যাদি। ২৩॥২২ এবং ২৩॥২৩: অধ্বর্যু কুমারীকে অভিমেথন করছেন—দুটি মন্ত্রে অধ্বর্যু ও কুমারীর মধ্যে মৈথুন-সংলাপ। ২৩॥২৪ এবং ২৩॥২৫: ব্রহ্মা মহিষীকে অভিমেথন করছেন—মন্ত্র দুটিতে ব্রহ্মা ও মহিষীর মধ্যে মৈথুন-সংলাপ। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের আলোচনার পক্ষে ২৩॥২৬ এবং ২৩॥২৭ সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হবে। তাই শুধু এই দুটি বেদমন্ত্রই উদ্ধৃত করা যাক। বোঝবার সুবিধে হবে, এই আশায় মন্ত্রের সঙ্গে উবটভাষ্যও উদ্ধৃত করলাম।

> উর্ধ্বামেনামুচ্ছ্রাপয় গিরৌ ভারং হরন্নিব।
> অথাস্যৈ মধ্যমেধতাং শীতে বাতে পুনান্নিব ॥২৩।২৬॥
> উবটভাষ্য:—উদ্গাতা বাবাতাম্ অভিমেথয়তি উর্ধ্বাম্ এনাম্ কম্ চিৎ পুরুষম্ আহ। উর্ধ্বাম্ এনাম্ বাবাতাম্ উচ্ছ্রিতাম্ কুরু। কথম্ ইব। গিরৌ ভারম্ মধ্যে নিগৃহ্য হরেৎ এবম্ এনাম্ মধ্যে নৃগৃহ্য উর্ধ্বাম্ উচ্ছ্রাপয়। অথ যথা ইতি এতস্য স্থানে। তথাচ উচ্ছ্রাপয় যথা অস্যা বাবাতায়া মধ্যম্ যোনিপ্রদেশঃ এধতাম্। 'এধ্ বৃদ্ধৌ' বৃদ্ধিম্ যায়াৎ অথ এনাম্ গৃহীয়াঃ। শীতে বাতে পুনন্ ইব। যথা কৃষীবলঃ ধ্যান্যম্ বাতে শুদ্ধম্ কুর্বন্ গ্রহনমোক্ষৌ ঝটিতি করোতি।
> উর্ধ্বমেনমুচ্ছ্রয়তাদ্গিরৌ ভারং হরন্নিব।
> অথাস্য মধ্যমেজতু শীতে বাতে পুনন্নিব ॥২৩।২৭॥
> উবটভাষ্য:—বাবাতা প্রত্যাহ উদ্গাতারম্। ভবতঃ অপি এতৎ এবম্। উর্ধ্বম্ এনম্। উদ্গাতারম্ উচ্ছ্রয়তাম্ উচ্ছ্রাপয়। অত্র স্ত্রী পুরুষায়তে। গিরৌ ভারম্ হরন্ ইব। অথ এবম্ ক্রিয়মাণস্য অস্য মধ্যম প্রজননম্ এজতু চলতু। অথ এনম্ নিগৃহীয় শীতে বাতে পুনন্ ইব যবানি।
> তর্জমা:
> ২৩॥২৬: এই স্ত্রীকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরো। পর্বতে যেমন করিয়া ভার উত্তোলন

করে। অনন্তর ইহার মধ্যদেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। বায়ুতে শুদ্ধ করিতে করিতে…

উবট: উদ্গাতা বাবাতাকে অভিমেথন করিলেন। কোনো পুরুষকে বলিলেন, এই বাবাতাকে উর্ধ্বে তুলিয়া উচ্ছ্রিত করো। কেমন করিয়া? পর্বতে ভারবস্তুকে মধ্যস্থানে ধরিয়া যেমন ভাবে উত্তোলন করা হয় তেমনি ইহাকে মধ্যে ধরিয়া উত্তোলন করো। অনন্তর যাহাতে এই বাবাতার যোনিপ্রদেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেইভাবে ইহাকে ধরো। যেমন কৃষক বায়ুতে ধান্য শুদ্ধ করিতে করিতে ঝাটিতে গ্রহণ করে ও বপন করে…

২৩৷৷২৭: উর্ধ্বে এই পুরুষকে তুলিয়া ধরো। যেমন করিয়া পর্বতে ভারবস্তুকে উত্তোলন করা হয়। অনন্তর ইহার মধ্যপ্রদেশ চলিতে থাকুক। শীতল বায়ুতে যব শস্য শুদ্ধ করিতে করিতে…

উবট: প্রত্যুত্তরে বাবাতা উদ্গাতাকে বলিল, তোমা কর্তৃকও এই রকমই করা হউক। এই পুরুষকে, অর্থাৎ উদ্গাতাকে, উর্ধ্বে তুলিয়া ধরো। এইখানে স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় আচরণ করিতেছে। পর্বতে যেমন করিয়া ভার তোলে। অনন্তর এইরূপ ক্রিয়মান ইহার মধ্যপ্রদেশ চলিতে থাকুক, অর্থাৎ মৈথুন চলিতে থাকুক। অনন্তর ইহাকে চাপিয়া ধরো। যেমন কৃষক শীতল বায়ুতে যব শুদ্ধ করিতে করিতে ঝাটিতে গ্রহণ এবং বপন করে…

উদ্ধৃত অংশের বিশেষ করে একটি বিষয়ের দিকে নজর রাখা দরকার: মৈথুন-সংলাপের মধ্যে কী ভাবে ক্ষেত্রে বীজ বপনের কথাটা এলো। তাহলে বামাচারের সঙ্গে বার্তা-বিদ্যার সংযোগটা মনে হচ্ছে শুধুমাত্র কাপালিক-লোকায়তিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয়, খোদ বৈদিক ঐতিহ্যেও যেন একই ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

এ-আলোচনায় পরে ফেরা যাবে।

আপাতত, বড়ো সমস্যাটাই দেখা যাক। সমস্যা হলো: যজুর্বেদে পরের পর দশ দশটি এই রকম মন্ত্র আছে, এবং আধুনিক কোনো পণ্ডিতই বলতে পারছেন না যে উত্তরযুগের লম্পটেরা এগুলি রচনা করে বেদের মধ্যে গুঁজে দিয়েছে। অর্থাৎ, রচনাটি খোদ বৈদিক ঋষিদেরই।

অবশ্যই, পরের যুগের বেদপন্থীরা এই মন্ত্রগুলি নিয়ে খুবই বিপদে পড়েছেন। তার কারণ, তাঁদের উত্তরযুগের রুচির সঙ্গে এগুলি কিছুতেই খাপ খায় না। তাই পরের যুগে এমনকি বিধান দেওয়া হয়েছে, এই বৈদিক মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করবার জন্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে[২৩]। প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের মূলে নিশ্চয়ই পাপ-বোধ। অথচ, পুরাকালের বৈদিক ঋষিরা যদি সত্যিই একে পাপাচরণ মনে করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তার জন্য পাঁচ-পাঁচজন যজ্ঞীয় ঋত্বিককে নিয়োগ করতে চাইতেন না। তাই তাঁদের কাছে

পুরো ব্যাপারটাই যে একটি বৈদিক যজ্ঞ-বিশেষ সে-বিষয়ে কোনো রকম সন্দেহেরই অবকাশ নেই। বস্তুত, বেদের ছাত্রমাত্রই জানেন এই মন্ত্রগুলির সঙ্গে অশ্বমেধ যজ্ঞের কী রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

কিন্তু মৈথুনের সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের সম্বন্ধ আবার কী? ঠিক কী সম্পর্ক এ-কথার জবাব এখুনি দেওয়া যাবে না। কেননা, যজ্ঞ বলে ব্যাপারটির আসল তাৎপর্য নিয়েই প্রচুর আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আপাতত, আমরা শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি যে যজ্ঞ মানে যাই হোক না কেন, অনেক জায়গায় দেখা যায় প্রাচীনেরা মৈথুনকেও সরাসরি যজ্ঞের মতোই মনে করেছিলেন।

এ-কথার প্রমাণ রয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের একেবারে শেষের দিকে:

> স হ প্রজপতিরীক্ষাংচক্রে হন্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পযানীতি স স্ত্রীয়ং সসৃজে তাং সৃষ্ট্বাঽধ উপাস্ত তস্মাৎ স্ত্রিয়মধ উপাসীত স এতং প্রাঞ্চং গ্রাবাণমাত্মন এব সমুদপারয়ত্তে নৈনামভ্যসৃজৎ ॥৬।৪।২॥
> তস্যা বেদিরুপস্থো লোমানি বর্হিশ্চর্মাধিষবণে সমিদ্ধো মধ্যতস্তৌ মুষ্কৌ স যাচান্ হ বৈ বাজপেয়েন যজমানস্য লোকো ভবতি তাবানস্য লোকো ভবতি য এবং বিদ্বানধোপহাসংচরত্যাসাং স্ত্রীণাং সুকৃতং বৃঙক্তেঽথ য ইদমবিদ্বানধোপহাসংচরত্যস্য স্ত্রিয়ঃ সুকৃতং বৃঞ্জতে ॥৬।৪।৩॥
>
> প্রজাপতি মনে-মনে চিন্তা করলেন, 'এসো আমি এর জন্যে একটি প্রতিষ্ঠা সৃষ্টি করি। তিনি স্ত্রী সৃষ্টি করলেন। তাকে সৃষ্টি করে তিনি তার অধোদেশে মিলিত হলেন (উপাস্ত=মিলিত হলেন। মনিয়ার উইলিয়মস্-এর অভিধান দ্রষ্টব্য)। সেই কারণে স্ত্রীর অধোদেশে মিলিত হওয়া উচিত (উপাসীত)। তিনি নিজের উর্ধ্বোত্থিত গ্রাবাণকে (আক্ষরিক অর্থে গ্রাবাণ যদিও সোমরস নিষ্কাশনের শিলাখণ্ড, তবুও এখানে শব্দটি স্পষ্টই শিশ্ন-ব্যঞ্জক) প্রসারিত করে দিলেন। তার দ্বারা তিনি তাকে গর্ভবতী করলেন ॥৬।৪।২॥
> তার (অর্থাৎ স্ত্রীলোকটির) উপস্থ (=নিম্নাঙ্গ) বেদি (=যজ্ঞবেদী); তার লোম (=চুল) যজ্ঞতৃণ; তার চর্ম অধিষবন (=সোমরস নিষ্কাশনের যন্ত্র); তার মুষ্কদ্বয় (=*the two labia of the vulva*: রাধাকৃষ্ণণ ও হিউমের তর্জমা দ্রষ্টব্য) মধ্যস্থ অগ্নি। বাজপেয়-যজ্ঞকারীর কাছে জগৎ যতো বৃহৎ, এই (তত্ত্ব) জেনে যে মৈথুন করে তার কাছেও জগৎ ততো বৃহৎ। সে স্ত্রী দ্বারা নিজে শক্তিমান হয়। যে এ (তত্ত্ব) না জেনে মৈথুন করে স্ত্রী তার সুকৃতকে…॥৬।৪।৩॥ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ-রকম প্রকট বামাচারী চিন্তা যদি উপনিষদের মধ্যে মাত্র একবারই উঁকি দিতো তাহলে না হয় আধুনিক পণ্ডিতদের পক্ষে একে দেখেও-না-দেখার ভানটা অতোখানি দোষাবহ হতো না। কিন্তু উদ্ধৃত অংশের মূল কথাটি

শুধুমাত্র উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, অন্যত্রও তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ছান্দোগ্যের ঋষি বলছেন :

> যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্ যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥৫।৮।১॥
> তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি ॥৫।৮।২॥
>
> অর্থাৎ, হে গৌতম, স্ত্রীলোকই হলো যজ্ঞীয় অগ্নি। তার উপস্থই হলো সমিধ। ওই আহ্বানই হলো ধূম। যোনিই হলো অগ্নিশিখা। প্রবেশ-ক্রিয়াই হলো অঙ্গার। রতিসম্ভোগই হলো বিস্ফুলিঙ্গ ॥৫।৮।১॥
> এই অগ্নিতে দেবতারা রেতর আহুতি দেন। সেই আহুতি থেকেই গর্ভ সম্ভব হয় ॥৫।৮।২॥

আবার, বৃহদারণ্যকেও হুবহু এই কথাই দেখতে পাওয়া যায় :

> যোষা বা অগ্নির্গৌতম তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সংভবতি…॥৬।২।১৩॥

তর্জমা আগের উদ্ধৃতিটির অনুরূপ হবে।

তাহলে, উপনিষদের ঋষি মৈথুন-ক্রিয়াকে খোলাখুলি ভাবেই যজ্ঞ বলে উল্লেখ করছেন। কথায় কথায় সোমযাগ থেকে উপমা নেবার চেষ্টাটাও লক্ষ্য করবার মতো। আমাদের আধুনিক রুচিতে এ-সব কথাবার্তা যতোই কদর্য লাগুক না কেন, উপনিষদের ঋষিরা এই তত্ত্বটির প্রতিই যে কতোখানি গুরুত্ব দিতে চান তার পরিচয় পাওয়া যায় নানান দিক থেকে। বৃহদারণ্যকে উক্ত তত্ত্ব বলবার পরই ঋষি তিনজন প্রাচীন জ্ঞানীর নজির দেখাচ্ছেন : বিদ্বান উদ্দালক আরুনি, বিদ্বান নাক মৌদগল্য, বিদ্বান কুমারহারিত —তিনজন বিদ্বানই নাকি এই তত্ত্ব জানতেন এবং সেই মর্মে উপদেশ দিয়েছেন। এবং এই প্রসঙ্গেই এগিয়ে বৃহদারণ্যকের ঋষি বলছেন :

> …যদ্যুদক আত্মানং পশ্যেত্তদভিমন্ত্রয়েত ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং যশো দ্রবিণং সুকৃতমিতি শ্রীর্হ বা এষাং স্ত্রীণাং যন্মলোদ্বাসাস্তস্মান্মলোদ্বাসসং যশস্বিনীমভিক্রম্যোপমন্ত্রয়েত ॥৬।৪।৬॥
> সা চেদস্মৈ ন দদ্যাৎ কামমেনামবক্রীণীয়াৎ সা চেদস্মৈ নৈব দদ্যাৎ কামমেনাং যষ্ট্যা বা পাণিনা বোপহত্যাতিক্রামেদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদদ ইত্যযশা এব ভবতি ॥৬।৪।৭॥

…কেউ যদি নিজেকে জলে দেখে তাহলে জপ করবে, 'আমাতে তেজ, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, যশ, ধন, সুকৃত (আসুক)'।

এই হলো স্ত্রীলোকের মধ্যে শ্রী, যখন সে মলোদ্বাসা হয় (মল+উৎবাসাঃ, খুব সম্ভব, ঋতুর পর মলবস্ত্র ত্যাগ করবার উল্লেখ করা হচ্ছে)। অতএব মলোদ্বাসা যশস্বিনী স্ত্রীলোকের নিকট গমন করে তাকে আহ্বান করবে।৬।৪।৬।

সে (স্ত্রীলোকটি) যদি তাকে কাম দিতে রাজী না হয় তাহলে তাকে (স্ত্রীলোকটিকে) নিজ বশে আনয়ন করবে। সে (স্ত্রীলোকটি) যদি তাকে (পুরুষটিকে) কাম দিতে রাজী না হয় তাহলে তাকে (স্ত্রীলোকটিকে) লাঠি দিয়ে বা হাত দিয়ে প্রহার করে অভিভূত করে বলবে, 'আমার ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা, আমার যশদ্বারা তোমার যশকে কেড়ে নিচ্ছি'। এই ভাবে সে (স্ত্রীলোকটি) যশহীনা হয়।৬।৪।৭। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য, আজকের দিনে এ-ধরনের উপদেশ দিতে গেলে আমরা ঋষির গৌরব পাবার বদলে নিজেরাই লাঠিপেটা বা কিলচড় খাবো। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদের লেখক মেয়েদের লাঠি-পিটে, কিলচড় লাগিয়ে কামভাব চরিতার্থ করতে দিতে বাধ্য করবার উপদেশ দিয়েও মারধোর খেয়েছিলেন বলে কোথাও লেখা নেই। বরং তাঁর লেখা বইকে প্রাচীনেরা জ্ঞানের আকর বলেই মনে করছেন।

আর, এই থেকে কি প্রমাণ হয় না যে মৈথুন ও কাম সম্বন্ধে আমাদের আজকের দিনের যা-ধারণা তার সঙ্গে সেকালের মানুষদের ধারণার একেবারে আকাশ-পাতাল তফাত?

তফাত যে হয়েছিলো এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনো রকম অবকাশই নেই। কেননা, মহাভারতের যুগে দেখা যায় এ-বিষয়ে পুরোনো কালের ধ্যানধারণার সঙ্গে নতুন কালের ধ্যানধারণাগুলো আর মিল খাচ্ছে না। আদিপর্বের ১২২ অধ্যায় দেখুন[২৪] :

পূর্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্ত ধারণপূর্বক কহিলেন, আইস আমরা যাই। ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্বক ('বলাৎ ইব') লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, বৎস ক্রোধ করিও না, ইহা নিত্যধর্ম। (এষঃ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।১।১২২।১৪।)। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্মলিপ্ত হয় না। ঋষিপুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত পূর্বাপেক্ষা ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমধ্যে বলপূর্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতিভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমারব্রহ্মচারিণী

বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণহত্যা সদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। (কালিপ্রসন্ন সিংহের তর্জমা)

যৌনজীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা যে একটি বিশেষ যুগেই বদলেছে—আগে একরকম ছিলো, পরে অন্যরকম হলো—এ-কথার এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ আর কী হবে? সেই যুগ বলতে ঠিক কোন যুগ,—কোন যুগ থেকে কামজীবন সম্বন্ধে আধুনিক ধ্যানধারণার শুরু,—এ-প্রশ্ন অবশ্যই স্বতন্ত্র।

আমাদের কাছে এখানে প্রধান সমস্যা হলো, সেকালের ধারণাটা ঠিক কী রকম? কোন রকম ধারণার বশবর্তী হলে পর বৈদিক ঋষিদের পক্ষে কামজীবনকে অতোখানি গুরুত্বপূর্ণ, অতোখানি উদ্দেশ্যমূলক, মনে করা সম্ভবপর? এ-প্রশ্নের পুরো জবাবটা অবশ্যই শুধুমাত্র বৈদিক সাহিত্যের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। অন্য কোন দিক থেকে জবাবটা পাবার সম্ভাবনা সে-কথায় একটু পরে ফেরা যাবে। কিন্তু, যেটা খুবই বিস্ময়ের কথা, এ-বিষয়ে বৈদিক সাহিত্য আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ করে না। উপনিষদ এবং বিশেষ করে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির কাছ থেকেই প্রশ্নটার অন্তত আংশিক উত্তর পাওয়া যাচ্ছে।

উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় ছান্দোগ্য-উপনিষদের বামদেব্য ব্রতের কথা। 'বামদেব্য' নামটার দিকে নজর রাখবেন। বৈদিক সাহিত্যেও বামাচারের স্মারক রয়েছে তার একটি স্পষ্ট নিদর্শন ওই নামের মধ্যেই।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে লেখা আছে :

উপমন্ত্রয়তে স হিংকারো জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্গীথঃ প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ ॥২।১৩।১॥
স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম্ ॥২।১৩।২॥

আহ্বান করে, সেই হলো হিঙ্কার। প্রস্তাব করে, সেই হলো প্রস্তাব। স্ত্রীর সঙ্গে সে শয়ন করে, সেই হলো উদ্গীথ। স্ত্রীর অভিমুখ হয়ে শয়ন করে, সেই হলো প্রতিহার। সময় অতিবাহিত হয়, তাই নিধন। এই বামদেব্য নামক সাম মিথুনে প্রতিষ্ঠিত। ॥২।১৩।১॥
যে এইভাবে বামদেব্য সামকে মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বলে যে জানে সে মিথুনে মিলিত হয়। (তার) প্রত্যেক মিথুন থেকেই সন্তান উৎপন্ন হয়। সে পূর্ণজীবী হয়। সন্তান, পশু ও কীর্ত্তিতে মহান হয়। কোনো স্ত্রীলোককেই পরিহার করবে না—এই-ই ব্রত ॥২।১৩।২॥

"মিথুনাৎ মিথুনাৎ প্রজায়ন্তে সর্বম্ আয়ুঃ এতি জ্যোক্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা"—এই হলো আসল কথা।

মিথুন থেকে কী কী পাওয়া যাবে তার ফর্দ দেখুন :

সন্তান পাওয়া যাবে।
পূর্ণ জীবন পাওয়া যাবে।
পশু পাওয়া যাবে।
মহান্ কীর্তির নামডাক পাওয়া যাবে।

এখানে বিশেষ করে যে-দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি তা হলো, উপনিষদের ঋষি মৈথুনকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনেরই উপায় মনে করছেন না, সেই সঙ্গেই ধনউৎপাদনের উপায় বলেও বর্ণনা করছেন। উপনিষদের যুগেও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটা অনেকখানিই পশুপালনমূলক ; তাই ধনউৎপাদন বলতে প্রধানতই পশুবৃদ্ধি।

আর এই ধারণার দরুনই মিথুনকে এতোখানি জরুরী বলে মনে করা হচ্ছে যে ঋষি মিথুনের বিভিন্ন স্তরকে হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার প্রভৃতি পঞ্চবিধ সামগানের সঙ্গে এক বলে বর্ণনা করছেন। শুধু তাই নয়, উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, "ন কাঞ্চন (=কাম্+চন=কোনো স্ত্রীলোককে) পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম"—কোনো স্ত্রীলোককেই পরিহার করবে না, তাহা-ই ব্রত।

তাহলে প্রাচীনদের মনে মিথুন সম্বন্ধে ধারণাটা ঠিক আমাদের মতো নয়।

আমাদের ধারণায় মিথুন থেকে কী পাওয়া যায় ? সন্তান।

ঋষিদের ধারণায় মিথুন থেকে কী পাওয়া যায় ? শুধু সন্তান নয়, ধনসম্পদও।

আমাদের ধারণায় সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে ধনসম্পদ উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁদের ধারণায়, ধনসম্পদ উৎপাদন ও সন্তান উৎপাদন—দু'-এর মধ্যে সম্পর্ক বড়ো গভীর।

এখন, আমাদের ধারণাটা ঠিক না তাঁদের ধারণাটা ঠিক, এ-নিয়ে তর্ক তোলবার দরকার নেই। অবশ্যই, এ-বিষয়ে আমাদের ধারণা তাঁদের চেয়ে অনেক স্পষ্ট, অনেক নির্ভুল। তার তুলনায়, তাঁদের ধারণাটার প্রায় পনেরো আনাই কল্পনা। কিন্তু যেটা আসলে ঢের বড়ো কথা, তাঁদের যুগে তাঁদের মনে এই রকমের একটা কল্পনা সত্যিই ছিলো, ছিলো ওই রকমের একটা ভুল ধারণা। তাই তাঁদের লেখা পুঁথিপত্র আমরা যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের একালের ধ্যান-ধারণাগুলিকে তাঁদের লেখার উপর আরোপ করে বসলে প্রকাণ্ড ভুল

হবে—ঠিক কী ভেবে তাঁরা কী লিখেছিলেন সে-কথা আমরা বুঝতেই পারবো না।

তাঁদের মনে যে সত্যিই ওই রকমের একটা ধারণা ছিলো এ-কথার প্রমাণ শুধুই উপনিষদ নয়, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিও। বরং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে এই কথা এতোবার এবং এতো স্পষ্টভাবে তাঁরা লিখে রেখেছেন যে সেদিকে চোখ না পড়াটাই বিস্ময়কর। স্থানসংকুলনের খাতিরে আমরা এখানে মাত্র একটি নমুনার উল্লেখ করতে পারবো ; উৎসাহী পাঠক পাদটীকায় অন্যান্য বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাবেন[২২]। আমাদের এই দৃষ্টান্তটি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্চিকা প্রথম অধ্যায় থেকে সংগৃহিত, তর্জমা শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর[২৩] :

> যে যজমান আপনাকে অপ্রতিষ্ঠিত মনে করে সে ঘৃতপক্ক চরু নির্বাপন করিবে। (অপ্রতিষ্ঠিত অর্থে, পুত্রাদিরহিত ও গবাদিরহিত)।
> হে বৎস, যে এইরূপ প্রতিষ্ঠারহিত সে ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত (শ্লাঘ্য) হয় না। (ঘৃতচরুর দ্বারা সেই অপ্রতিষ্ঠার পরিহার হয়)।
> তাহাতে (সেই ঘৃতপক্ক চরুতে) যে ঘৃত আছে তাহা স্ত্রীর পয়ঃ (শোনিতস্বরূপ) আর যে তণ্ডুল আছে তাহা পুরুষের (রেতঃ স্বরূপ) ; সেই ঘৃততণ্ডুল মিথুন সদৃশ ; সেই জন্য এই মিথুনদ্বারাই (ঘৃততণ্ডুলময় চরুপ্রদানদ্বারা) ইহাকে (যজমানকে) সন্ততিদ্বারা ও পশুদ্বারা বর্ধিত করা হয়। (সেই হেতু এই চরু) প্রতিষ্ঠারই হেতু।

এখানেও সেই একই ধারণা : মিথুন থেকে শুধুই যে সন্তান পাওয়া যাবে তাই নয়, ধনসম্পদও। মনে রাখবেন, সে-যুগে ধনসম্পদ বলতে প্রধানত পশুই। তাহলে সে-যুগের যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের ধারণায় ধনউৎপাদন আর প্রজনন এমন কিছু আলাদা ব্যাপার নয়। মিথুন থেকে শুধু সন্তান পাবার আশা নয়, পশুদ্বারা বর্ধিত হবার আশাও। আর এই কথায় যদি বিশ্বাস অটুট হয় তাহলে তাঁরা স্বভাবতই উপদেশ দেবেন : 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম্', কোনো স্ত্রীলোককেই পরিত্যাগ করবে না—তাই-ই ব্রত।

আধুনিক কালের পণ্ডিতেরা বেদ-উপনিষদে এ-ধরনের কথা লেখা আছে দেখে বিলক্ষণ বিরক্তিবোধ করতে পারেন। তার কারণ, এ-ধরনের কথা বলবার পিছনে যেটা হলো নিছক আধুনিক যুগের উদ্দেশ্য সেটাকেই তাঁরা একমাত্র উৎসাহ মনে করেন। আর যদি তাই হয় তাহলে বেদ-উপনিষদের লেখকদের মধ্যে অত্যন্ত স্থূল আর কদর্য মনোবৃত্তি কল্পনা না করে উপায় থাকে না। কিন্তু তাই বা কী করে বলা যায়? হাজার হোক, তাঁরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। ফলে আধুনিক পণ্ডিতদের পক্ষে একমাত্র উপায় হলো ঋষিদের এই জাতীয়

কথাবার্তাগুলিকে চেপে যাওয়া। আমরা বলতে চাই, ওই পদ্ধতিটাই ভুল। কেননা, প্রাচীনেরা কী ভেবে কী লিখেছেন তা ঠিকমতো বুঝতে হলে সবপ্রথম মনে রাখা দরকার যে প্রাচীনেরা ছিলেন প্রাচীন—তাই একালের ধ্যানধারণাগুলি তাঁদের মধ্যে কল্পনা করাটাই অসঙ্গত ও যুক্তিহীন।

সন্তান উৎপাদন আর ধন-উৎপাদন

লোকায়তিকদের কথায় ফিরে আসা যাক। কাপালিকদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে যে সমস্যা উঠেছিলো বৈদিক সাহিত্যের নজির থেকেই তার যেন একটা কিনারা পাওয়া যাচ্ছে। বৃহস্পতি বলছেন, লোকায়ত আর কাপালিক দু'-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শুধু বৃহস্পতিই নন, গুণরত্নের লেখা বইতেও এই কথাই। এদিকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখছেন, লোকায়ত হলো অর্থসাধনশাস্ত্র—আধুনিক ভাষায় ধনউৎপাদনের শাস্ত্র, সায়েন্স অব ইকনোমিক্স। অপর পক্ষে, কাপালিক হলো কামসাধনশাস্ত্র, মহামহোপাধ্যায়ের ভাষায় সায়েন্স অব ইরোটিক্স।

অবশ্যই, আমাদের আধুনিক ধারণা অনুসারে ইকনোমিক্স-এর সঙ্গে ইরোটিক্স-এর—ধনউৎপাদনের সঙ্গে কামসাধনের—কোনো সম্পর্ক নেই। আর যদি তা না থাকে তাহলে সেকালের পুঁথিপত্রে লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিকদের অভেদ-সূচক যে-সব কথাবার্তা সেগুলির তাৎপর্য খোঁজবার কোনো মানে হয় না। মহামহোপাধ্যায়ের নিজের লেখার মধ্যে এই রকমেরই একটা পরাজয় স্বীকার করার ইঙ্গিত থেকে গিয়েছে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, প্রাচীনদের মত অনুসারে লোকায়ত ও কাপালিক আলাদা নয়। আর এক জায়গায় তিনি বলছেন, লোকায়তিকেরা ছিলেন অর্থনীতি বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা, কাপালিকেরা কামশাস্ত্রের: কিন্তু দু'-এর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তিনি কোনো কথাই তুললেন না। অথচ তা যদি না তোলা হয় তাহলে লোকায়ত আর কাপালিক যে কী করে এক হলো সে-সমস্যার সমাধান দেবার চেষ্টাই করা হলো না।

অথচ, আমরা দেখলাম বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা এ-সমস্যার উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। কেননা, বৈদিক সাহিত্য থেকে অন্তত এটুকু বোঝা গেলো যে আজকালকার দিনে ধনউৎপাদন ও সন্তানউৎপাদনকে আমরা যতোখানিই সম্পর্কহীন ও বিচ্ছিন্ন চেষ্টা মনে করি না কেন প্রাচীনকালের কোনো একটা যুগের মানুষ তা মনে করতো না। আর তাহলে কি এমনটা

হতে পারে না যে, যে-কালের বা যে-স্তরের ধ্যানধারণার স্মারক বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে টিকে রয়েছে সেই-স্তরের চেতনা থেকেই লোকায়ত ও কাপালিক মতের উৎপত্তি? সকলেই বলছেন, লোকায়তিকদের মতে অর্থ ও কামই হলো পরম-পুরুষার্থ; কিন্তু এমন কথা তো কেউই বলছেন না যে মানব-চেতনার একটি পুরানো স্তরে যেহেতু অর্থসাধন ও কামসাধন স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা নয় সেই হেতু এমনটা হওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব নয় যে, সেই স্তরের চেতনাই লোকায়তিকদের মধ্যে প্রতিফলিত—তাদের কাছে হয়তো অর্থ ও কাম স্বতন্ত্র পুরুষার্থ নয়, একই পুরুষার্থের যেন এপিঠ-ওপিঠ।

অবশ্যই মানি, বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের বা কামাচারের স্মারককে সূত্র হিসেবে অবলম্বন করে লোকায়তিকদের কথা বোঝবার চেষ্টা করলে রাশি রাশি প্রশ্ন উঠবে। কেননা, বেদনিন্দুক বা নাস্তিক বলেই যাদের প্রধান পরিচয় বেদমন্ত্রের সাহায্যে তাদের কথা বুঝতে পারবার দাবিটা সরাসরি অসম্ভব মনে হবারই কথা। বিশেষত, আর্য-অনার্য মতবাদ রয়েছে—পণ্ডিত মহলে অনেকেরই ধারণা বৈদিক সাহিত্য যে রকম বিশুদ্ধ আর্য-সাহিত্য বামাচারাদি তেমনিই বিশুদ্ধ অনার্য-ব্যাপার। তাই, এর সাহায্যে ওকে বোঝবার চেষ্টা একান্তই অসম্ভব।

আমরা কিন্তু বলতে চাই, তা নয়। শুধুই যে কিছুকিছু বেদমন্ত্রের সাহায্যে বেদনিন্দুকদের কথা বুঝতে পারা যায় তাই নয়, বেদনিন্দুকদের কিছুকিছু কথা বিচার করেও বৈদিক সাহিত্যকে বোঝবার অবকাশ রয়েছে। তার কারণ আমরা প্রথম পরিচ্ছেদেই আলোচনা করেছি: বৈদিক বা অ-বৈদিক যে-কোনো ধ্যানধারণাই হোক না কেন, প্রত্যেকটিরই উৎসে রয়েছে সমাজ-বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের কথা। এবং সমাজ-বিকাশের যে-পর্যায়টির মধ্যে লোকায়তিক চেতনার উৎস বৈদিক মানুষেরাও এককালে সেই পর্যায়েই বাস করতেন, ফলে তাঁদের রচনায় সেই পর্যায়ের স্মারক টিকে থাকা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। তাই, উত্তরকালে বেদপন্থী ও বেদনিন্দুকদের মতাদর্শে যতোই প্রভেদ দেখা দিক না কেন, বৈদিক সাহিত্যের স্মারকের সাহায্যেই ওই বেদনিন্দুকদের কিছুকিছু কথা বুঝতে পারার সম্ভাবনা সত্যিই রয়েছে। অবশ্যই এ-কথা বলতে গেলে বিদগ্ধ সমাজে যে-মতবাদ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে—অর্থাৎ আর্য-অনার্য বা আর্য-দ্রাবিড় মতবাদ—তার সংকীর্ণতা ঠিক কোথায় সে-প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা তোলা দরকার। কিন্তু শুরুতেই যদি এতো রকম সমস্যার জোটে জড়িয়ে পড়তে হয় তাহলে আর অগ্রসর হবার সম্ভাবনা থাকে না। তাই, আপাতত শুধু বামাচার বা কামাচারের কথাটা আরো একটু তলিয়ে দেখা যাক।

কথা হলো, কোনো এক যুগে,—কিংবা আরো সাবধানে বললে বলা

উচিত মানব সমাজের ক্রমোন্নতির কোনো এক পর্যায়ে,—সন্তান-উৎপাদন ও ধন-উৎপাদনকে মানুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি ক্রিয়া বলে চিনতে শেখে নি। সে-যুগটা যাই হোক না কেন, সে-পর্যায়টা যাই হোক না কেন, বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্যকে যদি আপনি গুরুত্ব দিতে রাজী হন তাহলে আপনাকে মানতেই হবে যে, বৈদিক মানুষেরাই এককালে ক্রমোন্নতির এ-রকম একটা পর্যায়ে বেঁচে ছিলো। তারই রাশি রাশি স্মারক রয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। এ-কথা যদি আপনি না মানেন তাহলে আপনাকে বলতে হবে মৈথুন নিয়ে অমন প্রচণ্ড উৎসাহটা বৈদিক ঋষিদের পক্ষে অতি কদর্য কামবিকারেরই পরিচয়। আমরা আপনার কথায় সায় দিতে পারবো না। কেননা, আমরা দেখেছি বৈদিক রচনায় যেখানে কামাচারের কথা সেখানে রসালো অশ্লীলতা উপভোগ করবার কোনো রকম লক্ষণই নেই। বরং এই বামাচার যে তাঁদের কাছে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার তার পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন একে যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করে, সামগানের সঙ্গে তুলনা করে। যজ্ঞ ও সামগান সম্বন্ধে আজকের দিনে আমরা যতো হালকা কথাবার্তাই বলতে শিখি না কেন তাঁদের কাছে এগুলিই ছিলো জীবনের সর্বস্ব।

বেদে লেখা আছে,—কথাটা তাই মানতেই হবে। মানতেই হবে, ক্রমোন্নতির কোনো এক পর্যায়ে মানুষ সত্যিই মনে করেছিলো, মিথুনের দরুন শুধু সন্তান উৎপাদনই নয়, ধন উৎপাদনও সম্ভবপর। তাই, সমস্যা হলো: এ-পর্যায় সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা যাবে কোথা থেকে?

একবার উল্টো দিক থেকে চেষ্টা করা যাক। বেদনিন্দুকদের কথা বোঝবার আশায় বৈদিক সাহিত্যের সাহায্য নেওয়া গিয়েছে। এবার দেখা যাক বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের ওই স্মারকগুলি মানব চেতনার ঠিক কোন স্তরের পরিচায়ক সে-কথা বোঝবার ব্যাপারে বেদনিন্দুকদের দিক থেকে এগোলে কি কোনো সুবিধে হতে পারে?

গুণরত্নের কথা বলেছি। লোকায়ত-সংক্রান্ত তাঁর কিছুকিছু মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: লোকায়তিকেরা যোগী, তারা গায়ে ভস্ম মাখে, তারা বামাচারী, তারা কাপালিক। গুণরত্ন কিন্তু লোকায়তিকদের সম্বন্ধেই আরো কিছু কথা বলেছেন, মহামহোপাধ্যায় তার উল্লেখ করেন নি।

গুণরত্ন বলেছেন, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে লোকায়তিকেরা একত্র সমবেত হয়। তারা একত্রে মিলিত হয় এবং প্রমত্ত হয় নির্বিচার মৈথুনে।

বর্ষে বর্ষে কস্মিন্ অপি দিবসে সর্বে সংভূয় যথানাম নির্গময় স্ত্রীভিঃ অভিরম্যন্তে২৭...

বলাই বাহুল্য, লোকায়তিকদের সম্বন্ধে এই সংবাদটি দেবার পিছনেও গুণরত্নের আসল উদ্দেশ্যটা হলো তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করা। কিন্তু তা হোক। তবুও গুণরত্ন লোকায়তিকদের সম্বন্ধে এই যে খবরটি দিলেন এর জন্যে ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেক ছাত্রই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। কেননা, এটুকু সংবাদের মধ্যে শুধুই যে লোকায়তিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎস সম্বন্ধে মূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া গেলো তাই নয়, বামাচারী ক্রিয়াকাণ্ডগুলি মানব সমাজের ঠিক কোন স্তরের পরিচায়ক সে-কথা অনুমান করবারও একটি সুযোগ পাওয়া গেলো।

গুণরত্নের দেওয়া এই তথ্যটি সম্বন্ধে ভালো করে ভেবে দেখুন। ব্যাপারটা কী? মানুষগুলো এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে, একত্রে পানাহার করছে, প্রমত্ত হয়ে উঠছে অবারিত মৈথুনে। একে কি কোনো একরকম দলগত কামবিকার বলতে হবে নাকি? এখানেও সেই একই কথা। শুধুমাত্র একালের লাম্পট্য-ব্যবহারকে সম্বল করলে সেকালের আচরণকে বুঝতে পারা যাবে না।

তাহলে? বুঝতে পারবার আশায় কোন পথ ধরে এগোবো?

ভেবে দেখতে হবে, পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আজো যে-সব পেছিয়ে-পড়া মানুষের দল টিকে রয়েছে তাদের মধ্যে এ-ধরনের আচরণ সত্যিই দেখতে পাওয়া যায় কি না। যদি সত্যিই দেখতে পাওয়া যায় তাহলে প্রশ্ন তুলতে হবে, ঠিক কী ভেবে তারা এ-ধরনের আচরণ করছে? তাদের চেতনাতেও কি এ-আচরণ শুধু লাম্পট্য, না, এরই সাহায্যে তারা কোনো রকম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করবার চেষ্টা করছে? হয়তো তাদের সে-চেষ্টাটা শুধুই কল্পনা, বাস্তব তথ্যের দিক থেকে হয়তো তার পুরোটাই ভুল। তবুও আসল প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্ন হলো, তাদের ধারণাটা ঠিক কী? সে-ধারণার সঙ্গে আমাদের ধারণার মিল আছে কি?

প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলির যে-সব কথার কোনো রকম মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এইদিক থেকে এগোলে হয়তো তার মানে পাওয়া যেতে পারে। তার কারণ, পুঁথিগুলি প্রাচীন বলেই সেগুলির মধ্যে ওই পিছিয়ে-পড়া সমাজের মানুষদের চেতনার রেশ থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়।

তাহলে প্রাচীন পুঁথির অর্থ অন্বেষণ করবার সময় শুধুমাত্র পুঁথির রাজ্যে আবদ্ধ থাকলেই চলবে না। পুঁথির রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে এই বাস্তব পৃথিবীতে—যে-পৃথিবীতে সব মানুষের সমান উন্নতি হয় নি, কেউ বা এগিয়ে গিয়েছে অনেকখানি, কেউ বা পিছিয়ে পড়ে রয়েছে অনেক দূরে। যারা এগিয়ে গিয়েছে, উঠে এসেছে সভ্যতার হিমাদ্রিশিখরে, তাদের চেতনা থেকে অনেকাংশেই বিলুপ্ত হয়েছে নিজেদের অসভ্য অতীতের স্মৃতি; আর তাই, যারা পিছিয়ে পড়ে রয়েছে তাদের দিকে নজর করলে—ভালো করে

নজর করলে—সভ্য মানুষদের এই ভুলে যাওয়া অতীতকে খুঁজে পাওয়া হয়তো অসম্ভব হবে না। আর এইদিক থেকে আলো পেয়েই আমরা হয়তো দেখতে পাবো আমাদের সুদূর পূর্বপুরুষেরা ঠিক কী ভেবে, কোন ধারণায় বিশ্বাস করে ওই জাতীয় কথাবার্তা লিখে গিয়েছেন।

কথাটা বিশেষ করে তুললাম, বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের চিহ্নগুলি বোঝবার প্রসঙ্গে। কিন্তু, বৈদিক সাহিত্যে আদিম চিন্তার স্বাক্ষর বলতে শুধু ওই বামাচার নয়। আরো নানা রকম চিহ্ন আছে। সেগুলিকেও বুঝতে হবে। তাই, কোন পদ্ধতিতে বোঝা সম্ভব এ-বিষয়েও একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে হবে। আপাতত বামাচারী চেতনার উৎস নিয়েই অনুসন্ধান চালানো যাক। এ-অনুসন্ধান যদি সফল হয় তাহলে নিশ্চয়ই আশা করা ভুল হবে না যে, যে-পদ্ধতির অনুসরণে তা সফল হলো তারই সাহায্যে বৈদিক সাহিত্যে টিকে থাকা আদিম ধ্যানধারণার অন্যান্য চিহ্নও বুঝতে পারা যাবে। শুধু তাই নয়, মানবজাতির ক্রমোন্নতি-পথের ঠিক কোন স্তরের চেতনায় লোকায়তিক-বামাচারের উৎস সে-কথা নির্ণয় করা যদি সম্ভব হয় তাহলে হয়তো তারই সাহায্যে অনুমান করা যাবে, বৈদিক সাহিত্যের বামাচারের স্মারকগুলিও ঠিক কোন ধরনের সমাজবিকাশের পরিচায়ক। অর্থাৎ কিনা, বামাচারের ওই স্মারকগুলিই হয়ে দাঁড়াতে পারে একটি নির্দিষ্ট সমাজ-সংগঠনের সাক্ষ্য। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, বৈদিক বামাচার ও লোকায়তিক বামাচার হুবহু একই রকমের। দু'-এর মধ্যে তফাত আছে: বৈদিক বামাচার মূলতই পুরুষপ্রধান—ঝোঁকটা শুধুই পুরুষের উপর, যা কিছু ভাবা হচ্ছে বা বলা হচ্ছে তা পুরুষের তরফ থেকে। যেমন ধরুন, ছান্দোগ্যের ঋষি বলছেন: কোনো স্ত্রীলোককেই পরিহার করবে না। বৃহদারণ্যকের ঋষি আরো এক-পা এগিয়ে যাচ্ছেন; বলছেন, নারী যদি মৈথুনে রাজী না হয় তাহলে কিলঘুঁষি এমনকি লাঠি মেরে তাকে রাজী করাতে হবে। উপনিষদ থেকেই এই পুরুষ-প্রাধান্যের আরো অনেক নজির তোলা যায়। এর তুলনায়, লোকায়তিক বামাচার মূলতই স্ত্রী-প্রধান। স্ত্রীই শক্তি, শক্তিই সব। এই তফাতের কারণ কী?—সে-বিষয়ে পরে দীর্ঘতর আলোচনা তুলতে হবে।

আপাতত, বামাচারী চেতনার উৎস-সন্ধানেই অগ্রসর হওয়া যাক। অগ্রসর হবার একটা সূত্র পাওয়া গিয়েছে: গুণরত্ন-বর্ণিত লোকায়তিকদের রতি-উৎসব[২৮]।

সে-বর্ণনাকে ঠিকমতো বুঝতে হলে, নিছক পুঁথিপত্রের বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা চলবে না।

তাহলে, পুঁথির গণ্ডি পিছনে ফেলে বাস্তব পৃথিবীতেই বেরিয়ে পড়া

যাক। দেখা যাক, গুণরত্ন-বর্ণিত ওই লোকায়তিক আচরণের সঙ্গে হুবহু মিল আছে—এমন কোনো দৃশ্য সত্যিই চোখে পড়ে কি না।

পড়ে। আপনি যদি সত্যিই বেরিয়ে পড়তে রাজী হন তাহলে স্বচক্ষে দেখে আসতে পারবেন। খুব বেশি দূরও যেতে হবে না। বাংলা দেশের সাঁওতাল-অঞ্চল পর্যন্ত গেলেই হবে। পৌষ মাসে যাবেন। ওই সময়টাতেই সাঁওতালদের ওই রকমের উৎসব। কিন্তু মজা হলো, উৎসবটার নামের সঙ্গে আষাঢ় মাসের যোগাযোগ রয়েছে। তার কারণ, উৎসবটা বুঝি আগেকার কালে আষাঢ় মাসেই হতো। সাঁওতালদের স্মৃতিতে আজো সে-কথা টিকে রয়েছে। এই সময়-বদলটা অবশ্যই অহেতুক নয়। আধুনিক গবেষক অনুমান করছেন, এর সঙ্গে চাষবাসের উন্নতির সম্পর্ক আছে[২৯]। অর্থাৎ কিনা, আগেকার কালে তাদের কাছে আউশই ছিলো একমাত্র ফসল। বর্ষার সেই ফসল উপলক্ষেই তাদের উৎসবটা ছিলো বর্ষাকালে। তারপর, আমন বা হৈমন্তিক ফসল ফলাতে শেখবার পর উৎসবের সময়টা বর্ষা বদলে হেমন্ত হলো।

ছোটোনাগপুরের[৩০] দিকেও যেতে পারেন। এ-ধরনের উৎসব শুধুমাত্র সাঁওতালদের মধ্যেই টিকে নেই। ছোটোনাগপুরের দিকে দেখবেন, মুণ্ডা, হো প্রভৃতিদের মধ্যেও এ-উৎসব আজো কী ভাবে বর্তমান। তবে, ওদের উৎসবটা যদি দেখতে চান তাহলে আষাঢ় মাসে বরাবরই যেতে হবে। তার কারণ কি এই যে ওরা এখনো আমন-ফসলটাকে বড়ো ফসল মনে করতে শেখে নি?

আরো নানান দিকে যাওয়া যায়। জয়পুরের দিকে গেলে পাঞ্জাদের মধ্যে এই উৎসব দেখা যায়, নিলগিরির দিকে গেলে দেখা যায় কোটারদের মধ্যে[৩১]। বিদেশ যেতে যদি রাজী হন তাহলে মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া বা ওই রকম আরো নানান জায়গায় এই উৎসবটাই আপনার চোখে পড়বে[৩২]। কিন্তু স্বদেশেই দেখুন আর বিদেশেই দেখুন, একটা ব্যাপার দেখে অবাক হতেই হবে: নির্বিচার মৈথুনের এই যে উৎসব, এর সঙ্গে ফসলের সম্পর্কটা সর্বত্রই ঘনিষ্ঠ।

সাঁওতালরাই সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে। সাঁওতালদের মধ্যে এ-উৎসব কী ভাবে টিকে আছে তাই দেখা যাক:

> Five days are spent in dancing, drinking and debauching. It is significant that at the commencement the village-headman gives a talk to the village people, in which he says that they may act as they like sexually, only being careful not to touch certain women: otherwise they may amuse themselves.

The village people reply that they are putting twelve balls of cotton in their ears and will not pay any heed to, nor hear or see, anything. This festival is in many ways a disgrace to this people[৩৬].

অর্থাৎ নাচ, মদ্যপান ও ব্যাভিচারে কাটে পাঁচ দিন। লক্ষ্য করা দরকার যে, শুরুতে গ্রামের মোড়ল গ্রামের সবাইকে ডেকে একটি বক্তৃতায় বলে, মৈথুন ব্যাপারে যা খুসি তাই করতে পারো, কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি নারীকে স্পর্শ করা চলবে না, তাছাড়া মনের সুখে মজা করো। উত্তরে গ্রামের সবাই বলে যে, তারা কানের মধ্যে বারো গোলা তুলো পুরছে,—কোনো দিকে নজর দেবে না, কিছুই শুনবে না, কিছুই দেখবে না—কিছুই নয়। এ-উৎসব ওদের পক্ষে এক কলঙ্ক।

উদ্ধৃতির শেষ কথাটি নজর করবেন: আধুনিক কালের লাম্পট্য-ব্যবহারের কাছ থেকে আলো পেয়ে ওদের আচরণটাকে বুঝতে গেলে এ-ধরনের একটা মন্তব্য করা ছাড়া উপায় নেই। ওদের শুধোন, একেবারে অন্য জবাব পাবেন। ডাল্টন[৩৭] সাহেব অনেককাল আগেই সে-জবাব সংগ্রহ করে গিয়েছেন: ফসলের এই সময়টায় ওরা অনুভব করে নিজেদের মধ্যে বীজের ভার। ক্ষেত্রে বীজ ছড়ানো আর নারীর মধ্যে সন্তানের বীজ স্থাপন করা—ওদের চেতনায় দুটো কথা সম্বন্ধহীন নয়।

বাজসনেয়ী সংহিতার মন্ত্রগুলিতেও কি সেই ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? উদ্গাতা বাবাতাকে অভিমেথন করবার সময় ওই বীজবপনের কথাটাই ভাবছে: যেমন কৃষক বায়ুতে ধান্য শুষ্ক করিতে করিতে অকস্মাৎ গ্রহণ এবং বপন করে।

তাহলে সমাজ-বিকাশের প্রাচীন স্তরে আটকে পড়ে-থাকা মানুষদের দিকে চেয়ে দেখলে প্রাচীন সাহিত্যের বামাচারকে বোঝবার সূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

এ-বিষয়ে রাশি রাশি তথ্য সংগ্রহ করেছেন স্যর জেম্স্ ফ্রেসার এবং তারই ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত করছেন:

> ...the profligacy which notoriously attended these ceremonies was at one time not an accidental excess but an essential part of the rites, and that in the opinion of those who performed them the marriage of trees and plants could not be fertile without the real union of the human sexes. At the present day it might perhaps be vain to look in civilized Europe for customs of this sort observed for the explicit purpose of promoting the growth of vegetation.

> But ruder races in other parts of the world have consciously employed the intercourse of the sexes as a means to ensure the fruitfulness of the earth ; and some rites which are still, or were till lately, kept up in Europe can be reasonably explained only as stunted relics of a similar practice[৩৫].
>
> মোদ্দা কথায়, পিছিয়ে-পড়া মানুষদের কল্পনা অনুসারে প্রকৃতিকে ফলপ্রসূ করবার কৌশল হলো নরনারীর মৈথুন : মানুষ যদি ফলপ্রসূ হয় তাহলে প্রকৃতিও তাকে অনুকরণ করতে বাধ্য হবে।

বলাই বাহুল্য, আমাদের আজকালকার জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের ওই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। আমরা আজ অনেক বেশি জেনেছি, অনেক ভালো করে বুঝতে পেরেছি প্রকৃতিকে বাস্তবিকই ফলপ্রসূ করবার প্রকৃত কৌশল কী। কিন্তু যারা পিছিয়ে পড়ে রয়েছে তাদের বেলায় একেবারে আলাদা কথা। আমাদের তুলনায় প্রকৃতির উপর তাদের দখলটা নেহাতই নগণ্য—বাস্তবভাবে তারা আর প্রকৃতিকে কতটুকুই বা জয় করতে শিখেছে? তাই বাস্তব জয়ের দিক থেকে প্রকাণ্ড অভাবটাকে একরকমের কাল্পনিক উপায়ে তারা মেটাতে চায়।

আকাশে বৃষ্টি চাইতে হলে তারা দলবেঁধে নাচতে নাচতে আকাশের দিকে জলের ছিটে ছোঁড়ে। কেন ছোঁড়ে? ওরা ভাবে, এইভাবে আকাশে বৃষ্টির একটা নকল তুললেই আসল বৃষ্টি ডেকে আনা যাবে।

আদিম মানুষের এ-জাতীয় বিশ্বাসকেই বলে 'ম্যাজিক' বা যাদু-বিশ্বাস। মৈথুন সম্বন্ধে তার ধারণাটাও বুঝতে হবে এই যাদুবিশ্বাসের দিক থেকেই। স্যর জেম্‌স্ ফ্রেসার যেমন বলছেন: যে-পদ্ধতি অনুসারে মানুষ সন্তান উৎপাদন করে, আর, যে-পদ্ধতি অনুসারে গাছপালারাও ওই একই কাজ করে—আদিম মানুষ যেন এই দু'রকম পদ্ধতিকে গুলিয়ে ফেলছে, আর ভাবছে প্রথমটিকে সে নিজে সম্পাদন করে দ্বিতীয়টিকেও সম্পাদিত হবার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে[৩৬]।

স্যর জেম্‌স্ ফ্রেসারকে অনুসরণ করেই[৩৭] কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক:

মধ্য-আমেরিকার পিপিলে বলে আদিবাসীদের কথা: বীজ বোনবার আগে পুরুষেরা চারদিন স্ত্রী-সংসর্গ করে না, যাতে বীজ বোনবার আগের রাতটিতে কামনাকে প্রচণ্ড ভাবে চরিতার্থ করা যায়। এমনকি, যে-মুহূর্তে জমিতে প্রথম বীজ বোনা হবে সেই মুহূর্তে মৈথুন করবার জন্যে কয়েকজনকে বিশেষ করে নিযুক্ত রাখা হয়। পুরোহিতদের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেকেই এই উপলক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য;

এমনকি, উক্ত অনুশাসন না মেনে বীজ বুনতে যাওয়াটাকে আইন-গর্হিত মনে করা হয়।

জাভা-দ্বীপের কোনো কোনো গ্রামে ধান পাকবার সময়টিতে কৃষাণ-কৃষাণীরা রাত্রিবেলায় ক্ষেতে যায় ও ক্ষেতের উপরই সহবাস করে। তাদের মনে বিশ্বাস, তাদের এই ক্রিয়ার দরুনই ফসল বৃদ্ধি পাবে।

অস্ট্রেলিয়া আর নিউগিনির মাঝামাঝি দ্বীপপুঞ্জগুলিতে এই জাতীয় বিশ্বাসের সামান্য রকমফের দেখা যায়। ওখানের মানুষদের বিশ্বাস, সূর্য হলো পুরুষ, ধরিত্রী নারী। বছরে একবার করে, বর্ষার মুখে, সূর্য নাকি আকাশ থেকে নেমে আসে ধরণীকে গর্ভবতী করবার জন্যে। আর পুরো পৃথিবী জুড়ে উৎপাদনের যখন এ-রকম মহোৎসব তখন মানুষেরাও মেতে ওঠে ওই একই উৎসবে : নরনারীর মধ্যে অবাধ মিলন চলতে থাকে। ওদের ধারণায়, উৎসবটির উদ্দেশ্য হলো পিতামহ সূর্যের কাছ থেকে বহুল পরিমাণে বৃষ্টি, অন্ন, পশু ও প্রজা পাওয়া। ফ্রেসার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, এই ধরনের অবারিত যৌন-মিলনকে অসংযত যৌনক্ষুধার বিকাশমাত্র মনে করলে ভুল করা হবে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে পুরো উৎসবটিকে তারা সযত্নে ও রীতিমতো ভক্তিভরেই সম্পাদন করে, কেননা, তাদের ধারণায় এরই উপর নির্ভর করছে জমির উর্বরতা আর মানুষের মঙ্গল।

স্যার জেম্স্ ফ্রেসার আরো অজস্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আরো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না—জায়গায় কুলোবে না। উদ্ধৃত করতে পারলে দেখা যেতো এ-জাতীয় বিশ্বাস পৃথিবীর শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি জায়গায় আবদ্ধ নয়; যেখানেই আজো মানুষ পিছিয়ে-পড়া দশায় আটকে রয়েছে সেখানেই টিকে আছে এই ধরনের বিশ্বাস। অর্থাৎ, আদিম মানুষের পক্ষে এ-বিশ্বাস সার্বভৌম: কিংবা, যা হয়তো একই কথা, মানুষের আদিম অবস্থার কোনো এক স্তরে এ-বিশ্বাস অনিবার্যও। কেন, তা পরের পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো।

আর যদি তাই হয় তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরাও যখন সবেমাত্র ওই রকম কোনো অবস্থা পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছেন তখন তাঁদের ধ্যানধারণা থেকে এ-জাতীয় বিশ্বাসের চিহ্ন সম্পূর্ণ ভাবে মুছে যায় নি। আর যেহেতু তাঁরা নিজেদের ধ্যানধারণাগুলিকে অমর করে রেখে গিয়েছেন পুঁথির পাতায় বা মন্দিরের ভাস্কর্যে সেইহেতুই আমরা আজো সেগুলির স্পষ্ট স্বাক্ষর স্বচক্ষে দেখতে পাই। কেবল ভুলে যাই, তাঁদের উদ্দেশ্য আর আমাদের উদ্দেশ্য এক হবার কথা নয়।

তাই, বেদের মন্ত্র শুনলে পরের যুগে প্রায়শ্চিত্ত করবার কথা ওঠে।

তাই, মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্য[৩৮] দেখতে গিয়ে আজ চোখ নামিয়ে নিতে হয়।

একাল আর সেকালের তফাতটা তো সত্যিই বড়ো কম নয়! বলাই বাহুল্য, প্রাচীন বলেই সেকালের ধারণাকে নির্বিচারে শ্রদ্ধা করবার কথা উঠছে না। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা উচিত যে, একালের মনোভাব দিয়ে সেকালকে বিচার করলে প্রাচীনদের প্রতি অবিচার করা হবে।

বাজসনেয়ী সংহিতার বা উপনিষদের ঋষিরা যা বলেছেন তা ঠিক না ভুল সে-আলোচনা স্বতন্ত্র। আমরা শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, তাঁরা যা ভাবেন নি, সে-ভাবনাটা তাঁদের রচনায় আরোপ করাটা ভুল।

তাঁরা অশ্লীল সাহিত্য রচনা করেন নি। তাঁরা লাম্পট্য বর্ণনা করেন নি। তাঁরা নিজেদের জ্ঞান অনুসারে যা উদ্দেশ্যমূলক মনে করেছেন তাই লিখে গিয়েছেন। মৈথুন তাঁদের ধারণায় যজ্ঞের সমান, সামগানের সমান, একমাত্র ব্রতের সমান। কেননা, তাঁদের ধারণায় এরই উপর নির্ভর করছে শুধুমাত্র সন্তান পাবার সম্ভাবনা নয়, সব কিছুই : মিথুনাম্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা···

লোকায়ত, বৈষ্ণব, সহজিয়া

অবশ্যই, লোকায়ত নিয়ে সমস্যাটা শুধুমাত্র প্রাচীন ইতিহাসের সমস্যা নয়। কেননা, খুব পুরোনো কালের লেখায় লোকায়তিকদের উল্লেখ পাওয়া গেলেও, লোকায়ত বলতে শুধুমাত্র প্রাচীন কালের কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ বোঝা উচিত নয়।

এ-বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য উল্লেখ করেছি। তিনি দেখাচ্ছেন, আজো ভারতবর্ষের নানান জায়গায় নানান রকম নামের আড়ালে ওই লোকায়ত আর কাপালিক মতবাদ টিকে রয়েছে। বিশেষ করে তিনি দুটি সম্প্রদায়ের কথা তুলছেন, বৈষ্ণব আর সহজিয়া। এই যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়, এ-হলো নামেই বৈষ্ণব—কেননা, বিষ্ণু কিংবা কৃষ্ণ অবতারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। তার বদলে, এ-জাতীয় সম্প্রদায়গুলির কাছে দেহতত্ত্বই হলো চরমতত্ত্ব, সাধনা বলতে সবটুকুই কামসাধনা।

অতএব, মহামহোপাধ্যায় বলছেন, এ-জাতীয় সম্প্রদায়গুলিকে লোকায়তিক আখ্যাই দিতে হবে।

কিন্তু যে-লোকায়ত চিন্তাধারা দেহতত্ত্বের গানে, সহজিয়া, তন্ত্র বা ওই ধরনের অজস্র নামের আড়ালে, দেশের পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলে এবং সামাজিক মর্যাদাহীন নিচু স্তরের মানুষদের মধ্যে আজো এ-ভাবে টিকে রয়েছে তার সঙ্গে মাধবাচার্য বর্ণিত ওই ধারালো, মার্জিত দার্শনিক মতবাদটির সম্পর্ক ঠিক কী?

সম্পর্কের একটা নমুনা দেখুন:

এক ব্রাহ্মণ বুঝি নদীতে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে তর্পণ করছিলো। তাই দেখে সহজিয়ারা গান[৩৯] গেয়ে বলছে: ওগো বামুন, এতো সহজেই যদি সুদূর পরলোক পর্যন্ত জল পাঠাতে পারো তাহলে কাছে পিঠে ওই যে চাষের ক্ষেত সেখানে জল পৌঁছে দেবার জন্যে আর হাঙ্গামা করা কেন?

যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে লোকায়তিকদের যে-সব তীব্র বিদ্রূপের বর্ণনা মাধবাচার্য দিয়েছেন সহজিয়াদের এই গান প্রায় হুবহু সেই রকমের নয় কি? মাধবাচার্য[৪০] লিখেছেন, লোকায়তিকেরা বলে শ্রাদ্ধপিণ্ড যদি পরলোকে কারুর ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে তাহলে গ্রামান্তরে যাবার সময় চিঁড়েমুড়ির পোঁটলাটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার দরকার কি?

কিন্তু শুধু সহজিয়াই নয়। দেহবাদী নানান সম্প্রদায় আজো আমাদের দেশে বেঁচে রয়েছে। লোকায়ত-দর্শন বুঝতে হলে এগুলিকেও ঠিকমতো বুঝতে হবে।

পদ্ধতির পরিচয়

শুরুতেই বলেছি, লোকায়ত দর্শন নিয়ে যতো রকমের সমস্যা ওঠে তা সবই সমাধান করা আমাদের যোগ্যতায় নেই। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণার বর্তমান অবস্থায় তা কতোখানি সম্ভব তাও হয়তো অনেকটাই সন্দেহের কথা।

সমস্যা যে ওঠে এবং সমস্যা যে বহু রকমের, ভারতীয় দর্শনের সাধারণ ইতিহাসে সে-কথার স্বীকৃতি নেই। মহামহোপাধ্যায়ের রচনা অনুসরণ করে দেখাবার চেষ্টা করলাম সমস্যাগুলিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে এবং সেগুলির সমাধান খোঁজ করা দরকার। এবং সমাধান খোঁজ করবার পদ্ধতিটি কী রকম হতে পারে তারও কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেলো সমস্যাগুলির সূত্র ধরে এগোতে-এগোতে: পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষের ধ্যানধারণা থেকে প্রাচীন পুঁথিপত্রের অনেক কথা এবং অনুন্নত মানুষদের অনেক ক্রিয়াকর্মকে বোঝবার সুযোগ হতে পারে।

এ-পদ্ধতি খুবই মূল্যবান।

এ-পদ্ধতির অনুসরণ শুধু যে লোকায়ত-দর্শন প্রসঙ্গেই প্রয়োজন তাই নয়, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অনেক অন্ধকার গুহা, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের অনেক জটিল সমস্যা, প্রাচীন পুঁথিপত্রে লেখা অনেক দুর্বোধ্য কথা—এ-পদ্ধতির সাহায্যে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

শুরুতে তাই পদ্ধতিটির সম্যক পরিচয় প্রয়োজন।

কিন্তু পদ্ধতিটিকে বোঝবার ব্যাপারে সুবিধে হবে এটির কোনো মূর্ত প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করলে। উপনিষদেরই একটি দুর্বোধ্য পরিচ্ছেদের উপর প্রয়োগ করে পদ্ধতিটির পরিচয় পাবার চেষ্টা করা যাক। লোকায়ত-দর্শনের দিক থেকেও উপনিষদের এই পরিচ্ছেদটি অবান্তর হবে না। কেননা, তার মধ্যে যে-দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তাকে বস্তুবাদী বা লোকায়তিকই বলতে হবে।

অথ কুকুর-সম্বন্ধী সামগান

ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডে একটি অদ্ভুত, ও আপাতঃ-অর্থহীন, বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের ধারণায় এর অর্থনির্ণয় করা সম্ভব, কিন্তু তার জন্যে নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন। সে-পদ্ধতির পরিচয় হিসেবে উপনিষদের এই অংশটুকুর উপর পদ্ধতিটির প্রয়োগ করবার চেষ্টা করা যাক। ছান্দোগ্যে লেখা আছে :

> অথাতঃ শৌব উদ্গীথস্তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্বব্রাজ ॥১।১২।১॥
>
> তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্বভূব তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম বা ইতি ॥১।১২।২॥
>
> তান্‌, হোবাচেহৈব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার ॥১।১২।৩॥
>
> তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবমাসসৃপুস্তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ ॥১।১২।৪॥
>
> ওম্‌ অদাম ওম্‌ পিবাম ওম্‌ দেবঃ বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা অন্নম্‌ ইহ আহরৎ অন্নপতে অন্নম্‌ ইহ আহর আহর ওম্‌ ইতি ॥১।১২।৪॥

অর্থাৎ,

> অতএব এখন কুকুর সম্বন্ধীয় সামগান (উদ্গীথ)। তখন বক দালভ্য, ওরফে অতৃপ্ত (গ্লাব) মৈত্রেয়, স্বাধ্যায়ে (=বেদজ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে) বেরিয়েছিলেন ॥১।১২।১॥

তাঁর কাছে শ্বেতবর্ণ কুকুর আবির্ভূত হলেন। অন্য কুকুরেরা তাঁর (=সেই শ্বেতবর্ণ কুকুরের) কাছে গিয়ে বললো, "ভগবান, আমাদের অন্নের জন্য গান করুন। আমরা ভোজন করতে চাই ॥১৷১২৷২॥

সেই সাদা কুকুর অন্য কুকুরদের বললেন, "ভোর বেলায় এইখানে আমার কাছে সমাগত হয়ো"। বক দালভ্য, ওরফে অতৃপ্ত মৈত্রেয়, অপেক্ষা করে রইলেন ॥১৷১২৷৩॥

বহিষ্পবমানের সাহায্যে স্তোস্যমান অবস্থায় যেমন পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে সর্পিল গতিতে ঘোরা হয় (সর্পন্তি), তারা (=সেই কুকুরেরা) তেমনি গতিতে ঘুরলো (আসস্‌পু)। তারপর তারা (=সেই কুকুরেরা) একত্রিত হলো ও হিং (হিংকার) করলো ॥১৷১২৷৪॥

(তারা গান করতে লাগলো) "ওম্, আমরা ভোজন করি। ওম্ আমরা পান করি। ওম্, দেবতা বরুণ, প্রজাপতি, সবিতা এইখানে অন্ন আহরণ করেছিলেন। হে অন্নপতি, এইখানে অন্ন আহরণ করো। ওম্।" ইতি ॥১৷১২৷৫॥

শব্দার্থের দিক থেকে কয়েকটা কথা গোড়ায় বলে নেওয়া দরকার।

সামগানকে পাঁচ ভাগে বা পাঁচ স্তরে ভাগ করা হয়: হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন। অধ্যাপক আর. ই. হিউমের[১১] তর্জমা অনুসারে: হিংকার=preliminary vocalizing, প্রস্তাব=introductory praise, উদ্গীথ=loud chant, প্রতিহার=response, নিধন= conclusion।

বহিষ্পবমান স্তোত্র। প্রথমত, স্তোত্র: "যাহা গান করা যায় তাহার নাম স্তোত্র।"[১২] দ্বিতীয়ত, বহিষ্পবমান: যজ্ঞবিশেষে ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের একাদশ সুক্তটি গান করবার সময় পাঁচজন ঋত্বিক (অধ্বর্যু, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা) ও তারপরে যজমান হাত ধরাধরি করে চত্বাল অভিমুখে প্রসর্পণ করেন, সকলে উপবেশন করলে পর হোতা তাঁদের অনুমন্ত্রন করেন।

স্বাধ্যায়। এ-কথার চলতি মানে হলো প্রাথমিক বেদজ্ঞান। সু+আ+অধ্যায়ম্। কিন্তু অন্য ভাবেও এই শব্দ নিষ্পন্ন হতে পারে: স্ব+অধ্যায়ম্, অর্থাৎ, নিজে নিজে অধ্যয়ন।

বক দালভ্য, ওরফে, গ্লাব মৈত্রেয়। বক মানে বক, যদিও কিনা মানুষের নাম যে কি করে বক হতে পারে এ-নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা কিছুটা মুস্কিলে পড়েছেন। তাই, তর্জমা করবার সময় ম্যক্সমূলার[১৩] করছেন Vaka, "বাক"। অধ্যাপক হিউম[১৪] করছেন Baka। কিন্তু যাঁরা উপনিষদ লিখেছিলেন তাঁরা Vakaও লেখেন নি, Bakaও লেখেন নি;

শুধু "বক"ই লিখেছেন। দালভ্য? এ-নামটার শব্দার্থ যাই হোক না কেন, মহৎ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে। কেননা, ছান্দোগ্য-উপনিষদেই[১৫] একটু আগে লেখা আছে: মাত্র তিনজন উদ্গীথ-বিদ্যায় কুশল ছিলেন—শালাবত্য শিলক, দালভ্য চৈকিতায়ন এবং প্রবাহন জৈবলি। অবশ্যই, দালব্য বক এবং দালভ্য চৈকিতায়ন—দু'-এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিলো কিনা সে-কথা উপনিষদে লেখা নেই। কিন্তু, তাহলেও, বক দালভ্যও খুব কম পণ্ডিত ছিলেন না। ছান্দোগ্য-উপনিষদের অন্যত্র সে-কথা লেখা আছে[১৬]। গ্লাব মানে অতৃপ্ত—এই মানেটাই মনে রাখা ভালো। অতৃপ্ত বলেই তিনি স্বাধ্যায়ে বেরিয়েছিলেন।

এইবার শব্দার্থের কথা ছেড়ে পুরো বর্ণনাটুকুর তাৎপর্য সন্ধান করা যাক। মনে রাখবেন, এটি হলো ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ড এবং উপনিষদে এই পরমাশ্চর্য দৃশ্যটির কথা যেমনি খাপছাড়া ভাবে অবতারণা করা হলো তেমনি খাপছাড়া ভাবেই তা শেষ হয়ে গেলো।

কুকুরদের কথা হঠাৎ উঠলো, হঠাৎ শেষ হলো—সারা উপনিষদটিতে তাদের আর কোথাও খুঁজে পাবেন না! ব্যাপারটা কী? উপনিষদের আধুনিক টীকাকারেরা বলছেন, পুরো ব্যাপারটাই হলো প্রকাণ্ড পরিহাস। কাদের সম্বন্ধে পরিহাস? যজ্ঞের পুরোহিতদের সম্বন্ধে। পরিহাস কেন? কেননা, এঁরা ধর্মের নামে পানাহারে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত, আধুনিক পণ্ডিতদের কাছে একটি প্রিয় মতবাদ হলো, বৈদিক যুগের পর দেশে যখন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে প্রচণ্ড মাতামাতি করছেন তখনই উপনিষদের ঋষিরা তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তোলেন[১৭]। তাঁরা যজ্ঞীয় ক্রিয়াকর্মের নিন্দা করে ব্রহ্মজ্ঞানকেই পরম পুরুষার্থ বলে ঘোষণা করতে চাইলেন। ফলে, যজ্ঞীয় ক্রিয়াকর্মকে বিদ্রূপ করাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক।

আধুনিক কালে পণ্ডিত মহলে এই মতবাদটির জনপ্রিয়তা যতোই হোক না কেন, উপনিষদকে এই ভাবে বুঝতে যাওয়া সত্যিই চলে কিনা সে-বিষয়ে অজস্র প্রশ্ন ওঠে[১৮]। আপাতত আমাদের পক্ষে সে-সব প্রশ্নের আলোচনায় প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তার বদলে উপনিষদের আলোচ্য অংশটিকেই খুঁটিয়ে বিচার করবার চেষ্টা করা যাক।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতবাদের নমুনা হিসেবে এই অংশ উপলক্ষেই স্যর সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ কী লিখেছেন দেখুন:

> There are occassions when the sacrificial and priestly religion strikes them as superficial, and then they give vent to all their

> irony. They describe a procession of dogs to march like a procession of priests, each holding the tail of the other in front and saying, "Om! let us eat. Om, let us drink..."[৪৯] etc.
> অর্থাৎ, তাঁদের কাছে মাঝে মাঝে যজ্ঞমূলক ব্রাহ্মণ্যধর্ম নেহাৎ বাহ্য ব্যাপার বলে মনে হয়েছে এবং তখন তাঁরা তাঁদের সবটুকু বিদ্রূপ উজোড় করে দিয়েছেন। পুরোহিতদের মিছিলকে তাঁরা একদল কুকুরের মিছিলের মতো বর্ণনা করেছেন,—ওই কুকুরদের প্রত্যেকেই সামনের কুকুরের লেজ কামড়ে ধরেছে আর বলছে: "ওম্ আমরা ভোজন করি। ওম্, আমরা পান করি"। ইত্যাদি

স্যর সর্বপল্লি ছাড়াও আধুনিক যুগের প্রায় সমস্ত পণ্ডিতই একবাক্যে বলছেন: ছান্দোগ্যের এ-অংশ পুরোহিত-শ্রেণীর ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে বিদ্রূপ না হয়ে যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, উপনিষদের মানে করবার সময় উপনিষদে যা লেখা আছে শুধুমাত্র তার উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে হবে, না, অজস্র আধুনিক কল্পনাকে উপনিষদের উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে? ওঁরা বলছেন, বিদ্রূপ। কিন্তু বিদ্রূপের ছিটে-ফোঁটাও কি আপনি উপনিষদে যা লেখা আছে তার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন? উদ্ধৃত অংশটিকে ভালো করে পরীক্ষা করুন; দেখবেন, বিদ্রূপ তো দূরের কথা লেখকের কাছে পুরো অংশটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক। মনে রাখবেন, দালভ্য একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত লোক এবং তিনি অতৃপ্ত হয়ে জ্ঞানান্বেষণে বেরিয়েছিলেন। আর তাঁকে বেদজ্ঞান দেবার প্রসঙ্গেই পুরো দৃশ্যটির অবতারণা করা হয়েছে।

বিদ্রূপ তো আর বললেই হলো না।

ওঁরা বলবেন, তা কেন? বিদ্রূপ না হলে যারা বহিষ্পবমান স্তোত্রের মতো করে গান গাইছে তাদের কুকুর বলে বর্ণনা করা হবে কী করে? উপনিষদে লেখা আছে: কুকুর। সে-বিষয়ে তো আর সন্দেহ নেই। আর, আমি-আপনি যদি কাউকে কুকুর বলি তাহলে নিশ্চয়ই খুব খাতির দেখাবার উদ্দেশ্যে বলি না।

কুকুর মানে কী?

তাহলে, ওই হলো আসল প্রশ্ন: উপনিষদের ওই কুকুর কথাটির মানে কী?

কুকুর মানে কুকুর। আবার কি?—এই হলো আধুনিক পণ্ডিতদের বলবার কথা। আর, কুকুরই যদি হয় তাহলে তাদের লেজ থাকবে না কেন? অবশ্যই, উপনিষদের ঋষিরা লেজের কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন। আধুনিক টীকাকারেরা যেন ভ্রম-সংশোধন হিসেবেই লেজের কথাটুকু জুড়ে দিচ্ছেন: পেছনের কুকুর তার সামনের কুকুরের লেজ কামড়ে ধরলো, ইত্যাদি।

লেজের উপাখ্যানটি ছোটো নয়: এ-লেজ শঙ্কর-ভাষ্য[১১] থেকে গজাতে শুরু করে মক্ষমূলারের গ্রন্থাবলী হয়ে স্যর সর্বপল্লির "ভারতীয় দর্শন" পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে।

কিন্তু আমাদের ওই একই মন্তব্য: উপনিষদের ব্যাখ্যা করা মানে উপনিষদ রচনা করা নয়। লেজের উল্লেখ যদি উপনিষদে না থাকে তাহলে তর্জমা করতে গিয়ে, কিংবা, টীকা করতে গিয়ে লেজ রচনা করার সুযোগ নেই।

তার বদলে, উপনিষদে ঠিক কী লেখা আছে? লেখা আছে, কুকুরেরা এক সাদা কুকুরের কাছে গিয়ে বললো, আমরা ভোজন করতে চাই, আমাদের অন্নার্থে গান দিন। অন্নং নঃ ভগবান আগায়তু, অশনায়াম্ ইতি। আর শেষ পর্যন্ত সত্যিই তারা দল বেঁধে গান করতে শুরু করলো: আমরা ভোজন করি, আমরা পান করি, ইত্যাদি।

এখন এতো ব্যাপার কি সত্যিই কুকুরের পক্ষে সম্ভব? নিশ্চয়ই নয়। পুরাকালেও নয়। সেকালের কুকুরেরা যে অন্ন চাইতো এবং অন্নের উদ্দেশ্যেই দল বেঁধে গান গাইতো—এমন কথা নিশ্চয়ই কেউই বিশ্বাস করবেন না।

আর একটা সম্ভাবনা আছে। উপনিষদের এই অংশে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা আসলে সত্যিকারের কুকুরই নয়। তার বদলে মানুষ।

এবং মানুষ হলেও তাদের কুকুর বলে উল্লেখ করবার পেছনে কোনো রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপের উদ্দেশ্য নেই।

কিন্তু তাও কি সম্ভব? মানুষকে নিছক জন্তু-জানোয়ার মনে করা হচ্ছে, অথচ তা স্বাভাবিক ভাবেই! তার মূলে কোনো রকম বিদ্রূপ-বিতৃষ্ণার লক্ষণ নেই?

আজকের দিনে অবশ্যই তা সম্ভব নয়। কিন্তু উপনিষদের এ-অংশ তো আজকের দিনের লেখা নয়। উপনিষদের এই অংশে যাদের উল্লেখ করা হচ্ছে তারাও কেউ আধুনিক কালের মানুষ নয়। অপর পক্ষে, বৈদিক সাহিত্যের দিকে ভালো করে নজর করুন। দেখবেন, জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে কতো স্বাভাবিক ভাবেই একান্ত মানবীয় ব্যাপারগুলির নামকরণ করবার নমুনা

পাওয়া যাচ্ছে। তাই, আধুনিক মনোভাবটাকেই আপনি যদি একমাত্র মনোভাব মনে করেন তাহলে প্রাচীনদের ওই ব্যবহারটির কোনো অর্থ খুঁজে পাবেন না।

কয়েকটা নমুনা দেখা যাক।

সাদা খচ্চোর: আজকের দিনে আমি-আপনি নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তু সম্বন্ধে সমীহ দেখাবার মনোভাব নিয়ে এমনতরো নাম ব্যবহার করবো না। কিন্তু একটা বই-এর নাম যদি তাই দেওয়া হয়? তাহলে আজকের দিনে নিশ্চয়ই সরাসরি বলে দেওয়া যাবে, বইটার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ-মূলক মনোভাবের বিকাশ হিসেবেই এ-রকম নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন কালের ব্যাপারই আলাদা। একটি উপনিষদের নাম সত্যিই সাদা খচ্চোর: শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। অথচ ঠাট্টা নয়, বিদ্রূপ নয়, —নামকরণের মধ্যে কোনো রকম বিদ্রূপ ভাবের প্রকাশই নেই।

আর শুধু খচ্চোরই বা কেন। প্রাণীজগতের আরো সব অদ্ভুত অদ্ভুত বাসিন্দাদের খুঁজে পাবেন বৈদিক-সাহিত্যের রকমারি নামের মধ্যে। অপর একটি উপনিষদের নাম গ্রহণ করা হয়েছে ব্যাঙ থেকে: মাণ্ডুক্য উপনিষদ। কিন্তু এই নামের জন্যে উপনিষদ-সাহিত্যে তার মর্যাদা এতোটুকুও কম নয়। শঙ্করাচার্যের গুরু গৌড়পাদ এরই কারিকা রচনা করে অমর হয়েছেন।

উপনিষদ থেকে আরো এক-পা পিছু হটে যদি সংহিতার রাজ্যে প্রবেশ করেন তাহলে আপনার মনে হতে পারে নামজগতের এক অদ্ভুত চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করেছেন বুঝি! নমুনা দেখুন:

সংহিতাগুলির নানান শাখা-উপশাখার নাম পাওয়া যায়, যদিও অবশ্য অনেক শাখাই আজ বিলুপ্ত হয়েছে এবং যে-সব নাম টিকে রয়েছে তার মধ্যে অনেক নামেরই কোনো রকম মানে খুঁজে পাওয়া আজ দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই: এতো সব নামের মধ্যে যে-গুলির মানে ঠাহর করা আজো সম্ভবপর সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই পশুজগৎ বা উদ্ভিদ-জগৎ থেকে পাওয়া।

ঋগ্বেদের যে-একমাত্র শাখা আজো বিলুপ্ত হয় নি তার নাম হলো শাকল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[৩২] লেখা আছে, শাকল হলো এক রকম সাপের সেকেলে নাম। শৌনক প্রণীত প্রতিশাখ্য[৩৩] অনুসারে, এ-ছাড়াও ঋগ্বেদের আরো চারটি শাখা ছিলো: বাস্কল, আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন ও মাণ্ডুক। এর মধ্যে মাণ্ডুক নামটিকে বুঝতে অসুবিধে হয় না। বেদজ্ঞরা ভেবে দেখতে পারেন, দুটি শাখার নামের যে-মানে পাওয়া যায় তারই আলোয় বাকি তিনটির কোনো মানে উদ্ধার করা সম্ভব কিনা।

পুরাণে[৩৪] আছে, এককালে সামবেদের সহস্রাধিক শাখা ছিলো। ইন্দ্র

বজ্রাঘাতে সেই শাখাগুলি বিনষ্ট করেন। ইন্দ্রের এই অদ্ভুত আচরণের তাৎপর্য খোঁজা আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তার বদলে দেখা যাক, ইন্দ্রের বজ্রাঘাত সত্ত্বেও যে-সাতটি শাখা টিকে থাকলো বলে বলা হয়েছে সেগুলির নাম কী রকম: কৌথুমী (বা কৌথুম), রাণ্যায়ণীয় (বা রাণ্যায়ণ), শাট্যমুগ্র, কাপোল, মহাকাপোল, লাঙ্গলিক, শার্দূলীয়। এই সপ্তম নামটি যে বাঘ থেকেই এসেছে তা বোঝবার জন্যে স্যর মনিয়ার-উইলিয়ম্‌স্‌-এর অভিধান ঘাঁটতে হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর ওই মহামূল্যবান অভিধানটিকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও এক লাঙ্গলিক ছাড়া আর কোনো নামের শব্দার্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু এ-নামটির যে-অর্থ পাওয়া যায় তা চিত্তাকর্ষক: লাঙ্গলিক মানে নাকি একরকম ভেষজ[৭৭]।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের একটি শাখার নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। এ-নাম যে তিত্তির পাখি থেকে এসেছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের যে-শাখার নাম বাজসনেয়ী সংহিতা তা বাজ বা তেজি ঘোড়া থেকে এসেছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের অপর শাখার নাম মৈত্রায়ণী সংহিতা, তার কয়েকটি উপশাখার নাম খুবই চিত্তাকর্ষক: মানব, বরাহ, ছাগলেয়, হারদ্রবীয়, দুন্দুভ, শ্যামায়ণীয়।

অথর্ব্ববেদের কয়েকটি শাখার নাম: পৈপ্পল, শৌনকীয়, তোত্তায়ন, ব্রহ্মপালাশ। এগুলির মধ্যে পৈপ্পল নামটি যে পিপুল গাছ থেকে এসেছে সে-বিষয়ে কোনো রকমই সন্দেহের অবকাশ নেই। বাকিগুলির কোনোটি কোনো জন্তু-জানোয়ারের বা কোনো গাছগাছড়ার কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ভালো করে ভেবে দেখা দরকার।

আমরা বলতে চাই, পাঁচটা দৃষ্টান্তের মধ্যে যদি একটাকেও স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় আর বাকি ক'টাকে বোঝা না যায় তাহলে যেটা বোঝা যাচ্ছে তারই সাহায্যে যে-ক'টাকে বোঝা যাচ্ছে না সেই ক'টাকে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। কিংবা, অন্তত এটুকু তো নিশ্চয়ই দাবি করা যায় যে, যা-অস্পষ্ট তার সাক্ষ্য যা-স্পষ্ট তার সাক্ষ্যকে উড়িয়ে দিতে পারে না। সংহিতা-সাহিত্যের অন্তত কয়েকটি দৃষ্টান্তের বেলায় আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, নামগুলি সরাসরি জন্তু-জানোয়ার, কিংবা, গাছগাছড়া থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। বাকিগুলির অর্থ যদি এখন বোঝা না-ও যায় তাহলেও কি সেগুলির পক্ষে একই রকম উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক নয়?

আর, এই কথাটি মনে রেখে আধুনিক পণ্ডিতদের যুক্তিটাকে বিচার করে দেখুন: ছান্দোগ্যের ঋষি যে-হেতু আলোচ্য দৃষ্টান্তকে কুকুর-সম্বন্ধীয় সামগান

বলে বর্ণনা করছেন সেই হেতু উদ্দেশ্যটা ঠাট্টা-তামাসা ছাড়া আর কী হতে পারে? এ-যুক্তি নেহাতই অচল এবং এর মূলে রয়েছে সেকালের রচনাতেও একালের মনোভাব কল্পনা করার চেষ্টা। কিন্তু সেকালের রচনায় একালের মনোভাব যে কল্পনা করা চলবে না তার প্রমাণ হলো, সেকালের ঋষিরা যে-গ্রন্থগুলিতে নিজেদের চূড়ান্ত জ্ঞান প্রকাশ করেছেন সেইগুলিরই নামকরণ করবার সময় সাপ, ব্যাঙ, বাঘ, ছাগল, তিতির, খচ্চোর ইত্যাদি নানান রকমের জানোয়ারেরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এবং তার জন্যে যে তাঁদের কোনো রকম কুণ্ঠা ছিলো সে-কথা পুরোনো পুঁথির কোথাও লেখা নেই।

তাই, আধুনিক পণ্ডিতদের ওই যুক্তিটিকে যদি সত্যিই গুরুত্ব দিতে হয় তাহলে মানতেই হবে, বৈদিক ঋষিরা নিজেদের যে কীর্তিগুলিকে সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন সেগুলি সম্বন্ধেই তাঁরা বিদ্রূপ-পরিহাসে মুখর হয়ে উঠেছিলেন!

তাহলে, ছান্দোগ্য-উপনিষদের ওই অংশটিতে কতকগুলি মানুষকে যে কুকুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ বিদ্রূপ বা পরিহাস নয়। আর বিদ্রূপ বা পরিহাস যদি নাই হয় তাহলে বর্ণনাটিকে সহজ ও স্বাভাবিক বলেই স্বীকার করতে হবে। তার মানে, স্বাধ্যায়ের আশায় বেরিয়ে গ্লাব মৈত্রেয়, ওরফে, বক দালভ্য নামের বিদ্বান ব্যক্তিটি যাদের সামগান শুনে এলেন তাদের সহজ ও স্বাভাবিক পরিচয় হলো : কুকুর।

কিন্তু সত্যিই কি কোনো মানবদলের সহজ ও স্বাভাবিক পরিচয় কুকুর হওয়া সম্ভব?

নিশ্চয়ই সম্ভব, যদিও অবশ্যই আমাদের আধুনিক সমাজে নয়,—প্রাচীন সমাজে।

আমাদের এই ভারতবর্ষেই এমন অনেক মানবদলের খবর পাওয়া যায় যাদের নাম কুকুর এবং শুধুই কুকুর।

সেকালের লেখা পুঁথিপত্রে এ-জাতীয় খবর পাওয়া যায়। এমন কি একালেও যারা পিছিয়ে-পড়া বা সেকেলে অবস্থায় আটকে রয়েছে তাদের যদি স্বচক্ষে দেখেন তো দেখবেন তাদের মধ্যেও এই নামটি একেবারেই দুর্লভ নয়।

প্রথমে দেখা যাক প্রাচীন পুঁথিতে কী লেখা আছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে[৫৩] খুবই সোজাসুজি কুকুর নামের মানুষদের কথা বলা হয়েছে : কৌটিল্য বলছেন, 'রাজশব্দোপজীবী' সংঘগুলির মধ্যে একটির নাম কুকুর। হরিবংশের[৫১] অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের নামই হলো 'কুকুরবংশবর্ণন। মহাভারতের সভাপর্বে লেখা আছে, যাদবগণের একটি শাখার নাম কুকুর : "এইরূপে কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ 'দুর্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত স্পর্ধা করিবে

না' এই নীতিবাক্যের অনুসরণ ক্রমে মহাবীর জরাসন্ধকে তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলেন"[৫৮]। ভীষ্মপর্বের নবম অধ্যায়ে[৫৯] ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ভারতবর্ষের নানারকম মানুষের বর্ণনা দিতে দিতে সঞ্জয় কুকুর নামের একদল মানুষের উল্লেখ করছেন। সভাপর্বে[৬০], যুধিষ্ঠিরের কাছে যারা উপহার বহন করে আনছে বলে বর্ণিত হয়েছে তাদের মধ্যে একদল মানুষকে স্বাভাবিক ভাবেই কুকুর বলা হয়েছে। তাহলে, প্রাচীন পুঁথিপত্রেই দেখা যায় মানবদলের নামও কুকুর হওয়া অসম্ভব নয়, এবং উল্লেখিত দৃষ্টান্তের কোথাও লোকগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে ইচ্ছে করেই, গাল দিয়ে, কুকুর বলা হয়েছে—এমন নজির নিশ্চয়ই নেই। সর্বত্রই একদল মানুষের সহজ স্বাভাবিক পরিচয় হিসেবেই কুকুর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু মানবদলের পরিচয় যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই কুকুর হওয়া সম্ভবপর 'এ-কথার প্রমাণ হিসেবে শুধুমাত্র প্রাচীন পুঁথিপত্রের নজিরই আমাদের একমাত্র সম্বল নয়। আজো আমাদের দেশের নানা জায়গায় যে-সব মানুষের দল সমাজ-বিকাশের প্রাচীন স্তরে আটকা পড়ে রয়েছে তাদের দিকে দেখুন, দেখবেন কুকুর নামের কী রকম ছড়াছড়ি! এখানে মাত্র কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করলেই হবে।

রিসলী[৬১] বলছেন, ওরাওঁদের মধ্যে একদল মানুষের পরিচয় হলো খোয়েপা, খোয়েপা মানে বন্য কুকুর। অনন্তকৃষ্ণ আয়ার[৬২] বলছেন, আজো মহীশূর অঞ্চলে একাধিক দলের মানুষের পরিচয় কুকুর নাম দিয়েই। থার্স্টন[৬৩] দক্ষিণ ভারতের নানারকম মানুষের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলছেন, একদলের নাম হলো ভোলিয়া, ভোলিয়া মানে বন্য কুকুর।

আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। আজো ভারতবর্ষের কতো জায়গায় কতো রকমের মানুষ যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কুকুর হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয় তার পূর্ণ তালিকা খুবই দীর্ঘ হবে।

এই ভাবে কুকুর বলে জীবন্ত মানুষগুলিকে দেখবার পর পুরোনো পুঁথির দিকে ফিরে যাওয়া যায়।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে ওই যে যারা সামগান গাইলো ওরা কারা?

ওদের সত্যিকারের কুকুর মনে করে এবং সত্যিকারের কুকুরের ন্যায্য মর্যাদা দেবার জন্যে শঙ্করাচার্যের মতো লেজ সৃষ্টি করে উপনিষদের পিছনে জুড়ে দেবার দরকার নেই।

কিংবা, রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানদের মতো এ-কথা কল্পনা করবারও কোনো দরকার নেই যে, উপনিষদের ঋষিরা যজ্ঞীয় ঋত্বিকদের বিদ্রূপ করে বা ঘৃণাভরে ওই রকম সাজিয়েছিলেন।

তার বদলে, এখানে একদল সত্যিকারের মানুষেরই বর্ণনা।... যেই

মানুষগুলির সহজ ও স্বাভাবিক পরিচয় হলো : কুকুর। যেমন সহজ স্বাভাবিক ভাবেই বেদের শাখাগুলিকে সাপ, ব্যাঙ, ছাগল ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছিলো, কিংবা, উপনিষদের কোনোটির নাম নেওয়া হয়েছে ব্যাঙ থেকে, কোনোটির খচ্চোর থেকে!

জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে মানুষের নাম

উপনিষদের ওই সামগায়কগুলিকে সম্যকভাবে চিনতে হলে দেশের প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলির ওপর ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিতে হবে।

পুরোনো পুঁথিপত্রগুলিতে দেখবেন, পশুপাখি বা গাছগাছড়ার নামে মানুষের আত্মপরিচয় দেবার উদাহরণ কী রকম প্রচুর! মূল বইগুলি উল্টে দেখাবারও দরকার নেই, কেননা আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই ইতিপূর্বে ওই পুঁথিপত্রগুলি থেকে এ-জাতীয় দৃষ্টান্তের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেছেন। অন্তত, ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের 'জাতিভেদ'[৩৪] বলে বইটি উল্টে দেখুন, দেখবেন, তাঁর তৈরি তালিকাটি প্রায় দশ পাতা জুড়ে রয়েছে।

ঋগ্বেদে একদল মানুষের[৩৫] উল্লেখ রয়েছে যাদের পরিচয় হলো অজ। অজ মানে ছাগল। আর একদল[৩৬] মানুষের খবর পাওয়া যাচ্ছে যাদের নাম হলো শিগ্রু বা সজনে। আবার একদলের[৩৭] নাম হলো মৎস্য। এ-হেন মাছ-নামধারী মানুষ নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের নানান জায়গায় এবং নানান যুগে বাস করতো। কেননা, শতপথ ব্রাহ্মণে[৩৮] তাদের দেখতে পাওয়া যায়, তাদের দেখতে পাওয়া যায় কৌষীতকি ব্রাহ্মণে[৩৯], গোপথ ব্রাহ্মণে[৪০], মহাভারতে[৪১] ও নানা পুরাণে[৪২]। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে[৪৩] পারাবত (পায়রা) জাতির কথা আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে[৪৪] ব্রহ্মাপ্রজাপতির কূর্মরূপের কথা আছে। ওই কাছিমই আবার কশ্যপ নামে ঋগ্বেদ[৪৫], অথর্ব্ববেদ[৪৬] থেকে শুরু করে পুরোনো যুগের নানান পুঁথিপত্র[৪৭] আলো করেছে।

হনুমান বা জাম্বুবানের সত্যিই লেজ ছিলো কিনা জানা নেই। কিন্তু ক্ষিতিমোহন সেন[৪৮] মহাশয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, "কাঠিয়াওয়ারের পোরবন্দর বা সুদামাপুরীর রাজারা হনুমানের বংশ।" তাছাড়া, ব্যাস-বাল্মিকীর রচনা পড়লে মনে হয় হেন জন্তু-জানোয়ার বা গাছগাছড়ার নাম বুঝি আমাদের জানা নেই যার পরিচয়ে সেকালের কোনো না কোনো মানুষের দল নিজেদের পরিচয় দিতে দ্বিধা করেছে। ক্ষিতিমোহন

সেন[৭৯] মশায়ের বই পড়লে দেখবেন কতো সব রকমারি মানুষদের নাম তিনি মহাভারত থেকে সংগ্রহ করেছেন। নমুনা হিসেবে মাত্র ছ'চারটের উল্লেখ করা যাক: প্যাঁচা, বিছে, কাক, আখ, বেল, শেয়াল, গাধা, গোসাপ, মুরগি, হাতি, ভেড়া, শূয়োর, বাঘ, পঙ্গপাল, হাঁস, মাগুরমাছ, খরগোস, ঘোড়া, তাল, শাল, বাঁশ, জাফ্রান—আরো কতো!

এতোসব দেখবার পর এ-কথা শুনে নিশ্চয়ই আর মন খারাপ হবে না যে বহুদিন ধরে আমাদের হিন্দুসমাজে যে-নামগুলিকে পরম পবিত্র মনে করা হয়েছিলো তার মধ্যে অনেক নামই খোদ জন্তু-জানোয়ার থেকে পাওয়া। ম্যাকডোনাল্ড-এর[৮০] 'বেদিক মাইথোলজি' থেকেই কয়েকটা নমুনা দেখা যায়। বৈদিক সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি ঋষি-নাম হলো: কৌশিক, মাণ্ডুক্যেয়, গোতম, বৎস, শুনক, ইত্যাদি। কৌশিক মানে প্যাঁচা, মাণ্ডুক্যেয় মানে ব্যাঙের বাচ্চা (ব্যাঙাচি?), গোতম মানে ষাঁড়, বৎস মানে বাছুর।

আর শুনক?

ঋষি-নাম হিসেবে 'শুনক' দেখে সত্যিই আর অবাক হবার অবকাশ নেই। কেননা, ছান্দোগ্য-উপনিষদে আপনি এই নামেরই মানুষদের সামগান গাইতে দেখেছেন। শুনক মানে কুকুর। শুনক ঋষির লেজ ছিলো এ-কথা কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে লেখা নেই, যদিও অবশ্য কুকুরের লেজ থেকে ঋষির নামকরণ হয়েছিলো এ-কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। শূনঃশেপ ঋষির কাহিনী আমরা পরে বড়ো করে আলোচনা করবো। ঋগ্বেদে তাঁর রচনা পাওয়া যায়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাঁর সুদীর্ঘ কাহিনী পাওয়া যায়। শূনঃশেপ মানে কুকুরের লেজ। কুকুরের লেজ থেকে যদি কোনো ঋষির নামকরণ সম্ভবপর হয় তাহলে কুকুরদের সামগান শুনে তাদের লেজ কল্পনা করবার দরকার কি?

টোটেম্ বিশ্বাস

জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে মানবদলের নামকরণ করবার এই প্রথাটি আমাদের দেশে টিকে রয়েছে শুধুমাত্র প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলির মধ্যে নয়, দেশের পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলের বাস্তব সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও। আপনি যদি থার্স্টন, রিসলী, রাসেল, কুক, আয়ার ইত্যাদির বই থেকে এ-বিষয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করতে রাজী হন তাহলে হয়তো দেখবেন

কোনো রকম পরিচিত পোকামাকড়, গাছগাছড়া বা জন্তু-জানোয়ারের নামই বাদ পড়ছে না!

কিন্তু প্রশ্ন হলো, ব্যাপারটা কী? এই ভাবে পোকামাকড়, গাছগাছড়া আর জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে মানবদলের নামকরণ করবার ব্যবস্থা কেন? এ কি শুধুই আমাদের দেশের মানুষদের একটা বৈশিষ্ট্য নাকি? আসলে তা নয়। এ হলো মানবজাতিরই সমাজ-সংগঠনের এক আদিম পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। মর্গান[৮১] লক্ষ্য করেছিলেন যে, আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে সর্বত্র প্রথা হলো জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে গোষ্ঠীর নামকরণ করা। কিন্তু এই প্রথাটিকে যদি আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায় দেখতে চান তাহলে আপনাকে অস্ট্রেলিয়া যেতে হবে। কেননা, সে-দেশের আদিবাসীদের মধ্যেই কোনো কোনো দল আজো খুবই আদিম পর্যায়ে পড়ে রয়েছে এবং তাদের মধ্যে থেকে এই প্রথার একেবারে আদিম রূপটি আজো লুপ্ত হয়নি।

ওজিবওয়া নামের একদল আমেরিকার আদিবাসীদের ভাষা-ব্যবহার থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রথাটির নাম গ্রহণ করেছেন। নামটা হলো টোটেম্-বিশ্বাস[৮২]।

কী রকমের বিশ্বাস? পুরো একদল মানুষ মনে করছে কোনো এক জন্তু বা কোনো এক গাছ থেকে তাদের সকলের জন্ম: তারা সকলেই ওই জন্তুর বা গাছের বংশধর। আর তাই জন্যেই, তাদের ধারণায় ওই গাছ বা জন্তুর পরিচয়টাই তাদের আসল পরিচয়। ক্যাঙারু-দলের সকলে ভাবছে, ক্যাঙারু থেকেই তাদের দলের সবাইকার জন্ম, তাই তারা সবাই-ই ক্যাঙারু। সূর্যমুখী-দলের সবাই ভাবছে, সূর্যমুখী থেকেই তাদের দলের সবাইকার জন্ম, তাই তারা সবাই সূর্যমুখী।

ওজিবওয়াদের ভাষায়, ক্যাঙারুদলের কাছে ক্যাঙারুই হলো দলের টোটেম্, সূর্যমুখী দলের কাছে সূর্যমুখীই হলো দলের টোটেম্। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা তাই পুরো ব্যাপারটারই নাম দিচ্ছেন টোটেম্-বিশ্বাস।

ছান্দোগ্য-উপনিষদের ওই সামগানরত কুকুরগুলির পরিচয়-প্রসঙ্গে এখানে বিশেষ করে দুটি প্রশ্ন আলোচনা করা দরকার।

প্রথমত, ভারতীয় প্রাচীন পুঁথিপত্রে সত্যিই এই টোটেম্-বিশ্বাসের চিহ্ন পড়ে রয়েছে কিনা?

দ্বিতীয়ত, টোটেম্-বিশ্বাসের চিহ্ন থেকে ঠিক কোন ধরনের সমাজ-সংগঠন অনুমান করা দরকার।

প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিতে টোটেম্-বিশ্বাসের চিহ্ন?

বেদাদি প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্রে টোটেম্-বিশ্বাসের চিহ্ন যে স্পষ্টভাবেই টিকে রয়েছে এ-কথা বোধ হয় হপ্‌কিন্স ছাড়া আর কোনো আধুনিক পণ্ডিত খুব জোর গলায় অস্বীকার করেন না। তাই, বিশেষ করে হপ্‌কিন্স-এর যুক্তিটাই এখানে বিচার করা দরকার। ওল্ডেনবার্গ-এর গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন[৮৩] :

> Our learned author, who is perhaps too well read in modern anthropology, seems to give the absolute dictum that animal names of persons and clans imply totemism. This is no longer a new theory. On the contrary, taken in so universal an application it is a theory already on the wane, and it seems to us injudicious to apply it at random to the Rigveda. As a means of explanation it requires great circumspection, as is evinced by the practice of American Indians, among whom it is a well-known fact that animal names not of totemic origin are given, although many of the tribes do have totem-names. For example, in the Rigveda, Cucumber and Tortoise certainly appear to indicate totemism. But when we hear that Mr. Cucumber was so called because of his numerous family we must remain in doubt whether this was not the real reason. Such family events are apt to receive the mocking admiration of contemporaries. Again, Mr. Tortoise is the son of Gritsamada, a name smacking strongly of the sacrifice, a thoroughly priestly name, and it is not his ancestor but his son who is called Tortoise, very likely because he was slow. The descendents of his son will be called "sons of the tortoise", but there is no proof of totemism; on the contrary, there is here direct evidence that totemistic appearance may be found without totemism. We can scarcely believe that Gritsamada's ritualistic educated son ever worshipped the tortoise.
>
> Clearly enough, it is in the later litereture that one is brought into closest rapport with the anthropological data of the other peoples. This is due to the fact that the more the Hindus penetrated into India the more they absorbed the cult of the un-Aryan nations, and it is from this rather than the refined

priestliness of the Rigvedic Aryans that one may get parallels to the conceptions of Cis-Indic barbarism.

পুরো উদ্ধৃতিটির তর্জমা করবার দরকার নেই, উদ্ধৃতির প্রতিটি যুক্তি খুঁটিয়ে বিচার করবারও নয়। তার বদলে বিশেষ করে নজর করা যাক, বৈদিক সাহিত্যে টোটেম্‌-বিশ্বাসের চিহ্ন অস্বীকার করবার আশায় হপ্‌কিন্স কোন ধরনের পাল্টা মতবাদ দাঁড় করবার চেষ্টা করছেন।

উদ্ধৃতির মধ্যেই দু'রকম চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

এক : বৈদিক সাহিত্যের যেখানে যেখানে জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে মানুষের নামকরণ করবার ব্যবস্থা দেখা যায় সেখানেই আসল উদ্দেশ্যটা হলো ঠাট্টা-তামাসা। জন্তুটার কোনো একটা লক্ষণের সঙ্গে মানুষটির কোনো লক্ষণ মিলে গেলে মানুষটিকে সেই জন্তুর নাম দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন ধরুন, আজকালকার দিনে কেউ খুব লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটলে তাকে ঠাট্টা করে আমি-আপনি হয়তো বক বলবো, কিংবা প্রচণ্ড গলায় চিৎকার করবার স্বভাব থাকলে বলবো ষাঁড়! তেমনিই, হপ্‌কিন্স বলছেন, গৃৎসমদের পুত্রটি নিশ্চয়ই গুটিগুটি নড়তেন, আর সম্ভবত সেই কারণেই তাঁকে কাছিম বলা হয়েছে।

কিন্তু, এই মতবাদ মানা সত্যিই মুস্কিল। বৈদিক ঋষিদের রসিকতার উৎসাহটা হপ্‌কিন্স-এর মতো প্রবল ছিলো কি না সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হলেও হপ্‌কিন্স-এর মত অনুসারে অন্তত এটুকু মানতেই হবে যে রসিকতার উদ্দেশ্যে তাঁরা একেবারেই পাত্রাপাত্রজ্ঞানহীন হয়ে পড়তেন এবং বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা রসিকতা করতেন জানোয়ারটির সঙ্গে কোনো রকম আপাত-সাদৃশ্যের পরোয়া না করেই। গোতম ঋষির সঙ্গে গোরুর মিল কোথায়, বৎস-র সঙ্গে বাছুরের মিল কোথায়, শুনক ঋষির সঙ্গে কুকুরের মিল কোথায়, মাণ্ডুক্যেয় ও কৌশিকের সঙ্গে ব্যাঙাচি আর প্যাঁচার মিল কতোটুকু—এ-সব প্রসঙ্গ অবশ্যই প্রাচীন পুঁথিপত্রের কোথাও আলোচনাই হয় নি। না হয় ধরেই নিলাম, উক্ত ঋষিদের সঙ্গে উক্ত জন্তু-জানোয়ারের লক্ষণগত সাদৃশ্য ছিলো এবং তারই প্রচ্ছন্ন উল্লেখ ঋষিদের সম্বন্ধে ওই রকম বিদ্রূপমূলক নামের আড়ালে। কিন্তু তাহলেও ঠিক কোন ধরনের পরিহাস-প্রিয়তায় মেতে সেকালের ঋষিরা বৈদিক শাখাগুলিকে সাপ, ব্যাঙ নাম দিয়েছিলেন, তা বোঝবার মতো কল্পনার দৌড় আমাদের সত্যিই নেই।

দুই : হপ্‌কিন্স যেন কিছুটা স্বস্তিবোধ করছেন পরবর্তী যুগের পুঁথিপত্রে পৌঁছে। কেননা, এখানে টোটেম্‌-বিশ্বাসের চিহ্ন পাওয়া গেলেও তার কলঙ্ক থেকে বৈদিক আর্যদের বাঁচাবার একটা সহজ উপায়ও তিনি পাচ্ছেন :

বৈদিক আর্যরা যতোই ভারতবর্ষের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন ততোই স্থানীয় অনার্যদের অনেক রকম স্থূল ও প্রাকৃত বিশ্বাস তাদের সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ করেছিলো। অর্থাৎ কিনা, টোটেম্-বিশ্বাসটির জন্যে দায়ি করে দেওয়া গেলো শুধু ওই ছাই-ফেলতে-ভাঙা-কুলো স্থানীয় অনার্য জাতিগুলিকে।

আর ঠিক এইটেই হলো আর্য-অনার্য মতবাদের আসল ফাঁদ। ঐতিহাসিক ভাবে এ-মতবাদ যে শেষ পর্যন্ত কতোখানি দাঁড়াবে সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু এই মতবাদই যে বৈদিক মানুষগুলির ইতিহাসকে বুঝতে দারুণ বাধার সৃষ্টি করে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা, বৈদিক সাহিত্যে এই বৈদিক মানুষগুলিকে সমাজ-বিকাশের যে-পর্যায়েই দেখা যাক না কেন, বৈজ্ঞানিক ভাবে এ-কথা মনে করা অসম্ভব যে তাদের কোনো অতীত ছিলো না—বুঝি শুরু থেকেই তারা সমাজ-বিকাশের ওই পর্যায়েই জীবনযাপন করতো। কেননা, মানবজাতির যে-কোনো শাখার কথাই ভাবা যাক না কেন, পশুর রাজ্য পিছনে ফেলে সভ্যতার পর্যায়ে উঠে আসবার পথে প্রত্যেককেই সমাজ-বিকাশের কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্যায় পার হতে হয়েছে। কিন্তু আর্য-অনার্য মতবাদ অনেক সময় বৈদিক মানুষদের ওই পিছনে-পড়ে-থাকা পর্যায়গুলিকে অস্বীকার করবার আয়োজন করে। কেননা, বৈদিক সাহিত্যে সে-পর্যায়ের কোনো চিহ্ন দেখলে উক্ত মতবাদের প্রভাবে এগুলিকে অনার্যদের কাছ থেকে গ্রহণ করা বিশ্বাস বলে ব্যাখ্যা করবার প্রলোভন হয়। বৈদিকসাহিত্যে টোটেম্-বিশ্বাসের চিহ্নগুলিকে ব্যাখ্যা করবার আশায় হপ্‌কিন্স যা বলেছেন তা এই প্রলোভনেরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। যদিও, বৈদিক সাহিত্যের তুলনায় উত্তর যুগের সাহিত্যে টোটেম্-বিশ্বাসের পরিচয় সত্যিই বেশি প্রকট, এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়—হপ্‌কিন্স-এর প্রতিজ্ঞাটিও খুব সম্ভব ভ্রান্ত।

কিন্তু হপ্‌কিন্স-এর সবচেয়ে হাস্যকর যুক্তি হলো: ঋষি গৃৎসমদের যাগযজ্ঞবিদ পুত্রটি কোনোদিন সত্যিই কাছিম পুজো করেছেন কিনা তা খুবই সন্দেহের কথা। বৈদিক সাহিত্যে টোটেম্-বিশ্বাসের চিহ্ন অপ্রমাণ করবার আশায় হপ্‌কিন্স এটিকেও একটি মূল্যবান যুক্তি মনে করছেন; অথচ এ-কথা সত্যিই হাস্যকর; কেননা, টোটেম্-বিশ্বাসকে ভুল বোঝবার—বা একেবারেই না-বোঝবার—এ হলো প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এবং দুঃখের বিষয় যে-সব বিদ্বানেরা বৈদিক সাহিত্যে টোটেম্-বিশ্বাসের চিহ্ন স্বীকার করেন তাঁরাও[৮৩] এ-বিশ্বাসের স্বরূপ সম্বন্ধে, এবং বৈদিক সাহিত্যে এ-বিশ্বাসের চিহ্ন খুঁজে পাবার তাৎপর্য সম্বন্ধে, খুব সুস্পষ্ট কোনো ধারণা পাবার চেষ্টা করেন নি।

টোটেম্-বিশ্বাস ও আদিম সাম্য-সমাজ

ভারতবর্ষের প্রাচীন পুঁথিপত্রে টোটেম্-বিশ্বাসের চিহ্ন যে রয়েছে এ-কথা বলায় নিশ্চয়ই আজকের দিনে আর তেমন কোনো অভিনবত্ব নেই। কেননা, বহু গবেষকই আজ এ-কথা স্বীকার করছেন। কিন্তু এ-জাতীয় চিহ্নের প্রকৃত তাৎপর্য কী? এই প্রশ্ন নিয়ে এখনো খুব স্পষ্ট আলোচনা হয় নি। তার কারণ, টোটেম্-বিশ্বাস বলতে প্রায়ই একরকম আদিম ধর্মবিশ্বাস মনে করা হয়; অথচ টোটেম্-চিহ্ন থেকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয় তা এক রকমের সমাজ-সংগঠন।

> Unfortunately, many writers have used the term totemism very loosly for any beliefs and practices dependent upon some supposed connection between animals and persons. The term should be restricted to those cases where a systematic association of groups of persons with species of animals (occassionally plants or inanimate objects) is connected with a centain element of social organisation.[৮৫]
>
> দুঃখের বিষয়, অনেক লেখকই টোটেম্-বিশ্বাস বলে নামটি অসাবধান ভাবে ব্যবহার করেন। তাঁদের ধারণায় জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক-সূচক যে-কোনো বিশ্বাস বা ক্রিয়াকর্মকেই এ-নাম দেওয়া যায়। শব্দটি শুধুমাত্র সেই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে আবদ্ধ রাখা দরকার যেখানে মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির জানোয়ারের সুপরিকল্পিত সম্পর্কের কথা একরকম সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত।

ওই সমাজ-সংগঠনের কথাটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। টোটেম্-বিশ্বাস থেকে সেই সমাজ-সংগঠনকে অনুমান করা দরকার।

কোন ধরনের সমাজ-সংগঠন? একমাত্র উত্তর হলো: আদিম সাম্য-সমাজ, যে-সমাজে ছোটো-বড়োয় তফাত দেখা দেয় নি—সামাজিক শক্তির দিক থেকে নয়, ঐশ্বর্যের দিক থেকেও নয়। সবাই সমান, সবাই স্বাধীন, মানুষে মানুষে সত্যিই ভাই-ভাই ভাব। মনে রাখতে হবে, এই আদিম সাম্য-সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপরই রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। অন্তত প্রাচীন মিশরের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তির এই অভ্যুত্থান-ইতিহাস স্পষ্ট ভাবে উদ্ধার করেছেন মরেট আর ডেভি[৮৬]। ছান্দোগ্য-বর্ণিত কুকুরদের সামগানটুকু বোঝবার জন্যে অবশ্যই ওই টোটেম্-সমাজের ধ্বংসকাহিনী বা রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান-কাহিনী নিয়ে আলোচনা তোলবার দরকার নেই।

দরকার হলো, টোটেম্-সমাজের স্বরূপটিকে চেনবার। এ-বিষয়ে মরেট এবং ডেভির সিদ্ধান্তই উদ্ধৃত করা যাক :

> The true totemic society, remarks M. Moret, knows neither kings nor subjects. It is democratic or communistic ; all the members of the clan live in it on a footing of equality with respect to their totem.[৮৭]
>
> অর্থাৎ, এম্. মরেট বলছেন, প্রকৃত টোটেম্-সমাজে না আছে রাজা না প্রজা। এ-সমাজ গণতান্ত্রিক, বা সাম্যবাদী ; গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষই টোটেম্‌টির সম্পর্কে সমানে সমান।

কিংবা

> The active and passive subjects of obligations are collective in the regime of the totemic clan. Power, like responsibility, still has therein an undivided character. We are in the presense of a communal and equalitarian society in the bosom of which participation in the same totem which constitutes the essense of each and the cohesion of all, places all members of the clan on the same footing[৮৮].
>
> অর্থাৎ, টোটেম্-গোষ্ঠীর পর্যায়ে কর্তব্যের সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় দুটো দিকই সমষ্টিগত। দায়িত্বের মতোই শক্তিরও তখন পর্যন্ত অবিভক্ত অবস্থা। আমরা এক সাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী সমাজের সম্মুখীন হই যার মধ্যে একই টোটেমে অংশগ্রহণ করবার দরুন সকলেরই সমান অবস্থা। এবং এই টোটেমের উপরই নির্ভর করছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সত্তা এবং পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক।

এই আদিম সাম্যসমাজের বর্ণনায় পরবর্তী পরিচ্ছেদে ফেরা যাবে। কিন্তু এখানে একটি সমস্যার অবতারণা করে রাখা যায় : টোটেম্-সমাজ যদি সত্যিই এরকম অবিভক্ত সাম্যসমাজ হয় তাহলে তারই আওতায় কোনো রকম ধর্মচেতনা সত্যিই কি সম্ভবপর ? মনে রাখা দরকার, ধর্মচেতনার মূল কথা হলো উপাস্য-উপাসকে প্রভেদ। যাঁরা ভুল করে টোটেম্-বিশ্বাসকে ধর্মবিশ্বাস মনে করছেন তাঁদের ধারণায় সমাজ-বিকাশের ওই আদিম পর্যায়ে এক এক দল মানুষ এক একটি জন্তু-জানোয়ার বা গাছপালাকেই ভগবানের সামিল মনে করেছিলো : দলের সকলের কাছে দলের টোটেম্‌টিই উপাস্যের স্থান দখল করেছিলো। কিন্তু টোটেম্-বিশ্বাসকে ভালো করে পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়, এ মতবাদ ঠিক নয়। যে-দলের টোটেম্ হলো সূর্যমুখী ফুল সে-দলের প্রত্যেকেই নিজেকে সূর্যমুখী ফুল মনে করছে। উপাস্য-উপাসকের

তফাতটা কোথায়? আর যদি তাই হয়, তাহলে টোটেম্-বিশ্বাসকে ধর্ম-বিশ্বাসেরই কোনো আদিম পর্যায় মনে করবার সত্যিই অবকাশ নেই। মনে রাখতে হবে, টোটেম্-সমাজ ভেঙে যখন রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হচ্ছে,—যখন আদিম সাম্যের বদলে সমাজের সবটুকু শক্তি ও ঐশ্বর্য কেন্দ্রীভূত হচ্ছে শাসকের হাতে,—তখনই প্রকৃত অর্থে ধর্মবিশ্বাসের জন্ম। অবশ্যই, সমাজ-বিকাশের ওই নবপর্যায়ে আদিমকালের টোটেমটি যে বিলুপ্ত হতে বাধ্য এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু অন্তত তার জাতবদল হতে বাধ্য। তাই নতুন পর্যায়েও প্রায়ই সেই পুরোনো জানোয়ারটিকে খুঁজে পাওয়া যায়—কিন্তু তখন আর সে আদিম টোটেম্ নয়, তার বদলে এক নবজাত দেবতা। তফাতটা কম নয়: টোটেম্-সমাজে যে-জানোয়ারটির সঙ্গে প্রত্যেক মানুষেরই একান্ত একাত্মবোধ ছিলো রাষ্ট্রের উৎপত্তির পর দেখা গেলো তারই সামনে মানুষেরা হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা-উপাসনা শুরু করেছে!

প্রাচীন মিশরের ইতিহাসকে উদ্ধার করবার প্রচেষ্টায় এই টোটেম্-চিহ্নের গুরুত্ব মরেট এবং ডেভির গবেষণায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে। রাষ্ট্রশক্তির উৎপত্তি এবং ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি নিয়ে আমরা যখন আলোচনা তুলবো তখন স্পষ্টই দেখা যাবে এঁদের গবেষণা আমাদের পক্ষে কতোখানি সহায়ক। প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে যা স্পষ্ট ভাবে জানা গিয়েছে, তারই সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আজো যা অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে তা বোঝবার পথ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আপাতত আমাদের চেষ্টা হলো, ছান্দোগ্যের ওই সামগানরত "কুকুরগুলি"কে সনাক্ত করা। আশা করি টোটেম্-বিশ্বাস নিয়ে যেটুকু আলোচনা তোলা হয়েছে তার সাহায্যে ওই কুকুরগুলিকে চিনতে আর কোনো অসুবিধে হবে না।

সামগান আর অন্নআহরণ

কুকুর মানে তাহলে সত্যিই কুকুর নয়। মানুষ। তবে আমার-আপনার মতো একালের মানুষ নয়। টোটেম্-সমাজের মানুষ। সে-সমাজের প্রধান লক্ষণ হলো, একান্ত দলগত বা গোষ্ঠীগত জীবন। ছোটোয়-বড়োয় তফাত নেই,—শক্তির দিক থেকে নয়, ঐশ্বর্যের দিক থেকেও নয়। তাই এই সমাজকে বলা হয় আদিম সাম্য-সমাজ। শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার আগেকার পর্যায়ের এই সমাজে পরান্নজীবী হিসেবে কারুরই স্থান নেই—দলের কাজে সবাইকেই যোগ দিতে হয়। অর্থাৎ, শ্রমের দায়িত্ব গ্রহণের দিক থেকেও সবাই সমান।

উপনিষদের মধ্যে এ-হেন একটা টোটেম্-সমাজের স্পষ্ট ছবি কেমন ভাবে টিকে থেকেছে তা ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগে। কেননা, উপনিষদে মোটের উপর যে-সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় তা আর যাই হোক আদিম সাম্যসমাজ নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজই। অথচ মানতেই হবে, যেমন করেই হোক নতুন পর্যায়ের সাহিত্যেও পুরোনো পর্যায়ের স্মারক থেকে গিয়েছে। ঠিক কী করে টিকে থাকলো তার স্পষ্ট জবাব দিতে না পারলেও ওই সমাজের ছবি যে টিকে রয়েছে এ-কথা কোনো মতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সমাজ-বিকাশের ওই পুরোনো পর্যায়টির কথা মনে না রাখলে ছান্দোগ্য-বর্ণিত কুকুরগুলির বাকি আচরণটুকুও বোঝা যাবে না। অপর পক্ষে, ওই সামাজিক পটভূমিটিতে বিচার করতে পারলে উপনিষদের এই অংশটির বাকি প্রায় প্রতিটি কথারই স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

একে একে বাকি কথাগুলির আলোচনা তোলা যাক।

স্বাধ্যায়-অন্বেষী বক দালভ্য, ওরফে গ্লাব মৈত্রেয়, কী দেখলেন? প্রথমত একটি সাদা কুকুর: সাদা বিশেষণটি বয়স-ব্যঞ্জক কিনা তা বোঝবার উপায় নেই। হতেও পারে, না হতেও পারে। যদি প্রাচীনত্বসূচকই হয় তাহলে তাকে ওই কুকুরদলের মধ্যে প্রাচীন বলতে বাধা হবে না। তার প্রতি অন্য কুকুরদের আচরণটাও দলপতি-সূচক। তাই সাদা বলতে 'সাদা চুল'—এমন অর্থ খুব বেশি অসম্ভব নাও হতে পারে।

কিন্তু তা হোক আর নাই হোক, তার প্রতি অন্য কুকুরদের অনুরোধটা আপাতদৃষ্টিতে একেবারেই অসম্ভব আর আজগুবি মনে হয়: তাদের ক্ষিদে পেয়েছে, তারা অন্ন চায়—এ-পর্যন্ত বুঝতে নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু অন্নলাভের উপায় হিসেবে অপর কুকুরগুলি যা বললো তার কোনো রকম তাৎপর্য যে থাকতে পারে তা আমাদের পক্ষে ভাবাই কঠিন। সাদা কুকুরটিকে ঘিরে অন্য কুকুরেরা বললো: ক্ষিদে পেয়েছে, অন্ন চাই, অতএব একটা গান গাও।

অন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম্

কুকুরদের ছোটো মুখে এ-হেন একটা বড়ো কথা শুনে আধুনিক যুগের অনেক নন্দনতত্ত্ববিশারদ নিশ্চয়ই বিলক্ষণ বিরক্ত হবেন। কেননা, তাঁদের মধ্যে আজ অনেকেই খুব জোর-গলায় ঘোষণা করছেন: *Art for Art's sake*—শিল্প নিছক শিল্পের খাতিরেই। অনাশক্ত ও নির্লিপ্ত রসসম্ভোগ ছাড়াও শিল্পের যে আর কোনো রকম উপযোগিতা থাকতে পারে এ-কথা আজকের যুগে নানাভাবে অস্বীকার করা হয়।

অবশ্যই, নন্দনতত্ত্বের এ-জাতীয় মতবাদ হলো ভাববাদী মতবাদ—

অভিনব গুপ্ত থেকে ক্রোচে পর্যন্ত যে-মতবাদের প্রচারক। কিন্তু ছান্দোগ্যের ওই কুকুরগুলি ভাববাদ কাকে বলে তা জানে না! তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা আগাগোড়াই বস্তুবাদী

নন্দনতত্ত্বের মতাদর্শের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গেও কুকুরদের ওই কথাগুলির যেন আকাশ-পাতাল তফাত। আমরা আজ এমন একটা যুগে বাস করছি যেখানে সংগীতের সঙ্গে অন্ন আহরণের কোনো রকম কার্যকারণ সম্পর্ক একেবারে অসম্ভব ও আজগুবি কল্পনা বলেই মনে হবার কথা।

তবু, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, উপনিষদের ঋষিদের কাছে সম্পর্কটার সম্ভাবনা অতো অসম্ভব বা আজগুবি ছিলো না। এবং এর কারণটাও রহস্যজনক নয়: আমরা বাস করি আধুনিক সমাজে, এবং আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থাই আমাদের ধ্যানধারণার উৎস। উপনিষদের ঋষিরা বাস করতেন প্রাচীন সমাজে, এবং সেই প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাই তাঁদের ধ্যানধারণার উৎস ছিলো। তাঁদের ওই প্রাচীন সমাজের সঙ্গে আমাদের আধুনিক সমাজের অনেক তফাত, তাঁদের ধ্যানধারণার সঙ্গে আমাদের ধ্যানধারণারও অনেক তফাত। তাই, তাঁদের স্মৃতি থেকে সংগীতের সঙ্গে অন্ন-আহরণের সম্পর্কটা একেবারে বিলুপ্ত হয় নি, যে-রকম বিলুপ্ত হয়েছে আমাদের মন থেকে।

উপনিষদ-সাহিত্যে যদি শুধুমাত্র কুকুরদের ওই সামগানের দৃশ্যটিই সংগীতের সঙ্গে অন্নআহরণের কার্যকারণ-সম্পর্ক-সূচক হতো তাহলেও কথাটাকে উড়িয়ে দেবার উপায় থাকতো না। কিন্তু উপনিষদের সাক্ষীর জোর অনেক বেশি, কেননা, দেখা যায় ওই সম্পর্কের কথা বারবার ঋষিদের চিন্তায় উঁকি দিচ্ছে। এখানে দু'-একটা নমুনা উদ্ধৃত করা যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে লেখা আছে:

> অথাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়ত্তদ্ধি কিংচান্নমদ্যতেঽনেনৈব তদদ্যত ইহ প্রতিতিষ্ঠতি ॥১।৩।১৭॥
>
> অর্থাৎ, অনন্তর নিজের জন্য অন্নাদিকে গান করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। কেননা, যে-কিছু অন্ন ভুক্ত হয় তা ইহার দ্বারাই ভুক্ত হয়, ইহাতে (অন্নতে) প্রতিষ্ঠিত থাকে।

গানের সাহায্যেই যে অন্ন লাভ করা গিয়েছে এ-কথা উপনিষদের ঋষিদের মনগড়া কথা নয়। তাঁরা লিখছেন, স্বয়ং দেবতারাও এই কথাটি স্বীকার করে গিয়েছেন। বৃহদারণ্যকে তাই বলা হয়েছে:

> তে দেবা অব্রুবন্নেতাবদ্বা ইদং সর্বং যদন্নং তদাত্মন আগাসীরন্থু নোঽস্মিন্নন্ন আভজস্বেতি··· ॥১।৩।১৮॥
>
> অর্থাৎ, সেই দেবগণ বলিলেন, এ-পর্যন্ত এই যে অন্ন সেই অন্নকে নিজের জন্ত গান করিয়া লাভ করিয়াছ। এখন (পশ্চাৎ) আমাদের সেই অন্নে অংশী করো···

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উপনিষদের যুগ পর্যন্ত খোদ দেবতারাও মানতেন যে অন্নলাভার্থে গানের কার্যকারিতা আছে। গান শুধুমাত্র অবসর-বিনোদন নয়, উৎপাদন-পদ্ধতির অঙ্গও।

অন্নলাভের সঙ্গে গানের কোনো যোগ থাকা সম্ভব কিনা এ-বিষয়ে আজকের দিনে আমার-আপনার একটা মত থাকতে পারে, আছেও নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনা মোটেই তা নিয়ে নয়। আমরা শুধু দেখতে চাইছি, প্রাচীনদের ধারণা অনুসারে এ-রকম কোনো যোগাযোগ মানা দরকার কিনা।

প্রাচীনদের ধারণায় গানের সঙ্গে অন্নের যোগটা যে কতো ঘনিষ্ঠ তার অন্যান্য পরিচয় উপনিষদেই দেখতে পাওয়া যায়। উপনিষদের ঋষিরা উদ্গীথ শব্দটিকে কী ভাবে বিশ্লেষণ করতে চান তাই দেখুন। ছান্দোগ্য-উপনিষদে বলা হয়েছে, এই উদ্গীথের অক্ষরগুলিকে সম্যকভাবে বুঝতে হবে (উপাসীত) :

> খলূদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাসীতোদ্গীথ ইতি প্রাণ এবোৎ প্রাণেন হ্যুত্তিষ্ঠতি বাগ্গীর্বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতেঽন্নং থমন্নে হীদং সর্বং স্থিতম্ ॥১।৩।৬॥
>
> অর্থাৎ, অনন্তর উদ্গীথের অক্ষরসমূহকে উপাসীত। উদ্গীথ এই : প্রাণই হইল উৎ অক্ষর, কেননা, প্রাণের দ্বারাই উত্তিষ্ঠ হয়। বাক্-ই হইল গী অক্ষর, (কেননা) বাক্‌কেই গী বলা হয়। অন্নই হইল থম্ এই অক্ষর, (কেননা) এই সমুদয় অন্নেই অবস্থিত।

তাহলে, সামগানের ওই উদ্গীথ বলে নামটিকে ভেঙে দেখলেই দেখতে পাবেন, তার মধ্যে অন্নের অভাব নেই। এবং এ-কথা একালের কোনো চিন্তাশীলের কল্পনা নয়—স্বয়ং ঋষিদের দস্তখৎ করা দলিল।

সামগানের সঙ্গে অন্নের সম্পর্ক নিয়ে উপনিষদে আরো কথা লেখা আছে। সামগানের চতুর্থ পর্যায়টিকে বলে প্রতিহার—আধুনিক পণ্ডিতের তর্জমায় *response*। ছান্দোগ্য-উপনিষদেই প্রশ্ন উঠেছে, এই প্রতিহারের অনুগমনকারী দেবতাটির স্বরূপ নিয়ে। উষস্তি চাক্রায়নকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, কে সেই দেবতা ? প্রশ্নের সর্তটা অবশ্যই খুব কঠিন : এই দেবতাকে

না জেনে উষস্তি চাক্রায়ন যদি প্রতিহার-কর্ম করেন তাহলে তাঁর মাথা কাটা যাবে। উত্তরে উষস্তি চাক্রায়ন যা বলেছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর :

> অন্নমিতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রত্যহরিষ্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্য ময়েতি তথোক্তস্য ময়েতি। ॥১।১১।৯॥
>
> অর্থাৎ, তিনি বলিলেন, অন্নই সেই দেবতা। এই সমুদয় ভূতই অন্ন আনয়ন করিয়া (প্রতিহরমাণানি=প্রতি+হৃ+শানচ্=আনয়ন করিয়া) জীবনধারণ করে। সেই দেবতাই প্রতিহারের অনুগমন করেন। তাহাকে না জানিয়াই আপনি যদি প্রতিহার-কর্ম করিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনারই শির নিপতিত হইবে।

উষস্তি চাক্রায়ণের শির নিপতিত হয়েছিলো—এমনতরো কোনো কথা উপনিষদে লেখা নেই। বরং, উষস্তি চাক্রায়ণের সংবাদ ওইখানেই শেষ হলো। তার থেকেই বোঝা যায়, উপনিষদের ওই অংশে তাঁর এই কথাগুলিই উপনিষদের ঋষিদের কাছে এ-বিষয়ে চরম প্রতিপাদ্য ছিলো।

তাহলে, উপনিষদের ওই কুকুরগুলি গানের সঙ্গে—সামগানের সঙ্গে—অন্ন-আহরণের সম্পর্ক উল্লেখ করে এমন কোনো কথা বলছে না যা কিনা সাধারণভাবে উপনিষদের ঋষিদের মতবাদের সঙ্গে খাপ খায় না। বরং, উপনিষদের ঋষিদের চেতনায় এই সম্পর্কের কথাটা যেন এক স্থির বিশ্বাসের মতো—বারবার তা ঘুরে আসছে দেখা যায়।

গান আর কাজ

কিন্তু ব্যাপারটা কী? আমাদের আধুনিককালের ধারণার সঙ্গে এই কথাগুলির সঙ্গতি নেই। আর তা যদি না থাকে তাহলে এগুলিকে বোঝবার একমাত্র উপায় হতে পারে আধুনিক যুগের সামাজিক পরিবেশটিকে ছেড়ে প্রাচীন সমাজের দিকে চেয়ে দেখা, সন্ধান করা যে এমন কোনো সমাজব্যবস্থা সত্যিই সম্ভব কিনা যেখানে গান আর খাদ্য-উৎপাদন সত্যিই অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে সংযুক্ত।

সত্যিই কি ওই রকম কোনো সমাজের খবর জানা আছে? আছে। সে-সমাজ অবশ্যই খুব পিছিয়ে-পড়া সমাজ—তার আদি ও অকৃত্রিম রূপ নিশ্চয়ই আদিম সাম্যসমাজ, যদিও সেই আদিম সাম্যসমাজ ভেঙে যাবার

পরও মানুষের চিন্তায় কাজের সঙ্গে গানের যোগাযোগটির রেশ বহুদিন ধরেই থেকে গিয়েছে।

বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে সুবিধে হবে অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের[৮৯] রচনা অনুসরণ করলে।

অধ্যাপক টম্‌সন শুরু করছেন একেবারে গোড়ার কথা থেকে। গান বা সংগীতের জন্ম হলো কী করে? এ-কথা বুঝতে হলে ভাষার জন্মবৃত্তান্তও মনে রাখা দরকার। কেননা, বাক বা ভাষা ছাড়া গান হয় না—অন্তত আধুনিক যুগের বিশুদ্ধ যন্ত্রসঙ্গীতের বেলায় যাই হোক না কেন, পুরোনো আমলে ভাষা বাদ দিয়ে গানের কথা ভাবা যায় না। উদ্‌গীথের শব্দার্থ-বিশ্লেষণে ঋষিরাও বলছেন, বাক্‌-ই গী[৯০]! কিন্তু ভাষার জন্মবৃত্তান্ত অনুসন্ধান করতে হলে মানুষের জন্মবৃত্তান্ত নিয়েও আলোচনা তুলতে হয়, কেননা, মানুষের পক্ষে পশুজগৎ ছেড়ে আসবার পরিচয় প্রধানত দু'দিক থেকে: হাতিয়ার আবিষ্কার ও ভাষা আবিষ্কার। জানোয়ারেরা হাতিয়ার বানাতে পারে না, কথা কইতে পারে না—পৃথিবীতে শুধুমাত্র মানুষই তা পারে।

মানুষের পক্ষে হাতিয়ার আবিষ্কার এবং ভাষা আবিষ্কার—দুটো খুব স্বতন্ত্র ঘটনা নয়। হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ উৎপাদন-কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারলো। কিন্তু গোড়ার দিকে কারুর পক্ষেই এই উৎপাদন-কাজ একাএকা সম্পাদন করা সম্ভব নয়—দশহাত এক হয়ে একসঙ্গে কাজ করেছে। আর এরই দরুন পরস্পরের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিলো—সেই তাগিদেই মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সংযোজিত হতে লাগলো অর্থ: মানুষ আর জানোয়ারদের মতো চিৎকার করে না, রীতিমতো কথা বলে। পুরো দলের ওই একান্ত দলগত কাজটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার তাগিদেই মানুষের ভাষা উন্নত হতে লাগলো। তাই গোড়ার দিকে হাতের কাজের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি[৯১]।

শিশুরা কথা বলবার সময় খুব বেশি অঙ্গভঙ্গি করে। যদি মানবজাতিরও শৈশবকে পরীক্ষা করা যায় তাহলে চোখে পড়ে কথা বলার সঙ্গে হাত নাড়ানোর যোগাযোগটা কতো ঘনিষ্ঠ। আমরাও হয়তো মুখের কথাকে ভালো করে বোঝাবার জন্যে অল্পবিস্তর হাত নাড়াই—অঙ্গভঙ্গি করি। কিন্তু অসভ্য মানুষদের বেলায় ঠিক তা নয়—অন্যেরা যাতে কথাটাকে আরো ভালো করে বুঝতে পারে এইজন্যে তারা হাত নাড়ায় না। কেননা, বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য করেছেন যে, ওরা যখন আপন মনে কথা বলে তখনো প্রচুর অঙ্গভঙ্গি করে[৯২]। আমাদের কাছে কথাটাই মুখ্য, অঙ্গভঙ্গিটুকু গৌণ। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে তা নয়। কেননা, হাতের কাজের সঙ্গেই তাদের মুখে ভাষা ফুটেছিলো। আদিম মানুষদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে যাঁরাই

গবেষণা করেছেন তাঁরাই বলছেন, ওদের বেলায় মুখের ভাষাটা অনেকাংশেই হাতের অঙ্গভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক টম্‌সন নজির দিচ্ছেন গ্রে, স্মাইথ, রটে্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের[২৩]। অর্ধশতাব্দী আগেই এই সব সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বুশের[২৪] প্রমাণ করতে চাইলেন, হাতিয়ার-ব্যবহারের দরুন পেশীগুলিতে যে-জোর পড়ে তারই প্রতিবর্তী-ক্রিয়া হিসেবে স্বরযন্ত্রের প্রতিক্রিয়াটি থেকেই মানুষের গলায় ভাষা ফুটে উঠেছিলো। তারপর, হাতের কাজের যতো উন্নতি হয়েছে ততোই উন্নত হয়েছে স্বরযন্ত্র এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের চেতনাও উন্নত হতে হতে একটা পর্যায়ে পৌঁছে দেখা গেলো এই প্রতিবর্তী ক্রিয়াটিকেই তারা সচেতনভাবে ভাবের আদান-প্রদান কাজে নিযুক্ত করতে পারছে।

শ্রমের সঙ্গে ভাষার এই সংযোগটিকে আজো খুঁজে পাওয়া যায় শ্রম-সঙ্গীত বা 'কাজের গান'-এর মধ্যে। যে-সব দেশে কলকারখানার শব্দে শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর একেবারে চাপা পড়ে যায় নি সেই সব দেশে ওই শ্রম-সঙ্গীত শুনতে পাওয়া একটুও কঠিন নয়[২৫]। নৌকো বাওয়ার গান, ধান কাটার গান থেকে শুরু করে ছাদ পেটাবার গান বা শ্রমিকদের পক্ষে প্রকাণ্ড ভারি কিছু টানবার সময়কার গানগুলোকে একটুখানি নজর করলেই বোঝা যাবে, এ-সব ক্ষেত্রে কাজ শুধুমাত্র হাতের উপর নির্ভর করছে না, ভাষার উপরও নির্ভর করছে, অবশ্যই, সে-ভাষার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে সুর। তারই নাম গান। এ-গান মোটেই অবসর-বিনোদন নয়—কাজের অঙ্গ। বিশজন শ্রমিক মিলে যখন একটা ভারি কাজ করছে তখন সর্দার দাঁড়িয়ে গানের দায়িত্ব নিয়েছে এবং সে নিজে কাজে হাত লাগাচ্ছে না বলে বাকি শ্রমিকদের মনে কোনো বিক্ষোভ নেই। কেননা, তার ওই গানের দরুনই বাকি বিশজনের পক্ষে অমন শ্রমসাধ্য কাজটাও সহজসাধ্য হয়। গান এখানে শ্রমকে সাহায্য করছে—সবাইকেই একসঙ্গে একতালে একটি কাজ করবার অবস্থায় এনে প্রত্যেকেরই শ্রমলাঘব করছে।

অসভ্য মানুষদের মধ্যে এই শ্রম-সঙ্গীতের তাৎপর্য আরো অনেক স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। যখনই তারা কোনোরকম শ্রমসাধ্য কাজে লিপ্ত হয় তখনই যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাদের মুখে গান জেগে ওঠে। মেয়েরা দৈনন্দিন কাজ গান ছাড়া করতে পারে কিনা সন্দেহ[২৬]!

বুশের প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কাজের তাল থেকেই মানুষের ভাষায় ছন্দের জন্ম হয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্ত আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তী কালের গবেষণায়।

গান-কাজ-নাচ

কিন্তু শ্রমসঙ্গীতের তাৎপর্য—গানের সঙ্গে কাজের আদিম যোগাযোগটির রহস্য—স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে আরো কয়েকটি দিকে নজর রাখা দরকার।

প্রথমত, অসভ্য মানুষদের মধ্যে—এবং পিছিয়ে-পড়ে-থাকা সভ্য মানুষদের মধ্যেও—কাজের সঙ্গে শুধুমাত্র গানেরই যোগাযোগ নয়। তাছাড়াও নাচের যোগাযোগ। বস্তুত, আদিতে নাচ ছাড়া গান সম্ভবই নয়। কিংবা, ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, আদিম মানুষদের মধ্যে নাচ-কাজ-গান—সবসুদ্ধু একসঙ্গে মিশে একাকার হয়ে রয়েছে[৭]। তার মধ্যে কতোটা ঠিক নাচ, কতোটুকু নিছক কাজ এবং কতোটুকু শুধুমাত্র সংগীত—এ-ধরনের তফাত করবার চেষ্টাই কৃত্রিম।

দ্বিতীয়ত, এই যে নাচ-কাজ-গান—এর তাৎপর্যটুকু বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় মানুষের পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় উৎপাদন-কাজের পক্ষে নাচগান বাহুল্য তো নয়ই, বরং অনিবার্যভাবেই উদ্দেশ্যমূলক ও প্রয়োজনীয়[৮]।

এই দ্বিতীয় কথাটিকে মনে না রাখলে ছান্দোগ্য-বর্ণিত কুকুরদের সামগান কিছুতেই বোঝা যাবে না। তাই এই বিষয়টিকেই বিশ্লেষণ করে এগোবার চেষ্টা করা যাক।

উৎপাদন-কৌশলের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে দশজন মিলে একসঙ্গে একই কাজে হাত না লাগালে কাজটাই অসম্ভব। তার কারণ, কাজের হাতিয়ার তখন এমনই স্থূল যে কারুর পক্ষেই একা একটি পুরো কাজ করবার উপায় নেই। তাই সে-অবস্থায় নিজে নিজে কোনো কাজ করবার কথা ওঠে না, কাজ যা তা ওই পুরো দলটিরই।

কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেই মানুষের হাতিয়ার ধারালো হয়েছে, উন্নত হয়েছে তার উৎপাদন-কৌশল।

উন্নতির একটা পর্যায়ে পৌঁছে দেখা গেলো একজন মানুষ নিজে একটা গোটা কাজ করতে শিখেছে। ওই একটি কাজের জন্যে দশজনে আর একসঙ্গে হাত লাগাতে বাধ্য নয়। প্রত্যেকেই যে-যার কাজ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে যৌথ-প্রেরণার প্রয়োজন যে মিটলো তা নিশ্চয়ই নয়। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করবে, কিন্তু সকলে মিলে দল হিসেবে কাজ করবে। বরং যে-যার নিজের কাজের দায়িত্ব নিতে পারবার দরুনই যৌথ-প্রেরণার প্রয়োজনটা বাড়বার কথা: এখন আর দশ-হাত প্রত্যক্ষভাবে এক জায়গায় মিলছে না, তাই মনের দিক থেকে প্রত্যেকের কাছেই সাহসের আর বিশ্বাসের চাহিদাটা বেশি হয়েছে।

কিসের সাহস? কোন ধরনের বিশ্বাস?

যদিও একজনের নিজের উপর গোটা কাজটার দায়িত্ব পড়েছে তবুও আসলে সে একা নয়—দলের সবাই তার সঙ্গেই রয়েছে। তারই সাহস।

কোন বিশ্বাস থেকে এ-ধরনের সাহস পাওয়া সম্ভব? যাদুবিশ্বাস।

কাজে বেরুবার আগে সবাই মিলে এক হয়ে একই কামনা করবে।

শুধু তাই নয়, সবাই মিলে এক হয়ে একসঙ্গে দেখবে ওই কামনাটি সফল হবার ছবি।

কাজ শুরু হবার আগেই কামনা সফল হবার এই ছবিটি কেমন করে দেখতে পাওয়া সম্ভব? বাস্তবে নয় নিশ্চয়ই। কল্পনায়। আর কল্পনায় ওই ছবিটি দেখবার জন্যেই আদিম মানুষের পক্ষে নাচ-গানের আয়োজন: পুরো দলকে ডাক দিয়ে তারা একসঙ্গে মিলে নাচবে আর গান করবে—নাচটার আগাগোড়াই হলো কামনা সফল হবার অনুকরণ, গানটার আগাগোড়াই হলো কামনা সফল হবার অনুকরণ। এইভাবে কামনা সফল হবার ছবিটি দেখতে দেখতে পুরো দল মেতে উঠবে, মেতে উঠে কাজে বেরুবে। দলের মাতন—সে তো আর যেমন-তেমন নয়। সেই সাহসে বুক বেঁধে বেরুতে পারলে কেউই আর নিরুপায় নয়, দুর্বল নয়। অর্থাৎ কিনা, ওই নিরুপায়-বোধ বা দুর্বলতা-বোধটি মন থেকে কেটে যায়।

আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে-সব মানুষের দল পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় টিকে রয়েছে তাদের চেতনায় কাজের সঙ্গে নাচ-গানের সম্পর্কটা কী রকম তাই দেখা যাক।

শ্রীমতী জেন হ্যারিসন বলছেন:

> When a savage wants sun or wind or rain, he does not go to church and prostrate himself before a false god; he summons his tribe and dances a sun dance or a wind dance or a rain dance. When he would hunt and catch a bear, he does not pray to his god for strength to outwit and outmatch the bear, he rehearses his hunt in a bear dance.[98]
>
> আদিম মানুষ যখন রোদ, হাওয়া বা বৃষ্টি চায় তখন সে দেবালয়ে গিয়ে কোনো অলীক দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়ে না। সে ডাক দেয় নিজের গোষ্ঠীকে এবং রোদের নাচ বা হাওয়ার নাচ বা বৃষ্টির নাচ নাচতে শুরু করে। ভালুক শিকার করবার আগে ভালুকটিকে হারিয়ে দেবার জন্যে সে তার দেবতার কাছে শক্তি ভিক্ষে করে না; ভালুক নাচ নেচে শিকারের মহড়া দিয়ে নেয়।

শ্রীমতী জেন হ্যারিসন[৯৯] দেখিয়ে চলেছেন, মেক্সিকোর তারাহুমারে আদের

মানুষদের মধ্যে 'নাচা' আর 'কাজ-করা'—দুটি বিষয় বোঝাবার জন্যে দুটি স্বতন্ত্র শব্দ নেই। একই শব্দের ওই রকম দুটো মানে। দলের নাচে যোগ না দিয়ে যদি কোনো ছোকরা বসে থাকে তাহলে বুড়োরা তাকে ধমক দিয়ে বলবে, কুঁড়ের মতো বসে না থেকে কাজে লাগছো না কেন? বয়েস বাড়া বোঝাবার জন্যে ওরা বলে, নাচের সংখ্যা বাড়া। দলের নাচে যোগ না দিতে পারলে মানুষ কপাল চাপড়ে বলে, এ-রকম অকর্মণ্য হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী?

নাচ-গানের সঙ্গে কাজের এই যে যোগাযোগ এর মূলে রয়েছে আদিম মানুষদের একটি অদ্ভুত বিশ্বাস। তার নাম যাদুবিশ্বাস—ইংরেজীতে বলে ম্যাজিক। কী রকমের বিশ্বাস? কল্পনায় প্রকৃতিকে জয় করতে পারলে বাস্তব ভাবে প্রকৃতিকে জয় করাও সত্যিই সম্ভবপর হবে। কল্পনায় জয় করা মানে কী? জয়ের একটা নকল তোলা,—কামনা সফল হয়েছে তারই যেন অভিনয় করা। আকাশে বৃষ্টি চাইলে ওরা দলের সবাইকে ডাক দিয়ে শুরু করবে বৃষ্টির নাচ: আকাশে জলের ছিটে ছুঁড়ে বৃষ্টির নকল তুলবে, বাজনা বাজিয়ে নকল করবে মেঘের ডাক, আর ওরা ভাববে এইভাবে কামনা সফল হওয়ার নকল করে সত্যিই বুঝি কামনাকে সফল করা সম্ভব হবে।

ওদের কাছে, আসল কাজের সঙ্গে যাদুবিশ্বাসের তফাতটা তেমন স্পষ্ট নয়। যাদুবিশ্বাস ছাড়া ওদের পক্ষে বাঁচাই কঠিন—কেননা, ওদের হাতিয়ারের অবস্থা এমনই করুণ যে, মন থেকে অন্তত দুর্বলতা-বোধটুকুকে দূর করবার চেষ্টা করা দরকার। দুর্বলতা-বোধকে দূর করবার কৌশল ওই যাদুবিশ্বাস। আর এই যাদুবিশ্বাসই হলো ওদের নাচ-গানের ষোলো আনা।

মাওরিদের[১০১] মধ্যে এক রকমের নাচ আছে। তাকে বলে আলুর নাচ। ফসলের জন্যে পুব-হাওয়ার দরকার। তাই ওদের দলের তরুণী মেয়েরা ক্ষেতে গিয়ে নাচতে শুরু করে। নাচের আগাগোড়াই হলো ঝড় আর বৃষ্টি আর ফুলফোটা আর ফসল-ফলার অনুকরণ। নাচতে নাচতে তারা গান গাইতে শুরু করে, গানের মধ্যে কামনার প্রকাশ: চারাগুলি যেন তাদেরই অনুকরণ করে। অর্থাৎ, ওই মেয়েরা বাস্তবে যা চায় তাই কল্পনায় ফুটিয়ে তোলে নাচের দোলায়, গানের কথায়। দৃষ্টান্তটি সম্বন্ধে অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের মন্তব্যটুকু ভালো করে দেখা দরকার। তিনি বলছেন, আলুর উপর ওই নাচের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, কিন্তু যে-মেয়েরা নাচছে তাদের নিজেদের উপর নাচটির যথেষ্ট প্রভাব পড়তে বাধ্য। নাচতে নাচতে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে এরই দরুন চারাগাছগুলি রক্ষা পাবে। তারপর ওই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তারা যখন গাছগুলির পরিচর্যা করতে লাগলো তখন তাদের আত্মবিশ্বাস আর শক্তিসামর্থ্য ঢের বেড়ে

গিয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত ফসলের উপরও নাচটার প্রভাব পড়ে বই কি। এই নাচেরই দরুন বহির্বাস্তবের প্রতি মেয়েদের মনের ভাবটা বদলায়, ফলে পরোক্ষভাবে এই নাচই বহির্বাস্তবকেও বদল করে[১০২]।

ঠিক একই বিষয় চোখে পড়ে বাংলা দেশের ব্রতগুলির মধ্যে—অবশ্যই, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেগুলিকে বলছেন খাঁটি মেয়েলি ব্রত, এবং যেগুলি কিনা, তাঁর ধারণায়, "পুরাণেরও পূর্বেকার বলে বোধ হয়"[১০৩]। অবনীন্দ্রনাথের একটি বর্ণনা দেখুন :

> এমনি শস্পাতার ব্রত। সেখানে আমরা দেখি মানুষ শস্তের কামনা করছে; কিন্তু সেই কামনা সফল করবার জন্তে সে যে নিশ্চেষ্টভাবে কোনো দেবতার কাছে জোড়হাতে 'দাও দাও' করছে তা নয়; সে যে-ক্রিয়াটা করছে তাতে সত্যিই ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে এবং ফসল ফলার যে আনন্দ সেটা নাচ গান এমনি নানা ক্রিয়ায় প্রকাশ করছে। বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্পাতার ব্রত বা ভাঁজো, ভাদ্রমাসের মন্থনষষ্ঠী থেকে আরম্ভ হয়ে পরবর্তী শুক্লাদ্বাদশীতে শেষ হয়। মন্থনষষ্ঠীর পূর্বদিন পঞ্চমী তিথিতে পাঁচ রকমের শস্ত—মটর, মুগ, অড়হর, কলাই, ছোলা—একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়; পরদিন ষষ্ঠীপুজায় এইগুলি নৈবেদ্য দিয়ে বাকি শস্ত সরষে এবং ইঁদুরমাটির সঙ্গে মেখে একটি নতুন সরাতে রাখা হয়; দ্বাদশী পর্যন্ত মেয়েরা স্নান করে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে; চার-পাঁচদিন পরে যখন শস্ত সব অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় এ-বৎসর শস্ত প্রচুর হবে এবং মেয়েরা তখন শস্ত উৎসবের আয়োজন করে। ইন্দ্রদ্বাদশীতে এই উৎসব; চাঁদের আলোতে উঠানের মাঝখানে এই অনুষ্ঠান। নিকোনো বেদীর উপর ইন্দ্রের বজ্রচিহ্ন দেওয়া আলপনা; কোথাও মাটির ইন্দ্রমূর্তিও থাকে। এই বেদীর চারিদিকে, পাড়ার মেয়েরা সকলে আপন-আপন শস্পাতার সরাগুলি সাজিয়ে দেয়, তারপর সাত-আট থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের মেয়েরা হাত ধরাধরি করে বেদীর চারদিক ঘিরে নাচগান শুরু করে। উঠানের এক অংশে পর্দার আড়ালে বাদ্যকর তাল দিতে থাকে :
>
> ভাঁজো লো কলকলানী, মাটির লো সরা,
> ভাঁজোর গলায় দেবো আমরা পদ্মফুলের মালা।...
>
> এরপর দুই দলে ভাগ হয়ে মুখেমুখে ছড়াকাটাকাটি করে।...সমস্ত রাত দুই দলের নাচগান ছড়াকাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারার ঝিকিমিকি।...
> এরপর রাত্রিশেষ, মেয়েরা আপন-আপন শস্পাতার সরা মাথায় নিয়ে পুকুরে কিংবা নদীতে বিসর্জন দিয়ে ঘরে আসে। এখানে শস্তের উদ্গমের কামনা সরাতে শস্তবপন ক্রিয়া থেকে আরম্ভ হলো এবং অনুষ্ঠান শেষ হলো উৎসবের নৃত্যগীতে...[১০৪]

ব্রত-প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস পুনর্গঠন করবার মালমশলা হিসেবে বাংলার এই ব্রতগুলি সত্যিই অমূল্য। এমনকি, এই একান্ত লোকায়তিক অনুষ্ঠানগুলির সাহায্যেই বৈদিক সাহিত্যের নানান দুর্বোধ্য তথ্য বোঝবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ-বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশেষ করে মনে রাখা দরকার :

> খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের সূক্তগুলিতেও সমগ্র আর্যজাতির একটা চিন্তা, তার উদ্যম উৎসাহ ফুটে উঠেছে দেখি। এ-দু'-এরই মধ্যে লোকের আশা আশঙ্কা চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং দু'-এর মধ্যে এইজন্যে বেশ একটা মিল দেখা যাচ্ছে। নদী সূর্য এমনি অনেক বৈদিক দেবতা, মেয়েলি ব্রতেও দেখি এঁদেরই উদ্দেশ্যে ছড়া বলা হচ্ছে[১০৫]।

অবনীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন, বৈদিক সূক্তে উষাকে, নদীসকলকে উদ্দেশ্য করে যে-রকম কবিতা রচনা হয়েছিলো খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে প্রায় তারই পুনরুক্তি পাওয়া যায়[১০৬]। এবং এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার আর্য-অনার্য মতবাদ সাধারণত আমাদের পণ্ডিতমহলে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত :

> আর্য এবং আর্যপূর্ব দু'জনেরই সম্পর্ক যে-পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে, এবং দু'জনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ ধন ধান সৌভাগ্য স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস; দু'জনে ব্রত করছে যা কামনা করে সেটা দেখলে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে, কেবল পুরুষের চাওয়া আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের, এই যা প্রভেদ। ঋষিরা চাচ্ছেন—ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক, ইত্যাদি; আর বাঙালির মেয়েরা চাইছে—'রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব'। এর সঙ্গে পৃথিবী-ব্রতের শাস্ত্রীয় প্রণাম-মন্ত্রটি দেখি—
>
> বসুমাতা দেবী গো! করি নমস্কার।
> পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।
>
> এই যে পৃথিবীর যা-কিছু তার উপরে ঘোর বিতৃষ্ণা এবং 'গোক'লে গোকুলে বাস, গরুর মুখে দিয়ে ঘাস আমায় যেন হয় স্বর্গে বাস'—এই অস্বাভাবিক প্রার্থনা ও স্বপ্ন, এটা বেদেরও নয়, ব্রতেরও নয়। বৈদিক সূক্তগুলি আর ব্রতের ছড়াগুলিকে আমাদের রূপকথায় বিহঙ্গম বিহঙ্গমা দুটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দু'জনেই পৃথিবীর, কিন্তু বেদসূক্তগুলি ছাড়া ও স্বাধীন, উদার পৃথিবীর গান;

আর ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন সবুজের আড়ালে পক্ষীমাতার কাকলি—কিন্তু দুই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা[১০৭]।

অবনীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, ব্রতের সঙ্গে বেদের সাদৃশ্য সত্ত্বেও একটি মৌলিক অমিল রয়েছে: বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের। বামাচার-প্রসঙ্গেও আমরা এই রকমই একটি প্রভেদ লক্ষ্য করেছি: বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের স্মারকগুলি পুরুষপ্রধান, লোকায়তিক বামাচার স্ত্রীপ্রধান। এই প্রভেদের কারণ ঠিক কী—সে প্রশ্নের আলোচনায় পরে ফিরতে হবে। আপাতত, সাদৃশ্যের দিকটিতেই মনোযোগ দেওয়া যাক। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, দুই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা, দু'-এর মূলেই কামনা হলো এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ ধন ধান সৌভাগ্য স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস। দার্শনিক পরিভাষায়, দুই-ই প্রাক-অধ্যাত্মবাদ, প্রাক-ভাববাদ। আমাদের যুক্তি অনুসারে তার কারণ অস্পষ্ট নয়: দু'-এর উৎসেই রয়েছে প্রাগ-বিভক্ত সমাজ-জীবন। যে-চেতনায় প্রাগ-বিভক্ত সমাজ-জীবন প্রতিফলিত তার মধ্যে অধ্যাত্মবাদের বিকাশ হবার অবকাশ নেই।

ব্রতের মধ্যে সমাজ-জীবনের কোন পর্যায়ের প্রতিচ্ছবি, সে-প্রশ্ন অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ তোলেন নি। কিন্তু তবুও তাঁরই নানা মন্তব্য আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় ব্রতের সঙ্গে প্রাগ-বিভক্ত সমাজের যোগাযোগ অন্বেষণ করবার দিকে। প্রথমত, তিনি বলছেন, এই আদি অকৃত্রিম ব্রতগুলি অতি প্রাচীন—আর্যরা এ-দেশে আসবার আগে থাকতেই এ-দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিলো[১০৮]। ব্রতগুলি যদি সত্যিই অতো পুরোনোকালের হয় তাহলে তার মধ্যে সমাজ-বিকাশের অতি প্রাচীন পর্যায়ের প্রতিচ্ছবিই খুঁজে পাওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, বাংলা দেশের এই ব্রতগুলিকে বোঝবার কৌশল হিসেবে তিনি যে-পদ্ধতির কথা বলছেন তারও ইঙ্গিতটা একই রকম: পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আজো যে-সব মানুষ সমাজ-বিকাশের অনেক আদিম পর্যায়ে পড়ে রয়েছে তাদের আচরণ থেকে এগুলিকে বোঝবার সূত্র পাওয়া যাবে। বস্তুত, বাংলা দেশের লক্ষ্মীব্রতটি বোঝবার জন্যে অবনীন্দ্রনাথ প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারের মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি দেশের অনার্যদের[১০৯] আচরণ থেকেই আলো সংগ্রহ করছেন। বাংলার ব্রতের সঙ্গে এ-জাতীয় আদিবাসীদের ক্রিয়াকর্মের যদি মিল থাকে তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান করবার সুযোগ থাকে যে, দু'-এর মূলেই অনুরূপ সমাজ-বাস্তব। তৃতীয়ত, ব্রতের সঙ্গে প্রাগ-বিভক্ত সমাজের সম্পর্কের ইঙ্গিত অবনীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত মন্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠতে দেখা যায়:

একজন মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থতার ক্রিয়া, ব্রত-অনুষ্ঠান বলে ধরা যায় না। যদিও ব্রতের মূলে কামনা এবং চরিতার্থতার জন্ম ক্রিয়া, কিন্তু ব্রত তখন যখন দশে মিলে এককাজ এক-উদ্দেশ্যে করছে। ব্রতের মোটামুটি আদর্শ এই হলো—একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে। একের সঙ্গে অন্য দশজনে কেন যে মিলছে, কেন যে একের অনুকরণ দশে করছে, সেটা দেখবার বিষয় হলেও আমরা সে-সব জটিল প্রশ্নে এখন যাবো না। একজনকে দিয়ে নাচ চলে কিন্তু নাটক চলে না, তেমনি একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতার উপাসনা চলে, কিন্তু ব্রত অনুষ্ঠান চলে না। ব্রত ও উপাসনা দুই-ই ক্রিয়া—কামনার চরিতার্থতার জন্য; কিন্তু একটি একের মধ্যে বদ্ধ এবং উপাসনাই তার চরম, আর একটি দশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—কামনার সফলতাই তার শেষ—এই তফাত[১১০]।

একের সঙ্গে অন্য দশজনে কেন মিলছে—অবনীন্দ্রনাথ সেই জটিল প্রশ্নে গেলেন না; কিন্তু এ-সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ব্রতের সমস্যা জটিল হয়েই থাকবে। তিনিই যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন সেই পথে অগ্রসর হলে আমরা হয়তো এই প্রশ্নেরও উত্তর পেয়ে যাবো। তাই আমরা এখানে আর একটি প্রশ্ন তুলতে চাই: পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আজো যে-সব আদিম মানুষের দল বেঁচে রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে এমন কোনো কথা জানা আছে কিনা যার সাহায্যে ওই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, বোঝা যাবে একের সঙ্গে অন্য দশজনে কেন মিলছে।

এ-বিষয়ে শ্রীমতী জেন হ্যারিসনের[১১১] গবেষণা থেকে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়:

> One element in the rite we have already observed, and that is that it be done collectively, by a number of persons feeling the same emotion. A meal digested alone is certainly no rite; a meal eaten in common under the influence of a common emotion, may, and often does, tend to become a rite.
>
> Collectivity and emotional tension, two elements that tend to turn the simple reaction into a rite, are—specially among primitive peoples—closely associated, indeed scarcely separable. The individual among savages has but a thin and meagre personality... He may make by himself excited movements, he may leap for joy, for fear; but unless these movements are made by the tribes together they will not become rhythmical; they will probably lack intensity and certainly permanence.

> আদিম অনুষ্ঠানের (rite) একটি অঙ্গ আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি ; সেটি হলো তার সম্পাদন যৌথভাবে করা দরকার,—একাধিক মানুষ একই আবেগ অনুভব করবে। একাএকা খেতে বসলে তা কখনো অনুষ্ঠান হবে না ; একই আবেগের বশে একসঙ্গে খেতে বসলে তা অনুষ্ঠান হতে পারে এবং প্রায়ই দেখা যায় তা অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে।
> বিশেষত, আদিম মানুষদের মধ্যে দেখা যায় যে-দুটি উপাদান সাধারণ ক্রিয়াকে যজ্ঞে পরিণত করতে চায়,—অর্থাৎ, যৌথভাব আর আবেগের চাপ—ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত ও এমনকি অবিচ্ছেদ্য। আদিম মানুষদের মধ্যে ব্যষ্টির ব্যক্তিত্ব নেহাতই ক্ষীণ…। সে হয়তো একাএকা উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গি করতে পারে, লাফিয়ে উঠতে পারে আনন্দে, ভয়ে ; কিন্তু পুরো গোষ্ঠী যতোক্ষণ না এই ক্রিয়ায় মেতে ওঠে ততোক্ষণ তা ছন্দোময় হবে না ; তার মধ্যে সম্ভবত তীব্রতা থাকবে না, স্থায়িত্ব তো নয়ই।

তাহলে ব্রতের ওই বৈশিষ্ট্যটিকে—একের সঙ্গে অন্য দশজনে কেন মিলছে তা—বুঝতে পারবার মূলসূত্র পাওয়া যাবে আদিম মানুষদের আচরণ থেকেই। আদিম সমাজে একের কোনো সত্তা নেই, একার পরিচয়টা নেহাতই ক্ষীণ। তারা দশে মিলে একসঙ্গে এক হয়ে যখন কিছু করে তখনই কাজটি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং এই দিক থেকেই বুঝতে পারা যায় আদিম সমাজ-জীবনে যাদুবিশ্বাসের উপযোগিতাটুকুও। মনে রাখতে হবে দশজন মিলে একই সঙ্গে একই কথা ভাবছে, একই কাজ করছে। তাদের চোখের সামনে দুলছে কামনা সফল হবার ছবি। একার সামনে নয়। একের সামনে নয়। দশজনে এক হয়েছে। একই কথা ভাবছে। একই ছবি দেখছে। দেখতে দেখতে মেতে উঠছে পুরো দলটা। দলের মাতন—সে তো আর যেমন-তেমন নয়। কামনা সফল হবার ছবিটা অবশ্যই কাল্পনিক, কিন্তু পুরো দলটির পক্ষে ওই ভাবে মেতে ওঠাটা নিশ্চয়ই কাল্পনিক নয়। আর তারই সাহায্যে কামনাকে বাস্তবভাবে সফল করবার চেষ্টাও অনেকখানি সফল হতে পারে বই কি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতের যে-সব দিকগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার জন্যে আমরা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু যে-দিকগুলির আলোচনা তিনি তোলেন নি সেগুলি সম্বন্ধেও আমাদের পক্ষে উদাসীন থাকবার উপায় নেই। এই দিকগুলির মধ্যে প্রধানতই, ওই যাদুবিশ্বাসের এবং জীবনধারণের পক্ষে সে-বিশ্বাসের উপযোগিতার দিকটি। ব্রতের প্রাণ-বস্তু হলো যাদুবিশ্বাস—মানুষ যা কামনা করে ব্রত করছে ব্রতের মধ্যে সেই কাজটিই সফল হবার একটা নকল করা হচ্ছে, এবং নকল যে করা হচ্ছে তা প্রধানত এই বিশ্বাস থেকেই যে, মানুষ যা করবে প্রকৃতিতে বাস্তবিকই তাই ঘটবে। "তাঁজো লো

কলকলানী, মাটির লো সরা"—মেয়েরা এই গান করছে মনের আনন্দকে প্রকাশ করবার তাগিদে নয়, তাদের মনে মনে বিশ্বাস যে, ওই ভাবেই ভাঁজো সত্যিই কলকলিয়ে উঠবে, ফলবে প্রচুর শস্য। কিংবা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই যেমন বলছেন, "মেস্লিকোতে কোজাগর লক্ষ্মীপুজোয় মেয়েরা এলোকেশী হয়,—শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছাগোছা লম্বা হয়ে ওঠে, এই কামনায়"[১১২]। কিন্তু শুধু কামনাই নয়, কামনা সফল হওয়ায় বিশ্বাসও। সেই বিশ্বাসই হলো যাদুবিশ্বাস।

প্রাচীন-সমাজে তাই নাচগান অবসর-বিনোদন নয়, সৌন্দর্য উপভোগ নয়। এগুলির উৎসে রয়েছে যাদুবিশ্বাস। এবং এই যাদুবিশ্বাসকে উদ্দেশ্যহীন অন্ধ সংস্কার মনে করাও ভুল হবে। কেননা, যতোদিন পর্যন্ত মানুষের উৎপাদন-কৌশল অনুন্নত ততোদিন কাজের জন্যেই যাদুবিশ্বাসের অতো প্রয়োজন। এই কারণেই আদিম যুগে গান আর অন্ন-আহরণ সত্যিই আলাদা হয় নি।

সমাজ-বিকাশের সেই রকমই এক প্রাচীন পর্যায়ের ছবি টিকে রয়েছে ছান্দোগ্য-উপনিষদের আলোচ্য অংশটিতে। ছবিটা যে প্রাচীন সমাজেরই তার প্রমাণ হলো মানুষগুলির ওই রকম অদ্ভুত বর্ণনা : কুকুর।

যে-মানবদলকে অমন সরাসরি কুকুর বলে বর্ণনা করা হচ্ছে তাদের কাছে গান অবসর-বিনোদন নয় ; ক্ষুন্নিবৃত্তির—অতএব, অন্নপ্রাপ্তির—উপায়ই।

অন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়ম

আর কোনো দেশের আর কোনো প্রাচীন পুঁথির মধ্যে সংগীতের আদি-তাৎপর্য-সংক্রান্ত এমন স্পষ্ট ও অভ্রান্ত দলিল পাওয়া যায় কিনা খুবই সন্দেহের কথা[১১৩]। কিন্তু ছান্দোগ্য-উপনিষদের আলোচ্য অংশের তাৎপর্য শুধু এইটুকুই নয়। তাছাড়াও আরো কয়েকটি তাৎপর্য রয়েছে, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা দরকার।

কামনা ও যাদুবিশ্বাস

যাদুবিশ্বাস থেকেই সংগীতের জন্ম। যাদুবিশ্বাসের মূল কথা হলো, কোনো এক কামনা। এই কামনাকে কল্পনায় সফল করে প্রাচীন মানুষ মনে করেছে যে বাস্তবিকই তা বুঝি সফল হতে চললো।

উপনিষদের ঋষিদের স্মৃতি থেকেও এই আদিম সত্যের উপলব্ধি সত্যিই মুছে যায়নি। ছান্দোগ্য-উপনিষদে বলা হচ্ছে :

> …তস্মাদু হৈবংবিদুদ্গাতা ব্রূয়াৎ ॥১।৭।৮॥
> কং তে কামমাগায়ানীত্যেষ হ্যেব কামগানস্যেষ্টে য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি ॥১।৭।৯॥
>
> অর্থাৎ,…সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন উদ্গাতা বলিবেন : 'তোমার কোন্ কাম্যবস্তুকে গান করিব' ? কেননা, যিনি এই প্রকার জানিয়া সামগান করেন তিনি কামগানকে শাসন করেন। হিউম্-এর তর্জমা অনুসারে : For truly he is the lord of the winning of desires by singing…[১১]

মূলে রয়েছে, 'কামগানস্য'। শব্দটার মানে কী ? মূলে রয়েছে, 'কামম্ আগায়ানি'। কথাগুলির মানে কী ? যদি গান সম্বন্ধে আধুনিক যুগের ধ্যানধারণাকেই একমাত্র সম্বল করে উপনিষদের এই ধরনের উক্তিগুলি বোঝবার চেষ্টা করা হয় তাহলে সে-চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা নেই। অপরপক্ষে, আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে-সব মানুষের দল সমাজ-বিকাশের প্রাচীন পর্যায়ে আটকে পড়ে রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে জানতে-পারা তথ্যকে অবলম্বন করে যদি এ-জাতীয় উক্তি বোঝবার চেষ্টা করা যায় তাহলে তার তাৎপর্য উদ্ধার করা এতোটুকুও কঠিন হবে না। কেননা, সমাজ-বিকাশের ওই প্রাচীন পর্যায়ে পড়ে-থাকা মানুষগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় গানের উৎসে যাদুবিশ্বাস। এবং এই যাদুবিশ্বাসের প্রাণ হলো তীব্র কামনার আবেগ।

গানের সঙ্গে যাদুবিশ্বাসের যোগ যে কতো নিবিড় তার স্মৃতি উপনিষদের ঋষিদের মন থেকে মোটেই মুছে যায় নি। ছান্দোগ্য থেকেই অনেক দৃষ্টান্ত আহরণ করা যায় :

> বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত পুরোবাতো হিঙ্কারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ ॥২।৩।১॥
> উদ্গৃহ্ণাতি তন্নিধনং। বর্ষতি হাস্মৈ বর্ষয়তি হ য এতবেদং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥২।৩।২॥
>
> অর্থাৎ, বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে : বৃষ্টির পূর্বে যে বায়ু উত্থিত হয় তাহাই হিঙ্কার, মেঘ উৎপন্ন হয় তাহাই প্রস্তাব, বৃষ্টি পতিত হয় তাহাই উদ্গীথ, বিদ্যুৎ চমকায় ও গর্জন করে তাহাই প্রতিহার, বৃষ্টিপাত শেষ হয় তাহাই নিধন। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া বৃষ্টিতে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করেন তাঁহার জন্য মেঘ বর্ষণ করে এবং তিনি বর্ষণ করাইতে পারেন।

‘উপাসীত’ কথাটার আদি অর্থ কী তা নিয়ে নিশ্চয়ই সুদীর্ঘ আলোচনা তোলবার অবকাশ আছে[১১৫]। কিন্তু সে-আলোচনা বাদ দিলেও অন্তত এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে উপনিষদের এখানে প্রাচীন সমাজে ভূয়ঃ-প্রচলিত বৃষ্টিযাদুরই স্বাক্ষর। সামগানের উৎসে যে যাদুবিশ্বাস তার প্রমাণ এর চেয়ে আর কতো স্পষ্ট হবে?

উপনিষদের ঋষিদের ধারণায় অন্ন প্রভৃতি একান্ত পার্থিব বস্তু লাভের সঙ্গে গানের—সামগানের—সম্পর্ক কতো ঘনিষ্ঠ তার আরো কয়েকটি নমুনা ছান্দোগ্য থেকেই উদ্ধৃত করা যাক। এই নমুনাগুলি মনে রাখলে বুঝতে পারা যাবে, কুকুরদের মুখে ‘অন্নং নঃ ভগবান আগায়তু’ কথাটি খাপছাড়া তো নয়ই, ঋষিদের চিন্তাধারার সঙ্গে এর সঙ্গতি খুবই স্পষ্ট :

> …অন্নবানন্নাদো ভবতি য এতান্যেবং বিদ্বানুদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাস্ত…॥১।৩।৭॥
>
> অর্থাৎ, যিনি এই প্রকার জানিয়া উদ্গীথের অক্ষরসমূহকে উপাসনা করেন তিনি <u>অন্নবান ও অন্নভোক্তা</u> হন।

কিংবা,

> তং হৈতমতিধন্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্ত্বোবাচ যাবত্ত এনং প্রজায়ামুদ্গীথং বেদিষ্যন্তে পরোবরীয়ো হৈভ্যস্তাবদস্মিঁল্লোকে জীবনং ভবিষ্যতি ॥১।৯।৩॥
>
> অর্থাৎ, শৌনক অতিধন্বা উদ্গীথবিষয়ে উপদেশ দিয়া উদরশাণ্ডিল্যকে বলিয়াছিলেন, যে-পর্যন্ত তোমার সন্তানদের মধ্যে এই উদ্গীথবিষয় জানা থাকিবে সেই-পর্যন্ত তাহাদিগের জীবন এই পৃথিবীতে এই সমুদয় লোকের অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠবস্তু-সম্পন্ন হইবে।

কিংবা,

> পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত… ॥২।৬।১॥
>
> ভবন্তি হাস্য পশবঃ পশুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥২।৬।২॥
>
> অর্থাৎ, পশুসমূহে পঞ্চবিধ সাম উপাসনা করিবে।…যিনি ইহাকে এই প্রকার জানিয়া পশুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, পশুসমূহ তাঁহার ভোগ্যবস্তু হয় এবং তিনি পশুমান (পশুশালী) হন।

কিংবা,

> দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সামোপাস্তে ॥২।৮।৩॥
>
> অর্থাৎ, যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া বাক্যে সপ্তবিধ সামের উপাসনা করেন,

তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন। বাক্যের যাহা দুগ্ধ বাক্য স্বয়ং তাহা তাঁহার জন্য দোহন করে। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

উপনিষদের ঋষিরা আর যাই হোন, *Art for Art's sake*-এর থিয়োরি শেখেন নি। তাঁদের স্মৃতিতে সংগীতের আদি-উদ্দেশ্যের কথা রীতিমতো স্পষ্টভাবেই টেকে ছিলো। অবশ্যই, অনেক সময় ওই আদি-উদ্দেশ্যের সঙ্গে রকমারি পরবর্তী-সমাজের ধারণাকে মিশেল হতে দেখা যায়। কিন্তু সেইটেই বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হলো, তাঁদের চেতনা থেকে সংগীতের ওই আদি-উদ্দেশ্যের কথা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নি। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, উপনিষদের স্থান-বিশেষে,—যেখানে যেখানে সমাজ-বিকাশের অতি-প্রাচীন পর্যায়ের স্পষ্টতর স্মারক পাওয়া যায়, সেখানে-সেখানে,—সংগীতের ওই আদি-উদ্দেশ্যের স্মৃতিটুকুকেও স্পষ্টতরভাবেই টিকে থাকতে দেখা যায়। যেমন, সামগানরত ওই টোটেম্-গোষ্ঠীটির বেলায়। তারা গান চাইলো,—মনের আনন্দ মেটাবার জন্যে নয়, পেটের জ্বালা মেটাবার কামনায়, অতএব অন্নের কামনাতেই।

গান আর নাচ

সমাজের পুরোনো পর্যায়ে গান কিন্তু শুধু গান নয়। তার সঙ্গে নাচেরও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ : কামনা সফল হবার ছবিটা মানুষ শুধু কথায় নয়, কাজের মধ্যেও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। মাওরি মেয়েদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি : গান ছাড়াও ওরা নাচের মধ্যেই পুব-হাওয়ার আর ফুল ফোটার আর ফসল ফলার অনুকরণ করছে, আর ভাবছে এরই দরুন পাওয়া যাবে ফসল। শস্পাতার ব্রতের বেলাতেও একই কথা : ভাঁজোকে কলকলিয়ে তোলবার কামনায় মেয়েদের গান, কিন্তু শুধু গানই নয়—ইন্দ্রদ্বাদশীতে রাতভোর চাঁদের আলোয় তাদের নাচও। বস্তুত, আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে-সব মানুষের দল সমাজ-বিকাশের পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে পড়ে রয়েছে তাদের মধ্যে নিছক গান বলে কিছুই চোখে পড়ে না। তার বদলে দেখা যায় গানে-নাচে মেশা এক অনুষ্ঠান, যার প্রেরণা যাদুবিশ্বাসে, যার উদ্দেশ্য কাজ। নাচের সঙ্গে গানের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে সমাজ-বিকাশের অনেক পরের পর্যায়ে, আরো পরের পর্যায়ে গানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সুর—তখন থেকেই আজকালকার অর্থে কবিতার জন্ম। এ-বিষয়ে অধ্যাপক জর্জ টমসনের সিদ্ধান্তগুলি[১০]

নিদিধ্যাসিতব্য। মনে রাখা দরকার, ভূয়োদর্শনের ভিত্তিতেই তাঁর ওই সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু ছান্দোগ্যের সামগান-রত কুকুরগুলির বেলায় কী রকম? সমাজ-বিকাশের যে-পর্যায়ের মানুষ বলে ওদের সনাক্ত করতে হলো সে-পর্যায়ে গান নিছক গান হবার কথা নয়। নিছক গান অবশ্য নয়; তার সঙ্গে কামনার যোগ রয়েছে, কাজের যোগ রয়েছে। কিন্তু নাচের যোগ? সে-বিষয়ে উপনিষদের লেখায় কি কোনোরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়?

উপনিষদে লেখা আছে, গান শুরু করবার ঠিক আগেই ওরা বহিষ্পবমানের অনুকরণে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে সর্পিল গতিতে ঘুরেছিলো: তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবম্‌আসসৃপুস্তে। এর মধ্যে ওই সংরব্ধা শব্দটিকে আশ্রয় করেই আধুনিক টীকাকারেরা খোদ মানুষগুলিকে কেমনভাবে একেবারে কুকুর বানিয়ে দেবার উপক্রম করেছিলেন সে-কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এবং অর্থবিপর্যয়ের এই আশঙ্কা দেখেই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, আধুনিক ধ্যানধারণাকে অবলম্বন করে প্রাচীন সাহিত্যের অর্থ নির্ণয় করতে অগ্রসর হবো না।

সে-অভিজ্ঞতার কথা মনে রাখলে কিন্তু 'যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ' শব্দগুলির অর্থবিচার করবার সময়েও আধুনিক কালের ধারণার উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে যাওয়া ভুল হবে। অর্থাৎ, পরবর্তীকালে বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ বলতে কী বুঝিয়েছে তা জানা থাকলেই ছান্দোগ্যের আলোচ্য অংশে শব্দগুলি কী বোঝাচ্ছে সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহে কোনো কথা বলবার জোর থাকবে না। কেননা, এমন তো হতেই পারে যে, আদিকালের অর্থটা অন্যরকম ছিলো এবং আলোচ্য চিত্রটিতে আদিকালের পরিস্থিতিই প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

অবশ্যই, এ-বিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনা তোলবার অবকাশ আমরা এখানে পাবো না। কেননা, তাহলে বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞ, ছন্দ ইত্যাদি কথাগুলির আদি তাৎপর্য অনুসন্ধানে অগ্রসর হতে হয়। 'দ্বিজ' নামের পরিচ্ছেদে সে-চেষ্টা করবার আগ্রহ রইলো। এখানে সামান্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, পরের যুগে বহিষ্পবমান স্তোত্রের মানে যাই দাঁড়াক না কেন, আদিযুগে তা পার্থিব সম্পদের কামনার গান ছাড়া আর কিছুই নয়। "যাহা গান করা যায়, তাহার নাম স্তোত্র"। বহিষ্পবমান স্তোত্র কোন গান? সামগায়ী ঋত্বিকেরা ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্ত গান করেন; ওই সূক্তটি যখন গীত হয় তখন তার নাম বহিষ্পবমান স্তোত্র। এখন ঋগ্বেদের ওই সূক্তটি যদি পড়ে দেখেন তাহলে দেখবেন তার মধ্যে অধ্যাত্মবাদের ছিটে-

কোটাও নেই। এই সূক্তে নয়টি মন্ত্র রয়েছে, এবং নবম মন্ত্রটিতেই সূক্তের চরম কামনা প্রকাশ করে বলা হচ্ছে :

> হে ক্লেদবিশিষ্ট পবমান সোম! তুমি ইন্দ্রের সহিত আমাদিগকে সুন্দর বীর্যযুক্ত ধন দান কর।

সূক্তটির আগাগোড়াই এই রকম একান্ত পার্থিব কামনা।

অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, এ-গান তো আর শুধু গলা ছেড়ে গাইবার গান নয়; সোমযজ্ঞের এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গাইবার গান এবং যজ্ঞ মানেই পরলোকতত্ত্ব, অধ্যাত্মবাদ। কিন্তু, মুশকিল হচ্ছে, প্রাচীনেরাই এ-ধরনের কথা জোর গলায় বলতে বারণ করে গিয়েছেন। কেননা, যদিও উত্তরযুগে যজ্ঞ বলতে স্বর্গাদির কামনামূলক ক্রিয়াকাণ্ডকেই বুঝিয়েছে তবুও যজ্ঞের আদি-অর্থ নিশ্চয়ই তা ছিলো না। একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাক। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে,—এবং এক-আধবার নয়, বারবার বলা হয়েছে,—

> যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে, আমি তোমাদের অন্ন হইব না, ইহা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবতারা বলিলেন,—না, তুমি আমাদের অন্নই হইবে। দেবতারা তাঁহাকে (যজ্ঞকে) হিংসা করিয়াছিলেন…[১১৭]

কিংবা,—

> একদা যজ্ঞ ভক্ষ্য অন্ন সমেত দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, যজ্ঞ ভক্ষ্য অন্ন সমেত আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এই যজ্ঞের অনুসরণ করিয়া আমরা অন্নেরও অনুসরণ করিব। তাঁহারা বলিলেন, কিরূপে অন্বেষণ করিব? ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা (অন্বেষণ) করিব।…

ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই দেখা যায় কী ভাবে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র পলায়মান যজ্ঞের অনুসরণ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মাই (ব্রাহ্মণ-ই?) যজ্ঞকে ধরে ফেলেন।[১১৮]

এই উপাখ্যান এবং ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের এইজাতীয় উক্তিগুলির তাৎপর্য অবশ্যই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার। কেননা, এই ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের যুগ থেকেই আদিম প্রাগ-বিভক্ত সমাজ বদলে শ্রেণীসমাজ ফুটে ওঠবার লক্ষণ স্পষ্ট হতে দেখা যায়—এ-যুগে অনাহারের তাড়নায় মানুষ নিজের ছেলে বেচতে শুরু করেছে[১১৯]। আমরা এ-আলোচনায় পরে ফিরবো। আপাতত দেখা যাক উদ্ধৃত অংশগুলিতে কী কী কথা বলা হয়েছে :

এক : প্রাচীনেরাই লিখছেন, ব্রাহ্মণের পরবর্তী যুগে যজ্ঞ বলতে যা বুঝিয়েছে তা যজ্ঞের আদি-অর্থ নয়। পরবর্তী যুগের যজ্ঞ হলো আদি-যজ্ঞের নবাবিষ্কৃত সংস্করণ এবং এ-আবিষ্কার ব্রাহ্মণ-বর্ণের কীর্তি।

দুই : প্রাচীনেরাই লিখছেন, যজ্ঞের আদি-তাৎপর্য ছিলো দেবগণের পক্ষে অন্নের যোগান দেওয়া। তাই যজ্ঞের সঙ্গে পরলোকাদির যে-সংস্রব তা নিশ্চয়ই পরবর্তী যুগের অবদান। আদি-যুগে যজ্ঞের তাৎপর্যটুকু নেহাতই পার্থিব। কেননা, ব্রাহ্মণগ্রন্থটিতে স্পষ্টই বলা হচ্ছে, দেবতাদের কাছে যজ্ঞই ছিলো ভক্ষ্য অন্ন লাভের উপায়। 'ভক্ষ্য অন্নে'র অর্থ নিশ্চয়ই অস্পষ্ট নয়; প্রশ্ন হলো : যজ্ঞের আদি-অর্থ কী? যার সাহায্যে ভক্ষ্য অন্ন পাওয়া যায়, যা চলে গেলে ভক্ষ্য অন্নও চলে যায়, যাকে ফিরে পাবার চেষ্টার মধ্যেই ভক্ষ্য অন্নকেও ফিরে পাবার আশা, তারই নাম যদি যজ্ঞ হয় তাহলে এই যজ্ঞকে অন্ন-উৎপাদনের বা অন্ন-আহরণের কৌশল ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? তাই, পরের যুগে যজ্ঞ শব্দের অর্থ যাই দাঁড়াক না কেন অন্তত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হয়, কোনো এককালে যজ্ঞ বলতে উৎপাদন-পদ্ধতিই বোঝাতো। যজ্ঞ শব্দের এই আদি-তাৎপর্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন এস্. এ. দাঙ্গে : ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণীবিভাগ ও রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত আর্যদের আদিম অবস্থায় যে যৌথ উৎপাদন-পদ্ধতি তারই নাম ছিলো যজ্ঞ[১২০]।

এই সিদ্ধান্তের পক্ষে অন্যান্য প্রমাণের আলোচনায় পরে ফেরা যাবে। আপাতত আমাদের যুক্তির পক্ষে যেটুকু কথা প্রাসঙ্গিক শুধু সেইটুকুর প্রতিই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক। আমরা বলতে চাই, বহিষ্পবমান স্তোত্র সংযোগে আসর্পণ-ক্রিয়া যজ্ঞ-বিশেষের অঙ্গ,—শুধুমাত্র এই বিষয়ের নজির দেখালেই প্রমাণ হবে না ছান্দোগ্য-উপনিষদের আলোচ্য দৃশ্যে সামগাননিরত কুকুরগুলি অন্ন-উৎপাদন বা অন্ন-আহরণ ক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে লিপ্ত ছিলো। বরং, আদিম পর্যায়ের এই দৃশ্যটিতে যজ্ঞ-ক্রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের উল্লেখ থেকেই আরো অবধারিতভাবেই প্রমাণ হয় যে, এখানে আদিম সমাজের উৎপাদন-প্রক্রিয়ারই—বা আরো নিখুঁতভাবে বললে বলা উচিত, অন্ন-আহরণ-ক্রিয়ারই—বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, যজ্ঞের আদি-অর্থ উৎপাদন-পদ্ধতি ব্যঞ্জক।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উদ্ধৃত অংশ থেকে আরো কিছুকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দেবতারা বললেন, যজ্ঞকে অনুসরণ করেই ভক্ষ্য অন্নেরও অন্বেষণ করতে হবে। কিন্তু কী ভাবে তা করা যায়? ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা। এই বলে তাঁরা ব্রাহ্মণকে ছন্দোদ্বারা দীক্ষিত করেছিলেন।

এখানে, ব্রাহ্মণ শব্দের আদি-অর্থ সন্ধানে এগোবার অবকাশ নেই।

কিন্তু যজ্ঞের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্কমূলক ইঙ্গিতকেও অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। কেননা, আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা বলছেন, সমাজ-বিকাশের আদিম পর্যায়ে,—যৌথজীবনের আবহাওয়ায়,—ছন্দ ছাড়া উৎপাদন-পদ্ধতি সম্ভবই নয়[১২১]।

চলতি বাংলাতেও তারই স্মৃতি নানান ভাবে থেকে গিয়েছে। ছন্নছাড়া বা ছন্দ-ছাড়া কথাটি কোথা থেকে এলো তা ভাষাতত্ত্ববিদেরা ভেবে দেখবেন। তাছাড়াও আমরা বলি: কাজের ছিরি-ছাঁদ। ছিরি হলো শ্রী, সৌন্দর্য। ছাঁদ হলো ছন্দ। তাই, সৌন্দর্য ও ছন্দ কী ভাবে 'কাজ'-এর বিশেষণ হতে পারে তাও ভেবে দেখা দরকার: "ছিরি-ছাঁদ জিনিসটা আকাশ থেকে পড়েনি। এসেছে সমাজের দরকারে। মানুষই তৈরি করেছে এই ছিরি-ছাঁদ। শ্রীর মধ্যে আছে সুন্দর আর মঙ্গল, বাহার আর ব্যবহার। ছন্দের দরুনই এসেছে শ্রী। ছন্দ হলো কাজ। কাজ থেকেই আসছে সৌন্দর্য আর মঙ্গল"[১২২]।

এখানেও, লোকায়ত-ব্যবহারের সাহায্যে বৈদিক ঐতিহ্যকে বোঝবার সম্ভাবনা থেকে গিয়েছে: "বৈদিক সাতটি ছন্দে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ছন্দের নাম থেকেই বাঁচবার আয়োজন আর সেই সঙ্গে সকলে মিলে হাতে হাত লাগিয়ে বাঁচবার ভাবটা আন্দাজ করা শক্ত নয়। বৈদিক ছন্দ আছে সাতটি: গায়ত্রী, বৃহতী, জগতী, উষ্ণিক, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ। এই নামগুলোর পিছনে উৎপাদন-সংক্রান্ত অর্থাৎ মানুষের বাঁচা-সংক্রান্ত কোনো-না-কোনো কাজ না থেকে পারে না!...'বৃহতী' একরকমের শস্য। ক্ষেতের আল হলো 'পঙক্তি'। 'উষ্ণিক' কি উড়কিধান না রবিফসল? 'ত্রিষ্টুপ' কি ধানকাটা? 'জগতী' মানে তো গোরু। 'গায়ত্রী' তো প্রাণ বাঁচাবার উপায়। 'অনুষ্টুপ' এসেছে সকলের পরে"...[১২৩]।

এই প্রসঙ্গেই আরো মনে রাখা দরকার, বৈদিক ছন্দ শুধুই কাজের ঢঙ নয়, নাচের তালও। মর্কাল্ তাঁর "চিন্তা ও ভাষার উৎপত্তি" নামের গ্রন্থে[১২৪] এ-বিষয়ে অজস্র প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। তার আলোচনায় পরে ফিরতে হবে। আপাতত আমাদের যুক্তি হলো, ছান্দোগ্য-উপনিষদের আলোচ্য অংশে "যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবম্ আসসৃপুস্তে"—প্রাচীন-সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্যের আলোয় এই বর্ণনাটুকু অনুসরণ করে কোনো দক্ষ সংস্কৃতজ্ঞ যদি বৈদিক সাহিত্যের আদি-তাৎপর্য সন্ধানে অগ্রসর হন তাহলে তাঁর পক্ষে এর মূলে কোনো নাচের স্মৃতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব না হতেও পারে। কেননা, আধুনিক নৃতত্ত্বের বহুল তথ্য পর্যালোচনা করে অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[১২৫] নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যাকে মানব সংস্কৃতির আদি-পর্যায় সংক্রান্ত এক সাধারণ সত্য বলা যায়।

> The three arts of dancing, music and poetry began as one. Their source was the rhythmical movement of the human bodies engaged in collective labour.
>
> অর্থাৎ, নাচ গান আর কবিতা—এই তিন রকম চারুশিল্পই শুরুতে এক ছিলো। এ গুলির উৎসে ছিলো যৌথশ্রমে নিযুক্ত মানবদেহের ছন্দ-যুক্ত ক্রিয়া।

এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের নানান দুর্বোধ্য সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করেই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনেক অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। দক্ষ ভারততত্ত্ববিদেরা যেদিন সে-কাজে হাত দেবেন সেদিন ভারততত্ত্বের ক্ষেত্রে যুগান্তর আসবে। পদ্ধতিটির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার আশাতেই আমরা একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এ-পদ্ধতির উপযোগিতা দেখাবার চেষ্টা করেছি: দেখা যাচ্ছে ছান্দোগ্য-উপনিষদের ওই আপাত-অর্থহীন অংশটির অনেকখানিই স্পষ্টভাবে বোঝবার পথ পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে আরো দুটি বিষয়ের আলোচনা তোলা দরকার: এক, কামগানের তাৎপর্য। দুই, বৈদিক দেবতাদের আদি-রূপ।

কামগান মানে কী?

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, ছান্দোগ্যের ঋষি বলছেন…'সেইজন্য এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন উদ্গাতা বলবেন, তোমার কোন কাম্যবস্তু লাভের জন্য গান করবো? যিনি এই প্রকার জেনে সামগান করেন তিনি গানের দ্বারা কাম্যবস্তু লাভ করতে সমর্থ হন।'

প্রাচীন পুঁথিতে লেখা রয়েছে, কামম্‌ আগায়ানি।

প্রাচীন পুঁথিতে লেখা রয়েছে, কামগানস্য।

প্রাচীন সমাজের কোন লক্ষণ থেকে এই কথাগুলির তাৎপর্য উদ্ধার করা সম্ভব? এই জাতীয় উক্তি সমাজ-বিকাশের প্রাচীন পর্যায়ের কোন ধরনের স্মৃতি বহন করছে?

আজো পৃথিবীর নানা জায়গায় যে-সব মানুষের দল সমাজ-বিকাশের প্রাচীন পর্যায়ে পড়ে রয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে এ-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে। এবং তাদের দৃষ্টান্ত আলোচনা করে আধুনিক গবেষক বলছেন, প্রাচীন সমাজে নাচগানের মূলে ছিলো যাদুবিশ্বাস: মানুষ যে-কামনাকে

সফল করতে চেয়েছে নাচের মধ্যে গানের ভাষায় তারই সফলতার ছবি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছে। মাওরি মেয়েদের আলু-নাচের সময় তাই পুব-হাওয়ার আর ফুলফোটার আর ফসলফলার অনুকরণ; ফসল যাতে এলোচুলের মতো গোছাগোছা হয় সেই আশায় মেক্সিকোর মেয়েরা কোজাগর পূর্ণিমায় তাই এলোকেশী হয়। এই যাদুবিশ্বাসটির বর্ণনা হিসেবে অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[১৬] বলছেন :

> The desired reality is described as though already present.
> অর্থাৎ, এক কথায়, কামনা সফল হবার ছবিটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা।

প্রাচীন মানুষদের এই যাদুবিশ্বাসকেই মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করে প্রাচীন সাহিত্যের 'কামগান' কথাটিকে বুঝতে হবে : প্রাচীন সমাজে কামনা ছাড়া গান হয় না, কেননা, ওই কামনাকে সফল করে তোলবার কল্পনাই হলো প্রাচীন সংগীতের প্রাণবস্তু।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে কুকুরদের সামগান এই বিষয়টিরই মূর্ত উদাহরণ। তাদের খিদে পেয়েছিলো, তারা তাই অন্নের আশায় গান চেয়েছিলো। তাই, তাদের গানটিও হলো : ওম্ অদাম, ওম্ পিবাম…। আমরা ভোজন করি, আমরা পান করি…।

আজকালকার গানের মতো এ-গান একজনে গাইবে আর দশজনে শুনবে—তা নয়। দশজনে এক হয়ে একসঙ্গে গাইবে। কেননা, বাংলার প্রাচীন ব্রতগুলির মতোই এ-গানেরও মূল কথা হলো একটি কামনা এবং 'একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়ে' ওঠা।

আর্যদের আদিপর্ব

ছান্দোগ্যের ওই কুকুরগুলি সত্যিই বড়ো আশ্চর্য মানুষ! সমাজ-বিকাশের আদি-পর্যায় সম্বন্ধে ওরা আমাদের নানান তথ্য দিলো। শুধু তাই নয়। ওরাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, বৈদিক মানুষদেরও একটা আরো অতীত ইতিহাস আছে। সেই আদি-পর্যায়ের সঙ্গে উত্তর-পর্যায়ের আকাশ-পাতাল তফাত। কেননা, অন্নলাভার্থে তারা যে-গান জুড়ে দিলো তারই মধ্যে অতীতকালের স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করবার আয়োজন রয়েছে আর সে-আয়োজনের সাহায্যেই তারা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে অতীতকালটা কতোই [illegible]।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক কান পেতে শুনুন :

দেবঃ বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা অন্নম্ ইহ আহরৎ

দেবতা বরুণ, প্রজাপতি, সবিতা এইখানে অন্ন আহরণ করেছিলেন (বা, বৈদিক প্রয়োগ অনুসারে, আহরৎ=আহরতু, আহরণ করুন)।

উত্তরযুগে সংহিতায় প্রসিদ্ধ এই দেবতাগুলির মাহাত্ম্য যেভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে তার সঙ্গে এই দৃশ্যের কোনো মিল নেই। কেননা, বেদের দেবতাগুলিকে এখানে দেখছি অন্ন-আহরণে নিযুক্ত; অথচ উত্তরকালে এঁদের সম্বন্ধে যে-ধারণা প্রচারিত হয়েছে তার সঙ্গে আর যাই হোক অন্ন-আহরণ প্রচেষ্টার কোনো সংশ্রব নেই! কিন্তু কুকুরদের গান থেকেই প্রমাণ হয় যে, এককালে তা ছিলো। মানবশ্রম দিয়ে সৃষ্ট অন্নের অংশ গ্রহণ করবার বদলে দেবতারাই অন্ন-আহরণ কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। তার মানে, উত্তরকালে শুধুই যজ্ঞ ছন্দ আর সামগানের অর্থই বদলায়নি, বদলে গিয়েছে শ্রমের প্রতি মনোভাব আর তারই অঙ্গ হিসেবে দেবতা নামের তাৎপর্যও। ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনার অবকাশ পাবো, এবং তখনই আমরা দেখবো উক্ত পরিবর্তন অকারণ নয়। কেননা, এর মূলে রয়েছে মানবসমাজে শ্রেণী-বিভাগের বিকাশ।

কিন্তু শ্রেণীবিভাগের আগে, কোনো এক আদিম যুগে, বৈদিক মানুষেরাই যে প্রাগ্-বিভক্ত সমাজে জীবন-যাপন করতো তার স্মৃতি বৈদিক সাহিত্য থেকেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। বস্তুত, এই কথাটি মনে না রাখলে বৈদিক সাহিত্যের অনেক তথ্যই অর্থহীন হয়ে থাকবে। উদাহরণ হিসেবে আমরা ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটি অংশের উল্লেখ করলাম। আধুনিক কালের ধ্যানধারণাকে যদি একমাত্র সম্বল মনে করা যায় তাহলে এই অংশটির কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়াই সম্ভব নয়, কিংবা, বড়ো জোর এর উপর একটি কাল্পনিক অর্থ আরোপ করে পাণ্ডিত্যের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা করা যায়। অথচ, সমাজ-বিকাশের আদিম পর্যায়ের কথা মনে রেখে এবং সে-পর্যায়ের মানুষদের জীবন-ধারণ প্রণালী ও ধ্যানধারণা সম্বন্ধে সাধারণভাবে যা জানা গিয়েছে তার উপর নির্ভর করে এই অংশটির অর্থ অনুসন্ধান করলে এর পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। তাই, আমরা এই পরিচ্ছেদে সামগাননিরত কুকুরগুলির কথা দীর্ঘভাবে আলোচনা করলাম এবং দেখাবার চেষ্টা করলাম এমন এক পদ্ধতি সত্যিই পাওয়া যাচ্ছে যার সাহায্যে প্রাচীন পুঁথিপত্রের অনেক আপাত-অর্থহীন অংশেরও অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। এবং এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে অগ্রসর হয়েই আমরা মানতে বাধ্য হলাম,

উত্তরকালে বেদপন্থী ও বেদনিন্দুকদের মধ্যে মতাদর্শগত প্রভেদ যতো প্রকটই হোক না কেন বৈদিক সাহিত্যের অনেক স্মারকের সাহায্যে লোকায়তিক ধ্যানধারণা বুঝতে পারা অসম্ভব নয়। কেননা, বৈদিকই হোক আর লোকায়তিকই হোক, কোনো ধ্যানধারণাই মানবনিরপেক্ষ নয়—মানুষের জীবনযাপন প্রণালীর উপরই ধ্যানধারণাগুলি নির্ভর করে। এবং বৈদিকই হোক, আর অবৈদিকই হোক, মানবজাতির সমস্ত শাখাই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হবার পথে একের পর এক কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্যায় পেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এই পর্যায়গুলির মধ্যে কোনো এক পিছিয়ে-পড়া পর্যায়েই হলো লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস—বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকেরা উত্তরযুগে সে-পর্যায়ের ধ্যানধারণাকে যতোই ঘৃণা করতে শিখুন না কেন তাঁদেরই পূর্বপুরুষেরা এককালে সেই পর্যায়েই জীবনধারণ করতেন আর তাই তাঁদের পরবর্তী কালের রচনাতেও সে-পর্যায়ের ধ্যানধারণার কিছুকিছু স্মারক থেকে গিয়েছে।

ছান্দোগ্য-উপনিষদের আলোচিত অংশটির কথাই ভেবে দেখুন। এর মধ্যে অধ্যাত্মবাদের ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাবেন না। পরম পুরুষার্থ হিসেবে এখানে যেটুকুর উল্লেখ তা ভক্ষ্য অন্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই, এখানের ধ্যানধারণাটা লোকায়তিক। কিংবা, চর্বণ বা খাওয়াদাওয়ায় উৎসাহ থেকেই যদি চার্বাক নাম এসে থাকে[১১] তাহলে যারা 'ওম্ অদাম, ওম্ পিবাম' বলে গান জুড়ে দিলো তাদেরও চার্বাক ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যায়? এবং আরো বিস্ময়কর কথা হলো, এরা শুধু নিজেরাই চার্বাক নয়—সংহিতায় প্রসিদ্ধ দেবতাদেরও নিজেদের দলে টানছে। বরুণ। প্রজাপতি। সবিতা। তার মানে, এককালে ওই দেবতাগুলিও লোকায়তিক ছিলেন নাকি? কিংবা, ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, সমাজ-বিকাশের এমন কোনো পর্যায়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিলো যে-পর্যায়ে অধ্যাত্মবাদের উৎপত্তি হয়নি। এই সূত্রেই মনে রাখা দরকার, বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে প্রাগ্-অধ্যাত্মবাদী বা লোকায়তিক ধ্যানধারণার সম্পর্ক দেখে আজকের দিনে আমরা যতোই বিস্মিত হই না কেন, প্রাচীনদের কাছে ঘটনাটি সত্যিই তেমন বিস্ময়কর নয়। কেননা, দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে বৃহস্পতিই হলেন লোকায়ত-দর্শনের আদিগুরু।

মার্কসবাদ ও নৃতত্ত্ব

এতোক্ষণে আমরা অধ্যাপক জর্জ টম্সনের পদ্ধতির মোটামুটি পরিচয় পেলাম।

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন মার্ক্‌স্‌বাদী। অধ্যাপক-জীবনের প্রথমার্ধে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ হবার গৌরব পেলেও তিনি কেমনভাবে অধ্যাপক-জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রীক সাহিত্য বোঝবার প্রকৃত পথ খুঁজে পেলেন সে-অভিজ্ঞতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

এই পথই হলো মার্ক্‌স্‌বাদের পথ। গ্রীক সাহিত্য বিচারে তিনি যে-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন্ সে-পদ্ধতি হলো প্রাচীন দলিলগুলির উপর মার্ক্‌সীয় মূলসূত্রের প্রয়োগ। অবশ্যই, অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদ হেনরি লুইস্ মর্গানের গবেষণার উপরও নির্ভরশীল। এবং মর্গানকে নিশ্চয়ই কার্ল মার্ক্‌স্‌-এর অনুগামী বলা চলে না, কেননা, সমসাময়িক হলেও মার্ক্‌স্‌-এর রচনাবলীর সঙ্গে মর্গানের পরিচয় ছিলো না[১২৮]। তবুও মর্গান তাঁর নিজের পথে অগ্রসর হয়েও, এবং তাঁর নিজের গবেষণার সংকীর্ণ ক্ষেত্রটিতে স্বতন্ত্রভাবে, যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তার সঙ্গে মার্ক্‌স্‌-এর সিদ্ধান্তের বিরোধ তো নেই-ই, এমনকি আশ্চর্য মিল থেকে গিয়েছে। তাই এঙ্গেল্‌স্[১২৯] বলছেন :

> Morgan rediscovered in America, in his own way, the materialist conception of history that had been discovered by Marx forty years ago, and in his comparison of barbarism and civilization was led by this conception to the same conclusions, in the main points, as Marx had arrived at.
>
> অর্থাৎ, চল্লিশ বছর আগে মার্ক্‌স্ ইতিহাসের যে-বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেন মর্গানও তাঁর নিজের পথে আমেরিকায় তার পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। এবং বর্বরতার সঙ্গে সভ্যতার তুলনা করবার সময় এই ধারণার সাহায্যে তিনি যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেগুলি মূলত মার্ক্‌স্‌-এর সিদ্ধান্তও।

অবশ্যই, মার্ক্‌স্‌বাদেরই একটি মূল কথা হলো, চরম সত্য বা শেষ সত্য বলে কিছুই বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভবপর নয়,[১৩০] কেননা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা দিনের পর দিন নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করে সত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে। ফলে, অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের পক্ষে মর্গানের মূল সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ করাও যে-রকম তাঁর মার্ক্‌স্‌বাদেরই পরিচয় তেমনিই মর্গানের কোনো কোনো সিদ্ধান্তকে পরবর্তী যুগের গবেষণা-লব্ধ তথ্যে সমৃদ্ধ ও সংশোধিত[১৩১] করবার চেষ্টাতেও মার্ক্‌স্‌বাদ-বিরোধের কোনো পরিচয় নেই।

তাই, অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের পদ্ধতি বলতে প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলির উপর মার্ক্‌স্‌বাদের প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই বোঝা উচিত নয়। এইভাবে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের উপর মার্ক্‌স্‌বাদের মূল সিদ্ধান্তগুলির প্রয়োগ করে

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন মার্ক্‌সীয় বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধতর করেছেন। কেননা, মূর্ত প্রয়োগের সাহায্যেই মার্ক্‌সীয় মূল সিদ্ধান্তগুলির সমৃদ্ধি সম্ভবপর। মার্ক্‌সবাদ অনুসারে প্রয়োগ-নিরপেক্ষ জ্ঞান অর্থহীন ও অবান্তর।

অধ্যাপক টম্‌সনের গবেষণা থেকে প্রেরণা পেয়ে আমরাও যে ভারতীয় দর্শনের একটি সমস্যার আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি তার কারণ আমাদের ধারণাতেও মার্ক্‌সবাদের সাহায্য ছাড়া প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলির সাক্ষ্য সম্যক্‌ভাবে বুঝতে পারবার আর কোনো উপায় নেই। কেননা, পুরোনো পুঁথির তাৎপর্য স্পষ্ট হলেও অনেক সময় তা আমাদের চোখে পড়ে না। তার কারণ, আমাদেরই এক রকম অন্ধতা। একমাত্র মার্ক্‌সবাদের সাহায্যেই সে-অন্ধতা দূর করা সম্ভব।

এই কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার।

প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলি প্রায়ই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়। সে-দুর্বোধ্যতার নানা কারণ আছে। তার মধ্যে ভাষাগত কারণ নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ভাষাগত কারণ ছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। কেননা, প্রাচীন-পুঁথিগুলি শুধুই যে প্রাচীন ভাষায় লেখা তাই নয়, এগুলির অন্তর্গত ধ্যানধারণাও প্রাচীন। এবং এইজাতীয় প্রাচীন ধারণার সঙ্গে আমাদের আধুনিক ধারণার অনেক সময় মৌলিক তফাত। ফলে, ভাষাগত সমস্যার সমাধান হবার পরও, ওই প্রাচীনকালের ধারণাকে সামনে পেয়ে আধুনিক বিদ্বানের পক্ষে তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবার সমস্যাটা বাকি থেকে যেতে পারে। এই কারণেই, প্রাচীন পুঁথি বোঝবার ব্যাপারে ভাষাতত্ত্বগত-ব্যুৎপত্তিই পর্যাপ্ত নয়।

এই রকমেরই একটা যুক্তি দেখিয়ে সেকালে অধিকার-ভেদের[৩২] কথা বলা হতো। আর আমাদের বলবার কথাটিও শুরু ঠিক এইখান থেকেই। এবং ওই কথাটি পাড়বার আশাতেই আমরা ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটি আপাত-অর্থহীন অংশের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি। সে-অংশের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল। কিন্তু শব্দার্থ পাবার পরও অংশটি অনেকাংশে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য থেকে যায়।

কেননা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাচীনদের এই রচনাটি বোঝবার কোনো উপায় নেই। বুঝতে হলে প্রাচীনদের দৃষ্টিভঙ্গিটা গ্রহণ করবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণ করেছি, আধুনিক ধ্যানধারণায় লালিত হয়েছি—তার প্রভাব মুক্ত হয়ে প্রাচীনদের দৃষ্টিকোণটা গ্রহণ করবো কেমন করে?

এই সমস্যারও সমাধান আছে। সমাধানটা বোঝবার জন্যে প্রধানত দুটি কথা মনে রাখা দরকার।

এক : মানুষের ধ্যানধারণা আকাশ থেকে জন্মায় না ; সেগুলির উৎসে রয়েছে মানুষের বাস্তব সমাজ-জীবন। তাই প্রাচীনদের দৃষ্টিকোণটা বোঝবার ব্যাপারে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথনির্দেশ পাওয়া যাবে প্রাচীন সমাজ-জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থেকেই।

দুই : কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রাচীনকালের ওই সমাজ-জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে কেমন করে? বহু শতাব্দী আগেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন। তাই, তাঁরা ঠিক কী ভাবে বাঁচতেন তা তো আর আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভবপর নয়। এ-বিষয়ে বড়ো জোর কিছুকিছু পরোক্ষজ্ঞান পাওয়া যায়। বহু শতাব্দীর সঞ্চিত ধুলো সরিয়ে তাঁদের কীর্তির কিছুকিছু চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং এই চিহ্নগুলি থেকে তাঁদের জীবনযাপন সম্বন্ধে কিছু কথা অনুমান করতে পারা অসম্ভব নয়। তাছাড়া, প্রাচীনেরা যে-সব সাহিত্যাদি রচনা করে গিয়েছেন সেগুলি থেকেও তাঁদের সমাজ-জীবনের কিছুটা চিত্র খুঁজে পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভবপর।

কিন্তু প্রত্নতত্ত্বমূলক উপাদানই হোক আর সাহিত্যিক উপাদানই হোক —শেষ পর্যন্ত তা পরোক্ষ। তাই, প্রত্যক্ষভাবে প্রাচীন সমাজকে চেনবার যদি কোনো পথ থাকতো তাহলে এই পরোক্ষ উপাদানগুলিকে তারই আলোয় আরো স্পষ্টভাবে, আরো নির্ভুল ও নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করবার উপায় পাওয়া যেতো।

এবং ঠিক এইখানেই হেনরি লুইস্ মর্গানের গবেষণা সত্যিই যুগান্তকারী। মর্গানের আবিষ্কারের একটা কথা হলো, আমাদের পক্ষে আজো ওই প্রাচীন সমাজকে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব। অনেক শতাব্দী আগেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা ঠিক কী ভাবে জীবন-যাপন করতেন তা আজকের দিনেও আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে জানবার একটা উপায় রয়েছে। আর, মর্গানের এই দাবি যদি সত্যি হয়, তাহলে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই প্রত্নতত্ত্বমূলক বা সাহিত্যমূলক ওই পরোক্ষ দলিলগুলিকে আরো নির্ভরযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করবার অবকাশ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তাই, মর্গানের মূল দাবিটিকে ভালো করে বোঝা দরকার।

সারা পৃথিবীর বুক জুড়ে সমস্ত মানুষের উন্নতিই সমান তালে হয়নি। কোথাও বা মানুষ এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূরে, কোথাও বা মানুষ পড়ে রয়েছে অনেকখানি পিছনে। এবং মর্গান দাবি করলেন, ওই পিছিয়ে-পড়া মানুষদের বাস্তব অবস্থাকে পরীক্ষা করলে এগিয়ে-যাওয়া মানুষদের অতীত ইতিহাসটিকেও দেখতে পাওয়া যাবে। তার কারণ, মানুষের পক্ষে এগিয়ে চলবার পথে একের পর এক যে-সব পর্যায় সেগুলির মধ্যে স্বাভাবিক ও

অনিবার্য পারম্পর্য রয়েছে। মর্গানের ভাষায়, *natural as well as necessary sequence of progress*[১৩৩]। যেন একের পর এক কয়েকটি নির্দিষ্ট ও অনিবার্য ধাপ বেয়ে এগোবার চেষ্টা—যেখানেই মানুষ এগিয়েছে সেখানেই এই ধাপগুলি ভেঙে এগোতে হয়েছে, যেখানে এগোতে পারে নি সেখানে ওই ধাপগুলির কোনো-না-কোনো একটি ধাপে আটকে রয়েছে আর সেই জন্যেই যারা এগোতে পারে নি তাদের দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায় যারা এগিয়ে গিয়েছে তারা ঠিক কোন কোন ধাপ ভেঙে এগিয়েছে।

এই ধাপগুলি ঠিক কী কী? কোন পথে এগিয়ে, ঠিক কোন কোন পর্যায় পার হয়ে, মানুষ শেষ পর্যন্ত সভ্যতার স্তরে উঠে এলো? মর্গানের পরিভাষা অনুসারে সভ্যতার স্তরে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত মানুষের অবস্থাকে মোটের উপর দুটি অংশে ভাগ করা যায়: বন্য-দশা (*savagery*) ও বর্বর-দশা (*barbarism*)। এই দুটি দশারই আবার স্তরবিভাগ রয়েছে: নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ। অর্থাৎ মানুষ শুরু করেছে নিম্ন-বন্য-দশা থেকে, তারপর এগিয়ে এসেছে মধ্য-বন্য-দশায়, তারপর উচ্চ-বন্য-দশায়। তারপর মানুষ বন্য-দশা ছেড়ে বর্বর-দশায় উঠে এসেছে: প্রথমে নিম্ন-বর্বর-দশা, তারপর মধ্য-বর্বর-দশা, তারপর উচ্চ-বর্বর-দশা। আর, তারপর মানুষ বর্বর-দশা ছেড়ে সভ্যতার আওতায় এসে পৌঁছেছে।

এই সব বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচয় কী কী রকম সে-আলোচনায় পরে ফিরতে হবে। আপাতত মর্গানের মূল যুক্তিটির অনুসরণ করা যাক। মর্গান বলছেন, আজকের পৃথিবীতে এমন কোনো মানবদলের পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায় না যারা একেবারে নিম্ন-বন্য-দশায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু মধ্য-বন্য-দশায় নানা দলকে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

> আবিষ্কৃত হবার সময় পলিনেসিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিরা ছিলো মধ্য-বন্য-দশায়।
> আমেরিকার 'হাড্‌সন্‌-বে টেরিটরি' ও 'কলম্বিয়া উপত্যকা'র নানান উপজাতিরা ছিলো উচ্চ-বন্য-দশায়।
> মিসিসিপি নদীর পুব-কিনারায় রেড্‌-ইণ্ডিয়ানরা ছিলো নিম্ন-বর্বর-দশায়।
> নিউ মেক্সিকো, মেক্সিকো, মধ্য-আমেরিকা ও পেরুর নানান উপজাতিদের দেখা গেলো মধ্য-বর্বর-দশায়[১৩৪]।

এরপর উচ্চ-বর্বর-দশার কথা। মর্গান বলছেন, সে-দশার পরিচয় পাওয়া যায় হোমারের যুগের গ্রীকদের মধ্যে, রোম স্থাপিত হবার মুখোমুখি সময়কার লাতিন জাতিগুলির মধ্যে এবং সিজারের সময়কার জার্মানদের মধ্যে। এই উচ্চ-বর্বর-দশার আওতা পেরিয়েই সভ্যতার শুরু। অতএব মর্গান সিদ্ধান্ত করছেন:

Commencing, then, with the Australians and Polynesians, following with the American Indian tribes, and concluding with the Roman and Grecian, who afford the highest exemplifications respectively of the six great stages of human progress, the sum of their united experiences may be supposed fairly to represent that of the human family from the Middle Status of savagery to the end of ancient civilization. Consequently, the Aryan nations will find the type of the condition of their remote ancestors, when in savagery, in that of the Australians and Polynesians; when in the Lower Status of barbarism, in that of the partially village Indians of America; and when in the Middle Status, in that of the Village Indians, with which their own experience in the Upper Status directly connects. So essentially identical are the arts, institutions and mode of life in the same status, upon all the continents, that the archaic form of the principal domestic institutions of the Greeks and Romans must even now be sought in the corresponding institutions of the American aborigines,......

In studying the condition of tribes and nations in these several ethnical periods we are dealing, substantially, with the ancient history and condition of our own remote ancestors.'[১৩৫]

অর্থাৎ, মানুষের অগ্রগতির ছ'টি প্রধান স্তরের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয় ও পলিনেসিয়দের থেকে শুরু করে আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের অনুসরণ করে রোমান ও গ্রীকদের কথায় শেষ করলে; এদের মিলিত অভিজ্ঞতাকে মধ্য-বন্য-দশা থেকে শুরু করে প্রাচীন সভ্যতার শেষ পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বলা যায়। অতএব আর্যজাতিগুলি তাদের সুদূর পূর্বপুরুষদের বন্য-দশার অবস্থাটা দেখতে পাবে অস্ট্রেলিয় ও পলিনেসিয়দের মধ্যে; নিম্ন-বর্বর-দশার অবস্থাটা দেখতে পাবে আমেরিকার আংশিকভাবে গ্রামবাসী রেড্-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে; মধ্য-বর্বর-দশার অবস্থাটা দেখতে পাবে গ্রামবাসী রেড্-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে—এদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর্যজাতিগুলির উচ্চ-বর্বর-দশার অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। সমপর্যায়ের মানুষদের মধ্যে শিল্প, সমাজ-সংগঠন ও জীবন-যাপন পদ্ধতি সমস্ত মহাদেশের বেলাতেই এমন মৌলিকভাবে অভিন্ন যে, গ্রীক ও রোমানদের গার্হস্থ্য-ব্যবস্থার আদিম রূপটিকে এখনো খুঁজতে হবে আমেরিকার আদিবাসীদের অনুরূপ ব্যবস্থার মধ্যে···

নৃতত্ত্বমূলক এই বিভিন্ন পর্যায়গুলিতে যে-সব বিভিন্ন জাতি-উপজাতি রয়েছে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীন ইতিহাস এবং অবস্থার কথাও পর্যালোচনা করবো।

তাই, আদিবাসী-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণের কাজে নিজের প্রায় পুরো জীবনটিকে উৎসর্গ করে হেনরি লুইস্ মর্গান প্রাচীন সাহিত্যের তোরণদ্বার খোলবার চাবিকাঠি আমাদের হাতে দিয়ে গিয়েছেন।

মর্গানের এই মূল সিদ্ধান্তগুলি মনে রেখে প্রাচীন যুগের ইতিহাস-রচনা সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যার আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

পিছিয়ে-পড়া মানুষদের দিকে এইভাবে চেয়ে দেখলে যদি সত্যিই এগিয়ে-যাওয়া মানুষদের অতীত ইতিহাসটাকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারা সম্ভবপর হয় তাহলে প্রাচীন ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রত্নতত্ত্বমূলক ও সাহিত্যমূলক পরোক্ষ উপাদানগুলিকে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলোয় যাচাই করে নিলে নিশ্চয়ই আমাদের সিদ্ধান্ত অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হবে।

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[১৩৩] তাই বলছেন, পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব—বিজ্ঞানের এই দুটি শাখার মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। নৃতত্ত্বের সাহায্যে পুরাতত্ত্বের আবিষ্কারকে কী ভাবে বুঝতে পারা সহজসাধ্য হয় তিনি তার একটি নমুনা দিচ্ছেন। পুরাতত্ত্ববিদেরা মাটি খুঁড়ে প্রাচীন ড্যানিউব-সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি তথ্য আবিষ্কার করলেন: দেখা গেলো সে-সংস্কৃতির মানুষেরা অনেকখানি এলাকা জুড়ে একের পর এক বাসস্থান গড়ে তুলেছিলো, কিন্তু কোনো বাসস্থানেই তারা বেশিদিন ধরে একটানা বাস করে নি। ঘটনাটির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আফ্রিকার নানা জায়গায় আজো যে-সব আদিবাসীরা রয়েছে তাদের কাছ থেকে। তারা আবাদী জমির পাশে বাসস্থান গড়ে এবং যতোদিন পর্যন্ত না জমির উর্বরতা একেবারে উজোড় হয়ে যায় ততোদিন তারা সেইখানেই চাষবাস করে। তারপর তারা সেই বাসস্থান পরিত্যাগ করে চলে যায়; অন্যত্র নতুন বাসস্থান গড়ে তোলে।

অবশ্যই, গর্ডন চাইল্ড[১৩৭] প্রমুখ কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, পুরাতত্ত্বের সঙ্গে এইভাবে নৃতত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রাচীন মানুষদের সমাজ-জীবন ও ধ্যানধারণার কথা অনুমান করবার চেষ্টা সঙ্গত নয়। সমস্যাটা কী, এবং এঁদের আপত্তিটা ঠিক কেন প্রথমে তাই দেখা যাক। ধরুন, পুরাতত্ত্বের গাঁইতি এক জায়গায় দশ হাজার বছর আগেকার কোনো একদল মানুষ সম্বন্ধে এমন চিহ্ন আবিষ্কার করলো যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তাদের জীবন-যাপন নির্ভর করতো শিকারের উপর। এদিকে, নৃতত্ত্ববিদ সংবাদ দিলেন শিকারজীবী মানুষের দল আজো পৃথিবীর এখানে-ওখানে টিকে রয়েছে এবং তাদের সমাজ-সংগঠন ও ধ্যানধারণা সংক্রান্ত তথ্য প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে কি এ-কথা দাবি করা সঙ্গত হবে যে, ওই দশ হাজার বছর আগেকার মানুষদের সমাজ-জীবন ও ধ্যানধারণা আজকের এই মানুষদের অনুরূপই ছিলো? গর্ডন চাইল্ড বলেছিলেন, এ-জাতীয় অনুমান সঙ্গত নয়।

কেননা, আজকের ওই শিকারজীবীরা যদিও উৎপাদন-পদ্ধতির দিক থেকে অতোখানি পেছিয়ে পড়ে রয়েছে তবুও তাই বলে এ-কথা নিশ্চয়ই প্রমাণ হয় না যে, তাদের মানসিক বিকাশও ওই দশ হাজার বছর আগেকার মানুষদের মনোবিকাশের পর্যায়েই একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়েছে।

উত্তরে অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[১৩৮] বলেছেন, তা নিশ্চয়ই হয়ে যায়নি। যে-সব মানুষেরা আজো উৎপাদন-পদ্ধতির দিক থেকে ওই রকমের পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে আটকে রয়েছে তাদের মানসিক পরিবর্তনও নিশ্চয়ই ঘটে চলেছে, কিন্তু এ-পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই ঘটেছে এবং সে-গণ্ডি নির্ভর করছে ওই উৎপাদন-পদ্ধতির উপরই।

> ......the social institutions of these modern tribes have not remained stationary. They have continued to develop, but *only in directions determined by the prevailing mode of production.* This is the key to the problem. If, for example, we examine the Australian forms of totemism, exogamy, and initiation, and compare them with similar institutions elsewhere, we find that they are extraordinarily elaborate, pointing to a long period of development. But these are all institutions characteristic of a simple hunting economy. In other words, *just as the economic development of these tribes is stunted, so their culture is ingrown.* And consequently, while we cannot expect to find such institutions in palæolithic Europe in the same form, we are likely to find them there in some form.

অর্থাৎ, এই সব আধুনিক উপজাতিগুলির সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেমে থাকে নি। সেগুলির বিকাশ ঘটে চলেছে, কিন্তু তা একান্তভাবেই প্রচলিত উৎপাদন-পদ্ধতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত অভিমুখেই। এই হলো সমস্যাটিকে বোঝবার মূল কথা। যেমন ধরুন, আমরা যদি টোটেম্-বিশ্বাস, বহির্বিবাহ ও দীক্ষার অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত রূপগুলিকে বিশ্লেষণ করি এবং তার সঙ্গে অন্যত্র প্রচলিত অনুরূপ অনুষ্ঠানের তুলনা করি তাহলে দেখবো অস্ট্রেলিয়ার অনুষ্ঠানগুলি অসাধারণ রকমের ফাঁপানো-ফোলানো—তার থেকেই দীর্ঘ যুগ ধরে বিকাশের নির্দেশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ কিনা, এই উপজাতিগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি যে-রকম খর্ব সেই রকমই তাদের সংস্কৃতির বিকাশও অন্তর্মুখি। তাই, পুরোনো-পাথর যুগের ইয়োরোপে যদিও আমরা এই অনুষ্ঠানগুলিকে এই রূপেই আশা করতে পারি না তবুও সেগুলিকে কোনো-একরূপে খুঁজে পাবার আশা করতে পারি।

তাই, অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের কাছে প্রাচীন ইতিহাস রচনার কাজে আদিবাসী সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণা,—বিশেষ করে মর্গানের গবেষণা—এতো মূল্যবান হয়েছে। লোকায়ত-দর্শনের আলোচনায় আমাদের প্রধান সমস্যা অবশ্যই পুরাতত্ত্বমূলক আবিষ্কারকে নৃতত্ত্বের আলোয় বোঝবার সমস্যা নয়, তার বদলে প্রাচীন সাহিত্যের কিছুকিছু আপাত-দুর্বোধ্য নিদর্শনের তাৎপর্য নির্ণয় করবার সমস্যা। তবু, এই নিদর্শনগুলিও যেহেতু বহু পুরোনো যুগের স্মারক সেইহেতুই অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের পদ্ধতি আমাদের প্রচেষ্টার পক্ষেও অমূল্য।

অবশ্যই, আজকের দিনে পণ্ডিতমহলে নৃতত্ত্ব নিয়ে উৎসাহের অভাব নেই। কিন্তু বিদগ্ধ মহলের একজন দিকপাল হয়েও অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের পক্ষে এইভাবে প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে নৃতত্ত্বের প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যটি হলো, তাঁর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যার একটি পরিচয় হলো মর্গানের গবেষণাকে গ্রহণ করা। কেননা, সোভিএট ইউনিয়ন ও নয়া-গণতান্ত্রিক দেশগুলির বাইরে মার্ক্‌স্‌-এর আবিষ্কারের মতোই মর্গানের আবিষ্কারও নিষিদ্ধ কথা হয়ে রয়েছে[১০৯]। মর্গানের বিরুদ্ধে এই প্রতিবন্ধের পরিচয় শুধু আজকের দিনেই নয়, তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই তাঁর আবিষ্কারগুলি চেপে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে[১১০]। অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন দেখাচ্ছেন সমস্যাবিশেষের আলোচনায় মর্গানের আবিষ্কার অগ্রাহ্য করার দরুনই রিভারস্‌, মেলিনাউস্কি প্রমুখের রচনায় নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান কী ভাবে প্রায় অজ্ঞানের কোঠায় পৌঁছেছে[১১১]।

মর্গানের বিরুদ্ধে এই প্রতিবন্ধের কারণ ভালো করে বিশ্লেষণ করা দরকার। কোনো একজন বৈজ্ঞানিক আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় পুরো জীবনটা কাটিয়ে যদি তাদের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন তাহলে আধুনিক বিদগ্ধ-সমাজ তাঁর প্রতি বিরূপ হবে কেন?

অবশ্যই, আদিবাসী-সংক্রান্ত তাঁর ওই গবেষণা শুধুমাত্র অসভ্য মানুষ সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান দেয়নি, আমাদের নিজেদের অতীতটাকেও আমাদের চিনতে শিখিয়েছে। এবং আসল হ্যাঙ্গামাটা ঠিক এইখানেই: অতীতের উপর থেকে পর্দা সরালে শুধুমাত্র অতীতটুকুই চোখে পড়ে না—পাওয়া যায় এক ভবিষ্যতের নির্দেশও[১১২]। কী ভাবে তাই দেখা যাক।

মর্গান আবিষ্কার করলেন, আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্ক, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা রাষ্ট্রব্যবস্থা—মানবজাতির পক্ষে এগুলির কোনোটাই অপরিহার্য নয়। কেননা, প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন একটা যুগ গিয়েছে যখন তাদের মধ্যে এ-সব কিছুরই পরিচয় ছিলো না। বস্তুত, আজকের দিনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাব যতো প্রচণ্ডই মনে হোক না কেন, পৃথিবীর বুকে মানবজাতির

পুরো জীবনটার তুলনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যুগটা চোখের পলকের মতো। তার প্রমাণ, মধ্য-বন্য-দশা থেকে শুরু করে মধ্য-বর্বর-দশা পর্যন্ত সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যে-সব মানবদল এখনো টিকে রয়েছে তাদের জীবনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিচয় নেই। আর যদি তাই হয় তাহলে মানতেই হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানবজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হতে পারে না। অতীতে যদি তার প্রভাব ছাড়াও জীবনধারণ সম্ভবপর হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতেও মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাব-মুক্ত হওয়া অসম্ভব কথা নয়। আর, ঠিক এই কথাটিই হলো মর্গানের গবেষণার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তিনি দেখলেন, বর্তমান যুগে ওই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বগ্রাসী প্রভাবে মানুষের জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন প্রাচীন পর্যায় আলোচনা করে তাঁর মনে এ-বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিলো যে মানুষ এগিয়ে চলবে—মানুষ চিরকাল এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলার ক্ষমতাই তাকে পশুর রাজ্য থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে আজকের এতো আশ্চর্য সভ্যতার আওতায়। তাই, ব্যক্তিগত সম্পত্তি আজ তার জীবনে যতো বাধাই সৃষ্টি করুক না কেন, সে-বাধা অলঙ্ঘনীয় নয়। অগ্রগতি অতীতের নিয়ম হয়েছে, অগ্রগতিই ভবিষ্যতের নিয়ম হবে। তাই মর্গান মানুষের সামনে যে-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেন সেখানে ব্যক্তিগত-সম্পত্তির গ্লানি নেই—সবাই সমান, সবাই স্বাধীন, মানুষে-মানুষে সত্যিই ভাই-ভাই ভাব। আর মর্গান চিনতেও পারলেন: এ-যেন সেই প্রাচীন সমাজেরই পুনরাবর্তন—কিন্তু ওই প্রাচীন পর্যায়ে নয়, উন্নত ও সমৃদ্ধ এক নতুন পর্যায়ে। ভবিষ্যতের ওই ছবিটি মর্গানের কাছে দিবাস্বপ্ন নয়, অতীত-অনুসন্ধানের অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত।

কিন্তু আজকের যুগে দিনের চিন্তা আর রাত্রির স্বপ্ন সবকিছুর উপরই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অমোঘ প্রভাব। এই আবহাওয়াতেই লালিত হয়েছেন আধুনিক বিদ্বান-ব্যক্তিরাও। অতি বড়ো বিদ্বানের দৃষ্টিও তাই ভবিষ্যতের ওই ছবিটির দিকে যেতে চায় না। ফলে, অতীত সম্বন্ধেও এক আশ্চর্য অন্ধভাব!

প্রাচীন রচনাবলীর তাৎপর্য-নির্ণয় করা নিয়েই আমাদের সমস্যা। কিন্তু আমরা যতোদিন পর্যন্ত ওই অন্ধভাবের বশবর্তী হয়ে থাকবো ততোদিন পর্যন্ত এ-তাৎপর্য উদ্ধার করবার সম্ভাবনা থাকবে না। কেননা, অস্পষ্ট এক অতীতে রচিত বলেই এগুলির মধ্যে প্রাচীন-সমাজের বহু স্মৃতি থেকে গিয়েছে। সেগুলি বুঝতে হলে প্রাচীন সমাজকেও স্পষ্টভাবে চিনতে হবে। প্রাচীন সমাজকে যদি চিনতে হয় তাহলে পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সনাতন মনে করা চলবে না।

আমরা যে-অর্থে অন্ধভাবের কথা বলছি তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাবে কার্ল মার্ক্‌স্‌-এর একটি চিঠি উদ্ধৃত করলে। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন

...রের নামে জার্মান ঐতিহাসিক ও আইনবিদের গবেষণা-প্রসঙ্গে। এ-গবেষণার আলোয় দেখা গেলো জার্মান দেশে জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দিয়েছে অনেক পরের যুগে, এবং এমনকি আধুনিক যুগেও নানা জায়গায় প্রাচীন যৌথ-সম্পত্তির চিহ্ন টিকে থেকেছে। তাহলে, ব্যক্তিগত-সম্পত্তির বিরুদ্ধে অতি-আধুনিক সমাজতান্ত্রিক আয়োজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির চিহ্নহীন অতি প্রাচীন ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে; অতি প্রাচীনের মধ্যেই আবিষ্কার করা যাচ্ছে অতি-আধুনিককে এবং এই আবিষ্কারের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টার যোগাযোগ রয়েছে। মার্কস্[১১৩] বলছেন :

> Owing to *a certain judicial blindness* even the best intelligences absolutely fail to see the things which lie in front of their noses. Later, when the moment has arrived, we are surprised to find traces everywhere of what we failed to see. The first reaction the against French Revolution and the period of Enlightenment bound up with it was naturally to regard everything mediæval as romantic, and even people like Grimm are not free from this. The second reaction is *to look* beyond the Middle Ages *into the primitive age of each nation, and that corresponds to the socialist tendency,* although these learned men have no idea that the two have any connection. They are therefore surprised *to find what is newest in what is oldest*—even equalitarians, to a degree which would have made Proudhon shudder.

অর্থাৎ, এক রকম আইনগত অন্ধতার দরুন এমনকি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানেরাও যা একেবারে নাকের গোড়ায় রয়েছে তা দেখতেই পান না। পরে, যখন সময় উপস্থিত হয় তখন, যে-সব চিহ্ন আমরা আগে দেখতে পাইনি সর্বত্র সেগুলিকে দেখে অবাক হয়ে যাই। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত নবজাগরণের যুগের সম্বন্ধে, প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো মধ্যযুগীয় সবকিছুকেই সুন্দর মনে করায়; এবং গ্রীম্-এর মতো ব্যক্তিরাও এর প্রভাবমুক্ত নন। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হলো, মধ্যযুগ পেরিয়ে···প্রত্যেক জাতিরই আদিম যুগটির দিকে চেয়ে দেখা, এবং এ-চেষ্টা সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টারই অনুরূপ, যদিও এই দু'-এর মধ্যে যে কোনো সম্পর্ক আছে সে-সম্বন্ধে ওই সব বিদ্বান-ব্যক্তিদের কোনো ধারণাই নেই। তাঁরা তাই যা কিনা সবচেয়ে পুরোনো তারই মধ্যে যা হলো সবচেয়ে নতুন তাকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যান—এমনকি সাম্যবাদীদেরও এই দশা, ব্যাপারটা এতোই চরম যে প্রুধঁ-র মতো ব্যক্তিরও শিউরে কম্পন হবে।

উদ্ধৃত অংশের বিশেষ করে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, মার্ক্স্ একরকম আইনগত অন্ধতার কথা বলছেন: শ্রেণীসমাজের আবহাওয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেই মানুষ পরমপুরুষার্থ মনে করতে শিখেছে, তাই যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভাব তা একেবারে নাকের গোড়ায় থাকলেও সাধারণত আমাদের চোখে পড়তে চায় না।

দ্বিতীয়ত, মার্ক্স্ বলছেন, প্রত্যেক জাতির আদিম যুগটির দিকে চেয়ে দেখা সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টারই অনুরূপ। তার কারণ, সমাজতন্ত্র এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হবার পথনির্দেশ দিচ্ছে এবং প্রত্যেক জাতিরই আদিম অবস্থার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় তখনো মানুষের সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা হয়নি।

আর, ঠিক এই কারণেই মার্ক্স্ বলছেন, যা-কিনা সবচেয়ে পুরোনো তারই মধ্যে, যা-হলো সবচেয়ে নতুন তাকে আবিষ্কার করতে পারা। মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে আধুনিক বলতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা বা সাম্যবাদের আয়োজন। আদিম মানবসমাজও একরকমের সাম্যসমাজ। এই প্রসঙ্গেই মনে রাখতে হবে, মর্গানের সামনেও অতীতের উপর থেকে পর্দা সরে যাবার দরুনই এক ভবিষ্যতের চিত্র উন্মোচিত হয়েছিলো এবং সে-ভবিষ্যতের বর্ণনায় মর্গান বলেছিলেন: 'সেই প্রাচীন সমাজের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতাই আবার ফিরে আসবে উন্নততর এক পর্যায়ে'।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক হলো আধুনিক যুগের ব্যক্তিগত-সম্পত্তির প্রভাব-লালিত অন্ধতা প্রাচীন রচনাবলীর তাৎপর্য নির্ণয়ে কী রকম বাধা সৃষ্টি করে সে-সম্বন্ধে সচেতন হবার প্রয়োজনীয়তা। তারই উদাহরণ হিসেবে মার্ক্স্[১৪] বলছেন:

> To show how much we are all implicated in this judicial blindness :......philologists of the force of a Grimm *mistranslated* the simplest Latin sentences...
> E.g., the well-known passage in Tacitus: "*arva per annos* mutant et *superest ager*", which means, "they exchange the fields, *arva* (by lot, hence also *sortes* [lot] in all the later law-codes of the barbarians) "and the common land remains over" (*ager* as public land contrasted with *arva*)—is translated by Grimm, etc.: "they cultivate fresh fields every year and still there is always (uncultivated) land left over."

আমরা সবাই কী ভাবে এই আইনগত অন্ধতার বশ তাই দেখা যায়।...গ্রীম্-এর

মতো অতো বড়ো ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ও সবচেয়ে সরল লাতিন বাক্যের ভ্রান্ত তর্জমা করেছেন। উদাহরণ : "*arva per annos mutant et superest ager*"—ট্যাসিটাসের এই বিখ্যাত অংশটির মানে হলো, "তারা লটারি করে জমি বদল করে এবং সাধারণের জমি বাকি থাকে" ; গ্রীম্‌ প্রভৃতি এর তর্জমা করছেন, "তারা প্রতি বছর নতুন জমি চাষ করে এবং তবুও অনাবাদী জমি বাকি পড়ে থাকে"। (সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)।

প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার সাহায্য না নিয়ে প্রাচীন সাহিত্যের অর্থনির্ণয় করবার চেষ্টায় অতিবড়ো বিদ্বানেরাও কী রকম কাল্পনিক কথা বলতে পারেন তার একটি দৃষ্টান্ত ভারতীয় সাহিত্য থেকে এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। মহাভারতে বাহীকদের বর্ণনায়[১৮৮] ঘৃণাভরে বলা হয়েছে :

> তস্মাত্তেষাং ভাগহরা ভাগিনেয়া ন সূনবঃ
> অর্থাৎ,
> এই নিমিত্তই তাহাদের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্য অনুসারে এই উত্তরাধিকার ব্যবস্থা মাতৃ-প্রধান সমাজের স্বাভাবিক স্মারক বলে বুঝতে অসুবিধে হয় না। মহাভারতে বাহীকদের বর্ণনায় এই মাতৃপ্রাধান্যের ইঙ্গিতও অস্পষ্ট নয়[১৮৯] এবং আজো ভারতের স্থানবিশেষে[১৯০],—যেখানে মাতৃপ্রধান সমাজের চিহ্ন আছে সেখানে,—এই জাতীয় উত্তরাধিকার ব্যবস্থাই দেখতে পাওয়া যায়। অথচ, মহাভারতের এই সরল তথ্যটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নীলকণ্ঠের মতো বিদ্বান-ব্যক্তিও কী রকম মনগড়া কথা বলছেন :

> যদি অপি পুত্রী পুত্রঃ চ যৌ অপি জারজৌ তথাপি পিতৃত্বে ইব মাতৃত্বে বিসংবাদী-ভাবাৎ দৌহিত্রঃ এব রিক্‌থহারী ভবতি ন পুত্রঃ ইতি ভাবঃ। যতঃ তে ভগিনীষু এব অপত্যানি জনয়ন্তি ন স্বদারেষু অতঃ তেষাং ভাগিনেয়াঃ ভাগহরাঃ ইতি……
>
> অর্থাৎ, যদিও পুত্রী ও পুত্র দুজনেই জারজ তথাপি পিতৃত্বের ন্যায় মাতৃত্বে বিসংবাদ-অভাব হেতু, দৌহিত্রই ধনাধিকারী হয়, পুত্র নহে। যেহেতু তাহারা ভগিনীতেই অপত্য উৎপাদন করে, নিজেদের পত্নীতে নহে—সেই হেতু তাহাদিগের ভাগিনেয়-গণই উত্তরাধিকারী হয়।

মার্ক্‌স্‌ যে-অজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছেন এখানে তারই অনুরূপ অজ্ঞতার পরিচয়। এবং এই অজ্ঞতা দূর করবার জন্যেই গ্রীকতত্ত্বের অতো বড়ো পণ্ডিত হয়েও

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন গ্রীক সাহিত্য বোঝবার তাগিদেই মার্ক্‌সবাদী হয়েছিলেন।

উপসংহার

আধুনিক যুগের বিদ্বানেরা ভারতবর্ষের প্রাচীন রচনাবলী সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন। সে-গবেষণাকে ছোটো করবার প্রশ্ন নিশ্চয়ই ওঠে না; কেননা, তার উপর নির্ভর করতে না পারলে আমাদের পক্ষে আজ হয়তো ওই পুঁথিপত্রগুলির দিকে অগ্রসর হওয়াই অনেকাংশে অসম্ভব হতো। কিন্তু তবুও শুধুমাত্র এই গবেষণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাও সম্ভব নয়। কেননা, এই রচনাগুলিতে প্রাচীন-সমাজের যে-সব স্মারক পড়ে রয়েছে আধুনিক বিদ্বানেরা সেগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা খোঁজ করেন নি। তার কারণ কি এই যে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ওই সব ঝুলজমা ধুলোঢাকা গহ্বরগুলিতে এমন কঙ্কাল লুকোনো রয়েছে যার কাহিনী শুনতে আধুনিক সমাজ সাহস পায় না? এই কঙ্কালগুলি রবীন্দ্রনাথের কঙ্কাল গল্পের অশরীরী নায়িকাটির মতো সত্যিই বড়ো অপরূপ কাহিনী আমাদের শোনাতে চায়। এরা বলতে চায়, উত্তরযুগের ভারতীয় সমাজে হিংসা ও বিদ্বেষের তাণ্ডব যতো প্রচণ্ড হয়েই উঠুক না কেন এককালে এই সমাজেই সবাই স্বাধীন ছিলো, সবাই সমান ছিলো, মানুষে-মানুষে ছিলো ভাই-ভাই সম্পর্ক। তখনো মানুষ মানুষকে শোষণ করতে শেখেনি, তাই শেখেনি অধ্যাত্মবাদের প্রবঞ্চনা, শেখেনি ভাববাদের আলেয়া দেখিয়ে মানুষকে ভুল পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

এ-কাহিনী প্রকাশ করতে আধুনিক সমাজ এতো ভয় পায় কেন? কেননা, সে-কাহিনী শুনে আজকের মানুষ আবার সমানে-সমান সম্পর্ককে ফিরে পেতে চাইবে। তার মানে অবশ্যই সে-সমাজের দৈন্যকে ফিরে পাবার কথা নয়—ধনসম্পদের দৈন্যও নয়, চিন্তাচেতনার দৈন্যও নয়—তার বদলে, প্রাচুর্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নতুন সাম্য-সমাজ, আর তারই অনুরূপ ধ্যানধারণা হিসেবে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ লোকায়ত-দর্শনও। অতীতকে আবিষ্কার করবার সঙ্গে শুধুই অতীতকে চেনবার সম্পর্ক নয়—সচেতনভাবে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার যোগাযোগও আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

বস্তুবাদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গণপতি : লোকায়ত-র উৎস সন্ধানে

দার্শনিক হেগেল দেখাতে চেয়েছেন, ভারতবর্ষের কোনো ইতিহাস নেই। এদেশে জীবাত্মা তার নিজস্ব সত্তা খোয়াতে খোয়াতে একেবারে দেউলে হয়ে গিয়েছে। এদেশে পরমাত্মার মর্যাদাকে মলিন করা হয়েছে খণ্ড, সংকীর্ণ বস্তুরাজ্যের মধ্যে তাঁকে বিলীন করে দিয়ে। এবং এ-পরিস্থিতিতে আর যাই হোক ইতিহাস বলে কিছু সম্ভব নয়।

হেগেলের এই ভারত-আবিষ্কার সত্যিই বিস্ময়কর।

ভারতের কি কোনো ইতিহাস নেই?

হেগেলের মূল কথা হলো, মানুষের ইতিহাসকে শুধুমাত্র মানুষের কীর্তি-কাহিনী মনে করা ভুল। কেননা, এই পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে আছেন এক চিন্ময় পরমাত্মা। এখানের ধূলিকণা থেকে শুরু করে ধ্যানধারণার জটিলতা পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর বিকাশ।

তাই, ইতিহাস বলতে মরলোকের মানুষ যেটুকু দেখছে সেটুকুই সব নয়। আসলে সবই তাঁর লীলা। আর কী অপরূপ এই লীলা : যুগের পর যুগ ধরে একের পর এক পর্যায় পার হয়ে, ভগবান তাঁর মহিমার বিকাশ করে চলেছেন। একএক যুগের একএক দেশের কথা তাই এই লীলাপ্রসঙ্গেরই যেন একএকটি পরিচ্ছেদ।

আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে, লীলাময়ের কী রকম মহিমা?

হেগেল[১] বলছেন, এ-যেন তাঁর স্বপ্ন-দশা। স্বপ্নমহিমা। তার মধ্যে লাবণ্য যে নেই তা নয় : যা-কিছু কঠিন, যা-কিছু এলোমেলো, এবড়ো-খেবড়ো, দ্বন্দ্বকণ্টকিত, তা সবই এখানে শান্ত, সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছে। তবুও, কী সাংঘাতিক অলীক এই স্বপ্ন—এমনকি মনগড়া বা কাল্পনিক কথার মতোও নয়। যদি তাই হতো তাহলেও জীবাত্মা এ-কল্পনা থেকে ও-কল্পনায় সহজে যাতায়াত করতে পারতো। তার মানে, একটা কল্পনাকে যতো সহজে

জড়িয়ে ধরতো ততো সহজেই আবার তাকে ছেড়ে আসতে পারতো। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে লীলাময়ের যে-স্বপ্ন-দশা সেখানে জীবাত্মা যে-কোনো একটি খণ্ড ও সংকীর্ণ বস্তুর কাছেই একেবারে চরম আত্মসমর্পণ করে বসে—যেন বিধাতার পায়ে, ভগবানের কাছে, একেবারে বিলীন হয়ে যাওয়া। এখানে তাই সবকিছুই যেন এক একটি মূর্তিমান ভগবান্ : সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গঙ্গা, সিন্ধু, জানোয়ার, সবকিছুই। ঈশ্বর-সৃষ্টির এই নেশায় জীবাত্মার স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। অপরপক্ষে আবার সংকীর্ণ ও খণ্ড বস্তুরাজ্যের স্তরে নামিয়ে এনে মলিন করা হয় ঈশ্বরের মর্যাদা।

আর, হেগেল বলছেন, ঠিক এই কারণে ইতিহাস বলতে সত্যিই যা বোঝায় এ-দেশে তার সন্ধান করা চলে না[২]। কেননা, ব্যক্তিচেতনা যেখানে ধ্বংস হয়েছে, বস্তু-চেতনা যেখানে অনাবিল নয় সেখানে ইতিহাসের আশা করা নিষ্ফল। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হলো একদিকে চরম আত্মনাশ এবং অপরদিকে খণ্ডবস্তুর স্বরূপ ভুলে সবকিছুকেই ঈশ্বর করে তোলা। একদিকে জীবাত্মার বিলোপ, অপরদিকে পরমাত্মার অমর্যাদা। এ-শুধু স্বপ্ন-দশায় সম্ভব —একে ইতিহাস বলে না।

অতএব, হেগেল আরো বলে চলেছেন, ইয়োরোপের কাছে ভারতবর্ষ অনিবার্যভাবেই মাথা নোয়াতে বাধ্য ছিলো, কেননা, ইয়োরোপের শুধু যে ইতিহাস আছে তাই নয়, সে-ইতিহাসে পরমাত্মার অনেক উন্নত পর্যায়ের বিকাশ। হেগেল ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, চীনও একদিন না একদিন এইভাবেই ইয়োরোপের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। বস্তুত, এসিয়ার সমস্ত দেশেরই এই হলো অনিবার্য ভবিষ্যৎ[৩]।

কিন্তু ভারতবর্ষ—তথা এসিয়া—যে একদিন ইয়োরোপের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্তিও পাবে হেগেলের ভবিষ্যৎ-বাণীর মধ্যে এ-কথার স্থান নেই। কী করে থাকবে? যার অতীতটা অস্বীকার করা গেলো তার ভবিষ্যৎটা স্বীকার করবার অস্বস্তি থেকে মুক্তিও পাওয়া যায়। তাই, ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামে ভারতবর্ষের অতীত নিয়ে প্রশ্নটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা, অতীতের কথার সঙ্গে ভবিষ্যতের কথা সম্পর্কহীন নয়—অতীতের উপর থেকে যবনিকা উঠলে পর ভবিষ্যতেরও নির্দেশ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের সত্যিই কি কোনো অতীত ছিলো? যদি থাকে, তাহলে সে-অতীতকে আবিষ্কার করে ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের কোন ধরনের নির্দেশ পাওয়া সম্ভব হবে?

তেত্রিশকোটি দেবদেবীর কথা

আমাদের মনে আমাদের অতীত সম্বন্ধে একটা গর্বের ভাব নিশ্চয়ই রয়েছে। এবং নানান রকম প্রচারের ফলে এ-গর্ব প্রধানতই আমাদের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য নিয়ে। তাই, হেগেলের ওই অধ্যাত্মবাদী সমালোচনাটা আমাদের অনেকেরই মনঃপূত হবে না।

হেগেলের তরফ থেকে কিন্তু তর্ক তুলে বলা যাবে, এ-দেশে অন্তত তেত্রিশকোটি দেবদেবীর ভিড় রয়েছে। তাঁদের বাদ দিয়ে দেশের কথাটা তো সত্যিই বোঝা যায় না। আর, ওই তেত্রিশকোটি দেবদেবী থেকেই প্রমাণ হয়, এ-দেশে মানুষ যা-কিছু সামনে পেয়েছে তাকেই একেবারে ভগবান বলে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছে: সূর্য, চন্দ্র, জানোয়ার, ফুল, সব-কিছুই। তাই, একে একরকম ঘোরের দশাই বলতে হবে। স্বপ্নের ঘোর। শুধু তাই নয়, ওই ঘোরের মধ্যে একেবারে বিলীন হয়ে যাওয়াও।

তেত্রিশকোটি দেবদেবী। সত্যিই তো, ভিড় বড়ো কম নয়। কে যেন বলছিলো, এ-দেশে মানুষের চেয়েও দেবতারা দলে ভারি। কথাটা অবশ্যই রসিকতা, হেগেলের মতো প্রগাঢ় দার্শনিকতা নয়। তবুও, রসিকতা হলেও উড়িয়ে দেওয়া চলে না। হিসেবে তার প্রমাণ রয়েছে। হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে, ষোড়শ শতাব্দীতে[১] ভারতবর্ষের জনসংখ্যা মাত্র দশকোটির মতো ছিলো আর দেবতারা যে তখন দলে কম-ভারি ছিলেন তা নিশ্চয়ই ভাবা যায় না। এমনকি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি[২], যখন সর্বপ্রথম দেশের মানুষ ভালো করে গুনে দেখা হলো তখন, দেখা গেলো মানুষের সংখ্যা মোটের উপর পঁচিশ কোটির চেয়ে সামান্য বেশি। তেত্রিশকোটির পাশে পঁচিশ কোটি নিশ্চয়ই খুব একটা জাঁকালো সংখ্যা নয়।

দেশের শাসকেরা এই ভিড় নিয়ে স্বভাবতই বিব্রত ও বিরক্ত হন। কিন্তু, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাঁদের মনোভাবে একটা বিরোধ থেকে গিয়েছে। কেননা, শাসকসম্প্রদায়ের বিরক্তিটা একান্তভাবেই ভিড়ের ছোটো অংশটুকু সম্বন্ধেই, সংখ্যালঘু ওই মরলোকের মানুষগুলি সম্বন্ধেই। ঐশী বাসিন্দারা দেশের ভিড়কে যতো অসহ্যই করে তুলুন না কেন তাঁদের সম্বন্ধে শাসকসম্প্রদায়ের বিরক্তি নেই, বরং একটা প্রকাশ্য শ্রদ্ধাভক্তির ভাবই দেখা যায়[৩]।

অবশ্যই, ভালো করে বিচার করলে শাসকদের এই আপাত-বিরোধী মনোভাবের ন্যায়সঙ্গত তাৎপর্যটা বুঝতে পারা অসম্ভব নয়। বস্তুত, সে-তাৎপর্য বোঝাবার ব্যাপারে তাঁদের তরফ থেকে ক্লান্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি।

রক্তমাংসে-গড়া এই সংখ্যালঘুর দল নির্বিচারে বংশবৃদ্ধি করে, সন্তানের

জন্ম দেয় বেপরোয়ার মতো। বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করে দেওয়া হচ্ছে, এরই দরুন দেশের বুকে অভাব-অনটনের বন্যা না বয়ে পারে না। এ যে অর্থনীতির এক অমোঘ বিধান: খাইয়ে মানুষের সংখ্যা বাড়লে খাবারে ঘাটতি পড়বেই। অথচ, কার্যকারণসম্পর্ক সম্বন্ধে অন্ধ ওই প্রাকৃতজনেরা একদিকে সেকালের বামাচারীদের মতোই প্রজনন-উৎসাহী এবং অপরদিকে লোকায়তিকদের মতোই অমৃতের বদলে অন্নকেই পুরুষার্থ মনে করছে। ফলে, একালেও সন্তান-উৎপাদনের সঙ্গে খাদ্য-উৎপাদনের প্রসঙ্গ না উঠে পারছে না। দাবি উঠছে, দেশের উৎপাদন-পদ্ধতিকে উন্নততর করতে হবে—অনাবাদী জমিকে আবাদ-যোগ্য করে তুলতে হবে, আবাদী জমিতে চাষবাসের মামুলি আয়োজনটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা চলবে না, দেশের বুকে গড়ে তুলতে হবে আধুনিক কলকারখানা। দেশের মানুষ যদি সংখ্যায় সত্যিই বাড়ে তাহলে সমাধানটা অনাহার নয়, খাবারের আয়োজন বাড়ানোই।

কিন্তু, উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে শাসন-ব্যবস্থারও যোগাযোগ রয়েছে। ফলে, এ-জাতীয় দাবি শাসক-সম্প্রদায়ের সুনিশ্চিত শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই দেখা দেয় বিরক্তিও। তুলনায় কিন্তু ঐশী বাসিন্দারা দলে যতোই বেশি হোন না কেন, এরকম বিরক্তিজনক পরিস্থিতি মোটেই সৃষ্টি করেন না। দেশের উৎপাদন-পদ্ধতিকে উন্নততর করবার বদলে বরং পিছিয়ে-পড়া থিতোনো আবহাওয়াই তাঁদের পক্ষেও নিরাপদ। দেশের জনসাধারণ যাতে নিজেদের দুঃখদৈন্যকে নিজেদেরই কর্মফল বলে মেনে শুধুমাত্র নিজেদের কপালেই করাঘাত করতে শেখে এ-চেষ্টাতেও তাঁরা উদাসীন নন। ফলে, দেশের শাসক-সম্প্রদায়ও এঁদের সম্বন্ধে বিরক্তির বদলে শ্রদ্ধাভক্তিই প্রচার করতে চায়।

ভারতের আদিপর্ব

১

কিন্তু দার্শনিক হেগেলের পক্ষে কথাটা যতোই অসন্তোষজনক হোক না কেন, ভারতবর্ষেরও একটা অতীত ইতিহাস সত্যিই আছে। বরং, ওই যে তেত্রিশকোটি দেবদেবীর নজির দেখিয়ে হেগেল প্রমাণ করতে চেয়েছেন এ-দেশের কোনো ইতিহাস নেই,—ওঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেই এ-দেশের অতীত ইতিহাসটার আভাস পাওয়া যেতে পারে। কেননা, এই দেবদেবীদের নিজেদেরও ইতিহাস আছে এবং সে-ইতিহাস শুধুই যে চিত্তাকর্ষক তাই নয়, তারই মধ্যে দেশের ইতিহাসও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

দেশের সেই আদিপর্বের ইতিহাসটির সন্ধান পেলে দেখা যায় অবস্থাটা চিরকালই স্বপ্নের ঘোরের মতো নয়। আর, হেগেল ওই যে স্বপ্ন-লাবণ্যের কথা বলেছেন,—যা-কিছু কঠিন, যা-কিছু কঠোর, যা-কিছু দ্বন্দ্বকন্টকিত ও সংঘাতচঞ্চল তা সবই স্বপ্নের দশায় শান্ত সমাধিস্থ হয়ে যাওয়ার লাবণ্য—তা আর যাই হোক অন্তত ভারতীয় ইতিহাসের আদিপর্বের বেলায় অলীক কল্পনামাত্র।

কিন্তু দেবদেবীর আবার ইতিহাস কী? স্বর্গের কাহিনীর সঙ্গে মর্তের মানুষদের সম্পর্কই বা কী করে সম্ভবপর?

আসলে এই দেবদেবীরা চিরকালই স্বর্গের বাসিন্দা ছিলেন না। তার মানে, এমন একটা যুগ ছিলো যখন তাঁরা আধুনিক অর্থে দেবদেবীই হয়ে ওঠেননি। তাই মর্তের মানুষের সঙ্গেই তাঁদের সম্পর্ক তখন খুব নিবিড়। মানুষের উৎপন্ন অন্ন থেকে নৈবেদ্য পাবার বদলে তখন তাঁরা অনেকেই মানুষের উৎপাদন-উৎসাহে, এমনকি প্রজনন-উৎসাহেও, প্রকাশ্যভাবেই নেতৃত্বগ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি।

ভারতবর্ষের সেই আদিপর্বের চিত্রটি তাই আশ্চর্য, অপরূপ। মানুষের সমাজে তখনো উদ্বৃত্তজীবী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেনি আর তাই সে-শ্রেণীর চেতনা দিয়ে গড়া নৈবেদ্যজীবী দেবদেবীরাও নয়।

তারপর অবশ্যই উদ্বৃত্তশ্রেণীর মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। যদিও অবশ্য, ঠিক কী করে তা হলো সে-প্রশ্ন খুবই জটিল। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি-ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আসমুদ্রহিমাচল এই বিরাট দেশে সমস্ত মানুষের জীবনে একই তালে পরিবর্তন দেখা দেয়নি। রাষ্ট্রশক্তি গড়ে ওঠবার পাশাপাশিই থেকে গিয়েছে প্রাগ্-বিভক্ত প্রাচীন সমাজ। আর, ওই রাষ্ট্রশক্তির কর্ণধারেরা প্রাগ্-বিভক্ত সমাজের মানুষগুলিকে যে কী রকম বিষনজরে দেখেছিলেন তার দলিল রচনা করে গিয়েছেন স্বয়ং কৌটিল্য। কৌটিল্যের রচনা অনুসরণ করেই যৌথ-সমাজের প্রতি শ্রেণীবিভক্ত-সমাজের শাসক-সম্প্রদায়ের মনোভাব সম্বন্ধে পরে আলোচনা তুলবো। আপাতত প্রশ্ন হলো, দেবদেবীদের আদিরূপটির প্রতি ওই শাসক-শ্রেণীর মনোভাব কী রকম? যে-মানুষদের সঙ্গে তখনো ওই দেবদেবীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেই মানুষদের প্রতি যে-রকম মনোভাব, সেই রকমই। অর্থাৎ, দেশের শাসক-সম্প্রদায়ও এঁদের মোটেই সুনজরে দেখেনি, এমনকি খোদ আইনকর্তারাও এঁদের বিরুদ্ধে আইনজারি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অর্থাৎ, দেবলোকের অনেক যুদ্ধই তখন পর্যন্ত ঘটে চলেছিলো মরলোকের বুকেই।

আর্য-অনার্য মতবাদের জটিলতায় ভারতের আদিপর্বে শ্রেণীসমাজের

আবির্ভাব-কাহিনী আজো অনেকখানি অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। অথচ, ওই আদিপর্বের ইতিহাস খুঁজে না পেলে প্রাচীন ভারতে ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে সংগ্রাম ও সংঘাতকে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তার কারণ, ধ্যানধারণাগুলি স্বয়ম্ভূ নয়। মানুষের মূর্ত জীবনেরই প্রতিবিম্ব।

অতএব, লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস-আবিষ্কারের প্রচেষ্টা ভারতের আদিপর্বের ইতিহাসটি খোঁজবার চেষ্টাও হতে বাধ্য। এবং, যে দেবদেবীদের নজির দেখিয়ে হেগেল ভারতবর্ষের গোটা ইতিহাসটাকেই অস্বীকার করতে চান তাঁদেরই অনুসরণ করে আমরা হয়তো ভারতের আদিপর্বের ওই ইতিহাসটির সন্ধান পাবো।

গণেশের কথা কেন?

কিন্তু দেবতা তো এ-দেশে এক-আধটি নন। তাঁদের মধ্যে কাকে ছেড়ে কাকে অনুসরণ করা যাবে?

আগেই বলেছি, আমরা বিশেষ করে গণপতির পদানুসরণ করবো। কেননা, তাঁকে অনুসরণ করবার অনেক রকম সুবিধে আছে।

প্রথমত, এ-নির্বাচন আমাদের ঐতিহ্য-বিচ্যুত করবে না। দেশের ঐতিহ্য অনুসারে যে-কোনো পুজোর বেলাতেই গণেশ পুজো পান সর্বপ্রথম। এই ঐতিহ্য অনুসারেই গণেশ হলেন সিদ্ধিদাতা। সংকল্প যতো দুরূহই হোক না কেন, তাঁকে অনুসরণ করলে সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত হয়।

কিন্তু ঐতিহ্যের কথা ছাড়াও অন্য যুক্তি রয়েছে। আপনি যদি চণ্ডী বা মনসা বা ওই রকম আর কোনো দেবদেবীকে অনুসরণ করতে চান তাহলে শুরুতেই আপনার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে—কিন্তু বিঘ্ন-বিনাশক গণেশের বেলায় সে-বিঘ্নের ভয় নেই। কী রকম বিঘ্ন? মনসা প্রভৃতির বেলায় আধুনিক পণ্ডিতেরা বলবেন, এঁরা ছিলেন স্থানীয় অনার্যদের উপাস্য দেবদেবী। তাই, আগন্তুক আর্যদের মনে, কিংবা আভিজাতিক আর্য-ঐতিহ্যের বাহকদের পক্ষে, এঁদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধ থাকাই স্বাভাবিক। চাঁদসদাগরের উপাখ্যানে তারই স্বাক্ষর রয়েছে[৮]। কিন্তু এ-প্রতিবন্ধ শুধুমাত্র ধর্মবোধপ্রসূত; আর্যদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অনার্যদের ধর্মবিশ্বাসের সংঘাত-কাহিনী। সে-কাহিনী থেকে ধর্মবিশ্বাসের সংঘাত অনুমান করা যেতে পারে, তার চেয়ে বেশি কিছুই নয়। গণপতির বেলায় কিন্তু এতো সহজ একটা সমাধান দেখিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে নিরস্ত করা যাবে না। কেননা, গণপতি হলেন

মা আর্য না অনার্য, কিংবা, আর্য আর অনার্য দুই-ই। বাজসনেয়ী সংহিতায়[৯] তাঁর গান শোনা যায় : গণানাং ত্বাং গণপতিং হবামহে। এমনকি, বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশে—ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে—তাঁর উল্লেখ আছে[১০]। আবার ভিলদের গ্রামেও তাঁকে দেখা যায়—চাষের আগে আবাদী জমির উপর একটি শিলাখণ্ডকে তারা গণেশ বলেই সম্বোধন করছে[১১]। গণেশ যে স্থানীয় অনার্যদের বিশ্বাস থেকে ঋগ্বেদ সংহিতায় বা বাজসনেয়ী সংহিতায় প্রবেশলাভ করেছিলেন, এমন কথা যদিও ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়[১২] প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন তবুও তাঁর যুক্তির জোর খুবই ক্ষীণ মনে হয়। অপরপক্ষে গণেশ যে সংহিতা সাহিত্য থেকে বেরিয়ে কোলভিলদের মন জয় করেছিলেন এ-ধরনের কথা প্রমাণ করা আরো দুঃসাধ্য হবে। তাই, অন্যান্য দেবদেবীর বেলায় আধুনিক পণ্ডিতেরা যে অতিসরল সমাধান দিতে পারবেন গণেশের বেলায় তা সম্ভব হবে না।

গণেশকে অনুসরণ করবার তৃতীয় সুবিধে হলো, আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে ইতিপূর্বে অনেকেই তাঁর ইতিহাস রচনা করবার চেষ্টা করেছেন। এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র[১৩] ও শ্রীমতী অ্যালিস গেটীর[১৪] গবেষণা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। পূর্বসূরীদের এই জাতীয় গবেষণা আমাদের প্রচেষ্টাকে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করতে পারে।

সুবিধের কথা ছাড়াও আমাদের পক্ষে গণেশের ইতিহাস অন্বেষণ করাই বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক। তারও নানান কারণ আছে। প্রথমত, আমাদের উদ্দেশ্য হলো লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস অনুসন্ধান করা এবং আমরা আগেই দেখেছি লোকায়তের সঙ্গে বামাচারের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এবং ওই তেত্রিশকোটির মধ্যে গণেশই বোধ হয় একমাত্র দেবতা যাঁর সঙ্গে লোকায়ত ও বামাচার দু'-এরই স্পষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। দেশের ঐতিহ্য অনুসারে লোকায়ত-দর্শনের আদি-গুরু হলেন বৃহস্পতি এবং ঋগ্বেদের মন্ত্র অনুসারে বৃহস্পতি ও গণপতিতে তফাত নেই[১৫]। অপরপক্ষে, এই গণেশই আবার তান্ত্রিক সাহিত্যের হেরম্ব—হেরম্ব ছাড়াও তন্ত্রে গণেশের আরো অনেক রকম নাম আছে। তাছাড়াও, শক্তি-গণপতির মূর্তি এবং আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়ে গাণপত্যসম্প্রদায়ের বর্ণনা গণেশকে একেবারে অভ্রান্তভাবেই বামাচারের সঙ্গে সংযুক্ত বলে প্রমাণ করে[১৬]। দ্বিতীয়ত, সমাজ-ইতিহাসের কথা বাদ দিয়ে দর্শনের ইতিহাস আলোচনা অসম্ভব। গণপতিকে অনুসরণ করেই প্রাচীনকালের সমাজ-ইতিহাসের দিকে অগ্রসর হওয়া সুবিধাজনক। কেননা, গণপতির কাহিনী আর গণের কাহিনী আলাদা নয়। এখানেও পূর্বসূরীদের প্রচেষ্টা আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। কেননা, আধুনিক যুগের দু'জন বিখ্যাত ঐতিহাসিক,—অধ্যাপক কে. পি. জয়সওয়াল[১৭]

ও অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার[১৮],—এই গণের কথাই অতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা একটু পরেই দেখবো, মার্ক্স্ যাকে বলেছেন 'আইনগত অন্ধতা' তারই দরুন এঁরা গণ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেও শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান-বিচ্যুত হয়েছেন। কিন্তু এঁদের সিদ্ধান্ত স্বীকারযোগ্য না হলেও এঁরা যে-সব তথ্য সঞ্চয় করেছেন তা মহামূল্যবান।

গণেশ মানে কী?

এই সব নানান কারণে আমরা তেত্রিশকোটির মধ্যে বিশেষ করে গণপতিরই শরণাপন্ন হতে চেয়েছি।

কিন্তু গণেশ না হয়ে শিবও হতে পারতো, কৃষ্ণও হতে পারতো; হতে পারতো বুদ্ধ, হতে পারতো কপিল; এমনকি হতে পারতো স্বয়ং বৃহস্পতি—যাঁর নামের সঙ্গে লোকায়ত-দর্শনের যোগাযোগটা কিছুতেই ভোলা চলে না। কিন্তু এখানে একটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার আছে—যেন, উপনিষদের ভাষায়, একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানম্। এক গণেশের ইতিহাসকে খুঁজে পেলেই শিব, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কপিল, বৃহস্পতি—অনেকেরই জন্মাদিরহস্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া, ভারতীয় ঐতিহ্যের এমনই জটিলতা যে, গণেশের সঙ্গে শিবের আর কৃষ্ণের, কপিলের আর বুদ্ধের একাত্মভাব একাধিকবার ঘোষিত হয়েছে। বৃহস্পতির কথা তো আগেই বলেছি। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলছেন, "এখন আমরা গণদেবতা বলিতে শুধু গণেশকেই বুঝি। কিন্তু মহাদেবও গণেরই দেবতা। গণদেবতা অর্থাৎ সাধারণ লোকপূজ্য দেবতা(?)। মহাদেবেরই এক নাম গণেশ (বনপর্ব, ৩৯, ৭৯), তিনিই গণানাং পতিঃ (দ্রোণপর্ব, ২০১, ৪৮), তিনিই গণাধ্যক্ষ গণাধিপ (সৌপ্তিকপর্ব, ৭, ৮; শান্তিপর্ব, ২৮৪, ৭৬)। বিষ্ণুও গণদেবতা। তাই তাঁর নাম গণেশ্বর, লোকবন্ধু, লোকনাথ, ইত্যাদি (অনুশাসনপর্ব, ১৪৯, বিষ্ণু সহস্রনাম)। মহাদেবের প্রায় নামই বিষ্ণু সহস্রনামে দেখা যায়। যথা, ঈশান, স্থাণু, মহাদেব, রুদ্র, বৃষাকৃতি, লোকাধ্যক্ষ ইত্যাদি।"[১৯] মনিয়ার উইলিয়াম্স্‌ও[২০] বলছেন, মহাভারতের স্থানবিশেষে শিবের নাম গণাধিপতি বা গণেশ। বুদ্ধ আর কপিলের সঙ্গেও অন্তত এই রকমই নামের মাধ্যমেই গণেশের সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, গণেশের একটি নাম হলো বিনায়ক। এবং বিনায়ক বলতে বুদ্ধকেও বোঝায়, কপিলকেও বোঝায়।

তাই, গণপতির ইতিহাস একা গণপতিরই ইতিহাস নয়। কিংবা, ঘুরিয়ে বললে হয়তো একথাও বলা যায় যে, এক গণপতিই নানা রূপে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের নানা জায়গা জুড়ে রয়েছেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যের এতো সব জটিলতা সত্ত্বেও কিন্তু এতোটুকুও জটিলতা নেই গণেশের নামটা নিয়ে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত[২১] মহাশয় যেমন বলছেন, "সর্ববিঘ্নহর ও সর্বসিদ্ধিদাতা বলে যে দেবতাটি হিন্দুর পূজা-পার্বণে সর্বাগ্রে পূজা পান, তাঁর গণেশ নামেই পরিচয় যে, তিনি 'গণ' অর্থাৎ জনসঙ্ঘের দেবতা। এ থেকে যেন কেউ অনুমান না করেন যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজের যাঁরা মাথা তাঁরা জনসঙ্ঘের উপর অশেষ ভক্তি ও প্রীতিমান ছিলেন। যেমন আর সব সমাজের মাথা, তেমনি তাঁরাও সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তিকে ভক্তি করতেন না, ভয় করতেন।...গণশক্তির প্রতি প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কর্তাদের মনোভাব কি ছিল, তা গণেশের নরশরীরের উপর জানোয়ারের মাথার কল্পনাতেই প্রকাশ"।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের 'গণেশ' বলে ওই ছোট্ট প্রবন্ধটি আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান মনে হয়েছে। তার প্রধান কারণ এই যে, তিনিই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, গণেশের প্রতি শাসক-সমাজের একালের মনোভাবটার সঙ্গে সেকালের মনোভাবের মিল নেই। আমরা একটু পরেই দেখবো, এই সূত্রটি আমাদের পক্ষে কতোখানি মূল্যবান।

কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, অতুলবাবুর প্রতিটি মন্তব্যই স্বীকারযোগ্য। প্রথমত, 'গণ' শব্দের প্রকৃত অর্থ কী, এ-বিষয়ে দিক্‌পাল ভারততত্ত্ববিদেরা বহু আলোচনা করেছেন—তাঁদের আলোচনা উপেক্ষা করে গণেশের ইতিহাস আলোচনা করা যায় না। দ্বিতীয়ত, গণেশের ওই গজাননটির কাহিনী সত্যিই অতো সহজ নয়। বিশেষ করে এই কারণে নয় যে, গণেশের চিরকালই এ-রকম্ হাতির মাথা ছিলো কিনা সন্দেহের কথা। বৈদিক সাহিত্যে গণপতির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁর গজাননের উল্লেখ নেই[২২]। তান্ত্রিক সাহিত্যে গণেশের বহু চিত্তাকর্ষক নামের মধ্যে কয়েকটি নাম হলো: বৃষভধ্বজ, দ্বিজিহ্ব, বৃষকেতন ইত্যাদি[২৩]। এই জাতীয় নাম হাতির বদলে সাপ আর ষাঁড়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়। খোদাইকরের ছেনি যদি গণেশকে দ্বিজিহ্বের রূপ দিতো তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর মূর্তিতে গজমুণ্ডের চিহ্ন থাকতো না। বস্তুত, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া কোনো কোনো গণেশমূর্তির[২৪] সঙ্গে হাতির মাথার সত্যিই কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি, নির্দিষ্ট কোনো রূপহীন শিলাখণ্ডকে আজো ভারতবর্ষের নানা জায়গায় গণেশ আখ্যা দেওয়া হয়[২৫]। আনন্দকুমার

কুমারস্বামী[২৩] মনে করিয়ে দিচ্ছেন, গজাননবিশিষ্ট গণেশের এই মূর্তিটি ভারতবর্ষে বহুলভাবে প্রচলিত হতে শুরু করেছে শুধু গুপ্তযুগ থেকেই। এই সব নানান কারণে আমাদের সন্দেহ হয় গণেশের ওই হাতির মাথার মধ্যে অনেক রকম খবর লুকোনো আছে আর তাই এ-বিষয়ে কোনো একটি মতবাদকে তাড়াতাড়ি মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা হয়।

তৃতীয়ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বলছেন, গণেশ নামেই পরিচয় যে, তিনি গণ অর্থাৎ জনসঙ্ঘের দেবতা। কিন্তু এখানে দেবতা কথাটিতে উত্তরযুগের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ঠিক কতোটুকু বর্তমান তাও ভেবে দেখা দরকার। বাজসনেয়ী সংহিতায় যিনি গণপতি তাঁর মধ্যে আধুনিক অর্থে দেবভাব একান্তই আছে কিনা তা ভেবে দেখবার কথা। মনিয়ার উইলিয়মস্-এর[২৭] মতে সেখানে গণপতি বলতে একদল মানুষের বা কোনো এক গোষ্ঠীর নেতামাত্রই বুঝিয়েছে। এবং, তাঁর ধারণায় ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে গণপতি বা ব্রহ্মণস্পতি নামের তাৎপর্যও আলাদা নয়। বরাহমিহিরও[২৮] গণনায়ক শব্দটিকে ঠিক এই অর্থেই ব্যবহার করেছেন। মনে রাখা দরকার, গণেশেরই অপর নাম হলো গণনায়ক এবং নায়ক মানে নেতা। গণেশের দেবত্বের অভাব আরো স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে অন্য একটি নামের মধ্যে। উইল্সন্[২৯] বলছেন, গণেশের একটি নাম শুধু গণ। তান্ত্রিক সাহিত্যেও[৩০] এ-কথার নজির রয়েছে। এবং গণ বলতে যাই বোঝাক না কেন, দেবতা বোঝাবার কোনো কারণ নেই। তার মানে, এমনটা হওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব নয় যে, শুরুর যুগে গণেশ আধুনিক অর্থে দেবতা ছিলেন না।

আপত্তি তুলে হয়তো বলা হবে, নামে কিছুই আসে যায় না। গণেশ হলেন সিদ্ধিদাতা দেবতা—তা তাঁকে গণপতিই বলা হোক বা গণনায়কই বলা হোক বা শুধু গণ-ই বলা হোক। আমাদের ধারণায় অবশ্য নামে নিশ্চয়ই আসে-যায়। কিন্তু আপাতত সে-তর্ক না তুললেও চলতে পারে। কেননা, শুধুমাত্র ওই বিচিত্র নামগুলিই গণেশের ইতিহাসে বড়ো কথা নয়। আগেই বলেছি, গণেশ না হয়ে কৃষ্ণ হতে পারতো, কপিল হতে পারতো, বুদ্ধ হতে পারতো, বৃহস্পতি হতে পারতো। এঁদের নামের সঙ্গে অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে গণের কোনো সম্পর্ক নেই। তার মানে, গণেশের ইতিহাসের সবচেয়ে আশ্চর্য দিকটিকে তাঁর ওই নামগুলির মধ্যেই খোঁজ করবার প্রয়োজন নেই।

তাহলে, সেই আশ্চর্য দিকটি ঠিক কী? সে-এক অপরূপ পরিবর্তন।

একটা বিশেষ যুগে দেখা যায় সমাজের উপরমহলে গণেশের প্রতি মনোভাবটা একেবারে পাল্টে যাচ্ছে। আর, শুধু এই মনোভাবের পরিবর্তনই নয়, গণেশের নিজস্ব তাৎপর্যও। এই ওলট-পালটের কাহিনী ভারতের আদি-পর্বের ধ্যানধারণার ইতিহাসের উপর আলোকপাত করে। এবং ধ্যানধারণা

বলতে যেহেতু অনিবার্যভাবেই মানুষের ধ্যানধারণা সেই হেতু দেবতাদের সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েই মানুষের ইতিহাসও অনুমান করবার অবকাশ পাওয়া যেতে পারে। এবং, শুধুমাত্র গণেশের ক্ষেত্রেই যদি এই জাতীয় ওলট-পালট চোখে পড়তো তাহলে না হয় তা অগ্রাহ্য করবার অবকাশ থাকতো—এই একই ঘটনা ঘুরেফিরে নানান বার নানান ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। তাই, এ-ঘটনা হলো চলতি কথায় যাকে বলা হয় টিপিক্যাল। দর্শনের ক্ষেত্রে কপিল, বুদ্ধ বা বৃহস্পতির বেলাতেও কী ভাবে একই অদলবদল ঘটেছে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবার অবকাশ হয়তো হবে না। তবু গণেশের ইতিহাস থেকেই তাঁদের ইতিহাসও অনুমান করা অসম্ভব নয়।

গণেশের ইতিহাসে ওই অপরূপ অদল-বদলটি ঠিক কী রকম?

সমাজের সদরমহল এককালে গণেশকে রক্তকলুষ বিঘ্নস্রষ্টা বলেই চিনতে চেয়েছিলো। অথচ, এই গণেশই শেষ পর্যন্ত হয়ে গেলো সর্বসিদ্ধির দেবতা! এ-পরিবর্তন সত্যিই বড়ো অপরূপ!

গণেশ যখন রক্তকলুষ বিঘ্নরাজ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত[৩১] বলছেন, "আদিতে গণেশ ছিলেন কর্মসিদ্ধির দেবতা নয়, কর্মবিঘ্নের দেবতা"। দেবতা কিনা, কিংবা, আধুনিক অর্থে দেবতা কিনা, তা কিছুটা পরেই দেখা যাবে। আপাতত দেখা যাক একটা বিশেষ যুগের আইন-কর্তাদের চোখে গণেশের সঙ্গে কর্মবিঘ্নের যোগাযোগ কতোটা ঘনিষ্ঠ।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার, গণেশ এক নয়, বহু। মহাভারতে[৩২] গণেশ বা গণপতি প্রসঙ্গে বহুবচনের প্রয়োগ দেখা যায় এবং স্যর ভাণ্ডারকর[৩৩] মনে করিয়ে দিচ্ছেন শতরুদ্রীয়-তে যেরকম বহু ক্ষেত্রে বিদ্যমান বহু রুদ্রের কথা রয়েছে মহাভারতেও তেমনি বহু ক্ষেত্রে বিদ্যমান বহু গণপতির কথাই বলা হয়েছে। এবং, শুধুই যে গণেশ বহু তাই নয়, তাঁর নামও বহু। আধুনিকপন্থী বা প্রাচীনপন্থী কোনো পণ্ডিতই অস্বীকার করবেন না যে, অথর্বশিরস-উপনিষদ[৩৪], মানবগৃহ্যসূত্র[৩৫], যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা[৩৬] প্রভৃতি বইতে বিনায়ক বলে যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা ওই গণপতি ছাড়া আর কেউই নন। প্রশ্ন হলো, ওই পুঁথিপত্রগুলিতে এই গণপতিদের প্রতি কী রকম মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

মানবগৃহ্যসূত্র[৩৭] থেকেই শুরু করা যাক। আধুনিক পণ্ডিতদের হিসেবে[৩৮]

যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার অন্তত চার শ' বছর আগে এই পুঁথি রচিত হয়েছিলো। এবং, এই পুঁথিতে গ্রন্থকার গণেশদের এক অতি আতঙ্কজনক ছবি এঁকেছেন। গণেশদের বা বিনায়কদের দৃষ্টি পড়লে যে কতোরকম ভয়াবহ মানসিক অবস্থা সৃষ্ট হয় তারই ফর্দ দিয়ে তিনি আলোচনা শুরু করছেন। এই ফর্দের মধ্যে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন থেকে কঠিন উন্মাদরোগ পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়েনি। কিন্তু শুধু ওই রকম মনোবিকার সৃষ্টি করেই গণেশরা ক্ষান্ত নন। তাঁদেরই প্রভাবে রাজার ছেলে রাজ্যলাভে উপযুক্ত হলেও রাজ্য পায় না, কুমারী বিবাহযোগ্যা হলেও তার বর জোটে না, সন্তানবতী হবার উপযুক্ত হলেও নারীর সন্তান হয় না, কিংবা, যার সন্তান আছে তার সন্তান-বিয়োগ ঘটে। বিদ্বান আচার্যের শিষ্য জোটে না, শিষ্যদের বিদ্যালাভ হয় না। কৃষি ও বাণিজ্য উচ্ছন্নে যায়।

তখনকার কালের মানুষদের সুখসম্ভোগের সম্ভাবনা যে-রকম সংকীর্ণ তার অনুপাতে সর্বনাশের তালিকাটা নিশ্চয়ই এর চেয়ে বড়ো হতে পারতো না। এবং, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তখনকার কালে যাঁদের হাতে শাসনক্ষমতা তাঁদেরই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে এই গৃহ্যসূত্রগুলির[৩৯] মধ্যে। তার মানে, গণেশদের প্রতি উপরোক্ত মনোভাবকে সে-যুগের শাসকশ্রেণীর মনোভাবই বলতে হবে। এবং, এ-মনোভাব যে খুবই সাময়িক ছিলো না তারও প্রমাণ আছে। কেননা, মানবগৃহ্যসূত্রের বেশ কয়েক শ' বছর পরে যাজ্ঞবল্ক্য আইনের যে-বই লিখলেন[৪০] তার মধ্যেও গণেশদের প্রতি হুবহু একই মনোভাব :

> বিনায়কঃ কর্মবিঘ্নসিদ্ধ্যর্থং বিনিযোজিতঃ।
> গণানামাধিপত্যে চ রুদ্রেণ ব্রহ্মণা তথা॥
> তেনোপসৃষ্টো যস্তস্য লক্ষণানি নিবোধত।
> স্বপ্নে ইবগাহতে ইত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি॥
> কাষায়বাসসশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চাধিরোহতি।
> অন্ত্যজৈর্গর্দ্দভৈরুষ্ট্রৈঃ সহৈকত্রাবতিষ্ঠতে॥
> ব্রজন্তঞ্চ তথাত্মানং মন্যতেঽনুগতং পরৈঃ।
> বিমনা বিফলারম্ভঃ সংসাদত্যনিমিত্ততঃ॥
> তেনোপসৃষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ।
> কুমারী ন চ ভর্ত্তারমপত্যং ন চ গর্ভিনী॥
> আচার্যত্বং শ্রোত্রিয়শ্চ ন শিষ্যোঽধ্যয়নং তথা।
> বণিগ্লাভং ন চাপ্নোতি কৃষিঞ্চৈব কৃষীবলঃ॥

পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়[৪১] তর্জমা করছেন : ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, বিনায়ককে কর্মবিঘ্নের জন্য এবং গণদিগের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি যাহার উপর উপসর্গ করেন, তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি যেন জলে

> অবগাহন করিতেছে, কাষায়বাস মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণকে দেখিতেছে, আমমাংসাশী মৃগাদিতে আরোহণ করিতেছে, এবং চণ্ডালাদি অন্ত্যজজাতি গর্দভ ও উষ্ট্রের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছে, দৌড়িতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইচ্ছামতো দৌড়িতে না পারায় পশ্চাদনুগামী শত্রুর করকবলিত হইতেছে, এইসকল স্বপ্ন দেখিতে পায়। আর সর্বদাই অন্যমনস্ক থাকে, আরব্ধ কোনো কার্যই সিদ্ধ হয় না এবং বিনা কারণে বিষণ্ন হয়। তাঁহার (বিনায়কের) উপসর্গ হইলে রাজকুমার রাজ্যলাভ করিতে পারে না; কুমারী অভিলষিত স্বামী প্রাপ্ত হয় না; গর্ভবতী স্ত্রী অপত্যলাভে বঞ্চিত থাকে; ঋতুমতী স্ত্রীর গর্ভ হয় না। শ্রোত্রিয় আচার্যতা, শিষ্য অধ্যয়ন, বণিক লাভ এবং কর্ষক কৃষিফল প্রাপ্ত হয় না।

ভয়াবহ চিত্র, সন্দেহ নেই। "এবং", অতুলচন্দ্র গুপ্ত[২] মনে করিয়ে দিচ্ছেন, "গণেশের যে-পূজা তা ছিলো এই ভয়ঙ্কর দেবতাটিকে শান্ত রাখার জন্য; তিনি কাজকর্মের উপর দৃষ্টি না দেন, সে-জন্য ঘুষের ব্যবস্থা"। এই ঘুষের ব্যবস্থাটি যে কতোখানি ফলাও তার পরিচয় যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি[৩] থেকেই পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালের আইনের বইতে গণেশের প্রতি এই যে-মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তার কথা মনে না রাখলে গণেশের কয়েকটি পুরোনো নামের তাৎপর্য বুঝতে পারাই সম্ভব নয়। নানা রকম পুঁথিপত্রে[৪] এই নামগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। নমুনা: বিঘ্নেশ, বিঘ্নকৃৎ, বিঘ্নেশ্বর, বিঘ্নরাজ, ইত্যাদি। চলতি কথায়, 'যতো নষ্টের গোড়া'—ট্রাব্‌ল-মেকার। দুর্বৃত্তদের পাণ্ডাও বলতে পারেন। অবশ্যই, পরের যুগের পরিবর্তিত আবহাওয়ায় গণেশ সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা দেখা দিলো। এবং, এই পরবর্তী ধারণার বশবর্তী হয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা ওই প্রাচীন নামগুলির ভুল ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা বলতে চাইলেন, বিঘ্ন দূর করবার ক্ষমতা গণেশের, বাধাবিঘ্নের শক্তি গণেশের কাছে নতজানু—তাই তিনি বিঘ্নের অধিপতি, বিঘ্নেশ। দুর্বৃত্ত বলে বিঘ্নরাজ নন, দুর্বৃত্তদের দমন করেন বলেই বিঘ্নরাজ। এই জাতীয় ব্যাখ্যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মনিয়ার-উইলিয়মস্‌-এর[৫] রচনায়: বিঘ্ন দূর করতে পারেন বলেই গণেশের ওই রকম নাম আর তাইজন্যেই সমস্তরকম ক্রিয়াকর্মের শুরুতে নমো গণেশায় বিঘ্নেশ্বরায় বলে প্রণাম করবার প্রথা রয়েছে। কিন্তু মনিয়ার-উইলিয়মস্‌-এর এই ব্যাখ্যা যে মনগড়া তার প্রমাণ আছে। বিঘ্নকৃৎ বলে নামটির তাৎপর্য বিঘ্ন দূর করা নয়, বিঘ্ন সৃষ্টি করাই। বৌধায়ন-ধর্মসূত্রে[৬] গণেশের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক নামের মধ্যে একটি হলো বিঘ্ন এবং শুধু বিঘ্ন। এবং, আমরা একটু আগেই দেখেছি, যাজ্ঞবল্ক্য সরাসরি বলছেন যে, বিঘ্নসাধন করবার জন্যেই বিনায়কেরা নিযুক্ত আছেন। তাই

মানতেই হবে যে, এককালে গণেশকে শুধু দুর্বৃত্ত বলেই দেখবার চেষ্টা করা হয়েছিলো, দুর্বৃত্ত-দলনের কথাটা অর্বাচীন।

আর, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, গণেশকে তখন শুধুমাত্র দুর্বৃত্ত বলেই কল্পনা করা হয়নি,—তার বদলে রীতিমতো রক্তকলুষ দুর্বৃত্তই। কেননা, গণেশের ওই যে হাতির মাথা জীববিজ্ঞানমতে তো তাতে দুটি গজদন্ত থাকবার কথা। শাস্ত্রমতে কিন্তু তা নয়। গণেশের দাঁত বলতে মাত্র একটি। গণেশের নামই হলো একদন্ত। এবং, এই যে মাত্র একটি দাঁত—এর রংটাও স্বাভাবিক হাতির দাঁতের মতো নয়। শাস্ত্রমতে একেবারে টকটকে লাল। ওরকম টকটকে লাল কেন? শাস্ত্রমতে, গণেশ ওই দাঁতের আঘাতে বহু শত্রু বিনাশ করেছেন আর তাদেরই রক্তে স্নাত হয়ে দাঁতটার ওই রকম চেহারা হয়েছে: দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং[৭৭]। কিন্তু, প্রশ্ন হলো, গণেশের অরি বা শত্রু বলতে ঠিক কে বা কারা? পুরাণে এ-প্রশ্নের রকমারি জবাব আছে। তার মধ্যে একটা জবাব আন্দাজ করা যায় গণেশের অপর দাঁতটি কী করে হারালো তারই কাহিনী থেকে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে[৭৮] এক রোমহর্ষক যুদ্ধের কাহিনী পাওয়া যায়—পরশুরামের সঙ্গে গণেশের যুদ্ধ। লড়াই করতে করতে পরশুরাম তাঁর হাতের কুঠারটা ছুঁড়ে মারলেন গণেশের দিকে। তারই আঘাতে গণেশের একটা দাঁত উড়ে গেলো। অবশ্যই, তাই বলে গণেশকে পরশুরামের তুলনায় দুর্বল মনে করা চলবে না। কেননা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে[৭৯] বলা হয়েছে, ইচ্ছে করলে গণেশ ওই কুঠারাঘাতকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। কিন্তু গণেশ দেখলেন, কুঠারটি তাঁর পিতার হাতের তৈরি, তাই কুঠারকে নিষ্ফল করলে পিতাকে অমর্যাদা দেখানো হয়। তাই পিতার মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যেই গণেশ একটি দাঁত এগিয়ে দিয়ে কুঠারের আঘাতটা গ্রহণ করে নিলেন। অবশ্যই, এই হারজিতের কাহিনীই এখানে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক নয়। আমাদের কাছে তার চেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো এই পৌরাণিক কাহিনী থেকে গণেশের শত্রুকে চেনবার চেষ্টা। কার সঙ্গে গণেশের লড়াই? কে তাঁর ওই শত্রু? পরশুরাম। পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সামান্যমাত্র পরিচয় থাকলেই এই পরশুরামকে সনাক্ত করা সম্ভব। হিংসার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের এমন জঙ্গী প্রবর্তকের কথা শাস্ত্রগ্রন্থে নিশ্চয়ই অদ্বিতীয়। এই প্রসঙ্গে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের[৮০] গ্রন্থে পরশুরামের পৌরাণিক কাহিনীর সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা স্মরণীয়।

তার মানে কি এই যে, একটা বিশেষ যুগে গণেশের শত্রু বলতে ওই পুরোহিত-শ্রেণীকেই বুঝতে হবে? সে-যুগে রচিত পুরোহিত-শ্রেণীর

সাহিত্যে গণেশের বিরুদ্ধে বিষোদগারও একই ইঙ্গিত দিতে চায়। কিন্তু খুব তাড়াহুড়ো করে কোনো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার তাগিদ নেই। কেননা, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আদালতে বিস্তর সাক্ষী-সাবুদ ভিড় করে আছে। ঐতিহাসিকেরা সবসময় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন না, কেননা, তাহলে অপ্রিয় সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ভয়। সে-আতঙ্ক উত্তীর্ণ হতে পারলে গণেশের পদচিহ্ন অনুসরণ করেই নানারকম আশ্চর্য সওয়াল আমরা শুনে আসতে পারবো।

আপাতত গণেশের বিরুদ্ধে সেকালের এই প্রকট ঘৃণার মনোভাবের আরো কিছুকিছু নমুনা দেখা যাক। অতুলচন্দ্র গুপ্ত[১১] মহাশয় বলছেন, "এইজন্যেই গণেশের অনেক প্রাচীন পাথরের মূর্তিতে দেখা যায় যে, শিল্পী তাঁকে অতি ভয়ানক চেহারা দিয়ে গড়েছে"। আলফ্রেড ফুসে-ও[১২] গণেশের কদাকার মূর্তির উল্লেখ করে শিল্পীদের মনে গণেশের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব অনুমান করতে চাইছেন। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, গণেশের ওইসব বীভৎস চেহারার আসল তাৎপর্য অন্য। তবু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, ভারতীয় দেব-শিল্পের ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে গণেশের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিলো—প্রতিমা-পরিকল্পনাতেই তার প্রকট প্রমাণ রয়েছে। কেননা, অনেক মূর্তিতেই দেখতে পাওয়া যায় গণেশ কোনো-না-কোনো আভিজাতিক দেবদেবীর পায়ের তলায় অবদলিত হয়েছেন।

বাংলা দেশেই[১৩] পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে যেখানে দেখা যায় গণেশ অবদলিত হয়েছেন ভ্রুকুটিতারা বা পর্ণশবরীর পায়ের তলায়। তবু তাঁর হাতে ঢাল-তলোয়ার দেখে অনায়াসেই অনুমান করা যায় বিনা যুদ্ধে তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। বিশেষ করে লক্ষ্য করা দরকার, এই মূর্তিতে গণেশের গজানন নেই—মুখটা কদাকার, কিন্তু মানুষেরই মুখ। তিব্বতে পাওয়া[১৪] ব্রোঞ্জ-এর মূর্তিতে দেখি দেবতা মহাকাল গণেশকে পায়ের তলায় দলছে। মঞ্জুশ্রীর পায়ের তলায় অবদলিত অবস্থায় গণেশের মূর্তিও একান্ত দুর্লভ নয়। তার চেয়েও চিত্তাকর্ষক হলো আর এক রকম মূর্তি[১৫] যেখানে গণেশকে দেখানো হয়েছে বিঘ্নহন্তা বলে এক দেবতার পায়ের তলায়। নামেই প্রমাণ, বিঘ্নকে জয় করবার কল্পনা থেকেই বিঘ্নহন্তার জন্ম—এই মূর্তিতে বিজিত গণেশ তাই সাক্ষাৎ বিঘ্নই। নেপালের উপকথায়[১৬] এই বিঘ্নহন্তার যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তা থেকেও প্রমাণিত হয় বিঘ্ন বলতে এখানে গণেশই।

আপত্তি উঠবে, উল্লেখিত দেবদেবীরা জাতে বৌদ্ধ। তাই মূর্তিগুলির সাক্ষ্য এই কথাই প্রমাণ করে যে, বৌদ্ধ ধর্মের কর্তারা এককালে

গণেশকে বিষনজরে দেখেছিলেন। এবং, গণেশের প্রতি বৌদ্ধ দেবদেবীদের এই আচরণ হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘাতের ইঙ্গিত হয়তো দিতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে গণেশের বিরুদ্ধে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধ কী করে প্রমাণ করবে?

উত্তরে বলবো, ভাস্কর্যের ভাষায় এই যে গণেশ-দলন কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে তার নায়ক-নায়িকারা হিন্দুস্বর্গের বাসিন্দাই হোন আর বৌদ্ধস্বর্গের বাসিন্দা হোন, আমাদের মূল যুক্তির পক্ষে তাতে খুব বড়ো তফাত হয় না। কেননা, মর্তের প্রতিবিম্ব হিসেবে এঁদের সকলের জাত একই। অর্থাৎ, হিন্দু দেবতাদের মতো এঁরাও হলেন মানবসমাজের আভিজাতিক-শ্রেণীর প্রতিনিধি। মহাকালের কথাটাই ভেবে দেখা যাক। দেবলোকের বাসিন্দা হলেও মরলোকের আভিজাতিক-শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে এতোটুকুও সন্দেহের অবকাশ নেই। শান্তি আর শৃঙ্খলার রক্ষক হিসেবেই তাঁর পরিচয়[৭৭]। তাছাড়া, নজর করলেই দেখা যায় তাঁর হাতে একটা মোহরের থলি রয়েছে: চৈনিক পর্যটক ঈ-সীন[৭৮] বলছেন, ভারতবর্ষে অধিকাংশ মঠের দোরগোড়ায় তিনি এক দেবমূর্তি দেখে গিয়েছেন, তাঁর হাতে স্বর্ণমুদ্রার থলি আর তাঁরই নাম হলো মহাকাল। ভারতবর্ষের বাইরেও আভিজাতিক-শ্রেণীর সঙ্গে মহাকালের সম্পর্কটা অস্পষ্ট নয়: মঙ্গোলিয়ার শাসক আল্টন খাঁ হুকুম জারি করেছিলেন, মহাকালই হবেন দেশের এক এবং অদ্বিতীয় দেবতা, তাঁরই খাতিরে বাকি সব দেবমূর্তি পুড়িয়ে ফেলতে হবে[৭৯]। তাই বৌদ্ধস্বর্গের বাসিন্দা এই মহাকাল যখন গণেশকে পদদলন করছেন তখন তাঁর সঙ্গে হিন্দুসমাজের আইনকর্তা যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিভঙ্গির খুব বেশি তফাত খুঁজতে যাওয়াটা ভুল হবে।

আইনকর্তাদের কথাটা যখন উঠলোই তখন তা শেষ করে নেওয়াই ভালো। মনু নাকি বলেছেন, গণেশ ব্রাহ্মণদের দেবতা নন, ক্ষত্রিয়দের দেবতা নন, এমনকি বৈশ্যদেরও দেবতা নন—তার বদলে শুধুমাত্র শূদ্রদের দেবতাই:

> বিপ্রাণাং দৈবতং শম্ভুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তু মাধবঃ।
> বৈশ্যানাং তু ভবেৎ ব্রহ্মা শূদ্রানাং গণনায়কঃ॥

—অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের দেবতা হলেন শম্ভু, ক্ষত্রিয়দের মাধব, বৈশ্যদের ব্রহ্মা আর শূদ্রদের গণনায়ক। অবশ্যই, এই শ্লোকটি মনুস্মৃতিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু উইলসন্ থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত[৮০] পর্যন্ত দেশ-

বিদেশের পণ্ডিতেরা একবাক্যে বললেন, দেশের ঐতিহ্য অনুসারে শ্লোকটি মনুরই রচনা।

প্রশ্ন হলো, শূদ্র মানে কী? যাদের চোখে জল[৩১], শ্রমের দায়িত্ব যাদের উপর,—অর্থাৎ, শঙ্করাচার্যের ভাষায় যারা হলো ওই প্রাকৃতজনাঃ বা পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর ভাষায় যারা হলো কিনা *unthinking masses*—তারাই শূদ্র। এরা এলো কোথা থেকে—সে-প্রশ্ন নিয়ে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত[৩২] সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমাদের যুক্তির বর্তমান পর্যায়ে বিশেষভাবে জরুরী প্রশ্ন হলো, মনু ওই গণ-নায়ককে যাদের দেবতা বলেছেন তাদের প্রতি শাসকসমাজের মনো-ভাবটা কী রকম? অতুলচন্দ্র গুপ্ত[৩৩] বলছেন:

> 'বাংলা ছিলো সোনার বাংলা, তা তো বটেই। কিন্তু কবে ছিলো? কলকারখানা ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় আসবার পুর্ব পর্যন্ত কি? সেই সময়েই তো ছিয়াত্তুরের মন্বন্তর। তাতে নাকি সোনার বাংলার একপোয়া লোকের উপর না খেয়ে মরেছিলো! মোগল পাঠানের আমলে বোধ হয়? বিদেশীদের বর্ণনা, আবুল ফজলের গেজেটিয়ার, মুকুন্দরামের কবিতা রয়েছে। গোলায় ধান, গোয়ালে গরু, অবশ্যই ছিলো—এখনও আছে। কিন্তু এখনকার মতো তখনো সে গোলা আর গোয়ালের মালিক অল্প ক'জনাই ছিলো।...তবে হিন্দুযুগে নিশ্চয়। কিন্তু সে যুগেও কি এখনকার মতো দেশে শূদ্রই ছিলো বেশি? তাদের standard of living তো মনু বেঁধে দিয়েছেন:
>
> উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
> পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥
>
> ঋষি গৌতমেরও ঐ ব্যবস্থা: জীর্ণান্যুপানচ্ছত্রবাসাঃ—কূর্চাণ্যুচ্ছিষ্টাশনং। পুরোনো জুতো, ভাঙা ছাতা, জীর্ণ কাপড় তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, ছেঁড়া মাদুর তাদের আসন, উচ্ছিষ্ট অন্ন তাদের আহার। 'পুলাক' কথাটার অর্থ ধানের আগড়া; টীকাকারদের ভাষায় 'অসার ধান'। দেশে গোলাভরা ধান থাকলেও দেশবাসীর বেশির ভাগের কপালে খুদকুঁড়ো জুটতে কোনও আটক নেই।

মনে রাখা দরকার, মনুর মতে এ-হেন শূদ্রদের সঙ্গেই গণেশের সম্পর্ক। ঐতিহ্যনির্ণীত মনুর ওই উক্তিটি মনে না রাখলে মনুস্মৃতিরই অন্য উক্তি বুঝতে অসুবিধে হবে। মনুস্মৃতিতে[৩৪] লেখা আছে, যারা গণযাগ করে শ্রাদ্ধবাড়িতে তাদের প্রবেশ নিষেধ:

> স্বক্রীড়ী শ্যেনজীবী চ কন্যাদূষক এব চ।
> হিংস্রো বৃষলবৃত্তিশ্চ গণানাংশ্চৈব যাজকঃ॥

আধুনিক পণ্ডিতেরা এই 'গণানাংশ্চৈব যাজকঃ' কথাটা নিয়ে রীতিমতো অসুবিধেয় পড়েন। অসুবিধের কারণ এই নয় যে, টীকাকারেরা ও-কথার তাৎপর্য নির্ণয়ে সত্যিই ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছেন। মেধাতিথি বলছেন, গণানাং দেবানাঞ্চ যাজকঃ—গণযাজাঃ প্রসিদ্ধাঃ। কুল্লুকভট্ট আরো পরিষ্কার করে বলছেন, বিনায়কাদি-গণযাগকৃৎ। সোজা কথায়, গাণপত্য বা গণেশ-সম্প্রদায়ের লোক। অথচ, আজকের আবহাওয়ায় সমস্ত রকম পূজা-পার্বণের বেলায় গণেশকেই সর্বপ্রথম পুজো পেতে দেখে মনুর এই সহজ কথাটিকে সহজ অর্থে গ্রহণ করা কঠিন। অথচ মনুস্মৃতি থেকেই প্রমাণ যে, এককালে গণযাজকদের স্বক্রীড়ী, শ্যেনজীবী আর কন্যাদূষকদের সমান নিন্দনীয় মনে করা হতো।

বিঘ্নরাজ থেকে সিদ্ধিদাতা

শাসকসম্প্রদায়ের মুখপাত্ররা এককালে গণেশের প্রতি যে-বিদ্বেষ প্রকাশ করেছিলেন তার আরো কিছু নমুনা সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু গণেশের অভিজ্ঞতাতেই তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে। কেননা, এককালে যিনি ছিলেন ওই রক্তকলুষিত বিঘ্নরাজ আর এককালে তিনিই খোদ সিদ্ধিদাতা সেজে বসলেন, সমাজের সদরমহল এককালে যাঁর ভয়ে আতঙ্কিত ছিলো আর এককালে দেখা গেলো তাঁকেই বরণ করে নিচ্ছে আভিজাতিক দেবদেবীর জমকালো সভায়।

কিন্তু খোদ বিঘ্নরাজকে একেবারে সিদ্ধিদাতা করে তোলা যেন এক অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা। তাই, দরকার পড়লো গণেশের এই নব্যরূপকে প্রচার করবার অজস্র তোড়জোড়। ওই প্রচার-প্রচেষ্টা অবশ্যই সার্থক হয়েছে। গণেশের সেই ভয়াবহ রূপটিকে ভুলে গিয়ে আজকের দিনে আমরা শুভকর্মের সূচনায় তাঁরই আশীর্বাদ অপরিহার্য মনে করি।

গণেশের এই নব্যরূপের প্রচার বহুমুখী ও ব্যাপক। শুধুমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে হলে হয়তো ছোটোখাটো একটি পুঁথি রচনা করা প্রয়োজন।

দেশের পুরাণগুলি গণেশের মাহাত্ম্যে মুখর হয়ে উঠলো। বিশেষ করে দুটি পুরাণে—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও স্কন্দপুরাণে[৮৭],—গণেশ জুড়ে বসলেন সুদীর্ঘ স্থান। স্কন্দপুরাণ[৮৮] গণেশকে অবতার বলে ঘোষণা করলো। গণপতি-তত্ত্ব[৮৯] বলে আর একটি গ্রন্থে আরো এক-পা এগিয়ে গিয়ে বলা হলো গণেশও বা

আর উপনিষদের ব্রহ্মও তাই। শুধুমাত্র গণেশের মাহাত্ম্য প্রচার করবার আশাতেই রচিত হলো একটি উপপুরাণ ও একটি নতুন উপনিষদ—গণেশপুরাণ ও গণেশউপনিষদ[৩৮]। এমনকি, একথাও হয়তো বলা যায় যে, অনেক সময়ই প্রচারের প্রচেষ্টাটা সচেতন। কেননা, নারদপুরাণের গণেশস্তোত্রে[৩৯] লেখা আছে :

> অষ্টানাং ব্রাহ্মণানাং চ লিখিত্বা যঃ সমর্পয়েৎ।
> তস্য বিদ্যা ভবেৎ সদ্য গণেশস্য প্রসাদতঃ॥

—মোদ্দা কথায়, স্তোত্রটি লিখেলিখে বিলি করতে হবে। অনেকটা আধুনিক কালের হ্যাণ্ডবিল বিলি করবার মতোই নয় কি?

অবশ্যই, এখন থেকে গণেশকে আর অপর কোনো আভিজাতিক দেবদেবীর পায়ের তলায় নিপীড়িত হতে দেখবার কথা নয়। কেননা, গণেশ নিজেই আভিজাতিক হয়ে উঠেছেন, তাঁর মূর্তিতে জমকালো অলঙ্কার দেখা দিলো। কিন্তু এইখানে একটি খুব জরুরী কথা মনে রাখা দরকার, কথাটি আনন্দকুমার কুমারস্বামী[১০] আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন : ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে গণেশের এ-হেন মূর্তি একটি নির্দিষ্ট যুগ থেকে হঠাৎ দেখা দিতে শুরু করেছে। এবং কুমারস্বামীই বলছেন, গণেশের এই আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনি বহুল।

কিন্তু গণেশের এই নব্যরূপের প্রচার যতোই জমজমাট হোক না কেন, এরই মধ্যে যেন কয়েকটি ফাটল থেকে গিয়েছে। সেই ফাটলগুলির ভিতর দিয়ে উঁকি মারলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাবে সমস্ত প্রচেষ্টাটুকুই কী রকম কৃত্রিম। এখানে দু'-একটা নমুনার উল্লেখ করবো।

খাপছাড়াভাবেই গণপতির বিদ্যা ও জ্ঞানের গৌরব প্রচার করতে শুরু করা হলো। নজির হিসেবে বলা হলো, বেদব্যাস যখন মহাভারত রচনা করেন তখন লিপিকার হিসেবে গণেশ ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যায়নি। অথচ, এই কাহিনী মহাভারত রচিত হবার অনেক পরের রচনা, অতএব কৃত্রিম-ভাবে কোনো এক সময়ে মহাভারতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রমাণ : মহাভারতের শুধুমাত্র উত্তর-ভারতীয় সংস্করণে এই গল্পটি দেখতে পাওয়া যায়, দক্ষিণ-ভারতীয় সংস্করণে গল্পটি নেই। এ-বিষয়ে উইন্‌টারনিৎস্‌-এর আলোচনা[১১] দ্রষ্টব্য।

আর একটা নমুনা : গণেশকে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করতে হলে তাঁর মুখে খুব গুরুগম্ভীর দার্শনিক কথাবার্তা বসিয়ে দেওয়া দরকার। সচেতনভাবে এই চেষ্টা থেকে হোক আর নাই হোক, উত্তরযুগে দেখা যায় গণেশগীতা বলে

একটি পুঁথি রচিত হলো। কিন্তু পুঁথিটি যে কতোখানি কৃত্রিম তা বুঝতে পারাও কঠিন নয়: গণেশগীতা আগাগোড়াই শ্রীমদ্ভাগবতগীতাই—তফাতের মধ্যে শুধু, কৃষ্ণের বদলে কোনোমতে গণেশের নামটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে[৭২]।

তার মানে, গণেশের বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতিটা গণেশের তুলনায় অনেক অর্বাচীন, পরের যুগের রচনা। এই কথাটি স্পষ্টভাবে মনে রাখেননি বলেই আধুনিক কালের অনেক বড়ো বড়ো বিদ্বানও এ-বিষয়ে কৃত্রিম ও বিচারবিরুদ্ধ মতবাদ দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। মনিয়ার-উইলিয়ম্‌স্[৭৩] বলছেন, গণেশের বুদ্ধিটা যে কতোখানি তা বোঝাবার জন্যেই তাঁর অমন এক হাতির মাথা কল্পনা করা হয়েছে। হাতির মাথার তাৎপর্য নিয়ে পরে আলোচনা তোলা যাবে এবং আমরা আগেই বলেছি গণেশের রকমারি নাম দেখেই সন্দেহের অবকাশ রয়েছে হাতির মাথাটা তাঁর আদি ও অকৃত্রিম অঙ্গ না হতেও পারে। আপাতত মন্তব্য হলো, হাতির সঙ্গে জ্ঞানের আনুষঙ্গ ভারতীয় ঐতিহ্যে যদিই বা থাকে তাহলেও তার স্থান নিশ্চয়ই গৌণ।

স্যর ভাণ্ডারকর[৭৪] বলছেন, গণেশের বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতিটা খুব সম্ভব তাঁর নামের সঙ্গে বৃহস্পতির নামের যোগাযোগের দরুনই। অবশ্যই, গণেশের নামের সঙ্গে বৃহস্পতির নামের যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা তোলা দরকার: ওই যোগাযোগ এবং অন্যান্য তথ্য থেকেই দেখতে পাওয়া যায় গণেশের ইতিহাস কতো—কতো—পুরোনো। সিদ্ধিদাতা হিসেবে ঘোষিত হবার আগে,—এমনকি বিঘ্নরাজ হয়ে আতঙ্ক সঞ্চার করবারও অনেক আগে,—ভারতের ইতিহাসে গণেশ দেখা দিয়েছিলেন এক আশ্চর্য রূপে: না বিঘ্নরাজ, না সিদ্ধিদাতা। সে-ইতিহাসের কথায় একটু পরেই ফেরা যাবে। আপাতত, স্যর ভাণ্ডারকরের মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য হলো, তিনি নিজেই বলছেন মানবগৃহ্যসূত্র এবং যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি অনুসারে গণেশের দৃষ্টি পড়লে আচার্যের শিষ্য জোটে না, বিদ্যার্থীর বিদ্যালাভ হয় না। তাই গণেশের বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতিটা সূত্র ও স্মৃতি সাহিত্যের অনেক পরের যুগে রচিত হয়েছে। অতএব এই খ্যাতি যে বৈদিক-সাহিত্যে ঘোষিত তাঁর সঙ্গে বৃহস্পতির সম্পর্কেরই রেশ—এ-কথা বললেও মাঝখানের যুগটিতে গণেশের প্রকট বিদ্যাবিরোধিতা যে কেন সে-প্রশ্নের মীমাংসা বাকি থেকে যায়।

অতিকথার বিড়ম্বনা

বিঘ্নরাজকে সিদ্ধিদাতা সাজাতে হলে তাঁর একটা জমকালো জন্মকথার দরকার পড়ে। এ-চাহিদা মেটাতে গিয়ে পুরাণকারেরা রীতিমতো হিমশিম খেয়ে গিয়েছেন। তাই, আল্‌ফ্রেড ফুসে[৭৫] বলছেন, এবং ঠিকই বলছেন, গণেশের জন্মবৃত্তান্তগুলির মধ্যে অসঙ্গতি এবং বিশেষ করে অসংলগ্নতা থেকেই প্রমাণ হয় এগুলি উত্তরযুগের নতুন পরিস্থিতির চাহিদা মেটাবার জন্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে—যাঁরা উদ্ভাবন করেছিলেন তাঁরা সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না।

উপাখ্যানগুলির মধ্যে অসঙ্গতি এবং অসংলগ্নতা যে কতোদূর তা কেনেডির[৭৬] 'হিন্দু মাইথোলজি' বা গোপীনাথ রাও-এর[৭৭] 'হিন্দু আইকনোগ্রাফি' দেখলেই বুঝতে পারা যাবে,—এঁরা উভয়েই বিভিন্ন পুরাণ থেকে এ-জাতীয় বহু উপাখ্যান সংকলিত করেছেন। আমাদের যুক্তির পক্ষে মাত্র কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট হবে।

কোনো পুরাণে[৭৮] লেখা আছে, একা শিব থেকেই গণেশের জন্ম। কোনো পুরাণে[৭৯] আবার লেখা আছে, একা পার্বতী থেকেই গণেশের জন্ম। অথচ এমন নয় যে, স্ত্রী-পুরুষে মিলন বাদ দিয়ে প্রজনন-সম্ভাবনাকে পুরাণকারেরা সত্যিই স্বাভাবিক মনে করতেন। তাই, এ-জাতীয় কাহিনী থেকেই প্রমাণ হয় যে, আভিজাতিক দেবলোকে গণেশের আবির্ভাব আর যাই হোক সহজ বা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

ওই অস্বাভাবিক ঘটনাটিকে স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন করবার একটা মস্ত অন্তরায় ছিলো গণেশের গজাননটি। তাই, গণেশের মাথা নিয়ে পুরাণ-কারদের মাথাব্যথাও খুব কম নয়। এ-নিয়েও অনেক রকম অসংলগ্ন ও এলোমেলো কাহিনী পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের গণেশখণ্ডে[৮০] লেখা আছে জন্মাবার পর শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু একটি হাতির মাথা কেটে এনে নবজাতকের কাঁধের উপর এঁটে দেন। আবার স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে[৮১] লেখা আছে, সিন্দুর বলে এক দৈত্য পার্বতীর গর্ভে অষ্টম মাসের সময় প্রবেশ করে গণেশের মাথাটি কেটে দেয় এবং শিরহীন অবস্থায় জন্মাবার পর নারদের অনুরোধে গণেশ গজাসুরের মাথাটি কেটে নিজের স্কন্ধে যোজনা করেন—তার মানে, গণেশের গজাননটি তাঁর নিজস্ব নয়, গজাসুরের কাছ থেকে ধার করা। কিন্তু এ-বিষয়ে সবচেয়ে আশ্চর্য পৌরাণিক কাহিনী[৮২] হলো, শিব ও পার্বতী একবার হাতির রূপে মৈথুন করেছিলেন—তাই ওই রকম গজানন সন্তানের জন্ম হয়।

কিন্তু এতোভাবে গণেশের জন্মকাহিনী রচনা করেও পুরাণকারেরা যেন কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে, তাঁর জন্মের সঙ্গে একটা নোংরা কিছুর

সম্পর্ক রয়েছে। তাই, তাঁকে পার্বতী-তনয় বলে মেনে নেওয়া সত্ত্বেও এ-কথাও বলতে যেন দ্বিধা হচ্ছে যে, পার্বতীর গর্ভে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জন্ম হয়েছিলো। পুরাণকারেরা বারবার[৮৩] বলছেন, নিজের গায়ের নোংরা নিয়ে খেলা করতে করতে পার্বতী একটি কিম্ভূত-কিমাকার শিশুমূর্তি গড়ে তোলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারই মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে গণেশকে সৃষ্টি করেন।

আর একটি পুরাণ[৮৪] যেন আরো এক-পা এগিয়ে যেতে চায় এবং ওই আভিজাতিক দেবলোকে গণেশের আসল আবির্ভাব-কাহিনীকে প্রকাশ করে দেবার উপক্রম করে। এই কাহিনী অনুসারে পার্বতী বুঝি একবার স্নানের সময় গায়ে-মাখা তেলের সঙ্গে নিজের শরীরের নোংরা মেশান এবং মালিনী বলে গঙ্গাতীরবর্তী এক গজাননা রাক্ষসীকে এই উপাদেয় বস্তুটি খাওয়ান। তারই ফলে মালিনীর গর্ভে গণেশের জন্ম হয়। তারপর পার্বতী তাঁকে গ্রহণ করেন। এই উপাখ্যানটি চিত্তাকর্ষক। কেননা, এখানে স্পষ্টই বলে দেওয়া হচ্ছে যে, গণেশের জন্মটা আসলে দেবতাদের ঘরে নয়। দেবলোকে তাঁর স্থান পোষ্য-সন্তান হিসেবেই। কেবল এই উপাখ্যানে বলে দেওয়া হয়নি যে, পোষ্য-গ্রহণের আগে সংস্কার করবার দরকার হয়েছিলো—সেই সংস্কারের ফলেই রাক্ষসকুলজাত বিঘ্নরাজ দেবলোক-লালিত সিদ্ধিদাতায় পর্যবসিত হন।

গণেশ-সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যে আর এক রকম কাহিনীতে[৮৫] ওই বিঘ্ন-বিপর্যয়ের স্মৃতিটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি, যদিও সে-স্মৃতি টিকে রয়েছে উল্টো হয়ে। কাহিনীটা হলো, ইন্দ্র প্রভৃতি আভিজাতিক দেবতারা একবার খুবই বিপদে পড়েছিলেন। তার কারণ, নারী ও শূদ্ররা দলে দলে সোমনাথ পাহাড়ে শিবের কাছে যাত্রা করেছিলো। এই নিকৃষ্টদের মিছিল দেখে দেবতারা বিশেষ শঙ্কিত হন। তাঁরা শিবের কাছে গিয়ে বললেন—প্রভু, ওদের এই মিছিল বন্ধ করবার জন্যে যা হোক একটা ব্যবস্থা করুন। শিব তাতে রাজি হলেন না। তাই, ইন্দ্রাদি দেবতারা গিয়ে পড়লেন পার্বতীর কাছে। পার্বতী নাকি এই মানবেতরদের মিছিলে বিঘ্ন সৃষ্টি করবার জন্যেই বিঘ্নেশ্বরকে সৃষ্টি করলেন।

পৌরাণিক সাহিত্যে এই কাহিনী বা এই জাতীয় কাহিনী একাধিকবার পাওয়া গেলেও এর মধ্যে বাস্তবের প্রতিবিম্ব যে উল্টো হয়ে পড়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। গণেশ-সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য থেকেই তা বুঝতে পারা যায়। আমরা আগেই দেখেছি, মনুর মতে গণেশ হলেন শূদ্রদের দেবতা। পরে, উচ্ছিষ্টগণপতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাবো, গাণপত্য সম্প্রদায়ের একটি মূল কথা হলো নারীজাতির সাম্য ও স্বাধীনতা। তাই এই গণেশই যে স্ত্রী-শূদ্রের বিরুদ্ধে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা সরাসরি

স্বীকার করতে দ্বিধা হয়। ফলে, উক্ত পৌরাণিক কাহিনীর তাৎপর্য বুঝতে হলে মনে রাখা দরকার, শাসক-শ্রেণীর চেতনায় বাস্তবের প্রতিবিম্ব উল্টো হয়ে পড়ে[৮৬]। অর্থাৎ, এককালে বিঘ্ন সৃষ্টিই হলো গণেশের কাজ—কিন্তু সে-বিঘ্ন স্ত্রী-শূদ্রের বিরুদ্ধে নয়। যাজ্ঞবল্ক্যের বিনায়ক-বর্ণনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বুঝা যায় বিঘ্নটা আসলে কাদের বিরুদ্ধে।

এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার, গণেশের বহু নামের মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক নাম হলো, দ্বিদেহক[৮৭]। অর্থাৎ, গণেশের দুটি স্বতন্ত্র দেহ। আর সত্যিই তাই। গণেশের সত্যিই দুটি দেহ—দুটি স্বতন্ত্র জন্ম, দুটি স্বতন্ত্র সত্তা। এক, বিঘ্নরাজ। দুই, সিদ্ধিদাতা। বিঘ্নরাজটা আগেকার। সিদ্ধিদাতাটা পরের যুগের।

বিঘ্নরাজেরও আগে

গণপতির ইতিহাসে এই চিত্তাকর্ষক পরিবর্তনটি আধুনিক বিদ্বানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁরা এই পরিবর্তনের একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। সে-ব্যাখ্যার মূল কথা হলো, আদিতে গণপতি ছিলেন স্থানীয় অনার্যদের দেবতা। তাই আর্যরা বা বৈদিক ঐতিহ্যের অনুগামীরা, শুরুতে এই দেবতাটিকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁরা গণেশকে গ্রহণ করে নেন। সেই কারণেই গণপতিরও রূপান্তর ঘটে।

এই সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত হিসেবে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন[৮৮] মহাশয়ের রচনা উদ্ধৃত করা যায়: "অনার্য অনেক দেবতাকে আর্যেরা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। চারিদিকের প্রভাবকে দীর্ঘকাল ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব। তাহার পরে গণচিত্তকে প্রসন্ন না করিলে মানুষকে যে অতিষ্ঠ হইতে হয় এই কথা প্রাচীন আর্যেরাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই গণদেবতা গণপতির পূজা সকল যজ্ঞের অগ্রে অনুষ্ঠান করা হইত।" শ্রদ্ধেয় হরিদাস মিত্র[৮৯] মহাশয় অবশ্য গণেশকে অনার্য-উপাসিত দেবতা বলছেন না,

> As Ganesa was perhaps originally the special deity of the *Gaṇas*—wild Aryan tribes, inhabiting desert wastes, mountains and forests,—he was probably in later times affiliated to *Paśupati* (*Sankara*) and *Bhutapati* (*Siva*) ; and when he was admitted to the higher Aryan pantheon, various descriptions of

his origin were given in the Puranas, as necessity arose. These explanations might have taken centuries to grow.

যেহেতু গণেশ আদিতে সম্ভবত বিশেষ করে গণগুলিরই—অর্থাৎ, মরুভূমি, পর্বত ও বনজঙ্গলের বুনো আর্য উপজাতিগুলিরই—দেবতা ছিলেন সেই হেতু খুব সম্ভব উত্তরযুগে তাঁকে পশুপতি (শঙ্কর) ও ভূতপতির (শিব) সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়; এবং তাঁকে যখন উচ্চতর আর্য দেবলোকে গ্রহণ করা হলো তখন প্রয়োজনের খাতিরে পুরাণে তাঁর জন্ম-সংক্রান্ত নানারকম উপাখ্যান রচনা করা দরকার হলো। এই ব্যাখ্যাগুলি গড়ে উঠবার জন্যে সম্ভবত অনেক শতাব্দী সময় লেগেছিলো।

আমাদের মন্তব্য হলো, এ-জাতীয় ব্যাখ্যায় দেবলোকের ইতিহাসকে মরলোকের ইতিহাসের প্রতিবিম্ব বলে দেখবার চেষ্টা নেই। তাই, আধুনিক বিদ্বানদের এ-জাতীয় গবেষণা দুর্মূল্য হলেও পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। প্রথমত, গণেশ বলতে এককালে নির্দিষ্ট একজনকে বোঝাতো না—প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে প্রমাণ হয় বিনায়ক ছিলেন বহু। গণেশের নানাবিধ নামের মধ্যে দ্বিজিহ্বক, বৃষকেতন প্রভৃতি নাম দেখে সন্দেহ হয় প্রাণীজগতের মধ্যে শুধুমাত্র হাতির সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ছিলো না, সাপ ষাঁড় প্রভৃতির সঙ্গেও সম্পর্ক ছিলো। যাঁরা গণেশকে এ-জাতীয় নামে চিনতেন তাঁরা গণেশের মূর্তি রচনা করলে আজকের দিনে আমাদের পক্ষে সেই মূর্তিগুলিকে গণেশ বলে চেনাই হয়তো দুঃসাধ্য হতো। তাই, উন্নততর আর্যেরা অনার্যদের কাছ থেকে, বা অনুন্নত আর্য উপজাতিদের কাছ থেকেই, এই গণেশকে গ্রহণ করেছিলেন—এ-জাতীয় মতবাদ স্বীকার করলেও অনেক প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। কেন গ্রহণ করলেন? এবং, তারচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো, বহু বিনায়কের মধ্যে, কিংবা, বিনায়কের বহু রূপের মধ্যে ওই একটিমাত্র নির্দিষ্ট রূপই কেন গৃহীত হলো? আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো, এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব হয়তো আজ স্পষ্টভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, এমন হতে পারে যে, এই প্রশ্নকে অনুসরণ করেই ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের উৎপত্তি-সংক্রান্ত অমীমাংসিত সমস্যার মীমাংসা অন্বেষণ করা যেতে পারে।

এইখানে আমরা আমাদের মূল যুক্তির আভাস দিয়ে রাখতে পারি।

আমাদের মূল যুক্তি হলো, অন্যান্য দেশের মতোই ভারতবর্ষেও রাষ্ট্রশক্তি ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কাহিনী অনাদি নয়। প্রাগ্‌-বিভক্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপরই রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একসঙ্গে তা ঘটেনি। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের পাশেই থেকেছে প্রাগ্‌-বিভক্ত প্রাচীন সমাজ। এমনকি, প্রাগ্‌-বিভক্ত সমাজ যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে সেখানেও তার সমস্ত চিহ্ন নির্মূল হয়ে যায়নি।

আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, ভারতীয় সাহিত্যে ওই প্রাগ্‌-বিভক্ত সমাজেরই নাম হলো গণ। ইংরেজী পরিভাষা অনুসারে ট্রাইব। অবশ্যই, দুর্ভাগ্যবশত এই ট্রাইব শব্দটিকে প্রায়ই এলোমেলোভাবে ব্যবহার করা হয়—মর্গান-এর গবেষণা অনুসরণ করে ওই ট্রাইব্যাল-সমাজ বা গণ-সমাজকে স্পষ্টভাবে চেনবার চেষ্টা করা হয়নি। তার বদলে সাধারণত একরকম আধো-অস্পষ্ট আদিম জীবনের চিত্রই উল্লেখ করা হয়। মর্গান-এর গবেষণা অনুসরণ করলে দেখা যায় এই গণ-সমাজের চিত্রটিকে অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট মনে করবার কারণ নেই। তার বদলে এখানে সমাজসংগঠনের একটি নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট রূপ রয়েছে। শুধু তাই নয়। ওই গণ-সমাজেরও একটা ইতিহাসও আছে, বিকাশ আছে: মর্গান-এর পরিভাষা অনুসারে মধ্য-বন্য-দশা থেকে মধ্য-বর্বর-দশা পর্যন্ত। মধ্য-বর্বর-দশার পর থেকেই ওই গণ-সমাজের গড়নে ভাঙন দেখা দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই ধ্বংসস্তূপের উপরই গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রশক্তি।

এই গণ-সমাজকে আমরা প্রাগ্‌-বিভক্ত সমাজ বলছি, কেননা, যতোদিন পর্যন্ত এই গণ-সমাজে ভাঙন দেখা দেয়নি ততোদিন পর্যন্ত শ্রেণীবিভাগেরও পরিচয় নেই—পরিচয় নেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির, আধুনিক স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের (পরিবারের) এবং রাষ্ট্রশক্তির।

নামেই প্রমাণ, ওই গণ-সমাজের সঙ্গেই গণপতির সম্পর্ক।

কিন্তু ভারতবর্ষে রাষ্ট্রশক্তির পাশাপাশিই ওই গণ-সমাজও টিকে থেকেছে,—সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সমাজ-পরিবর্তন একতালে ঘটেনি। রাষ্ট্রশক্তির দেখা দেবার পর তার অধিনায়কেরা আশেপাশের গণ-সমাজকে কীরকম বিষনজরে দেখেছিলেন তার নমুনা মহাভারত এবং অর্থশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করবো। আর, তাঁদের এই মনোভাব থেকেই মূলসূত্র পাওয়া যাবে গণেশ সম্বন্ধে এককালের ওই বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণাকে বোঝবার: যাজ্ঞবল্ক্যের বিনায়ক-আতঙ্ক আর কৌটিল্যের সংঘবৃত্ত হয়তো সম্পর্কহীন নয়। অবশ্য, এই বিঘ্নরাজ বিনায়কই যে শেষ পর্যন্ত কী করে সিদ্ধিদাতার সম্মান পেলেন সে-সমস্যা স্বতন্ত্র। গণচিত্তকে তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যেই এই গণদেবতাকে গ্রহণ করা হয়েছিলো—এমনতরো সমাধান সহজ হলেও সন্তোষজনক নয়। কেননা, বিনায়ক এক ছিলেন না, বহু। কখনো তাঁর চেহারায় হাতির চিহ্ন, কখনো তাঁর নামে সাপের চিহ্ন, ষাঁড়ের চিহ্ন, কিংবা হয়তো আরো অন্যরকম। উদ্দেশ্যটা যদি গণচিত্তকে তোষণ করাই হয়—যদিও অবশ্য একথার অর্থ খুব স্পষ্ট নয়,—তাহলে ওই বহুবিনায়কের মধ্যে এক-বিনায়ককে কেন বেছে নেওয়া হলো সে-প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যায় না। তাছাড়া, বিঘ্নরাজ বিনায়ক এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের মধ্যে যে-মৌলিক প্রভেদ আছে তাও এই মতবাদ ঠিকমতো গ্রাহ্য করে না। তাই, গণনায়কের পক্ষে সিদ্ধিদাতা গণেশ হয়ে যাওয়ার সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল ও

কঠিন। আজকের দিনেই হয়তো এ-সমস্যার সমাধান করা যাবে না; কিন্তু তার থেকেই প্রমাণ হবে না যে, আগামীকালের উন্নততর গবেষণার ভিত্তিতেও সে-সমাধান সুদূরপরাহত থেকে যাবে। আমরা শুধু এইটুকুই দেখাবার চেষ্টা করবো যে, এই সমস্যার সঙ্গে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান-কাহিনীর সম্পর্ক রয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাগ্-বিভক্ত সমাজ ভেঙে রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান কী করে হলো ঠিক এই বিষয়ে গবেষণা এখনো হয়নি। আজই হোক বা আগামীকালই হোক, আমাদের ঐতিহাসিকদের এ-বিষয়ে মনোনিয়োগ করতে হবে।

কিন্তু আপাতত যে-বিষয়টির দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই: গণপতির ইতিহাসে ওই বিঘ্নরাজ-চরিতের চেয়েও পুরোনো একটি পরিচ্ছেদ আছে। তার প্রমাণ ঋগ্বেদ, তার প্রমাণ যজুর্বেদ—মানবগৃহ্যসূত্র বা যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির চেয়েও অনেক আগেকার সাহিত্য।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে[৩০],—অর্থাৎ, আধুনিক পণ্ডিতদের হিসেবে ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে,—দেখতে পাওয়া যায় গৃৎসমদ ঋষি গান রচনা করেছেন:

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে
কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পতে
আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্॥

অর্থাৎ,

হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি গণগুলির মধ্যে গণপতি, কবিগণের মধ্যে কবি, সমস্ত অন্নের উপমাস্বরূপ অন্ন যাঁদের আছে তুমি তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠদের মধ্যে তুমি বিরাজমান, তুমি মন্ত্রসমূহের স্বামী। তুমি আমাদের আহ্বান শ্রবণ করে আশ্রয় প্রদানার্থ যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে এই গান ছান্দোগ্যের সেই কুকুরগুলির গান মনে পড়িয়ে দেয়। কেননা, এখানেও অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী ধ্যানধারণার পরিচয় নেই, তার বদলে এ-গানের মূলে রয়েছে অন্নকামনাই: শ্রব মানে অন্ন এবং সায়ন বলছেন ব্রহ্মণস্পতি শব্দে ওই ব্রহ্মন্ বলে কথাটি অন্নবাচকই: ব্রহ্মণঃ অন্নস্য পরিবৃঢ়স্য কর্মণো বা পতে পালয়িতঃ। অবশ্যই, ব্রহ্মণস্পতির অর্থ নিয়ে আমাদের পক্ষে পরে দীর্ঘতর আলোচনা তোলবার দরকার পড়বে, কেননা, দেশের ঐতিহ্য অনুসারে এই ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতিই হলেন লোকায়ত-দর্শনের আদিগুরু। তাই, আমরা এই নামটির আলোচনায় পরে ফিরবো। আপাতত বৈদিক সাহিত্যেই গণপতির আদি-রূপটির দিকেই দৃষ্টি রাখা যাক।

বাজসনেয়ী সংহিতায়[১১] দেখা যায় অশ্বমেধযজ্ঞ প্রসঙ্গে মেয়েরা দল বেঁধে গান গাইছে :

গণানাং ত্বাং গণপতিং হবামহে ॥
প্রিয়ানাং ত্বাং প্রিয়পতিং হবামহে ॥
নিধীনাং ত্বাং নিধিপতিং হবামহে ॥

অর্থাৎ,
গণদের মধ্যে তুমি গণপতি, আমরা তোমার যজ্ঞ করি। প্রিয়দের মধ্যে তুমি প্রিয়পতি, আমরা তোমার যজ্ঞ করি। নিধিদের মধ্যে তুমি নিধিপতি, আমরা তোমার যজ্ঞ করি।

এই গানে নিধি শব্দটির প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখলে সন্দেহ করা যেতে পারে যে, এখানে প্রাগ্‌-বিভক্ত সমাজের,—ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দেবার আগেকার পর্যায়ের—স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। মনিয়ার উইলিয়মস্‌[১২] বলছেন, সংহিতা সাহিত্যে নিধি শব্দ *store, hoard, treasure,* ইত্যাদি বুঝিয়েছে; 'ধা' ধাতু (*to deposit*) থেকে শব্দটির নিষ্পত্তি। নিধি বলতে তাই এক জায়গায় জমা করা ধনসম্পত্তি বোঝায়। কিন্তু কার ধনসম্পত্তি? উত্তর-যুগের পৌরাণিক সাহিত্য আর আইনের বই থেকে সন্দেহ হয় এ হলো এমন ধনসম্পত্তি যার উপর কারুর ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। পৌরাণিক সাহিত্যে[১৩] সাধারণত ন'জন (কখনো আটজন) নিধির উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের নামগুলিতেই টোটেম্‌-বিশ্বাসের—অতএব আদিম সমাজের—চিহ্ন টিকে রয়েছে : পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। পৌরাণিক সাহিত্যে যদিও এই নিধিদের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে কুবের বা লক্ষ্মীর অনুচর হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে তবুও অনুমিত হয় এ-কল্পনার পিছনে কোনো-না-কোনো বাস্তব সমাজ-পরিবেশ এককালে ছিলো। কিন্তু তার চেয়েও চিত্তাকর্ষক হলো আইনের পুঁথিগুলির সাক্ষ্য। কেননা, আইনের বই[১৪] থেকে এটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, নিধি হলো এমন ধনরত্ন যার উপর কারুর ব্যক্তিগত স্বামিত্ব নেই। অবশ্যই, এ-যুগে আমরা যাকে চিরপ্রনষ্ট স্বামীক (গুপ্তধন?) বলি মিতাক্ষরা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত একালের আইনের বইতে নিধি বলতে হয়তো তাই-ই বুঝিয়েছে; কিন্তু এ-কথা কল্পনা করা সত্যিই কঠিন যে, বাজসনেয়ী সংহিতার যুগেও এ-ধরনের গুপ্তধনের বাস্তব সম্ভাবনা ছিলো[১৫]। তাই, সেকালের স্বামীবিহীন সম্পদকে প্রাচীন সমাজের যৌথ-সম্পদ মনে করবার অবকাশ আছে—উত্তরকালের আইনকর্তাদের রচনাতেও নিধি শব্দ থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাবসূচক তাৎপর্যটা মুছে যায়নি। কিন্তু তাঁদের সমাজে

এ-হেন সম্পত্তি বলতে যৌথ-সম্পদ নয়—মালিকহীন সম্পত্তি বলতে শুধুমাত্র প্রনষ্টস্বামীক সম্পদ।

সংহিতার এই দুটি উদ্ধৃতিতে আমরা বিশেষ করে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলাম : প্রথমটিতে প্রাগ্‌-অধ্যাত্মবাদী চেতনার স্মৃতি ; দ্বিতীয়টিতে প্রাগ্‌-ব্যক্তিগত-সম্পত্তির পর্যায়ের স্মৃতি। আমাদের মূল যুক্তি অনুসারে দু'-এর মধ্যে যোগাযোগ আছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ এবং অধ্যাত্মবাদী চেতনার বিকাশ সম্পর্কহীন নয়। এবং আমাদের কাছেও গণেশ সত্যিই যেন সিদ্ধিদাতা : তাঁর ইতিহাস অনুসন্ধান করতে করতে আমরা সমাজ-বিকাশের এমন এক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যাই যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়নি এবং সেই সঙ্গেই আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি, অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী ধ্যানধারণারও নয়!

তাই, গণপতির প্রসঙ্গ ছেড়ে যাওয়া চলবে না। তাঁরই কথায় ফিরে আসা যাক।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি আশ্চর্য ঘটনা বারবার চোখে পড়ে। যে-কোনো কারণেই হোক, এদেশে রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কেরা বৈদিক ঐতিহ্যের গরিমা চেয়েছিলেন। এমনকি, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালেও শূদ্র শিবাজী রাষ্ট্রশক্তি লাভ করবার পর কাশী থেকে গার্গভট্ট বলে জনৈক পণ্ডিতকে আনিয়ে তাঁর সাহায্যে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করবার ব্যবস্থা করলেন[৭৭]।

এবং, বৈদিক-গরিমা-লোলুপ রাষ্ট্রশক্তির এই অধিনায়কেরাই গণ-সমাজ সম্বন্ধে বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণায় মুখর হয়েছিলেন।

ফলে, ওই বৈদিক মানুষদেরও যে একটা অতীত ছিলো,—তাঁরাও যে এককালে গণ-সমাজেই বাস করতেন,—এ-কথা আমরা আজকের দিনে প্রায়ই ভুলে যাই। অথচ, তারই স্মৃতি টিকে রয়েছে সংহিতার উদ্ধৃতি দুটির মধ্যে। তাই, আমরা আগে যে যুক্তির উল্লেখ করেছি এখানে তারই পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন : আর্য-অনার্য মতবাদের সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করবার চেষ্টায় একটা বিপদ হলো, ওই আর্যদেরই অতীত ইতিহাসটাকে ভুলে যাবার বা ভুল বোঝবার সম্ভাবনা থাকে। কেননা, আর্যদের রচনায় সেই অতীতের যে-কোনো স্মৃতিচিহ্ন দেখলেই তা অনার্যদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছিলো বলে ব্যাখ্যা করবার ঝোঁক এসে যায়। গণপতির ক্ষেত্রেই ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের রচনা এই ঝোঁকের একটি দৃষ্টান্ত : এদেশের অনার্য অধিবাসীদের যেন খুশি করবার জন্যেই বৈদিক আর্যরা অনার্য গণপতিটিকে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের যুক্তি হলো, তা না হতেও পারে। এককালে তাঁরা নিজেদেরই খুশি করবার জন্যে গণপতি নিয়ে গান

রচনা করেছিলেন। কেননা, পৃথিবীর বাকি সব মানুষের মতোই এই আর্যরাও এককালে গণ-সমাজেই বাস করতেন—তার চিহ্ন বৈদিক সাহিত্য থেকে বিলুপ্ত হয়নি।

সংক্ষেপে: গণপতির ইতিহাসে মোটের উপর তিনটি পর্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এক: প্রাগ্‌-বিভক্ত সমাজের স্মৃতি বহন করে এককালে বৈদিক মানুষেরাই গণপতিকে নিয়ে গান রচনা করেছিলেন। দুই: শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে রাজনীতির গ্রন্থে কৌটিল্য ওই গণ-সমাজের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেন এবং আইনের গ্রন্থে যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ গণপতিকে দেখলেন বিষনজরে—কেননা, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সামাজিক পরিবর্তন একতালে ঘটেনি, শ্রেণীসমাজের আশপাশেই বেঁচে ছিলো প্রাগ্‌-বিভক্ত গণসমাজ। তিন: বহু বিনায়কের মধ্যে গজাননধারী একটি নির্দিষ্ট বিনায়ক সিদ্ধিদাতা দেবতা হিসেবে ঘোষিত হলেন এবং বহুভাবে তাঁর এই নব রূপটির প্রচার করা হলো। গণপতির ইতিহাসের এই তিনটি পর্যায়ের সঙ্গে আদিম সাম্যসমাজ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি পর্যন্ত সুদীর্ঘ সমাজ-ইতিহাসের সম্পর্ক রয়েছে। শুধু তাই নয়। সম্পর্ক রয়েছে লোকায়তিক চেতনার স্তর থেকে অধ্যাত্মবাদের বিকাশ পর্যন্ত ধ্যানধারণার ইতিহাসেরও।

গণপতিরই আর একটি নাম হলো লোকবন্ধু, লোকনাথ[৭৭]। লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস-সন্ধানে আমরা তাই এই লোকবন্ধুরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবার পণ করেছি। সে-পথে এগোতে গেলে সর্বপ্রথম নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলতে হয়: গণ মানে কী? কেননা, গণনায়ক শুধুই গণের নায়ক নন, তাঁর একটি নামই হলো গণ—শুধু গণ। তাই গণের রহস্য না বুঝলে গণনায়কের রহস্য বোঝা যাবে না।

গণ মানে কী? কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল ও রমেশচন্দ্র মজুমদার

গণ মানে কী? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া সত্যিই তেমন দুরূহ হওয়া উচিত নয়। কেননা, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র রেখে যাবার ব্যাপারে প্রাচীনেরা মোটেই কৃপণ ছিলেন না। তবু এ-কথাও ঠিক যে, শুধুমাত্র ওই দলিলগুলির শব্দার্থের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে গণকে বোঝবার চেষ্টা একপেশে, অতএব ভুলও হতে পারে। তার কারণটা খুব জটিল নয়। দলিলগুলির উপর চোখ

বোলালেই বুঝতে পারা যায় গণ ছিলো সেকালের কোনো একরকম সমাজ-সংগঠন। তাই, গণকে বুঝতে হলে সংস্কারমুক্ত সমাজবিজ্ঞানের সাহায্যও প্রয়োজন।

এই সংস্কারমুক্তির কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, শুধু যে সেকালের রচনাই সেকালের সামাজিক-পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য তাই নয়, সেকালের রচনা সম্বন্ধে একালের মনোভাবটিও একালের সামাজিক-পরিস্থিতির প্রভাব নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। কারণ, সেকাল নিয়ে গবেষণা করলেও একালের ঐতিহাসিক হাজার হোক একালেরই মানুষ। এবং, একালের মানুষ হিসেবে তাঁর মনে একালের প্রয়োজন নানারকম সংস্কার সৃষ্টি করতে বাধ্য। তাই, আধুনিক ঐতিহাসিকের লেখনী পুরোনো দলিলপত্রের ব্যাখ্যা দেবার সময় সেগুলিকে আধুনিক যুগের আশা-আকাঙ্খায় রঞ্জিত করবার প্রলোভনে পড়তে পারে। এ-ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক হবার একমাত্র পথ হলো, আধুনিক যুগের আশা-আকাঙ্খাগুলিকে সচেতনভাবে সমালোচনা করবার প্রচেষ্টা[২৮]।

কথাটা বিশেষ করে কেন উঠলো তাই বলি। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা গণ নিয়ে গবেষণা বড়ো কম করেননি। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের "হিন্দু পলিটি" এবং অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের "কর্পোরেট লাইফ ইন্ এন্সেণ্ট ইণ্ডিয়া",—বিশেষ করে প্রথম বইটির নাম—উল্লেখ না করলেই নয়। এই বই দুটিতে তাঁরা প্রাচীনদের কাছ থেকে পাওয়া গণ-সংক্রান্ত বহু তথ্য একত্রিত করেছেন—বস্তুত, তাঁদের ওই পরিশ্রমই আমাদের পক্ষে গণ নিয়ে আলোচনার পথ সুগম করেছে। তবুও তাঁরা যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন তা আমাদের কাছে স্বীকার-যোগ্য মনে হয়নি। তার কারণ, তাঁদের ঐতিহাসিক দক্ষতার অভাব নয়, তাঁদের মনের উপর আধুনিক যুগের এক নির্দিষ্ট আশা-আকাঙ্খার প্রভাব। কেননা, তাঁদের গবেষণার পিছনে স্পষ্ট প্রেরণা হলো একটি নির্দিষ্ট যুগের একটি নির্দিষ্ট রাজনীতির। এই রাজনীতির সাময়িকতা ও সংকীর্ণতা তাঁদের সিদ্ধান্তকেও সাময়িক মূল্য দিয়েছে ও সংকীর্ণ করেছে।

কথাটা এমনি শুনলে হয়তো সন্দেহজনক মনে হবে। অথচ, তথ্যের দিক থেকে তাঁদের গবেষণার পিছনে তাঁদের সময়কার রাজনীতির দাবিটা সত্যিই অস্পষ্ট নয়।

প্রথমত, জয়সওয়াল আর মজুমদারের আগেও অনেক বড়ো বড়ো বিদ্বান প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে অনেক বড়ো বড়ো বই রচনা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই বইগুলিতে গণ-এর তাৎপর্য-বিচারের চেষ্টা নেই বললেই চলে। জয়সওয়াল ও মজুমদারের রচনাই সর্বপ্রথম বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করলো, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে সম্যক-

ভাবে বুঝতে হলে গণ-এর তাৎপর্য বিচার করবার প্রয়োজন আছে। এ-ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কারণ, আগেই বলেছি, প্রাচীন পুঁথিপত্রে গণ-সংক্রান্ত যে-মালমশলা মজুত আছে তার পরিমাণ বড়ো কম নয়। তাই, আগেকার স্বনামধন্য ঐতিহাসিকদের পক্ষে সেগুলিকে উপেক্ষা করাও তুচ্ছ ঘটনা নয়। গণ-এর প্রতি তাঁদের নজর না পড়বার কারণ হলো তাঁদের পক্ষে গণকে বোঝবার তাগিদই ছিলো না। অথচ, গণ-এর প্রতি আলোচ্য ঐতিহাসিক দু'জনের দৃষ্টি পড়লো, কেননা, দৃষ্টি পড়বার স্পষ্ট তাগিদ ছিলো। তাগিদটি ঠিক কী রকম তা বোঝবার জন্যে আমাদের জাতীয়-সংগ্রামের ইতিহাসের একটি পর্যায়ের কথা মনে রাখতে হবে।

বই দুটির রচনাকাল কী? অধ্যাপক জয়সওয়ালের বই প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৪-এ। কিন্তু লেখা কয়েক বছর আগেকার। প্রকাশিত হতে দেরি হবার অপ্রীতিকর কারণ লেখক ভূমিকায় ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক মজুমদারের বইটির রচনাকালও আনুমানিক একই রকম, ১৯১৯-এর কিছু আগে হবে।

এই সময়টা বরাবর ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অবস্থাটা ভেবে দেখা যাক। জাতীয় কংগ্রেসের কণ্ঠে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দাবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯১৯-এর প্রস্তাবে[**] ঘোষণা করা হলো, স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে দেশে সাধারণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র চাই। অবশ্যই, এ-দাবির প্রতিষেধক হিসেবে ইংরেজ শাসকেরা পাইক-পেয়াদা থেকে অর্ডিন্যান্স-গোয়েন্দা পর্যন্ত কোনো অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি করেননি।

কিন্তু তাছাড়াও দেশের জনমতকে ধোঁকা দেবার জন্যে দরকার ছিলো ইতিহাসের দোহাই। ও-তরফের পণ্ডিতেরা তাই আমাদের বারবার বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, ভারতবর্ষে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কথাই ওঠে না,—ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে তার কোনো নজির নেই। বিদেশী শাসকদের মুখপাত্রেরা তাই প্রমাণ করছিলেন, সাধারণতান্ত্রিক স্বায়ত্ব-শাসনের দাবিটা আমাদের পক্ষে নেহাতই বিজাতীয় উৎসাহের পরিচায়ক।

ফলে, জাতীয় আন্দোলনের তরফ থেকেও ঐতিহাসিক গবেষণা যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠবে তাতে বিস্ময়ের অবকাশ নেই। তাগিদ পড়লো দেশের অতীত খুঁড়ে পাল্টা নজির খুঁজে বের করবার। আর, এই কারণেই ঐতিহাসিকদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো উপেক্ষিত ও অবহেলিত গণগুলির দিকে। পাল্টা নজির হিসেবে ওই গণ-এর সাক্ষ্য সত্যিই দুর্মূল্য। কেননা, গণ বলতে আসলে যাই বোঝাক না কেন, এ-বিষয়ে এতোটুকুও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তা একরকমের সমাজসংগঠন এবং তার মধ্যে সাধারণতান্ত্রিক স্বায়ত্বশাসনের আয়োজন সত্যিই ষোলো আনা।

বই-এর ভূমিকায়[১০০] অধ্যাপক জয়সওয়াল সানন্দে ঘোষণা করলেন, স্যর শঙ্কর নায়ার ভারতসরকারের কাছে গঠনতান্ত্রিক সংশোধনের প্রথম সুপারিশে (৫ই মার্চ, ১৯১৭) বইটির পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর, বইটির রচনা-সময়েই লেখক যে গণতান্ত্রিক সংশোধন-বিষয়ে কতোখানি হুশিয়ার ছিলেন তা বইটির সূচীপত্রের উপর একবার চোখ বোলালেই বুঝতে পারা যায়। তাঁর ভারত-আবিষ্কার থেকে সাধারণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রমূলক কোনো রকম খুঁটিনাটির হিসেবই বাদ পড়েনি: লোকসভার আসন, কোরাম, হুইপ, ভোট, অনুপস্থিতের ভোট, ব্যালট ভোট, সংখ্যা-গরিষ্ঠ সংক্রান্ত নীতি, প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতি, ভোটের অধিকার, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, নাগরিকের অধিকার,—এক কথায়, জাতীয় কংগ্রেস তখন যে-গঠনতন্ত্র চেয়েছে তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত।

অধ্যাপক মজুমদারের বই-এর মূলেও এই রাজনৈতিক প্রেরণা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। বইটি সম্বন্ধে স্বদেশী পত্রিকাগুলির প্রতিক্রিয়া থেকেই তা অনুমান করা যায়। অধ্যাপক মজুমদারের বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মডার্ন রিভিউ[১০১] উচ্ছ্বাস করে বললো: ইতিহাসকে অস্বীকার করে যাঁরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, স্বায়ত্বশাসনে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য জাতিদেরই একচেটিয়া অধিকার তাঁদের যুক্তিকে এ-বই একবারে নস্যাৎ করে দেবে। অমৃতবাজার পত্রিকা[১০২] সগর্বে ঘোষণা করলো: ফিরিঙ্গি ভায়ারা তো বার-বার তর্ক তুলে বলেন যে, গণতান্ত্রিক পরীক্ষা ভারতবর্ষে চলবে না—এই বই তাঁদের একেবারে মুখের মতো জবাব হয়েছে।

ঐতিহাসিক আবিষ্কারের পিছনে সমসাময়িক রাজনীতির প্রেরণাটা এতোটুকুও অস্পষ্ট নয়।

আমাদের যুক্তি হলো, সেকাল সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেও একালের ঐতিহাসিক যেহেতু অনিবার্যভাবেই একালের আশা-আকাঙ্খার দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য সেই হেতু নৈর্ব্যক্তিক হবার একমাত্র পথ একালের ওই ধ্যানধারণাগুলিকে সচেতনভাবে সমালোচনা করবার প্রচেষ্টা। তাই, গণ-সংক্রান্ত আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণাকে গ্রহণ করবার আগে তাঁদের ওই রাজনৈতিক প্রেরণার সমালোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় জেনেছি, ওই রাজনীতির আসল অবদানই বা কোথায় আর সংকীর্ণতাই বা ঠিক কী। গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের দাবিতে নিশ্চয়ই অগ্রগতির স্বাক্ষর ছিলো। অপরপক্ষে, জনসাধারণের মধ্যে সাম্যজীবনের চাহিদাকে উপেক্ষা করাই এ-রাজনীতির প্রকৃত সংকীর্ণতা। উক্ত রাজনীতির প্রেরণায় যে ঐতিহাসিক গবেষণা

তার বেলাতেও একই কথা। ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি যুক্তির বিরুদ্ধে দেশের ইতিহাস থেকে গণতান্ত্রিক স্বায়ত্বশাসনের ঐতিহ্যকে তুলে ধরবার চেষ্টা এঁদের গবেষণার প্রকৃত গৌরব। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত দেশের মানুষের মতোই ভারতবর্ষের মানুষও যে এককালে আদিম সাম্য সমাজে বাস করেছে সে-বিষয়ে চেতনার অভাব এঁদের গবেষণার প্রকৃত সংকীর্ণতা। বস্তুত, আমরা বহু প্রমাণের সাহায্যে একটু পরেই দেখতে পাবো, গণ শব্দের আদি-তাৎপর্য অভ্রান্তভাবেই ওই আদিম সাম্যসমাজ। অথচ, দেশের ঐতিহ্যে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নজির খোঁজবার প্রেরণায় উভয় ঐতিহাসিকই গণকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এঁদের প্রধান যুক্তি হলো, গণকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে মানতেই হবে, কেননা, গণ-এর মধ্যে গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ আয়োজন রয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র গণতন্ত্রের লক্ষণ থেকেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রমাণ হয় না। মর্গানের[১০৩] গবেষণার সাহায্য গ্রহণ করলে এঁরা অনায়াসেই দেখতে পেতেন, প্রাগ্-বিভক্ত প্রাচীন সমাজে গণতন্ত্রের ষোলো আনা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রশক্তির পরিচয় নেই। ওই একান্ত গণতান্ত্রিক সাম্যসমাজের ধ্বংসস্তূপের উপরই রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হয়েছে।

গণ বলতে প্রাচীনেরা সত্যিই যদি এ-হেন প্রাগ্-বিভক্ত আদিম সাম্য-সমাজ বুঝে থাকেন তাহলে জাতীয় কংগ্রেসের একটি নির্দিষ্ট দাবির মধ্যে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রেরণাকে আবদ্ধ রেখে এই গণ-সমাজের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অধ্যাপক জয়সওয়াল ও অধ্যাপক মজুমদারের সিদ্ধান্ত তাই অনিবার্যভাবেই বিজ্ঞান-ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত হয়েছে। গণ-এর অর্থবিচার এবং প্রাচীন সমাজে গণতন্ত্রের আয়োজন নিয়ে আলোচনা সুদীর্ঘ হবে। এখানে শুধু নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যায় একটি নির্দিষ্ট রাজনীতির প্রেরণার ফলে অতো বড়ো বড়ো ঐতিহাসিকেরাও কী রকম কাল্পনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

মহাভারতের সভাপর্বে[১০৪] নকুলের দিগ্বিজয়-বর্ণনার এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, যুদ্ধে পৌরব ও পর্বতবাসী দস্যুদের পরাস্ত করবার পর উৎসব-সংকেত নামের সাতটি গণ তিনি জয় করলেন।

> পৌরবং যুধি নির্জিত্য দস্যূন্ পর্বতবাসিনঃ।
> গণানুৎসবসংকেতানজয়ৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ॥

তাহলে এখানে সেকালের সাতটি গণ-এর কথা পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলির:

সমবেত নাম হলো উৎসব-সংকেত। প্রশ্ন হলো, উৎসব-সংকেত মানে কী? টীকাকার নীলকণ্ঠ বলছেন:

> উৎসবসংকেতানাং স্ত্রী-পুরুষয়োঃ পরস্পরপ্রীতিরেব রত্যর্থং সংকেতঃ। ন তু দাম্পত্যব্যবস্থা। পশূনামিব যত্রাস্তীত্যর্থঃ।
>
> অর্থাৎ, এই উৎসব-সংকেতদের বেলায় স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রীতিই হলো রতিসম্পর্কের সংকেত। এদের মধ্যে দাম্পত্যব্যবস্থা নেই। তাই, এদের যৌন-জীবন পশুদের মতোই নির্বিচার।

মনিয়ার উইলিয়মস্-এর অভিধান অনুসারে সংকেত কথার শব্দার্থ হলো এন্‌গেজমেন্ট। উৎসব শব্দটিকে আমরা আজকাল যে-অর্থে বুঝি এখানেও যদি সেই অর্থে গ্রহণ করবার অবকাশ থাকে তাহলে আধুনিক নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সঙ্গেও সামঞ্জস্য থাকে। কেননা, প্রাগ্-বিভক্ত উপজাতি-সমাজে 'উৎসবে'র সঙ্গেই 'রত্যর্থং সংকেতঃ' দেখা যায়। কিন্তু আপাতত সে-আলোচনা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেলো। তাহলেও এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, নীলকণ্ঠ দাম্পত্য-জীবন বলতে স্ত্রী-পুরুষের যে-সম্পর্ককে সমাজ সঙ্গত বলে মনে করতেন এই গণগুলির মধ্যে তার অভাব ছিলো। অবশ্যই, নীলকণ্ঠ যদি তাঁর সমসাময়িক নীতিবোধের তাড়নায় "পশূনামিব যত্রাস্তীত্যর্থঃ" বলে গালাগাল না দিয়ে ওই প্রাগ্-দাম্পত্য সম্পর্কের স্পষ্টতর বিবরণ দিতেন তাহলে এই গণগুলি প্রাগ্-বিভক্ত সমাজের ঠিক কোন পর্যায়ে ছিলো তা মর্গানের গবেষণার আলোয় অনুমান হয়তো করা যেতো। কেননা, মর্গান দেখিয়েছেন, প্রাচীন প্রাগ্-বিভক্ত সমাজে শুধুই যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রশক্তির অভাব তাই নয়, উত্তরকালের দাম্পত্য-ব্যবস্থারও অভাব আছে এবং অবশ্যই ওই প্রাগ্-বিভক্ত সমাজেরও ইতিহাস আছে এবং সে-ইতিহাসের পর্যায়ভেদের সঙ্গে নরনারীর সম্পর্কেও প্রভেদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এখানে অতো খুঁটিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছবার অবকাশ না থাকলেও এটুকু নিশ্চয়ই বলা চলে যে, উত্তরকালের সংজ্ঞা অনুসারে যা দাম্পত্য-ব্যবস্থা (অর্থাৎ, এক-বিবাহ বা মনোগ্যামী) নীলকণ্ঠের বর্ণনা অনুসারে উৎসব-সংকেতদের মধ্যে যেহেতু তার অভাব সেই হেতু এই গণগুলিকে প্রাগ্-বিভক্ত সমাজের কোনো এক পর্যায় বলে না মেনে উপায় নেই।

কিন্তু অধ্যাপক জয়সওয়ালের পক্ষে এই মূল্যবান সূত্রটি অনুসরণ করবার কথাই ওঠে না। তার কারণ, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো প্রাচীন ভারতে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আবিষ্কার করা। তাই, তিনি বিনা দ্বিধায় লিখলেন…

> The Utasava-Sanketas were republicans, probably founded by two men Utasava and Sanketa. We may, however, point out that *sanketa* is a technical term denoting an act or resolution passed by a republic and it is just possible that *sanketa* here originally denoted a state founded by a resoultion of the Utasavas.
>
> অর্থাৎ, উৎসব সংকেতগুলি প্রজাতান্ত্রিক ছিলো, খুব সম্ভব উৎসব ও সংকেত নামের দুই ব্যক্তি সেগুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু এখানে বলে রাখা যায় যে, সংকেত একটি পারিভাষিক শব্দ, তার অর্থ হলো প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গৃহীত প্রস্তাব। এবং এও নিশ্চয়ই সম্ভব যে, সংকেত বলতে এখানে এমন এক রাষ্ট্র বোঝানো হয়েছে যা উৎসবদের গ্রহণ করা প্রস্তাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

অতো বড়ো একজন ঐতিহাসিকের রচনায় এ-রকম আবোল-তাবোল কথা পড়লে দুঃখিত হতে হয়। অথচ, সমসাময়িক কোনো আশা-আকাঙ্খাকে ঐতিহাসিক গবেষণার একমাত্র প্রেরণা বলে গ্রহণ করলে শেষ পর্যন্ত এ-ভাবে বিজ্ঞান ভ্রষ্ট না হয়েই বা উপায় কী।

গণ মানে কী? শব্দার্থ বিচার

তাহলে, নিজেদের সাময়িক ধ্যানধারণা ও আশা-আকাঙ্খাকে সচেতন-ভাবে সমালোচনা করেই গণ-এর তাৎপর্য অন্বেষণে অগ্রসর হতে হবে।

গণ প্রসঙ্গে প্রাচীন পুঁথিপত্রে নানা রকম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে সেগুলির অর্থ-বিচার করা দরকার।

মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কানে[১০৬] বলছেন, কাত্যায়নের মতে গণ, শ্রেণী, ব্রাত, পূগ, সংঘ ও পাষণ্ড এই ক'টি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—অর্থটা হলো সমূহ বা বর্গ। মহামহোপাধ্যায় কাত্যায়ন থেকে উদ্ধৃত করছেন: গণাঃ পাষণ্ডপূগাশ্চ ব্রাতাশ্চ শ্রেণয়স্তথা, সমূহাখ্যাশ্চ যে চান্যে বর্গাখ্যাস্তে বৃহস্পতিঃ। এবং, মহামহোপাধ্যায়[১০৭] বলছেন, এই শব্দগুলি বৈদিক সাহিত্যেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, কিন্তু সেখানে এগুলি শুধু সাধারণভাবে সমূহবাচক (*a group*),—তার চেয়ে আর কোনো বিশিষ্ট অর্থ এগুলির নেই।

পাণিনিও[১০৮] পূগ, গণ, সংঘ এবং ব্রাত শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁর ভাষ্যকারেরা এই শব্দগুলিকে আরো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন।

পাণিনি : ব্রাতেন জীবতি।
মহাভাষ্য : নানাজাতীয়া অনিয়তবৃত্তয় উৎসেধজীবিনঃ সঙ্ঘা ব্রাতাঃ। তেষাং কর্ম ব্রাতং। তেন ব্রাতকর্মণা জীবতীতি ব্রাতীনঃ।
কাশিকা : নানাজাতীয়া অনিয়তবৃত্তয়োঽর্থকামপ্রধানাঃ সঙ্ঘাঃ পুগাঃ।

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্রাত প্রভৃতি শব্দের অর্থে মূল ঝোঁকটা সমূহত্বের (যৌথ-জীবনের) উপরই। তবুও, ভাষ্যকারদের কয়েকটি কথার শব্দার্থ সম্বন্ধে খুঁটিয়ে ভাবা দরকার। যেহেতু সমূহ-জীবনের পর্যায়ে জাতিভেদ দেখা দেওয়া সমাজ-বিজ্ঞান অনুসারে স্বাভাবিক ঘটনা নয় (কেননা, জাতিভেদ প্রধানতই ভেদের কথা, আর তাই সমূহার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত), সেইহেতু ভাষ্যকারদের 'নানাজাতীয়' শব্দকে সাধারণভাবে 'নানা প্রকার' অর্থে গ্রহণ করাই উচিত নয় কি? এই মানের সঙ্গেই 'অনিয়ত বৃত্তি' শব্দাদিরও সঙ্গতি থাকা সম্ভব—কেননা, জাতিভেদের একটি লক্ষণই হলো বৃত্তি বা জীবিকা স্থিরনিশ্চিত বা নিয়ত হয়ে যাওয়া। তাছাড়া, ব্রাতকর্ম বলতেও পুরো দলের কাজকর্ম বোঝানোই সম্ভব—ব্রাতের মধ্যে যদি জাতিভেদ সত্যিই থাকে তাহলে ব্রাতকর্ম বলে একটি শব্দ ব্যবহার করা স্বাভাবিক নয়। এই কারণেই, মহামহোপাধ্যায় কানের[১০৯] ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। তিনি বলছেন : Vrātas are groups formed by *men of various castes* with no fixed means of livelihood but subsisting by the might (or strength) of their bodies (by bodily labour of various kinds)। আমাদের মন্তব্য হলো, গণ বা ব্রাত নামের ওই যৌথ-জীবনের ধ্বংসস্তূপের উপরই উত্তরযুগের জাতিভেদের ইমারত গড়ে ওঠা সম্ভবপর।

মহাভাষ্য ও কাশিকার উদ্ধৃত অংশ দুটির উপর নির্ভর করে আমরা এখানে লোকায়তিক ধ্যানধারণা-সংক্রান্ত আমাদের মূল যুক্তিরও পুনরুল্লেখ করতে চাই। কাশিকায় 'অর্থকামপ্রধানাঃ' বলে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—এখানে যেন লোকায়তিকদের পুরুষার্থের কথাই ব্রাতজীবীদের বিশেষণ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। আমাদের যুক্তি হলো, ব্রাত বা প্রাগ্-বিভক্ত যৌথ-জীবনে যে-হেতু কর্মজীবনের সঙ্গে মানব-চেতনার বিচ্ছেদ হয়নি সেই হেতুই অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের আবির্ভাবও সম্ভব নয়—তাই, সে-স্তরের চেতনাকে আধুনিক অর্থে বস্তুবাদীদর্শন বলা অসঙ্গত হলেও তা লোকায়তিক চেতনাই—ওই লোকায়তিক চেতনা যতো মূক, অব্যক্ত ও অচেতন হোক না কেন। এই প্রসঙ্গে ব্যাকরণ-সাহিত্যে ব্যবহৃত ওই উৎসেধজীবী শব্দটির তাৎপর্যও চিত্তাকর্ষক। মহামহোপাধ্যায় কানে উৎসেধজীবী বলতে শারীরিক শ্রমজীবীই

বোঝাতে চান এবং আধুনিক টীকাকারও বলছেন, 'শারীরিক শ্রমেন (ন তু বুদ্ধি বৈভবেন) জীবন্তি তে ব্রাতা'[১১০]।

তাহলে, ব্যাকরণ-সাহিত্যের দিক থেকেও প্রাগ্-বিভক্ত যৌথ-জীবন ও তার সঙ্গে শারীরিক শ্রম এবং অতএব অর্থকামপ্রধান (লোকায়তিক) চেতনার যোগাযোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি?

কিন্তু গণ, ব্রাত প্রভৃতি শব্দে যে ওই প্রাগ্-বিভক্ত যৌথ-সমাজই বোঝানো হয়েছে সে-আলোচনায় ফেরা যাক।

ম্যাকডোন্যাল্ড[১১১], উইল্‌সন্[১১২], মনিয়ার-উইলিয়মস্[১১৩] প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানেরাও গণ শব্দটির এই সমূহবাচকত্বের তাৎপর্য অনুসরণ করে ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করছেন: *community, corporation, association,* ইত্যাদি। মনিয়ার-উইলিয়মস্ তো সরাসরি *tribe* শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। এবং এ-জাতীয় অর্থনির্ণয়ের নমুনা ভারতীয় অভিধানেও দুর্লভ নয়। তাই, জে. এফ্. ফ্লিট[১১৪] সিদ্ধান্ত করেছিলেন:

> ...the word *gana* is given in Indian lexicons, with many other terms as primarily a synonym of *samuha* or *samgha,* of which the radical and leading idea is that of a 'gathering together, a collection'.
>
> ভারতীয় অভিধানে অন্যান্য কয়েকটি শব্দের সঙ্গে গণ শব্দটিকে সমূহ বা সঙ্ঘের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার প্রধান ও চূড়ান্ত অর্থ হলো একত্রিত হওয়া, যূথবদ্ধতা।

এবং, এই নজির থেকেই শ্রীযুক্ত ফ্লিট সরাসরি সিদ্ধান্ত করেন যে, গণ বলতে প্রাচীনেরা *tribe*-ই বুঝতেন[১১৫]। যদিও অবশ্য অন্যান্য বহু আধুনিক বিদ্বানের মতোই শ্রীযুক্ত ফ্লিটও ওই *tribe* শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী তা আলোচনা করেননি[১১৬]। তিনি যদি মর্গানের গবেষণা অনুসরণ করে সে-কথার আলোচনা করতে রাজী হতেন তাহলে তাঁকেও আদিম-সাম্যসমাজের প্রসঙ্গ তুলতে হতো। আমরা একটু পরে সে-প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করবো। তার আগে দেখা দরকার শ্রীযুক্ত ফ্লিট-এর এই ব্যাখ্যা কী ভাবে খণ্ডন করবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ওই চেষ্টা সত্যিই স্বীকারযোগ্য কি না।

রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়[১১৭] পাতার পর পাতা জুড়ে এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত জে. এফ্. ফ্লিটের সঙ্গে শ্রীযুক্ত এফ্. ডাব্লিউ. টমাসের সুদীর্ঘ বিতর্ক হয়েছিলো। বিতর্কের কারণ ছিলো দুটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার—শিলালিপি দুটি আনুমানিক পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর এবং

দুটি লিপিতেই 'গণ' শব্দের উল্লেখ দেখা গিয়েছিলো। শ্রীযুক্ত ফ্লিট এই গণ শব্দকে সরাসরি 'ট্রাইব' অর্থে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এ-তর্জমায় শ্রীযুক্ত টমাসের ঘোরতর আপত্তি ছিলো। তাঁর ধারণায়, গণ শব্দ সাধারণভাবে ট্রাইব না বুঝিয়ে ট্রাইব-সমাজের শাসক-গোষ্ঠীটুকুকেই *(governing body of the tribe)* বোঝায়। যদিও অবশ্য, মর্গানের গবেষণা অনুসরণ করলে পর দেখতে পাওয়া যায়, ট্রাইব-সমাজ সম্বন্ধে আমরা সাধারণভাবে যে-জ্ঞান পাই তার সঙ্গে শ্রীযুক্ত টমাস কল্পিত এই প্রভেদের সঙ্গতি নেই।

এ-বিতর্ক শুধুমাত্র ওই পাশ্চাত্য বিদ্বানদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো না। শ্রীযুক্ত ফ্লিট নজির দেখিয়েছিলেন স্যর ভাণ্ডারকরের রচনার, শ্রীযুক্ত টমাসকে সমর্থন জানালেন অধ্যাপক জয়সওয়াল[১১৮]।

এখানে আমরা বিশেষ করে অধ্যাপক জয়সওয়ালের যুক্তিরই আলোচনা করতে চাই। তার কারণ, আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে জোর দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, প্রাচীন সাহিত্যে গণ বলতে ট্রাইবের বদলে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই বুঝিয়েছিলো—এবং, এই মতবাদ আমাদের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। আমরা বলতে চাই, গণ বলতে প্রাগ্‌-বিভক্ত, অতএব প্রাক্‌-রাষ্ট্র, সমাজ-সংগঠনকে বুঝতে হবে। তাছাড়া, ফ্লিট-বনাম-টমাসের বিতর্কে তথ্য প্রভৃতির ভিত্তি সামান্যই ছিলো; অপরপক্ষে অধ্যাপক জয়সওয়াল আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রাচীন সাহিত্য থেকে বহু তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলিকে নতুন করে বিচার করলে শুধুই যে অধ্যাপক জয়সওয়ালের সিদ্ধান্ত বিচার করা হবে তাই নয়, আমাদের পক্ষে তথ্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার কাজও অনেক সহজ-সাধ্য হবে।

ব্যাকরণ-সাহিত্যে গণ এবং সঙ্ঘ বলে দুটি শব্দই যে একার্থবাচক, এ-কথা অধ্যাপক জয়সওয়ালও অস্বীকার করেন না। এ-বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই কাত্যায়নের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি—গণ, পূগ, পাষণ্ড, ব্রাত প্রভৃতি সমস্ত শব্দই সমূহ-বাচক। এবং অধ্যাপক জয়সওয়াল নিজেই বলছেন, পাণিনি গণ এবং সঙ্ঘ বলে দুটি শব্দকে একই অর্থে গ্রহণ করেছেন[১১৯]:

> Panini, dealing with the formation of the word *Samgha* in III. 3. 86 (সঙ্ঘোদ্‌ঘৌ গণ-প্রশংসয়োঃ) says that the word *Samgha* (as against the regular *Samghata* derived from *han*, III, 3. 76) is in the meaning of *gana*.

অর্থাৎ, পাণিনি সঙ্ঘ শব্দের নিষ্পত্তি আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন (সঙ্ঘোদ্‌ঘৌ

গণ-প্রশংসয়োঃ—৩, ৩, ৮৬) সঙ্ঘ বলতে গণ বোঝায়—হন্‌ ধাতু জাত সঙ্ঘাত নয়।

অধ্যাপক জয়সওয়াল এ-বিষয়ে বৌদ্ধ পুঁথিরও নিদর্শন তুলছেন—সেখানেও গণ এবং সঙ্ঘ শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে[২০]। সঙ্ঘ ও গণ-এর এই একার্থবাচকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, কৌটিল্যের সঙ্ঘবৃত্ত আলোচনা করবার সময় আমরা স্পষ্টই দেখতে পাবো, যে-সঙ্ঘগুলিকে ভাঙবার জন্যে তিনি নির্লজ্জতম পদ্ধতির নির্দেশ দিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছেন না সেগুলি ট্রাইব্যাল-সংগঠন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। অথচ, বিস্ময়ের কথা হলো, গণ ও সঙ্ঘের মধ্যে এই অভেদ প্রদর্শন করবার পরই অধ্যাপক জয়সওয়াল বলছেন[২১] :

> The term *gana* signified the form of Government. *Samgha* on the other hand signified the State.
>
> অর্থাৎ, গণ বলতে বুঝিয়েছিলো সরকারের রূপ; অপরপক্ষে সঙ্ঘ বলতে বুঝিয়েছিলো রাষ্ট্র।

এবং, সঙ্ঘ বা গণ বলতে ট্রাইব বোঝবার বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি দিচ্ছেন[২২] :

> Panini, we have seen, equates *Gana* with *Samgha.* No one would say that the word *samgha* can in any way be connected with tribe there. Again, new *ganas* were founded. Would that mean that *new* tribes were founded? Such a meaning would hardly deserve consideration.
>
> অর্থাৎ, আমরা দেখেছি, পাণিনি গণ এবং সঙ্ঘকে এক করেছেন। সেখানে সঙ্ঘ যে ট্রাইব-এর সঙ্গে কোনোভাবে সংযুক্ত, এ-কথা কেউই বলবেন না। তাছাড়া নতুন গণ প্রতিষ্ঠিত হতো। তার মানে কি এই হবে যে, নতুন ট্রাইব প্রতিষ্ঠিত হতো? এ-ধরনের মতবাদ আলোচনার যোগ্যই নয়।

কিন্তু কেন? বরং রাষ্ট্রের বেলায় শাসক-শাসিতের মধ্যে প্রভেদ আছে বলেই এবং গণ বা সঙ্ঘ একান্তভাবে সমূহার্থক বলেই, গণ বলতে রাষ্ট্র মনে করা কষ্ট-কল্পনার পরিচায়ক। অপরপক্ষে, নতুন গণ প্রতিষ্ঠিত হবার কথা এতোটুকুও অসম্ভব নয়[২৩]। বস্তুত, গণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জয়সওয়ালই আরো যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা থেকে গণকে ট্রাইব মনে করাই খুব স্বাভাবিক হয়। যেমন, বৌদ্ধ-পুঁথি[২৪] থেকে তিনি গণ-বন্ধন বলে শব্দ তুলছেন, জৈন-পুঁথি[২৫]

থেকে সচিত-সমূহ বলে আর একটি কথা তুলছেন। প্রথম শব্দটির অর্থ *group-bond* এবং দ্বিতীয়টির অর্থ *group-consciousness* হওয়াই সবচেয়ে স্বাভাবিক। এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বর্ণনায় এ-জাতীয় বিশেষণ প্রাসঙ্গিক না হওয়াই সম্ভবপর।

প্রাচীন ব্যাকরণ-সাহিত্যেই এই জাতীয় মানবগোষ্ঠীর যে-সব নাম পাওয়া যায় তা থেকেও ট্রাইব অর্থই অনুমান করা স্বাভাবিক মনে হয়। কয়েকটি নামের নমুনা[১২৬] : লৌহিত-ধ্বজাঃ, লৌহধ্বজাঃ, কৌণ্ডায়ন্যঃ, ব্রাধ্নায়ন্যঃ, কৌণ্ডীবৃষঃ, বার্কেণ্য, ঔলপয়ঃ (ভোঁদড় থেকে), ক্রোষ্টুকীয়ঃ (শিয়াল থেকে), শিবি, ইত্যাদি।

এই নামগুলির উৎসে টোটেম্-বিশ্বাস অনুমান করা কষ্টকর নয় এবং তার তাৎপর্য আর যাই হোক রাষ্ট্র হতে পারে না। অবশ্যই, তর্ক করে বলা যেতে পারে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে ওঠবার পরও টোটেমিক নাম টিকে থাকা সম্ভব। কিন্তু সুখের বিষয়, ব্যাকরণ-সাহিত্যে উল্লেখিত এই নামগুলির বেলায় সে-তর্কের অবকাশ সত্যিই নেই। কেননা, প্রাচীন সাহিত্যে শুধু এই নামগুলিই টিকে নেই,—ওই নামের মানবগোষ্ঠীর বর্ণনাও পাওয়া যায়। এবং সে-বর্ণনার মধ্যে প্রাগ্-রাষ্ট্র ট্রাইব-সমাজের ছবিই স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

এই বর্ণনা পাবার জন্যে ব্যাকরণ-সাহিত্য থেকে মহাভারতের দিকে এগোনো দরকার।

গণ মানে কী? মহাভারতের বর্ণনা

একরকম সঙ্ঘের বিশেষণ হিসেবে পাণিনি 'আয়ুধজীবী' শব্দ ব্যবহার করছেন। এ-শব্দের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা একটু পরেই তোলা যাবে। এই প্রসঙ্গেই পাণিনি[১২৭] খবর দিচ্ছেন যে, উক্ত সঙ্ঘগুলি বাহীক দেশস্থিত। এই বাহীক দেশস্থিত সঙ্ঘের বর্ণনা মহাভারতে বিস্তারিতভাবেই পাওয়া যায়। মহাভারতের বর্ণনায় এই মানুষগুলি সম্বন্ধে যে তীব্র ঘৃণার মনোভাব ফুটে উঠেছে তার কারণ নিয়ে আলোচনা অবশ্যই স্বতন্ত্র। আপাতত আমাদের প্রশ্ন হলো, এই বর্ণনার মধ্যে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ছবি পাওয়া যায়, না, আদিম সমাজের কোনো এক পর্যায়ের ছবি পাওয়া যায়? কালিপ্রসন্ন সিংহের[১২৮] তর্জমা থেকে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাক। কর্ণ বলছেন,

> হে মদ্ররাজ! আমি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ব্রাহ্মণ মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্রমন্দিরে বিবিধ বিচিত্র দেশ

ও পূর্বতন ভূপতিগণের বৃত্তান্ত কহিতেন। তথায় একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক ও মদ্রদেশোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূর প্রদেশে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধর্মবর্জিত অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।...আমি নিতান্ত নিগূঢ় কার্যানুরোধ বশতঃ বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তাহাদের ব্যবহার বিদিত হইয়াছি।...তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ীসুরা পান এবং লশুনের সহিত ভৃষ্ট যব, অপুপ ও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মাল্যচন্দন রহিত হইয়া নগরের গৃহপ্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চিৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপরপুরুষ বিবেক-বিহীন হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করত উচ্চৈস্বরে পুরুষগণের প্রতি আহ্লাদজনক বাক্য প্রয়োগ করে। একদা একজন বাহীক কুরুজাঙ্গলে অবস্থান পূর্বক অপ্রফুল্ল মনে কহিয়াছিল, আহা! সেই সূক্ষ্মকম্বলবাসিনী গৌরী আমাকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিতেছে। হায়! আমি কতদিনে রম্যা, শতদ্রু ও ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে গমনপূর্বক সেই কম্বলাজীর্ণসংবীত স্থূল ললাটাস্থি-সম্পন্ন গৌরীগণের মনঃশিলার ন্যায় উজ্জ্বল অপাঙ্গদেশ, ললাট, কপাল ও চিকুরে অঞ্জনচিহ্ন এবং গর্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য মৃদঙ্গ, আনক, শঙ্খ ও মর্দলের নিস্বন সহকারে কেলিপ্রসঙ্গ অবলোকন করিব। হায়! কত দিনে শমী, পীলু ও করবীরের অরণ্যে চক্রসমবেত অপুপ ও শক্তুপিণ্ড ভোজন করত সুখী হইব...

...সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় যাহা কহিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। বাহীক দেশে শাকল নামে এক নগর আছে। তথায় এক রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণা চতুর্দশীর রজনীতে দুন্দুভিধ্বনি করত এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে যে, আহা! আমি কতদিনে পুনরায় এই শাকল নগরে সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গৌড়ীসুরা পান এবং গোমাংস ও পলাণ্ডুযুক্ত মেষমাংস ভোজন করিয়া বাহেয়িক সঙ্গীত করিব। যাহারা, বরাহ, কুক্কুট, গো, গর্দভ, উষ্ট্র ও মেষের মাংস ভোজন না করে, তাহাদের জন্ম নিরর্থক! হে শল্য! শাকলদেশের আবালবৃদ্ধ সকলেই সুরাপানে মত্ত হইয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের ধর্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?

হে মদ্ররাজ, আর এক ব্রাহ্মণ কুরুসভায় যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। হিমাচলের বহির্ভাগে, যে স্থানে পীলু বন বিদ্যমান আছে এবং সিন্ধু ও তাহার শাখা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই অরট্টদেশ নিতান্ত ধর্মহীন; তথায় গমন করা অবিধেয়। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃলোক ধর্মভ্রষ্ট সংস্কারহীন অরট্টদেশীয় বাহীকদিগের পূজা গ্রহণ করেন না...

হে শল্য! কুরুসভায় বিপ্র আরো যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি। যে ব্যক্তি যুগন্ধরে উষ্ট্রাদির দুগ্ধ পান, অচ্যুত স্থলে

বাস ও ভূতিলয়ে স্নান করে তাহার কিরূপে স্বর্গলাভ হইবে? পঞ্চনদী পর্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থলের নাম অরট্ট; সাধুলোক তথায় কদাচ দুইদিন অবস্থান করিবেন না। বিপাশা নদীতে বাহ ও বাহীক নামে দুইটি পিশাচ আছে। বাহকেরা তাহাদেরই অপত্য। উহারা প্রজাপতির সৃষ্ট নহে; সুতরাং হীনযোনি হইয়া কিরূপে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম পরিজ্ঞাত হইবে। ধর্মবিবর্জিত কারস্কর মাহিষক, কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক ও বীরক-গণকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। হে মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণ তীর্থগমনানুরোধে সেই অরট্টদেশে এক রাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ রজনীতে এক উলূখলমেখলা রাক্ষসী তাঁহাকে এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিল। সেই অরট্টদেশ বাহীকগণের বাসস্থান, তথায় যে সকল হতভাগ্য ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই নাই। দেবগণ সেই ব্রতবিহীন দুরাচারদিগের অন্ন ভোজন করেন না। অরট্টদেশের ন্যায় প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, খস, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর দেশে এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে।

হে শল্য! আমি পুনরায় তোমাকে এক উপাখ্যান কহিতেছি…কিছুদিন হইল, এক ব্রাহ্মণ আমাদের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন…(তিনি কহিলেন)…গান্ধার মদ্রক ও বাহীকেরা সকলেই কামাচারী, লঘুচেতা ও সংকীর্ণ।…হে মদ্রাধিপ! আমি আর একজনের নিকট বাহীকদিগের যে কুৎসিত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি…। পূর্বে অরট্টদেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা সীমন্তিনীকে অপহরণ পূর্বক তাঁহার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে তিনি শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে নরাধমগণ! তোমরা অধর্মাচরণপূর্বক আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে; অতএব তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যাভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর শাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। হে শল্য! এই নিমিত্তই অরট্ট-দিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে।…

পাণিনি যদি স্পষ্টভাষায় বলে থাকেন এ-হেন বাহীকরাই আয়ুধজীবী সঙ্ঘের বা গণের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত[১১৯] তাহলে নিশ্চয়ই মহাভারতে পাওয়া তাদের এই বর্ণনা গণসমাজের অর্থ-নির্ণয় কাজে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। অধ্যাপক জয়সওয়াল অবশ্যই মহাভারতের এই অংশকে অগ্রাহ্য করেননি। কিন্তু এই দীর্ঘ বর্ণনা থেকে তিনি শুধুমাত্র একটি তথ্য উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন: সেকালের ভারতবর্ষের ঠিক কোন অংশে বাহীকদের বাস ছিলো[১৩০]। বলাই বাহুল্য, সে-তথ্য তুচ্ছ নয়; কিন্তু তাই বলে এ-বর্ণনায় বাহীকদের সমাজ-জীবন সংক্রান্ত যে সাধারণ ছবিটি পাওয়া গেলো তাকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। অথচ, অধ্যাপক জয়সওয়াল তা অবজ্ঞা করছেন। তার কারণ কি এই যে, সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোয় এ-বর্ণনাকে পুরতে গেলে কাঠামোটিই ভেঙে চৌচির হবার ভয়?

অবশ্যই, মহাভারতের সংবাদদাতাদের বর্ণনায় বাহীকদের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণার ভাব রয়েছে। সেই ঘৃণার প্রভাবে তাঁরা কিছুকিছু কাল্পনিক

কথা এই বর্ণনার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে বাহীকদের সমাজ-জীবন সংক্রান্ত কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখলে আমরা দেখতে পাবো, এ-বর্ণনা প্রাগ্-রাষ্ট্র ট্রাইব-সমাজেরই ইঙ্গিত দেয়।

বাহীকদের সম্বন্ধে মহাভারতের সংবাদদাতাদের মনে যা নিয়ে সবচেয়ে তীব্র ঘৃণা প্রথমে তারই আলোচনা করা যাক : বাহীকদের মধ্যে যৌন-নিষ্ঠার অভাব। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সভ্য-সমাজের কাছে পরিবার-জীবন বা দাম্পত্য-ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় বাহীকদের মধ্যে মহাভারতের সংবাদদাতারা তা দেখতে পাননি। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে, সভ্য-সমাজের এই দাম্পত্য-জীবন চিরন্তন নয় : প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানবজাতিই সভ্যতার দিকে এগোবার পথে যে-পর্যায়গুলি উত্তীর্ণ হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে সেগুলির মধ্যে আধুনিক বিবাহ-সম্পর্ক অনুপস্থিত। আমরা আগেই দেখেছি, মর্গানের পরিভাষা অনুসারে মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছে বন্য-দশার নিম্ন স্তর থেকে ; তারপর বন্য-দশার মধ্য ও উচ্চ স্তর পেরিয়ে মানুষ বর্বর-দশায় উঠে এলো এবং এই বর্বর-দশারও নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিনটি স্তর পেরোলে পরই মানুষের পক্ষে সভ্যতার আওতায় পৌঁছোনো সম্ভব। এবং মর্গান দেখালেন, বন্য-দশার আগোগোড়া এবং বর্বর-দশার নিম্ন ও মধ্য স্তর পর্যন্ত কোথাও আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্কের বা এক-বিবাহের পরিচয় নেই[১৩১] :

> ...it (অর্থাৎ, আধুনিক বিবাহ-সম্পর্ক) was preceded by more ancient forms which prevailed universally throughout the period of savagery through the Older and into the Middle Period of barbarism ; and that neither the monogamian nor the patriarchal can be traced back to the Later Period of barbarism. They were essentially modern.
>
> অর্থাৎ, বন্য-দশার আগাগোড়াই, এবং বর্বর-দশার আদ্য ও মধ্য স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই, আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্কের তুলনায় প্রাচীনতর নরনারী-সম্পর্ক বর্তমান ছিলো। উচ্চ-বর্বর স্তরের আগে পর্যন্ত কোথাও এক-বিবাহ বা পিতৃ-প্রধান পরিবারের চিহ্ন পাওয়া যায় না। এগুলি একান্তই আধুনিক।

মর্গানের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। কেননা, যদিও বন্য-দশার নিম্ন স্তরে আজ আর কোনো মানবদলকে স্বচক্ষে দেখবার উপায় নেই তবুও বন্য-দশার মধ্য-স্তর থেকে শুরু করে বর্বর-দশার মধ্য-স্তর পর্যন্ত প্রতিটি অবস্থায় আটকে-পড়ে-থাকা বিভিন্ন মানবদলকে প্রত্যক্ষভাবেই জানতে পারা গিয়েছে

এবং দেখা গিয়েছে এই অবস্থাগুলির কোথাও আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্কের পরিচয় নেই। মনে রাখতে হবে, মানবজাতির যে-কোনো শাখাই সভ্যতার স্তরে পৌঁছুক না কেন তার পক্ষে বন্য-দশার নিম্ন-স্তর থেকেই যাত্রা শুরু করতে হয়েছে এবং তারপর ধাপে ধাপে বন্য-দশার মধ্য ও উচ্চ স্তরে উঠে ও তারপর বর্বর-দশার নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ স্তর পার হয়ে সভ্যতার পর্যায়ে পৌঁছুনো সম্ভব হয়েছে।

আমাদের যুক্তি হলো, ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত মর্গানের এই সিদ্ধান্তগুলিকে প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে পারা বৈজ্ঞানিক মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেই প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণিত সেকালের মানুষদের সমাজ-জীবনকে সনাক্ত করবার চেষ্টা করতে হবে। তাই এ-জাতীয় কোনো বর্ণনায় যদি আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্কের অভাব দেখা যায় তাহলে অনুমান করবার সুযোগ থাকে যে, বর্ণিত মানবদল বর্বর-দশার উচ্চ স্তরের আগেকার কোনো পর্যায়ে জীবন যাপন করতো। আলোচ্য ক্ষেত্রে, বাহীকদের মধ্যে আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্কের অভাব চোখে পড়ে। তাই তাদের সমাজ-জীবন বর্বর-দশার উচ্চ-স্তরের আগেকার কোনো এক পর্যায়ের বলেই অনুমান করা স্বাভাবিক। এই অনুমান গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বর্বর-দশার মধ্য-স্তরের পর থেকেই ট্রাইব্যাল-সমাজে,—বা আদিম সাম্যসমাজে,—ভাঙন শুরু হয়েছে[১৩২]। অতএব, পাণিনির মতে এই বাহীকদের সমাজই যদি গণ-সমাজের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয় তাহলে স্বীকার করা দরকার যে, গণ বলতে প্রাগ্-বিভক্ত ট্রাইব্যাল-সমাজই হওয়া স্বাভাবিক।

মর্গানের গবেষণা থেকেই সাধারণ বৈজ্ঞানিক মূলসূত্র হিসাবে আমরা আরো জেনেছি যে, মানব-ইতিহাসে এক-বিবাহমূলক দাম্পত্য-সম্পর্কের আবির্ভাব ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আবির্ভাব সম্পর্কহীন ঘটনা নয়[১৩৩]। বর্বর-দশার উচ্চ-স্তরে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত শুধুই এক-বিবাহ নয়, রাষ্ট্র-ব্যবস্থারও পরিচয় নেই। আর যদি তাই হয় তাহলে বাহীকদের ওই গণ-সংগঠনকে কোনো রকম রাষ্ট্র-সংগঠন বলে অনুমান করারও সুযোগ নেই। গণ বলতে প্রাগ্-রাষ্ট্র ট্রাইব্যাল সমাজই বুঝিয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁরা 'গণ'কে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বলে মনে করেছেন তাঁদের কাছে প্রাক্-রাষ্ট্র ট্রাইব্যাল সমাজের ধারণাটিই সুস্পষ্ট নয়[১৩৪]। তাই, গণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ষোলো-আনা আয়োজন দেখে তাঁরা অনুমান করেছেন যে, সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া গণ আর কিছুই নয়। কিন্তু, গণতন্ত্র অতএব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—এ-অনুমান বিজ্ঞানসম্মত নয়। কেননা, অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[১৩৫] দেখাচ্ছেন, এমনকি গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলিতেও ট্রাইব্যাল সমাজের মতো আদি ও অকৃত্রিম গণতন্ত্রের আয়োজন ছিলো না।

অবশ্যই, মহাভারতের সংবাদদাতারা যদি বাহীকদের মধ্যে প্রচলিত নরনারী-সম্পর্ককে আরো খুঁটিয়ে বর্ণনা করতেন তাহলে আমাদের পক্ষে তাদের সমাজ-জীবনকে আরো সুনিশ্চিতভাবে সনাক্ত করবার সুযোগ বাড়তো। কেননা, আদিম সাম্যসমাজেরও একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে—বন্য-দশার মধ্য-স্তর থেকে শুরু করে বর্বর-দশার মধ্য-স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত সেই ইতিহাস। তেমনি, আধুনিক দাম্পত্য-জীবনের আগে পর্যন্ত যে-নরনারীসম্পর্ক তার মধ্যেও রূপান্তর ঘটেছে[১৩৩]। তাই প্রাচীনকালের কোনো মানবদলের মধ্যে প্রচলিত নরনারী-সম্পর্কের স্পষ্টতর বর্ণনা পাওয়া গেলে তারই উপর নির্ভর করে অনুমান করবার সুযোগ থাকে, বর্ণিত মানবদল আদিম-সমাজের কোন পর্যায়ে বাস করতো[১৩৭]। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে অতোখানি খুঁটিয়ে অনুমান করবার সুযোগ সত্যিই পাওয়া যায় না। তার কারণ, এই পুঁথিগুলির সংবাদদাতাদের উদ্দেশ্য প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সরবরাহ করা নয়, তার বদলে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার। ফলে, তথ্যের দিক থেকে প্রায়ই তাঁদের বর্ণনা অস্পষ্ট ও অপর্যাপ্ত—মোটের উপর শুধু এইটুকুই বোঝা যায় যে, বর্ণিত মানুষগুলির মধ্যে এক-বিবাহ বা আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্কের পরিচয় নেই। আমাদের মূল যুক্তির পক্ষে অবশ্য আপাতত এই তথ্যটুকুই পর্যাপ্ত বলে স্বীকৃত হতে পারে। কেননা, এর থেকে যদিও অনুমান করা যায় না যে, বর্ণিত মানবদল প্রাগ্‌-বিভক্ত সমাজের ঠিক কোন পর্যায়ে বাস করতো তবুও একথা অনুমান করবার সুযোগ থাকে যে, তারা প্রাগ্‌-বিভক্ত সমাজের কোনো-এক স্তরে জীবন-যাপন করতো।

সুখের বিষয়, এ-ক্ষেত্রে মহাভারতের ওই বর্ণনার মধ্যেই আরো একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত থেকে গিয়েছে। ইঙ্গিতটি হলো, বাহীকদের মধ্যে প্রচলিত উত্তরাধিকার-সূত্র : তস্মাত্তেষাং ভাগহরা ভাগিনেয়া ন সূনবঃ—তাদের মধ্যে পুত্রেরা ধনাধিকারী না হয়ে ভাগিনেয়রাই ধনাধিকারী হয়। এই উত্তরাধিকার-সূত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকাকার নীলকণ্ঠ কী রকম কাল্পনিক কথা বলছেন তার নমুনা আমরা আগেই দেখেছি (পৃঃ ১৭৮)। এ-জাতীয় উদ্ভট কথা তিনি কল্পনা করেছেন, তার কারণ প্রাচীন সমাজ-সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যের উপর নির্ভর না করেই তিনি এই উত্তরাধিকার সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। অথচ, প্রাচীন সমাজ-সংক্রান্ত তথ্যের দিক থেকে এই উত্তরাধিকার-সূত্রে মাতৃ-প্রধান সমাজের চিহ্ন থেকে গিয়েছে। আজো আমাদের দেশের মাতৃপ্রধান অঞ্চলগুলিতে[১৩৮] এ-জাতীয় উত্তরাধিকার ব্যবস্থা টিকে থাকতে দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ মাতৃ-প্রধান-সমাজে উত্তরাধিকার-সূত্র ছিলো মায়ের দিক থেকে মেয়ের দিকে। এই ব্যবস্থারই কিছুটা রদবদল হয়ে মামার দিক[১৩৯] থেকে ভাগনের দিকে উত্তরাধিকারসূত্র

প্রবর্তিত হলো। তারপর, শেষ পর্যন্ত মাতৃ-প্রধান সমাজ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে যাবার পর, যখন পূর্ণ পিতৃ-প্রধানসমাজ দেখা দিলো তখন উত্তরাধিকারসূত্র হলো পিতা থেকে পুত্রের দিকে। মাতুল থেকে ভাগিনেয়র দিকে উত্তরাধিকারসূত্র যতোদিন বর্তমান ততোদিন পর্যন্ত সমাজ-সংগঠনে মাতৃ-প্রাধান্যের লক্ষণ রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। মাতৃ-প্রধান সমাজ ঠিক কী ও কেন—এ-প্রশ্ন নিয়ে একটু পরেই দীর্ঘতর আলোচনা তোলা যাবে। আপাতত এ-বিষয়ে অধ্যাপক জর্জ টমসনের[১১০] নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত আমাদের মূল যুক্তির পক্ষে প্রাসঙ্গিক হবে :

> ...the social dominance of the female sex tend to go with the survival of common ownership.
> অর্থাৎ, নারীজাতির সামাজিক প্রতিপত্তির সঙ্গে যৌথ-সম্পত্তির যোগাযোগ আছে।

মহাভারত-বর্ণিত ওই উত্তরাধিকার-সূত্রে যদি নারীজাতির সামাজিক প্রতি-পত্তির স্বাক্ষর,—বা অন্তত স্পষ্ট স্মারক,—থাকে তাহলে তারই মধ্যে যৌথ-জীবনের ইঙ্গিত থেকে গিয়েছে একথা অনুমান করবার অবকাশ আছে না কি?

আমাদের মূল যুক্তির পক্ষে এই যৌথ-জীবনের ইঙ্গিতটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই, গণ-সংক্রান্ত আরো কয়েকটি শব্দের মধ্যে যেখানে ওই যৌথ-জীবনের ইঙ্গিতটি স্পষ্ট সেই শব্দগুলির উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। গণদ্রব্য[১১১] বলতে বোঝায়, সাধারণের দ্রব্য—যে-দ্রব্যের স্বামী অনেকে এবং একত্রিতভাবে। গণচক্রক[১১২] বলতে বোঝায় একত্র ভোজন। গণান্ন[১১৩] বলতে বোঝায় বহুস্বামীক অন্ন—যাতে অনেকের সত্ব আছে। অবশ্যই, মনু যে-হেতু গণজীবনকে সুনজরে দেখেননি সেই হেতুই তাঁর কাছে এই গণান্ন নিন্দনীয়[১১৪] : গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্তুতি—গণান্ন ও গণিকান্ন ভোজন করলে তপস্যাসিদ্ধ স্বর্গাদিলোক থেকে বিচ্যুত হতে হয়। ভ্রাতৃবর্গ অথবা বন্ধুবর্গের অনুষ্ঠেয় মরুৎস্তোম নামের যজ্ঞকে কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রে গণযজ্ঞ[১১৫] বলা হয়েছে। গণবন্ধন শব্দের তাৎপর্য ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই জাতীয় শব্দগুলির মধ্যে থেকে গণ-এর যৌথজীবন-বাচকতাই ফুটে ওঠে।

ব্রাত্য মানে কি ?

বলাই বাহুল্য, পুরোনো পুঁথিপত্রে গণ-সংক্রান্ত যে-অজস্র তথ্য পাওয়া যায় তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে বর্তমানে সম্ভব হবে না—বিশেষ করে এই কারণে নয় যে তাহলে আমাদের মূল যুক্তি থেকে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হবার ভয় থাকে। তাই এখানে আমরা আমাদের মূল যুক্তির দিকে নজর রেখেই গণ সম্বন্ধে আরো কিছু নির্বাচিত তথ্যের আলোচনা করবো। আমাদের মূল যুক্তি হলো, গণ বলতে প্রাক-বিভক্ত যৌথ-সমাজকে বোঝানো হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত মানবদলের মতোই বৈদিক মানুষেরাও এককালে এই প্রাক-বিভক্ত যৌথ-সমাজেই জীবন যাপন করতেন। তাই তাঁদের সাহিত্যের প্রাচীনতর পর্যায়গুলিতে গণ বা গণপতি সম্বন্ধে ঘৃণার ভাব নেই। কিন্তু উত্তরকালে রাষ্ট্রশক্তির মুখপাত্ররা বৈদিক ঐতিহ্যের গরিমা দাবি করলেও গণ-সমাজকে—এবং অতএব গণপতিকেও—ঘৃণার চোখেই দেখতে শিখেছিলেন : মানব-গৃহ্যসূত্র বা যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে গণপতি বা বিনায়কের বিরুদ্ধে যে-বিষোদ্গার তার সঙ্গে মহাভারতের সংবাদদাতাদের মুখে বাহীক-প্রমুখদের সম্বন্ধে ওই তীব্র ঘৃণার সম্পর্ক রয়েছে। ভারতবর্ষের জমিতে যে এইরকম ঘটনা ঘটেছে তার কারণ, ভারতবর্ষ এতোটুকু দেশ নয় এবং এখানে পুরো দেশ জুড়ে একই তালে সবমানুষের সমাজজীবনে সমান পরিবর্তন দেখা দেয়নি। তাই এদেশে রাষ্ট্রশক্তির পাশাপাশিই টিকে থেকেছে আদিম সাম্যসমাজ।

গণেশকে অনুসরণ করে গণসমাজ-সংক্রান্ত আমরা যে-ইতিহাসটার ইঙ্গিত পাই তারই অনুরূপ ইতিহাস পাওয়া যায় ব্রাত্য শব্দটির তাৎপর্য বিচার করলে। উত্তরযুগে যাঁরা বৈদিক ঐতিহ্যের বাহক বলে নিজেদের পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেন, তাঁদের মধ্যে শুধুই যে গণ বা গণপতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব ফুটে উঠলো তাই নয়, ব্রাত্য সম্বন্ধেও। তেমনি বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতর পর্যায়ে শুধুই গণ বা গণপতির গৌরবোজ্জ্বল চিত্র নয়, ব্রাত্যেরও। এবং ব্রাত্যের এই ইতিহাসটিকে বিশ্লেষণ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে ; কেননা, আধুনিক পণ্ডিতমহলে ব্রাত্য শব্দটি নিয়ে নানা রকম ভুল ধারণার প্রচলন দেখা যায়।

বাহীকদের বর্ণনায় মহাভারতের যে-অংশের তর্জমা উদ্ধৃত করেছি তাতে রয়েছে, 'দেবগণ সেই ব্রতবিহীন দুরাচারদিগের অন্ন ভোজন করেন না'। প্রশ্ন হলো, ব্রতবিহীন শব্দটি এলো কোথা থেকে ? মূলে আছে, ব্রাত্যানাম্ দাস-মীয়ানাম্ অন্নম্ দেবাঃ ন ভুঞ্জতে [১৩৩]। স্পষ্টই, ওই ব্রাত্যানাম্ শব্দটিকে ব্রতবিহীন বলে তর্জমা করা হয়েছে। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আধুনিক কালে ব্রাত্য শব্দটির ওই রকমই একটা অর্থ করবার চেষ্টা করা হয়। এবং এ-চেষ্টা অকারণ

বা অমূলক নয়। কেননা, মনু, বোধায়ন[১৪৭] প্রমুখেরা ব্রাত্য শব্দের অর্থ করেছেন সাবিত্রীপতিত। মনু[১৪৮] বলছেন, সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ—ঠিক বয়সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্তানদের উপনয়ন না হলে তারা আর্যবিগর্হিত হয়, তাদেরই ব্রাত্য বলে। অতএব, মনুর মত অনুসরণ করে বলা হয়েছে[১৪৯] "সাবিত্রীপতিত উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন ব্যক্তিই ব্রাত্য নামে অভিহিত। ব্রাত্যের যজ্ঞাদি বেদবিহিত ক্রিয়ায় অধিকার নাই—ব্রাত্য ব্যবহারযোগ্যও নহে, ইহাই এক শ্রেণীর শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত।" এই রকমই অর্থের উপর নির্ভর করে আধুনিক পণ্ডিতেরা[১৫০] ব্রাত্য বলতে "ব্রত থেকে পতিত" অর্থ করছেন। "কিন্তু", মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[১৫১] দেখাচ্ছেন, "ব্রত হইতে পতিত এইরূপ অর্থে ব্রত শব্দের উত্তর কোন রূপ তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া ব্রাত্য শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে তাহার সূত্র পাণিনির ব্যাকরণে নাই।" শাস্ত্রী মহাশয় শুধু এইটুকু কথাই বললেন, কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণে এই ব্রাত্য শব্দের নিষ্পত্তি ঠিক কী ভাবে করা হয়েছে তার উল্লেখ তিনি করলেন না। সেইদিক থেকে দেখা যায়, ব্রাত্য শব্দের নিষ্পত্তি ব্রত শব্দ থেকে নয়। কেননা, পাণিনি বলছেন[১৫২], ব্রাত শব্দের উত্তর স্বার্থে ঞ্যং প্রত্যয় করে ব্রাত্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তাই, ব্রাত এব ব্রাত্য।

যদি ব্রাত শব্দের উত্তর স্বার্থে ঞ্যং প্রত্যয় করে ব্রাত্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ব্রাত্য বলতে ব্রতহীন অর্থ করবার অবকাশ থাকে না। আমরা আগেই দেখেছি, মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কানে কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রের নজির দেখিয়ে বলছেন, গণ পূগ ব্রাত শ্রেণী প্রভৃতি শব্দগুলির একই অর্থ। অর্থটা হলো, সমূহ। পাণিনির ভাষ্যকারদের মধ্যেও ব্রাত শব্দের তাৎপর্য-নির্ণয় প্রসঙ্গে দলবাচকত্বের উপরই ঝোঁকটা সবচেয়ে বেশি। এবং এই ব্যাকরণশাস্ত্রের ঢের আগে, ঋগ্বেদে[১৫৩], গণ ও ব্রাত শব্দ সমানার্থে,—বা অন্তত প্রায়-সমানার্থে,—ব্যবহৃত হয়েছে :

যো বঃ সেনানী মহতঃ গণস্য
রাজা ব্রাতস্য প্রথমঃ বভূব।
তস্মৈ কৃণোমি ন ধনা রুণধ্মি
দশাহং প্রাচীস্তদৃতং বদামি॥

অর্থাৎ (খুব সম্ভব অক্ষর ঘুঁটিগুলিকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে!) মহৎ গণের মধ্যে যিনি সেনানী (নায়ক), ব্রাতর মধ্যে যিনি প্রথম রাজা, আমি তাঁকে প্রণাম করি। দশ-আঙুল তুলে আমি দেখাচ্ছি, আমি কোনো ধন গোপন করছি না; আমি সত্য (ঋত) কথা বলছি।

বলাই বাহুল্য, এই ঋকটির অর্থ অনেকাংশে দুর্বোধ্য; পরবর্তী পরিচ্ছেদে

এর আলোচনায় ফেরবার চেষ্টা করবো। বর্তমানে আমাদের যুক্তির পক্ষে শুধু এইটুকুই প্রাসঙ্গিক যে, এখানে গণ ও ব্রাত শব্দ প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ভাষ্যে সায়ণ বলছেন, গণব্রাতয়োরল্পো ভেদঃ—গণ এবং ব্রাত-র মধ্যে বড়ো একটা তফাত নেই।

ব্রাত এব ব্রাত্যঃ। গণব্রাতয়োরল্পো ভেদঃ। অথচ মনু প্রমুখের রচনায় এই ব্রাত্যই পতিতসূচক হয়ে দাঁড়ালো। তার কারণ কি এই নয় যে, উত্তরযুগে মনু প্রমুখের মতো শ্রেণীশাসনের প্রচারকেরা গণসমাজকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করলেন? অথচ, যে-বৈদিক ঐতিহ্যের গরিমায় তাঁরা নিজেরা অতোখানি আত্মপ্রসাদ পেতেন সেই বৈদিক সাহিত্যেই ব্রাত্য সম্বন্ধে মনোভাবটা একেবারে বিপরীত। আর যদি তাই হয় তাহলে কি অনুমান করবার অবকাশ থাকে না যে, বৈদিক সাহিত্য সমাজ-বিকাশের যে-স্তরের স্মৃতি বহন করছে সে-স্তরে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয়নি?

> অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডটি কেবল ব্রাত্য মহিমাতে পরিপূর্ণ। ব্রাত্য বৈদিক-কার্যে অধিকারী, ব্রাত্য মহানুভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পূজ্য, অধিক কথা কি, ব্রাত্য স্বয়ং দেবাধিদেব। ব্রাত্য যেখানে গমন করেন, বিশ্বজগৎ ও বিশ্বদেবগণও সেইখানে তাঁহার অনুগমন করেন। তিনি যেখানে অবস্থান করেন, বিশ্বদেবগণ সেই স্থানে অবস্থান করেন, তিনি তথা হইতে গমন করিলে তাঁহারাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। সুতরাং তিনি যখন যেখানে গমন করেন, তখন যেন রাজার ন্যায় গমন করিয়া থাকেন।
>
> সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ডেই এইরূপ কেবল ব্রাত্যমহিমা দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব-বেদের পঞ্চদশ কাণ্ডোক্ত ব্রাত্য বাচ্যবিষয়ে ধর্মসংহিতোক্ত ব্রাত্য হইতে সম্যক স্বতন্ত্র। এই ব্রাত্যসকল বৈদিক পুরুষসূক্তের পুরুষ এবং পৌরাণিকগণের বিরাট পুরুষ বলিয়াই ধর্তব্য।[১৫৪]

অগত্যা, ভাষ্যরচনার সময় সায়ণাচার্যকে বলতে হচ্ছে যে, অথর্ববেদের এই বর্ণনা সমস্ত ব্রাত্যের উপরই নির্বিচারে প্রযোজ্য নয়—তার বদলে এই বর্ণনা ব্রাত্যদের মধ্যে শুধুমাত্র সাধু ও শক্তিশালীদের উপরই প্রযোজ্য[১৫৫]। সায়ণের এই ব্যাখ্যা যে কৃত্রিম তা আধুনিক পণ্ডিতের চোখ এড়িয়ে যায়নি[১৫৬]। কিন্তু এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, উত্তরযুগে ব্রাত্য শব্দের যে-পরিণতি দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাচীন যুগের রচনার ভাষ্য করতে হলে এই জাতীয় কৃত্রিম উক্তি না করে উপায় নেই। আধুনিক পণ্ডিত[১৫৭] বলছেন:

> কী প্রকারে ব্রাত্য শব্দের এইরূপ অর্থাবনতি সংগঠিত হইল, পরব্রহ্মের বাচক

শব্দটি কী প্রকারে মানবসমাজের অসম্মানিত জনের অর্থবোধক রূপে ব্যবহৃত হইল, তাহারও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

আমাদের মন্তব্য হলো, যতোদিন না সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে এই অনুসন্ধান করা হবে ততোদিন পর্যন্ত সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান সুদূরপরাহত হয়ে থাকবে।

রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব

সমাজ-বিজ্ঞান অনুসারে, ওই প্রাগ্‌-বিভক্ত গণসমাজের ধ্বংসস্তূপের উপরই রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথিপত্রের মধ্যে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি? যায়। কেবল মনে রাখতে হবে, প্রাচীন পুঁথিপত্রের এই নজিরগুলিকে ঠিকমতো বুঝতে হলে মানবসমাজের ক্রমবিকাশ-সংক্রান্ত যে-তথ্যকে সাধারণ সত্য হিসাবে জানতে পারা গিয়েছে তারই আলোয় বোঝবার চেষ্টা করতে হবে।

মহাভারতের[১৫৮] একজায়গায় ভীষ্ম বলছেন :

> সর্বপ্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড ও দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মানুষেরা একমাত্র ধর্ম অবলম্বন পূর্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। মানবগণ এইরূপে কিছুদিন কালযাপন করিয়া পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে মোহ তাহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাব বশতঃ ক্রমশঃ জ্ঞান ও ধর্মের লোপ হইতে লাগিল এবং মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভপরতন্ত্র, পরধনগ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশূন্য হইয়া উঠিল।

ভীষ্ম বলে চলেছেন[১৫৯], এই অবস্থার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যে সৃষ্টি হলো রাজা, রাজধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, ইত্যাদি।

তার মানে, প্রাগ্‌-বিভক্ত সাম্য-সম্পর্কের ধ্বংসস্তূপেরই ওপর যে রাষ্ট্র-যন্ত্র দেখা দিয়েছে এ-কথা ভীষ্মের উক্তিতে একটুও অস্পষ্ট নয়। অবশ্যই, এখানে তিনি এমন কথা নিশ্চয়ই বলছেন না যে, ওই প্রাগ্‌-রাষ্ট্র সমাজ-সংগঠনেরই নাম হলো গণ। কিন্তু ১০৭ অধ্যায়ে গণ-সংগঠন কেমন করে ধ্বংস হয় তার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যেহেতু একই কারণের উল্লেখ করছেন, সেই হেতু অনুমানের অবকাশ থাকে বই কি যে, ৫৭ অধ্যায়ের ওই প্রাগ্‌-রাষ্ট্র

সংগঠনের নামই গণ-সংগঠন। দুঃখের বিষয় ১০৭ অধ্যায়টির তর্জমা কালীপ্রসন্ন সিংহের সংস্করণে প্রায় একেবারেই মূল্যহীন। গণ শব্দের বদলে শূর শব্দ ব্যবহার করে সেখানে মৌলিক ভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। ভীষ্ম বলছেন[১০০] :

> গণানাঞ্চ কুলানাঞ্চ রাজ্ঞাং ভরতসত্তম।
> বৈরসন্দীপনা বেতৌ লোভামর্ষৌ নরাধিপ॥
> লোভমেকো হি বৃণুতে ততোঽমর্ষমনন্তরম্।
> তৌ ক্ষয়ব্যয়সংযুক্তাবন্যোন্যশ্চ বিনাশিনৌ॥

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অবশ্যই, এখানে ভীষ্মের সামনে সমস্যাটা একটু অন্য রকমের : উদীয়মান রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে আশপাশের গণ-সঙ্ঘগুলিকে কীভাবে তাঁবে রাখা যায় তারই সমস্যা। তাই গণের মধ্যে ভেদসৃষ্টির কৌশল নিয়ে আলোচনাও। কিন্তু, এ-আলোচনা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অনেক ধারালো আর নির্লজ্জও। তাই, কৌটিল্য-প্রসঙ্গেই সে-কথা তোলা যাবে।

আপাতত যে আলোচনা হচ্ছিলো : প্রাগ্-বিভক্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপরই কীভাবে রাষ্ট্রশক্তি দেখা দিলো তার স্মৃতি যে শুধুই মহাভারতের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে তাই নয়, বৌদ্ধ সাহিত্যেও এর নজির রয়েছে। নমুনা, মহাবস্তু অবদান। বরং, মহাভারতের চেয়ে এখানের বর্ণনাটি অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক ; কেননা, বাস্তবনিষ্ঠ। মহাভারতে শুধুমাত্র লোভ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে ; কিন্তু মহাবস্তু অবদান দেখাচ্ছে যে, সবকিছুর মূলে আসল কারণ হলো উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি। কৃষি ব্যবস্থা শেখবার পর দরকার পড়লো দলের সবাইকার মধ্যে জমি আলাদা-আলাদাভাবে বিলি করে দেবার ব্যবস্থা। আর শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে নানান সমস্যা সমাধানের জন্যেই রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব। অবশ্যই, মহাবস্তু অবদানের ভাষাটা পুরাণ-ঘেঁষা, তবুও কিন্তু অস্পষ্ট নয়। সেই ভাষায় বর্ণনাটি কী রকমের তাই দেখা যাক।

আগেকার যৌথ-জীবন কী রকম ছিলো? মহাবস্তু অবদানে[১০১] বলা হচ্ছে, "সুখনিবাসে থাকিয়া তাঁহারা প্রীতিভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। তাঁহারা যাহা করেন সকলই ধর্ম।" কিন্তু চাষবাসের কায়দাকানুন শেখবার পর, দলের মধ্যে জমি বিলি হবার পর, দেখা দিলো চুরি, মিথ্যে কথা, মারামারি কাটাকাটি। "তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল : আইস, আমরা একজন বলবান বুদ্ধিমান, সকলের মন যোগাইয়া চলে,—

এমন লোককে আমাদের ক্ষেত রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে আমরা সকলে ফসলের অংশ দিব। সে অপরাধের দণ্ড দিবে, ভালো লোককে রক্ষা করিবে আর আমাদের ভাগমতো ফসল দেওয়াইয়া দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। তাঁহাকে তাহারা ফসলের ছয়ভাগের এক ভাগ দিতে রাজী হইল।...এইরূপে তেজোময় জীব অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে লোভে পড়িয়া মাটিতে মাটি হইয়া গেলো। শেষে তাহাদের ক্ষেত আগলাইবার জন্য একজন ক্ষেতওয়ালার দরকার হইল। সেই ক্ষেতওয়ালাই রাজা, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগই তাহার মাহিনা"[১০২]।

এইখানে অবশ্যই অনেকগুলি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত, বৌদ্ধ ঐতিহ্যে গণতন্ত্রের প্রভাব অনেক প্রবল, তাই রাজাকে যে-চোখে দেখা হয়েছে তারও বৈশিষ্ট্য আছে। দ্বিতীয়ত, মহাবস্তু অবদানের বর্ণনাটাই পুরাণ-ঘেঁষা, তায় উদ্ধৃতিটা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের লেখা থেকে, যিনি কিনা ঘরোয়া গল্পের ঢং-এ মহাবস্তু অবদানের কথাটা নতুন করে বলছেন। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তো আর এই উপাখ্যান থেকে সমাজ-বিজ্ঞানে হাতেখড়ি নয়। তার বদলে শুধু এইটুকুই দেখা যে, সমাজ-বিজ্ঞানের একটি মূল সিদ্ধান্ত হিসেবে এঙ্গেল্‌স্‌ ও মর্গান যে দেখাচ্ছেন প্রাগ্‌-বিভক্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপরই দেখা দিয়েছে রাষ্ট্রশক্তি, প্রাচীনদের লেখা ঠিকমতো বুঝতে পারলে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

জয়সওয়াল প্রমুখ পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই তর্ক করে বলবেন, মহাভারত কিংবা মহাবস্তু অবদানে যে রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্মকথা বর্ণিত হচ্ছে তা রাজতন্ত্র। তাই উদ্ধৃতগুলি এখানে অবান্তর। কেননা, রাজতন্ত্রের জন্মবৃত্তান্ত মোটের ওপর এই রকম, একথা মানলেও উদ্ধৃতির বর্ণনাকে রাষ্ট্রমাত্রের জন্মবৃত্তান্ত বলে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা চলবে না। অপরপক্ষে, ওঁরা বলবেন, গণ বলে সংগঠনের মধ্যে যদি সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় তাহলে এই গণকে রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে অস্বীকার করবার সুযোগ কোথায়? কিন্তু প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠবে: গণ-এর মধ্যে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষণ কোথায়? উত্তরে, ওঁদের রচনা থেকে যেটা কিনা একমাত্র যুক্তি হিসেবে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি, সেটা হলো গণ-এর মধ্যে নিখুঁত গণতন্ত্রের আয়োজন। এইটেই হলো ওঁদের তরফের আসল কথা আর এইখানেই ওঁদের দৃষ্টিভঙ্গির আসল সংকীর্ণতাও। কেননা, ওঁদের মূল কথা হলো, গণকে কোনো-না-কোনো রকমের রাষ্ট্রব্যবস্থা হতেই হবে, তাই এ রাষ্ট্র যদি রাজতন্ত্র না হয়, যদি এর মধ্যে পাওয়া যায় গণতন্ত্রের পরিচয়, তাহলে একে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া আর কী বলা সম্ভব? অথচ, সমাজ-বিজ্ঞান অনুসারে, রাষ্ট্রব্যবস্থার

আবির্ভাব হবার আগে পর্যন্ত যে সাম্যসমাজ তার শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের আয়োজন একেবারে ষোলো আনাই। তাই, গণতন্ত্র অতএব সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—এমনতরো কথা যুক্তি বিজ্ঞানসম্মত নয়। অবশ্যই, তাই বলে, গণতন্ত্র অতএব প্রাগ্-বিভক্ত সমাজ—এমনতরো পাল্টা যুক্তিও নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। আর আমাদের যুক্তি তা নয়ও। গণ বলতে যে প্রাগ্-বিভক্ত ট্রাইব্যাল সমাজই বুঝতে হবে তার অন্যান্য প্রমাণ হলো গণের ওই যৌন-সম্পর্ক আর যৌথ-চেতনা।

সিদ্ধিদাতার জন্মকথা: গণ-সমাজ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি

তাহলে প্রাচীনদের স্মৃতি থেকে এ-কথা একেবারে মুছে যায়নি যে, এক আদিম অবিভক্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপরেই রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ঘটেছিলো। সেই আদিম সমাজে শাসক-শাসিতে প্রভেদ নেই; রাজা নেই, প্রজা নেই; লোভ নেই, অধর্ম নেই—মানুষের সঙ্গে মানুষের শুধু প্রীতির সম্পর্ক। আমাদের বক্তব্য হলো, এদেশে আদিম সমাজের রূপটি ঠিক কী রকম ছিলো এবং কী ভাবে সে-সমাজ ধ্বংস হয়ে আবির্ভাব হলো রাষ্ট্রশক্তির—এ-বিষয়ে মৌলিক গবেষণার অবকাশ রয়েছে, ভারততত্ত্বে যাঁরা সুপণ্ডিত তাঁদের দৃষ্টি এই সমস্যার দিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। গণপতির পদানুসরণ করে আমরা এই ইতিহাসের বহিঃরেখার আভাষ পেলাম এবং সাধারণভাবে কয়েকটি কথা মানতে বাধ্য হলাম। প্রথমত, আমাদের প্রাচীন পুঁথিপত্রে এই প্রাগ্-বিভক্ত প্রাচীন সমাজের উল্লেখ রয়েছে—গণ, ব্রাত, সংঘ, পুগ, শ্রেণী প্রভৃতি নানান নামে প্রাচীনেরা এই সমাজকে অভিহিত করতে চেয়েছেন। এই আদিম সাম্যসমাজে অবশ্যই ষোলো আনা গণতন্ত্রের আয়োজন; দুঃখের বিষয় আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ওই গণতন্ত্রের লক্ষণ থেকেই আদিম সমাজকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে সনাক্ত করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে সর্বত্রই এক সঙ্গে এই আদিম সমাজ ভেঙে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ঘটেনি। আজো, ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে ওই জাতীয় আদিম সমাজ টিকে রয়েছে: সাঁওতাল বিদ্রোহের বর্ণনাদাতা ইংরেজ লেখক[১৩৩] সাঁওতালদের সম্বন্ধে বলছেন, they are republicans and communists in politics—ওরা রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদী। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই যদি ওই জাতীয় সমাজ দেশে টিকে থাকে (আজো আছে), তাহলে আজ থেকে প্রায় হাজার দুয়েক বছর আগেকার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রে নিশ্চয়ই ওই

আদিম সমাজের—বা গণ-সমাজের—পরিচয় বেশি হবার কথা। অতএব, অনুমান করা যায়, প্রাচীন ভারতের এখানে-ওখানে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হবার পর তারই আশে পাশে গণসমাজও থেকে গিয়েছিলো। গণপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমরা দেখতে পেলাম, রাষ্ট্রশক্তির মুখপাত্ররা এই গণসমাজকে খুব সুনজরে দেখেননি। এই কারণেই, প্রাচীন আইনের পুঁথিতে গণপতি দেখা দিয়েছেন মূর্তিমান বিঘ্ন বা বিঘ্নরাজ হিসেবে।

অবশ্যই, গণপতির ইতিহাসে এর চেয়েও চিত্তাকর্ষক পর্যায় হলো ওই বিঘ্নরাজের পক্ষে সিদ্ধিদাতায় পর্যবসিত হওয়া। এবং আমরা বলতে চাইছি, আধুনিক ঐতিহাসিকেরা যদিও গণপতির ইতিহাসের এই পর্যায়টির দিকে ভালো করে নজর দেননি তবুও এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, এই পর্যায়টিকে ভালো করে বিশ্লেষণ করলে পর ভারতীয় ইতিহাসের একটি বিখ্যাত রাষ্ট্রের আবির্ভাব কাহিনী উদ্ধার করা যাবে। অবশ্যই, ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে উক্ত বিশ্লেষণের যোগ্যতা নেই। কিন্তু দক্ষতর বিদ্বানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার আশায় আমি এখানে কয়েকটি কথার অবতারণা করতে চাই।

প্রথমত, ঐতিহাসিক বিবর্তনের কয়েকটি মূল নিয়ম আছে। এ-কথা না মানলে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া দুষ্কর[১৩৩]। কিন্তু এ-কথা মানতে হলে স্বীকার করতে হবে, অন্যান্য দেশের ইতিহাসের বেলায় যে-ভাবে রাষ্ট্র-শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে আমাদের দেশের ইতিহাসের বেলাতেও সেইভাবেই রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হওয়াই স্বাভাবিক। তাই অন্যান্য কোনো দেশের বেলায় যদি কোনো সূত্র ধরে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব-কাহিনী নিয়ে সার্থক গবেষণা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের দেশের পুরোনো ইতিহাসের বেলাতেও একই সূত্রে অগ্রসর হয়ে রাষ্ট্রের আবির্ভাব-কাহিনী উদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় যদিও বিদেশের ক্ষেত্রে এ-বিষয়ে সত্যিই উচ্চাঙ্গের গবেষণা হয়েছে তবুও এখনো আমাদের ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনুরূপ পথে অগ্রসর হবার উৎসাহ দেখা দেয়নি।

অথচ, আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথিপত্রেই এমন ইঙ্গিত রয়েছে যেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে অনুরূপ পথে অগ্রসর হবার সুযোগ পাওয়া যায়। প্রথমে এইরকমেরই কিছু ইঙ্গিতের উল্লেখ করবো এবং তারপর আলোচনা করবো বিঘ্নরাজ থেকে সিদ্ধিদাতায় পর্যবসিত হবার পেছনে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব-কাহিনী সংক্রান্ত কী তথ্য পাওয়া যায়।

ধরা যাক মৌর্য রাষ্ট্রের কথা। এ-রাষ্ট্রের উৎপত্তি কী করে হলো? সাধারণত আমরা এ-বিষয়ে মুরা-নাম্নী দাসী পুত্রের কাহিনী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি। অথচ, আধুনিক গবেষণার আলোয় ইতিহাসের একটি সাধারণ নিয়ম

হিসেবে আমরা আজ এ-কথা মানতে বাধ্য যে, ট্রাইব্যাল-সমাজ ভেঙেই রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। এই ট্রাইব্যাল-সমাজকে চেনবার একটি উপায় হলো, জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে সমাজের নাম-করণ পদ্ধতি—অর্থাৎ, টোটেম্-বিশ্বাস মূলক নাম। এই দুটি কথা মনে রাখলে মৌর্য-রাষ্ট্রের আবির্ভাব-ইতিহাস হিসেবে মূরা নাম্নী দাসীর কাহিনী নিশ্চয়ই পর্যাপ্ত হবে না। কেননা, অপরপক্ষে অন্যান্য তথ্য রয়েছে, এবং সেই তথ্যগুলির তাৎপর্য ইতিহাস-বিজ্ঞানের দিক থেকে মূল্যবান। প্রথমত, আধুনিক ঐতিহাসিকেরা জানেন যে, মৌর্য অশোক তাঁর রাজ্যে ময়ূর-বধ নিষিদ্ধ করেছিলেন[১৩৪]। এই ঘটনাটির তাৎপর্য ঠিক কী? এ-কি শুধুই অশোকের পক্ষে জীবে দয়ার পরিচয়? তা হতে পারতো, যদি রাজাজ্ঞায় নির্বিচারে সমস্ত রকম প্রাণীবধই নিষিদ্ধ হতো। কিন্তু নিষেধটা যেহেতু নির্দিষ্ট এক প্রাণী সম্বন্ধেই সেইহেতু অনুমান করবার সুযোগ থাকে যে এর পিছনে কোনোরকম টোটেম্-বিশ্বাসের পরিচয় থাকতে পারে। কেননা, টোটেম্ বিশ্বাসের সঙ্গে টাবু-র বা নিষেধাজ্ঞার যোগাযোগ রয়েছে। এই টাবু প্রধাণত দু-রকম। এক, বিবাহ সংক্রান্ত; দুই টোটেম্-প্রাণীটির হত্যা ও আহার সাক্রান্ত: হরিণ-দলের মানুষ হরিণদলের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না, হরিণ-দলের মানুষ হরিণ-হত্যা করতে পারবে না। হরিণ-দলের মানুষ অন্য যে-কোনো রকম প্রাণী হত্যা করতে ও ভক্ষণ করতে পারে, কেবল হরিণ নয়। তাই, মৌর্য অশোকের রাজ্যে যদি নির্দিষ্টভাবে ময়ূর-বধ নিষিদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে এই নিষেধাজ্ঞাকে ময়ূর-বধ সংক্রান্ত টাবুর স্মারক মনে করবার অবকাশ থাকে না কী? তার মানে কি এই নয় যে, মৌর্য রাজবংশের উৎপত্তি ময়ূর-টোটেম্-যুক্ত কোনো ট্রাইব্যাল-সমাজ থেকে হওয়াই সম্ভবপর? এবং ঠিক এই ইঙ্গিতটিই পাওয়া যায় জৈন-পুঁথিতে[১৩৫]:

> চন্দ্রবচ্চন্দ্রগুপ্তোঽপি ব্যবর্দ্ধত দিনে দিনে।
> ময়ূর পোষক কুলোৎপলিনী বনলাসকঃ॥
>
> অর্থাৎ, গুপ্ত ছিদ্রযুক্ত তৃণমণ্ডপমধ্যে চন্দ্রসুধাপান করিয়া সন্তানপ্রসূত হয় বলিয়া তাহার নাম হইল চন্দ্রগুপ্ত। ইনি ময়ূরপোষক-কুলোৎপন্ন।

এইদিক থেকে ভেবে দেখলে মনে হয় ময়ূর-টোটেম্-যুক্ত কোনো ট্রাইব্যাল-সমাজ থেকে মৌর্যবংশের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এখনো সূত্রটিকে অনুসরণ করে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেননি।

সিদ্ধিদাতা গণেশের বেলাতেও এই জাতীয় সূত্র থেকে গিয়েছে এবং দক্ষ ঐতিহাসিকদের পক্ষে সেই সূত্র অনুসরণ করে সেকালের ভারতবর্ষের আর একটি বিখ্যাত রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব-কাহিনী উদ্ধার করা বোধ হয় অসম্ভব নয়। ওই সূত্রগুলি ঠিক কী? এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে প্রাচীন মিশরে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব-কাহিনী নিয়ে মরেট ও ডেভি[১৭] যে-সার্থক গবেষণা করেছেন তার কিছুটা উল্লেখ করবো। কেননা, আমাদের ধারণায় উক্ত বিদ্বানেরা যে-ভাবে অগ্রসর হয়েছেন গুপ্ত-রাষ্ট্রের আবির্ভাব প্রসঙ্গেও সেই পথে অগ্রসর হবার অবকাশ আছে।

মিশরের ইতিহাসে যিনি প্রথম একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসলেন তাঁর নাম মেনেস। কিন্তু মেনেস-এর পক্ষে এই একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসবার যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তা ভারি অদ্ভুত ধরনের। বর্ণনাটি হলো: বাজপাখি গিলে খেলো বাকি সব জানোয়ার। মরেট ও ডেভির গবেষণা থেকে বোঝা যায়, এই বর্ণনাটি মেনেস-এর পক্ষে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসবার পক্ষে কেন সত্যিই এক নিখুঁত বর্ণনা। সূত্রটা হলো, মেনেস ছিলেন বাজপাখি-দলের প্রধান। বাজপাখি মানে তাই মেনেস-এর দলের টোটেম্-চিহ্ন। কিন্তু এই দলের নেতার পক্ষে অনেক বড়ো এলাকা জুড়ে রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়ক হতে হলে অন্যান্য দলগুলিকে পরাস্ত করা প্রয়োজন। মেনেস-এর দলের পরিচয় যে-রকম বাজপাখি তেমনি অন্যান্য দলের পরিচয়ও অন্যান্য জানোয়ার থেকেই। এখন, মরেট আর ডেভি দেখাচ্ছেন, মেনেস-এর পক্ষে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসবার ঠিক আগের যুগটিতে অঙ্কিত অনেক ছবি পাওয়া যাচ্ছে—এই ছবিগুলির বিষয়বস্তু হলো, নানান জানোয়ারের মধ্যে লড়াই চলেছে এবং সেই লড়াইতে জয় হয়ে চলেছে বাজপাখির। নানারকম টোটেম্-দলের মধ্যে যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে বাজপাখি-টোটেম্যুক্ত দলটির জয় আর কী ভাবে এঁকে বোঝানো যায়? চিত্রে মেনেস্-এর বিজয়কাহিনী সংক্রান্ত অন্যান্য যে-সব তথ্য পাওয়া যায় তাও এই টোটেম্-বিশ্বাসের দিক থেকেই বুঝতে পারা সম্ভব: ফাঁসিকাঠে-ঝোলানো শত্রুদের কথা আঁকা হয়েছে কয়েকটি জানোয়ারকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হিসেবেই, কিংবা, বিজিত মানুষদের যেখানে শিরঃ-ছেদ আঁকা হয়েছে সেখানে যদিও মানুষদের চেহারা মানুষ হিসেবেই আঁকা তবুও তারা কে-কোন দলের মানুষ তা বোঝাবার জন্যে ছিন্নমস্ত নরদেহগুলির উপরই জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকতে চিত্রকরেরা ভুলে যাননি। তাই, বাজপাখি গিলে খেলো বাকি সব জানোয়ার,—এই বর্ণনার অর্থ হলো বাজপাখি দলের কাছে পরাজয় ঘটলো অন্যান্য দলের মানুষদের[১৮]।

এই প্রসঙ্গেই মনে রাখতে হবে, মরেট এবং ডেভি দেখাচ্ছেন, বিজয়ী

মেনেস-এর পক্ষে রাজা হবার কাহিনীই হলো বাজপাখি-টোটেম্‌টির পক্ষে দেবতা হোরাস্‌ হয়ে যাওয়ার কাহিনীও। অর্থাৎ, রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ও দেবতার জন্ম স্বতন্ত্র কাহিনী নয়। টোটেম্‌-সমাজে উপাস্য-উপাসকে তফাত নেই, দলের প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে টোটেম্‌টির একাত্মভাব। তাই, এ-সমাজে আধুনিক অর্থে দেবতার বা আধুনিক অর্থে ধর্মভাবের কোনো অবকাশ নেই—কেননা, উপাস্য-উপাসকে তফাত না থাকলে সে-অবকাশ সম্ভব নয়। যে-দলের টোটেম্‌ হলো সূর্যমুখী ফুল সে-দলের সবাই বলবে, আমরা হলাম সূর্যমুখী ফুল ; যে-দলের টোটেম্‌ হলো সাময় হরিণ সে-দলের সবাই বলবে, আমরা হলাম সাময় হরিণ। তাই, বাজপাখি যতোদিন একটি দলের টোটেম্‌ ততোদিন পর্যন্ত ওই দলের সকলের মনেই বাজপাখির সঙ্গে একাত্ম-চেতনা : তারা সবাই বাজপাখি, বাজপাখি তখনো তাদের কাছে উপাস্য-দেবতার স্বাতন্ত্র্য পায়নি। কিন্তু সেই আদিম-সাম্যসমাজ ভেঙে যখন রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হলো তখন দলের ঐশ্বর্য এলো ব্যক্তিবিশেষের কবলে—মেনেস্‌-এর কবলে। তেমনি অধ্যাত্ম-শক্তিও কেন্দ্রীভূত হলো একজায়গায়—বাজপাখি আর বাজপাখি রইলো না, দেবতা হয়ে গেলো, সে-দেবতার নাম হোরাস্‌। অবশ্যই, রাজা মেনেস ও দেবতা হোরাস্‌—দু'-এর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তাই ছবিতে দেখা যায়, রাজার ধ্বজায় আঁকা হয়েছে বাজপাখি হোরাস্‌কে, দেখা যায় দেবতা হোরাস্‌ রাজার কাছে উপহার আনছে ক্রীতদাস। রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে অধ্যাত্মশক্তির আবির্ভাবের এই যোগাযোগটির কথা মূল্যবান[১৩৩]।

মিশর-ইতিহাসের এই বিচিত্র ঘটনাটি থেকে আমাদের দেশের প্রাচীন-যুগের ইতিহাস সংক্রান্ত কোনো তথ্য অনুমান করবার অবকাশ আছে কি? একটি টোটেমের পক্ষে দেবতায় পরিণত হওয়া নিশ্চয়ই আকস্মিক ঘটনা নয়, এবং তারই পাশাপাশি যদি কোনো রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হতে দেখা যায় তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান করবার সুযোগ থাকে যে, টোটেম্‌টির পক্ষে এই দেবত্বপ্রাপ্তি এবং ওই রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব সম্পর্কহীন ঘটনা নয়—যে-ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে এই রাষ্ট্রের উদয় হলো দেবত্বপ্রাপ্তির পূর্বে টোটেম্‌টিও সেই ট্রাইব্যাল সমাজেরই পরিচায়ক ছিলো। আমাদের এই অনুমান আরো জোরালো হবে যদি দেখা যায় নবোদিত রাষ্ট্রশক্তি নবজাত ওই দেবতাটির মাহাত্ম্যপ্রচারে প্রচুর উৎসাহের পরিচয় দিচ্ছে।

এই রকমই কিছুকিছু তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায় সিদ্ধিদাতার জন্মকথা-প্রসঙ্গে।

গণেশের নরদেহের উপরে ওই রকমের একটা গজানন কেন? এ-প্রশ্ন পুরাণকারেরাও তুলেছিলেন এবং আমরা দেখছি তাঁদের সমাধানগুলির

অসংলগ্নতা ও পরস্পর-বিরোধিতা থেকেই প্রমাণ হয় যে, এগুলি উত্তরকালের কৃত্রিম রচনা। এই জাতীয় কৃত্রিম সমাধানের পরিচয় আধুনিক পণ্ডিতমহলেও দুর্লভ নয়। কেননা, ওই গজানন থেকে গণেশের উৎস সম্বন্ধে একটিমাত্র তথ্যই অবধারিতভাবে প্রমাণ হয়—প্রমাণ হয় দেবতাটির আদিরূপটা, অর্থাৎ, প্রাগ্-দেবত্বপ্রাপ্তির রূপটা, ছিলো হাতি-টোটেম্। হাতি-টোটেমের কথায় বিস্মিত হবার কারণ নেই। আমাদের দেশের পুরোনো পুঁথিতে এ-জাতীয় টোটেমের উল্লেখ পাওয়া যায়[১০] এবং আধুনিক যুগের সেন্সাস-রিপোর্টেও দেখা যায় এই হাতি-টোটেমের উল্লেখ রয়েছে। আজো মহীশূর অঞ্চলে একদল মানুষের নাম হলো আনে[১১]—আনে মানে হাতি।

কোনো এক হাতি-টোটেম্ থেকেই যে গণেশের জন্ম হয়েছে তার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ হলো গণেশের ওই গজাননটি। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখা দরকার যে, এককালে গণপতি বা বিনায়ক শব্দের সঙ্গে শুধুমাত্র ওই হাতি-টোটেম্টিরই সম্পর্ক ছিলো না। তার বদলে, সন্দেহ হয়, এই গণপতি শব্দটি ছিলো প্রাণীজগতের রকমারি বাসিন্দার সঙ্গে সংযুক্ত একটি সাধারণ নামের মতো। আগেই বলেছি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখের রচনা থেকে বোঝা যায়, বিনায়ক এক ছিলেন না, বহু ছিলেন। তাই অনুমান করতে হবে, এই বহু-বিনায়কের মধ্যে গজাননধারী একটি নির্দিষ্ট বিনায়কই উত্তরকালে এক এবং অদ্বিতীয় বিনায়ক হয়ে দাঁড়ালেন—তিনিই আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশ। এবং ওই অন্যান্য বিনায়কদের চেহারা কী রকম ছিলো তা অনুমান করবার মতো অন্তত একরকম তথ্যের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। তন্ত্রসাহিত্যে গণেশের পঞ্চাশটি নামের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক নাম হলো, বৃষভধ্বজ, বৃষকেতন, দ্বিজিহ্ব। এই নামগুলি থেকেই অনুমান করবার সুযোগ থাকে যে, এককালে ওই বহু বিনায়কের বহুপ্রকার রূপ ছিলো,—কোনোটা সাপের মতো, কোনোটা বা ষাঁড়ের মতো।

এই জাতীয় বহু টোটেম্-রূপী বিনায়কদের মধ্যে গজাননধারী নির্দিষ্ট একটি বিনায়ক সিদ্ধিদাতা দেবতা হয়ে উঠলেন এবং তাঁরই গৌরব-প্রচারে মুখর হয়ে উঠলো শাসক-শ্রেণীর সাহিত্য ও ভাস্কর্য। অথচ, তার আগের যুগের শাসক-শ্রেণীর সাহিত্যই বিনায়ক-বিদ্বেষে বিষাক্ত হয়েছিলো, বিনায়ককে চেনবার চেষ্টা ছিলো বিঘ্নরাজ বলেই।

বিঘ্নরাজ থেকে সিদ্ধিদাতা। ঘৃণিত, আতঙ্কসঞ্চারী টোটেম্-রূপী বহু বিনায়কদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিনায়কের এই দেবত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে কি ভারতীয় ইতিহাসে কোনো রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাবের সম্পর্ক আছে? আছে। তার নাম গুপ্তরাষ্ট্র। সম্পর্কটা কী রকম? আনন্দকুমার কুমারস্বামী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে গণেশ-মূর্তির

আবির্ভাব আকস্মিকভাবেই বহুল—অর্থাৎ কিনা, গুপ্তযুগ থেকেই দেখা গেলো হঠাৎ বহুলভাবে গণেশ-মূর্তির আবির্ভাব ঘটতে শুরু করেছে। পুরাণগুলিও যে, অমনভাবে সিদ্ধিদাতার মাহাত্ম্যে মেতে উঠলো তাও ওই যুগটা বরাবর হওয়া অসম্ভব নয় : স্কন্দপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ,—অর্থাৎ, যে-দুটি পুরাণে বিশেষ করে গণেশ মাহাত্ম্যের প্রচার হয়েছে,—গুপ্তযুগ বরাবরই রচিত কি না এ-বিষয়ে বিদ্বানেরা নিশ্চয়ই চিন্তা করতে পারেন ; কিন্তু স্যর গোপাল ভাণ্ডারকর[১১২] ইতিপূর্বেই অনুমান করেছেন যে, গুপ্তযুগে সমস্ত পুরাণগুলিকেই অন্তত ঢেলে সাজানো হয়েছিলো।

মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কানেও[১১৩] মানছেন, গুপ্তযুগ থেকেই গণেশ মাহাত্ম্যের প্রচার শুরু হয়েছে।

তাই রকমারি টোটেম্-রূপী বহু বিনায়কের মধ্যে গজরূপী নির্দিষ্ট বিনায়কটির পক্ষে দেবত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে সেকালের ভারতবর্ষে একটি রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব-কাহিনীরও সম্পর্ক রয়েছে। মরেট ও ডেভির মিশর-ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা থেকে আমরা যদি শিক্ষালাভ করতে প্রস্তুত থাকি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে সন্দেহ করা অন্যায় হবে না যে, সিদ্ধিদাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই হয়তো গুপ্ত-রাষ্ট্রের আবির্ভাব-কাহিনীর উপর আলোকপাত করবার আশা আছে। কেননা, গুপ্ত-রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঠিক কীভাবে হয়েছিলো ভারতীয় ইতিহাসে তা আজো অনেকাংশে অমীমাংসিত প্রশ্ন। বিদ্বানেরা ভেবে দেখতে পারেন, হাতি-টোটেম্‌যুক্ত কোনো ট্রাইব্যাল সংগঠন ভেঙে এই রাষ্ট্রের আবির্ভাব সম্ভব কি না। আলবারুণী[১১৪] নাকি গুপ্তবংশের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এক অরণ্যবাসী দুর্দান্ত দস্যুদের কথাই উল্লেখ করেছেন। তার মানে, তা কোনো এক ট্রাইব্যাল সংগঠন হওয়া অসম্ভব নয়। সেই ট্রাইবের সঙ্গে হাতি-টোটেমের কোনো সম্পর্ক ছিলো কি না এই প্রশ্ন অনুসন্ধান-যোগ্য।

অবশ্যই, এখানে সে-অনুসন্ধান চালাবার যোগ্যতা আমাদের নেই, সুযোগও নেই। কিন্তু গণপতির বিচিত্র ইতিহাসের তৃতীয় পর্যায়টির ব্যাখ্যায় আলোচনার অন্তত একটা বহিঃরেখা দাঁড় করাবার প্রয়োজন ছিলো। এই তৃতীয় পর্যায়টি হলো, বিঘ্নেশ্বর থেকে সিদ্ধিদাতায় পরিণত হবার কাহিনী। আমরা দেখলাম, অন্তত কালনির্ণয়ের দিক থেকে এই কাহিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাবের সম্বন্ধ আছে।

সংক্ষেপে, গণেশের ইতিহাসে মোটের উপর তিনটি পর্যায় দেখা যায়। ভারতীয় সমাজ-ইতিহাসের সঙ্গে এই তিনটি পর্যায়ের সম্পর্ক রয়েছে।

এক : পৃথিবীর সব-মানুষের মতোই বৈদিক আর্য এবং অনার্য উভয়

প্রকার মানুষই এককালে প্রাগ্-বিভক্ত ট্রাইব্যাল সমাজে জীবন-যাপন করেছে। এই ট্রাইব্যাল সমাজেরই নাম হলো গণ। ফলে, বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতর পর্যায়গুলিতে গণ বা গণপতি নিন্দিত নয়।

দুই : ভারতবর্ষের মানুষদের উন্নতি হয়েছে অসমান তালে। তাই, রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হবার পরও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পাশাপাশিই থেকে গিয়েছে গণসমাজ। এই অবস্থায়, রাষ্ট্রশক্তির মুখপাত্রেরা গণসমাজকে কী রকম ঘৃণার চোখে দেখেছেন তার নজির মহাভারতে পাওয়া যায় এবং তাঁরা তাই গণপতিকেও কী রকম বিষনজরে দেখেছেন তার নজির পাওয়া যায় মানব-গৃহ্যসূত্র, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি প্রভৃতিতে।

তিন : একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পাশাপাশি বহু বিনায়কের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিনায়ককে বিঘ্নরাজের বদলে সিদ্ধিদাতা দেবতার সম্মান পেতে দেখা যায়। এই তৃতীয় পর্যায়টির ব্যাখ্যা পাবার আশায় আমরা সন্দেহ করলাম, যে-ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে উক্ত রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে সেই ট্রাইব্যাল-সমাজের সঙ্গে উক্ত বিনায়কটির যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধানযোগ্য।

অবশ্যই, ওই তৃতীয় পর্যায়টির ব্যাখ্যা হিসেবে আমাদের এই সন্দেহের পক্ষে খুব জোরালো কোনো প্রমাণ এখানে দেওয়া গেলো না। প্রাচীন মিশর-ইতিহাসের একটি পরিস্থিতি সংক্রান্ত গবেষণা আমাদের সাধারণভাবে এই সন্দেহের দিকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু এই তৃতীয় পর্যায়টি সংক্রান্ত উক্ত সন্দেহের উপর আমাদের মূল যুক্তির ঐকান্তিক নির্ভরতাও নেই। কেননা, আমাদের উদ্দেশ্য হলো লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস-অন্বেষণ। এবং আমাদের মূল যুক্তি হলো, প্রাগ্-বিভক্ত আদিম সমাজের মধ্যেই এই ধ্যানধারণাগুলির উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই গণপতির ইতিহাসের বিশেষ করে প্রথম পর্যায়টির কথাই আমাদের যুক্তির পক্ষে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক।

ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ

কিন্তু এইখানে আরো একটু কথা আছে। প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা দেখেছি যে, লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস সমাজ-ইতিহাসের যে-পর্যায়েই হোক না কেন, একেবারে আধুনিক যুগেও আমাদের দেশ থেকে তা বিলুপ্ত হয়নি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে-রকম দেখাচ্ছেন, আজো সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ওই লোকায়তিক ধ্যানধারণাই

টিকে রয়েছে। যদি তাই হয়, এবং ধ্যানধারণা যদি স্বয়ম্ভূ বা স্বাবলম্বী না হয়—অর্থাৎ, সামাজিক পরিস্থিতিই যদি ধ্যানধারণার অনিবার্য ভিত্তি হয়, —তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান করতে হবে যে, ভারতীয় ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্যই হলো উত্তরকালের সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের দেশে প্রাচীন-সমাজের, অর্থাৎ ট্রাইব্যাল-সমাজের—অনেক চিহ্নই টিকে থেকেছে। তা না হলে, যে-সব ধ্যানধারণায় প্রাচীন সমাজ-জীবন প্রতিবিম্বিত তা আজকের সমাজেও এমনভাবে টিকে থাকতে পারতো না।

সাধারণভাবে আমরা যেগুলিকে তান্ত্রিক ধ্যানধারণা বলি, উদাহরণ হিসাবে সেইগুলির উল্লেখ করা যায়। আমরা দেখাবার চেষ্টা করছি, এই জাতীয় ধ্যানধারণা আমাদের দেশের মানুষদের মাথায় আকস্মিকভাবে দেখা দেয়নি, এগুলিকে ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের বিকৃত চিন্তাধারা বলেও বর্ণনা করা যায় না। সমাজবিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে অবশ্যম্ভাবী-ভাবেই এগুলি মানুষের মাথায় এসেছে—এবং তা শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও। কিন্তু সেই সঙ্গেই মানতে হবে, আধুনিক যুগে আমাদের দেশের মানুষ সমাজ-বিকাশের যে-পর্যায়েই থাকুক না কেন, ওই জাতীয় ধ্যানধারণাগুলি তাদের চেতনা থেকে মুছে যায়নি। আর, তা যদি সত্যিই মুছে গিয়ে না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান করা দরকার যে, তাদের সমাজ জীবন থেকেও সেই প্রাচীন-সমাজের সমস্ত চিহ্ন নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হয়নি।

এক কথায়, এইজাতীয় ধ্যানধারণার উৎস যদি ট্রাইব্যাল-সমাজের কোনো পর্যায় হয় এবং যদি দেখা যায় আধুনিক যুগেও এই জাতীয় ধ্যানধারণা মানুষের মনে বেঁচে রয়েছে তাহলে মানতেই হবে আমাদের দেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলগুলিতে, ট্রাইব্যাল সমাজের বিনাশ সত্যিই পরিপূর্ণ হয়নি।

লোকায়ত-ধ্যানধারণার আলোচনায়—বিশেষ করে আজকের যুগেও লোকায়ত ধ্যানধারণা কীভাবে বেঁচে থাকতে পারে তার ব্যাখ্যা খোঁজবার আশায়—আমরা ঠিক এই প্রকল্প বা হাইপথেসিস্ থেকেই অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছি : গণসমাজের বা ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ বা *incomplete detribalisation* সংক্রান্ত প্রকল্প।

ঠিক কোন ধরনের তথ্যের উপর নির্ভর করে আমরা এই হাইপথেসিস্‌টি প্রণয়ন করবার চেষ্টা করেছি? সে-কথার পরিচয় দিতে হলে অবশ্যই আমাদের পক্ষে মূল আলোচনা থেকে বেশ কিছুটা বিক্ষিপ্ত হতে হবে। তার দরুন পাঠকদের পক্ষে ক্লান্তিবোধ অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের ধারণায় উক্ত হাইপথেসিস্ শুধুমাত্র লোকায়তিক চেতনার উপরই আলোকপাত করে না; বস্তুত, এরই সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতির নানান বৈশিষ্ট্য বোধগম্য হতে পারে।

তাই, আমরা আশা করছি, আলোচনায় অনেকদূর বিক্ষিপ্ত হবার ক্লান্তি সত্ত্বেও পাঠকবর্গ আমাদের ক্ষমা করতে পারেন।

আমাদের এই বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করবার আশায় গণপতির ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই আলোচনা শুরু করা বাঞ্ছনীয় হবে।

গণ-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ : কৌটিল্যের সংঘবৃত্ত

আমরা বলতে চেয়েছি, আমাদের দেশে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হবার পরও তারই পাশাপাশি ট্রাইব্যাল সমাজ টিকে থেকেছিলো। রাষ্ট্রশক্তির মুখপাত্রেরা সেই ট্রাইব্যাল সমাজগুলিকে মোটেই সুনজরে দেখেননি। ধর্মচেতনার স্তরে ওই বিরুদ্ধ মনোভাবটির পরিচয় পাওয়া যায় সেকালের বিনায়ক-বিদ্বেষের মধ্যে, সমাজচেতনার স্তরে মহাভারতের বাহীক বর্ণনায় এবং সুস্পষ্ট রাজনীতির স্তরে কৌটিল্যের সংঘবৃত্ত নামের অধিকরণে।

সেকালের শাসকশ্রেণী ওই গণ বা সংঘগুলিকে ভাঙবার উৎসাহে যে কতোদূর নির্লজ্জ ও দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও কুণ্ঠিত হয়নি তারই নিদর্শন হলো কৌটিল্যের রচনা। কেননা, আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো, এই উদ্দেশ্যে কৌটিল্য মদ্য ও গণিকার বহুল ব্যবহার করতে বলেই ক্ষান্ত নন, সধবা ও বিধবা নারী এবং সন্ন্যাসী-বেশধারী গুপ্তচর কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তারও বর্ণনা খুঁটিয়েই দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কৌটিল্যের পক্ষে এই গণগুলি নিয়ে এতো মাথাব্যথা কেন? সে-প্রশ্নের জবাব তিনি শুরুতেই দিয়ে দিয়েছেন: আসল কথা, গণগুলি অধৃষ্য ও অজয্য। তাই এগুলিকে যদি মিত্রভাবে পাওয়া যায় তাহলে রাজার পক্ষেও অধৃষ্য হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা[১১৫]। কিন্তু, গণসমাজের এই শক্তিটার উৎস ঠিক কী? এক কথায় তার জবাব হলো, গণের একতা,—গণবন্ধন বা *group-bond*[১১৬]। জুলু কাফিরদের বর্ণনায় এঙ্গেল্‌স্‌ ঠিক এই কথাই বলেছেন এবং সাম্প্রতিক ভারতীয় ইতিহাসেও—সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে শুরু করে অতি-আধুনিক কালের গারো-হাজঙ ও তেলেঙ্গানায় লাম্বাড়ি প্রভৃতিদের বিদ্রোহ পর্যন্ত—শাসকশ্রেণীর মুখপাত্রেরাও বারবার এই কথাই স্বীকার করে গিয়েছেন[১১৭]। অতএব, কৌটিল্যও যে বলবেন, ছলে-বলে-কৌশলে, ঘুষ দিয়েই হোক আর যে-করেই হোক, সর্বপ্রথম গণগুলিকে হাত করবার চেষ্টা করতে হবে,—এ-বিষয়ে আশ্চর্য হবার সত্যিই কারণ নেই।

অবশ্যই, কৌটিল্যের লেখা পড়লে বুঝতে পারা যায়, ঘুষের সাহায্যে এই গণগুলিকে হাত করবার বাস্তব সম্ভাবনাটা সত্যিই সংকীর্ণ ছিলো। কেননা, এ-কথা একটিবার মাত্র উল্লেখ করে[১১৮] কৌটিল্য বাকি অধিকরণটি জুড়ে বর্ণনা করছেন কেমনভাবে এই সংঘগুলিকে ধ্বংস করা সম্ভবপর। সংঘের মূল শক্তিটা যেহেতু তার একতা বা গণবন্ধন সেইহেতু কৌটিল্যের পক্ষে সংঘগুলিকে ভাঙবার কৌশল হিসেবে বিভেদ-সৃষ্টির কথাই প্রাসঙ্গিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁর রচনাটি যে-কারণে সত্যিই চিত্তাকর্ষক তা হলো এই বিভেদ-সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি যে-সব রকমারি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেছেন তারই তালিকা। মহাভারতে বাহীকদের বর্ণনা দেবার সময় শাসক-সম্প্রদায়ের মুখপাত্রেরা ঘৃণাভরে বলছেন, বাহীকেরা হলো পৃথিবীর মল-স্বরূপ। তার কারণ গণসমাজের ওই সহজ-সরল মানুষগুলির মধ্যে "সদাচারের" পরিচয় নেই। কিন্তু ওই গণসমাজকে ধ্বংস করবার জন্যেই শাসক সম্প্রদায়ের মুখপাত্রেরা যখন জঘন্যতম মিথ্যার ও নির্লজ্জতম ব্যবস্থার কথা অবলম্বন করতে বলেন তখন "সদাচার" বলে শব্দটির উপর থেকে মুখোসটা সত্যিই খুলে পড়ে না কি? তাছাড়া আরো একটি কথা আছে। মহাভারতের বর্ণনাদাতা সদাচারের পরাকাষ্ঠা ওই ব্রাহ্মণেরা বলছেন, "নিতান্ত নিগূঢ় কারণবশতঃ" তাঁরা গণসমাজগুলিতে বাস করতে গিয়েছিলেন। কৌটিল্যের ব্যবস্থা থেকে অনায়াসেই অনুমান করা যায়, এই নিগূঢ় কারণটি ঠিক কী রকম? সাধুবেশে চর হয়ে গণসমাজগুলির মধ্যে মিথ্যা কথা প্রচার করা, গণিকা ও মদ ব্যবহার করে গণসমাজের মানুষগুলির মধ্যে নৈতিক অধঃপতন ঘটানো—তাছাড়া ওই নিগূঢ় কারণ আর কিছুই নয়। শাসক-সম্প্রদায়ের "সদাচার" সংক্রান্ত দম্ভের উপর এই হলো চূড়ান্ত ভাষ্য।

কৌটিল্যের কথাগুলি সেদিক থেকে সত্যিই চিত্তাকর্ষক। পুরো অধিকরণটি উদ্ধৃত করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু জায়গার অভাবে তা সম্ভব হবে না। কৌটিল্য[১১৯] বলছেন :

> …সংঘের আসন্নবর্তী হইয়া (বিজিগীষুর) সত্রিনামক গূঢ় পুরুষগণ সংঘগুলির পরস্পরের মধ্যে দোষ, দ্বেষ বা রোষ, অপকারাদি-নিমিত্তক বৈর বা দ্রোহ ও কলহের কারণ উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগের মধ্যে ক্রমশ অনুপ্রবেশিত ভেদ ঘটাইবে এবং বলিবে, 'অমুখ সংঘ তোমাদিগের সংঘের এইরূপ অপবাদ করে'। (অন্য সংঘের প্রতিও এইভাবে বলিয়া) তাহারা উভয়পক্ষমধ্যে ভেদ আনয়ন করিবে। পরস্পরের প্রতি রুষ্টভাবাপন্ন সংঘীদিগের মধ্যে আচার্যব্যঞ্জন গূঢ়পুরুষগণ বিদ্যা, শিল্প, দ্যূত ও বৈহারিক বিষয়ে বালকলহ উৎপাদন করাইবে। ……(সংঘমধ্যে) হীনগণের সহিত বিশিষ্টগণের এক পংক্তিতে ভোজন ও বিবাহসম্বন্ধ তাহারা নিবারণ করিবে।…অথবা, (সংঘমধ্যে) কোনো ব্যবহার

ন্যায্যভাবে নির্ণীত হইলেও, তাহারা ইহার বিপরীত ন্যায় সমর্থন করিয়া শুনাইবে বা বুঝাইবে। অথবা, তীক্ষ্ণ নামক গূঢ়পুরুষেরা, রাত্রিতে সংঘীগণমধ্যে কোনো বিবাদবিষয় উপস্থিত হইলে, (একপক্ষের) দ্রব্য, পশু ও মনুষ্য নষ্ট করিয়া (অপর কোনও পক্ষের উপর সেই নাশের দোষ আরোপ করিয়া) তাহাদের মধ্যে কলহ উৎপাদন করিবে।…বিক্রমের অবসর উপস্থিত হইলে, শৌণ্ডিক ও সৌরিকের বেশধারী গূঢ়পুরুষগণ নিজেদের পুত্র ও স্ত্রীর মরণচ্ছলে, ইহা (প্রেতের উদ্দেশ্যে দেয়) 'নৈষেচনিক' নামক মদ্য—এই বলিয়া মদনরসযুক্ত শতশত মদ্য কুম্ভ (সংঘের নিকট) প্রদান করিবে।………অথবা, কুলটা স্ত্রীর পোষণকারী, অথবা, প্লবক, নট, নর্তক ও সৌভিকগণের (ঐন্দ্রজালিকগণের) বেশধারী গূঢ়পুরুষেরা গুপ্তচরের কার্যে ব্যাপারিত থাকিয়া, পরমরূপযৌবনবিশিষ্টা স্ত্রীলোকদ্বারা সংঘমুখ্যদিগকে উন্মাদিত করিবে। সংঘমুখ্যেরা এইভাবে স্ত্রীকামী হইলে, তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্যতমের কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া (মিলনের সংকেতস্থান ঠিক হইলে) সেই রমণীকে অন্য এক সংঘমুখ্যদ্বারা অন্যত্র নেওয়াইয়া বা অন্য সংঘমুখ্য তাহাকে অপহরণ করিয়া নিয়াছেন বলিয়া মিথ্যা কথা রটনা করাইয়া, সংঘমুখ্যদিগের মধ্যে তাহারা কলহ উৎপাদন করিবে। এইভাবে কলহ উৎপন্ন হইলে তীক্ষ্ণ নামক গূঢ়পুরুষেরা তাহাদের নিজ কার্য সমাধা করিবে, অর্থাৎ কোনো একজন সংঘমুখ্যের হত্যাসাধন করিবে এবং রটাইয়া দিবে, 'এই কামুক ব্যক্তি প্রতিকামুক অন্য ব্যক্তি দ্বারা হত হইয়াছে'। অথবা, এই সংঘমুখ্যগণমধ্যে যদি কেহ ঝগড়া করিতে না চাহেন, তাহা হইলে সেই রমণী এই প্রকার বলিবে—'আপনার প্রতি আমি জাতকামা হই—ইহাতে অমুখ সংঘমুখ্য বাধাপ্রদান করেন অর্থাৎ তিনি ইহা ইচ্ছা করেন না। তিনি জীবিত থাকিলে আমি আর এখানে (আপনার নিকট) থাকিতে পারি না'—এই বলিয়া সে তাঁহার বধের আয়োজন করিবে। অথবা, যদি কোনো সংঘমুখ্য তাহাকে বলাৎকারপূর্বক অপহরণ করিয়া কোনো জঙ্গলে বা ক্রীড়াগৃহে (সংকেতগৃহে) লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষেরা হত্যা করাইবেন, অথবা, সে স্বয়ং বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিবে। তাহার পর সেই রমণী এইরূপ প্রকাশ করিবে—'অমুখ (প্রতিকামুক) ব্যক্তির দ্বারা আমার প্রিয়জন হত হইয়াছেন'। অথবা, সিদ্ধপুরুষের বেশধারী কোনো গূঢ়পুরুষ কোনো স্ত্রীকে জাতকাম সংঘমুখ্যকে বশীকরণের উপযোগী ওষধিসমূহের প্রয়োগের ছল করিয়া, বিষমিশ্রিত ঔষধের প্রয়োগদ্বারা ঠকাইয়া (তাঁহার বধসাধনপূর্বক) পলাইয়া যাইবে। সে পলাইয়া গেলে পর, অন্য সত্রী পুরুষেরা প্রকাশ করিবে যে, অন্য একজন প্রতিকামুক দ্বারা প্রেরিত হইয়াই সেই সিদ্ধপুরুষ তাঁহার বধসাধন করিয়াছেন। অথবা, ধনী বিধবা স্ত্রীলোক, অথবা (সধবা হইলেও দারিদ্র্যাদি-দোষে) গূঢ়ভাবে ব্যাভিচারকারিণী স্ত্রীলোক ও কপট স্ত্রীলোক (অর্থাৎ স্ত্রীবেশধারী পুরুষজন) দায় ও নিক্ষেপ সম্বন্ধী বিবাদে রত হইয়া (নির্ণয়ার্থ) সংঘমুখ্যগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে উন্মাদিত করিবে। অথবা, অদিতিস্ত্রী (অর্থাৎ, নানাপ্রকার দেবতার ছবি প্রদর্শন করিয়া জীবিকাকারিণী স্ত্রী), কৌশিক-স্ত্রী (সর্পগ্রাহীদিগের স্ত্রী), নর্তকী ও গায়িকা স্ত্রী (এইভাবে)

সংঘমুখ্যদিগকে উন্মাদিত করিবে। এই প্রকার ভাবে উন্মাদিত হইয়া বশীকৃত সংঘমুখ্যদিগকে সংকেতের গূঢ়গৃহে রাত্রিতে সমাগমার্থ প্রবেশ করিলে তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষেরা তাঁহাদিগকে বধ করিবে, কিংবা, বন্ধনপূর্বক অপহরণ করিবে। অথবা, কোনো সত্রী গূঢ়পুরুষ সংঘমুখ্যকে এইভাবে জানাইবে—'অমুখ গ্রামে দরিদ্রকুলজাত অমুখ পুরুষ (জীবিকার জন্য) অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, তাহার স্ত্রী রাজার ভোগের যোগ্যা, তাহাকে আপনি স্বীকার করিয়া লউন'। সেই স্ত্রী (সংঘমুখ্যদ্বারা) গৃহীত হইলে, পনেরো দিবস পরে সিদ্ধবেশধারী এক দূষ্য সংঘমুখ্যদিগের মধ্যে যাইয়া এইরূপভাবে আক্রন্দন বা চিৎকার করিয়া বলিবে,—'এই মুখ্যপুরুষ আমার ভার্যা, পুত্রবধূ, ভগিনী বা কন্যাকে বলাৎকারে ভোগ করিতেছেন'। যদি সংঘ সেই মুখ্যকে নিগৃহীত করে, তাহা হইলে (বিজিগীষু) রাজা তাঁহাকে স্ববশে আনিয়া অন্যান্য প্রতিকূলচারী মুখ্যদিগের উপর তাঁহাকে উত্যক্ত করিবেন। আর যদি সেই মুখ্য সংঘকর্তৃক নিগৃহীত না হন, তাহা হইলে তীক্ষ্ণগণ রাত্রিতে সেই সিদ্ধবেশধারী দূষ্য পুরুষকে হত্যা করিবে। তৎপর অন্যান্য সিদ্ধব্যঞ্জক গূঢ়পুরুষেরা চিৎকার করিয়া বলিবে—'এই সংঘমুখ্য পুরুষ ব্রহ্মঘাতী এবং তিনি ব্রাহ্মণীর সহিত জারকর্মে রত ছিলেন'। অথবা, কার্তান্তিক বা দৈবজ্ঞের বেশধারী গূঢ়পুরুষ (সংঘমুখ্যগণের) অন্যতমদ্বারা বৃতা (কোনো ব্যক্তির) কন্যাসম্বন্ধে অন্যতম সংঘমুখ্যের নিকট এইভাবে বুঝাইবে—'অমুখ ব্যক্তির কন্যা যাঁহার পত্নী হইবে, তিনি রাজা হইবেন এবং সে-কন্যা যে-পুত্র প্রসব করিবে তিনিও রাজা হইবেন ; অতএব, সর্বস্বদানে, বলাৎকারপূর্বক সেই কন্যাকে লাভ কর'। (সেই বোধিত সংঘমুখ্যদ্বারা) যদি সেই কন্যা লব্ধ না হয়, তাহা হইলে পূর্ববরণকারীপক্ষকে তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিবে। আর যদি (সেই সংঘমুখ) সেই কন্যাকে লাভ করিতে পারে, তবে (পূর্ববরয়িতা ও পরবর্তী যাচক—এই উভয়ের মধ্যে)—কলহ সিদ্ধ হইবে। অথবা, ভিক্ষুকী-বেশধারী স্ত্রী-গুপ্তচর ভার্যাপ্রেমরত কোনো সংঘমুখ্যকে এইরূপ বলিবে—'অমুখ যৌবনদৃপ্ত মুখ্য আপনার ভার্যার প্রতি (কামলোলুপ হইয়া) তাঁহার নিকট আমাকে (দূতীরূপে) পাঠাইয়াছেন। তাঁহার ভয়ে আমি এই পত্র ও আভরণ লইয়া এখানে আসিয়াছি। আপনার ভার্যা নির্দোষা। আপনি গূঢ়ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিকারের চেষ্টা করুন (অর্থাৎ তাঁহার বধোপায় নির্ধারণ করুন)। (যতক্ষণ আপনি তাহা না করেন) ততক্ষণ আমিও আপনার নিকট অবস্থান অঙ্গীকার করিব'। এই প্রকার কলহকারণ উপস্থিত হইলে, কিংবা, (উপজাপ ব্যতীত) আপনা হইতেই কলহ উৎপন্ন হইলে, অথবা, তীক্ষ্ণ পুরুষগণদ্বারা কলহ উৎপাদিত হইলে, (বিজিগীষু) রাজা অল্পশক্তি-বিশিষ্ট সংঘমুখ্যকে কোষ ও দণ্ডদ্বারা নিজ বশে আনিয়া তাঁহাকে প্রতিকূলচারী অন্যান্য সংঘমুখ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতে নিয়োজিত করিবেন…

মহাভারতে ভীষ্ম বলেছিলেন, গণগুলির মধ্যে লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি দেখা দিলে পর সেগুলির অভ্যন্তরীণ একতা ভেঙে যায় এবং এইভাবেই গণের বিনাশ

হয়। কিন্তু কৌটিল্যের রচনা পড়লে বোঝা যায়, গণসমাজের ওই সহজ-সরল মানুষগুলির মধ্যে লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি আপনি-আপনি জাগে না—তা জাগাবার জন্যে রাষ্ট্রশক্তির তরফ থেকে সাধু-বেশধারী গুপ্তঘাতক, সধবা বিধবা ও গণিকা, মদনরসমিশ্রিত মদ্য ইত্যাদি অনেক কিছুই পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয়।

গণ-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ : ভারতবর্ষের মানুষ

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই জাতীয় নীতিগর্হিত নানান উপায়ে গণ বা সংঘের একতা ভাঙবার পর সে-সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে ঠিক কী ব্যবস্থা করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে কৌটিল্য যা বলছেন তা শুধুই চিত্তাকর্ষক নয়, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বোঝবার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

প্রথমত, কৌটিল্য বলছেন, রাজা এই মানুষগুলিকে নিজের সৈন্যদলে ভর্তি করবার চেষ্টা করবেন। 'সর্বপ্রকার কলহ-বিষয়েই রাজা হীনপক্ষকে কোষ ও দণ্ডদ্বারা স্বপক্ষে আনিয়া তাহাকে নিজ-প্রতিপক্ষ বা শত্রুর বধে নিযুক্ত করিবেন'[১৮০]। আমরা ব্রিটিশ আমলে যে-রকম দেখেছি—কোষ ও দণ্ড দ্বারাই ট্রাইব্যাল সমাজ থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্যে কামানের খোরাক সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা—অনেকটা সেই রকমই নয় কি? ব্রিটিশ আমলের কথা না-হয় আলাদা। কিন্তু কৌটিল্যের বহুদিন পরেও তাঁর এই নীতিটি যে ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কেরা বাস্তবে প্রয়োগ করতেন তা অনুমান করবার মতো একটি তথ্যের উল্লেখ করা যায়। অষ্টম ও নবম শতাব্দীর ধর্মপাল ও দেবপালের শিলালিপিতে তাঁদের সৈন্যবাহিনীর যে-বর্ণনা পাওয়া[১৮১] যায় তা থেকে স্পষ্টই অনুমান করা সম্ভব যে, নানা রকম ট্র্যাইব্যাল মানুষ নিয়েই এই সৈন্যদল গঠিত হয়েছিলো। কেননা, এই সৈন্যদলের বর্ণনায় যে-সব মানুষদের নাম পাওয়া যায় সেই নামগুলি প্রায়ই সরাসরি ট্র্যাইব্যাল নাম। তার মানে, রাজার সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত হবার পরও ওই ট্রাইব্যাল মানুষেরা নিজেদের ট্রাইব্যাল নামগুলিকে ছেড়ে দেয়নি।

দ্বিতীয়ত, কৌটিল্য[১৮২] বলছেন, গণ-সমাজ থেকে উৎপাটিত ওই মানুষগুলিকে পাঁচ-ঘর বা দশ-ঘর এই রকম ছোটো-ছোটো দলে বিভক্ত করে আলাদা-আলাদা ছোটো-ছোটো গ্রামে বসিয়ে কৃষিকার্যে নিযুক্ত করতে হবে: দশকুলিং পঞ্চকুলিং বা কৃষ্যাং নিবেশয়েৎ—'ভূমিতে কৃষিকর্ম করিতে যোগ্য ইহাদের

কুলপঞ্চক বা কুলদশক লইয়া (ভিন্নভিন্ন) গ্রামনিবেশ করাইবেন'। মনে রাখতে হবে, কৌটিল্য বিশেষ করে উপদেশ দিচ্ছেন, এই গ্রামগুলি যেন স্বতন্ত্র ও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়। কেননা, গণসমাজের প্রধান শক্তি—এবং, অতএব, রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে গণসমাজ সম্বন্ধে আতঙ্কের প্রধান কারণ হলো—গণবন্ধন বা মানুষগুলির মধ্যে একতা। ইংরেজীতে, *group-bond*। তাই কৌটিল্যের কাছে গণসমাজকে ভাঙবার প্রধানতম কৌশল হলো এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। অতএব, গণসমাজকে ভাঙবার পর যে-সতর্কতা অবলম্বন করবার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো ওই মানুষগুলি যাতে আবার না এক হতে পারে। ওরা আবার এক হতে পারলেই রাজার বিরুদ্ধে আয়ুধ ধারণ করবে। তাই, এরা আবার এক হবার উপক্রম করছে দেখলে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। কৌটিল্য[১৮৩] বলছেন, 'ইহাদিগকে একত্র হইয়া থাকিতে দিলে, ইহারা (বিজিগীষু রাজার বিরুদ্ধে) শস্ত্রগ্রহণে সমর্থ হইয়া উঠিতে পারে। এবং ইহারা সমবেত হইয়া অবস্থান করিলে, (তিনি) ইহাদের উপর দণ্ড বিধান করিবেন'।

কৌটিল্যের এই দ্বিতীয় নির্দেশটির মূল্যই সবচেয়ে বেশি। কেননা, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বোঝবার ব্যাপারে এখান থেকেই একটি মূল্যবান সূত্র পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কৌটিল্য ঠিক কে ছিলেন,—এমনকি তিনি একান্তই কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা—এই জাতীয় সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান আমাদের পণ্ডিত-মহলে হয়তো আজো হয়নি। তবে, সাধারণত ধরে নেওয়া হয় তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মন্ত্রণার উপরই মৌর্যসাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিলো। যদি তাই হয় তাহলে তাঁকে যীশুখ্রীষ্টের অন্তত সওয়া তিন শ' বছর আগেকার মানুষ মনে করতে হবে। কিন্তু এ-কথাতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, যীশুখ্রীষ্টের বহু শতাব্দী পর পর্যন্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কেরা এই অর্থশাস্ত্রকেই নিজেদের মূলমন্ত্র করবার চেষ্টা করেছেন। তার মানে, কৌটিল্যের ওই নীতিটি—ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে সে-সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে ছোটো ছোটো স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিমূলক গ্রাম নিবেশ করতে হবে—আমাদের দেশে বহুদিন পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়েছে।

আমাদের এই অনুমানের পক্ষে এখানে একটি তথ্যের উল্লেখ করা যায়। তথ্যটি হলো ভারতবর্ষের মানুষদের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ।

অবশ্যই, নির্ভরযোগ্য সেন্সাস রিপোর্ট বলতে খুব পুরোনোকালের বিশেষ কোনো দলিল পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষিই সর্বপ্রথম দেশের মানুষগুলিকে ভালো করে গুনে দেখবার ও তাদের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছিলো[১৮৪]। এতো সাম্প্রতিক

কালের হলেও এই রিপোর্টের থেকে কয়েকটি বড়ো চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্যন্ত (এবং আধুনিকতম রিপোর্ট অনুসারে নিশ্চয়ই আজও, অর্থাৎ, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত[১৮৫]) আমাদের দেশ থেকে ট্রাইব্যাল-সমাজ বিলুপ্ত হয়নি—১৮৭১-৭২ সালের রিপোর্ট অনুসারে ১৮৬০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ১৮০ লক্ষ মানুষ তখনো ট্রাইব্যাল সমাজেই জীবন-যাপন করছে[১৮৬]। ব্রিটিশ কলোনিয়্যাল অফিস থেকে এদের নাম দেওয়া হয়েছে জংলী লোক বা এ্যাবরিজিন্। এবং জনৈক সুদক্ষ ইংরেজ আমলা[১৮৭] এদেরই প্রসঙ্গে বলছেন :

> Thurst back by the Aryans from the plains, they have lain hidden away in the recesses of the mountains, like the remains of extinct animals which palæontologists find in the hill-caves. India thus forms a great museum of races, in which we can study man from his lowest to his highest stages of culture.
>
> অর্থাৎ, আর্য-আক্রমণের দরুন সমতল দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এরা পর্বতে গিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে—বিলুপ্ত জীবজন্তুবিষয়ক বৈজ্ঞানিকেরা পাহাড়ের গুহায় যেরকম বিলুপ্ত জানোয়ারের অস্থি আবিষ্কার করেন এদের অবস্থাও খানিকটা তার মতন। তাই ভারতবর্ষের অবস্থাটা যেন জাতিতত্ত্বের এক বিরাট যাদুঘরের মতো—এখানে আমরা মানুষকে তার সংস্কৃতির সবচেয়ে নিচুস্তর থেকে শুরু করে সবচেয়ে উঁচুস্তর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

লেখক অন্যত্র এই ট্রাইব্যাল-সমাজের মানুষগুলির বর্ণনায় বলেছেন, *the fragments of a pre-historic world,*—প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর টুকরোর মতো[১৮৮]। ইংরেজ-আমলের ভারতবর্ষের চেহারাটাই যদি এই হয় তাহলে হিন্দু-আমলের ভারতবর্ষের ছবিটা নিশ্চয়ই অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু ১৮৭১-৭২ সালের ওই রিপোর্টটির আরো বিস্ময়কর তথ্য হলো, বাকি ১৬৮০ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় ১৫২০ লক্ষ মানুষ যে কোথা থেকে এলো তার সঠিক হদিস দিতে পারা যাচ্ছে না[১৮৯]। কেননা, এই রিপোর্টে দেশের মাত্র ১৬০ লক্ষ মানুষকে উঁচু-জাতের বলে—অর্থাৎ, বর্ণনাদাতাদের ভাষায়, বিশুদ্ধ আর্যসন্তান হিসেবে—সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে, এই ১৫২০ লক্ষ মানুষদের ব্যাখ্যা হিসেবে শুধু ঐটুকুই বলা হচ্ছে যে, এরা আদিতে ছিলো স্থানীয় অসভ্য ও অনার্য মানুষ—আর্যরা এ-দেশে এসে সভ্যতা বিস্তার করবার পর এরা ক্রমেক্রমে আর্যসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে

পড়েছে এবং সভ্য হয়ে উঠেছে। (১৮৭১-৭২-এর সেন্সাস অনুসারে অবশ্য পরে এই ১৫২০ লক্ষের মধ্যে ৪১০ লক্ষ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।)

অবশ্যই, ইংরেজ আমলারা প্রাচীন-ভারত আবিষ্কার করবার যে-চেষ্টা করেছেন তার মূল প্রেরণা হলো পুরোনোকালের ভারতবর্ষেও ইংরেজ-শাসনের অনুরূপ কিছু খুঁজে বের করা—ভারতবাসীরা যাতে কল্পনা করতে শেখে যে, এদেশের জমিতে বরাবরই এইরকম ঘটনা ঘটে এসেছে—অর্থাৎ, এটাই হলো স্বাভাবিক। অতএব তাঁরা প্রাচীনকালেও একরকম 'হোয়াইট্ ম্যান্‌স্ বার্ডেন' আবিষ্কার করতে অতো উৎসাহী—বিদেশ থেকে এসে আর্যরা এদেশের অসভ্য মানুষদের সভ্য করেছিলো বা নিজেদের উন্নততর সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করেছিলো। তাই সেকালের ইতিহাস বর্ণনায় 'আর্য-সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত-করা' বলে শব্দসমষ্টি অমন জোর দিয়ে চালু করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই সভ্য-করণ বলে ঘটনাটির প্রকৃত তাৎপর্য ঠিক কী? এ-যুগের ইংরেজ-কীর্তির আলোতেই ঘটনাটি বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। ধূর্ততর আমলাদের ভাষায় এ-হলো স্থানীয় জংলি মানুষদের সামনে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার নতুন বিকাশের পথ খুলে দেওয়া; কিন্তু এই পদ্ধতিরই আরো বাস্তব বর্ণনা হলো: রিক্রুট্‌মেণ্ট। চাবাগান আর কয়লাখনির জন্যে কুলি-সংগ্রহ করা, কিংবা সাম্রাজ্যবাদি যুদ্ধের জন্যে কামানের খোরাক সংগ্রহ করা। এবং ইংরেজ-আমলেও এই রিক্রুট্‌মেণ্ট-ব্যবস্থা সব সময়ই সরাসরি ইংরেজ প্রভুদের জন্যই করা হয়নি; অনেক সময় তা ইংরেজ-শাসনের খুঁটি স্থানীয় জমিদার-শ্রেণীর খাতিরেও করবার ব্যবস্থা হয়েছিলো। হাণ্টার সাহেবের একটি বর্ণনা[১৯০] দেখা যাক:

> Until nearly the end of the last century, the Santals were the pests of the neighbouring plains...... But in 1789, the British Government granted a proprietary right in the soil to the land-holders of Bengal under the arrangements which four years later became the Permanent Settlement. Forthwith, every landholder tried to increase the cultivated area on his estate, now become his own property. The Santals and other wild tribes were tempted to issue from their fastness by high wages and rent-free farms. "Every proprietor", said a London newspaper, the *Morning Chronicle*, in 1792, "is collecting husbandmen from the hills to improve his lowlands." The English officers found they had a new race to deal with, and gradually own them to peaceful habits by grants of land and 'exemption from all taxes.'

অর্থাৎ, গত শতাব্দীর প্রায় শেষাশেষি পর্যন্ত সাঁওতালেরা ছিলো প্রতিবেশীদের কাছে দুষমনের মতো।…কিন্তু ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার জমিদারদের উপর জমির মালিকানা অর্পণ করলো—এই ব্যবস্থাই চার বছর পরে পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্ট-এ পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেক জমিদার তার জমিদারিতে আবাদী জমির পরিমাণ বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো—এখন থেকে ভূসম্পত্তি তাদের নিজেদের হয়েছে। সাঁওতাল এবং অন্যান্য বুনো মানুষেরা চড়া মজুরী ও খাজনাহীন ক্ষেতের টানে নির্জন বনবাস থেকে বেরিয়ে আসতে প্রলুব্ধ হতে লাগলো। মর্নিং ক্রনিক্‌ল্‌ বলে লণ্ডনের খবরের কাগজ ১৭৯২-এ লিখছে: 'প্রত্যেক জমিদার নিজেদের খারাপ জমিকে উন্নত করবার জন্যে পাহাড় অঞ্চল থেকে কৃষক সংগ্রহ করছে'। ইংরেজ আমলারা দেখলেন, এবার থেকে নতুন একজাতের মানুষের দায়িত্বও তাঁদের উপরে পড়ছে; জমি দিয়ে এবং সমস্ত রকম খাজনা থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁরা এদের বিশ্বাস অর্জন করলেন।

বিনে খাজনার জমি, চড়া হারে মজুরী, বিশ্বাস-অর্জন—ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে এখানে যে রূপকথা রচনা করা হয়েছে তার উপর কোনো মন্তব্য করবার প্রয়োজন নেই; কেননা এগুলির উপর ঐতিহাসিক ভাষ্য হিসেবে ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল-বিদ্রোহের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু হাণ্টার সাহেবের এই বর্ণনা, এবং বিশেষ করে মর্নিং-ক্রনিক্‌ল্‌ পত্রিকার উদ্ধৃতিটি, নজর করবার মতো। ইংরেজ আমলেও ট্রাইব্যাল সমাজের মানুষগুলির মধ্যে সভ্যতা-বিস্তারের এই হলো নমুনা। এবং এরই চলতি নাম রিক্রুট্‌মেণ্ট: ট্রাইব্যাল সমাজ থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করবার পদ্ধতি। এবং কৌটিল্যের রচনা থেকে বোঝা যায়, এই জাতীয় রিক্রুট্‌মেণ্ট শুধুমাত্র যীশুখ্রীষ্টের ভক্তদের আমলেই নয়—যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার বেশ কয়েক শ' বছর আগে থাকতেই আমাদের দেশে চালু ছিলো। কেবল, কৌটিল্যের চক্ষুলজ্জাটা ছিলো কম। যীশুখ্রীষ্টের অনুগামীদের মতো কপট রূপকথা রচনা করে তিনি নোংরা বাস্তবকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করেননি। এবং ১৮৭১ সালের আদম-সুমারীর হিসেবে যদি দেখা যায়, ১৮৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৫২০ লক্ষ লোক এইভাবেই 'সভ্য' হয়েছে বা আর্যসভ্যতার আওতায় এসেছে, তাহলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, আমাদের দেশের শাসক-সম্প্রদায় অনেক শতাব্দী ধরেই কৌটিল্যের ওই নীতিটি অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন।

এই প্রসঙ্গেই বাংলা দেশের কৃষকদের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের[১১] বিশ্লেষণটিও উল্লেখযোগ্য:

……ever since the Aryans came to Bengal, it has been the main object with them to proselytize the aborigines, and large

number of the latter have now entered into the ranks of Hinduism but forming separate castes of their own... Dr. Hunter starts a very interesting question, namely what proportion of the total population of Bengal are Hinduised aborigines. To this he gives a very imperfect answer...... Out of a total population of thirtyseven million of Bengal proper Mr. Beverley recons the aborigines (Santals, Garos etc.) at nearly 4,00,000 and the Hiduised aborigines at a little over 5 million. Under this last head he includes such peoples as the Bagdi, the Buna, the Camar, the Muchi, the Candal, the Dome and the Hari, the Kaora, the Mal, the Mathor and many other tribes. Though all these are recorded as Hindus now, any one who has carefully observed their peculiar modes of living in our villages, would have no difficulty in setting them down as descended from the aboriginal stock. শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের নিজের হিসেব অনুসারে উঁচু জাতের খাঁটি হিন্দুদের সংখ্যা মোটের উপর প্রায় পঁচিশ লক্ষ। তাই তিনি বলছেন, Deducting then half a million of aborigines, five million of Hinduised aborigines, two and half a million of high caste Hindus and half a million of high-caste Mohammedans from the total of nearly 37 million, we have about 28 million still to account for. The question arises, then, have these 28 million descended from the aboriginal stock? অবশ্যই, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের বক্তব্য ঠিক তাই এবং তিনি বলছেন: The Aryan conquerors of Bengal, after causing their religion to be widely spread through the land, did not and could not exterminate *the aboriginal tillers of the soil.* It stands to reason to suppose that, while the brave and fierce aborigines retired to the wilds and fastness of Bengal, the weaker population accepted the religion of their conquerors and *remained, as they were before, the tillers of the soil.*

মোদ্দা কথায়, বাংলা দেশের কৃষকদের কথা বিচার করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বলছেন, ৩৭০ লক্ষ মানুষের মধ্যে পাঁচ লক্ষ ট্রাইব্যাল মানুষ এবং পঞ্চাশ লক্ষ হিন্দুধর্মভুক্ত ট্রাইব্যাল মানুষ, পঁচিশ লক্ষ জাত-হিন্দু এবং পাঁচ লক্ষ জাত-মুসলমানদের কথা বাদ দিলেও আমাদের পক্ষে আরো ২৮০ লক্ষের কিছু বেশি মানুষের হিসেব দেওয়া দরকার। এই ২৮০ লক্ষ মানুষকেও তাই স্থানীয় ট্রাইব্যাল মানুষদের বংশধরই মনে করা স্বাভাবিক। আর্যরা বাংলা দেশ আক্রমণ করবার পর এদেশে তাঁদের ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন।

> কিন্তু দেশের সমস্ত আদিবাসী কৃষকদের তাঁরা নিঃশেষে ধ্বংস করতে পারেনও নি, করেনও নি। তাই একথা মনে করা যেতে পারে যে, এই আদিবাসীদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত সাহসী ও দুর্ধর্ষ তারা আত্মসমর্পণ না করে বাংলা দেশের বনজঙ্গলের দিকে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষগুলি তাদের আক্রমণকারীদের ধর্ম গ্রহণ করলো এবং আগের মতোই কৃষিকর্ম নিয়ে রইলো।

বলাই বাহুল্য, জাতিগত বা ধর্মগত তাৎপর্যের জন্যে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের এই উক্তি উদ্ধৃত করিনি। আমাদের যুক্তির দিক থেকে যে-কথাটা প্রাসঙ্গিক তা হলো, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের হিসেবেও বাংলা দেশের কৃষকেরা প্রধানতই ট্রাইব্যাল মানুষদের বংশধর। আর যদি তাই হয় তাহলে নিশ্চয়ই এ-কথা মনে করবার অবকাশ থাকে যে, অনেক শ' বছর ধরে কৌটিল্যের ওই নীতি শাসক-সম্প্রদায় সত্যিই অনুসরণ করেছিলো: ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে সে সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে ছোটোছোটো স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিমূলক গ্রামনিবেশ করতে হবে।

অবশ্যই, বাংলা দেশে যা ঘটেছে পুরো ভারতবর্ষ জুড়েও যে তাই ঘটেছে এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু পুরো ভারতবর্ষের জনসংখ্যার যে-বিশ্লেষণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তা থেকেও মোটের উপর একই ধরনের কথা অনুমান করবার সুযোগ থাকে না কি?

ভারতীয় সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতীয় জনসংখ্যার এই বিশ্লেষণটির তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সেই তাৎপর্যের প্রতি সব সময় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের রচনা থেকে উদ্ধৃত ওই অংশের শেষ-পংক্তিটির দিকেই নজর রাখা যাক। তিনি বলছেন, আদিবাসীদের যে-বিরাট দলটি আর্যদের শাসনে এলো তারা আগের মতো কৃষক হয়েই রইলো। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে মানতেই হবে তাদের উৎপাদন-কৌশলে কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায়নি। অথচ, অপরপক্ষে, তাদের ওই ট্রাইব্যাল-সংগঠন নিশ্চয়ই আর আগেকার মতো রইলো না—বাংলাদেশে কৃষকদের গ্রামগুলি ট্রাইব্যাল-সমাজ নয়। কিন্তু ট্রাইব্যাল সমাজ না থাকলেও এই গ্রাম-জীবন থেকে ট্রাইব্যাল-সমাজের সমস্ত চিহ্নই নিঃশেষে বিলুপ্ত হতে পারেনি। কেননা, উৎপাদন কৌশলে কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়নি। ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে সে-সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে পুরোনো উৎপাদন-কৌশলের ভিত্তিতেই যদি ছোটো ছোটো আর নতুন গ্রাম-নিবেশ হয়ে থাকে তাহলে এই গ্রামগুলির মধ্যে থেকে ট্রাইব্যাল সমাজের সমস্ত চিহ্ন

নিঃশেষে মুছে যাবার কথা নয়। সেই সঙ্গেই মনে রাখা দরকার, ট্রাইব্যাল সমাজের একটি প্রধান লক্ষণ এই গ্রামগুলির মধ্যে অনিবার্যভাবেই অনুপস্থিত। ফলে, ট্রাইব্যাল সমাজের যে-চিহ্নগুলি এই গ্রাম-সমাজে টিকে রইলো সেগুলি আর ওই মূল লক্ষণটি দ্বারা লালিত হতে পায়নি। অতএব, সেগুলির আমূল রূপান্তর ঘটতে বাধ্য। ট্রাইব্যাল সমাজের স্বাভাবিক পরিবেশে এই চিহ্নগুলির যে-তাৎপর্য ছিলো ট্রাইব্যাল সমাজ থেকে উৎপাটিত হয়ে চিহ্নগুলি যখন ওই খণ্ড কৃষিনিবেশের মধ্যে এসে পড়লো তখন আর সে-তাৎপর্য বেঁচে থাকবার কথা নয়।

প্রথমে দেখা যাক, ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে যাবার সাধারণ ও স্বাভাবিক কারণটা কী? মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ দেখাচ্ছেন, এর কারণ হলো মানুষের উৎপাদন-কৌশলের উন্নতি। পশুপালন বা কৃষিকাজ ভালো করে শেখবার পরই মানুষের সমাজে উদ্‌বৃত্তজীবী শ্রেণীর আবির্ভাব হওয়া সম্ভব—এই অবস্থায় পৌঁছবার পর তাই মানব-সমাজ শ্রমজীবী ও উদ্‌বৃত্তজীবী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে, প্রাগ্‌-বিভক্ত ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে দেখা দেয় নতুন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। কিন্তু এই রকম স্বাভাবিক ও সাধারণভাবে ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে যাবার পরও নতুন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ থেকে সঙ্গে সঙ্গে ট্রাইব্যাল-সমাজের সমস্ত লক্ষণ একেবারে নিঃশেষে মুছে যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রোমানদের মধ্যে ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে রাষ্ট্রের আবির্ভাব হবার পরও ওই ট্রাইব্যাল-সংগঠনের নানান চিহ্ন টিকে থেকেছিলো। কিন্তু এই চিহ্নগুলির আদি-তাৎপর্য তখন বিলুপ্ত হয়েছে; কিংবা, এঙ্গেলস্[১২] যেমন বলছেন, চিহ্নগুলির আদিতাৎপর্য পর্যবসিত হয়েছে তার বিপরীতে :

> In this manner the organs of the gentile constitution were gradually torn from their roots in the people, in gens, phartry and tribe, and the whole gentile order was *transformed into its opposite*: from an organization of tribes for the free administration of their own affairs it became an organization for plundering and oppressing their own neighbours; and correspondingly, its organs were transformed from instruments of the will of the people into independent organs for ruling and oppressing their own people. This could not have happened had not the greed for wealth divided the members of the gents into rich and poor; had not "property differences in a gens changed the community of interest into antagonism between members of a gens" (Marx); and had

not the growth of slavery already begun to brand working for or living as slavish and more ignominious then engaging in plunder.

অর্থাৎ, এইভাবে জ্ঞাতিভিত্তিক সংগঠনের অঙ্গগুলি ক্রমেক্রমে জনসাধারণের মধ্যে—গেন্, ফ্রাত্রি ও ট্রাইবের মধ্যে,—তাদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হলো এবং জ্ঞাতিভিত্তিক পুরো ব্যবস্থাটি পরিণত হলো নিজের বিপরীতে: স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ পরিচালনা করবার জন্যে ট্রাইবদের একটি সংগঠন থেকে এটা হয়ে দাঁড়ালো নিজেদের প্রতিবেশীদের উপর উৎপীড়ন ও লুঠতরাজ চালাবার একটি সংগঠন ; এবং তারই অনুপাতে এই ট্রাইব্যাল সংগঠনের বিভিন্ন অঙ্গ জনসাধারণের ইচ্ছার যন্ত্র থেকে বদলে হয়ে দাঁড়ালো নিজেদের দলের মানুষগুলিকেই শাসন ও পীড়ন করবার যন্ত্র বিশেষ। যদি না ধনসম্পত্তির প্রতি লোভ গেন্-এর মানুষগুলিকে ধনী ও নির্ধন এই দুইভাগে বিভক্ত করতো, যদি না "গেন্-এর মধ্যে সম্পত্তির তারতম্য একই উদ্দেশ্যমূলক একটি সমবায়কে বদলে গেন্-এর সভ্যদের মধ্যে বিভেদ-বিরোধীতায় পরিণত করতো" (মার্ক্স্), যদি না ইতিমধ্যেই যে-দাসপ্রথার জন্ম হয়েছে সেই-দাসপ্রথার দরুন খেটে খাওয়াকে দাসবৃত্তি এবং লুঠতরাজের তুলনায় ঘৃণাকর বলে সাব্যস্ত করা হতো—তাহলে এ-রকম ঘটনা ঘটতেই পারতো না।

কিছু পরে, স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে, আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, বৈদিক মানুষদের মধ্যে গণ-সমাজ ভেঙে যাবার পরও সে-সমাজের যে-চিহ্নগুলি টিকে থেকেছিলো সেগুলি সম্বন্ধে এঙ্গেল্স্-এর এই মন্তব্য কতো স্পষ্টভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু এ-হলো উৎপাদন কৌশলে উন্নতি দেখা দেবার দরুন স্বাভাবিক ও সাধারণভাবে ট্রাইব্যাল সমাজ ভিতর থেকে ভেঙে যাবার কথা। তার বদলে, রাষ্ট্রশক্তি যদি বাইরের থেকে আক্রমণ চালিয়ে ট্রাইব্যাল সমাজকে ভেঙে দেয় এবং সে-সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে খণ্ড বিক্ষিপ্ত গ্রামনিবেশ করে তাহলে নিশ্চয়ই ওই গ্রামগুলির মধ্যে গণসমাজের চিহ্ন অনেক বেশি টিকে থাকবার কথা। কিন্তু ট্রাইব্যাল সমাজের প্রাণ বলতে ছিলো গণ-বন্ধন বা *group-bond*, মার্ক্স্-এর ভাষায় *community of interest*। গণবন্ধন দ্বারা লালিত বলেই ট্রাইব্যাল-সমাজের ওই চিহ্নগুলি ট্রাইব্যাল-সমাজের বুকে প্রাণবন্ত ও এমনকি উদ্দেশ্যমূলক: এগুলি মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। ফলে, ওই গণবন্ধন ভেঙে যাবার পরও ট্রাইব্যাল মানুষদেরই নিয়ে গড়া বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলির মধ্যে ট্রাইব্যাল সমাজের চিহ্নাবলী নিজেদের বিপরীতে পর্যবসিত হতে বাধ্য: যা ছিলো উদ্দেশ্যমূলক তাই হয়ে দাঁড়ালো উদ্দেশ্য-বিরোধী, যা-ছিলো জীবনের সহায় তাই হয়ে দাঁড়ালো জীবনের প্রতিবন্ধ।

আমাদের দেশে উৎপাদন কৌশলের উন্নতির উপর নির্ভর করে যদি ট্রাইব্যাল সমাজ ভিতর থেকে ভেঙে নতুন সমাজের পথ করে দিতো তাহলে হয়তো আমাদের দেশের সমাজ-ইতিহাসও ইয়োরোপীয় সমাজ-ইতিহাসের অনুরূপ হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। আমাদের দেশে স্থানে-স্থানে রাষ্ট্রশক্তি দেখা দিয়েছে, কিন্তু তখনো তাকে ঘিরে রয়েছে পুরোনো ট্রাইব্যাল সমাজ। এই ট্রাইব্যাল সমাজগুলির উপর আক্রমণ চালিয়ে রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কেরা এগুলিকে ধ্বংস করবার ব্যবস্থা করেছেন এবং এই সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে গ্রাম-নিবেশ করবার চেষ্টা করেছেন। স্বভাবতই ওই গ্রামগুলির মধ্যে ট্রাইব্যাল সমাজের চিহ্ন অনেক স্পষ্টভাবে টিকে থেকেছে,—উৎপাদন কৌশলের স্বাভাবিক উন্নতি হলে এই চিহ্নগুলিও হয় তো স্বাভাবিকভাবে মিলিয়ে যেতো। কিন্তু তা যায়নি। কেননা, উৎপাদন কৌশলের স্বাভাবিক উন্নতি এ-দেশে ঘটেনি। ফলে, গ্রামগুলি অনেকাংশেই ট্রাইব্যাল গ্রামের মতোই হয়ে রইলো; কেবল গণবন্ধন থেকে ছিন্ন হলো বলেই এই গ্রাম্য-জীবনে ট্রাইব্যাল সমাজের চিহ্নগুলি পর্যবসিত হলো নিজেদের বিপরীতে।

ট্রাইব্যাল সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ বলতে আমরা মোটের উপর এই কথাটিই বোঝাতে চেয়েছি। এবং আমাদের ধারণায় ভারতীয় সংস্কৃতির নানান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করবার ব্যাপারে এই হাইপথেসিস্ বা প্রকল্প থেকেই সাহায্য পাবার সম্ভাবনা আছে। ধ্যানধারণার আলোচনায় পরে আসা যাবে; তার আগে দেখা যাক ভারতীয় সমাজব্যবস্থার কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্যকে বোঝবার চেষ্টায় আমাদের এই প্রকল্পটি কী ভাবে কাজে লাগতে পারে।

গণ-সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ : গ্রাম-সমবায়

ভারতীয় সমাজের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোটো ছোটো গ্রাম-সমবায় (*village-communities*) এবং জাতিভেদ-প্রথা (*caste-system*) —এই দু'-এর উল্লেখ করা হয়। আমরা বলতে চাইছি, উভয় বৈশিষ্ট্যকেই ট্রাইব্যাল সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ বলে বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বৃটিশ আমলের প্রথম যুগের সেটল্‌মেণ্ট ও রেভিনিউ বিভাগের দলিল-পত্রগুলি বিশ্লেষণ করে মার্ক্ উইলক্‌স্,[১৯৩] জর্জ ক্যাম্‌বেল[১৯৪] এবং হেন্‌রি মেইন[১৯৫] সিদ্ধান্ত করেন, ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো জমিতে যৌথ স্বত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভাব। তাছাড়া, ভারতবর্ষের

মতো কৃষিপ্রধান দেশে আইনের বইগুলিতে জমির স্বত্বাধিকার-সংক্রান্ত আইন-কানুন চোখে পড়ে না[১৯৬]—এ-থেকেও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, আমাদের দেশে জমির উপর ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বাধিকার তেমনভাবে ফুটে ওঠেনি। তাই হেগেল[১৯৭] এবং মার্কস্[১৯৮] সিদ্ধান্ত করছেন যে, আমাদের দেশের সাবেকী গ্রামগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব। জমির উপর যৌথ স্বত্ব বলে এই লক্ষণটি ট্রাইব্যাল সমাজেরই চিহ্ন। ইরোকোয়া-ট্রাইবের মানুষেরা বলে, জল আর বাতাসের মতোই জমি কেনা-বেচা করবার প্রশ্ন ওঠে না[১৯৯]।

বেডেন্-পাওএল[২০০] যদিও মেইন প্রমুখের উক্ত সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে খণ্ডন করবার,—বা শুধরে নেবার—চেষ্টা করেছেন, তবুও এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষের অন্তত কয়েকটি বিস্তৃত অংশের বেলায় তাঁদের ওই সিদ্ধান্ত তথ্য-নির্ভর এবং অবশ্য-স্বীকার্য। এবং সাধারণ নিয়ম হিসেবে বেডেন্-পাওএল[২০১] যখন দাবি করেন যে, ঐতিহাসিকভাবে জমিতে যৌথ স্বত্বের চেয়ে প্রাচীনতর ব্যবস্থা হলো ব্যক্তিগত স্বত্ব,—তখন তাঁর দাবিটি যে ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন, সে-বিষয়ে কোনো রকম প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। অপর পক্ষে, মেইন প্রমুখের সিদ্ধান্তের পক্ষে অনেক জোরালো যুক্তি রয়েছে। মার্ক্ উইল্‌ক্স্[২০২] যে-রকম বলছেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে যে-সব ইয়োরোপীয় পরিব্রাজকেরা আওরংজেব-এর দরবার পরিদর্শন করেছিলেন তাঁরা এক বাক্যেই স্বীকার করেছেন যে, ভারতবর্ষে তখনো জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিলো না। অবশ্যই, প্রাচীন গ্রীক বর্ণনাদাতাদের[২০৩] বক্তব্য কিছুটা অন্যরকম। কিন্তু মার্ক্ উইল্‌ক্স্[২০৪] দেখাচ্ছেন, এ-বিষয়ে তাঁদের মন্তব্য খুব বেশি মূল্যবান হতে পারে না। কেননা, তথ্য সঞ্চয়ের জন্যে প্রায়ই তাঁরা নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিলেন একের পর এক তিন তিনজন দোভাষীর ব্যাখ্যার উপর, এবং এই তিনজনের মধ্যে একজনের কথাও গ্রীক বর্ণনাদাতারা বুঝতে পারতেন না। হয়তো সেই কারণেই, কীথ এবং ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড [২০৫] আক্ষেপ করেছেন, এ-বিষয়ে গ্রীক বর্ণনাদাতাদের মধ্যে কারুর সঙ্গে কারুর মতের মিল নেই।

অবশ্যই, শিলালিপি প্রভৃতিতে ভূসম্পত্তি-দানের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এই নজির দেখিয়ে কেউ কেউ[২০৬] অনুমান করেছেন যে, তাহলে নিশ্চয়ই জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলো। কিন্তু এই জাতীয় দলিলগুলিতে ভূসম্পত্তি বলতে ইয়োরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থে ভূসম্পত্তি নাও বোঝাতে পারে—এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, দান বলতে এখানে গ্রামাঞ্চল থেকে রাজার প্রাপ্য রাজস্বটুকুকেই উল্লেখ করা হয়েছে[২০৭]। তাছাড়া, এই দলিলগুলি থেকেই দেখা যায় দানের আগে দাতার পক্ষে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত সম্মতি নেবার দরকার

পড়তো[২০৮]। গ্রামের জমির উপর গ্রামবাসীদের যদি যৌথ অধিকার না থাকে তাহলে এইভাবে তাদের কাছ থেকে যৌথ সম্মতি নেবার প্রয়োজন হবে কেন?

কোনো কোনো ইংরেজ পণ্ডিত প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সাবেককালের ভারতবর্ষে জমির উপর কৃষকদের মালিকানা যে ছিলো না তার আসল কারণ হচ্ছে জমির প্রকৃত মালিক বলতে ছিলো রাজা বা সামন্ততান্ত্রিক প্রভুর দল। যেমন, ভিন্সেন্ট স্মিথ[২০৯] লিখছেন, ভারতবর্ষের নেটিভ আইন অনুসারে চাষ-জমিকে বরাবরই রাজসম্পত্তি বলে দেখা হয়েছে। ইংরেজ-শাসনের তরফ থেকে ইতিহাসের নামে এ-রকম একটা মিথ্যে কথা প্রচার করবার প্রয়োজন ছিলো; কেননা, ইংরেজ-শাসনের খুঁটি হিসেবে ওরাই এ-দেশে জমির মালিক নাম দিয়ে জমিদার-শ্রেণী হিসেবে যে নতুন এক-শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেছিলো এই জাতীয় ভুয়ো ইতিহাস তার কলঙ্ক কিছুটা পরিমাণে ঢাকা দিতে পারতো[২১০]। অধ্যাপক জয়সওয়াল[২১১] তাই স্মিথ সাহেবকে বিদ্রূপ করে বলছেন, এবং ঠিকই বলছেন, 'ভারতবর্ষের সত্যিকারের প্রামাণ্য আইনকর্তা-প্রবর্তিত নেটিভ আইন বলতে ঠিক এর বিপরীত। এ-রকম আইন অন্য কোনো দেশের নেটিভ আইন হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের নেটিভ আইন নিশ্চয়ই নয়'।

জৈমিনী, নীলকণ্ঠ, মাধব, কাত্যায়ন, মিত্রমিশ্র প্রভৃতির রচনা থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে অধ্যাপক জয়সওয়াল দেখাচ্ছেন[২১২] সাবেককালের ভারতবর্ষে জমির মালিক বলতে রাজা বা সামন্ত প্রভু হতেই পারে না। তিনি আরো বলছেন, জাতকের গল্পগুলি থেকে যে-ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা যায় তাও ভিন্সেন্ট স্মিথের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত[২১৩]। কিন্তু ভারতবর্ষে জমির উপর রাজার মালিকানা ছিলো না—এ-কথা তথ্যবলে প্রমাণ করলেও অধ্যাপক জয়সওয়াল দেখাতে চাইছেন, জমির উপর কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা ছিলো[২১৪]। তাঁর নিজের সিদ্ধান্তের দুর্বলতা ঠিক এইখানেই এবং এ-দুর্বলতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যখন তিনি ভিন্সেন্ট স্মিথের বিরুদ্ধে তর্ক করে বলেন, এ-হেন জনপ্রিয় একটি পাঠ্যপুস্তকে এ-বিষয়ে অমন ভ্রান্ত একটা সংস্কারগ্রস্ত মতবাদ প্রচারিত হওয়াটা খুবই ক্ষোভের ব্যাপার,—বিশেষ করে ক্ষোভের ব্যাপার এই কারণে যে, লেখক এ-বিষয়ে অত্যন্ত যোগ্য আলোচনাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেই নিজের মতবাদ পেশ করতে চাইছেন[২১৫]। বিশেষ যোগ্য আলোচনা বলতে অধ্যাপক জয়সওয়াল একটি বই-এরই উল্লেখ করছেন—১৮৬৯-এ প্রকাশিত মার্ক্‌স্ উইল্‌কৃস্-এর লেখা মাইসোর-ইতিহাস[২১৬]। আমরা ইতিপূর্বেই উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করেছি এবং বলেছি, প্রধানত এই গ্রন্থের ভিত্তিতেই হেগেল, মার্ক্‌স্ প্রমুখ মনীষীরা সিদ্ধান্ত

করেছেন যে, সাবেককালের ভারতবর্ষে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দেয়নি—জমি ছিলো গ্রামবাসীদের যৌথ সম্পত্তি। তাই অধ্যাপক জয়সওয়াল যদি সত্যিই মনে করেন, ভিন্সেণ্ট স্মিথের পক্ষে এই গ্রন্থটিকে অগ্রাহ্য করে জমির উপর রাজার-স্বত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টাটা খুবই গর্হিত কাজ হয়েছে, তাহলে অধ্যাপক জয়সওয়ালের নিজের পক্ষে উক্ত গ্রন্থকেই অগ্রাহ্য করে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার কথা প্রচার করা কী করে সঙ্গত হতে পারে?

অবশ্যই, এ-কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, সাবেকী ভারতবর্ষে জমির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা আজো অনেকাংশেই অমীমাংসিত। এ-বিষয়ে মৌলিক গবেষণার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া, ভারতবর্ষ সত্যিই এতোটুকু জায়গা নয়—প্রায় ইয়োরোপের মতো বড়ো একটি মহাদেশ-বিশেষ। তাই এদেশে ভূমিব্যবস্থা যে সর্বত্র একই রকমের ছিলো তাও মনে করা ঠিক হবে না। তবুও পূর্বগামীদের গবেষণার উপর নির্ভর করে অন্তত এটুকু অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নয় যে, ভারতবর্ষের কয়েকটি বিস্তৃত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিমূলক গ্রামসমবায় এবং এই সব গ্রামে জমি ছিলো গ্রামবাসীদের যৌথ সম্পত্তি। বেডেন্-পাওএল্ যদি সত্যিই প্রমাণ করে থাকেন যে, অন্যান্য অঞ্চলে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দিয়েছিলো তাহলেও নিশ্চয়ই এ-কথা প্রমাণিত হয় না যে, উইল্‌কস্, মেইন্ প্রমুখেরা অন্যান্য অঞ্চল সম্বন্ধে যে-বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন তা খণ্ডিত হয়ে যায়[১১]।

জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিতে যৌথ-জীবনের কথা আমরা এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাইছি আমাদের মূল প্রকল্পটির পক্ষে নজির দেখাবার আশায়। প্রকল্পটি হলো, এদেশে ট্রাইব্যাল-সমাজের বিলোপ পরিপূর্ণ হয়নি—জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভাব ও গ্রামগুলিতে যৌথ-জীবনের স্বাক্ষর ওই ট্রাইব্যাল-সমাজেরই ভগ্নাবশেষ। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমরা বলতে চাইছি, রাষ্ট্রশক্তি যদি বাইরের থেকে ট্রাইব্যাল-সমাজকে আক্রমণ করে, সে-সমাজ ভেঙে এবং সেই সমাজেরই মানুষগুলিকে নিয়ে ছোটো ছোটো গ্রাম-নিবেশ করে থাকে তাহলে এই গ্রামগুলিতে যে-রকম ট্রাইব্যাল-সমাজের বহু চিহ্ন টিকে থাকবার কথা সেইরকমই ট্রাইব্যাল-সমাজের মূল সঞ্জীবনী-শক্তি থেকে উৎপাটিত হয়ে বিরুদ্ধ-পরিবেশে গ্রথিত হবার ফলে এই চিহ্নগুলির আদি-তাৎপর্য তার বিপরীতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। ট্রাইব্যাল-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যে-যৌথজীবন ছিলো বাঁচবার সহায়, রাষ্ট্রশাসন ও রাষ্ট্রশোষণের অন্তর্ভুক্ত ওই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলির বৈশিষ্ট্য হবার পর সেই যৌথ-জীবনের ধ্বংসাবশেষই মানুষের জীবনের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি সম্বন্ধে হেগেল[১১৮] লিখছেন :

> The whole income belonging to every village is, as already stated, divided into two parts, of which one belongs to the Raja, the other to the cultivators; but proportionate shares are also received by the Provost of the place, the Judge, the Water-Surveyor, the Brahmin who superintends religious worship, the Astrologer (who is also a Brahmin, and announces the days of good and ill omen), the Smith, the Carpenter, the Potter, the Washerman, the Barber, the Physician, the Dancing girls, the Musician, the Poet. This arrangement is fixed and immutable, and subject to no one's will. *All political revolutions, therefore, are matters of indifference to the common Hindoo, for his lot is unchanged.*
>
> অর্থাৎ, প্রতিটি গ্রাম থেকে যা উপায় হতো তার পুরোটাই দু'ভাগে ভাগ করা হতো; তার মধ্যে একটা ভাগ রাজার, আর একটা ভাগ কৃষকদের। কিন্তু নিম্নোক্তরাও আনুপাতিকভাবে নিজেদের অংশ পেতো: স্থানীয় শান্তিরক্ষক, বিচারক, জল-পরিদর্শক, পুরোহিত, গণৎকার, কামার, ছুতোর, কুমোর, ধোপা, নাপিত, বৈদ্য, নর্তকী, গায়ক, কবি। এই ব্যবস্থা ছিলো একেবারে বাঁধাধরা ও অনড়-অচল এবং তা কারুরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করতো না। অতএব সাধারণ হিন্দুর কাছে সবরকম রাজনৈতিক বিপ্লবই ছিলো উপেক্ষার ব্যাপার; কেননা, তার অবস্থায় কোনো পরিবর্তনই হবার নয়।

মার্ক্‌স্‌ও সাবেকী[১১৯] ভারতবর্ষের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলির বৈশিষ্ট্য-বর্ণনায় যৌথজীবনের উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছেন এবং স্বভাবতই ভাববাদী-দার্শনিক হেগেলের তুলনায় বস্তুবাদী-দার্শনিক মার্ক্‌স্‌-এর বর্ণনা অনেক স্পষ্ট ও বস্তুনির্ভর :

> Those small and extremely ancient Indian communities, some of which have continued down to this day, are based on possession in common of the land, on the blending of agriculture and handicrafts, and on an unalterable division of labour, which serves, whenever a new community is started, as a plan and scheme ready cut and dried. Occupying areas of from 100 up to several thousand acres, each forms a compact whole producing all it requires. The chief part of the products is destined for direct use by the community

itself, and does not take the form of a commodity. Hence, production here is independent of that division of labour brought about, in Indian society as a whole, by means of the exchange of commodities. It is the surplus alone that becomes a commodity, and a portion of even that, not until it has reached the hands of the State, into whose hands from time immemorial a certain quantity of these products has found its way in the shape of rent in kind. The constitution of these communities varies in different parts of India. In those of the simplest form, the land is tilled in common, and the produce divided among the members. At the same time, spinning and weaving are carried on in each family as subsidiary industries. Side by side with the masses thus occupied with one and the same work, we find the "chief inhabitant", who is judge, police, and tax-gatherer in one; the book-keeper, who keeps the accounts of the tillage and registers everything relating thereto; another official, who prosecutes criminals, protects strangers travelling through and escorts them to the next village; the boundary man, who guards the boundaries against neighbouring communities; the water-overseer, who distributes the water from the common tanks for irrigation, the Brahmin, who conducts the religious services; the schoolmaster, who on the sand teaches the children reading and writing; the calender-Brahmin, or Astrologer, who makes known the lucky or unlucky days for seed-time and harvest, and for every other kind of agricultural work; a smith and a carpenter, who make and repair all the agricultural implements; the potter, who makes all the pottery of the village; the barber, the washerman, who washes clothes, the silversmith, here and there the poet, who in some communities replaces the silversmith, in others the schoolmaster. This dozen of individuals is maintained at the expense of the whole community. If the population increases, a new community is founded, on the pattern of the old one, on unoccupied land. The whole mechanism discloses a systematic division of labour; but division like that in manufactures is impossible, since the smith and the carpenter, etc., find an unchanging market, and at the

most there occur, according to the sizes of the villages, two or three of each; instead of one. The law that regulates, the division of labour in the community acts with the irrestible authority of a law of Nature, at the same time that individual artificer, the smith, the carpenter, and so on, conducts in his workshop all the operations of his handicrafts in the traditional way, but independently, and without recognizing any authority over him. The simplicity of the organisation for production in these self-sufficing communites that constantly reproduce themselves in the same form, and when accidentally destroyed, spring up again on the same spot and with the same name—this simplicity supplies the key to the secret of the unchangeableness of Asiatic societies, an unchangeableness in such striking contrast with the constanst dissolution and refounding of Asiatic States, and the never-ceasing changes of dynasty. The structure of the economical elements of society remains untouched by the storm-clouds of the political sky.

অর্থাৎ, এই সব ছোটো ছোটো ও অত্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় গ্রাম-সমবায়,—যার মধ্যে কিছু কিছু এখনো টিকে রয়েছে,—এগুলির ভিত্তিতে ছিলো জমিতে যৌথ স্বত্ব, কৃষির সঙ্গে কারিগরির মিশ্রণ এবং অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাগ, যা কিনা যখনই একটা নতুন যৌথ-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে তখনই তার সামনে তৈরি আর বাঁধাধরা পরিকল্পনা হিসেবে থেকে গিয়েছে। ১০০ থেকে কয়েক হাজার একর জমি জুড়ে (নানা আকারের এই যৌথ-সম্প্রদায়গুলি), এক একটি নিটোল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ (সমবায় হিসেবে) নিজের যাবতীয় প্রয়োজন উৎপাদন করেছে। উৎপাদিত সামগ্রীর প্রধান অংশ পুরো সম্প্রদায় দ্বারা সরাসরি ব্যবহৃত হবার জন্যে তৈরি হয়, এগুলি পণ্যের রূপ পায় না। তাই সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজে পণ্যবিনিময়ের দরুন যে শ্রমবিভাগ আছে এই যৌথ-সমবায়-গুলির আভ্যন্তরীন উৎপাদন তার প্রভাব-মুক্ত। শুধুমাত্র বাড়তিটুকুই পণ্য হয়, এবং তারও একটি অংশমাত্র রাষ্ট্রের কবলভুক্ত হবার পরই পণ্য হতে পারে—এক অস্পষ্ট অতীত থেকে রাজস্ব হিসেবে এই উৎপাদিত বস্তুগুলিরই একটা অংশ রাষ্ট্রের কবলভুক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে এই যৌথ-সমবায়গুলির সংগঠন বিভিন্ন রকমের। যেখানে সবচেয়ে সরল সংগঠনের পরিচয় সেখানে জমি যৌথভাবে চাষ করা হয় এবং উৎপন্ন-বস্তু সকলের মধ্যে বণ্টন করা হয়। সেই সঙ্গেই, প্রতিটি পরিবারে সহকারী শিল্প হিসেবে সুতোকাটা এবং কাপড়-বোনার কাজ চলে। এইভাবে একই কাজে নিযুক্ত জনসাধারণের পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই মোড়ল—সে একাধারে বিচারক, পুলিশ এবং রাজস্ব আদায়কারী; খাজাঞ্চী—সে কৃষি সংক্রান্ত সবকিছুর হিসেব রাখে; আর একজন কর্মচারী—

সে অপরাধীদের শাস্তি দেয়, আগন্তুক পথিকদের নিরাপদে পরের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে; সীমানাদার—সে আশপাশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য রাখবার জন্যে নিজেদের সম্প্রদায়টির সীমানা পরিদর্শন করে; জল-পরিদর্শক—সে কৃষির জন্যে বারোয়ারী পুকুর থেকে জল সরবরাহের তদারক করে; ব্রাহ্মণ—সে ধর্মকর্ম পরিচালনা করে; পাঠশালার পণ্ডিত—সে বালির উপরে ছেলেদের লেখাপড়া শেখায়; পাঁজিদার-ব্রাহ্মণ বা গণৎকার—সে বীজ বোনবার, ফসল কাটবার ও অন্যান্য সব-রকম কৃষিকর্মের পক্ষে শুভাশুভ সময়ের নির্দেশ দেয়; একজন কামার ও একজন ছুতোর—তারা চাষবাসের সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত করে; কুমোর—সে গ্রামের জন্যে সমস্ত হাঁড়িকুঁড়ি বানায়; নাপিত; ধোপা—সে কাপড় ধুয়ে দেয়; স্যাকরা; কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবি—কোথাও বা সে স্যাকরার বদলে আবার কোথাও বা পাঠশালার পণ্ডিতের বদলে থাকে। এই জনা বারো মানুষ পুরো যৌথ-সমবায়টির খরচে প্রতিপালিত হয়। জনসংখ্যা বেড়ে গেলে খালি জমিতে পুরোনো পরিকল্পনা অনুসারে নতুন একটি যৌথ-সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরো ব্যবস্থার মধ্যেই একরকম শ্রমবিভাগ দেখা যায়, কিন্তু এখানে কারখানা-শিল্পের (*manufacture*) মতো শ্রমবিভাগ অসম্ভব; কেননা, (এখানে—যৌথ-সমবায়গুলিতে) কামার বা ছুতোরের বাজার অপরিবর্তনীয় থেকেছে, বড়ো জোর কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামগুলির আয়তনের উপর নির্ভর করে একের বদলে দুই বা তিনজন করে এ-রকম কামার বা ছুতোর থাকে। যৌথ-সমবায়ের মধ্যে যে-নিয়ম অনুসারে শ্রমবিভাগ নিয়ন্ত্রিত হয় তা প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই অমোঘ; অপরপক্ষে কামার বা ছুতোর ধরনের প্রতিটি কারিগরই নিজের কারখানায় চিরাচরিত পদ্ধতিতে উক্ত কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় পুরো ক্রিয়াটি একাই করে যায়, তাদের মাথার উপর এ-ব্যাপারে হুকুম দেবার কেউই নেই। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ যৌথ-সমবায়গুলি—যেগুলি থেকে একই রূপে নতুন যৌথ-সমবায়ের জন্ম হয় এবং যেগুলি দৈবাৎ বিনষ্ট হলে একই জায়গায় এবং একই নাম নিয়ে যেগুলি আবার গজিয়ে ওঠে—এগুলির মধ্যের উৎপাদন-সংগঠনের সারল্যই এসিয়াটিক সমাজের অপরিবর্তনীয়তাকে বোঝবার ব্যাপারে মূলসূত্র; এসিয়ায় রাষ্ট্রের ক্রমাগত উত্থান-পতনের এবং এসিয়াটিক সাম্রাজ্যের ক্রমাগত ধ্বংস ও পত্তনের পাশাপাশি গ্রামগুলির ওই অপরিবর্তনীয়তা অত্যন্ত প্রকট ভাবেই চোখে পড়ে। রাজনৈতিক আকাশের ঝোড়ো মেঘ সত্ত্বেও সমাজের মূল অর্থনৈতিক উপাদানগুলির কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে।

মার্ক্‌স্‌-বর্ণিত এই কৃষিমূলক গ্রামসমবায়গুলি সমাজ-ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ঠিক কোন পর্যায়ে পড়ে তা নিয়ে গবেষণা করবার প্রয়োজন আছে। কেউ কেউ মনে করেন[২০], এখানে মার্ক্‌স্‌ ট্রাইব্যাল-পর্যায়ের গ্রামগুলিরই বর্ণনা দিচ্ছেন। এবং সে-কথা মনে করবার কারণও আছে। কেননা, এই বর্ণনার কিছু আগে মার্ক্‌স্‌ বলছেন[২১]:

Co-operation, such as we find it at the dawn of human development, among races who live by chase, or, say in the agriculture of Indian communities, is based, on the one hand, on ownership in common of the means of production, and on the other hand, on the fact, that in those cases, each individual has no more torn himself off from the navel string of his tribe or community, than each bee has freed itself from connection with the hive.

অর্থাৎ, মানব-উন্নতির শুরুর দিকে শিকারজীবী জাতিগুলির মধ্যে, বা, ধরা যাক, ভারতীয় গ্রামসমবায়গুলির কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে, যে-সমবায় দেখা যায় তার ভিত্তিতে একদিকে হলো উৎপাদনের উপায়গুলির উপর যৌথ স্বত্ব এবং অপরদিকে হলো, এ-সমস্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই পুরো ট্রাইবের সঙ্গে নাড়ির সম্পর্কে সংযুক্ত, যেমন কিনা প্রত্যেকটি মৌমাছিই মৌচাকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

মার্ক্স্-এর এই উক্তিটি থেকেই বুঝতে পারা যায় তাঁর মতে ভারতীয় গ্রাম-সমবায়গুলির মধ্যে ট্রাইব্যাল-সমাজের চিহ্ন কতো স্পষ্ট। কিন্তু তাই বলে, এগুলিকে শুধুমাত্র বা পুরোপুরি ট্রাইব্যাল মনে করলেও ভুল করা হবে। কেননা, মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ ট্রাইব্যাল সমাজে যে সরল, সহজ জীবনীশক্তির পরিচয় দেখছেন এই গ্রাম-সমবায়গুলির মধ্যে তার একান্ত অভাব। আমরা বলতে চাইছি, ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপের পরিণাম হিসেবেই যেহেতু এই গ্রাম-সমবায়গুলি গড়ে উঠেছিলো সেইহেতু একদিকে যেমন এই গ্রাম-সমবায়ের মধ্যে ট্রাইব্যাল-সমাজের স্পষ্ট ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে অপরদিকে আবার দেখা যায় সেই ধ্বংসাবশেষগুলির ভিতর ট্রাইব্যাল-সমাজের প্রকৃত সঞ্জীবনীশক্তি মরে গিয়েছে—চিহ্নগুলির মূল তাৎপর্য পরিণত হয়েছে তার বিপরীতে। এই তফাতটা বোঝবার জন্যে প্রথমে দেখা যাক, মার্ক্স্-এঙ্গেলস্-এর মতে ট্রাইব্যাল সমাজের সহজ, সরল প্রাণশক্তির পরিচয়টা কী রকম; তারপর দেখা যাবে তাঁদেরই মতে ভারতীয় গ্রাম-সমবায়গুলির মধ্যে সেই প্রাণশক্তির পরিচয় আছে কি না।

ট্রাইব্যাল-সমাজ প্রসঙ্গে এঙ্গেল্স্[২২] বলছেন:

And this gentile constitution is wonderful in its childlike simplicity! Everything runs smoothly without soldiers, gendarmes or police; without nobles, kings, governors, prefects or judges; without prisons; without trials.......There can be no poor and needy—the communistic household and the

gens know their obligations towards the aged, the sick and those disabled in war. All are free and equal—including the women. ......And the kind of men and women that are produced by such a society is indicated by the admiration felt by all white men who came into contact with the uncorrupted Indians (আমেরিকার আদিবাসী), admiration of the personal dignity, straightforwardness, strength of character and bravery of these barbarians.

We have witnessed quite recently examples of this bravery in Africa. The Zulu Kaffirs a few years ago, like the Nubians a couple of month ago—in both of which tribes gentile institutions have not yet died out—did what no European army can do.......This is what mankind and human society were, before class divisions arose. And if we compare their condition with that of the overwhelming majority of civilized people today, we will find an enormous gulf between the present-day proletarian and small peasant and the ancient free member of a gens.

This is one side of the picture. Let us not forget, however, that this organization was doomed to extinction. ......The power of these primordial communities had to be broken, and it was broken. But it was broken by influences which from the outset appear to us as a degradation, *a fall from the simple moral grandeur of the ancient gentle society.* The lowest interests—base greed, brutal sensuality, sordid avarice, selfish plunder of common possessions—usher in the new, civilized society, class society; the most outrageous means—theft rape, deceit and treachery—undermine and topple the old, classless gentle society. And the new society, during all the 2,500 years of its existence, has never been anything but the development of the small minority at the expense of the exploited and oppressed great majority; and it is so today more than ever before.

অর্থাৎ, শিশুসুলভ সারল্যময় এই জ্ঞাতিভিত্তিক সংগঠন সত্যিই অপরূপ। সিপাই নেই, পাইক নেই, পুলিশ নেই, সামন্ত নেই, রাজা নেই, রাজ্যপাল নেই, উজির নেই, কাজি নেই; কারাগার নেই, বিচারালয় নেই; সব কিছুই ঘটে চলে সহজ সরলভাবে।...এখানে গরিব বা অভাবগ্রস্থ বলে কেউই থাকতে পারে না—বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং যুদ্ধের দরুন যারা অক্ষম হয়েছে তাদের প্রতি কী কর্তব্য

তা সাম্যবাদী পরিবার ও 'গেন্'-এর জানা আছে। সকলেই স্বাধীন আর সমান—মেয়েরা পর্যন্ত।...নির্দোষ রেড্-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যে-সব সাদা মানুষ সংস্পর্শে এসেছে তারা সকলেই এদের প্রশংসা করেছে—এই অসভ্য মানুষদের আত্মমর্যাদা, কুটিলতার অভাব, চরিত্রবল ও সাহস সম্বন্ধে প্রশংসা এবং এর থেকে বোঝা যায় ওই জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজ কোন ধরনের নরনারী তৈরি করেছে।

সম্প্রতি আমরা আফ্রিকায় এই বীরত্ব দেখতে পেয়েছি। বছর কয়েক আগে জুলু কাফিরেরা এবং মাস দুয়েক আগে নুবিয়ান্‌রা—উভয় উপজাতির মধ্যেই জ্ঞাতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এখনো টিকে আছে—যা করেছে, তা কোনো ইয়োরোপীয় সেনাবাহিনী করতে পারে না।...শ্রেণী-বিভাগ ফুটে ওঠবার আগে পর্যন্ত মানবজাতি ও মানবসমাজ এই রকমই ছিলো! এবং তাদের সঙ্গে আজকের সভ্য মানুষদের সবচেয়ে বিরাট অংশটির যদি তুলনা করা যায় তাহলে চোখে পড়ে, আধুনিক শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে সেই পুরানো 'গেন্‌স্'-এর স্বাধীন মানুষদের আকাশ-পাতাল তফাত।

এই হলো ছবিটির একপিঠ। কিন্তু ভুললে চলবে না যে এই সংগঠন ধ্বংস পেতে বাধ্য ছিলো।...এই আদিম যৌথ সম্প্রদায়গুলির শক্তি ভেঙে যাওয়া দরকার ছিলো, এবং তা ভেঙে গেলো। কিন্তু এমন প্রভাবের দরুন তা ভাঙলো যা শুরু থেকেই আমাদের কাছে অধঃপতন বলে প্রতীয়মান হয়—প্রাচীন জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের সরল নৈতিক ঐশ্বর্য থেকে পতন। ঘৃণিত লোভ, পশুসুলভ ইন্দ্রিয়পরায়নতা, পঙ্কিল মাৎসর্য, স্বার্থপরভাবে যৌথ সম্পদকে লুঠ করা,—এই সব নীচ উৎসাহ ফুটে উঠলো নতুন সভ্য সমাজে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে। চুরি, ধর্ষণ, প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা—এই সব ঘৃণিত পদ্ধতিতে প্রাচীন শ্রেণীহীন জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজকে দাবিয়ে দেওয়া ও ভাঙা হলো। এবং ওই নতুন সমাজটি—গত আড়াই হাজার বছর ধরে তার অবস্থিতির মধ্যে—সংখ্যাগরিষ্ঠদের শুষে সংখ্যাকনিষ্ঠদের উন্নতি ছাড়া আর কিছুই নয়—এবং আজকের দিনে তার এই রূপটি আগেকার যে-কোনো সময়ের চেয়ে প্রকট।

মহাবস্তু অবদান প্রভৃতি আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথিতেও এ-স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায় যে প্রীতির সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রাচীন-সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপরই শ্রেণীবিভক্ত সভ্য-সমাজ গড়ে উঠেছে। এই সভ্য সমাজের শাসক সম্প্রদায়ের কাছে এঙ্গেলস্-বর্ণিত চুরি, ধর্ষণ, প্রতারণা, বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতিই যে আদর্শ কূটনীতি বলে স্বীকৃত হয়েছিলো তার প্রমাণও আমরা কৌটিল্যের রচনা থেকেই পেয়েছি। এবং ওই "সহজ সরল নৈতিক ঐশ্বর্যপূর্ণ" মানুষদের ট্রাইব্যাল সমাজ একেবারে সাম্প্রতিক যুগেও আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়নি। সে-মানুষদের বীরত্বের পরিচয় আমাদের অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসেও বারবার পাওয়া গিয়েছে। এদের প্রসঙ্গেই জনৈক বিখ্যাত ইংরেজ আমলা[২৩] লিখছেন :

The very officers who have had to act most sharply against them speak most strongly, and often not without a noble regret and self-reproach, in their favour. 'It was not war', Major Vincent Jervis writes of the operations against the Santals in 1855. 'They did not understand yielding; as long as their national drums beat, the whole party would stand, and allow themselves to be shot down. They were the most truthful set of men I ever met'.

যে-অফিসারেরা এদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরাই আবার এদের পক্ষে সবচেয়ে জোর দিয়ে কথা বলেছেন,—এই উক্তিগুলিতে প্রায়ই এদের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিজেদের বিরুদ্ধে তিরস্কারের ভাব থেকেছে। ১৮৫৫-র সাঁওতালদের বিরুদ্ধে অভিযান বর্ণনায় মেজর ভিন্‌সেণ্ট জার্ভিস বলছেন, 'একে যুদ্ধ বলে না। সমর্পণ বলতে কী বোঝায় ওরা তা জানে না। যতোক্ষণ ওদের জাতীয় ঢাক বেজে চলবে ততোক্ষণ পুরো দলটা সোজা হয়ে থাকবে এবং গুলী খেয়ে মরতে রাজি হবে। আমি জীবনে এ-রকম সত্যনিষ্ঠ মানুষ আর কখনো দেখিনি।'

ট্রাইব্যাল-সমাজের ওই প্রাণশক্তির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এঙ্গেলস্[২২৪] বলছেন, তারই স্পর্শ পেয়ে রোমান-যুগের পাঁক থেকে মুমূর্ষু ইয়োরোপীয় সভ্যতা পুনরুজ্জীবন লাভ করেছিলো :

What was the mysterious charm with which the Germans infused new vitality into dying Europe?... It was not their specific national qualities that rejuvenated Europe, however, but simply—their barbarism, their gentile constitution. Their personal efficiency and bravery, their love of liberty, and their democratic instinct, which regarded all public affairs as its own affairs, in short, all those qualities which the Romans had lost and which were alone capable of forming new states and of raising new nationalities out of the muck of the Roman world—what were they but the characteristic features of barbarism in the upper stage, fruits of their gentile constitution?.... All that was vital and life-bringing in what the Germans infused into the Roman world was barbarism.

বর্তমানে আমাদের কাছে প্রশ্ন হলো, মার্ক্‌স্ ওই যে ভারতীয় গ্রাম-সমবায়ের বর্ণনা দিয়েছেন তা কি এই জাতীয় ট্রাইব্যাল-সমাজেরই বর্ণনা? আমরা

একটু আগেই দেখেছি, এই গ্রাম-সমবায়গুলির মধ্যে ট্রাইব্যাল-সমাজের চিহ্ন টিকে থেকেছে। কিন্তু তবুও এগুলিকে প্রকৃত ট্রাইব্যাল-সমাজের নমুনা মনে করা চলবে না। কেননা, এঙ্গেল্‌স্ বর্ণিত ট্রাইব্যাল-সমাজের ওই প্রাণশক্তির একান্ত অভাব এই স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম-সমবায়গুলির মধ্যে। মার্ক্‌স্[২২০] বলছেন :

> ...We must not forget that these idyllic village communities, inoffensive though they might appear, had always been the solid foundation of Oriental despotism, that they restrained the human mind within the smallest possible compass, making it the unresisting tool of superstition, enslaving it beneath traditional rules, depriving it of all grandeur and historical energies...
>
> We must not forget that this stagnatory, undignified and vegitative life, that this passive sort of existence, evoked, on the other hand, in contradistinction, wild, aimless, unbounded forces of destruction and rendered murder itself a religious rite in Hindostan.
>
> We must not forget that these little communities were contaminated by distinctions of caste and by slavery, that they subjugated man to external circumstances insted of elevating man to be the sovereign of circumstances, that they transformed a self-developing social state into never-changing natural destiny, and thus brought about a brutalising worship of nature, exhibiting its degradation in the fact that man, the sovereign of nature, fell down on his knees in adoration of Hanuman, the monkey and Sabbala, the cow.

ভোলা চলবে না, ছবির মতো সুন্দর এই গ্রামগুলিকে যদিও দেখতে নিরীহ মনে হয় তবুও এগুলিই চিরকাল প্রাচ্য স্বৈরাচারের মজবুত বনিয়াদ ছিলো, এগুলিই মানব-মনকে সংকীর্ণতম গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে করে তুলেছিলো কুসংস্কারের অবাধ হাতিয়ার, সাবেকী নিয়মের ক্রীতদাস, সব রকম গৌরব ও ঐতিহাসিক শক্তি থেকে বঞ্চিত।

ভোলা চলবে না, এই থিতোনো, মর্যাদাহীন, নিষ্কর্মা জীবন, এই নিষ্ক্রিয় সত্তা, অপর পক্ষে বিপরীত লক্ষণ হিসেবে জাগিয়ে তুলেছিলো ধ্বংসের উন্মত্ত, অন্ধ ও অসীম শক্তিকে—হিন্দুস্থানে এমন কি খুন করাকেও ধর্মকর্ম করে তুলেছিলো।

ভোলা চলবে না, এই ছোটো ছোটো সমবায়গুলি জাতিভেদ ও দাসপ্রথা দ্বারা কলুষিত ছিলো, মানুষকে পারিপার্শিকের উর্ধ্বে তোলবার বদলে পারিপার্শিকেরই

ক্রীতদাস করে রেখেছিলো, স্বয়ং বিকাশমান সামাজিক অবস্থাকে প্রাকৃতিক নিয়তির সামিল করে তুলেছিলো আর এইভাবে একরকম পাশবিক প্রকৃতি-পুজার জন্ম দিয়েছিলো—অধঃপতন যে কতোখানি তা এই ঘটনা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে মানুষ, যে হলো কিনা প্রকৃতিরাজ্যের রাজা, সেই হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা শুরু করলো হনুমান বলে বাঁদরের সামনে বা সব্বলা বলে গরুর সামনে।

মার্ক্স্ যেগুলিকে ভিলেজ্-কমিউনিটি বা গ্রাম-সমবায় বলছেন সেগুলির মধ্যে তাঁর ধারণায় যদি মানুষের এ-জাতীয় মানসিক অধঃপতন ঘটে থাকে, যদি সেগুলি জাতিভেদ ও দাসপ্রথায় কলুষিত হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলিকে প্রকৃত ট্রাইব্যাল-সংগঠনের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা ভুল হবে। অথচ, আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি, এই গ্রাম-সমবায়গুলির মধ্যে ট্রাইব্যাল-সমাজের চিহ্ন যে নেই তাও ঠিক নয়। তাই আমরা বলতে চাইছি, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ওই গ্রাম-সমবায়গুলিকে ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করবার সুযোগ রয়েছে। এই ধ্বংসাবশেষ-গুলির মধ্যে ট্রাইব্যাল-সমাজের আদি তাৎপর্য অবশ্যই বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছিলো : ট্রাইব্যাল-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যা ছিলো জীবনের সহায় এই গ্রাম-সমবায়গুলির মধ্যে তাই হয়ে দাঁড়ালো জীবনের অন্তরায়।

ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ : জাতিভেদ

সাবেকী ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার আর একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো জাতিভেদ। এই প্রথার ব্যাখ্যা হিসেবে বহু মতবাদ[২২৩] দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়েছে। এবং এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, জাতিভেদ সম্বন্ধে এখনো অনেক গবেষণার প্রয়োজন আছে। আমরা বলতে চাই, ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ সংক্রান্ত আমাদের প্রকল্প এই বৈশিষ্ট্যটির উপরও আলোকপাত করতে পারে।

একটা সময়ে জাতিভেদ-প্রথার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়েছিলো, হিন্দুদের শ্রুতি-স্মৃতির লিখিত স্বাক্ষ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করেই[২২৭]। কিন্তু সে-চেষ্টা সফল হয়নি। কেননা, স্মৃতিশাস্ত্রে জাতিভেদ প্রথার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে বাস্তবে প্রচলিত প্রথাটির বড়ো একটা মিল নেই[২২৮]। স্মৃতিশাস্ত্র চতুর্বর্ণের কথাই বলে ; কিন্তু বাস্তবভাবে দেখা যায় জাতি প্রায়

অসংখ্য। কথার কথা হিসেবে আমরা বলি ছত্রিশ জাত—এও কিন্তু খুবই কমিয়ে বলা।

বাস্তবভাবে সমাজে এই যে প্রায় অসংখ্য জাতের অস্তিত্ব,—একে শুধুমাত্র একালের ব্যাপার মনে করলে ভুল হবে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই রকম। এবং সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রিস্ ডেভিডস্, রিচার্ড ফিক্ প্রমুখ বৌদ্ধশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ বিদ্বানেরা[২২৯]।

এঁদের রচনায় ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস হিসেবে বৌদ্ধ পুঁথিপত্রগুলির প্রতি নতুন উৎসাহ দেখা গেলো। এবং এঁরা বললেন, বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী থেকে জাতিভেদ সংক্রান্ত ও সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতের সমাজ-ইতিহাস সংক্রান্ত যে-সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের রচনায় উল্লেখিত মতামতগুলির মিল হয় না। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে, পুরাণ ও বিশেষ করে স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে, ব্রাহ্মণেরা নিজেদের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকেই বাস্তবের বর্ণনা বলে প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্যই, ফিক্[২৩০] মানছেন, ব্রাহ্মণ মতাবলীর মধ্যে যদিও বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নেই তবুও সেগুলি যে সামাজিক বাস্তবের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। তবুও, তিনি[২৩১] বলছেন, ব্রাহ্মণদের রচনায় মূল চেষ্টাটা ছিলো, সমাজ-বাস্তবে যে সব অজস্র জাতের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে সেগুলির কথা কোনো মতে চতুর্বর্ণ-মূলক থিয়োরিটির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, এবং অতএব, এই অন্যান্য জাতিগুলির একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করা। ফিক্ দেখাবার চেষ্টা করছেন,[২৩২] ব্রাহ্মণ-মতবাদ অনুসারে যে-জাতিগুলিকে বর্ণশঙ্কর আখ্যা দেওয়া হচ্ছে এবং যেগুলির উৎস সম্বন্ধে নানা রকম কল্পিত কাহিনী প্রচার করা হচ্ছে সেগুলির নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এগুলি স্থান-বাচক বা ট্রাইব-বাচক : অর্থাৎ, নামগুলি এসেছে হয় কোনো জায়গার নাম থেকে আর না হয়তো কোনো ট্রাইবের নাম থেকে। এ রকম নামের অনেক দৃষ্টান্তই তিনি উল্লেখ করেছেন : মাগধ, নিষাদ, বিদেহ, অম্বষ্ঠ, মল্ল, লিচ্ছবি, চণ্ডাল। আবার ফিক্ বলছেন, কোনো কোনো জাতের নাম এসেছে মনুষদের পেশার দিক থেকে। যেমন : সূত (রথকারক), বেন (যারা বেতের কাজ করে), নট, কৈবর্ত, (জেলে), ইত্যাদি[২৩৩]।

তাহলে, এই ধরনের জাতগুলির ব্যাখ্যা হিসেবে ফিক্-এর সিদ্ধান্তটা কী? তিনি বলছেন, এ-দেশে আর্য-সমাজের বহির্ভূত নানান মানবদল বর্তমান ছিলো। তাদের এবং তাদের পেশা সম্বন্ধে আর্যদের মনে ঘৃণা যতোই থাকুক না কেন, একেবারে সরাসরি তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। আবার চতুর্বর্ণের কোনো একটি বর্ণের অন্তর্গত বলে স্বাভাবিকভাবে তাদের স্বীকার করে নেওয়াও যায়নি। অতএব, চতুর্বর্ণ-মূলক

আর্যদের ওই মতবাদটিকেই আরো একটু ব্যাপক করে নেবার চেষ্টা হলো এবং তথাকথিত শঙ্কর-জাতগুলির কথা চতুর্বর্ণের কোনো এক বর্ণের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এগুলির পরিবার-গত ও পেশা-গত নামের একটা করে কাল্পনিক ব্যাখ্যাও উদ্ভাবন করা হলো[২৩৪]।

বৌদ্ধযুগের ভারতীয়-সমাজ সম্বন্ধে রিচার্ড ফিক্-এর এই গবেষণা যতোই মূল্যবান হোক না কেন, জাতিভেদ-প্রথার ব্যাখ্যা হিসেবে তাঁর সিদ্ধান্তগুলিকে অসম্পূর্ণ না বলে উপায় নেই। তার নানান কারণ আছে। একটি কারণ হলো, তিনি ওই ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের তথ্যকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে জাতিভেদ-প্রথার একটা ব্যাখ্যা খোঁজ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের কথাগুলিকে তিনি আর্যজাতির মনগড়া কথা বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেও, জাতিভেদ-প্রথা ওই তথাকথিত আর্যদের মধ্যেও অত্যন্ত প্রকটভাবেই ফুটে উঠেছিলো। অতএব, বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে শুধুমাত্র শঙ্কর-জাতিগুলির কথা বিশ্লেষণ করেই জাতিভেদ সমস্যার একটা পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেওয়া যায় না—সমাধানটিকে স্বীকারযোগ্য, অতএব পূর্ণাঙ্গ, করতে হলে 'আর্য'দের চতুর্বর্ণ-ব্যবস্থারও একটা ব্যাখ্যা তারই মধ্যে থাকা দরকার।

দ্বিতীয়ত, ফিক্ তাঁর তথ্য সংগ্রহ করেছেন প্রধানতই জাতকের গল্পগুলি থেকে। অবশ্যই, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে-যুগের ভারতবর্ষের একটা বিশেষ অঞ্চল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের যোগান জাতকের গল্পগুলির মধ্যেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গেই একথাও মনে রাখা দরকার যে, জাতিভেদ-প্রথা শুধুমাত্র সেকালের ব্যাপার নয়, একালের ব্যাপারও। তাই, একালের বাস্তব পরিস্থিতিকে ঠিক মতো বিশ্লেষণ করতে পারলে সেকালের সাহিত্যের উপর আলোকপাত হবার সম্ভাবনাও থেকে যায়। বস্তুত, এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে ফিক্ নিজেও অচেতন নন। তিনি বলেছেন[২৩৫]:

> We do not hesitate to make use of the conditions of modern India which, on account of the stability of most Oriental cultures, have preserved so much of the past for comparison with, and for the explanation of, the earlier periods.
>
> অর্থাৎ, প্রাচ্য সংস্কৃতির স্থবিরতার দরুন ভারতের আধুনিক পরিস্থিতিতেও প্রাচীন অবস্থার অনেক কিছুই টিকে থেকেছে; তাই প্রাচীন অবস্থার সঙ্গে তুলনা করবার জন্যে ও প্রাচীন অবস্থাকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে ভারতবর্ষের আধুনিক অবস্থার কথা ব্যবহার করতেও আমাদের দ্বিধা হয় না।

বলাই বাহুল্য, ফিক্-এর এই ইংগিতটি অত্যন্ত দুর্মূল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-ইংগিতের সম্ভাবনা তিনি নিজের গবেষণাক্ষেত্রে বাস্তবে পরিণত করেননি।

আমাদের যুক্তি হলো, জাতিভেদ-প্রথার মূল ব্যাখ্যা খুঁজতে হলে বৌদ্ধসাহিত্য ছাড়াও দুটি দিকে নজর রাখা দরকার। এক, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের কথা। দুই, সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের বাস্তব পরিস্থিতির কথা। তাই এখানে আমাদের কাছে প্রধান প্রশ্ন হবে, জাতিভেদ-প্রথার মধ্যে এমন কোনো মূল লক্ষণ কি সত্যিই চোখে পড়ে যা একাধারে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণগুলি এবং সাম্প্রতিক ভারতীয় পরিস্থিতি,—উভয়ের মধ্যেই বর্তমান? যদি সত্যিই সে-রকম কোনো লক্ষণের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে সেইটির সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েই এই জটিল সমস্যার সমাধান পাবার আশা আছে।

প্রথমত, বর্তমান ভারতের বাস্তব পরিস্থিতির কথাই বিচার করে দেখা যাক।

পুঁথিপত্রের গণ্ডি ছেড়ে আমরা যদি দেশের মানুষগুলির দিকে চেয়ে দেখতে রাজি হই তাহলে প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে এক অতি বিস্ময়কর ঘটনা: আমাদের দেশের বিশেষ করে পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় আটকে-থাকা মানুষদের মধ্যে ট্রাইব্যাল-ব্যবস্থা (*tribal organisation*) এবং জাত-ব্যবস্থা (*caste-organisation*)—এই দুয়ের মধ্যে সীমারেখা সব সময় স্পষ্ট নয়। যাঁরা এই পিছিয়ে-পড়া মানুষদের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের অধিকাংশের বেলাতে গ্রন্থের নামকরণ ব্যাপারের মধ্যেই এই স্বীকৃতি থেকে গিয়েছে: বই-এর নামকরণ করবার সময় তাঁরা শুধুমাত্র *Tribe* বা শুধুমাত্র *Caste* শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করছেন—অতএব শিরোনামায় ট্রাইব এবং কাস্ট উভয় শব্দই সংরক্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সেন্সাস্ কর্তৃপক্ষরা[২০৩] এই পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলির বর্ণনা দেবার জন্যে সাধারণত তাঁদের রিপোর্টের একটি স্বতন্ত্র খণ্ড প্রকাশ করে থাকেন এবং সেটির নাম দেওয়া হয় "ট্রাইবস্ এবং কাস্টস্": ওই পিছিয়ে-পড়া মানুষদের ভিতর ট্রাইব এবং কাস্ট-এর মধ্যে সীমারেখাটা অস্পষ্ট বলেই এ ধরনের নামকরণ প্রয়োজন হয়েছে। একই কারণে, অনন্তকৃষ্ণ আয়ার, থার্স্টন, রাসেল প্রমুখ সকলেই ওই ধরনের মানুষদের সম্বন্ধে বই লেখবার সময় ট্রাইব এবং কাস্ট উভয় শব্দই প্রায় সমানার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। কোনো একটি নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীকে ট্রাইব আখ্যা দেওয়া হবে, না, কাস্ট আখ্যা দেওয়া হবে—এ-বিষয়ে লেখকরা সব সময় খুব সুনিশ্চিত নন। এর থেকেই কি অনুমান করবার অবকাশ থাকে না যে, কাস্ট-সংগঠন ও ট্রাইব-সংগঠন খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত? আর যদি তাই হয়, তাহলে ট্রাইব-সংগঠন সম্বন্ধে সাধারণভাবে

জানতে পারা তথ্যকে অবলম্বন করেই কাস্ট-সংগঠনের সমস্যা সমাধান করবার আশা থাকে না কি? অবশ্যই, তাই বলে ট্রাইব আর কাস্টকে এক মনে করবারও কারণ নেই; ট্রাইব্যাল-সমাজ বহু দেশেই টিকে আছে, কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা সর্বত্র নেই। ভারতবর্ষেই যে-সব জায়গায় ট্রাইব্যাল-সমাজের বিশুদ্ধতর রূপ সেখানেও জাতিভেদ-প্রথার পরিচয় নেই। আমরা তাই অনুমান করতে চাইছি, জাতিভেদ-প্রথা আসলে ট্রাইব্যাল-সমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিণাম—ট্রাইব্যাল-সমাজেরই ধ্বংসাবশেষ এর মধ্যে টিকে রয়েছে, কিন্তু ট্রাইব্যাল-সমাজের মূল প্রাণশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংসাবশেষটির আদি-তাৎপর্য বিপরীতে পরিণত হয়েছে। এবং ট্রাইব্যাল-সমাজের ওই অসমাপ্ত বিলোপের কারণ হলো, উৎপাদন-কৌশলের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলো—উৎপাদন-পদ্ধতির সাধারণ বা স্বাভাবিক উন্নতির ফলে ট্রাইব্যাল-সমাজ যদি ভিতর থেকে ধ্বংস পেতো তাহলে তার বিলোপ অসম্পূর্ণ হতো না। সেদিক থেকে কৌটিল্যের উদ্ধৃত নীতিটি ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে বোঝবার কাজে একটি মূল্যবান মূলসূত্র।

জাতিভেদের কথায় ফিরে আসা যাক। প্রথমে দেখা যাক, পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথার যে-রূপটি চোখে পড়ে তাতে ট্রাইব ও কাস্ট-এর মধ্যবর্তী সীমারেখা কী রকম অস্পষ্ট। এখানে খুব এলোমেলো ভাবে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলেই চলবে, কেননা প্রকৃতপক্ষে এ-জাতীয় দৃষ্টান্ত প্রায় অসংখ্য।

আমরা রাসেল ও হীরালাল[২৩১] রচিত "মধ্যভারতের ট্রাইব এবং কাস্ট" বলে বই থেকে এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবো:

1. The *Ahir* caste has sub-castes, which again are divided into exogamous sections. The names of these sections are often titular and totemic animals.
2. The *Andh* caste : The caste is divided into two groups : the *Vartati* or pure and the *Khaltati* or illegitimate, which take food together but do not intermarry. These again are divided into a large number of exogamous septs, a few of which names are totemic, e. g., *Majiria* (cat), *Ruigni* (a kind of tree), *Dumare* (from Dumar, an ant-hill), *Dukare* (from *Dukar*, a pig), *Titawe* (from *Titwa*, a bird), and so on.
3. The *Baiga*, a primitive Dravadian tribe, is divided into seven sub-tribes, which again are divided into a number of exogamous septs, the names of which are identical with those

of the Gonds, as *Markm*, *Maravi*, *Netam*, *Tekam*. Prohibition of marriage into these septs are based on the number of gods that they worship. No sept can marry into another sept which also worships the same gods.

আগেই বলেছি, এই দৃষ্টান্তগুলি খুব কিছু বাছাই করে উদ্ধৃত করিনি। তার বদলে, প্রায় এলোমেলোভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এগুলির মধ্যেই যে-বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা বিচার করলে চিত্তাকর্ষক তথ্য নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

প্রথমত দেখা যাচ্ছে, তৃতীয় দৃষ্টান্তের বেলায় লেখকরা *tribe* শব্দ ব্যবহার করেছেন কিন্তু আগের দুটি দৃষ্টান্তে *caste* শব্দ। অথচ তিনটি ক্ষেত্রেই মানবদলের যে-ধরনের বর্ণনা তার মধ্যে এমন কোনো ইংগিত নেই যার দরুন এই দু'রকম পৃথক শব্দ-ব্যবহার সমর্থিত হতে পারে। ট্রাইব আর কাস্ট অবশ্যই এক নয়; কিন্তু লেখকরা দেখছেন, তা সত্ত্বেও যেন একই রকম। সেই কারণেই আমরা বলছিলাম, এই ধরনের পিছিয়ে-পড়া মানুষদের পরীক্ষা করলে দেখা যায় ট্রাইব এবং কাস্ট-এর মধ্যে সীমারেখাটা অস্পষ্ট। তার মানে, ট্রাইব্যাল সমাজের অসমাপ্ত ধ্বংসাবশেষই জাতি-ভেদ-প্রথার মূল উপাদান।

দ্বিতীয়ত দেখা যাচ্ছে, প্রথম নমুনাটির বেলায় যদিও লেখকরা *exogamous sections* বলে শব্দ ব্যবহার করছেন তবুও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নমুনার বেলায় তাঁরা *exogamous septs* বলে পরিভাষা ব্যবহার না করে পারছেন না। নৃতত্ত্বের ছাত্রের কাছে *exogamous septs* নামের পরিভাষা অপরিচিত নয়; কিন্তু এই পরিভাষা শুধুমাত্র ট্রাইব্যাল-সংগঠন সম্বন্ধেই প্রাসঙ্গিক। তার মানে কি এই নয় যে, লেখকরা এখানে *caste* বা জাত-এর বর্ণনায় এমন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা শুধুমাত্র ট্রাইব-প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য? কিন্তু আসল সমস্যাটা শুধুমাত্র পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের সমস্যাই নয়, তার চেয়ে ঢের মৌলিক এক সমস্যা। কেননা, তাঁরা এমন একরকম সামাজিক প্রথার সম্মুখীন হয়েছেন যাকে একদিক থেকে কাস্ট বা জাত না বলে পারছেন না; আবার অপরদিকে তারই আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ট্রাইব্যাল-সংগঠনের পক্ষে প্রাসঙ্গিক পরিভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে, জাত বা কাস্ট বলে ব্যবস্থাটি কোথা থেকে এলো।

বিষয়টির আলোচনা ভালো করে করতে হলে এখানে ট্রাইব্যাল-সংগঠনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উল্লেখ করা দরকার।

আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে মর্গান ট্রাইব্যাল-সমাজের যে-রূপটি

দেখেছিলেন তাকেই আমরা এ-সংগঠনের টিপিক্যাল রূপ বা আদি-অকৃত্রিম রূপ মনে করতে পারি।

মর্গান দেখাচ্ছেন, প্রতিটি ট্রাইব সাধারণত বড়ো বড়ো দুটি ভাগে বিভক্ত। এই দুটি ভাগকে বলা হয় ফ্রাত্রি বা *phartry*। প্রতিটি ফ্রাত্রি আবার কয়েকটি করে আরো ছোটোছোটো মানবগোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই ছোটো ছোটো গোষ্ঠির মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষই প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেকে সজ্ঞাতি মনে করে, তাদের ধারণায় একই পূর্বপুরুষ থেকে তাদের সকলের উৎপত্তি। মর্গান এই ছোটোছোটো গোষ্ঠীগুলিকে বলছেন গেন্‌স্‌ বা *gens*; কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে মর্গানের ওই পরিভাষাটি জনপ্রিয় হয়নি। গেন্‌স্‌-এর বদলে তাঁরা অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করে থাকেন,—সাধারণত ক্লান্‌ (*clan*), কখনো বা সেপ্ট (*sept*), কখনো বা সিব্‌ (*sib*)। অবশ্যই, ট্রাইব্যাল-সমাজের উচ্চতম পর্যায়ে একাধিক ট্রাইব একটি বৃহত্তর সংগঠনের মধ্যে মিলিত হয়—তাকে বলা হয়েছে কন্‌ফেডারেসি অব্‌ ট্রাইব্‌স্‌ বা *confederacy of tribes*। এবং প্রত্যেক ট্রাইবের ক্ষেত্রেই দুটি করে ফ্রাত্রি চোখে পড়তে বাধ্য নয়; কোনো কোনো দৃষ্টান্তে ফ্রাত্রি চোখে পড়েই না, কোনো কোনো দৃষ্টান্তে ফ্রাত্রির সংখ্যা দুই-এর বেশি। কিন্তু এ-জাতীয় দৃষ্টান্তকে মোটের উপর ব্যতিক্রম মনে করা যেতে পারে।

গেন্‌স্‌ বা ক্লান সম্বন্ধে মর্গানের একটি মন্তব্য আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি বলছেন, আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে সর্বত্রই চোখে পড়ে, কোনো-না-কোনো জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকেই এগুলির নামকরণ করা হয়েছে[২৩৮]। এই নামকরণ পদ্ধতি অবশ্যই টোটেম্‌-বিশ্বাসের পরিচায়ক।

এবার মর্গানের গ্রন্থ[২৩৯] থেকে একটি মূর্ত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক।

‘ইরোকোয়া’দের কন্‌ফেডারেসি অব্ ট্রাইবস্

কন্‌ফেডারেসির অন্তর্গত ছ'টি ট্রাইবের নাম	প্রতি ট্রাইবের অন্তর্গত ফ্রাত্রি	ফ্রাত্রির অন্তর্গত গেন্‌স্ বা ক্লান (পঞ্চম ও ষষ্ঠ ট্রাইবের বেলায় ফ্রাত্রি নেই)
১ : সেনেকা (Seneca)	ক	১ : ভালুক, ২ : নেকড়ে, ৩ : বীবর, ৪ : কাছিম।
	খ	১ : হরিণ, ২ : কাদাখোঁচা পাখি, ৩ : বক, ৪ : বাজপাখি।
২ : কেউগা (Cayuga)	ক	১ : ভালুক, ২ : নেকড়ে, ৩ : কাছিম, ৪ : কাদাখোঁচা, ৫ : ঈলমাছ।
	খ	১ : হরিণ, ২ : বাজপাখি, ৩ : বীবর।
৩ : ওননডগা (Onondaga)	ক	১ : নেকড়ে, ২ : বীবর, ৩ : কাছিম, ৪ : কাদাখোঁচা, ৫ : বল্।
	খ	১ : হরিণ, ২ : ভালুক, ৩ : ঈলমাছ।
৪ : টুস্‌কারোরা (Tuscarora)	ক	১ : ভালুক, ২ : বীবর, ৩ : বড়ো কাছিম, ৪ : ঈলমাছ।
	খ	১ : ধূসর নেকড়ে, ২ : হলদে নেকড়ে, ৩ : ছোটো কাছিম, ৪ : কাদাখোঁচা।
৫ : মোহক (Mohawk)		১ : ভালুক, ২ : নেকড়ে, ৩ : কাছিম।
৬ : ওনেইডা (Oneida)		১ : ভালুক, ২ : নেকড়ে, ৩ : কাছিম।

এই দৃষ্টান্তটিকে সামনে রেখে ট্রাইব্যাল-সমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাক। আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে প্রধানত দুটি বিষয়ের কথাই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হবে। ১: বিবাহ-পদ্ধতি। ২: শাসন-পদ্ধতি।

ট্রাইব্যাল-সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি সংক্রান্ত আইন-কানুনই সবচেয়ে অমোঘ[২১০]। বিবাহ-সংক্রান্ত আইন বলতে প্রধানত হলো: ক্লানের ভিতরে কাউকে বিয়ে করা চলবে না। বিয়ে করতে হবে ক্লানের বাইরে। ভালুক-ক্লানের কেউই ভালুক-ক্লানের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না—বিয়ে করতে হবে ভালুক-ক্লানের বাইরে (*clan-exogamy*)[২১১]।

ট্রাইব্যাল-সমাজের শাসন-পদ্ধতির মূল কথা হলো, পঞ্চায়েৎ বা *council*। ক্লানের পঞ্চায়েৎ-এ ক্লানের বয়ঃপ্রাপ্ত সকলে একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্তে আসবে, প্রত্যেক ক্লানের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে (ফ্রাত্রি-পঞ্চায়েৎ এবং) ট্রাইবের পঞ্চায়েৎ বসবে, প্রতিনিধিদের কাজকর্ম সন্তোষজনক না হলে তাদের প্রতিনিধিত্ব খারিজ করে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে[২১২]। এই ব্যবস্থার দরুনই ট্রাইব্যাল-সমাজে গণতন্ত্রের অমন চূড়ান্ত নিদর্শন এবং, আমরা আগেই আলোচনা করেছি, আমাদের দেশের পুরোনো পুঁথিপত্রে উল্লেখিত গণসমাজের ওই চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক আয়োজন দেখেই আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এগুলিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ভুল করেছেন।

এবার দেখা যাক, জাতিভেদ-প্রথার মধ্যে ট্রাইব্যাল-সমাজের এই দুটি বৈশিষ্ট্য কী রকম স্পষ্টভাবে টিকে রয়েছে। প্রথমে আমাদের দেশের পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলির মধ্যে জাত-প্রথা বা *caste-system*-এর কথা তোলা যাক, তারপর উচ্চ-বর্ণের প্রসঙ্গে ফেরা যাবে।

পিছিয়ে-পড়া মানুষদের ব্যাপারে রাসেল ও হীরালালের রচনা থেকে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিরই বিশ্লেষণ করা যাক। অহীর এবং অন্ধ্ নামের যে-দুটি জাতের (*caste*-এর) উল্লেখ করা হয়েছে সে-দুটির মধ্যে প্রথমটির সংগঠন হুবহু মর্গান-বর্ণিত মোহক আর ওনেইডা ট্রাইবের মতোই—এগুলির ক্ষেত্রে ফ্রাত্রি বলে অন্তর্বর্তী বিভাগের পরিচয় নেই, তার বদলে ট্রাইবটি কয়েকটা জন্তু-জানোয়ারের নামধারী ও বহির্বিবাহ-মূলক বা *exogamous* গোষ্ঠীতে বিভক্ত। রাসেল ও হীরালাল-বর্ণিত অন্ধ্ বলে জাতটির সংগঠন হুবহু মর্গান-বর্ণিত সেনেকা বা কেউগা ট্রাইবেরই মতো—ট্রাইবটি প্রথমত দুটি বড়ো ভাগে (ফ্রাত্রি) বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি বড়ো ভাগের অন্তর্গত রয়েছে জানোয়ার-নামধারী বহির্বিবাহ-ভিত্তিক কয়েকটি ছোটোছোটো গোষ্ঠী:
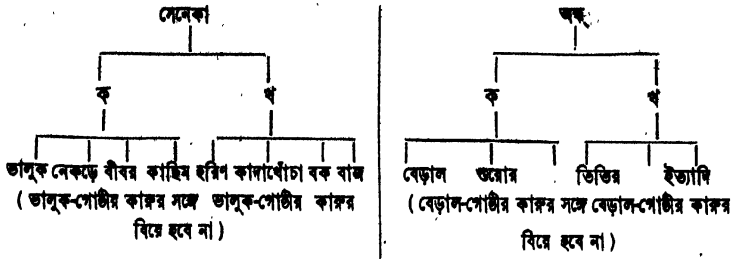
জাতিভেদ-প্রথার উৎপত্তিতে যে ঠিক কী তা এই তুলনা থেকেই আন্দাজ করা যায় এবং এর থেকেই বুঝতে পারা যায় ভারতবর্ষের পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলির মধ্যে জাতিভেদ-প্রথার (*caste-system*-এর) বর্ণনা দেবার সময় বর্ণনাদাতারা কেন অমন সরাসরি ট্রাইব্যাল-সমাজ-বর্ণনার পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন।

ওই পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলির মধ্যে জাতিভেদ-প্রথায় শুধুই যে ট্রাইব্যাল-সমাজের বিবাহ পদ্ধতির পরিচয় টিকে রয়েছে তাই নয়; অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এমনকি ট্রাইব্যাল-সমাজের শাসন-ব্যবস্থার বা পঞ্চায়েৎ প্রথারও প্রায় পূর্ণাঙ্গ স্বাক্ষর থেকে গিয়েছে[২১৩] :

> Caste discipline is maintained by the members of the community through their recognised leaders....Sometimes they hold offices with well-defined duties, but usually among the functional castes, they form a standing committee, or *panchayat*, which deals with all branches of caste-discipline and other matters affecting the community. The decisions of the *panchayat* are final and their authority is unquestioned. Minor breaches of caste-rules and restrictions can be expiated by a ceremony of purification and a feast to the fraternity : but for more serious offences, or for contumacy, the penalty is excommunication. A man against whom this sentence has been pronounced is cut off from all intercourse with his caste-fellows, who will neither eat nor smoke nor associate with him ; he is shunned as a leper, and his life is made so miserable that he soon becomes eager to accept any conditions that may be imposed upon him. Should his offence be too heinous to permit of atonement, he is driven to seek admission to some lower caste, or to become a Muhammadan, or to hide himself in the towns, where the trammels of the caste system are weaker and less irksome than in the villages.

অর্থাৎ সংক্ষেপে, সাধারণত জাত-এর আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও শাসনের দায়িত্ব থাকে একটি করে স্থায়ী পঞ্চায়েৎ-এর উপর। এই পঞ্চায়েৎ-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং অলঙ্ঘনীয়। ছোটোখাটো দোষত্রুটির প্রতিকার হিসেবে হয়তো প্রায়শ্চিত্ত ও জ্ঞাতিভোজনই পর্যাপ্ত; কিন্তু ত্রুটি যদি মারাত্মক হয় তাহলে পঞ্চায়েৎ বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়। এইভাবে কেউ জাতিচ্যুত বা জাতি-বহিষ্কৃত হলে তার সঙ্গে জাতের বাকি কেউ আর কোনো রকম সম্পর্ক রাখে না এবং ব্যক্তিটির ত্রুটি যদি একেবারেই অমার্জনীয় হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত অন্য কোনো নীচ জাতের মধ্যে স্থান নিতে সে বাধ্য হয়,—বা হয়তো, সে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়; বা গ্রাম ছেড়ে শহরে—যেখানে জাতের শাসন অপেক্ষাকৃত কম কঠোর,—পালাতে বাধ্য হয়।

আমাদের যুক্তি হলো, এই শাসন-ব্যবস্থা ও শাস্তি-ব্যবস্থা উভয়ের মধ্যেই ট্রাইব্যাল-সমাজের শাসন-ব্যবস্থা ও শাস্তি-ব্যবস্থার অভ্রান্ত ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়[২১১]। তাই, এদিক থেকেও জাত-ব্যবস্থাকে (*caste-system*-কে) ট্রাইব্যাল-সমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিচায়ক বলে অনুমান করবার সুযোগ রয়েছে।

অবশ্যই, কোনো-কোনো লেখক স্বীকার করছেন, দেশের পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলির মধ্যে জাতিভেদ-প্রথার যে-পরিচয় তা ট্রাইব্যাল-সংগঠনেরই রূপান্তর মাত্র। এমনকি *castes of the tribal type* (!) বা ট্রাইব্যাল-ধরনের জাত বলে শব্দ ব্যবহারও চোখে পড়ে[২১২]:

> ...there are the totemistic clans which are found amongst the castes of the tribal type. The totem is some animal or vegitable formerly held in reverence by the members of the clan and associated with some taboo; but by the time a tribe has developed into a caste, the origin of the name has generally been forgotton, and the name itself is transformed.
>
> অর্থাৎ, ট্রাইব-ধরনের জাতগুলির মধ্যে টোটেম্-বিশ্বাসমূলক ক্লান রয়েছে। ক্লানের সভ্যরা যে-জন্তু বা গাছগাছড়াকে আগে শ্রদ্ধা করতো এবং যেগুলির সঙ্গে কিছু কিছু নিষেধের সম্পর্ক ছিলো সেইগুলিই হলো টোটেম্। কিন্তু একটি ট্রাইব উন্নত হতে হতে জাত-এ পরিণত হবার পর এই টোটেম্-মূলক নামটির উৎস সাধারণত বিস্মৃত হয় এবং নামটি বদলে যায়।

এই ধরনের মতবাদের বিরুদ্ধে নানান আপত্তি ওঠে।

প্রথমত, এখানে *castes of the tribal type* বা ট্রাইব্যাল-ধরনের জাত বলে এক রকম বিশিষ্ট জাতের কথা বলা হচ্ছে। আর ধরেই নেওয়া হচ্ছে

যে, যে-কথা বা যে-বৈশিষ্ট্য এই নির্দিষ্ট জাতগুলি সম্বন্ধে প্রযোজ্য তা থেকে সাধারণভাবে জাতিভেদ-প্রথার রহস্য বোঝবার চেষ্টাটা সঙ্গত হবে না। এবং এই ইঙ্গিতটিই হলো আলোচ্য মন্তব্যের প্রধান দুর্বলতা। কেননা, দেশের ওই পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলির মধ্যে ট্রাইব্যাল-সংগঠন ও জাত-সংগঠনের সীমারেখা অস্পষ্ট বলেই, বা জাতিভেদ-প্রথাটি অন্যান্য ক্ষেত্রে যে-রকম কঠিন-ভাবে দানা বেঁধেছে ও একেবারে স্বতন্ত্র একটি প্রথার রূপ পেয়েছে তার অভাব বলেই,—এইখান থেকে মূলসূত্র পেয়ে জাতিভেদ-প্রথার অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলিকে বোঝবার সম্ভাবনা সত্যিই রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, লেখক বলছেন *by the time a tribe has developed into a caste,* ইত্যাদি। এ-কথার তাৎপর্য ঠিক কী? লেখক কি সাধারণ নিয়ম হিসেবে ট্রাইবের পক্ষে কাস্ট-এ পরিণত হবার কথা বলছেন? কিন্তু যদি এটা সমাজ-বিকাশের কোনো সাধারণ নিয়মই হয় তাহলে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও জাত-প্রথা দেখা দেয়নি কেন?

এই তথাকথিত ট্রাইব্যাল ধরনের জাত-গুলির বৈশিষ্ট্য বিচার করেই যে উচ্চ-বর্ণগুলির রহস্য অনুসন্ধান করবার অবকাশ আছে তার নমুনা উল্লেখ করা যায়। উক্ত জাতগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে কয়েকটি বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার: ১) প্রত্যেকটি জাতের মধ্যে ছোটোছোটো কয়েকটি করে গোষ্ঠী রয়েছে। ২) এই গোষ্ঠীগুলি বহির্বিবাহ-মূলক বা *exogamous*: গোষ্ঠীর অন্তর্গত কেউই অপর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। ৩) গোষ্ঠীগুলির নামকরণের মধ্যে টোটেম্‌-বিশ্বাসের চিহ্ন থেকে গিয়েছে।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের মধ্যেও ছোটো ছোটো গোষ্ঠী রয়েছে। এগুলিকে বলা হয় গোত্র। গোত্র মানে ঠিক কী, তা নির্ণয় করবার জন্যে আধুনিক বিদ্বানেরা বহু গবেষণা করেছেন[২১৩] এবং এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, এখনো অনেক গবেষণা বাকি আছে। কিন্তু গবেষক যদি ট্রাইব্যাল-সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে-পারা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এগোতে রাজি না হন তাহলে তাঁর পক্ষে অজস্র উক্তির জটিলতায় দিক্‌ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। কেননা, "বৌধায়ন, আপস্তম্ব, সত্যাষাঢ়, কুটিল, ভরদ্বাজ, লৌগাক্ষি, কাত্যায়ন ও আশ্বলায়ন প্রভৃতি রচিত শ্রৌতসূত্রে, মৎস্যপুরাণে, ভারতাদি ইতিহাসে ও মনু প্রভৃতি প্রণীত স্মৃতিসমূহে অল্পবিস্তর গোত্রের বিবরণ আছে, কিন্তু ইহার অনেক স্থলেই এক গ্রন্থের সহিত অপর গ্রন্থের বিরোধ বা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণে সহজে তাঁহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না"[২১১]। এবং, পুরুষোত্তমের গোত্রপ্রবরমঞ্জরী, ধনঞ্জয়ের ধর্মপ্রদীপ, বালভট্ট ও মহাদেবদৈবজ্ঞের গোত্রপ্রবর, বিষ্ণুপণ্ডিতের গোত্রপ্রবরদীপ, অনন্তদেব, আপদেব, কেশব,

জীবদেব, নারায়ণভট্ট, ভট্টোজি, মাধবাচার্য ও বিশ্বনাথদেব রচিত গোত্রপ্রবর নির্ণয়, লক্ষ্মণভট্টের প্রবররত্ন, গোত্রপ্রবরভাস্কর এবং কমলাকরের গোত্রপ্রবর-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থও[২৪৮] গবেষকের জটিলতা-বোধ দূর করতে পারবে না; কেননা, অনেক পরের যুগে রচিত বলেই এই গ্রন্থগুলির মূল চেষ্টা হলো পরের যুগের সমাজব্যবস্থাকে ও শাসনব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করা[২৪৯]।

অতএব ভেবে দেখা যাক, ট্রাইব্যাল-সংগঠন সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্যের দিক থেকে গোত্র-র মূল লক্ষণগুলি বিচার করে গোত্র-ব্যবস্থার উৎস সম্বন্ধে কোনো কথা অনুমান করা যায় কি না।

১। সগোত্র-বিবাহ নিষেধ: "মনু প্রভৃতি স্মৃতি-প্রণেতাগণ, বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি সূত্রকারগণ ও মৎস্য প্রভৃতি পুরাণকার সকলেই সগোত্র-বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। ভ্রান্তি অথবা অপর কোনো কারণে সগোত্রে বিবাহ করিলে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, প্রায়শ্চিত্তের পরে সেই স্ত্রীর সহিত মাতার ন্যায় ব্যবহার করিবে। কখনও তাহাকে গ্রহণ করিবে না, এবং সেই স্ত্রীও তাহাকে আপন সন্তানের ন্যায় দেখিবে।"[২৫০]

২। গোত্রান্তর্গত সকলেরই পূর্বপুরুষ এক। পাণিনি[২৫১] বলছেন, "অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্"। কথাটাকে আর একটু সরল করবার জন্যে ব্যাখ্যাকার[২৫২] বলছেন, "জনস্য পৌত্র-প্রপৌত্র-বৃদ্ধপ্রপৌত্রাদি অন্তরাপত্যং গোত্রম্ উচ্যতে। গোত্রাপত্যম্ অন্তরাপত্যম্ ব্যবহিতাপত্যম্ পৌত্র-প্রপৌত্র-বৃদ্ধপ্রপৌত্র-প্রভৃতিকম্ ইতি যাবৎ।···অনন্তরাপত্যম্ অব্যবহিতাপত্যং পুত্রঃ কন্যা চ উচ্যতে"। গোত্রান্তর্গত সকলে একই পূর্বপুরুষের বংশধর।

৩। গোত্রনামগুলির মূলে টোটেম্-বিশ্বাসের পরিচয়। পুরোনো পুঁথিপত্রে বহু গোত্রের নাম পাওয়া যায় এবং বৌধায়ন-এর রচনা[২৫৩] থেকেই বোঝা যায় এককালে সত্যিই প্রায় অসংখ্য গোত্র ছিলো। এই নামগুলি প্রায়ই জন্তু-জানোয়ার বা গাছগাছড়ার নাম থেকে এসেছে, তাই এগুলি যে আদিতে টোটেম্-বিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণেরই অন্তর্গত কয়েকটি বিখ্যাত গোত্রনামের নমুনা দেখা যাক: ভরদ্বাজ (ভরত পাখি থেকে), গোতম (গোরু থেকে), কাশ্যপ (কাছিম থেকে), শুনক (কুকুর থেকে), মৌদগল্য (মাগুর মাছ থেকে), কৌশিক (পেঁচা থেকে), শাণ্ডিল্য (পাখি থেকে), বাৎস (বাছুর থেকে), মাণ্ডুকেয় (ব্যাঙ থেকে), দার্ভায়ন (দূর্বাঘাস থেকে), তৈত্তিরীয় (তিতির পাখি থেকে),—ইত্যাদি, ইত্যাদি[২৫৪]। অবশ্যই, পরবর্তী যুগে রচিত মতবাদের দরুন গোত্রগুলির এই টোটেমিক উৎসের কথাটা অনেকাংশেই ঢাকা পড়ে গিয়েছে—তখন থেকে কশ্যপ প্রমুখকে কল্পনা করা হয়েছে কোনো-এক আদি-ঋষি হিসেবেই,—

কাশ্যপ গোত্রের সকলেই যেন সেই ঋষিটির বংশধর। কিন্তু এ-কল্পনা যে কৃত্রিম ও অর্বাচীন তা দেখতে পাওয়া কঠিন নয় : ওই ধরনের নাম শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের মধ্যে চোখে পড়ে না, আজো আমাদের দেশের ট্রাইব্যাল ও আধা-ট্রাইব্যাল সমাজের মধ্যে ক্লান-নাম ও গোত্রনাম হিসেবেই টিকে আছে[২০৫]। রিজলি তাঁর ভারতবর্ষের মানুষ সম্বন্ধে বিখ্যাত বইটিতে ফর্দ করে দিয়েছেন, আমাদের দেশের পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের মধ্যে কতো গোত্রনামের উৎস জন্তু-জানোয়ার বা গাছগাছড়ার নাম থেকে। বৌধায়ন প্রমুখের গ্রন্থেও সেকালের অজস্র গোত্রনামের পরিচয় পাওয়া যায়[২০৬]। এই দুটি ফর্দকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করে দেখলে গোত্র-ব্যবস্থার উৎপত্তি-সংক্রান্ত সমস্যার উপর আলোকপাত হতে পারে।

গোত্র প্রসঙ্গে প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা গেলো। এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকে না যে, এমন কি উচ্চ-জাতি বা উচ্চ-বর্ণের বেলাতেও ট্রাইব্যাল-সমাজের ক্লান বা গেনস্ নামের ছোটোছোটো মানবগোষ্ঠীগুলি থেকেই এই গোত্রগুলির উৎপত্তি হয়েছিলো। আধুনিক লেখকদের মধ্যে অনেকেই প্রায় বাধ্য হয়ে 'গোত্র' কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে ক্লান শব্দই ব্যবহার করে থাকেন[২০৭]। কিন্তু ঠিক এই কারণেই ট্রাইব্যাল-ধরনের-জাত (*castes of the tribal type*) নাম দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের কোনো জাতের কথা কল্পনা না করে বরং অনুমান করা উচিত যে, দেশের ওই পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলির মধ্যে জাত-সংগঠন সংক্রান্ত যে-কথা অমন স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেই কথাটিকেই মূলসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে উচ্চ-বর্ণগুলির মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা সংক্রান্ত যে-কথা জটিল, অস্পষ্ট ও আবছা হয়ে রয়েছে তা বোঝবার অবকাশ সত্যিই আছে। অথচ, সমাজের নিচু-মহলের মানুষগুলির কাছ থেকে মূলসূত্র পেয়ে উঁচু-মহলের মানুষগুলির মধ্যে একই প্রথার রহস্য বোঝবার চেষ্টা সাধারণত করা হয় না। তাই, বৌদ্ধ-যুগের ভারতবর্ষে জাতিভেদ-প্রথার রূপটিকে বিশ্লেষণ করবার সময় রিচার্ড ফিক্-এর[২০৮] মতো বিদ্বানও যদিও স্পষ্টই দেখছেন, নিচু-মহলের মানুষ-গুলির বেলায়—জাতকের গল্পে যাদের হীনজাতীয় বা হীন-সিপ্পনি বলা হয়েছে—জাতিব্যবস্থাটা ট্রাইব্যাল ব্যবস্থামাত্রই, তবুও তিনি উচ্চ-বর্ণগুলির বেলায় স্বতন্ত্র ধরনের মূলসূত্র অনুসরণ করে জাতিভেদপ্রথার রহস্য-উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করেছেন।

অবশ্যই আপত্তি উঠবে, জাতিভেদ-প্রথার আলোচনায় শুধুমাত্র এই বিবাহ-ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি রাখলে সে-আলোচনা একপেশে এবং অসম্পূর্ণ হবে। কেননা, বিবাহ-ব্যবস্থা যদিও জাতিভেদ-প্রথার একটি মূল-বৈশিষ্ট্য তবুও তার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বৃত্তি বা পেশার অপরিবর্তনীয়তা। এরই

দরুন, কথার কথা হিসেবে জাত-ব্যবসায় কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ, জাতিভেদ-প্রথার আর একটি মূল লক্ষণ হলো, কেউই জন্মগত পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারবে না।

উত্তরে বলা যায়, প্রথমত বৃত্তির অপরিবর্তনীয়তা জাতিভেদ-প্রথার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলেও বিবাহ-প্রথার মতো মৌলিক লক্ষণ নয়। ফিক্[২২৯] প্রমুখ পণ্ডিতেরাই দেখাচ্ছেন, বৃত্তির অপরিবর্তনীয়তা সেকালেও সম্পূর্ণ অলঙ্ঘনীয় ছিলো না, একালেও নয়। তাছাড়া, জৈনদের মধ্যেও জাতিভেদ-প্রথা আছে, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে বৃত্তির অলঙ্ঘনীয়তা চোখে পড়ে না[২৩০]; তার বদলে প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে ওই বিবাহ-ব্যবস্থাই দেখা যায়। তাই উভয়-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিবাহ-বিধিকেই তুলনায় বেশি মৌলিক মনে করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বৃত্তির অপরিবর্তনীয়তা বলে লক্ষণটির ব্যাখ্যাও একই দিক থেকে পাওয়া অসম্ভব নয়। কেননা, ট্রাইব্যাল সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে দেখতে পাওয়া যায় এক-একটি ক্লানের মধ্যে এক-একটি বৃত্তি স্থিরনিশ্চয় হয়ে আসবার লক্ষণ[২৩১]। বস্তুত, মধ্যযুগের ইয়োরোপের গিল্ড প্রথার উৎপত্তিতে ট্রাইব্যাল-সমাজের এই বৈশিষ্ট্যটিই ছিলো। অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[২৩২] লিখছেন,

> as Gronbech has shown, the guild is descended from the clan. The mediæval guild is simply an advanced form of the craft clan. The only structural difference between them is that membership of the guild is not determined by birth, except in so far as the son becomes eligible by following his father's vocation; and even the primitive clan commonly admits strangers by adoption. Since the craft clan is a widespread feature of the higher stages of tribal society, there is no difficulty in supposing that it existed in primitive Attica; and, even if it did not, at least there existed the primitive clans out of which the craft clans subsequently developed.
>
> অর্থাৎ, গ্রন্‌বেক্ দেখিয়েছেন, ক্লান থেকেই গিল্ড-এর জন্ম। মধ্যযুগের গিল্ড কারিকর-ক্লানেরই উচ্চতর পর্যায়মাত্র। দু'-এর গড়নে একমাত্র তফাত হলো, গিল্ড-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটা জন্মগত নয়; তবে পিতার বৃত্তি অনুসরণ করে অবশ্য পুত্রও গিল্ডের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আদিম ক্লানগুলিও বাইরের লোককে প্রায়ই ক্লানের মধ্যে গ্রহণ করে। যেহেতু ট্রাইব্যাল-সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে কারিকর-ক্লান বহুলভাবেই চোখে পড়ে সেইহেতু প্রাচীনকালের এ্যাটিকাতেও যে তা ছিলো সে-কথা কল্পনা করতে বাধা নেই; আর তা যদি

নাও থেকে থাকে তাহলে অন্তত আদিম ক্লান নিশ্চয়ই ছিলো, যা থেকে পরবর্তী সময়ে কারিকর-ক্লানের উৎপত্তি হয়েছে।

কারিকর-ক্লানের বেলায় বৃত্তিটা জন্মগত, মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় সামন্ত-সমাজে তা নয়। কিন্তু আমাদের দেশে উৎপাদন পদ্ধতির অগ্রগতি ট্রাইব্যাল-সমাজকে স্বাভাবিকভাবে ধ্বংস করে সামন্ত-সমাজের নতুন ভিত্তি স্থাপন করেনি। ইয়োরোপীয় অর্থে সামন্ত-সমাজ আমাদের দেশে খুব সম্ভব সত্যিই দেখা দেয়নি। তাই ইয়োরোপীয় অর্থে গিল্ডও বোধহয় নয়। আমাদের দেশের সমাজে উচ্চতর পর্যায়ের বৃত্তি-ব্যবস্থাটা ট্রাইব্যাল-সমাজের উচ্চতর পর্যায়ের কারিকর-ক্লানের মতোই প্রধানত জন্মগত ও অলঙ্ঘনীয় হয়ে থেকেছিলো। একেও ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপের পরিণাম মনে করবার অবকাশ আছে।

জাতিভেদ-প্রথার অন্যান্য নানা বৈশিষ্ট্যেরও এই দিক থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া অসম্ভব নয়। যেমন ধরা যায়, একত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বাছ-বিচারের কথা। এর মধ্যেও ট্রাইব্যাল-সমাজেরই ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা, ট্রাইব্যাল-সমাজেও পংক্তিভোজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বস্তুত, রিস্ ডেভিড্স্[২৩৩] স্বীকার করছেন, জাতিভেদ-প্রথার বিবাহভিত্তিমূলক লক্ষণটির মতোই পংক্তিভোজন সংক্রান্ত এই লক্ষণটিতেও প্রাচীন সমাজেরই স্বাক্ষর রয়েছে।

আগেই বলেছি, আধুনিক অনেক লেখকদের রচনাতেই এ-কথা স্বীকৃত হতে দেখা যায় যে, ট্রাইব্যাল-সংগঠন-এর বৈশিষ্ট্য থেকেই জাতিভেদ-প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলির উৎপত্তি হয়েছে। এদিক থেকে, এমিএল সেনা-র[২৩৪] রচনাই বোধহয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, জাতিভেদ-প্রথার বৈশিষ্ট্য-ব্যাখ্যায় তিনিও ওই বিবাহ-বিধিমূলক লক্ষণটির উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। কিন্তু ট্রাইব্যাল-সংগঠন থেকে ঠিক কীভাবে জাতিভেদ-প্রথার উৎপত্তি হয়েছে এ-প্রশ্নের মীমাংসা এখনো হয়নি। অথচ, এই প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আদিতে ট্রাইব্যাল-সমাজ শুধু আমাদের দেশেই ছিলো না; সবদেশেই এবং অনিবার্যভাবেই তা ছিলো। কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা অন্যান্য দেশে দেখা যায় না। তাই একে ট্রাইব্যাল-সমাজের স্বাভাবিক পরিণাম বলে মনে করবার সুযোগও সত্যিই নেই।

এখানে বিশেষ করে আর একটি বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হবে। ট্রাইব্যাল-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাইব্যাল-সমাজের ব্যবস্থাগুলি ছিলো উদ্দেশ্যমূলক—এগুলি মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলিই জাতিভেদ-প্রথার বৈশিষ্ট্য হিসেবে রূপান্তরিত হবার পর হয়ে

দাঁড়িয়েছে জীবনের পরিপন্থী,—বাঁচবার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা। জাতিভেদ-প্রথাটি আমাদের জাতীয়-জীবনের পথে যে কী প্রচণ্ড বাধার রূপ ধারণ করেছিলো তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন নেই ; এ-বিষয়ে দেশপ্রেমিকদের সহস্র উক্তি এবং আমাদের মতো সাধারণ দেশবাসীদের তিক্ততম অভিজ্ঞতা রয়েছে[২২৫]। মার্ক্‌স্[২৩৩] বলেছিলেন, ভারতবর্ষের উন্নতি ও শক্তিলাভের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হলো এই জাতিভেদ-প্রথা এবং দেশে উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নততর পর্যায়ের প্রচলনই এই চূড়ান্ত বাধাটিকে ভাঙতে পারবে :

> Modern industry, resulting from the railway system, will dissolve the hereditary division of labour, upon which rest the Indian castes, those decisive impediments to Indian progress and Indian power.
>
> অর্থাৎ, রেল-ব্যবস্থা প্রসূত আধুনিক শ্রমশিল্প জন্মগত শ্রমবিভাগকে বিনষ্ট করবে ; এই শ্রমবিভাগের উপরই প্রতিষ্ঠিত হলো ভারতবর্ষের উন্নতির ও শক্তিলাভের পথে চূড়ান্ত বাধাস্বরূপ জাতিভেদ-প্রথা।

আমাদের যুক্তি হলো, ট্রাইব্যাল-সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি ট্রাইব্যাল-সমাজের প্রাণশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিরুদ্ধ পরিবেশে গ্রথিত হলে পর আদি-তাৎপর্যের দিক থেকে সেগুলি বিপরীতে পর্যবসিত হতে বাধ্য হয়। এককালে যা-ছিলো উদ্দেশ্যমূলক, তাই হয়ে দাঁড়ায় উদ্দেশ্য-বিরোধী। এবং এই কারণেই আমরা বলতে চাই, জাতিভেদ-প্রথা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদের পক্ষে ট্রাইব্যাল-সমাজ, সে-সমাজের বৈশিষ্ট্য, এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির আদি-তাৎপর্য সংক্রান্ত স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ : লোকন্যায়মূলক ও স্মৃতিমূলক আইন

সাবেকি ভারতীয়-সমাজের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—গ্রাম-সমবায় ও জাতিভেদ-প্রথা—নিয়ে কিছুটা আলোচনা তুলতে হলো। বলাই বাহুল্য, আমাদের এই আলোচনা উভয়-সমস্যার কোনোটিরই পূর্ণাঙ্গ সমাধান হবার মতো কোনো বড়ো দাবি করে না। কেননা, দুটি সমস্যাই অত্যন্ত জটিল—এ-নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং আরো বহু গবেষণা হওয়ার অবকাশ ও আবশ্যকতা আছে। তবুও আমাদের মূল যুক্তির দিক থেকে এই প্রসঙ্গগুলির অবতারণা করবার প্রয়োজন ছিলো। তার কারণ, যে-প্রকল্প বা হাইপথেসিসের উপর নির্ভর করে আমরা লোকায়ত ধ্যানধারণাকে বোঝবার চেষ্টা করছি সেই প্রকল্পটির পক্ষে কিছুটা নজির না দেখালে প্রকল্পটির গুরুত্ব

স্বীকৃত হবে না। আমাদের ওই প্রকল্প বা হাইপথেসিস্ হলো ট্রাইব্যাল-সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ—এই প্রকল্পের দৃষ্টান্ত হিসেবেই আমরা গ্রাম-সমবায় ও জাতিভেদ-প্রথার উল্লেখ করেছি। কিন্তু এগুলির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আমাদের আলোচনা অনেকখানিই বিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই এইখানে আমাদের যুক্তির মূল সূত্রটির পুনরুল্লেখ বাঞ্ছনীয় হবে।

ট্রাইব্যাল-সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ সংক্রান্ত ওই প্রকল্পটি আমাদের কাছে লোকায়তিক ধ্যানধারণার আলোচনায় এতোখানি গুরুত্বপূর্ণ কেন মনে হয়েছে ?

লোকায়ত-দর্শনের মূল সমস্যা হিসেবে আমরা শুরুতেই কয়েকটি কথার উল্লেখ করেছি।

প্রথমত, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখাচ্ছেন, লোকায়তিক বলতে শুধুমাত্র প্রাচীনকালের কোনো একটি নির্দিষ্ট মতবাদকেই সনাক্ত করবার চেষ্টাটা ভুল হবে। কেননা, এমন কি আজকের দিনেও লোকায়তিক ধ্যানধারণা আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি, মরে যায়নি। লিখিত পুঁথিপত্রগুলিতে লোকায়তিকদের বিদ্রূপ করবার উৎসাহে তাঁদের বিপক্ষেরা যে-সব টুকরো-টাকরা খবর লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন লোকায়তিক চেতনাকে বোঝবার আশায় সেইগুলিকেই একমাত্র সম্বল মনে না করে আমরা যদি দেশের বাস্তব পরিস্থিতির দিকে চেয়ে দেখতে রাজি হই,—যদি বিশেষ করে আমরা লক্ষ্য করি দেশের পিছিয়ে-পড়া অঞ্চল ও সমাজের নিচুস্তরের মানুষগুলির দিকে,—তাহলে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাবো যে, বৈষ্ণব, সহজিয়া প্রভৃতি বিবিধ নামের আড়ালে ওই লোকায়তিক ধ্যানধারণাগুলি আজো আমাদের দেশে সত্যিই বেঁচে রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই আমাদের দেখালেন, লোকায়ত বলতে সংকীর্ণ অর্থে শুধুমাত্র মাধবাচার্য বর্ণিত অনুমান-বিরোধী বস্তুবাদী সম্প্রদায়টির কথা বুঝলে চলবে না। লোকায়ত-কে বুঝতে হবে অনেক ব্যাপক অর্থে। কেননা, এই লোকায়তিক চেতনারই আর একটি মৌলিক দিক হলো বামাচার বা কামাচার। পুরোনো পুঁথিপত্রেই এ-কথার নজির পাওয়া যায় ; সহজিয়া প্রভৃতি নামান্তরের আড়ালে ওই লোকায়তিক চেতনাই আজো আমাদের দেশে যে-ভাবে টিকে রয়েছে তাকে পরীক্ষা করলেও একই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে। অবশ্যই, আধুনিক রুচির দিক থেকে এই বামাচার সম্বন্ধে—এবং ব্যাপক অর্থে তান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলি সম্বন্ধে—আমাদের মনে স্বভাবতই তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব জাগে ; এগুলিকে বীভৎস কামবিকার ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। বস্তুত, তান্ত্রিক সাহিত্যের লিখিত পুঁথিপত্রগুলির মধ্যে বামাচারের যে-পরিচয় পাওয়া যায়

সেগুলি বিকৃত মনোভাবের অত্যন্ত প্রকট নিদর্শন। কিন্তু লোকায়তিক মতবাদকে ঠিকমতো বুঝতে হলে যেহেতু ওই বামাচারের কথা আলোচনা না-করলেই নয় সেইহেতু আমরা সে-বিষয়েও অনুসন্ধান শুরু করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এবং এই অনুসন্ধান আমাদের সামনে একটি বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশ করলো: উত্তরকালে বৈদিক ঐতিহ্য ও বামাচারী ঐতিহ্যের মধ্যে বিরোধ যতো প্রকটই হোক না কেন, ওই বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই এমন অনেক স্মারক টিকে রয়েছে যা বামাচারের নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এমন কথা সন্দেহ করা অস্বাভাবিক হয়নি যে, উত্তরকালে বামাচারী চেতনা আমাদের রুচির কাছে যতোই অর্থহীন ও বীভৎস মনে হোক না কেন, এমনটা হওয়া অসম্ভব নয় যে, মানব-অগ্রগতির কোনো এক প্রাকৃত পর্যায়ের পটভূমিতে এ-জাতীয় চেতনা স্বাভাবিকভাবেই স্ফূর্ত হয়েছিলো—বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকেরা সেই পর্যায়কে পেরিয়ে এসেছিলেন এবং অতএব এই বামাচারকে ঘৃণা করতে শিখেছিলেন; কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক না কেন দেশের পিছিয়ে-পড়ে থাকা মানুষগুলি আটকে থেকেছিলো সেই পর্যায়েরই কাছাকাছি। অর্থাৎ, উত্তরযুগে বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকরা যে-ধ্যানধারণাগুলিকে অমন ঘৃণার চোখে দেখতে চেয়েছিলেন সেগুলিকেই এককালে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা, অর্থাৎ বৈদিক ঐতিহ্যের প্রবর্তকেরা, মনে করেছিলেন সত্যগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ।

ফলে, লোকায়তিক ধ্যানধারণার আলোচনা-প্রসঙ্গেই আমরা মানুষের অগ্রগতি-পথের ওই প্রাকৃত পর্যায়টির কথা অনুসন্ধান করতে বাধ্য হলাম। প্রশ্ন উঠলো, ওই পর্যায়টির সংবাদ কেমন করে পাওয়া সম্ভব?

পুরো পৃথিবীর বুক-জুড়ে সব মানুষই সমান তালে এগিয়ে চলেনি। অথচ, এগিয়ে-চলার পথটা সব মানুষের পক্ষেই সমান। সে-পথে পরের পর কয়েকটি নির্দিষ্ট ও অনিবার্য পর্যায় আছে। তাই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আজো যে-সব মানবদল অগ্রগতি-পথের প্রাকৃত পর্যায়ে পড়ে আছে, তাদের অবস্থা পরীক্ষা করলে আজকের এগিয়ে-আসা মানুষদের ভুলে-যাওয়া অতীতটার কথাও অনুমান করবার সুযোগ থাকে। এবং এই অনুমানের ভিত্তিতেই প্রাচীন পুঁথিপত্রের কোনোকোনো অত্যন্ত দুর্বোধ্য উক্তিও বুঝতে পারা হয়তো অসম্ভব নয়; কেননা, এগুলি সেই আদিম পর্যায়ের চেতনার স্মারকচিহ্ন হতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের চিহ্নগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে ভয়ংকর ও অর্থহীন মনে হলেও আমাদের এই পদ্ধতির সাহায্যে সেগুলির আদি-তাৎপর্য অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতি অনুসারে অগ্রসর হয়েই আমরা ট্রাইব্যাল-সমাজের আলোচনায় গিয়ে পড়েছি। কেননা, মানুষের অগ্রগতির প্রাকৃত পর্যায়ের সমাজ-সংগঠন বলতে ওই ট্রাইব্যাল-সমাজের সংগঠনই। কিন্তু আজকের দিনে আমাদের পক্ষে এই ট্রাইব্যাল-সমাজের মূল লক্ষণটিকে সম্যকভাবে বুঝতে পারা সহজসাধ্য নয়। কেননা, আমাদের সমাজ-জীবনের সঙ্গে এর একেবারে গুণগত পার্থক্য আছে। আমরা বাস করি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, আমাদের চিন্তার কাঠামোটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ট্রাইব্যাল-সমাজের আদি ও অকৃত্রিম রূপটির মধ্যে শ্রেণীবিভাগের চিহ্ন ফুটে ওঠেনি; সে-সমাজের মানবজীবন একান্তভাবেই যৌথজীবন। তাই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নেই, শাসক-শাসিতে তফাত নেই, ব্যক্তিগত-সম্পত্তি নেই, আধুনিক এক-বিবাহমূলক নরনারী-সম্পর্ক বা পরিবার-জীবন নেই। ফলে, শ্রেণীসমাজ-লালিত আমাদের চিন্তা-চেতনার সাহায্যে আমরা ওই প্রাক্-বিভক্ত সমাজের বৈশিষ্ট্যকে সহজে উপলব্ধি করতে পারি না।

অবশ্যই, এই প্রাক্-বিভক্ত সমাজেরও একটা ইতিহাস আছে। ট্রাইব্যাল-সমাজের সমস্ত মানুষই এক-পর্যায়ে বাস করে না। জীবন ধারণের উপকরণগুলিকে সংগ্রহ ও উৎপাদন করবার দিক থেকে ট্রাইব্যাল-সমাজকেও বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়। ওই পর্যায়গুলির কোনোটির মধ্যেই বামাচারী, তথা লোকায়তিক চিন্তা-চেতনার উৎস। সেই পর্যায়টি ঠিক কী, এবং সে-পর্যায়ে কেন এই জাতীয় চিন্তাচেতনার জন্ম হয়েছিলো,—অর্থাৎ, এই ধ্যানধারণাগুলি সে-পর্যায়ে কোন ধরনের উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছে,—এই প্রশ্নটির আলোচনা এখনো বাকি আছে। কিন্তু সে-আলোচনা তোলবার আগে আর একটি প্রশ্ন ওঠে এবং উক্ত-প্রশ্নের মীমাংসা হিসেবেই আমরা ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ সংক্রান্ত প্রকল্প বা হাইপথেসিসের উল্লেখ করেছি—যদিও তা করতে গিয়ে আমাদের মূল যুক্তি থেকে অনেক দূর বিক্ষিপ্ত হতে হয়েছে।

প্রশ্নটা ঠিক কী?

ব্যাপক অর্থে আমরা যাকে তান্ত্রিক ধ্যানধারণা বলি আমাদের দেশে আজো তার প্রভাব অনেকাংশেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আজকের দিনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা অদ্বৈতবাদ নিয়ে যতোই উৎসাহ দেখান না কেন, তান্ত্রিক মতবাদের তুলনায় বৈদান্তিক মতবাদের প্রভাব ভারতীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে সত্যিই ব্যাপকতর বা গভীরতর কি না তা ভালো করে ভেবে দেখবার দরকার আছে[২৩৭]। আবার, আধুনিক পণ্ডিতমহলেই কখনো কখনো চোখে পড়ে তন্ত্রের সঙ্গে বেদান্তের সমন্বয় খোঁজবার চেষ্টা করা হয়েছে[২৩৮]। এই চেষ্টা অবশ্যই কৃত্রিম। কেন কৃত্রিম,—সে আলোচনা পরে তোলা হবে। আপাতত

আমাদের বক্তব্য হলো, বিশেষ করে দেশের পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলগুলিতে এবং সমাজের নিচুস্তরের মানুষদের মধ্যে নানান সম্প্রদায় হিসেবে নানা রকম নামের অন্তরালে ওই তান্ত্রিক ধ্যানধারণারই বিকাশ চোখে পড়ে এবং সেগুলিকে পরীক্ষা করলে বোঝা যায় আমাদের দেশে এ-জাতীয় ধ্যানধারণার প্রভাব আজো কতো ব্যাপক ও গভীর।

কিন্তু এইখানে একটা সমস্যা ওঠে। কেননা, মানুষের চিন্তা-চেতনা স্বয়ম্ভু নয়, স্বাবলম্বী নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তার উৎসে আছে মানুষের মূর্ত সমাজ-জীবন। এই কারণেই মানুষের ধ্যানধারণাকে খিলানের সঙ্গে তুলনা করা হয়, সে-খিলানের ভিত্তি-স্তম্ভ বলতে বাস্তব সমাজ-জীবন।

তাই প্রশ্ন ওঠে, প্রাচীন সমাজ যদি দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সে-সমাজেরই কোনো এক পর্যায়-প্রসূত চিন্তাচেতনার প্রভাব আজো এদেশে এতো ব্যাপক ও গভীরভাবে কী করে টিকে থাকতে পারলো? প্রশ্নটা বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে,—আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো,—আলোচ্য ধ্যানধারণার আদিরূপটি শুধুমাত্র আমাদের দেশের চেতনাতেই প্রতিভাত হয়নি; অন্যান্য দেশের মানুষেরাও ক্রমোন্নতির কোনো এক পর্যায়ে মূলত এই রকম ধ্যানধারণাকেই সত্য বলে মনে করেছিলো। তার কারণ, অন্যান্য দেশের মানুষেরাও একটা সময়ে প্রাচীন-সমাজের ওই একই পর্যায়ে জীবন-যাপন করেছে।

কিন্তু উত্তরযুগে তাদের চেতনা থেকে উক্ত ধ্যানধারণার প্রভাব মুছে গিয়েছে। কেননা, তারা ট্রাইব্যাল-সমাজকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে, তাদের মূর্ত সমাজ-জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়েছে ট্রাইব্যাল-সমাজের চিহ্ন।

আমাদের দেশে যদি দেখা যায় ট্রাইব্যাল-সমাজ প্রসূত ওই ধ্যানধারণা-গুলির প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি তাহলে সন্দেহ করবার অবকাশ থাকে যে, আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থারও একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ট্রাইব্যাল-সংগঠনের প্রকৃতি এদেশ থেকে মাত্র অসম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে।

তাই আমরা ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ সংক্রান্ত ওই প্রকল্পটির আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এবং এই প্রকল্প যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয় তা দেখাবার আশাতেই আমরা গ্রাম-সমবায় ও জাতিভেদ-প্রথার বহিঃরেখা নিয়ে কিছুটা আলোচনা তুলতে বাধ্য হলাম। সে-কারণে আমাদের আলোচনা অবশ্যই অনেকখানি বিক্ষিপ্ত হলো; কিন্তু আমাদের মূল যুক্তির দিক থেকে তার প্রয়োজন ছিলো। কেননা, সাবেকী ভারতবর্ষের সমাজ-সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্য বলতে ওই গ্রাম-সমবায় ও জাতিভেদ-প্রথাই।

এই দুটি বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়েই আমাদের চোখে পড়েছে,

উৎপাদন-কৌশলের উন্নতির দরুন স্বাভাবিকভাবে ট্রাইব্যাল-সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে ওঠবার বদলে, বাইরের আক্রমণে ট্রাইব্যাল-সমাজের গণবন্ধন ভেঙে ও স্বাধীনতা অপহরণ করে, কৃত্রিমভাবে সেই সমাজের মানুষগুলিকে নিয়েই ছোটোছোটো স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমবায় প্রতিষ্ঠা করবার ফলে, একদিকে যেমন আমাদের দেশে উত্তরকালেও ট্রাইব্যাল-সমাজের ভগ্নাবশেষ বহুল পরিমাণেই টিকে থেকেছে, আবার অপর দিকে তেমনিই এই চিহ্নগুলির আদি-তাৎপর্য ট্রাইব্যাল-সমাজের মূল প্রাণশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পর্যবসিত হয়েছে নিজেদের বিপরীতে: ট্রাইব্যাল-সমাজের পটভূমিতে যা ছিলো বাঁচবার সহায়, ট্রাইব্যাল-সমাজ থেকে উৎপাটিত হয়ে নতুন পরিবেশে স্থানান্তরিত হবার পর, ট্রাইব্যাল-সমাজের প্রাণশক্তি দ্বারা সেগুলি আর লালিত হতে পারেনি। ফলে, সেগুলির আদিতাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসিত হলো! যা ছিলো উদ্দেশ্যমূলক,—জীবনের সহায়,—নতুন পরিস্থিতিতে তাই হয়ে দাঁড়ালো উদ্দেশ্য-বিরুদ্ধ বিকৃতি,—জীবনের পরিপন্থী।

ধ্যানধারণাগুলিকে খিলানের সঙ্গে তুলনা করা হয়—যে-খিলানের ভিত্তিস্তম্ভ হলো সমাজ-বাস্তব।

অতএব, ভিত্তিস্তম্ভের বেলায় যে-কথা, খিলানের বেলাতেও তাই। অর্থাৎ, ধ্যানধারণার ক্ষেত্রেও ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপের একই পরিণাম দেখতে পাওয়া যায়। ট্রাইব্যাল-সমাজের যে-পর্যায়ে ওই বামাচারী চেতনার উৎস সেই পর্যায়ের পটভূমিতে এগুলিকে উদ্দেশ্যহীন কামবিকার বা ব্যভিচার-মাত্র মনে করবার কারণ নেই। বস্তুত, আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো, সমাজ-বিকাশের সে-পর্যায়ে এগুলি ছিলো জীবন সংগ্রামের সহায়। অথচ, সমাজ-জীবনের সেই পর্যায় থেকে উৎপাটিত হয়ে নতুন পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে গিয়ে এগুলিই হয়ে দাঁড়ালো অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, বিকৃত, বীভৎসতামাত্র। সেই বীভৎসতারই পরিচয় পাওয়া যায় তান্ত্রিক সম্প্রদায়-গুলির লিখিত দলিলে, অর্থাৎ তন্ত্রসাহিত্যে। তান্ত্রিক পুঁথিগুলি সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব যে কী রকম তার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি, এবং এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত মনোভাব অকারণ বা অনর্থক নয়। তবু এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে যে, তন্ত্রসাহিত্যে,—অর্থাৎ, তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের লিখিত অভিব্যক্তির মধ্যে,—ওই ধ্যানধারণাগুলির আদি-তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় কি না। আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, তা পাওয়া যায় না। কিন্তু তার আগে আমাদের যুক্তির দিক থেকে সাধারণভাবে এ-কথা দেখানো দরকার, ট্রাইব্যাল-সমাজের বিলোপ অসম্পূর্ণ হবার দরুন আমাদের দেশের ইতিহাসে ধ্যানধারণার ক্ষেত্রেও ট্রাইব্যাল-সমাজের স্পষ্ট স্মারক টিকে থেকেছে।

প্রধানত দুটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করবো : ১) দেশের আইনকানুনের কথা, ২) ব্রতকথা।

সাবেকী ভারতবর্ষের আইনকানুন বলতে সমাজের সদরমহলে যদিও প্রধানত স্মৃতি-শাস্ত্রগুলিরই উল্লেখ করবার প্রথা ছিলো তবুও ইংরেজ-শাসকেরা এসে দেখলো, দেশের বিশেষ করে পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলগুলিতে আইনকানুন বলতে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। এ-বিষয়ে স্যর হেনরি মেইন্-এর[২০৯] মন্তব্য উল্লেখ করাই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলছেন, স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে দেশের আইনকানুন হিসেবে যেটুকুর পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই দেশের বাস্তব আইনকানুনগুলির মিল নেই। কেননা, বাস্তবভাবে দেখা যায় একজাতীয় অলিখিত আইনেরই ব্যাপকতম প্রসার। এই অলিখিত আইনকানুনগুলি প্রকৃতপক্ষে লোকাচার-মূলক। তাই, ভারতবর্ষে আইনের দুটি সুস্পষ্ট ধারা রয়েছে : এক, স্মৃতিমূলক আইন, বা *codified laws*; দুই, লোকাচারমূলক আইন, বা *customary laws*। আমাদের যুক্তি অনুসারে দেশের আইনের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় ধারাটির মধ্যে ট্রাইব্যাল-সমাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়, এবং অতএব এর ব্যাখ্যা হিসেবে ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ সংক্রান্ত আমাদের প্রকল্পটিকেই মানা দরকার : ট্রাইব্যাল-সমাজের স্মারক এই লোকাচারমূলক আইনগুলির প্রভাব ব্যাপক এবং গভীরভাবে দেশে টিকে থেকেছে, তার কারণ এ-দেশে ট্রাইব্যাল-সমাজের বিলোপ পরিপূর্ণ হয়নি। দেশের আইনকানুন এবং দেশের দার্শনিক ধ্যানধারণা—দুই-ই সমপর্যায়ের। তাই, যে-কারণে আমাদের দেশে ওই লোকায়তিক ও তান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রভাব আজো এতো প্রবল সেই কারণেই আইনের ক্ষেত্রেও লোকাচারমূলক বিধিব্যবস্থাগুলি অত্যন্ত সাম্প্রতিক যুগেও দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়নি।

প্রথমে দেখা যাক, স্মৃতিমূলক ও লোকাচার-মূলক আইনের তফাতটা কী রকম। স্যর হেনরি মেইন[২১০] বলছেন :

> The whole of the codified law of the country—that is, the law contained in the codes of Manu, and in the treatises of the various schools of commentators who have written on that Code and greatly extended it—is theoretically connected together by certain ideas definite of a sacerdotal nature. But the most recent observation goes to prove that the portion of the law codified and the influence of this law are

much less than was once supposed, and that large bodies of indigenous customs have grown up independently of the codified law. But on comparing the written and the unwritten law, it appears clearly that the sacerdotal motives which permeate the first have invaded it from without, and are of Brahminical origin.

দেশের লিখিত আইনের (codified laws = স্মৃতিমূলক আইনের) সবটুকুই,—অর্থাৎ মনুস্মৃতি এবং তার উপর টীকারচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায় এই স্মৃতিকে যে-ভাবে ব্যাপকতর করেছে সেগুলি—পৌরোহিত্যমূলক কয়েকটি ধারণার দ্বারা একত্র গ্রথিত। কিন্তু অতি আধুনিক পরিদর্শনের ফলে দেখা গিয়েছে, এককালে এই আইনগুলির প্রভাব যতোখানি মনে হয়েছিলো আসলে এগুলির প্রভাব তার চেয়ে ঢের কম এবং এই স্মৃতিমূলক আইন-নিরপেক্ষভাবেই বিস্তর স্থানীয় লোকাচারের উদ্ভব হয়েছে। এই লিখিত ও অলিখিত আইনগুলির তুলনা করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পৌরোহিত্য-অভিপ্রায় প্রণোদিত স্মৃতিমূলক আইনগুলির মূল প্রেরণা বাইরে থেকে এসেছে এবং ব্রাহ্মণ্যমূলক সেগুলির উৎস।

কিংবা[২১১]

Complete and consistent in appearance as is the codified law of India, the law enunciated by Manu and the Brahminical commentators on him, it embraces a far smaller portion of the whole law of India than was once supposed, and penetrates far less deeply among the people. What an Oriental is really attached to, is his local custom.

যদিও স্মৃতিমূলক (লিখিত) আইনগুলিকে—অর্থাৎ মনু ও তাঁর টীকাকারদের লেখা আইনগুলিকে—আপাত দৃষ্টিতে সুসম্পূর্ণ ও সামঞ্জস্যময় মনে হয় তবুও এককালে এগুলিকে ভারতবর্ষীয় আইনকানুনের যতো বড়ো অংশ মনে করা হয়েছিলো এগুলি আসলে ভারতবর্ষীয় আইনের তার চেয়ে ঢের ছোটো অংশ এবং জনসাধারণের মধ্যে এগুলির প্রভাব অনেক অগভীর। প্রাচ্যদেশবাসীর আসল আকর্ষণটা তার স্থানীয় লোকাচারের প্রতিই।

কিংবা[২১২]

...the more exclusively an Anglo-Indian functionary has been employed in 'revenue' administration, and the further removed from great cities has been the scene of his labours, the greater is his hesitation in admitting that the law assumed

to begin with Manu is, or ever has been, of universal application.

…ফিরিঙ্গি চাকুরে যতোই একান্তভাবে খাজনা-সংক্রান্ত শাসনকাজে লিপ্ত হয়েছে এবং তার কর্ম্মস্থল বড়ো বড়ো শহর থেকে যতোই দূরে হয়েছে ততোই এ-কথা স্বীকার করতে তার দ্বিধা হয়েছে যে, যে-আইনগুলিকে মনু-লিখিত বলা হয় সেগুলির প্রয়োগ একালে, বা এমন কি কোনো কালেই, সার্বভৌম ছিলো।

আমরা আগেই বলেছি, যে-কারণেই হোক আমাদের দেশের রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কেরা ব্রাহ্মণ্য-ঐতিহ্যের গরিমা খুঁজেছিলেন। এবং স্যর হেন্‌রি মেইন্ যে-আইনকানুনকে পৌরোহিত্য-অভিপ্রায়-প্রণোদিত বলে উল্লেখ করছেন,—অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র বা দেশের লিখিত আইনকানুন,—সেগুলি এই রাষ্ট্রশক্তির মুখপাত্রদেরই রচনা। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কদের সঙ্গে দেশের সাধারণ-মানুষদের যোগসূত্র ছিলো নেহাতই ক্ষীণ : গ্রাম-সমবায়গুলিতে উৎপাদিত মোট দ্রব্যের একটি অংশমাত্রকে রাজস্ব হিসেবে কেড়ে নিতে পেরেই রাজারাজড়ারা খুশি ছিলেন,—এই গ্রাম-সমবায়গুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিলো না বললেই হয়। এবং গ্রাম-সমবায়গুলির মানুষেরাও ছিলো রাজারাজড়াদের ব্যাপারে একান্ত উদাসীন। মেগাস্থিনিসের বর্ণনায়[২১৩] দেখা যায়, আশপাশে রাজায়-রাজায় যখন ঘোর যুদ্ধ চলছে তখনো গ্রামবাসীরা সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবেই নিজেদের গ্রাম্যজীবন যাপন করছে। হেগেল এবং মার্ক্‌স্‌ও বলছেন, এ-দেশের কৃষকদের জীবনের সঙ্গে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কোনো সম্পর্ক ছিলো না[২১৪]।

তাই রাষ্ট্রশক্তির মুখপাত্ররা স্মৃতিশাস্ত্র নামে যে-আইনকানুন প্রবর্তন করেছিলেন তার সঙ্গে জনসাধারণের জীবনে বাস্তবভাবে প্রযোজ্য আইনকানুনের বিশেষ কোনো সম্পর্ক থাকাই অস্বাভাবিক। ফলে সাবেকী ভারতবর্ষে আইনকানুনের ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র ধারা দেখতে পাওয়া যায়, এই দুটিকেই বলা হয় স্মৃতিমূলক এবং লোকাচারমূলক আইন।

প্রশ্ন ওঠে, লোকন্যায়মূল ওই আইনগুলির জন্মাদি রহস্য নিয়ে। এগুলি এলো কোথা থেকে? এগুলির প্রভাব এমন গভীর হয়ে থাকলো কী করে? স্যর হেন্‌রি মেইন[২১৫] বলছেন :

The great instrumentality through which this body of customary law is preserved is the perpetual discussion by the people ; and that it could be so preserved is accounted for by the fact that the social constitution of India is extreme ancient.

অর্থাৎ, যে-ব্যবস্থার সাহায্যে লোকন্যায়মূলক এই আইনগুলি টিকে থেকেছে তা হলো জনসাধারণের মধ্যে অবিরাম আলোচনা এবং এগুলি যে ওইভাবে টিকে থাকতে পারলো তার কারণ হলো ভারতবর্ষের সামাজিক সংগঠনটা অত্যন্ত প্রাচীন।

কিন্তু, প্রশ্ন হলো, 'ভারতবর্ষীয় সমাজ-সংগঠন অত্যন্ত প্রাচীন'—এ-কথা বলতে ঠিক কী বোঝায়? স্যর হেন্‌রি মেইন কি বলতে চাইছেন, ভারতবর্ষে সমাজসংগঠনের কোনো প্রাচীন পর্যায় উত্তর যুগেও টিকে থেকেছিলো, সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি? যদি তাই হয় তাহলে তাঁর মন্তব্যটিও ট্রাইব্যাল সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ সংক্রান্ত আমাদের প্রকল্পের সঙ্গে অভিন্ন হবে। এবং আমাদের ধারণায়, মেইন যদিও এখানে সোজাসুজি 'ট্রাইব্যাল' শব্দটি ব্যবহার করছেন না তবুও তাঁর মূল বক্তব্যটি ওই ট্রাইব্যাল সমাজ সংগঠনেরই ইংগিত দেয়। এখানে তাঁর রচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে সে-কথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলে আমাদের আলোচনা ভারাক্রান্ত হবে; তাই সে-চেষ্টা পাদটীকায়[২১৩] করাই ভালো।

তাহলে, ট্রাইব্যাল-সমাজের ওই অসম্পূর্ণ-বিলোপের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাচ্ছে সাবেক ভারবর্ষের আইনকানুন সংক্রান্ত দুটি স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে। একদিকে, রাষ্ট্রশক্তির যে-অধিনায়কেরা বাইরে থেকে আক্রমণ করে গণসমাজকে ধ্বংস করেছিলো এবং ওই গণসমাজের মানুষগুলিকে নিয়েই ছোটোছোটো স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমবায় গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলো,—তাদেরই মুখপাত্র আইনকর্তাদের আইনকানুন। কিন্তু গ্রামসমবায়গুলির সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ ছিলো বলেই এই সব আইনকানুন দেশের জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হতে পারেনি। অপরপক্ষে, গ্রামসমবায়গুলির মধ্যে উৎপাদন পদ্ধতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়নি, তাই পরিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি ওই গ্রামসমবায়গুলির মধ্যে থেকে ট্রাইব্যাল-সমাজের চিহ্ন। ফলে, আইনকানুন বলতে এই-গ্রামসমবায়গুলির মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ধারা প্রবর্তিত ছিলো এবং এই ধারাটিতে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে ট্রাইব্যাল সমাজের শাসন ব্যবস্থারই ধ্বংসাবশেষ। স্যর মেইন[২১১] বলছেন, বিলেতের চাষীদের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষদের জীবনে মৌলিক তফাত আছে:

But the smaller organic groups of Indian society are very differently situated. They are constantly dwelling on tradition of a certain sort, they are so constituted that one man's interests and impressions correct those of another, and some of them have in their council of elders a permanent machinery

for declaring traditional usage, and solving doubtful points.

অর্থাৎ, ভারতীয় সমাজের ছোটোছোটো অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্কে-আবদ্ধ গোষ্ঠীগুলির বেলায় একেবারে অন্য রকম। এগুলি সর্বদাই কোনো-না-কোনো ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করছে, এগুলির সংগঠন এমনই যে, একজনের স্বার্থ ও ধারণা অপরজনের স্বার্থ ও ধারণা দ্বারা সংশোধিত হয়, এবং বহু ক্ষেত্রে মাতব্বরদের পঞ্চায়েৎ বলে একটি ব্যবস্থার সাহায্যে নির্ণয় করবার প্রথা আছে, কোনটা সাবেক কালের আসল ঐতিহ্য এবং সংশয়ের ক্ষেত্রে কী বিধান হবে।

এরই দরুন ভারতবর্ষে লোকাচার-মূলক আইনকানুনের প্রভাব অতো প্রবল এবং এই ব্যবস্থাটির মধ্যে ট্রাইব্যাল-সমাজের চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট।

স্মৃতিমূলক আইনকানুন এবং লোকাচার-মূলক আইনকানুন—স্যার হেনরি মেইন-এর পরিভাষায় *codified laws* এবং *customary laws*—এই দুয়ের মধ্যে স্মৃতিমূলক আইনকানুনগুলি নিশ্চয়ই চূড়ান্তভাবে কৃত্রিম এবং অর্থহীন হবার কথা। কেননা, জনসাধারণের বাস্তব জীবনের সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক প্রায় শূন্য বললেই হয়। স্যর হেনরি মেইনও[২১৮] সেই কথা বলছেন, এবং স্মৃতিমূলক আইনকানুনগুলি যে কী অসম্ভব রকমের কৃত্রিম হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তার নমুনা হিসেবে তিনি দেখাচ্ছেন এই আইন অনুসারে মানুষ সারা জীবন ধরে অর্থোপায়ের চেষ্টা করবে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর (শ্রাদ্ধের) খরচ যোগাবার জন্যেই! এই রকমের আরো কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তিনি দিচ্ছেন। এবং এর তুলনায় নিশ্চয়ই লোকাচারমূলক আইনকানুনগুলির আভ্যন্তরীণ প্রাণশক্তি একেবারে সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়নি। তার দৃষ্টান্ত হিসেবে স্যর হেনরি মেইন[২১৯] দেখাচ্ছেন, সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার ইত্যাদি নানা ব্যাপারে এই লোকাচার-মূলক আইনগুলির মধ্যে কিছুটা বেশি পরিমাণ সহজবুদ্ধির পরিচয় (*'a greater dose of commonsense'*) পাওয়া যায়।

কিন্তু সেইসঙ্গেই মনে রাখতে হবে, ট্রাইব্যাল-সমাজের প্রাণশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন পরিবেশের মধ্যে গ্রথিত হবার পর একান্তভাবে অতীত-আশ্রয়ী এই লোকাচার-মূলক আইনকানুনগুলি মানুষের জীবনে এক অদ্ভুত বোঝার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এগুলি মানুষকে ভবিষ্যৎ দেখতে দেয়নি, বেঁধে রাখতে চেয়েছে 'হাজার বছরের পুরোনো অচল খোঁটায়'। ট্রাইব্যাল-সমাজের পটভূমিতে যে-পঞ্চায়েৎশাসন দলের সব মানুষকেই স্বাধীনতার ও সাম্যের মর্যাদা দিয়েছিলো, গ্রাম সমবায়গুলির মধ্যে টিকে থাকতে গিয়ে সেই পঞ্চায়েৎ-শাসনই মানুষকে করে তুলেছিলো প্রাচীন প্রথার ক্রীতদাস। মার্ক্‌স্ তাই বলেছেন, এই গ্রাম-সমবায়গুলি মানবমনকে আবদ্ধ রেখেছিলো সংকীর্ণতম

পরিধির মধ্যে, করে তুলেছিলো কুসংস্কারের সামনে প্রতিরোধহীন যন্ত্রের মতো, সাবেক নিয়মকানুনের ক্রীতদাস-বিশেষ। এবং স্মৃতিমূলক আইনের তুলনায় ওই লোকাচার-মূলক আইনগুলির মধ্যে আপেক্ষিকভাবে সাধারণ বুদ্ধির পরিচয় বেশি দেখতে পেলেও স্যর হেনরি মেইন্[২৮০] এ-কথা বলতে ভুলছেন না যে,

> Such individual in India is a slave to the customs of the group to which he belongs ; and the customs of the several groups, various as they are, do not differ from one another with that practically infinite variety of difference which is found in the habits and practices of the individual men and women who make up the modern societies of the civilized West.

> অর্থাৎ, ভারতবর্ষে ব্যক্তিবিশেষ হলো নিজের গোষ্ঠীর লোকাচারের দাস ; এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকাচারের মধ্যে যদিও বৈশিষ্ট্য আছে তবুও পশ্চিম দেশের আধুনিক সভ্য সমাজে নরনারীর অভ্যাস ও আচার ব্যবহারের মধ্যে যে-রকম প্রায় অসীম বৈচিত্র্য দেখা যায়, (এই গোষ্ঠীগুলির ব্যাপারে) তা নেই।

ট্রাইব্যাল-সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি ট্রাইব্যাল-সমাজের পটভূমি থেকে উৎপাটিত হয়ে নতুন পরিবেশে স্থানান্তরিত হবার পর সেগুলির আদি-তাৎপর্য কী ভাবে বিপরীতে পর্যবসিত হয়, এই লোকাচার-মূলক আইনগুলি তারও দৃষ্টান্ত : ট্রাইব্যাল-সমাজের পটভূমিতেও ব্যক্তিবিশেষের স্বাতন্ত্র্য নেই, একের সঙ্গে দশের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। এবং ট্রাইব্যাল-সমাজের পটভূমিতে এই সম্পর্কের দরুনই মানুষগুলির মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্বাভাবিক বিকাশ। অথচ গ্রামসমবায়গুলির মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যের ধ্বংসাবশেষই মানুষগুলিকে করে তুললো দাসের সামিল—অনড়, অচল কয়েকটি প্রাচীন প্রথার ক্রীতদাস।

আমাদের যুক্তি হলো, একদিক থেকে আইনকানুন এবং দর্শন, উভয়ই সমগোত্রীয়। উভয়কেই *superstructure*-এর বা খিলানের সঙ্গে তুলনা করা হয়, এবং উভয়েরই ভিত্তি হলো মানুষের বাস্তব-জীবনধারণ প্রণালী। তাই, লোকাচার-মূলক আইনকানুন, এবং ব্যাপক অর্থে, লোকায়তিক ধ্যানধারণা—উভয়ের স্বরূপই এক ধরনের হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, এগুলিও ট্রাইব্যাল-পর্যায়েরই স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে, যদিও কিনা ট্রাইব্যাল-সমাজ থেকে উৎপাটিত হয়ে নতুন পরিস্থিতিতে এসে পড়বার পর এগুলির আদি-তাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসিত হতে বাধ্য হয়েছে। তাই,

এ-জাতীয় ধ্যানধারণা আজো আমাদের দেশে কী করে এমন ব্যাপকভাবে টিকে থাকলো, সে-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ সংক্রান্ত প্রকল্পটির দিক থেকেই।

ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ সংক্রান্ত আমাদের ওই প্রকল্পটির পক্ষে আরো একটি আনুষঙ্গিক নজির হলো, আমাদের দেশের ব্রতগুলি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২৮১] বলছেন, যোষিৎ-প্রচলিত বা মেয়েলি ব্রতগুলি পুরাণের চেয়ে পুরোনো এবং এগুলি যে আজো আমাদের দেশে টিকে রয়েছে তার কারণ, আমাদের দেশের সদর-মহলের চেহারায় যাই পরিবর্তন হোক না কেন, অন্দরমহলের চেহারায় তেমন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এ-কথার তাৎপর্য ঠিক কী? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২৮২] যখন এই ব্রতগুলির তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে আমেরিকার হুইচল জাতি বা মেক্সিকোর অনার্য জাতিদের আচার-আচরণ থেকে মূলসূত্র অনুসন্ধান করেন তখন আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, 'পুরাণের চেয়ে পুরোনো' কথার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য হলো সমাজবিকাশের কোনো এক পুরোনো পর্যায়—আমেরিকার হুইচল বা মেক্সিকোর অনার্যরা আজো যে-পর্যায়ে আটকে থেকেছে। আর তাই, আমাদের অন্দরমহলটা এখনো তেমন বদলায়নি—এ-কথার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য হবে, সমাজবিকাশের সে-পর্যায়ের চিহ্ন আমাদের দেশ থেকে পরিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। অর্থাৎ, ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ-বিলোপ সংক্রান্ত আমাদের ওই প্রকল্পই। অবশ্যই, ট্রাইব্যাল-সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে পারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ব্রতগুলির আদি-তাৎপর্য উদ্ধারের চেষ্টা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সচেতনভাবে নিশ্চয়ই করেননি। তাই ব্রত সম্বন্ধে তাঁর মূল ইঙ্গিতগুলি দুর্মূল্য হলেও এ-বিষয়ে ভবিষ্যৎ-গবেষকদের পক্ষে গবেষণা করবার প্রচুর অবকাশ থেকে গিয়েছে। অর্থাৎ, ট্রাইব্যাল-সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে পারা বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হলে ব্রতগুলির উপর স্পষ্টতর আলোকপাত হবার সম্ভাবনা আছে। আমরা আগেই[২৮৩] আলোচনা করেছি, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ-বিষয়ে একটি মূল্যবান ইঙ্গিতকে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করেছেন। তিনি বলছেন, ব্রতের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এ-জাতের আচরণ একা-একা করা যায় না—ব্রত তখনই, যখন দশে মিলে এক হয়ে একই কামনা করছে, একই আচরণে অংশ গ্রহণ করছে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য ঠিক কেন? অবনীন্দ্রনাথ বললেন, সে-আলোচনা স্বতন্ত্র—সে আলোচনা তাঁর নয়। কিন্তু তাঁরই স্বীকৃতি অনুসারে যদি এই বিষয়টি ব্রতের

একটি মূল লক্ষণ হয়ে থাকে তাহলে একে অগ্রাহ্য করে ব্রতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কী করে? আমরা দেখেছি, সমাজ-বিকাশের প্রাচীন পর্যায়ের দিক থেকে এই লক্ষণটি দুর্বোধ্য নয়। বরং, কল্পনায় কামনা-চরিতার্থ করে বাস্তবভাবে কামনা সফল করা,—প্রকৃতিকে জয় করা,—ততোদিনই সম্ভব যতোদিন পর্যন্ত দশের সঙ্গে একের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিলুপ্ত না হয়। এদিক থেকে ব্রতগুলিরও একটা আদি-তাৎপর্য নিশ্চয়ই ছিলো। সমাজ-বিকাশের পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে ব্রতগুলি মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। কিন্তু সে-পর্যায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই ব্রতগুলিই আজ যে-ভাবে আমাদের দেশে বেঁচে আছে তা বিচার করে শিল্পের উৎপত্তি প্রভৃতি সমস্যার উপর যতো মূল্যবান আলোকপাতই সম্ভব হোক না কেন, বাস্তব আচার-অনুষ্ঠান হিসেবে—বাস্তব বিশ্বাস হিসেবে—এগুলি আজ দেশবাসীর জীবনে অন্ধ ও অর্থহীন কুসংস্কারের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আয়ুধজীবী গণ ও বার্তাশস্ত্রোপজীবী গণ

ব্যাপক অর্থে যে-ধ্যানধারণাগুলিকে আমরা লোকায়তিক ও তান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে থাকি সেগুলির বেলাতেও একই কথা। গ্রাম-সমবায়, জাতপ্রথা, লোকাচার-মূলক আইনকানুন আর ব্রতের বেলায় যে-রকম,—সেই রকমই। বস্তুত, ওই তান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলির উৎস ও আদিতাৎপর্য অনুসন্ধান করবার উদ্দেশ্যে এগিয়েই আমরা এই অন্যান্য বিষয়গুলির আলোচনায় বিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম; কেননা, যে-মূল প্রকল্পের উপর নির্ভর করে আমরা এই তান্ত্রিক ধ্যানধারণা-গুলিকে চেনবার চেষ্টা করছি সেইটির ব্যাখ্যা এবং সেটির পক্ষে আনুষঙ্গিক নজির দেখাবার তাগিদ ছিলো।

আমরা বলেছি, ট্রাইব্যাল সমাজেরই কোনো এক পর্যায়ের মধ্যে এই তান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলির উৎস আবিষ্কার করবার সম্ভাবনা আছে।

অতএব আমরা আমাদের পদ্ধতি অনুসারে প্রথম প্রশ্ন তুলবো: ট্রাইব্যাল-সমাজের পর্যায়-ভেদ সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে পারা তথ্য বলতে ঠিক কী বোঝায়? বর্তমান পৃথিবীর নানা জায়গায় এখনো যে-সব ট্রাইব টিকে রয়েছে সেগুলির বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে এ-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে।

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[২৮৪] দেখাচ্ছেন, খাদ্য আহরণ ও খাদ্য-উৎপাদনের সবচেয়ে মৌলিক ব্যবস্থার দিক থেকে আজকের পৃথিবীর ট্রাইবগুলিকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে ভাগ করা যায় :

(১) : শিকার-জীবী। দুটি স্তর।

নিম্নস্তরের শিকার-জীবীরা ফলমূল আহরণ করে এবং পশু শিকার করে নিজেদের খাদ্যসরবরাহের ব্যবস্থা করে। উচ্চ-স্তরের শিকার-জীবীরা পশু শিকার ছাড়াও মাছ ধরতে শিখেছে। নিচুস্তরে শিকারের অস্ত্র বলতে বর্শা, উঁচুস্তরে বর্শা ছাড়াও তীর-ধনুক। তাছাড়া, এই উঁচুস্তরটিতে হাঁড়িকুড়ি তৈরি, কাপড় বোনা ও পশুকে পোষ-মানাবার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) : পশুপালন-জীবী। দুটি স্তর।

দ্বিতীয় স্তরটিতে পশুপালন ছাড়াও কিছুকিছু চাষবাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) : কৃষিজীবী। তিনটি স্তর।

তৃতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো, কোদাল দিয়ে ছোটো জমিতে চাষ করবার চেষ্টা ছাড়িয়ে রীতিমতো বড়ো ক্ষেতে লাঙল দেবার ব্যবস্থা এবং চাষবাসের সঙ্গে পশুপালনও।

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[২৮৫] দেখাচ্ছেন, পশুপালনের উচ্চ স্তর এবং কৃষির তৃতীয় স্তর থেকে কারিগরি, স্থায়ী আবাস-স্থাপন এবং ধাতুর কাজ বহুলভাবে বাড়তে থাকে এবং ফলে এই দুটি স্তর থেকেই দেখা যায়, অকৃত্রিম ট্রাইব্যাল-সংগঠনে ভাঙন ধরছে।

মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর সব-মানুষই যে আগে পশুপালনজীবী ও তারপর কৃষিজীবী হয়েছে তা নয়। মানবজাতির সব-শাখাই অবশ্য শুরু করেছে শিকারজীবী হিসেবে; তারপর কোনো শাখা এগিয়েছে পশুপালনের দিকে আবার অপর-কোনো শাখা কৃষিকাজের দিকে। এই রকম তফাত কেন? প্রধানতই প্রাকৃতিক পরিবেশের দরুন : পশুবহুল পরিবেশের মানুষেরা স্বভাবতই পশুপালনের দিকে এগিয়েছে, স্বভাব-উর্বর বুনো শস্যবহুল পরিবেশের মানুষেরা এগিয়েছে কৃষিকাজের দিকে[২৮৬]।

ট্রাইব্যাল সমাজে ভাঙন ধরবার পর? শ্রেণীসমাজ। রাষ্ট্রব্যবস্থা।

সভ্যমানুষদের প্রাগৈতিহাসিক অতীত প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে মর্গান-কৃত পর্যায়-বিভাগের উল্লেখ করেছি। তাঁর পরিভাষায়, বর্বর-দশার মধ্য স্তরের পর থেকেই অকৃত্রিম ট্রাইব্যাল সংগঠনে ভাঙন শুরু হয়—শুরু হয় শ্রেণীবিভাগের সূচনা। কেন হলো? তার কারণ, কোথাও বা পশুপালনের উন্নতি এবং কোথাও বা কৃষিকাজের উন্নতি। পশুপালনের উন্নতির ফলেই কী

ভাবে নতুন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সূচনা হয় তার দৃষ্টান্ত হিসেবে এঙ্গেল্‌স্[২৮৭] আর্যজাতির কথা উল্লেখ করছেন। এঙ্গেল্‌স্-এর সময়ে সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়নি। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা[২৮৮] বলছেন, প্রাচীন মিশরের মতোই এই সিন্ধুসভ্যতার ঐশ্বর্যের ভিত্তি ছিলো কৃষির উন্নতি।

তাহলে, ভারতবর্ষের ইতিহাসেই আদিম-সমাজে ভাঙন ধরবার দুটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায় : এক, বৈদিক মানুষদের জীবনে পশুপালনের উন্নতি ট্রাইব্যাল-সমাজে ভাঙন নিয়ে এলো। দুই, হরপ্পা-মহেনজোদারোর মানুষদের জীবনে কৃষির উন্নতি নগর সভ্যতা ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করলো।

অধ্যাপক গর্ডন-চাইল্ড-ও[২৮৯] বৈদিক সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ তথ্য পর্যালোচনা করে যে-সিদ্ধান্তে আসছেন সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে মানতে হবে, যারা বৈদিক সাহিত্য রচনা করেছিলো, তারা পশুপালনের দ্বিতীয় পর্যায়টিতেই জীবন ধারণ করতো। এই পর্যায়টি হলো প্রাক্-বিভক্ত সমাজ এবং শ্রেণী-সমাজের সীমারেখা—একদিকে আদিম ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, আর একদিকে জন্ম হচ্ছে নতুন শ্রেণীসমাজের। এর পরও বৈদিক মানুষদের জীবনে ট্রাইব্যাল-সমাজের যে-সব চিহ্ন পড়ে থেকেছে সেগুলি ফাঁপা কাঠামোর মতো।

সংক্ষেপে : ট্রাইব্যাল-সমাজ ছেড়ে শ্রেণী সমাজের দিকে অগ্রসর হবার দুটি পথ। এই দুটি পথকে পশুপালনের পথ ও কৃষিকর্মের পথ বলা যায়।

অবশ্যই বৈদিক মানুষেরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিলো কি না সে-প্রশ্ন নিয়ে বিশেষজ্ঞ-মহলে মতান্তর আছে। যদি শেষ পর্যন্ত এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক মানুষেরা ছিলো আদি অকৃত্রিম ভারতবাসী, এবং ভারতবর্ষ থেকেই এই আর্যদের কোনো কোনো শাখা প্রাচীন ইরান হয়ে প্রাগৈতিহাসিক ইজিয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছিলো,[২৯০] তাহলে মানা যাবে ভারতবর্ষের বুকেই আদিম সমাজ ছেড়ে শ্রেণীসমাজের দিকে অগ্রসর হবার দুটি পথেরই পরিচয় রয়েছে : বৈদিক মানুষের বেলায় প্রথম পথটির এবং সিন্ধুসভ্যতার প্রবর্তকদের বেলায় দ্বিতীয় পথটির। কিন্তু ভারতবর্ষে আর্যোদয় সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রচলিত মতটিই যদি শেষ পর্যন্ত অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়,—অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত যদি এই কথাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক মানুষেরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো,—তাহলে স্বীকার করতে হবে উপরোক্ত প্রথম পথে ভারতবর্ষের বুকে রাষ্ট্রের আবির্ভাবের নজির এখনো পাওয়া যায়নি।

আমাদের পক্ষে এখানে ওই আলোচনা নিয়ে বেশিদূর অগ্রসর হবার উপায় নেই। কিন্তু এই দুটি পথের পার্থক্যের কথা মনে রাখা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এবং এ-কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষের বুকের

উপর পশুপালনের পথ ধরে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হবার নজির যদিই বা সুপ্রমাণিত হয় তাহলেও মানতে হবে আপেক্ষিকভাবে সে-পথটার গুরুত্ব অনেক কম। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, পশুপালন-প্রধান নয়—যদিও অত্যন্ত বিস্তৃত দেশ বলেই এখানে পশুপালনের নজিরও অসম্ভব নয়।

অতএব আমরা বিশেষ করে এই দ্বিতীয় পথটির দিকেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখবো।

এই পথটির কথা বিশেষভাবে মনে রাখলে খাদ্য-আহরণ ও খাদ্য উৎপাদনের দিক থেকে অকৃত্রিম ট্রাইব্যাল-সমাজের দুটি পর্যায়ের কথা স্বীকার করা দরকার। এক, শিকার-জীবী; দুই প্রাথমিক কৃষিজীবী—অর্থাৎ, কৃষিজীবিকার বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্য স্তর—কেননা, কৃষিজীবিকার উচ্চ স্তর থেকেই অকৃত্রিম ট্রাইব্যাল সমাজের ভাঙন শুরু।

এবার এই তথ্যগুলিকে সাধারণভাবে জানতে-পারা সত্য হিসেবে গ্রহণ করে দেখা যাক, প্রাচীন পুঁথিপত্রের কোনো কোনো উক্তিকে নতুন করে বোঝবার সুযোগ হয় কিনা।

আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, গণ বলে সেকালের পুঁথিপত্রে যে-শব্দটির ব্যবহার হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য হলো ট্রাইব। ট্রাইব্যাল সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের কথাও আমরা আলোচনা করলাম; খাদ্য-আহরণ বা খাদ্য-উৎপাদনের দিক থেকে ট্রাইব্যাল সমাজকে প্রধান দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যাচ্ছে—শিকারজীবী এবং কৃষিজীবী। কৃষি-ব্যবস্থায় উন্নতি হতে হতে একটা স্তরে পৌঁছোবার পর থেকেই ট্রাইব্যাল সমাজে ভাঙন দেখা দেয়।

পাণিনির এবং কৌটিল্যের রচনা থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে কোনো কোনো গণ ছিলো শিকারজীবী, আর কোনো কোনো গণ ছিলো কৃষিজীবী। প্রাচীনদের পরিভাষায়, প্রথম ধরনের গণগুলি হলো আয়ুধজীবী এবং দ্বিতীয় ধরনের গণগুলি বার্তাশস্ত্রোপজীবী।

এক ধরনের গণের বিশেষণ হিসেবে পাণিনি[২৯১] আয়ুধজীবী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আয়ুধ বলতে বোঝায় অস্ত্র। কিন্তু অস্ত্র শিকারের জন্যেও হতে পারে, যুদ্ধের জন্যেও হতে পারে। জয়সওয়াল[২৯২] প্রমুখ বিদ্বানেরা গণকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে কল্পনা করেন; তাই তাঁদের পক্ষে এই প্রসঙ্গে

আয়ুধ শব্দটিকে শিকারের হাতিয়ার অর্থে গ্রহণ করা কঠিন। ফলে, পাণিনির আয়ুধজীবী গণকে তাঁরা এই বলে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছেন যে, এ-ছিলো সেকালের ভারতবর্ষের এক-রকম মিলিটারি রিপাব্লিক্—অর্থাৎ কিনা, এমন ধরনের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যার প্রধান বৃত্তিই হলো যুদ্ধ। কিন্তু স্বয়ং বিঘ্নরাজই আধুনিক ঐতিহাসিকদের এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিঘ্ন সৃষ্টি করেন এবং আয়ুধজীবী গণকে শিকারজীবী ট্রাইব হিসেবেই ব্যাখ্যা করবার প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় দেন।

এ-বিষয়ে গণেশের কাছ থেকে ঠিক কোন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়?

আমাদের দেশের দেবদেবীরা খালি হাতে থাকেন না; তাঁদের হাতে সাধারণত কোনো অস্ত্র বা প্রতীক-চিহ্ন থাকে। এ-গুলিকে বলা হয় আয়ুধ-পুরুষ—অর্থাৎ কিনা এগুলি হলো দেবদেবীর আয়ুধ, যদিও অবশ্য আয়ুধগুলিকে এ-ক্ষেত্রে খানিকটা ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হিসেবে কল্পনা করা হয়। কিন্তু মানুষ হিসেবে কল্পনা করার চেষ্টাটা যে কৃত্রিম, অতএব অর্বাচীন,তার প্রমাণ আছে: আয়ুধগুলিকে কখনো পুরুষ আবার কখনো স্ত্রীলোক হিসেবে দেখবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু এই স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্যটা নির্ভর করে আয়ুধবাচক সংস্কৃত শব্দটির ব্যাকরণগত লিঙ্গের ওপর[২৯৩]। স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ দিয়ে যদি আয়ুধটির নাম হয় তাহলে আয়ুধটিও স্ত্রীলোক হয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা দেখলেই বোঝা যায়, আয়ুধগুলির পক্ষে স্ত্রী-রূপে কল্পিত হওয়া আর পুরুষরূপে কল্পিত হওয়া দুই-ই,—অর্থাৎ, মনুষ্যরূপে কল্পিত হবার ঘটনাটিই,—কৃত্রিম চিন্তার পরিচায়ক।

তাহলে, আয়ুধ-পুরুষের কথা বাদ দিয়ে এগুলিকে শুধুমাত্র আয়ুধ বলেই দেখবার চেষ্টা করা যায়। প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠবে, দেবদেবীর হাতে এই জাতীয় আয়ুধ থাকবার তাৎপর্যটা কী? বলাই বাহুল্য, এ-বিষয়ে উত্তরকালের ধর্মগ্রন্থে কিছু কিছু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাই স্বাভাবিক। ললিতসহস্রনামের[২৯৪] টীকায় ভাস্কররায় এ-জাতীয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছেন। বরাহপুরাণেও[২৯৫] বলা হয়েছে, শঙ্খ হলো অবিদ্যা-বিনাশকের প্রতীক, খড়্গ হলো অজ্ঞানচ্ছেদ-এর প্রতীক, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং এই জাতীয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার জটিলতা দেখেই গোপীনাথ রাও[২৯৬] বলছেন,

> Thus we may see that, in relation to these various weapons and emblems found in the hands of the images of Hindu gods and goddesses, there is a consensus of opinion, showing that the early Hindus had probably a systematised symbolism as appertaining to their iconographic art in its application to religion. The key to this symbology is evidently lost and cannot be easily recovered…Till this lost key is recovered...

> nothing more than making mere guesses in the dark regarding the meaning and moral aim of Hindu icons is really possible.
>
> অর্থাৎ, সংক্ষেপে, দেবদেবীদের হাতের ওই আয়ুধগুলির কোনো গূঢ় সাংকেতিক অর্থ নিশ্চয়ই ছিলো। কিন্তু সে-অর্থ উদ্ধারের চাবিকাঠি হারিয়ে গিয়েছে—এবং সেই হারানো চাবিকাঠিটি যতোদিন না খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ততোদিন পর্যন্ত প্রতিমাকল্পনার গূঢ় অর্থ ও নৈতিক তাৎপর্য সংক্রান্ত কথা আন্দাজে ঢিল ছোঁড়বারই সামিল।

গূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের সম্ভাবনায় বিহ্বল না হয়ে ওই হারানো চাবিকাঠি খুঁজে পাবার আশায় একান্ত লোকায়তিক প্রশ্ন তোলা যাক এবং দেখা যাক লোকবন্ধু গণপতি এ-বিষয়ে আমাদের সত্যিই সাহায্য করেন কি না।

ভারতবর্ষের নানান জায়গায় গণেশকে পাওয়া যায় নানান রূপে। পুঁথিপত্রগুলিতেও গণেশের নানা রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। স্বভাবতই, এই সব বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর হাতের আয়ুধগুলি যে একই রকম হবে তা মনে করা ঠিক নয়। গণেশের নানা কল্পনায় তাঁর হাতে নানা রকমের আয়ুধ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু, যেটা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার কথা, এতো পার্থক্য সত্ত্বেও গণেশের পরিকল্পনায় দুটি আয়ুধ প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবেই থাকতে দেখা যায়। একটি হলো পাশ—*lasso*; আর একটি হলো অঙ্কুশ—*elephant goad*। উচ্ছিষ্ট গণপতি, উন্মত্ত-উচ্ছিষ্ট গণপতি, বিঘ্নরাজ গণপতি, বীরবিঘ্নেশ্বর, হেরম্ব, নৃত্যগণপতি প্রভৃতি গণেশের আদিম রূপের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তরুণগণপতি, লক্ষ্মীগণপতি, প্রসন্নগণপতি, ভুবনেশ গণপতি, হরিদ্রা গণপতি প্রভৃতি উন্নত ও মার্জিত পরিকল্পনাগুলি পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে গণেশের হাতে রয়েছে ওই পাশ ও অঙ্কুশ[২৯৭]।

পাশ আর অঙ্কুশ হাতে গণেশ কী করছিলেন,—কী করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর? আমরা যদি এই সহজ প্রশ্নটি তুলতে রাজি হই তাহলে তার একমাত্র একটিই জবাব পাওয়া যেতে পারে: পাশ আর অঙ্কুশের সাহায্যে তিনি নিশ্চয়ই হাতি-শিকার করছিলেন। কেননা, তাছাড়া এ-দুটি জিনিস আর কোন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে? আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি, গণেশের গজানন-রহস্যের মূলে আছে টোটেম্-বিশ্বাস এবং আমাদের যুক্তির বর্তমান পরিস্থিতিতে উল্লেখ করা দরকার, নৃতত্ত্বের সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুসারে টোটেম্-বিশ্বাসের উৎস ট্রাইব্যাল-সমাজের শিকারজীবী পর্যায়েই[২৯৮]। তার মানে, যে-কারণে গণেশের ওই গজানন, সেই কারণেই তাঁর হাতে পাশ আর অঙ্কুশ বলে দুটি আয়ুধ—শিকারের অস্ত্র।

গণেশের হাতের ওই আয়ুধ দুটির সাক্ষ্য সত্যিই মূল্যবান। হিন্দু

দেবদেবীদের হাতের আয়ুধগুলির আদি-তাৎপর্য উদ্ধারের সমস্যা ছাড়াও ট্রাইব্যাল-সমাজ সংক্রান্ত আমাদের মূল আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উপর এগুলি আলোকপাত করে। সমস্যাটা হলো, আয়ুধজীবী গণের বেলায় আয়ুধ শব্দটিকে কোন অর্থে গ্রহণ করা হবে—যুদ্ধের অস্ত্র, না, শিকারের হাতিয়ার? যদি দেখা যায়, স্বয়ং গণপতির হাতেই এমন আয়ুধ রয়েছে যা কিনা যুদ্ধ ব্যাপারে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক,—প্রাসঙ্গিক শুধুমাত্র শিকারের ব্যাপারেই,—তাহলে আয়ুধজীবী গণকে যুদ্ধবৃত্তিপরায়ণ রাষ্ট্র মনে না করে শিকারজীবী ট্রাইব বলাই স্বাভাবিক নয় কি?

কিন্তু ট্রাইব্যাল-সমাজ শুধুমাত্র শিকারজীবী পর্যায়েই নয়। শিকারজীবী পর্যায়ের পর কৃষিজীবী পর্যায়। কৃষিজীবী পর্যায়ের গণ-সমাজ সম্বন্ধে আমাদের পুরোনো পুঁথিপত্রে কি কোনো নজির পাওয়া যায়? তাছাড়া, যেহেতু নামেই প্রমাণ যে, গণ থেকেই গণপতির পরিকল্পনা সেইহেতু এ-কথা আশা করাও হয়তো অবিবেচনার লক্ষণ হবে না যে, গণপতির ইতিহাসটাও শুধুমাত্র শিকারজীবী পর্যায়ের প্রতিচ্ছবিতেই পরিসমাপ্ত হয়নি। অর্থাৎ, শিকারজীবী পর্যায় পেরিয়ে গণসমাজ যখন কৃষিজীবী পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন গণপতির পরিকল্পনা থেকে যদিও পুরোনো পর্যায়ের স্মৃতিচিহ্ন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি, তবুও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন পর্যায়ের কিছুকিছু নতুন চিহ্ন।

প্রথমে দেখা যাক, পুরোনো পুঁথিপত্রে আয়ুধজীবী গণ ছাড়া আর কোনো ধরনের গণের পরিচয় পাওয়া যায় কি না।

কৌটিল্য[২৯৯] গণ বা সংঘগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করছেন। দুটির নাম দিচ্ছেন রাজশব্দোপজীবী এবং বার্তাশস্ত্রোপজীবী। রাজশব্দ যে কী করে উপজীবিকা হতে পারে তা অবশ্যই বোঝা কঠিন; তাই 'রাজশব্দোপজীবী'র আক্ষরিক অর্থ অনেকাংশেই অস্পষ্ট এবং আধুনিক বিদ্বানেরা[৩০০] এর যে-সব ব্যাখ্যা করেছেন তা স্পষ্টতই চেষ্টাকল্পিত। কিন্তু বার্তাশস্ত্রোপজীবী বলে কথাটির মানে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। বার্তা মানে প্রধানতই চাষবাস, বার্তাশস্ত্র তাই চাষবাসের যন্ত্রপাতি,—বার্তাশস্ত্রোপজীবী গণ বলতে কৃষিভিত্তিক ট্রাইব্যাল সমাজ।

তাহলে, পাণিনির পাশাপাশি কৌটিল্যের রচনা মনে রাখলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথিপত্রেই শিকারজীবী এবং কৃষিজীবী—উভয় পর্যায়ের ট্রাইব্যাল সমাজেরই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীনদের পরিভাষায় এই দুটির নাম হলো, আয়ুধজীবী গণ এবং বার্তাশস্ত্রোপজীবী গণ।

গণপতির পরিকল্পনায় কি আয়ুধজীবী পর্যায়ের চিহ্ন ছাড়াও

বার্তাশস্ত্রোপজীবী পর্যায়ের কোনো নতুন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়? উত্তরে বলবো, বহু পরিচয়। যেমন, পাশ আর অঙ্কুশ ছাড়াও গণেশের হাতে দেখা দিলো ডালিম ফল, নারকোল, আম্রপল্লব, কল্পকলতা, পদ্ম, ইত্যাদি ইত্যাদি[৩০১]। আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো, এই প্রতীকগুলির প্রত্যেকটিই কৃষি আবিষ্কারের পরিচায়ক।

বস্তুত, গণেশের পরিকল্পনার সঙ্গে কৃষির যোগাযোগ এতো বহুল যে, এখানে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করবার অবকাশ নেই। তাছাড়া, কৃষি-আবিষ্কার সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্যের আলোচনা করবার আগে গণেশের রূপপরিকল্পনায় এই চিহ্নগুলির উল্লেখ অনেকাংশেই দুর্বোধ্য থেকে যাবে।

আমরা তাই এখানে কয়েকটি প্রশ্নের শুধুমাত্র অবতারণাই করে রাখবো। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাওয়া যাবে কৃষি-আবিষ্কার সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্যের আলোচনা করবার পর।

প্রথম প্রশ্ন হলো, গণেশের সঙ্গে রক্তবর্ণের একান্ত নিবিড় সম্পর্ক নিয়ে।

মন্ত্রমহার্ণবে[৩০২] বলা হয়েছে, গণেশের মূর্তি হবে রক্তবর্ণ। তন্ত্রসার[৩০৩] অনুসারে গণেশের তান্ত্রিক ধ্যানে 'সিন্দুরাভং', 'রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং' প্রভৃতি কথা পাওয়া যাচ্ছে। শঙ্করবিজয়ে[৩০৪] গাণপত্য-সম্প্রদায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, গাণপত্যরা কপালে রক্তবর্ণ ফোঁটা আঁকে—এই রক্তবর্ণতিলকই তাদের বৈশিষ্ট্য। রাঙাজবাকে বলে গণেশ-কুসুম[৩০৫], সিঁদুরের নাম হলো গণেশভূষণ[৩০৬]। নর্মদার তীরে গণেশকুণ্ডের কাছে একটি রক্তবর্ণ শিলাখণ্ডের নাম দেওয়া হয় গণেশ-শিলা[৩০৭]। মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কানে[৩০৮] দেখাচ্ছেন, বিষ্ণুর উপাসনায় যে-রকম শালগ্রামশিলা ব্যবহার করা হয়, গণেশের উপাসনায় তেমনি একটি রক্তবর্ণ শিলাখণ্ড ব্যবহার করার নির্দেশ আছে। এইভাবে, গণেশের সঙ্গে নানান দিক থেকে রক্তবর্ণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায়। প্রশ্ন হলো, ওই রক্তবর্ণের তাৎপর্যটা ঠিক কী? তার সঙ্গে কৃষিকর্মমূলক কোনো আদিম বিশ্বাসের যোগাযোগ আছে কি না? ভারতবর্ষের পিছিয়ে-পড়া মানুষদের দিকে চেয়ে দেখলে নিশ্চয়ই সে-রকম যোগাযোগের কথাই অনুমান করতে হয়। ভীল-রা ক্ষেতে বীজ বোনবার আগে একটি শিলাখণ্ডের উপর সিঁদুর মাখায়—শিলাটিকে তারা বলে গণেশ[৩০৯]।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, ভারতবর্ষীয় মূর্তিরচনার ক্ষেত্রে এবং নানা ভাস্কর্যে দেখতে পাওয়া যায় গণেশের সঙ্গে এক বা একাধিক স্ত্রী-মূর্তির যোগাযোগ ঘটছে। ইলোরার গুহায়[৩১০] গণেশ আর একা নন; তাঁর সঙ্গে সাতটি মাতৃমূর্তির—সপ্তমাতৃকার—যোগাযোগ হয়েছে। গণেশের একজাতীয় মূর্তির

নাম শক্তিগণপতি[৩১১]। শক্তিগণপতির নানান রূপ : লক্ষ্মী-গণপতি, উচ্ছিষ্ট গণপতি, মহাগণপতি, উর্ধ্ব-গণপতি, পিঙ্গল-গণপতি। এই মূর্তিগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই দেখা যায় গণেশের সঙ্গে একটি করে নারীমূর্তি সংযুক্ত হয়েছে। নারীমূর্তিগুলিকে বলা হয় গণেশের শক্তি। তন্ত্রসাহিত্যে[৩১২] পঞ্চাশটি গণেশের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তান্ত্রিক মতে প্রত্যেকটি গণেশের সঙ্গেই একটি করে শক্তির যোগাযোগ আছে। তাই প্রশ্ন ওঠে, এই সব ক্ষেত্রে গণেশ একা নন কেন? কেন অমন অবধারিতভাবে নারীমূর্তির সঙ্গে গণেশ সংযুক্ত হচ্ছেন? তার সঙ্গেও কি কৃষি-আবিষ্কার-মূলক কোনো ব্যাপারের সম্পর্ক আছে?

তৃতীয়ত, গণেশের সঙ্গে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার যোগাযোগ। তান্ত্রিক সাহিত্যে গণেশ যে কী রকম গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন তার আলোচনা ইতিপূর্বে অনেকেই[৩১৩] করেছেন। এখানে আমাদের পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়ে[৩১৪] গাণপত্য-সম্প্রদায়ের একটি শাখার—অর্থাৎ, উচ্ছিষ্টগণপতির উপাসকদের—বক্তব্য-বর্ণনায় বলা হয়েছে :

> কিঞ্চ মদীয়াচারে ধর্ম্মদ্বয়মেবানুবর্ত্তনীয়ম্। পুরুষাণাং সর্ব্বজাতিকানাং একজাতিবৎ ইত্যেকঃ ধর্ম্মঃ। স্ত্রীণাং সার্ব্ববর্ণিকানাং একজাতিবৎ ইত্যেকঃ ধর্ম্মঃ। তেষাং তাসাঞ্চ সংযোগে-বিয়োগে চ দোষাভাবঃ। অস্যা অয়মেব পতিরিতি নিয়ামকাভাবাৎ তাসু রজঃসিক্তাদৌ সুসম্পর্কে জাতে রুধিরবাহুল্যাৎ আনন্দাধিক্যাচ্চ। (সর্ব্বে বর্ণাঃ সমানজাতয়ঃ দাম্পত্যব্যবস্থা নাস্তি। যেন কেনাপি পুরুষেণ স্বস্য হেরম্বতাং বিভাব্য যাং কাঞ্চিৎস্ত্রিয়ং তচ্ছক্তিং বিচিন্ত্য স্মরতেন সম্ভোগঃ কার্য্যঃ। ইত্যধিকঃ কৃচিৎ)। আনন্দপ্রাপ্তিরেব ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিতি তস্য সচ্চিদানন্দলক্ষণাচ্চ। তস্মাৎ উচ্ছিষ্টগণপতেঃ অখণ্ডানন্দরূপত্বেন ব্রহ্মরূপত্বেন চ তন্ময়তম্ অনন্যভেদঃ। তাদৃশাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ। অংশাংশিনো অভেদঃ প্রতিপাদিতো রুদ্রকাণ্ডে। নমো কেপি নমো গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চ বো নমো নম ইতি। গণরূপেভ্যো গণপতিরূপেভ্যশ্চ রুদ্রেভ্যো নম ইত্যনেন গণত্বং গণপতিরূপত্বঞ্চ একস্মিন্ রুদ্রে ঘটতে।
>
> অর্থাৎ,
>
> উপরন্তু আমাদের মতে দুইটি ধর্মের অনুসরণ করা উচিত। বিভিন্ন জাতীয় পুরুষগণের একজাতির ন্যায় ব্যবহার—এই একটি ধর্ম। সমস্ত বর্ণের স্ত্রীলোকদিগের একজাতির ন্যায় ব্যবহার—এই আর একটি ধর্ম। এই পুরুষগণের এবং এই নারীগণের পরস্পর মিলনে এবং বিচ্ছেদে কোন দোষ নেই; কেননা ওই বিশেষ পুরুষই এই নারীর পতি, এমন কোন নিয়ম নেই। রজঃপ্রকৃতি সিক্ত হইলে উপযুক্ত মিলনজাত রুধিরবাহুল্য হেতু আনন্দাধিক্য উপজাত হয়। (সমস্ত বর্ণগুলিই এক-জাতীয়, তাদের মধ্যে কোন দাম্পত্য ব্যবস্থা নাই। যে-কোন পুরুষই নিজেকে হেরম্ব বলে বিবেচনা করে এবং যে-কোন স্ত্রীলোককে শক্তিরূপে বিবেচনা করে সুরত কার্যের দ্বারা সম্ভোগ

> করতে পারে।) আনন্দলাভই ব্রহ্মপ্রাপ্তি—তাই-ই সচ্চিদানন্দের লক্ষণ। এই জন্যই উচ্ছিষ্টগণপতির অখণ্ডানন্দরূপ এবং ব্রহ্মরূপ পরস্পর এক এবং অভিন্ন। ব্রহ্মাদি দেবগণও এই রূপ। অংশ এবং অংশীর প্রভেদ রুদ্রকাণ্ডে প্রতিপাদিত হয়েছে। "গণদিগকে এবং গণপতিদিগকে, এই সকলকেই আমি নমস্কার করি।" "গণের রূপসমূহকে, গণপতির রূপসমূহকে, রুদ্রদিগকে নমস্কার করি"—ইহার দ্বারা গণত্ব এবং গণপতিরূপত্ব একই রুদ্রে আরোপিত হয়।

অবশ্যই, "রজঃসিক্তাদৌ সুসম্পর্কে জাতে রুধিরবাহুল্যাৎ"—ইত্যাদির আদি ও অকৃত্রিম তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা পরে তোলা যাবে। এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে চিত্তাকর্ষক তথ্য একটি নয়, একাধিক। যেমন ধরা যায়, গাণপত্য সম্প্রদায়ের পক্ষে ওই অংশ-অংশী-অভেদ-ন্যায়ের সাহায্যে গণ এবং গণপতির মধ্যে অভেদ-প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনায় যে-কথাটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক সেটি হলো, উচ্ছিষ্টগণপতিকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত প্রকট বামাচারী ধ্যানধারণা। গাণপত্যসম্প্রদায়ের এই শাখাটির সঙ্গে সহজিয়া প্রভৃতিদের পার্থক্য কতটুকু? বস্তুত, শঙ্কর-বিজয়ের লেখক[৩১১] অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় একাধিকবার বলে দিচ্ছেন, এই গাণপত্যসম্প্রদায়টি বামমার্গাবলম্বী, বামাচারী। আমাদের প্রশ্ন হলো, গণেশকে কেন্দ্র করে এই যে বামাচারী ধ্যানধারণাগুলির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এর সঙ্গে "বার্তাশস্ত্রোপজীবী গণ"-এর কোনো সম্পর্ক আছে কি না? অর্থাৎ এই ধ্যানধারণাগুলির উৎসে কৃষিআবিষ্কার পর্যায়ের বিশ্বাসই খুঁজে পাওয়া যায় কি না?

কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার

তাহলে, সিদ্ধিদাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগোতে এগোতেই আমরা আমাদের মূল সমস্যাগুলির আলোচনায় ফিরতে বাধ্য হলাম।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে অগ্রসর হয়ে আমরা দেখেছিলাম, লোকায়ত বলতে শুধুমাত্র সংকীর্ণ-অর্থে মাধবাচার্য-বর্ণিত চার্বাক-মতবাদকে বুঝতে গেলে ভুল হবে। কাপালিক, সহজীয়া প্রভৃতি বামাচারী সম্প্রদায়গুলিও লোকায়তিক সম্প্রদায়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লোকায়তিক ধ্যানধারণার সম্যক উপলব্ধির জন্যে আর একটি মূল্যবান মূলসূত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন: প্রাচীনদের মতে লোকায়তিকদের কাছে বার্তাই ছিলো প্রধানতম বিদ্যা।

তাই, লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস-সন্ধানে বার্তা বা কৃষিবিদ্যা আবিষ্কারের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বস্তুত, আমাদের ধারণায় কৃষিবিদ্যা-আবিষ্কার সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্যের ভিত্তিতেই লোকায়তিক,—তথা তান্ত্রিকাদি,—ধ্যানধারণাগুলির আদি-তাৎপর্য অনুমান করা সম্ভব। আমরা তাই শুরুতে কৃষিবিদ্যা-আবিষ্কার সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে-পারা কয়েকটি তথ্যের আলোচনা করবো।

প্রথম প্রশ্ন হলো, কৃষিবিদ্যা আবিষ্কার করেছিলো কারা? পুরুষেরা, না, মেয়েরা?

রবার্ট ব্রিফল্ট[৩১৬] বলছেন,

> The art of cultivation has developed exclusively in the hands of women.
>
> অর্থাৎ, একান্তভাবে মেয়েদের হাতেই কৃষিবিদ্যার বিকাশ ঘটেছে।

কী করে ঘটলো? মেয়েরা কেন? এ-বিষয়ে অধ্যাপক জর্জ টমসনের[৩১৭] সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করা যায়:

> In the pre-hunting stage there was no production, only simple appropriation of seeds, fruits, and small animals, and consequently there was no division of labour. With the invention of spear, however, hunting became the men's task, while the women continued the work of food-gathering. This sexual division of labour is universal in hunting tribes, being due to the relative immobility of women during pregnancy and lactation.
>
> Hunting led to the domestication of animals. Instead of being killed the game was brought home alive and kept. Accordingly cattle-raising is almost everywhere men's work. On the other hand, food-gathering led to the cultivation of seeds in plots adjacent to the settlement, and so garden tillage is women's work. Then, after the introduction of the cattle-drawn plough, agriculture was transferred to the men. In parts of Africa, where the plough is only a recent acquisition, the change-over can be seen taking place at the present day.
>
> অর্থাৎ, শিকারজীবী পর্যায়ের আগে পর্যন্ত খাদ্য-উৎপাদন বলে কিছু ছিলো না; তার বদলে ছিলো বীজ, ফল, ছোটো জানোয়ার সংগ্রহ (খাদ্য-আহরণ)। অতএব, তখন শ্রমবিভাগ বলেও কিছু ছিলো না। কিন্তু বল্লম আবিষ্কারের

ফলে শিকার হলো পুরুষের কাজ, তখনো মেয়েরা আগের মতোই খাদ্য-আহরণের কাজ করতে লাগলো। এই যৌন-শ্রমবিভাগ শিকারজীবী ট্রাইবদের মধ্যে সার্বভৌম ঘটনা ; কেননা এর কারণ হলো গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানের সময়টায় মেয়েদের পক্ষে আপেক্ষিকভাবে ঘোরাফেরা করবার অক্ষমতা।

শিকার থেকেই মানুষ পশুপালন শিখলো। জানোয়ারটাকে মেরে ফেলবার বদলে ঘরে ধরে আনা এবং বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হতে লাগলো। ফলে, পশুপালন প্রায় সর্বত্রই পুরুষদের কাজ। অপরপক্ষে, খাদ্য-আহরণের চেষ্টা বস্তির আশপাশের ছোটোছোটো জমিতে বীজ পোঁতবার কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলো। অতএব, বাগান-ক্ষেত (*garden-tillage*—কৃষিবিদ্যার আদিপর্ব : ছোটো ছোটো জমি খুঁড়ে বাগানের মতো ক্ষেত করবার কাজ) হলো মেয়েদের কাজ। তারপর, জানোয়ার-জোতা লাঙল ব্যবহার শুরু হওয়া থেকে কৃষিকাজ এলো মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে। আফ্রিকার কোথাও কোথাও সম্প্রতি কালে লাঙলের প্রচলন শুরু হয়েছে, সেখানে আজকের দিনে এই পরিবর্তনটি প্রত্যক্ষভাবে ঘটতে দেখা যায়।

আফ্রিকার জুলুদের বর্ণনায় ক্রিগ্[৩১৮] বলছেন, আজকালকার দিনে ওই নিয়মটি (অর্থাৎ, কৃষিকাজ মেয়েদেরই হবে) ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রভাবের ফলে বহুলাংশে শিথিল হয়েছে ; বলদ-জোতা লাঙলের ব্যবহার শুরু হওয়ার দরুন চাষের কাজ পুরোপুরি পুরুষদেরই হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কেননা মেয়েরা পশুর ব্যবহার পারে না।

"এন্সাইক্লোপিডিয়া অব্ রিলিজন্ এণ্ড এথিক্স"-এও[৩১৯] কৃষি-আবিষ্কার প্রসঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে, এ-আবিষ্কার পুরুষেরা করেনি—মেয়েরাই করেছিলো : "ট্রাইবের পুরুষেরা যখন বনজঙ্গলে শিকারে নিযুক্ত, বা, যুদ্ধে রত, মেয়েরা তখন শিশুদের নিয়ে বাসভূমির আশপাশে ছুঁচোলো কাঠের টুকরো বা পাথরের কুড়ুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তেই কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিলো। এই কৃষিকাজের রীতিমতো উন্নতি হবার আগে পর্যন্ত কাজের দায়িত্বটা মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে যায়নি।" নজির হিসেবে লেখক দেখাচ্ছেন, মধ্য-ব্রেজিল্-এ কৃষিকাজ যে মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিলো সে-কথা স্টেইনেন[৩২০] ইতিপূর্বেই প্রমাণ করেছেন। এবং জেন্ হ্যারিসনের[৩২১] লেখা থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখানো হয়েছে, আমেরিকার আদিবাসীদের একটি কুসংস্কারের মধ্যে ওই স্মৃতিটিরই পরিচয় পাওয়া যায় যে, কৃষিকাজ শুরুতে শুধুমাত্র মেয়েলি ব্যাপারই ছিলো : ওদের ধারণায় মেয়েরা ভুট্টা বুনলে এক-এক বৃন্তে তিন-তিন ভুট্টা হয়। কেন হয় ? কেননা মেয়েরা জানে কেমন করে ফলবতী হওয়া যায়। তাই শুধু তারাই জানে গাছও কী করে ফলের জন্ম দেবে।

রবার্ট ব্রিফল্ট[৩২২] একের পর এক উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছেন, মেয়েরাই যে কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিলো তার স্মৃতি নানান দেশের আদিম মানুষদের নানা উপকথায় আজো টিকে রয়েছে। চেরোকি জাতির[৩২৩] লোকেরা এখনো বিশ্বাস করে, পৃথিবীর প্রথম নারীই বনের মধ্যে শস্য আবিষ্কার করেছিলো, মারা যাবার সময় সেই নারী নির্দেশ দিয়ে যায় যে, মাটির উপর দিয়ে তার শবদেহ টেনে নিয়ে বেড়াতে হবে—জমি সেই শবদেহের স্পর্শে শস্যশ্যামল হয়ে উঠলো। চেইয়েন্সদের[৩২৪] মধ্যেও বিশ্বাস যে, একজন মেয়েই প্রথম শস্য আবিষ্কার করেছিলো। ব্রেসিল্-এ টুপিস্‌দের[৩২৫] উপকথায় আছে, একটি কুমারী মেয়ে একবার অন্তঃসত্ত্বা হয়; তার গর্ভজাত শিশুটির মৃতদেহ থেকেই পৃথিবীর প্রথম শস্য জন্মায়। আফ্রিকার দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে[৩২৬] নানা আদিবাসীদেরও বিশ্বাস, শস্য আবিষ্কার করেছিলো পৃথিবীর এক আদি-নারী।

এই জাতীয় উপকথার ইঙ্গিতকে নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের আজকের পুরুষ-প্রধান সমাজে এ-জাতীয় তথ্যের তাৎপর্যটা হৃদয়ঙ্গম করা অনেক সময় রীতিমতো কঠিন হয়ে ওঠে। তাৎপর্যটা হলো, মানুষের পক্ষে সভ্যতার দিকে এগোবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথটির নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিলো নারীজাতির কাছ থেকেই। অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন্[৩২৭] সেই তাৎপর্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন :

"শিকার এবং পশুপালন—উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের যাযাবর-জীবন। কৃষিকাজই মানুষের অগ্রগতিপথে একটি বিরাট ও প্রচণ্ড পরিবর্তন নিয়ে এলো, মানুষ স্থায়ীভাবে একই জায়গায় বাসা বাঁধতে শিখলো। তাই তার পর থেকেই মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণ অর্থে রাজনৈতিক জীব বা *political animal* হওয়া সম্ভবপর হলো—এ্যারিস্টট্‌ল্-এর সংজ্ঞা অনুসারে শহরে বাস করাটাই রাজনৈতিক জীবের লক্ষণ। আমেরিকায় ইরোকোয়ারা এই স্তরের দিকেই এগোবার উপক্রম করছিলো,—এমন সময় কলম্বাসের অনুচরেরা গিয়ে হামলা করে; ইরোকোয়াদের অগ্রগতি বন্ধ হয়। তাই এ্যাস্টেক্সদের তুলনায় তারা পিছিয়েই পড়ে রইলো—এ্যাস্টেক্সদের ঘট, ধাতুব্যবহার, নির্মাণশিল্প, চিত্র-লিপি এবং পঞ্জিকা-আবিষ্কারের বাস্তব ভিত্তি হলো যাযাবর জীবন ছেড়ে কৃষিমূলক সমাজে স্থায়ী জীবন। পুরোনো পৃথিবীর আলোচনা-প্রসঙ্গে এই প্রভেদটি আরো স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। ইয়োরোপ ও এসিয়ার কোনো কোনো সমতল মরুদেশে আমাদের জীবদ্দশাতেই সভ্যতা শুরু হয়েছে; অথচ দক্ষিণ এসিয়ার পলি-পড়া উর্বর উপত্যকাগুলিতে কোন এক সুদূর অতীত থেকেই সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটতে দেখা যায়। নীল-নদ, ইউফ্রেটিস ও সিন্ধুর কিনারায় যে-নগরসভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিলো সেগুলির ঐশ্চর্যের চূড়ান্ত উৎস ছিলো

চাষের জমিই—এ হলো যীশুখৃষ্টের তিন হাজার বছরের চেয়েও বেশি আগেকার কথা। অথচ, মধ্যবর্তী মরুদেশগুলি এখনো, আমাদের যুগ পর্যন্ত, বেদুইনদের দেশ হয়ে আছে! কৃষি আবিষ্কারের চরম গুরুত্ব নিয়ে দীর্ঘতর আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কথা হলো, উৎপাদনের এই পদ্ধতিটি মেয়েদের আবিষ্কার। তাই, সভ্যতার দিকে এগোবার চূড়ান্ত পথনির্দেশ তাদের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছে"।

পণ্ডিতেরা অনেক সময় আক্ষেপ করে বলেন, বৈদিক মানুষেরা আমাদের জন্যে কোনো রকম প্রত্নতত্ত্বমূলক চিহ্ন রেখে যায়নি; অপরপক্ষে হরপ্পা-মহেনজোদারোর মানুষগুলি কতো অপরূপ কীর্তির চিহ্ন রেখে গিয়েছে! সেই সঙ্গেই বলা হয়, বৈদিক-সাহিত্যে প্রধানতই পুরুষ-দেবতাদের ভিড়—নারী হিসেবে যে-দু'চারজনের উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের স্থান নেহাতই গৌণ; অপরপক্ষে, হরপ্পা-মহেনজোদারোতে দেবীমূর্তির বহু নজিরই খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কেন? এই প্রভেদ কেন? উভয় ঘটনাকেই বোঝবার যেটি হলো প্রকৃত মূলসূত্র তার আলোচনা প্রায়ই অস্পষ্ট থাকে: বৈদিক মানুষেরা ছিলো প্রধানতই পশুপালন-জীবী—সে-অর্থনীতির ভিত্তিতে স্থায়ী নগর গড়ে তোলবার সুযোগ নেই। তাই নগর-গড়বার চিহ্নের পরিবর্তে নগর-ধ্বংসের চিহ্ন রেখে যাওয়াই সেই মানুষদের পক্ষে স্বাভাবিক—আধুনিক পণ্ডিতেরা অনুমান করছেন সিন্ধুসভ্যতার নগরগুলি বৈদিক মানুষদের আক্রমণেই ধ্বংস হয়েছিলো[৩২৮]। অপরপক্ষে, প্রাচীন কালে সিন্ধু-অঞ্চলের মানুষেরা চাষবাস আবিষ্কার করেছিলো—এই আবিষ্কারই ছিলো অমন নগর-সভ্যতা গঠনের ভিত্তি এবং অমন নগর-সভ্যতা গঠনের ভিত্তি এই কৃষিবিদ্যা যে মেয়েদেরই আবিষ্কার ছিলো তার সাক্ষ্য বহন করছে হরপ্পা-মহেনজোদারোতে খুঁজে পাওয়া দেবীমূর্তিগুলি। কৃষিকাজ যে মেয়েদেরই আবিষ্কার তার একটি অত্যাশ্চর্য মূর্ত প্রমাণ হরপ্পায় পাওয়া গিয়েছে।

হরপ্পা-মহেনজোদারোর কথায় পরে ফেরা যাবে।

তার আগে দেখা যাক, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা, যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, কৃষিবিদ্যা মেয়েদেরই আবিষ্কার।

এরেন্‌ফেল্‌স্[৩২৯] লিখছেন, মেন্‌ঘিনের মতে নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষিকাজের পক্ষে উপযুক্ত পাথরের যে-কুড়ুল সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিলো, তা আবিষ্কার করেছিলো ভারতবর্ষের মেয়েরাই। মেন্‌ঘিন্-এর মূল রচনা পাঠ করবার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু এরেন্‌ফেল্‌স্ তাঁর 'মাদার-রাইট ইন্‌ ইণ্ডিয়া', বা, ভারতবর্ষে মাতৃপ্রাধান্য নামের গ্রন্থে বারবার এই বিষয়টিরই উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখাতে চান যে, ভারতবর্ষে মাতৃপ্রাধান্যের সবচেয়ে

প্রাকৃত স্তরটির সঙ্গে নারীজাতির কৃষিবিদ্যা-আবিষ্কারের যোগাযোগ রয়েছে[৩৩০] :

> Women here not only invented systematic tilling of the soil but also put this into practice, which can by no means have been an easy task, as conservatism was so strong in primitive society, especially in the primeval culture circle, that some remnants of this pre-agricultural groups have been preserved to the present day. In consequence of the tilling of the soil, the peoples of this first matriarchal culture-circle gave up roaming in the forest and became the first settlers.
>
> অর্থাৎ, এখানে (ভারতবর্ষে) মেয়েরা শুধুই যে সুষ্ঠুভাবে জমি খোঁড়বার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলো তাই নয়, এ-পদ্ধতিকে কার্যেও পরিণত করেছিলো। ব্যাপারটা খুব সহজ ছিলো না, কেননা আদিম সমাজে রক্ষণশীলতা যে-হেতু খুব জোর সেইহেতু আজও বিশেষ করে আদিম সংস্কৃতির এলাকায় প্রাক-কৃষিমূলক দলের চিহ্ন থেকে গিয়েছে। চাষ করতে শেখবার দরুন এই প্রাথমিক মাতৃপ্রধান সংস্কৃতির এলাকার মানুষেরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরা বন্ধ করলো এবং সব-প্রথম স্থায়ী আবাস গড়তে শুরু করলো।

এরেন্‌ফেল্‌স্‌ তাঁর এই সিদ্ধান্তের পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য দিয়েছেন। তাঁর গবেষণার উপর নির্ভর করে আমরা সহজেই দেখতে পাই, ভারতবর্ষেও কৃষিবিদ্যা মেয়েদেরই আবিষ্কার।

কৃষি-আবিষ্কার ও মাতৃপ্রাধান্য

এরেন্‌ফেল্‌স্‌-এর রচনা থেকে উদ্ধৃত অংশটিতে দেখতে পাওয়া যায়, মেয়েদের পক্ষে কৃষি-বিদ্যা আবিষ্কার হওয়ার কথা এবং মাতৃপ্রধান সমাজের কথা তিনি এক-নিঃশ্বাসে একই সঙ্গে বলছেন। তার কারণ, এই কৃষিবিদ্যা আবিষ্কারের ফলে সমাজ-সংগঠনে এক মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিবর্তনটি হলো, (সাময়িকভাবে) পিতৃপ্রাধান্যের বা পুরুষপ্রাধান্যের পরিবর্তে মাতৃপ্রাধান্য বা নারীপ্রাধান্যের প্রবর্তন।

লোকায়তিকেরা যেহেতু বার্তাকেই একমাত্র বিদ্যা বলে ঘোষণা করছে সেইহেতু এই লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস-সন্ধানে বার্তা-বিদ্যা

আবিষ্কারের সঙ্গে সমাজে মাতৃপ্রাধান্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা তুলতে আমরা বাধ্য। এবং আমরা আশা করতে পারি যে, এইদিক থেকে আমাদের মূল সমস্যাটির উপর কিছুটা আলোকপাত হবার সম্ভাবনা আছে। কেননা প্রাচীনেরা বলেছেন, লোকায়তিক ধ্যানধারণার সঙ্গে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার সম্পর্ক ছিলো এবং এই তান্ত্রিকেরা শাক্ত—তন্ত্র-সাহিত্যে প্রধান বলতে শক্তিই—অর্থাৎ নারীই। তাই, এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, এই ধ্যানধারণাগুলির মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজেরই প্রতিবিম্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। বস্তুত, শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ চন্দ[৩৩১] প্রমুখ কোনো কোনো বিদ্বান ইতিপূর্বেই উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার চেষ্টা করেছেন :

> ...it may be assumed that Saktism arose in India under the same social conditions as those under which Astarte was conceived in Syria, Cybele in Asia Minor, and Isis in Egypt. Regarding the origin of Astarte, Professor Paton writes :— "There is a large body of evidence to show that the Semites before their separation passed through a matriarchal stage of society. In such a society the chief deity of the tribe must have been conceived as a counterpart of the human matriarch...This view is confirmed by the fact that all those traits which are oldest and most permanent in the character of Ashtart-Ishtar are those which for other reasons we must predicate of the ancient Semitic tribal mother." In Asia Minor, the home of the cult of the Great Mother Cybele, matriarchate,...a social system which traces descent and transmits property through women and not through men, "lingered in Lycia down to historical period ; and we may conjecture that in former times it was widely spread through Asia Minor" (Frazer). In Egypt, the home of Isis, "the archaic system of mother-kin, with its preference for women over men in matters of property and inheritance, lasted down to Roman times" (Frazer)......
> The *Sakta* conception of the *Devi* as *Adyasakti*, 'the primordial energy,' and *Jagadamba*, 'the mother of the universe,' also very probably arose in a society where matriarchate or mother-kin was prevalent.

অর্থাৎ, এ-কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সিরিয়ায় যে-সামাজিক অবস্থায় অস্টারটি দেবীর আবির্ভাব হয়েছিলো, এসিয়া-মাইনরে আবির্ভাব হয়েছিলো সিবেলি দেবীর, ইজিপ্ট-এ আইসিস্-এর,—সেই সামাজিক পরিস্থিতিতেই

ভারতবর্ষে আবির্ভাব হয়েছিলো শক্তিবাদের। অস্টারটি দেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গে অধ্যাপক পেটন লিখছেন, "সেমাইটরা বিভক্ত হয়ে যাবার আগে যে মাতৃপ্রধান সমাজের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছিলো সে-বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়।…এ-জাতীয় সমাজে প্রধানা দেবী ট্রাইবের প্রধানা মহিষীর প্রতিরূপ হিসেবেই কল্পিত হতে বাধ্য।…এই মতবাদটির সমর্থনে দেখা যায়, এ্যাস্টার্ট-ইস্থারের চরিত্রের সবচেয়ে আদিম ও সবচেয়ে স্থায়ী লক্ষণগুলি আসলে সেই সব চারিত্রিক লক্ষণই, যেগুলিকে আমরা অন্যান্য কারণে প্রাচীন সেমিটিক ট্রাইবের মাতার চারিত্রিক লক্ষণ বলেই চিনে থাকি।" সিবেলি দেবীর দেশ এসিয়া মাইনরে দেখা যায় মাতৃপ্রাধান্য, অর্থাৎ কিনা যে-সামাজিক ব্যবস্থায় মায়ের দিক থেকে বংশ-নির্ণয় হয় এবং উত্তরাধিকারসূত্রে নারীগত হয়, —এই প্রথা "ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত লিসিয়ায় বর্তমান ছিলো; এবং আমরা অনুমান করতে পারি যে, আগেকার যুগে সারা এসিয়া-মাইনর জুড়ে এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো (ফ্রেসার)"। আইসিস্ দেবীর দেশ ইজিপ্ট-এ "মায়ের দিক থেকে জ্ঞাতি-নির্ণয়ের আদিম ব্যবস্থা,—যে-ব্যবস্থা অনুসারে সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় পুরুষদের বদলে মেয়েরাই প্রধান,—রোমান যুগ পর্যন্ত টিকে ছিলো (ফ্রেসার)।"…
শাক্ত-মতে দেবীকে যে আদ্যাশক্তি ও জগদম্বা মনে করা হয় তার উৎসও খুব সম্ভব মাতৃপ্রধান সমাজেই।

আমাদের ধারণায়, শাক্ত মতবাদের উৎস সংক্রান্ত এমন প্রগাঢ় অনুমান আধুনিক বিদ্বান মহলে আর কারুর রচনায় দেখতে পাওয়া যায় না। তন্ত্রের গূঢ়তম তাৎপর্য আলোচনার নামে একান্ত একালের ধ্যানধারণাকে সেকালের ধ্যানধারণার উপর আরোপ করবার পণ্ডশ্রম[৩৩২] না করে আধুনিক পণ্ডিতেরা যদি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের এই নির্দেশ অনুসরণ করে তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উৎস সন্ধানে অগ্রসর হতেন তাহলে ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় যুগান্তর আসতে পারতো। অবশ্যই স্যর জন মার্সাল[৩৩৩] হরপ্পা-মহেনজো-দারোর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের এই মন্তব্যের তাৎপর্যকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। সে আলোচনায় আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করবো। তার আগে আমাদের পক্ষে প্রয়োজন মাতৃপ্রাধান্য সংক্রান্ত যে-তথ্য সাধারণভাবে জানতে পারা গিয়েছে তারই আলোচনা।

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন্[৩৩৪] দেখাচ্ছেন, গত শতাব্দীতে ব্যাকোফেন্-এর গবেষণা অনুসরণ করে নৃতত্ত্ববিদেরা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আদিতে বংশপরিচয় নিয়ন্ত্রিত হতো মায়ের দিক থেকে। আজকের দিনে অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদই এই মতবাদটিকে বর্জন করতে চান, যদিও পালটা মতবাদ হিসেবে কোনটা যে সত্যি সে-বিষয়ে তাঁরা একমত নন। কিন্তু রবার্ট ব্রিফল্ট ব্যাকোফেনের ওই পুরোনো মতবাদটিকেই নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছেন; এবং

সে-উদ্দেশ্যে তিনি যে-বিশাল পরিমাণ তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তার অংশ-মাত্রও তাঁর বিপক্ষদের রচনায় চোখে পড়ে না। প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, মর্গান, মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেল্‌স্‌ সকলেই ব্যাকোফেনের এই মতটি গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রিফল্ট নিজে ক্রমে ক্রমে বাস্তব তথ্যের প্রেরণায় মার্ক্‌স্‌পন্থী হয়েছিলেন[৩৩৫]। কথাটা জরুরি। কেননা, এঙ্গেল্‌স্‌ সে-সময়ে মর্গানের মাতৃপ্রাধান্যমূলক মতবাদকে বিনা-সংশোধনে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মার্ক্‌স্‌পন্থী ব্রিফল্ট, এবং এ-বিষয়ে ব্রিফল্টকে অনুসরণ করে মার্ক্‌স্‌পন্থী জর্জ টম্‌সনও বিনা সংশোধনে মর্গানের সমস্ত মন্তব্য গ্রহণ করেন না[৩৩৬]। বিজ্ঞান বলেই মার্ক্‌স্‌বাদ কয়েকটি কল্পিত সনাতন সত্যের গুচ্ছ নয়। বাস্তব তথ্যের তাগিদে যেখানে মর্গানের সিদ্ধান্ত এঙ্গেল্‌স্‌-সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও সংশোধন-সাপেক্ষ সেখানে সংশোধন-প্রচেষ্টায় দ্বিধা অ-বৈজ্ঞানিক, অতএব অ-মার্ক্‌স্‌বাদী মনোভাবের পরিচায়ক।

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন লিখছেন, উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা মাতৃত্বসূত্রে বংশপরিচয়ের উৎস ব্যাখ্যা করতে পারেননি। মর্গানের মতে, সমাজ-বিকাশের প্রাকৃত পর্যায়ে ছিলো যৌথ-বিবাহ; এ-অবস্থায় সন্তানের পিতাকে সনাক্ত করা সম্ভব নয়, তাই সন্তানেরা মাতার গোত্রান্তর্গত হতো। কিন্তু অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন দেখাচ্ছেন, এ-পর্যায়ে সন্তানের ব্যক্তিগত মাতা-পিতাকে সনাক্ত করবার প্রশ্ন ওঠে না। নিউ ব্রিটেনের এক আদিবাসী সগর্বে বলেছিলো, তার তিনজন মা আছে; মেয়ে তিনটিও একইভাবে বলেছিলো, 'আমরা তিনজনেই ওর জন্ম দিয়েছি'। যৌথ-বিবাহ ভেঙে যাবার আসল কারণ, সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার জন্মাতে শুরু হবার দরুন ব্যক্তিগতভাবে কে-কার-সন্তান তা নির্ণয় করবার প্রয়োজন হয়। তাই এখানে মর্গানের মতবাদ শুধরে নেওয়া দরকার[৩৩৭]।

রবার্ট ব্রিফল্ট, এবং ব্রিফল্টকে অনুসরণ করে অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন, যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন[৩৩৮] তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

মানবসমাজের প্রাকৃততম পর্যায়ে যে মাতৃপ্রাধান্য ছিলো, এ-বিষয়ে মর্গানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁদের বক্তব্যের কোনো প্রভেদ নেই। প্রভেদ হলো, মাতৃপ্রাধান্যের কারণ কী, এবং মাতৃপ্রাধান্য কেন ধ্বংস হলো—সেই প্রশ্ন নিয়ে। মর্গান বলতে চেয়েছিলেন, এ-অবস্থায় (যৌথ-বিবাহের দরুন) পিতৃত্ব-নিরূপণ অসম্ভব এবং শুধুমাত্র মাতৃত্ব-নিরূপণ সম্ভবপর বলেই মাতৃপ্রাধান্যের প্রাদুর্ভাব হয়েছিলো। কিন্তু ব্রিফল্ট দেখাতে চান, এ-অবস্থায় মানবসমাজে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে নারীর উপরই দায়িত্ব আপেক্ষিকভাবে বেশি ছিলো এবং মাতৃপ্রাধান্যের মূল কারণ তাই। একেবারে প্রাকৃত অবস্থায় মানুষ খাদ্য-উৎপাদন করতে শেখেনি; খাদ্য-আহরণ করে জীবন-ধারণ করতো। এবং এইভাবে খাদ্য অন্বেষণ ও আহরণ করবার ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর

মধ্যে কারুর দায়িত্ব আপেক্ষিকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। অপরপক্ষে, নারীর উপর একটি অন্য ধরনের বিশিষ্ট দায়িত্ব ছিলো, এবং সেই দায়িত্বের গুরুত্বেই তার প্রাধান্য সম্ভবপর হয়েছিলো। এই বিশেষ দায়িত্ব হলো, শিশুপালনের দায়িত্ব। ব্রিফল্ট[৩৩৯] সুদীর্ঘভাবে আলোচনা করে দেখাচ্ছেন, মানুষের পক্ষে পশুর পর্যায় ছেড়ে আসবার একটি মূল লক্ষণ হলো, মানবশিশু বড়ো হতে বা পরিণতি পেতে অনেক বেশি সময় নেয়। পরিণতি পাবার ও বড়ো হবার জন্যে প্রয়োজনীয় এই দীর্ঘ সময়টি ধরে মানবশিশুর পক্ষে অনেক রকমের শিক্ষাদীক্ষা পাওয়ার কথা। এবং ওই শিক্ষাদানের দায়িত্ব মেয়েদেরই উপর ছিলো। তাই, অর্থনৈতিক দায়িত্বের দিক থেকে যখন পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান (কেননা, খাদ্য-উৎপাদনের কাজ তখন শুরু হয়নি, খাদ্য-আহরণের উপরই জীবনধারণ নির্ভর করতো), তখন শিশুপালনের ও শিশুকে শিক্ষা দান করবার বাড়তি দায়িত্বের দরুন দলের মধ্যে মেয়েদের একটা বাড়তি গুরুত্ব ছিলো। পুরুষেরা তখন শুধুমাত্র জন্মদাতা ; কিন্তু পুরো দলটির অভ্যাস, ব্যবহারের মাপকাঠি, ঐতিহ্য,—এক কথায়, সে-পর্যায়ে মানব-সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার সবটুকুকেই,—রূপ দেওয়া এবং নতুন বংশের মানুষদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া—এ-সব ব্যাপারের ভার ছিলো মেয়েদের উপরই। তাই সামাজিকভাবে মেয়েরাই হয়ে উঠেছিলো প্রধান। বংশপরিচয়ও স্বভাবতই মায়ের দিক থেকেই।

অবস্থাটার কিন্তু পরিবর্তন হতে বাধ্য হলো, শিকার,—বিশেষ করে উন্নত পদ্ধতিতে শিকার,—করতে শেখবার পর থেকে। কেননা, শিকারই যখন প্রধানতম জীবনোপায় তখন যাদের উপর শিকারের দায়িত্ব, সামাজিক-ভাবে তাদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। এবং শিকারজীবী পর্যায়ের আগে পর্যন্ত যে-শিশুপালনের দায়িত্ব সামাজিকভাবে মেয়েদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলো, শিকারজীবী পর্যায়ে পৌঁছে সেই দায়িত্বই মেয়েদের অপ্রধান করে তুললো। গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানের সময়ে, মেয়েরা নিশ্চয়ই বনে-জঙ্গলে ঘুরতে পারে না। তাই, শিকারজীবী পর্যায়ে তারা পুরুষদের সঙ্গে সমানে-সমান হতে পারে না। শিকার প্রধানতই পুরুষদের কাজ। আর তাই, শিকারজীবী পর্যায়ের ট্রাইবেরা স্বভাবতই পুরুষ-প্রধান। আজো পৃথিবীতে যে-সব শিকারজীবী ট্রাইব টিকে আছে তাদের বেলায় দেখা যায় শিকারের দায়িত্বটা পুরুষদের উপর ; মেয়েরা এ-অবস্থায় আগের মতোই খাদ্য-আহরণের কাজে লিপ্ত। তাই, আদিম মাতৃপ্রাধান্য ভেঙে যাবার কারণ সন্তানের পিতৃত্ব-নিরূপণের তাগিদ নয় ; খাদ্য-সরবরাহের দিক থেকে পুরুষদের প্রাধান্য। এই বিষয়ে তাই রবার্ট ব্রিফল্ট ও জর্জ টমসন মর্গানের মতবাদকে শুধরে নিতে চাইছেন[৩৪০]।

পুরুষপ্রাধান্য ও নারী-প্রাধান্য—এর সঙ্গে খাদ্য-সরবরাহ ব্যবস্থায় পুরুষ ও নারীর আপেক্ষিক গুরুত্বের সম্পর্ক আছে। তাই কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে মানবসমাজে আবার সাময়িকভাবে মাতৃপ্রাধান্য দেখা দিতে বাধ্য। কেননা, আমরা আগেই দেখেছি, কৃষিবিদ্যা মেয়েদের আবিষ্কার। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে খাদ্য-উৎপাদনের দিক থেকে পুরুষেরা প্রধান নয়, মেয়েরাই প্রধান। কিন্তু এই মাতৃপ্রাধান্য স্বভাবতই সাময়িক। যতোদিন পর্যন্ত কৃষিকাজ বলতে প্রধানতই হলো জমি কুপিয়ে ছোটো ছোটো ক্ষেত ধরনের তৈরি করা শুধু ততোদিনই কৃষিকাজের প্রধান দায়িত্ব মেয়েদের উপর। বড়ো ক্ষেতে এবং হাল-লাঙলে জানোয়ার জুতে চাষবাস শুরু করবার উন্নততর পর্যায়ে পৌছোনোর পর কৃষিকাজ আর মেয়েদের এক্তিয়ারে থাকেনি। পুরুষদের হাতে এলো। ফলে, এই পর্যায়ে আবার পিতৃপ্রাধান্যের প্রত্যাবর্তন হতে দেখা যায়।

কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, সামাজিক ব্যবস্থাদিতে, এবং বিশেষ করে ধ্যানধারণার ক্ষেত্র থেকে মাতৃপ্রাধান্যের সমস্ত স্মারক সঙ্গে সঙ্গে মুছে যেতে বাধ্য হলো। বস্তুত, প্রাচীন মিশর, মহেনজোদারো প্রভৃতি দৃষ্টান্তে স্পষ্টই চোখে পড়ে যে, কৃষির উন্নতির ফলে সুবিশাল রাষ্ট্রশক্তি ও এমন কি নির্মম শ্রেণীশোষণের পর্যায়ে পৌছুবার পরও মানবসমাজে এবং মানবচেতনায় মাতৃ-প্রাধান্যের খুবই স্পষ্ট ও প্রকট স্মারক টিকে থেকেছে। কিন্তু আমরা বিশেষ করে বলতে চাই, এগুলি নিয়ে আলোচনা করবার সময় স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার যে, এগুলি স্মারকমাত্র। অর্থাৎ, মহেনজোদারোর নগর পত্তন, ব্যবসা, বাণিজ্য, রাষ্ট্রশক্তি প্রভৃতির পিছনে কৃষিকাজের উন্নতির যে-পর্যায়টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, ওই মাতৃপ্রাধান্যের চিহ্নগুলি সে-পর্যায়েরই অবদান নয়, তার চেয়ে অনেক প্রাকৃত এক পর্যায়ের অবদান,—যখন কৃষিকাজ সবে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং মেয়েরাই সে-আবিষ্কার করেছে। আমরা একটু পরেই মহেনজোদারোর শক্তিপ্রধান চিন্তাচেতনার আলোচনা তুলবো। সে-আলোচনা প্রসঙ্গে এ-কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে যে, প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণে মহেনজোদারো মানব উন্নতির যে-পর্যায়ের পরিচায়ক এই শক্তিপ্রধান চিন্তাচেতনা তার অবদান নয়—তার চেয়ে অনেক পুরোনো পর্যায়ের স্মারক। অর্থাৎ, এগুলির আদি ও অকৃত্রিম তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে উন্নততর কৃষি-কর্মের পর্যায়ে নয়; তার বদলে কৃষিকর্মের প্রাকৃত পর্যায়টিতেই,—যে-পর্যায়ে মেয়েরাই মানবইতিহাসের এই চরম বিস্ময়কর আবিষ্কারটি সেরে করেছে।

মহেনজোদারোর কথায় পরে ফেরা যাবে। আপাতত, মাতৃপ্রাধান্যমূলক সাধারণ যুক্তিটির প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক।

মর্গানের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলা হয়, আজকের পৃথিবীতে যে-

ট্রাইবগুলি সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় আটকে রয়েছে সেগুলির মধ্যে মাতৃপ্রাধান্যের পরিবর্তে পিতৃপ্রাধান্যই চোখে পড়ে; আর যদি তাই হয় তাহলে কী করে স্বীকার করা যাবে যে, মানবসমাজের আদিমতম পর্যায়ে মাতৃপ্রাধান্যই বর্তমান ছিলো? অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[৩১১] দেখাচ্ছেন, এ-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে বর্তমান পৃথিবীর ওই প্রাচীনতর পর্যায়ের ট্রাইবগুলির অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করলে। আসলে এগুলি খাদ্য-আহরণ বা *food-gathering* পর্যায়ের ট্রাইব নয়; শিকারজীবী পর্যায়েরই ট্রাইব। এদের মধ্যে যে পিতৃপ্রাধান্য চোখে পড়ে তার কারণ হলো এই ট্রাইবগুলির অর্থনৈতিক জীবন শিকারজীবী পর্যায়েই আটকে থেকেছে।

অপরপক্ষে মর্গানের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে সত্যিই বলা যায়, শিকারজীবী পর্যায়ের তুলনায় অনেক উন্নততর পর্যায়ের ট্রাইব মাতৃপ্রধান হয়ে থেকেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ভারতবর্ষের গারো ও খাসিদের কথা আপাতত না তুলেও আমেরিকার ইরোকোয়া ও পিউব্‌লো ইণ্ডিয়ানদের উল্লেখ করা যায়। মর্গানের নিজের বর্ণনা[৩১২] অনুসারে ইরোকোয়াদের পরিবার মাতৃপ্রধান: প্রধানত মেয়েরাই মোড়ল নির্বাচন করে এবং ট্রাইব্যাল-পঞ্চায়েৎ-এর মধ্যে মেয়েরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। পিউব্‌লো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে মাতৃপ্রাধান্যের বর্ণনা অন্যান্য লেখকরা[৩১৩] দিয়েছেন। তুলনায়, অস্ট্রেলিয়ার নানা ট্রাইবের মধ্যে পিতৃপ্রাধান্য চোখে পড়ে। অথচ, মর্গানের স্তর-নির্ণয় অনুসারেই অস্ট্রেলিয়ার ওই ট্রাইবগুলি ইরোকোয়া ও পিউব্‌লো ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে অনেক প্রাকৃত স্তরের[৩১৪]। তাই, অস্ট্রেলিয়ার ট্রাইবগুলির এই পিতৃপ্রাধান্যের পাশাপাশি ইরোকোয়া ও পিউব্‌লো ইণ্ডিয়ানদের মাতৃপ্রাধান্যের ব্যাখ্যা অন্য দিক থেকে খোঁজ করা দরকার; মর্গানের নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সে-ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব রবার্ট ব্রিফল্ট ও জর্জ টম্‌সন মর্গানের সিদ্ধান্তকে যে-ভাবে শুধরে নিতে চান সেদিক থেকে: পিতৃপ্রধান অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা শিকারজীবী, ইরোকোয়া আর পিউব্‌লো ইণ্ডিয়ানরা কৃষিজীবী।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, মানবজাতির সব শাখা যে একইভাবে শিকারজীবী পর্যায় থেকে কৃষিজীবী পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে তা মনে করবার কারণ নেই। কোনো কোনো জাতির বেলায় দেখা যায় শিকারজীবী পর্যায়ের পর পশুপালনজীবী পর্যায় এবং পশুপালন থেকে একেবারে হাল-লাঙলে বলদ জুতে চাষবাস করবার আয়োজন—অর্থাৎ, উন্নততর পর্যায়ের কৃষিকাজই। স্বভাবতই, মানবজাতির এই শাখাগুলির বেলায় কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক স্তরের দরুন যে অন্তর্বর্তী মাতৃপ্রাধান্য, তা চোখে পড়বার কথা নয়।

এখানে, রবার্ট ব্রিফল্ট-এর[৩৩৫] রচনা থেকে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে :

> Definite economic power was first placed in the hands of men by the domestication of animals, which are always regarded as appertaining to the province of the hunter, and by the development of pastoral societies. That power has commonly been used to buy off the claims of women and of their families to the allegiance and services of husbands; women are purchased for cattle, and patriarchal society with patrilocal marriage becomes inevitably established among pastoral peoples. Where, on the other hand, agriculture, which from the first has been the province of women, has developed on an important scale without any intervening pastoral stage, the matriarchal order has often persisted and has even become accentuated in relatively advanced phases of culture. This has been the case in North America, where no domestication of animals has taken place, and most conspicuously among those tribes, such as the Iroquois and the Pueblos, in which agriculture attained in the hands of women an important development. Similarly, the matriarchal order is found persisting among the peoples of Indonesia, and of Micronesia, where the culture of rice and of paddy supply the staple means of subsistence and pastoral conditions have not existed. The matriarchal character of society has been preserved among many African peoples who have remained chiefly agricultural. This happened notably in Egypt which owed its wealth and culture to the Nile and to the fields which it fertilised, and where pastoral property never attained to any degree of importance. Elsewhere the stage of highly developed agriculture has been reached only after passing through a purely pastoral phase of long duration, as with the 'Aryans' of India and the Semites of Western Asia, who were driven by the desiccation of their pastoral lands towards the great alluvial plains, the granaries of the world. Among the Semitic nations of Western Asia women retained many relics of their primitive influence; their position, specially in earlier times, was very far from one of

degradation and oppression. The code of Hammurabi shows countless provisions protecting the status of women, more particularly of priestesses; women could own property, homes, slaves; they conducted business and commerce, and could plead in court. Yet the contrast of Babylonian society with Egypt is sharp and conspicuous in this respect; "the man is more important than the woman, the father than the mother, the husband than the wife." Assyrian pictorial art, in glaring contrast with that of Egypt, scarcely even represents a woman; only once the queen of Ashurbanipal appears in a court picture at Kuyunijk by the side of her lord. That subordinate position of women becomes in time more pronounced. The development of agriculture in its most productive from in those societies which were originally pastoral, instead of raising the economic power and importance of the earth-cultivating women, has accentuated beyond measure the already established supremacy of the owners of flocks and herds, and given rise to the most pronounced type of patriarchal society.

অর্থাৎ (সারমর্ম), শিকারবৃত্তি থেকেই পশুপালনের উৎপত্তি এবং পশুপালনের ফলে পুরুষের হাতে প্রথম সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক ক্ষমতা এলো। এই ক্ষমতার সাহায্যে প্রায়ই মেয়েদের কিনে নেওয়া শুরু হলো। গৃহপালিত পশুর বিনিময়ে মেয়েদের কেনা হতো। পশুপালনমূলক সমস্ত সমাজই অনিবার্যভাবে পিতৃপ্রধান, বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুরঘর করতে যায়। অপরপক্ষে, কৃষিকাজ শুরু থেকেই মেয়েদের এক্তিয়ারে; তাই যাদের বেলায় পশুপালনমূলক কোনো মধ্যবর্তী পর্যায় বাদ দিয়ে ভালো রকমের কৃষিকাজ দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে প্রায়ই মাতৃপ্রাধান্য বর্তমান থেকেছে ও এমন কি আপেক্ষিকভাবে সংস্কৃতির উন্নতর পর্যায়ে এই মাতৃপ্রধান্য কোথাও কোথাও দৃঢ়তর হয়েছে। এই ঘটনাই ঘটেছে উত্তর আমেরিকায়। সেখানে পশুপালন দেখা দেয়নি। এ-ব্যাপার বিশেষ করে ইরোকোয়া এবং পিউব্‌লোদের মধ্যে চোখে পড়ে—তাদের বেলায় মেয়েদের চেষ্টায় কৃষিকাজের বিশেষ উন্নতি হয়েছে। তেমনি, ইন্দোনেসিয়া এবং মাইক্রোনেসিয়ায় মাতৃপ্রাধান্য টিকে থাকতে দেখা যায়; এ-সব জায়গায় প্রধানতম খাদ্য হলো চাল এবং এখানে পশুপালনের অবস্থা কখনোই ছিলো না। আফ্রিকার জায়গায় জায়গায়, যেখানে মানুষেরা কৃষিপ্রধান হয়ে রয়েছে সেখানে, দেখা যায় মাতৃপ্রাধান্য টিকে থেকেছে। বিশেষ করে ইজিপ্ট-এ এই ঘটনা ঘটতে দেখা যায়—সেখানে পশুপালনমূলক সম্পত্তি কখনোই খুব গুরুত্বপুর্ণ রূপ নেয়নি এবং সেখানে ঐশ্বর্যের মূলে ছিলো নীল-নদের প্লাবনে উর্বর জমি। অপরাপর ক্ষেত্রে, সুদীর্ঘ পশুপালনজীবী পর্যায়ের পরই বিশেষ উন্নত

কৃষিজীবী পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে। যেমন, ভারতবর্ষে 'আর্য'দের বেলায় এবং পশ্চিম এসিয়ায় সেমাইটদের বেলায়। পশুপালনের জমি নিঃশেষ হবার ফলেই তারা শেষ পর্যন্ত পলিপড়া উপত্যকায় এসে পৌঁছেছিলো—সে-উপত্যকা পৃথিবীর শস্যভাণ্ডারের মতো। পশ্চিম এসিয়ার সেমিটিক জাতিগুলির মধ্যে মেয়েদের আদিম যুগের প্রভাব-প্রতিপত্তির কিছুকিছু স্মারক থেকে গিয়েছিলো। বিশেষ করে শুরুর দিকে তাদের অবস্থা মোটেই নির্যাতিত এবং অবদলিতের মতো নয়। হামুরাবির আইনে দেখা যায় মেয়েদের, বিশেষত পৌরোহিত্য-কর্মে লিপ্ত মেয়েদের, সম্মান রক্ষার জন্য অনেক বিধি ব্যবস্থা রয়েছে। মেয়েরা সম্পত্তির, বাড়ির এবং কৃতদাসের মালিক হতে পারতো। তবুও, এদিক থেকে মিশরের সমাজের সঙ্গে ব্যাবিলোনিয়ার সমাজের তফাতটা অত্যন্ত প্রকট। ব্যাবিলোনিয়ায়, "নারীর তুলনায় পুরুষের, মাতার তুলনায় পিতার, স্ত্রীর তুলনায় স্বামীর স্থান অনেক গুরুত্বপূর্ণ"। মিশরের চিত্রকলার সঙ্গে বিরাট তফাত হিসেবে দেখা যায়, অসিরিয় চিত্রকলায় মেয়েদের যেন কোনো স্থানই নেই; কেবলমাত্র একটি ছবিতে চোখে পড়ে রাজদরবারের দৃশ্যে রাজা অসুরবানিপালের রানী, তাও তিনি স্বামীর পাশে রয়েছেন। মেয়েদের এই গৌণ অবস্থা ক্রমশই আরো প্রকট হয়ে পড়তে থাকে। যে-সব সমাজে পশুপালনের পর উন্নত কৃষিকর্মের উদ্ভব হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় মাটি কোপানোয় নিযুক্ত মেয়েদের অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পরিবর্তে গৃহপালিত পশুর মালিক পুরুষদের ইতিপূর্বেই যে-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সেই প্রাধান্য ঢের বেড়ে গিয়েছে। এবং এই সব ক্ষেত্রে তাই বিকশিত হয়েছে চূড়ান্ত পিতৃপ্রধান সমাজের রূপ।

অবশ্যই, ব্রিফল্ট-এর পক্ষে সিন্ধুসভ্যতার আলোচনা তোলা সম্ভবপর হয়নি; স্যর জন মার্শাল-এর "মোহেনজোদারো এবং সিন্ধুসভ্যতা" পরে প্রকাশিত হয়েছিলো। অথচ, সিন্ধুসভ্যতার চিহ্নগুলি থেকে ব্রিফল্ট-এর সিদ্ধান্তের অত্যন্ত স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়: এগুলির মধ্যে কৃষিপ্রাধান্য ও মাতৃপ্রাধান্য দু'-এরই পরিচয় রয়েছে। বৈদিক "আর্য"দের বেলায় ঠিক এর বিপরীত। তাঁরা ছিলেন প্রধানতই পশুপালনজীবী যোদ্ধার দল। তাঁরা কৃষিকাজকে ঘৃণার চোখেই দেখতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁদের সাহিত্যে মাতৃপ্রাধান্য বা দেবীপ্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। রবার্ট ব্রিফল্ট[৩৬] লিখছেন:

> Mother Earth has scarcely any place in the cosmological or religious conceptions and rites of peoples in pre-agricultural stages. Even far above the level of primitive culture, where advanced material and intellectual civilization has been attained by peoples who have never truly become cultivators

of the soil, Mother Earth plays no part. The Hindu Aryans, for example, developed the highest type of Oriental civilization and culture without ever becoming agriculturists. It was as a society of pastoral warriors that they established themselves in the fertile plains of Northern India; they never took up the cultivation of the soil, leaving it to the native inhabitants; and, indeed, they, like all pastoral warriors, profoundly despised agriculture as the occupation of the conquered races. The Laws of Manu forbid agricultural work to members of Brahminical and warrior castes. "Some declare that agriculture is something excellent", states the official codes of Brahminical Laws, "but that means of subsistence is blamed by the virtuous". A Brahmin at the present day will not so much touch a plough. In Vedic literature, accordingly, and in Hindu religion we find no great Earth Mother...Goddesses occupy a subordinate position in Vedic religion.

অর্থাৎ, প্রাক্-কৃষিপর্যায়ের মানুষদের বিশ্বরহস্য কল্পনায়, ধর্মমূলক ধ্যানধারণায় ও আচার-অনুষ্ঠানে বসুমাতার বিশেষ কোনো স্থান নেই। যারা কৃষিকাজে প্রবৃত্ত না হয়েই আদিম সংস্কৃতির চেয়ে অনেক উচ্চতর পার্থিব ও পারমার্থিক সভ্যতার স্তরে পৌঁছেছিলো, তাদের মধ্যে বসুমাতার প্রচলন নেই। যেমন, হিন্দু আর্যরা কৃষিকাজে কখনোই আত্মনিয়োগ না করেও প্রাচ্য সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন গড়ে তুলেছিলো। উত্তর ভারতের উর্বর উপত্যকায় পশুপালক যোদ্ধা হিসেবেই তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলো; তারা নিজেরা কখনোই কৃষিকাজের দায়িত্ব নেয়নি, সে-দায়িত্ব স্থানীয় আদিবাসীদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। এবং, সমস্ত পশুপালক যোদ্ধাদের মতোই তারাও এই কৃষিকাজকে বিজিত জাতিদের বৃত্তি হিসেবে ভয়ানক ঘৃণা করতো। মনুর আইন অনুসারে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের পক্ষে কৃষিকাজ নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণদের আইনের বইতে বলা হয়েছে, "কোনো কোনো পণ্ডিত কৃষিকে ভালো বলেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। উহা সাধুজন কর্তৃক নিন্দিত"। (কৃষিঃ সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা: মনু, ১০, ৮৪)। আজকের দিনে কোনো ব্রাহ্মণ লাঙল স্পর্শ করতে পর্যন্ত রাজি নয়। ফলে বৈদিক সাহিত্য এবং হিন্দু ধর্মে বসুমাতার স্থান নেই।...বৈদিক ধর্মে দেবীরা গৌণ।

বলাই বাহুল্য, মনুস্মৃতির উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় এখানে প্রাচ্য-সভ্যতার ও সংস্কৃতির উন্নততম পর্যায় বলতে বৈদিক মানুষদের প্রাকৃততর পর্যায়ের উল্লেখ করা হচ্ছে না,—যে-পর্যায়ে, আমরা আগে দেখাবার চেষ্টা করেছি, তাদের মধ্যেও গণ-সমাজ বর্তমান ছিলো। তেমনি, হিন্দু ধর্ম বলতে এই

প্রসঙ্গে বৈদিক ধর্মই বুঝতে হবে। আমাদের মূল যুক্তির পক্ষে যে-ছুটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য তা হলো :

১) পশুপালন-প্রাধান্যের দরুনই বৈদিক ধ্যানধারণায় মাতৃপ্রাধান্যের বা শক্তিপ্রাধান্যের বিকাশ হয়নি।

২) যাদের সাধারণত স্থানীয় অনার্য বলা হয় তারা প্রধানতই কৃষিজীবী ছিলো এবং কৃষিজীবীই থেকে গিয়েছিলো। (অর্থাৎ, তাদের অর্থনীতিটা পশুপালন-প্রধান নয়। (এখানে, এই অনার্যদের মধ্যে আয়ুধজীবী পর্যায়কে অস্বীকার করা হচ্ছে না ; বার্তাশস্ত্রোপজীবীগণের পাশেই আয়ুধজীবীগণের দৃষ্টান্ত ছিলো নিশ্চয়ই—কিন্তু এগুলি হলো এগিয়ে-যাওয়া দলের পাশে পিছিয়ে-পড়ে-থাকা দল।) ফলে, আমরা দেখবো, এদেরই মধ্যে মাতৃপ্রাধান্যের বিকাশ ঘটেছিলো।

ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বোঝবার জন্যে এই ছুটি বিষয়েরই সুস্পষ্ট আলোচনা হওয়া দরকার।

১ : বৈদিক ঋষিরা যখন স্বর্গ ও মর্তের দূরত্ব বর্ণনা করবার জন্যে সহস্র গাভীকে উপর উপর দাঁড় করাবার হিসেব দেন,[৩৪৭] বা, একই শব্দ ব্যবহার করে 'গোরু পাবার বাসনা' ও 'যুদ্ধ' ছুই-ই বোঝাতে চান[৩৪৮]—তখন নিশ্চয়ই সন্দেহ থাকে না যে, তাঁরা প্রধানতই পশুপালক ছিলেন। বস্তুত, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র[৩৪৯], উইণ্টারনিৎস্[৩৫০], গর্ডন চাইল্ড[৩৫১] প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রায় একবাক্যেই স্বীকার করছেন যে, বৈদিক মানুষেরা প্রধানতই পশুপালনজীবী ছিলেন। উইণ্টারনিৎস্[৩৫২] বলছেন, যদিও পরের যুগে ভারতবর্ষীয়দের প্রধান খাদ্য বলতে চাল-ই, তবুও ঋগ্বেদে তার উল্লেখ নেই। *The chief source of income was cattle-raising*[৩৫৩]—ধনলাভের প্রধানতম উপায় বলতে ছিলো পশুপালন। পূর্ববর্তী গবেষকেরা এই কথাটি প্রমাণ করবার জন্যে এতো তথ্য সংগ্রহ করেছেন যে, আমাদের পক্ষে এ-বিষয়ে আজ আর কোনোরকম সন্দেহ পোষণ করবার সুযোগ নেই। প্রশ্ন ওঠে, এই পশুপালনজীবী সমাজে নারীর স্থান কী রকম ছিলো ? কার্ল মার্ক্স্ বলেছিলেন, পৌরাণিক কাহিনীতে (দেবতাদের তুলনায়) দেবীদের স্থান থেকেই প্রাচীন সমাজে নারীদের স্বাধীন ও গৌরবময় সত্তা অনুমান করা যায়।

> as Marx observes, the position of goddesses in mythology represents an earlier period when women still occupied a freer and more respected place[৩৫৪].

বৈদিক সাহিত্যে কী রকম ? ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড-এর 'বেদিক মাইথোলজি'[৩৫৫] অনুসরণ করে এখানে সে-বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করা যাক।

তিনি বলছেন, বৈদিক বিশ্বাস ও পূজার মধ্যে দেবীদের স্থান অত্যন্ত গৌণ। দেবীরা বৈদিক সাহিত্যের কোথাও-ই পৃথিবীর অধিশ্বরী বলে বর্ণিত হননি। দেবীদের মধ্যে একমাত্র যাঁর কিছুটা বা গৌরব আছে তিনি হলেন উষা। কিন্তু উষার গৌরবও খুব বেশি নয়। সংখ্যায় কতোবার উল্লেখিত হয়েছেন—এই বিচারে উষা বৈদিক দেবলোকের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন। অন্যান্য সমস্ত দেবতারাই যজ্ঞাহুতির অংশ পেয়ে থাকেন; কিন্তু উষা তা পান না। দেবীদের মধ্যে উষার পর স্থান হলো সরস্বতীর; কিন্তু তিনি নিম্নতম শ্রেণীতেই পড়েন। আর কয়েকটি দেবী আছেন যাঁদের কথা মাত্র একটি করে সূক্তে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, পৃথিবী (তাও, পৃথিবী একা নন, দ্যাবাপৃথিব্যৌ হিসেবে), রাত্রি। এইভাবে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড দেখাচ্ছেন, বৈদিক সাহিত্যে আর যে-কয়েকটি দেবীর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের স্থান নিতান্ত গৌণ। এবং ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবপত্নী হিসেবে যাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁদের না আছে স্বাতন্ত্র্য, না, বিশেষ কোনো গৌরব।

অতএব, দেবীমাহাত্ম্যে দেবীকে যেভাবে বেদবন্দিতা[৩৫৬] বলতে শোনা যায় তা আর যাই হোক বৈদিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক নয়। কেননা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দেবীসূক্ত যে অনেক অর্বাচীন, এ-কথায় আধুনিক গবেষকেরা একমত[৩৫৭]। বৈদিক সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যটির কথা আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই[৩৫৮] উল্লেখ করছেন। কিন্তু এর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা সকলে করেন না। আমাদের যুক্তি হলো, বৈদিক মানুষদের জীবনে পশুপালন-প্রাধান্য থেকেই ওই পুরুষপ্রধান বৈদিক দেবলোকের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

বৈদিক ধ্যানধারণা যে পুরুষপ্রধান তার নজির হিসেবে ম্যাকডোন্যাল্ড প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানেরা প্রধানতই বৈদিক দেবলোকটিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন: এ-দেবলোক পুরুষমাহাত্ম্যে পূর্ণ, দেবীদের দৃষ্টান্ত এখানে দুর্লভ। কিন্তু বৈদিক ধ্যানধারণার ওই পুরুষ-প্রাধান্যের আরো চূড়ান্ত নিদর্শন হলো ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের বিখ্যাত পুরুষসূক্ত[৩৫৯]:

> পুরুষং এবেদং সর্ব যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্
> উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
> ইত্যাদি। ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তর[৩৬০] তর্জমা থেকে এখানে পুরুষসূক্তের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাক:

যাহা হইয়াছে, অথবা যাহা হইবেক, সকলি সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হয়েন, কেননা তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহন করেন॥

তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিনপাদ॥

> পুরুষ আপনার তিনপাদ লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন॥ ইত্যাদি। ইত্যাদি।

এই পুরুষসূক্তকে অবলম্বন করে বহু আধ্যাত্মিক আলোচনার[৩৩১] অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্বানেরা এখনো এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নটি উত্থাপন করেননি: এখানে নারীর বদলে পুরুষকেই কেন আদি-কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে? প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক। কেননা, আদি-কারণ হিসেবে পুরুষের বদলে নারীকেও বর্ণনা করা সম্ভব। বস্তুত, আমাদের দেশেই বৈদিক চিন্তাধারা ছাড়াও আর একটি চিন্তাধারা প্রবাহিত ছিলো। সেই ধারা অনুসারে বিশ্বের আদি-কারণ পুরুষ নয়—নারী। এই অবৈদিক চিন্তাধারাটির নাম তন্ত্র। তন্ত্রমতে নারীই আদ্যাশক্তি, জগদম্বা।

আমাদের মন্তব্য হলো, মানুষের ধ্যানধারণা স্বয়ম্ভু নয়। তার মধ্যে বাস্তব সমাজ-জীবনের প্রতিবিম্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ওই পুরুষসূক্তে পুরুষ-প্রধান সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। এবং বৈদিক সমাজ যে পুরুষপ্রধান ছিলো তাও অকারণ নয়: বৈদিক মানুষদের প্রধানতম জীবনোপায় বলতে পশুপালনই।

বলাই বাহুল্য, তার মানে এই নয় যে, বৈদিক সাহিত্যে কৃষিকাজের কোনো পরিচয় নেই। কৃষিকাজেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে অনেকেই[৩৩২] ইতিপূর্বে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এমনকি, অশ্বমেধ যজ্ঞাদির আলোচনা প্রসঙ্গে কপ্পারস্[৩৩৩], এরেন্‌ফেল্‌স্[৩৩৪] প্রমুখ কোনো কোনো আধুনিক গবেষক দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বাজসনেয়ী সংহিতায় নারী-প্রাধান্যমূলক ধ্যানধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আমরা ইতিপূর্বে (পৃঃ ১০৪) বাজসনেয়ী সংহিতা থেকে কিছুটা অংশ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি এবং ওই বামাচারী অনুষ্ঠানটির সঙ্গে কী ভাবে ক্ষেত্রে বীজবপনের প্রসঙ্গ উঠলো সে-দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। অতএব, সংহিতা-সাহিত্যের এই অংশে যদি নারীপ্রাধান্যের পরিচয় সত্যিই পাওয়া যায় তাহলে তার সঙ্গে কৃষিকর্মের যোগাযোগের ইঙ্গিতটুকুও অস্পষ্ট নয়। আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে আমাদের যুক্তি হলো, এই জাতীয় নারীপ্রাধান্য ও কৃষিকর্মের পরিচয় বৈদিক সাহিত্যের মুখ্য অঙ্গ নয়। অর্থাৎ, বেদে কৃষিকর্মের নিদর্শন আবিষ্কার করা সম্ভব হলেও বৈদিক মানুষদের প্রধানতম জীবনোপায় বলতে পশুপালনই। তেমনি, বৈদিক মানুষদের চেতনায় ও আচার-অনুষ্ঠানে নারীপ্রাধান্যের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া অসম্ভব না হলেও সে-চেতনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো পুরুষপ্রাধান্য।

বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে মনে

রাখা দরকার, এ-সাহিত্য সুবিশাল ও জটিল। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশে বৈদিক ঐতিহ্যই একমাত্র ঐতিহ্য নয়। অ-বৈদিক মানুষদের মধ্যে যারা আয়ুধজীবী পর্যায়কে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছিলো তারা পশুপালনের দিকে অগ্রসর না হয়ে প্রধানতই বার্তাশস্ত্রোপজীবী পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো। এই কারণেই, ভারতীয় সংস্কৃতির অ-বৈদিক ধারাটি শক্তি-প্রধান বা মাতৃপ্রধান।

২: সাধারণত যাদের স্থানীয় অনার্য বলে উল্লেখ করা হয় তারা কৃষিজীবী ছিলো এবং কৃষিজীবী হিসেবেই থেকে গিয়েছিলো। এবং এর ফলে তাদের মধ্যে মাতৃপ্রাধান্যের বিকাশ ঘটাই স্বাভাবিক। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন[৩৩৫] বলছেন, "আর্যদের মধ্যে প্রধান হলো পুরুষ। তাকে বলে বীজ-প্রাধান্য। পরে দ্রাবিড়াদি জাতির মাতৃতন্ত্র সমাজের প্রভাবে মায়ের জাতই সন্তানেরা পেতে লাগলেন। তার নাম ক্ষেত্রপ্রাধান্য। তা অনার্য প্রভাবের ফল।" এবং "শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গুরু এবং মাতামহ, মামা, ভাগ্নে, দৌহিত্র, জামাতা, মাসতুত-পিসতুত ভাই প্রভৃতি কন্যাগত সম্বন্ধযুক্তদেরই আদর বেশি। কন্যাতন্ত্রতাও আর্যদের নয়। কূর্মপুরাণে বলেন, মাতৃযাগ না করে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করলে মাতৃগণ হিংসা করেন। অকৃত্বা মাতৃযাগন্তু যঃ শ্রাদ্ধন্তু নিবেশয়েৎ। তস্য ক্রোধসমাবিষ্টা হিংসামিচ্ছন্তি মাতরঃ।"[৩৩৬] শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন-এর মতে এটা অবশ্যই অনার্য প্রভাবের ফল।

ওই তথাকথিত দ্রাবিড় বা আর্য-বহির্ভূতদের মধ্যে মাতৃপ্রাধান্যের বিকাশ কেন হয়েছিলো? এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে তাদের কৃষিপ্রাধান্য থেকেই। এবং আমরা দেখবার চেষ্টা করবো, এই কৃষিবিদ্যার দিক থেকেই লোকায়তিক, তথা তান্ত্রিক, ধ্যানধারণার উৎস আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। তাই, আর্য-বহির্ভূত ওই কৃষিজীবীদের বিষয় নানা দিক থেকে আলোচনা তোলবার প্রয়োজন হবে। কিন্তু বর্তমানে আশাকরি এটুকু বলা অসঙ্গত নয় যে, ব্রত ও বামাচার-প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে একটি সমস্যার অবতারণা করেছিলাম এবং আমাদের আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছে সে-সমস্যার সমাধান পাওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে।

সমস্যাটা কী? আমরা ইতিপূর্বে (পৃঃ ১৫১) দেখেছি যে, বৈদিক অনুষ্ঠান এবং আদি অকৃত্রিম ব্রতগুলির তুলনা করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, "আর্য এবং আর্যপূর্ব দু'জনেরই সম্পর্ক, যে-পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে,…দু'জনে ব্রত করছে যা কামনা করে, সেটা দেখলে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে; কেবল পুরুষের চাওয়া আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের এবং ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের, এই যা প্রভেদ।" উপনিষদে বামাচারের স্মারকগুলি নিয়ে আলোচনা করবার সময়েও লোকায়তিক

বামাচারের সঙ্গে আমরা এরই অনুরূপ একটি প্রভেদ দেখেছি (পৃঃ ১১৬): বৈদিক বামাচার পুরুষপ্রধান, লোকায়তিক বামাচার স্ত্রী-প্রধান। সমস্যা হলো, এই প্রভেদের কারণ কী? আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছে আমরা এই প্রভেদের কারণটি অনুমান করবার সুযোগ পাই। ভারতীয় সংস্কৃতির ওই দুটি মূল ধারা, অর্থাৎ বৈদিক ও অ-বৈদিক ধারার মধ্যে মৌলিক তফাত আছে: বৈদিক সংস্কৃতি পুরুষ-প্রধান, অ-বৈদিক সংস্কৃতি নারী-প্রধান। এবং এই প্রভেদের কারণ হলো, বৈদিক মানুষদের জীবিকা-বৃত্তি প্রধানতই পশুপালন-মূলক, তথাকথিত অনার্য বা আর্যপূর্ব মানুষদের জীবিকা-বৃত্তি প্রধানতই কৃষিমূলক।

গণেশচতুর্থী ব্রত: কৃষিআবিষ্কার ও মাতৃপ্রাধান্য

আমাদের ওই গণেশ ঠাকুরটি সত্যিই যেন সিদ্ধিদাতা। তাঁকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজো এমন অনুষ্ঠান টিকে রয়েছে যা থেকে আমাদের এই বর্তমান যুক্তিটির উপর প্রভূত আলোকপাত হতে পারে। আমাদের যুক্তি হলো, কৃষিআবিষ্কার মেয়েদের কাজ আর তাই কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে মানব-সমাজে মাতৃপ্রাধান্য দেখা দিয়েছিলো। আমাদের দেশে গণেশচতুর্থী নামের একটি ব্রত অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। এ-অনুষ্ঠান স্পষ্টই কৃষি-কেন্দ্রিক। এবং এ-অনুষ্ঠানের মধ্যে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় যে, পুরুষ-দেবতা ম্লান হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর জায়গায় দেখা দিচ্ছেন এক নারী—গৌরী। আমাদের আলোচনায় তাই ব্রতটির সাক্ষ্য খুবই চিত্তাকর্ষক হবে।

গণেশচতুর্থী ব্রতের কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যাবে নগেন্দ্রনাথ বসু[৩৩৭] সংকলিত 'বিশ্বকোষ'-এ। পূর্ণতর বিবরণের জন্যে ১৯০৬ সালের ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বি. এস্. গুপ্তের[৩৩৮] প্রবন্ধ পড়ে দেখা দরকার। প্রধানত তাঁরই প্রবন্ধের উপর নির্ভর করে আমরা এখানে অগ্রসর হবার চেষ্টা করবো।

ব্রতটি এখন প্রধানতই দক্ষিণাপথবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। বোম্বাই ও পুণা অঞ্চলে এই উপলক্ষ্যে বিশেষ ধুমধাম হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাদের বাংলাদেশের সঙ্গে এই ব্রতের কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে কিছুটা নামান্তরের ও কিছুটা রূপান্তরের আড়ালে এই ব্রতই আমাদের অঞ্চলেও বর্তমান রয়েছে। সে-কথায় পরে ফেরা যাবে।

ব্রতটি একদিনে উদ্‌যাপিত হয় না। সাতদিন ধরে একটানা এর অনুষ্ঠান চলে। কিন্তু মজা হলো, যদিও গণেশের নাম থেকেই ব্রতটির নামকরণ হয়েছে এবং যদিও ব্রত অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে থাকতেই গণেশকে নিয়ে বেশ কয়েকদিন অনেক রকম সমারোহ করা হয়, তবুও আসল অনুষ্ঠানের মধ্যে খোদ গণেশকে দেখতে পাওয়া যায় মাত্র প্রথম দু'-একদিন। বাকি ক'দিনের অনুষ্ঠানটির মধ্যে গণেশের কোনো স্থান নেই। হালকা ভাষায় বললে বলা যায়, প্রথম দু'-একদিনের মধ্যেই সিদ্ধিদাতার যেন সুবুদ্ধি দেখা দেয় ; কৃষিকেন্দ্রিক এই অনুষ্ঠানটিকে নেহাতই মেয়েলি ব্যাপার বলে চিনতে পেরে তিনি বিদায় নেন দৃশ্যপট থেকে। তাঁর জায়গায়, ব্রতের কেন্দ্রে, এসে দাঁড়ান গৌরী। ফলে গণেশচতুর্থী-ব্রতের বেশির ভাগটাই হয়ে দাঁড়ায় গৌরী-ব্রত।

ভাদ্র মাসের চতুর্থী তিথিতে গণেশ-চতুর্থী ব্রতের শুরু। ওই দিনটিই বুঝি গণেশের জন্মদিন। পুণা ও বোম্বাই অঞ্চলে আজকাল অবস্থাপন্ন বাড়িতে গণেশমূর্তি কিনে এনে এই দিনটিতে মহা সমারোহে গণেশ-পুজো হয়। বলাই বাহুল্য, অবস্থাপন্ন পরিবারের সমারোহের মতোই এই পুজোপাঠের ব্যাপারটাও অবশ্যই অর্বাচীন। হয়তো তার আড়াল থেকে গণেশচতুর্থী ব্রতের প্রথম দিনকার অনুষ্ঠানের আদি ও অকৃত্রিম রূপটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। দুঃখের বিষয়, ইণ্ডিয়ান-এ্যান্টিকোয়ারির প্রবন্ধ-লেখকও গণেশকে কৃষি-উৎসবের প্রতীক বলে প্রমাণ করবার ভ্রান্ত আগ্রহে (ভ্রান্ত কেন, সে-কথা একটু পরেই তোলা যাবে) গণেশচতুর্থী ব্রতের প্রথম দিনকার বর্ণনাটি দিতে ভুলে গিয়েছেন।

দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ ভাদ্র পঞ্চমীর দিনই, গণেশের বিসর্জন।

এইভাবে, ব্রত অনুষ্ঠানের কেন্দ্র থেকে গণেশ বিদায় গ্রহণ করবার পর ব্রতটির তাৎপর্য স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে।

ভাদ্র ষষ্ঠীর দিন ভোর বেলাতেই মেয়েরা বেরিয়ে পড়ে একরকম শাকের গুচ্ছ সংগ্রহ করে আনতে। শাকগুলি উপড়ে কাপড়ে জড়িয়ে কুলোয় করে বাড়ি আনা হয়। তারপর, বাড়ি এনে সেগুলিকে ওই অবস্থায় চৌকির উপর স্থাপন করে চৌকির নিচে সিঁদুর দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। সন্ধ্যার দিকে এই কলা-বৌ মূর্তিটির পাশে এসে বসে একটি কুমারী মেয়ে। সধবারা পরস্পরকে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। তারপর, কলা-বৌকে নিয়ে বাড়ির ঘরে ঘরে ঘোরা হয়। সঙ্গে চলে কুমারী মেয়েটি। প্রত্যেকটি ঘরেই প্রশ্ন করা হয়, "গৌরী, গৌরী, কী এনেছো তুমি ? কী দেখছো তুমি ?" উত্তরে কুমারী মেয়েটি গৌরীর হয়ে জবাব দেয়, সে এনেছে প্রচুর ঐশ্বর্য, সে-দেখছে প্রচুর ঐশ্বর্য। কিন্তু শুধু ওই মুখের কথাটুকুই যথেষ্ট নয়। গৌরী যে এসেছিলেন, সত্যিই ঘরে ঘরে ঐশ্বর্য দিয়ে গিয়েছেন—

এ-বিষয়ে একটা চাক্ষুষ প্রমাণও এঁকে দেওয়া হয়। দোরগোড়ায় আঁকা হয় গৌরীর পায়ের আলপনা। ঠিক আমাদের বাংলা দেশের লক্ষ্মীপুজোর মতোই। এবং এই পায়ের আলপনার দিকে নজর করলে বোঝা যায় আমাদের লক্ষ্মীব্রতের মতোই এই গণেশচতুর্থী ব্রতের মূলেও রয়েছে প্রভূত শস্যের কামনা।

ভাদ্র সপ্তমীর দিন মেয়েরা চরকায় কাটা সুতো থেকে নিজের নিজের দৈর্ঘ্যের ষোলোগুণ করে লম্বা মাপের সুতো নেয় এবং কলা-বৌ-এর পাশে সুতোগুলি রেখে দেয়। পরের দিন ওই সুতো তুলে তাতে ষোলোটি করে গিঁট দিয়ে, হলুদ রং-এ ছুপিয়ে, ভাঁজ করে মেয়েরা গলায় পরে। তাছাড়া, ষোলোটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালে, ষোলোটি তিল এবং ষোলোটি ধান রাখে কলা-বৌ-এর সামনে। এই "ষোলো" সংখ্যাটির দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। কেননা, এই সংখ্যাটিকেই দেখতে পাওয়া যায় বাংলা দেশের আর একটি কৃষি-কামনামূলক ব্রততেও। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩৬৯] লিখছেন,

> পুর্ববঙ্গের তারাব্রতে একটি ছড়ায় আমরা পাই:
>
> ষোল ষোল বর্তির হাতে ষোল সরা দিয়া,
> মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া।

ষোলো কেন? ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারির বর্ণনাদাতা[৩৭০] বলছেন,

> The sixteen knots and the sixteen folds of the skein turned into a necklace suggests the number of weeks a rice-crop takes to grow.

অর্থাৎ কিনা, মানব-অগ্রগতির কোনো এক পিছনে-ফেলে-আসা-পর্যায়ে এই হলো মেয়েদের কাছে দিন গোনবার কৌশল। স্বভাবতই, গণেশচতুর্থী ব্রতের পঞ্চম দিনটিতে মেয়েরা ওই যে হলুদ-ছোপানো সুতোর হার গলায় পরলো সে-হার তারা খুলবে ফসলের সময় এলে—ষোলো সপ্তাহ পরে। আর তারা এই হারটির নাম দেয় মহালক্ষ্মী—গণেশচতুর্থী ব্রতের সঙ্গে বাংলা দেশের লক্ষ্মী ব্রতের মিল নানান দিক থেকে। শস্যের কামনায় অনুষ্ঠিত বাংলা দেশের আর একটি ব্রতের উল্লেখ আমরা করেছি—তার নাম শস্পাতার ব্রত (পৃঃ ১৫০)। এবং সেই প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ হলো নাচ—মেয়েদের নাচ। অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায়, "সমস্ত রাত দুই দলের নাচগান ছড়াকাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারার ঝিকিমিকি।" গণেশচতুর্থী ব্রতের বেলাতেও এই নাচ,—মেয়েদের নাচ,—বাদ যায় না। ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারির বর্ণনাদাতা বলছেন, ভাদ্র সপ্তমীর দিনটিতে মেয়েরা

দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘোরে, তারপর পাড়ার মেয়েরা সকলে মিলে রাতভোর নাচ আর গান করে।

এই নাচগানকে আধুনিক অর্থে অবসর-বিনোদন মনে করলে একেবারেই ভুল করা হবে। সমাজ-বিকাশের পুরোনো পর্যায়ে নাচ-গান খাদ্য-আহরণ বা খাদ্য-উৎপাদন-মূলক কৌশলেরই অঙ্গ। দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখা যায় শুম্বা মেয়েরা[৩১১] তাদের নাচ শেষ হবার আগে এমন কি কোদাল-গুলো স্পর্শ পর্যন্ত করবে না। মিসেস্ ব্রায়ন্ স্কট[৩১২] বলছেন, উত্তর বোর্নিওতে ডাইকদের মধ্যে কৃষিকাজকে একঘেঁয়ে একটানা শ্রমের ব্যাপার বলে মনে করলে ভুল করা হবে, কেননা তার ফাঁকে ফাঁকে নানান উৎসবের অবকাশ থাকে। আমেরিকার চেইন্নে-ইণ্ডিয়ানদের[৩১৩] বেলাতেও দেখা যায় কৃষিকাজের একটি অনিবার্য অঙ্গ হলো মেয়েদের ফসল-নাচ: তরুণী ও যুবতীর দল গোল হয়ে নাচ শুরু করে, পুরুষেরা ধরে গান—যে-মেয়েটি নাচের প্রধান অংশ গ্রহণ করে তার হাতের লাঠির ডগায় শস্যের গুচ্ছ বা বাঞ্ছিত ফসল বাঁধা থাকে। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, অন্ন-আহরণের প্রসঙ্গে এই নাচের তাৎপর্যটা কী (পৃঃ ১৪৭-১৫০)।

গণেশচতুর্থী ব্রতের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। ব্রত-অনুষ্ঠানের শেষে শাকের-উপর-কাপড়-জড়ানো গৌরীমূর্তিটিকে মেয়েরা নদীতে বিসর্জন দিয়ে আসে এবং আসবার সময় নদীর কিনারা থেকে পলিপড়া মাটি মুঠোয় করে নিয়ে আসে, ধানের গোলার উপর আর ক্ষেতের উপর ছিটিয়ে দেয়। ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারির বর্ণনাদাতা বলছেন, এবং ঠিকই বলছেন, এ-অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য খুব সম্ভব এই যে, শুরুতে নদীর কিনারার ওই পলিপড়া জমিতেই শস্যের উদ্গম হতো এবং এইভাবে ওই উর্বর মাটি ছিটোবার পিছনে যে-জাদুবিশ্বাস তা হলো মাটির উর্বরতার স্পর্শে ফসলের প্রাচুর্য পাবার আশা।

বলাই বাহুল্য, গণেশচতুর্থী ব্রতটিকে এইভাবে শস্যের কামনায় অনুষ্ঠিত ব্রত হিসেবে ব্যাখ্যা করে ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারির প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত গুপ্তে আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান যুক্তির পক্ষে তাঁর ব্যাখ্যায় যেটা আসল দুর্বলতা তারই আলোচনা বোধহয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। কেননা, এই ব্রত কৃষিকেন্দ্রিক বলেই পুরুষ গণপতি যে এখানে বাধ্য হয়ে অপ্রধান হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্রতটিকে ষোলো আনা মেয়েলি ব্যাপার হতে দিয়ে অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিয়েছেন—সে-কথা শ্রীযুক্ত গুপ্তের চোখে ধরা পড়তে চায়নি। বরং তিনি ঠিক উল্টো প্রচেষ্টাই করছেন। কৃষিকেন্দ্রিক ওই ব্রতটির নামের সঙ্গে গণেশের সম্পর্ক দেখে তিনি চেষ্টা করছেন গণেশকে একান্তই

ফসলের দেবতা বলে প্রমাণ করবার। শ্রীযুক্ত গুপ্তে একবার[৩১৪] বলছেন, ফসল কাটার পর ফসলের বোঝা মাথায় করে কৃষক যখন মাঠ থেকে ফেরে তখন দূর থেকে মনে হয় মানুষের শরীরের উপর হাতির প্রকাণ্ড মাথা; এর থেকেই গণেশ মূর্তির উদ্ভব। আবার, অন্যত্র[৩১৫] তিনি বলছেন, দু'দিকে কুলো বসিয়ে মাঝখানে ধানের শিষ আর লাঙলকে এমনভাবে সাজানো যায় যে, দেখতে অনেকটা হাতির মাথার মতোই মনে হয়—এর থেকেই গণেশ-মূর্তির উদ্ভব হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এ-জাতীয় কল্পনা উদ্ভট ও কৃত্রিম। এবং কৃষি-কেন্দ্রিক ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরুষমূর্তির স্থান থাকা যে সত্যিই অস্বাভাবিক, সে-বিষয়ে খেয়াল রাখেননি বলেই শ্রীযুক্ত গুপ্তে[৩১৬] উপসংহারে বলছেন: "এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গণেশের সঙ্গে মেক্সিকোর শস্যদেবী, টঙ্গা-দ্বীপের আলো-আলো, গ্রীকদের ডিমিটর এবং রোমানদের সিরিস্-দেবীর তুলনা করা যায়।" কিন্তু আসল কথা হলো, তুলনা করা যায় না। কেননা, পুরুষের সঙ্গে নারীর তুলনা করা চলে না: উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত প্রত্যেকটি নাম কৃষিকেন্দ্রিক বলেই অনিবার্যভাবে দেবী-নাম, মাতৃমূর্তি—কেবল গণেশ নন। শ্রীযুক্ত গুপ্তে যদি গণেশচতুর্থী নামটুকুর উপরই অমনভাবে আটকে না যেতেন তাহলে অনায়াসেই দেখতে পেতেন, নামে গণেশচতুর্থী হলেও এই কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরুষ গণেশও গণেশ-জননীর জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ কৃষিকেন্দ্রিক এই অনুষ্ঠানে পুরুষ যে কী ভাবে অপ্রধান হয়ে গিয়েছে তার নমুনা শ্রীযুক্ত গুপ্তের বর্ণনা[৩১৭] থেকেই পাওয়া অসম্ভব নয়:

> In regard to the chief goddess, Gowri, the Goddess of the Harvest, one great peculiarity remains to be mentioned, She is supposed to have been followed secretly by her husband, Siva, who remains hidden under the outer-fold of her *sari,* and is represented by a *lota* covered by a cocoanut and filled with rice carefully measured...
>
> অর্থাৎ, ওই শস্যদেবী গৌরী সম্বন্ধে একটা খুব বড়ো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ বাকি আছে। কল্পনা করা হয়, তাঁর স্বামী শিব লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে অনুগমন করছেন। শিব ঢাকা থাকেন গৌরীর শাড়ির আঁচলে এবং একটি ঘটির মধ্যে চাল দিয়ে ও ঘটির মুখে নারকেল ঢাকা দিয়ে এই শিবের প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়।

ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের রচনায় আমরা দেখেছি, আমাদের দেশে পিতৃপ্রাধান্য ও মাতৃপ্রাধান্য অর্থে বীজপ্রধান ও ক্ষেত্রপ্রধান শব্দ ব্যবহৃত হতো। মাতৃপ্রধান এই গণেশচতুর্থী ব্রতের বেলায় দেখছি,

পুরুষকে সত্যিই বীজপূর্ণ ঘট বলেই কল্পনা করা হচ্ছে—এবং বীজ অপ্রধান, গৌরীর শাড়ির আঁচলে ঢাকা রয়েছে।

কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানটিতে এইভাবে পুরুষের ভূমিকা 'অপ্রধান' এবং 'উদাসীনে'র মতো হয়ে যাওয়ার সঙ্গে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার এবং সাংখ্য দর্শনের কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে কি না—এ-প্রশ্নে আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করবো।

বার্তাশস্ত্রোপজীবী পর্যায়ে গণপতির নবরূপ

তাহলে, কৃষিকেন্দ্রিক এই ব্রতটির বিশ্লেষণ থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, ব্রতটির মূল অনুষ্ঠানটুকুর মধ্যে পুরুষপ্রাধান্যের বদলে নারী-প্রাধান্যেরই বিকাশ ঘটছে। অথচ, ব্রতটির অন্তত নামের মধ্যে থেকে গণপতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হননি। অন্যান্য দৃষ্টান্তের বেলায় দেখা যায়, বার্তা-শস্ত্রোপজীবী পর্যায়ে পৌঁছেও গণেশের পুরুষাকৃতিটি বিলুপ্ত বা নিশ্চিহ্ন হচ্ছে না—পুরোনো পর্যায়ের রেশটুকু নবপর্যায়ে পৌঁছাবার পর সব সময়েই যে সম্পূর্ণভাবে মুছে যাবে তা মনে করা ঠিক নয়। তার বদলে প্রায়ই দেখা যায়, নতুন পর্যায়েও পুরোনো পর্যায়ের রেশটা থেকে গিয়েছে। তবু সেইটুকুই বড়ো কথা নয়। আসলে বড়ো কথা হলো, নবপর্যায়ে উপনীত হবার পর এ-পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য অনিবার্যভাবেই ফুটে উঠতে বাধ্য। বার্তাশস্ত্রোপজীবী পর্যায়ে গণপতির পুরোনো পুরুষরূপটা অনেক ক্ষেত্রে টিকে থাকলেও, দেখা যায় নবপর্যায়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এই রূপটির সঙ্গে অনিবার্যভাবেই সংযোজিত হচ্ছে। এখানে তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করা যাক।

পাশ এবং অঙ্কুশকে আয়ুধজীবী পর্যায়েরই স্বাভাবিক আয়ুধ মনে করা দরকার; শিকার ছাড়া এই জিনিস দুটি আর কোনো কাজে লাগে না। স্বভাবতই, কৃষিবৃত্তির পটভূমিতে এই আয়ুধ দুটির গুরুত্ব গৌণ। তার বদলে এ-পর্যায়ে গণেশের হাতে এমনতরো বস্তুই প্রাসঙ্গিক হবে যা কিনা উর্বরা-শক্তির প্রতীক। গণেশের পরিকল্পনায় সত্যিই সে-রকম বস্তু সংযোজিত হতে দেখা যায় কি?

বালগণপতি[৩১৮] হিসেবে গণেশের যে-পরিকল্পনা তার বেলায় দেখা যায় গণেশের হাতে পাশ বা অঙ্কুশ কিছুই নেই। তার বদলে রয়েছে, আম, কলা, আখ, কাঁঠাল। ভক্তিবিঘ্নেশ্বর[৩১৯] হিসেবে গণেশকে কল্পনা করবার সময়

তাঁর হাতে নারকেল, আম, গুড় এবং পায়েস দেবার নির্দেশ। এখানেও তাহলে গণেশ শিকারজীবীদের অস্ত্র ফেলে কৃষিজাত সামগ্রীই গ্রহণ করছেন। আধুনিক পণ্ডিতদের[৩৮০] মতে, গণেশের এই নবলব্ধ সম্পদগুলির মধ্যে নারকেল ইত্যাদি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই উর্বরা-শক্তির প্রতীক। আবার অন্যত্র—যেমন লক্ষ্মীগণপতি ও মহাগণপতির পরিকল্পনায়[৩৮১]—দেখা যায় পাশ আর অঙ্কুশ একেবারে বর্জন না করলেও গণেশের হাতে এসেছে পদ্ম, পূর্ণকুম্ভ, কল্পকলতা, ধানের শিষ আর ডালিম ফল। এগুলি সবই উর্বরা-শক্তির প্রতীক[৩৮২] অতএব বার্তাশস্ত্রোপজীবী পর্যায়ের পক্ষেই প্রাসঙ্গিক—সে-পর্যায়েরই অবদান।

এগুলির মধ্যে বিশেষ করে একটি প্রতীক নিয়ে আলোচনা তুলবো। ডালিম-ফল। গণেশের হাতে এ-ভাবে ডালিম-ফল দেখা দেবার তাৎপর্যটা কী?

এই ডালিম-ফল যদি শুধুমাত্র গণেশের হাতেই দেখা যেতো তাহলে এর তাৎপর্যকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে না করলেও হয়তো চলতো। কিন্তু আসলে তা নয়। এই ফলটিকেই আমাদের দেশের নানান দেবদেবীর[৩৮৩] হাতে দেখতে পাওয়া যায়। আর শুধু আমাদের দেশেই বা কেন? দেশান্তরের দেবদেবীদের সঙ্গেও এই রক্তবর্ণ-বহুবীজ ফলটির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রাচীন গ্রীসের ডিমিটর-দেবীর[৩৮৪] প্রায় সমস্ত মূর্তিতেই দেখতে পাওয়া যায় তাঁর হাতে ডালিম ফল রয়েছে। একই বৈশিষ্ট্য দেবী এথেনার—রোমানরা যাঁকে দেবী মিনার্ভা বলে কল্পনা করেছিলো। এথেন্স-এ পাওয়া মূর্তিতে দেখা যায় তাঁর হাতে এই ফলটিই রয়েছে[৩৮৫]। অলিম্পিয়ায় পাওয়া মিলন্-এর[৩৮৬] মূর্তিতেও একই চিহ্ন; মিলন ছিলেন দেবী হেরা-র পুরোহিত। আর্গস্-এ পাওয়া হেরার মূর্তিতেও দেখা যায় তাঁর হাতে রয়েছে ডালিম-ফল[৩৮৭]।

এখানে বিশেষ করে গ্রীক ইতিহাস থেকেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো। কেননা, প্রাচীন গ্রীক সমাজ-এর আলোচনা প্রসঙ্গেই অধ্যাপক জর্জ টম্সন এই ডালিম ফলের তাৎপর্যটি নির্ণয় করেছেন। আমাদের যুক্তি হলো, প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির আলোচনা-প্রসঙ্গে এই ডালিম-রহস্য যদি স্পষ্ট-ভাবে জানতে পারা গিয়ে থাকে তাহলে তারই সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজো যা অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে তার তাৎপর্য অনুসন্ধান করা অসম্ভব নাও হতে পারে। অতএব এই ডালিম-ফলের তাৎপর্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক জর্জ টম্সন[৩৮৮] কী বলছেন তাই দেখা যাক।

প্রাচীন পরিব্রাজক পৌসানিয়াস্-এর কাছ থেকে প্রাচীন গ্রীক সমাজ সংক্রান্ত নানা খবর পাওয়া যায়। কিন্তু ডালিম-ফলের রহস্য উদ্ঘাটন করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত: 'ডালিমের কথা আমি বিশেষ কিছু বলবো না, কেননা তার

রহস্য অত্যন্ত গোপন।' অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন প্রশ্ন তুলছেন, গোপন রহস্যটা কী রকম্‌?

ডালিম-ফলের ভিতরটা টুকটুকে লাল। ডালিমের দানা থেকেই গ্রীক ভাষায় রক্তবর্ণসূচক শব্দটি এসেছে। ডালিম তাই রক্তের প্রতীক। এ-কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু রক্তের তাৎপর্য এখানে ঠিক কী?—এ-প্রশ্নের সমাধান ঠিকমতো করা হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন, খুন বা অপঘাত-মৃত্যুর সঙ্গেই এ-রক্তের সম্পর্ক। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে টাইটানরা ডাইওনিসাস্‌কে হত্যা করলে পর তাঁরই রক্ত থেকে ডালিম গাছের জন্ম হয়। এ-ছাড়াও মৃত্যু ও অপঘাতের সঙ্গে ডালিম-এর সম্পর্ক আরো কোনো কোনো দিক থেকে পাওয়া যায়: প্রাচীনদের বিশ্বাস অনুসারে ডালিমের স্বপ্ন অপঘাতের সূচনা করে। কিন্তু অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন দেখাচ্ছেন, রক্ত ও রক্তবর্ণের প্রতীক ডালিমের এই অনুষঙ্গগুলি মুখ্য নয়,—গৌণ। অর্থাৎ এগুলির পিছনে একটি মুখ্য তাৎপর্য আছে—সেই তাৎপর্যেরই আলোচনা তুলতে পৌসানিয়াসের সংকোচ হয়েছে।

ডালিম হলো রক্তের প্রতীক। কিন্তু কোন ধরনের রক্ত? প্রাচীন গ্রীক বৈদ্যশাস্ত্র থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। গ্রীক বৈদ্যরা ঋতু ও গর্ভ ব্যাপারেই ডালিম ব্যবহার করবার নির্দেশ দিয়েছেন। এই কারণেই, কোনো কোনো গুহ্য-সম্প্রদায়ের কাছে ডালিম ছিলো 'টাবু': ঋতু-রজকে প্রাচীন কালের মানুষেরা 'টাবু' মনে করতেন। থেস্‌মোফোরিয়া-উৎসবের সময় মেয়েদের পক্ষে শুধুই যে মৈথুন নিষিদ্ধ ছিলো তাই নয়; সেই সঙ্গে ডালিমও ছিলো নিষিদ্ধ। আর সেই সঙ্গে নির্দেশ ছিলো, তাদের শ্বেত-শয্যায় শুতে হবে, কেননা এই শ্বেত-শয্যার দরুন তাদের কামভাব সংহত থাকবে এবং তাছাড়াও শয্যার কাছে সাপ আসতে পারবে না। (প্রাচীনদের কল্পনা অনুসারে সাপের সঙ্গেও মেয়েদের যৌন-জীবনের যোগাযোগ আছে। *c.f.* 'সাপের স্বপ্ন দেখলে ছেলে হয়'।) অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন তাই সিদ্ধান্ত করছেন, শ্বেত-শয্যা যদি মেয়েদের রতিবাসনার প্রতিষেধক বলে বিবেচিত হয় তাহলে সেইসঙ্গেই ডালিম-পরিহারের নির্দেশ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই ডালিম রতিবাসনার উদ্দীপক বলেই বিবেচিত হয়েছিলো। আর তাই, ডালিম যে-রক্তের প্রতীক সে-রক্তের আদি-তাৎপর্য আঘাত-জাত রক্ত নয়; নারীর যৌন-জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত রক্ত—ঋতু-রজ। প্রাচীনদের কল্পনা অনুসারে, নারীর উৎপাদিকা-শক্তির মূলে রয়েছে এই ঋতুরজই। এবং এই ঋতুরজের সঙ্গে সাদৃশ্যের দিক থেকেই ডালিম তাদের কাছে উর্বরতার প্রতীক। পৌসানিয়াস যে কেন ডালিমের রহস্য ব্যাখ্যা করতে সংকোচ বোধ করেছিলেন তা বুঝতে পারাও তাই কঠিন নয়।

এদিক থেকে মনে হয় কৃষিকেন্দ্রিক ওই ব্রতটিকে ষোলো আনা মেয়েলি ব্যাপার হবার সুযোগ দিয়ে অনুষ্ঠানের কেন্দ্র থেকে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের গণপতি শোভন কাজই করেছিলেন। অন্যত্র, বার্তাশস্ত্রোপজীবী পর্যায়ের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে তিনি পুরুষ হয়েও যখন সংস্রব ছাড়তে রাজি হন না তখন তাঁর আচরণ সত্যিই অশোভন এবং অসংলগ্ন হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, গণেশের হাতে ঋতুরজের ওই প্রতীকটি। কিংবা, ওই ডালিমের রহস্যের সূত্র ধরেই আরো অগ্রসর হলে আরো অশোভনতার এবং অসংলগ্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। সে-অসংলগ্নতার প্রকৃত কারণ বুঝতেও তেমন অসুবিধে হবার কথা নয়। কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার, কৃষিকেন্দ্রিক প্রাচীন অনুষ্ঠান তাই নারীজীবনের নানারকম গোপন ও গভীর রহস্যের সঙ্গে জড়িত।

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, রক্ত বর্ণের সঙ্গে নানাদিক থেকে গণেশের নানারকম সম্পর্ক রয়েছে। সিঁদুরের নাম গণেশ-ভূষণ। অথচ, এই ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতেই অশোভন এবং অসংলগ্ন। কেননা এই সিঁদুর সধবাদেরই সিঁথির ভূষণ। সিঁদুরের তাৎপর্যটা কী? এই প্রশ্নের উত্তরেও অধ্যাপক জর্জ টম্সন বহু তথ্য পর্যালোচনা করে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তারই উল্লেখ করা যাক। অধ্যাপক টম্সনের মন্তব্য প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নানা মৌলিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করবে। তাই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি অবান্তর হবে না[৩৮৯] :

> It is important to observe that the magic of human fecundity attaches to the process, not to the result—to the lochial discharge, not to the child itself; and consequently all fluxes of blood, menstrual as well as lochial, are treated alike as manifestations of the life-giving power inherent in the female sex. In primitive thought menstruation is regarded, quite correctly, as a process of the same nature as childbirth.
>
> This magic is ambivalent. Its potency makes it something to be dreaded......From one aspect the woman who may not be approached is inviolable, holy; from another aspect she is polluted, unclean. She is what the Romans called *sacra*, sacred and accursed. And hence in patriarchal society, after woman has lost her control of religion, it is the negative aspect that prevails......
>
> These ideas are universal. There is no sphere of human life in which a greater uniformity can be observed than in the treatment of menstrual and puerperal women. The subject is

discussed at length by Briffault, who has collected examples from every branch of human race and every stage of culture.......

Aristotle, Pliny, and other naturalists, ancient and medieval, believed that the embryo is formed from the blood retained in the uterus after the stoppage of menstruation. This is the blood of life. Hence the commonest method of placing persons or things under a taboo—menstrual, lochial, or any other interdict formed on this original pattern—is to mark them with blood or the colour of blood. And in keeping with the ambivalent nature of the taboo itself, this sign of blood has the double effect of forbidding contact and imparting vital energy. It is a worldwide custom for menstruating or pregnant women to daub their bodies with red ochre, which serves at once to warn the men away and to enhance their fertility. In many marriage ceremonies the bride's forhead is painted red—a sign that she is forbidden to all men save her husband and a guarantee that she will bear him children. This is the origin of cosmetics. Among the Valenge, a Bantu tribe, every woman keeps a pot of red ochre, which is sacred to her sex and used to paint her face and body for ceremonial purposes. Of the many occassions for which she needs it, the following may be noted. At the end of her confinement both mother and child are anointed with it: in this way the child will live and the mother is restored to life. At initiation the girl is painted red from head to foot: so she is born again and will be fruitful. At the conclusion of mourning, after stepping over a fire, the widow is painted the same colour: so she returns from the contamination of death.

Red is renewal of life. That is why the bones from upper palæolithic and neolithic interments are painted red. The symbolism becomes quite clear when we find, as we commonly do, that the skeleton has been laid in the contracted or uterine posture. Smeared with the colour of life, curled up like a babe in the womb—what more could the primitive man do to ensure that the soul of the departed would be born again ?

অর্থাৎ, (স্বাধীন-তর্জমা) : মানুষের সন্তান-উৎপাদন সংক্রান্ত জাদুবিশ্বাস, ফলাফলের বদলে ফলপ্রসূ পদ্ধতিটির সঙ্গে—সন্তানের বদলে ঋতু ও লোকিয়া-স্রাবের সঙ্গে —সংযুক্ত। ফলে ঋতু ও লোকিয়া সমস্ত স্রাবকেই কল্পনা করা হয় নারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রাণদায়িনী শক্তির বিকাশ হিসেবে। আদিম ধ্যানধারণা অনুসারে ঋতুস্রাব সন্তানের জন্মদানের সমতুল্য পদ্ধতি বলেই বিবেচিত। এই জাদুবিশ্বাসের মধ্যে আত্মবিরোধ আছে: রক্তের ওই শক্তিই আবার তাকে ভয়াবহ করে তোলে। একদিক থেকে ঋতুমতী নারী এতো পবিত্র যে, তাকে স্পর্শ করা চলে না। অপর দিক থেকে সে কলুষিত, অস্পৃশ্য। তার অবস্থা হলো, রোমানরা যাকে বলতো *sacra*—পবিত্র আর ঘৃণিত দুই-ই। ফলে পুরুষপ্রধান সমাজে ধর্মাচরণের উপর মেয়েদের অধিকার লুপ্ত হবার পর এই জাদুবিশ্বাসের নেতিমূলক দিকটিরই জয় হয়: ঋতুমতী নারী শুধুমাত্র কলুষিত বলেই বিবেচিত হয়।

এই ধারণাগুলি সার্বভৌম। ঋতুমতী ও প্রসবিনীদের প্রতি মনোভাব-সংক্রান্ত ধারণায় সবদেশের সবমানুষের মধ্যে যতোখানি মিল আছে আর কোনো বিষয়ে তা নেই। ব্রিফল্ট এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মানবজাতির সমস্ত শাখা ও মানব সংস্কৃতির সমস্ত পর্যায় থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন……

এ্যারিস্টটল্, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিজ্ঞানীদের ধারণায়, ঋতুস্রাব বন্ধ হবার পর গর্ভের মধ্যে ওই ঋতুরজ জমেই সন্তানের দেহগঠন করে। এই রক্তই হলো প্রাণদায়িনী রক্ত। তাই, কোনো মানুষ বা কোনো বস্তুর উপর 'টাবু' ধার্য করবার সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হলো, তার উপর রক্ত-চিহ্ন বা রক্ত-বর্ণ চিহ্ন দেওয়া—ঋতুস্রাব বা লোকিয়া-স্রাব বা তারই কোনো অনুকরণ থেকে এই ব্যবস্থার উৎপত্তি। টাবুটির অন্তর্নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুসারেই এই রক্তচিহ্নের দু'রকম তাৎপর্য: চিহ্নিত বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক-নিষেধ এবং প্রাণশক্তির সঞ্চার। সারা পৃথিবীতেই দেখা যায়, ঋতুমতীর অঙ্গে লালমাটির প্রলেপ লাগাবার ব্যবস্থা আছে—তার দরুন পুরুষদের দূরে রাখা ও উর্বরা-শক্তির বৃদ্ধি দুটো কাজই হবে। অনেক জায়গায় বিবাহানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে স্ত্রীর কপালে রক্ত-বর্ণ চিহ্ন দেবার ব্যবস্থা আছে—এ-চিহ্নের অর্থ, স্বামী ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পুরুষের কাছেই মেয়েটি নিষিদ্ধ হলো এবং স্বামীর কাছে সে সন্তানদানের জন্য প্রতিশ্রুত হলো। অঙ্গরাগের উৎস এই থেকেই। বান্টুদের একটি জাতির মধ্যে দেখা যায়, প্রতিটি মেয়েই একটি করে লালমাটির পাত্র রাখে; পাত্রগুলি মেয়েদের কাছে পবিত্র, অনুষ্ঠানের সময় এর থেকেই তারা মুখ ও অঙ্গ রঞ্জিত করে। নানা রকম অনুষ্ঠানেই তাদের কাছে এই পাত্রগুলির প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্য: আঁতুড়ঘরের পর্ব শেষ হবার সময় প্রসূতা ও সন্তান উভয়কেই এই লালরঙে রঞ্জিত করা হয়—এরই দরুন সন্তানটি বেঁচে থাকবে এবং মা ফিরে আসবে জীবিতদের মধ্যে। 'দীক্ষা'র (initiation) সময় মেয়েটির মাথা থেকে পা

পর্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা হয়: এইভাবেই মেয়েটি যেন নতুন জন্ম পেলো এবং এবার থেকে সে ফলবতী হবে। অশৌচাবস্থা শেষ হবার পর বিধবারা অগ্নি স্পর্শ করে এবং তাদের লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়: এইভাবেই সে মৃত্যুর ছোঁয়াচ থেকে ফিরে আসে।

রক্তবর্ণ হলো নবজীবন। তাইজন্যেই দেখা যায়, প্রাচীন প্রস্তর যুগের উচ্চাবস্থার এবং নব্যপ্রস্তর যুগের কবরখানা থেকে পাওয়া হাড়গুলিতে লাল রঙ মাখানো রয়েছে। প্রতীকটির অর্থ আরো স্পষ্ট হয় যখন দেখি,—এবং প্রায়ই তা দেখতে পাওয়া যায়,—কঙ্কালগুলি গুটোনো ভ্রূণাবস্থার ভঙ্গিতে রয়েছে। মৃতের নবজন্ম সুনিশ্চিত করবার আশায় আদিম মানুষেরা এইভাবে তাকে গর্ভস্থ শিশুর মতো কুঁকড়ে এবং জীবনের রঙে রঞ্জিত করে রাখবার চেয়ে বেশি আর কীই বা করতে পারতো?

অধ্যাপক টম্সনের রচনা থেকে এই উদ্ধৃতিটুকু আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। কেননা আমাদের দেশের নানান রকম আচার-অনুষ্ঠান এবং ধ্যানধারণাকে এইদিক থেকে বোঝবার সুযোগ হতে পারে। আমাদের দেশের সধবারা সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, গাণপত্যেরা কপালে রক্ততিলক আঁকে, তান্ত্রিকেরা কাষায় বস্ত্র পরে। ভিল-রা জমিতে চাষ করবার আগে এক-টুকরো পাথরের উপর সিঁদুর মাখায়, গণেশচতুর্থী ব্রত অনুষ্ঠানটিতেও দেখা যায় সধবা মেয়েরা পরস্পরকে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছে। বস্তুত, আমাদের দেশে সধবাদের অনুষ্ঠানে সিঁদুরের ব্যবহার ভূয়ঃপ্রচলিত। এর পিছনে একটি আদিম বিশ্বাস লুকোনো আছে: ওই রক্তবর্ণ ঋতুরজের, অতএব নবজন্মের, প্রতীক। ফলে এরই স্পর্শে সধবারা সন্তানবতী হবার কামনাকে সফল করতে চায়। রক্ত ও রক্তবর্ণের এই প্রতীক-তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা আগেই বলেছি, আনন্দগিরি উচ্ছিষ্ট-গণপতির অনুচরদের বর্ণনায় "রুধিরবাহুল্য" বলে যে-শব্দ ব্যবহার করেছেন তার আদি-তাৎপর্য নিছক বীভৎসতা না হতেও পারে। তান্ত্রিক ধ্যানধারণার আদি-তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে এই ঋতুরজের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

বলাই বাহুল্য, আধুনিক-রুচিসম্পন্ন হিন্দুদের কাছে ঋতু-রজের এই জাতীয় আলোচনা কদর্য এবং রুচি-গর্হিত বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু তাঁরা এই প্রসঙ্গেই কামরূপ-কামাখ্যার কথা মনে রাখতে পারেন। কামাখ্যা যোনি-পীঠ। কালিকাপুরাণ মতে, "কুব্জিকা নামক পীঠস্থানে দেবীর যোনিমণ্ডল পতিত হইল। সেই যোনিমণ্ডল পতিত হইয়াই প্রস্তর হইয়াছিল, তাহাই কামাখ্যা দেবী নামে বিখ্যাত হইয়াছে।...এই যোনিমণ্ডলের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ২১ অঙ্গুলি এবং প্রস্থে এক বিতস্তি (½ হাত), উহা সিঁদুর ও কুমকুমাদি লেপিত"[৩১]। এই সিঁদুর ও কুমকুমের রহস্যটা বুঝতে পারা যাবে

যোগিনীতন্ত্র থেকে: "দেবী কামাখ্যা প্রতিমাসে এই স্থানে রজস্বলা হইয়া থাকেন"[৩৯১]।

অবশ্যই এই কামরূপ কামাখ্যার অঞ্চল থেকে মাতৃপ্রাধান্য আজো সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি[৩৯২]। তাছাড়া প্রবাদ আছে, ওদেশের মেয়েরা জাদু জানে—পুরুষদের ভেড়া করে রেখে দেয়। এ-প্রবাদ যে মাতৃপ্রাধান্য-সূচক সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই ওই অঞ্চল প্রসঙ্গে এ-জাতীয় ঘটনা খাপছাড়াও নয়। কিন্তু পুরুষ হয়েও হাতে ডালিম-ফল ধরে রাখার মতোই সিঁদুরকে আপন অঙ্গরাগ (গণেশভূষণ) করবার চেষ্টাটা গণেশের পক্ষে নিশ্চয়ই বিসদৃশ ও অশোভন। অর্থাৎ কিনা, এ-কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, কৃষিকেন্দ্রিক এই পরিস্থিতিটিতে পুরুষ গণপতির পক্ষে টিকে থাকবার চেষ্টাটা নেহাতই কৃত্রিম। গ্রীকদেবীদের হাতে ওই ডালিম-ফল কৃত্রিম নয়। কেননা, কৃষিআবিষ্কার মেয়েদের কাজ,—প্রাচীনতর পর্যায়ের ধ্যানধারণা অনুসারে মেয়েদের উর্বরা-শক্তির প্রভাবেই প্রকৃতির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মেয়েদের এই উর্বরা-শক্তির মূলে আছে ঋতুরজ। স্বভাবতই, কৃষিমূলক পরিস্থিতিতে মেয়েরা প্রধান, প্রকৃতি প্রধান—পুরুষ অপ্রধান, উদাসীন।

আর ঠিক সেই কারণেই আমাদের গণপতি যেন এই পর্যায়ে পৌঁছে নিছক পুরুষ হিসেবে আর টিকতে পারছেন না। তাঁর মূর্তির সঙ্গে একটি করে নারীমূর্তিও সংযুক্ত হচ্ছে। তারই নাম শক্তি। গণপতি আর এখন থেকে শুধু গণপতি নন, শক্তি-গণপতি।

এইভাবে আমরা স্বভাবতই ওই পুরুষ দেবতাটিকে ছেড়ে দেবীমাহাত্ম্যের আওতায় এসে পড়তে বাধ্য হলাম। এবং আমরা যে এইভাবে গণপতির সঙ্গ ছাড়তে বাধ্য হলাম তার কারণ আমরা পুরুষ-প্রাধান্যের আওতা থেকে নারী-প্রাধান্যের আওতায় এসে পড়েছি। তাই আলোচনাটা দেবদেবীকে উপলক্ষ্য করে হলেও নারী-প্রাধান্যের আওতায় আমরা যে এসে পড়লাম তার কারণটা আসলে আধ্যাত্মিক নয়—আধিভৌতিকই। অর্থাৎ কিনা, কৃষি-আবিষ্কার। এ-আবিষ্কার মেয়েদের। এ-আবিষ্কারের পর্যায়ে তাই মাতৃ-প্রাধান্য এবং ওই মাতৃ-প্রাধান্যের প্রতিবিম্ব হিসেবেই দেবী-প্রাধান্য।

আমাদের মূল আলোচনার দিক থেকে দেবী রহস্য অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন আছে। কেননা তা না হলে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার উৎস আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকবে। আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, কৃষি-আবিষ্কারের প্রাকৃত পর্যায়ের মধ্যেই দেবীরহস্য,—তথা তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণাগুলিকেও,—

বোঝবার মূলসূত্র পাওয়া যাবে। এবং আজকের দিনে এ-জাতীয় ধ্যানধারণা যতোখানিই বিকৃত বীভৎসতা বলে প্রতীয়মান হোক না কেন, কৃষি-আবিষ্কারের পটভূমিতে বিচার করলে এগুলিকে উদ্দেশ্যমূলক ও জীবন-সংগ্রামের সহায়ক বলেই চিনতে পারা যায়। উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছে মানুষ আজ প্রকৃতিকে ও প্রাকৃতিক নিয়মকানুনকে অনেক বাস্তব আর নির্ভুলভাবে জানতে শিখেছে। সেই উন্নততর জ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার করলে নিশ্চয়ই বোঝা যায়, পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের ধ্যানধারণাগুলি কতোখানি ভুল ও কাল্পনিক; কিন্তু ওই পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের ধ্যানধারণা সম্বন্ধে শুধুমাত্র এইটুকু জ্ঞানই পর্যাপ্ত নয়। কেননা, এই প্রসঙ্গেই আরো একটি প্রশ্ন বাকি থাকে: অতোখানি ভুল আর কাল্পনিক ধ্যানধারণাকেই এককালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অমন শ্রদ্ধা আর অটল বিশ্বাস নিয়ে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা কেন করেছিলেন? এ-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে, আজকের দিনেও যে-সব মানবদল আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের অবস্থায় আটকে পড়ে আছে তাদের বাস্তব অবস্থাটা বিচার করতে পারলে। এই পদ্ধতি অনুসারে অগ্রসর হলে আমরা দেখতে পাই, সে-পর্যায়ের মানুষদের দৈন্য কী রকম ভয়াবহ এবং অনিবার্যভাবেই ভয়াবহ: দৈন্যটা শুধুই জীবনযাপনের উপকরণ সংগ্রহের দিক থেকে নয়, প্রাকৃতিক রহস্যকে অনুমান করবার দিক থেকেও। সে-পর্যায়ের আধা-অসহায় মানুষগুলি প্রকৃতিকে যেটুকু আয়ত্তে এনেছে তার উপর নির্ভর করে এর চেয়ে সচ্ছল জীবন গড়ে তোলা সম্ভবই ছিলো না; এবং প্রকৃতির রহস্য সংক্রান্ত তাদের যেটুকু অন্তর্দৃষ্টি তাও ওইভাবে প্রকৃতিকে বশে আনবার অনুপাতেই সংকীর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু মানব-উন্নতির কাহিনী সরলরেখার মতো একমুখে একটানা এগিয়ে-যাওয়া নয়; পিছনের পর্যায়কে পিছনে ফেলে আসবার জন্য মানুষকে যে-মূল্য চোকাতে হয়েছে তার গুরুত্বটাও উপেক্ষা করবার নয়। সেই যৌথ-জীবনের পটভূমিতে মানুষের ধ্যানধারণা আর জীবন সংগ্রাম,—জ্ঞান আর কর্ম—দু'-এর মধ্যে প্রভেদ দেখা দেয়নি। এবং জীবন-সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে মানুষের চেতনায় উদিত হয়েছিলো বলেই এই পর্যায়ের ধ্যানধারণা যতোই মূঢ় আর মূক হোক না কেন,—আজকের জ্ঞানের মাপকাঠিতে এই ধ্যানধারণাগুলিকে অসম্ভব আর আজগুবি বলে সনাক্ত করা যতোই সহজসাধ্য হোক না কেন,—এগুলি শেষ পর্যন্ত মাটির পৃথিবীটাকেই আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছে, লোকোত্তরবাদের আলেয়ায় ভুলিয়ে মানুষকে পথভ্রান্ত করেনি, মুখর হয়ে ওঠেনি দেহবিহীন আত্মার এক অলীক কাহিনী নিয়ে। তাই ঈশ্বর নয়, স্বর্গ-নরক নয়, পরলোক-পরকাল নয়, চেতন-কারণবাদ নয়। এককথায় অধ্যাত্মবাদ নয়, ভাববাদ নয়—কেননা, সমাজ-বাস্তবে কর্মজীবন

থেকে চেতনা যতোদিন না বিচ্ছিন্ন হচ্ছে ততোদিন সে-চেতনার স্বাধিকার-প্রমত্ততার কাহিনী প্রচারিত হবার মতো বাস্তব পরিবেশই সম্ভব হয় না। এবং এই স্বাধিকারপ্রমত্ততার কাহিনীই হলো অধ্যাত্মবাদ আর ভাববাদের সবচেয়ে মৌলিক, সবচেয়ে প্রাথমিক ভিত্তি। সেই প্রাকৃত-পর্যায়ের ধ্যানধারণাগুলি অব্যক্ত, অচেতন ও জ্ঞানের দৈন্যের দিক থেকে ভয়াবহ হলেও মূলতই প্রধানকারণবাদী, বস্তুবাদী এবং দেহাত্মবাদীই। এককথায়, সে-চেতনা লোকায়তিক,—যদিও এই লোকায়তিক চেতনা আমাদের দেশের ইতিহাসে চিরকালই ওই অব্যক্ত, অচেতন ও ভয়াবহ দৈন্যের স্তরে আটকে থাকেনি।

সেইসঙ্গেই আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, জীবন-সংগ্রামের সেই মূর্ত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই ধ্যানধারণাগুলিই যখন উত্তরকালের বিরুদ্ধ পরিবেশে, বিপরীত আবহাওয়ায়, টিকে থাকবার চেষ্টা করেছে তখন এগুলির আদি-তাৎপর্যটুকু অনিবার্যভাবেই বিপরীতে পর্যবসিত হতে বাধ্য হয়েছে। তারই নমুনা পাওয়া যায় আধুনিক যুগের তান্ত্রিক গ্রন্থাবলী ও অনুষ্ঠানাদির মধ্যে। এই কারণেই, তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার আদি-তাৎপর্য শুধুমাত্র তান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে অন্বেষণ করবার চেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। এ-জাতীয় সাহিত্যে সেই আদি-তাৎপর্যের অনেক স্মারক নিশ্চয়ই টিকে আছে ; কিন্তু এই স্মারকগুলিকে ঠিকমতো বুঝতে হলে কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায় সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে পারা তথ্যের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন। আমরা তাই আমাদের মূল পদ্ধতি অনুসারে এ-আলোচনার জন্যে বারবার পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যানধারণার উল্লেখ করতে বাধ্য হবো। সেখানে যে-কথা স্পষ্ট ও প্রকটভাবে দেখতে পাওয়া যায় তারই সাহায্যে তান্ত্রিক সাহিত্যের অস্পষ্ট, জটিল, আপাত-অর্থহীন, একান্ত উৎকট ও বীভৎস বিষয়গুলির উপর আলোকপাত হওয়া অসম্ভব না হতেও পারে।

সাধারণ মূলসূত্র : কৃষি-আবিষ্কার ও জাদুবিশ্বাসের তীব্রতা

কৃষি-বিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়কে ঠিকমতো বুঝতে হলে সর্বপ্রথম একটি বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বিষয়টি হলো, এই পর্যায়েই জাদু-বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা মানুষের মনে সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। রবার্ট ব্রিফল্ট[৩০] দেখাচ্ছেন, অসভ্য মানুষদের মধ্যে সর্বত্রই দেখা যায় অন্যান্য কাজের তুলনায় কৃষিকাজকে কেন্দ্র করেই জাদুবিশ্বাস এবং জাদুবিশ্বাসগত

অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরতা সবচেয়ে বেশি। পিউব্লো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে খৃস্টান পাদ্রীরা নানাভাবে খৃস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেও এই অসভ্য মানুষগুলির মূল বিশ্বাস একটুও টলাতে পারেনি; অথচ এ-বিশ্বাস চুরমার হয়ে যেতে লাগলো যখন ইয়োরোপীয়রা সে-দেশে গিয়ে চাষবাস শুরু করলো। ইয়োরোপীয়দের কৃষিকাজ দেখে ওদের বিশ্বাস এ-ভাবে চুরমার হয়ে যেতে লাগলো কেন? কেননা, ওরা দেখলো কোনো রকম জাদু-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর না করেই ইয়োরোপীয়রা ফসল ফলাতে পারছে এবং সে-ফসল গুণ বা পরিমাণ কোনো দিক থেকেই নিকৃষ্ট নয়। তাই খৃস্টান পাদ্রীরা হাজার বক্তৃতা দিয়েও তাদের মনের যে-বিশ্বাস টলাতে পারেনি ইয়োরোপীয়দের কৃষিকাজ-পরিদর্শন সে-বিশ্বাসকে উৎপাটিত করতে পারলো। পিউব্লো-ইণ্ডিয়ানদের এই কাহিনীটি থেকেই অনুমান করা যায়, পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের মনে,—এবং অতএব এগিয়ে-আসা মানুষদের পিছনে-ফেলে-আসা পর্যায়েও,—কৃষিকাজ কতো গভীরভাবে জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত এবং জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। অবশ্যই ব্রিফল্ট শুধুমাত্র এই দৃষ্টান্তটির উপরই নির্ভর করেননি। আরো বহু তথ্য সংগ্রহ করে দেখাচ্ছেন, পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের মানুষদের কাছে জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে কৃষিকাজ একান্তই অসম্ভব।

প্রশ্ন হলো, কেন অসম্ভব? এই ঘটনাটির বাস্তব কারণ ঠিক কী? কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে জাদুবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা এমন ঐকান্তিক কেন?

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৩৭৪] বাংলার ব্রত প্রসঙ্গে যা বলছেন সেখান থেকেই আলোচনা শুরু করা যায়:

> 'গঙ্গা গুকুগুকু আকাশে ছাই!'—সেই সময় বর্ষার জলধারা কল্পনা করে বসুধারা ব্রতের অনুষ্ঠান। এই যে জ্যৈষ্ঠের সারা মাস আষাঢ়ের ছবি মনে জাগিয়ে মানুষ প্রতীক্ষা করছে, এটা বড় কম অবসর নয় আবেগ ঘনীভূত হয়ে নানা শিল্প-ক্রিয়ায় প্রকাশ হবার জন্য।…এমনি প্রায় প্রত্যেক ব্রতেই দেখি, কামনা অনেকদিন পর্যন্ত—কোথাও একমাস, কোথাও দু'মাস—অতৃপ্ত থাকছে চরিতার্থতার পূর্বে। শস্য ফলবার আগেই শস্য উদ্গমের ব্রত আরম্ভ হল এবং শস্যের প্রকৃত উদ্গমের ও কামনার মাঝের দিনগুলো মনের আবেগে নানা কল্পনায় নানা ক্রিয়ায় ভরে উঠে নাট্য, নৃত্য, আলেখ্য, এমনি-সব নানা শিল্পের জন্ম দিতে লাগল।

কথাগুলি ঠিক। তবু ঠিক নয়ও। ভাববাদী চিন্তাশীলের পক্ষে বাস্তবকে যতোখানি পর্যন্ত বুঝতে পারা সম্ভব ততোটুকু পর্যন্তই ঠিক। কিন্তু বাস্তবের

সম্যক উপলব্ধির জন্যে ভাববাদ ছেড়ে বস্তুবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

কথাগুলি কতোটুকু পর্যন্ত ঠিক? কামনা এবং কামনা-সফল-হওয়ার মাঝখানের যে-দীর্ঘ ব্যবধান তাকেই মনের ঘনীভূত আবেগ দিয়ে,—কামনা সফল হওয়ার ছবি দিয়ে,—ভরিয়ে তোলাই হলো ব্রতের উদ্দেশ্য। নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য—এমনি সব নানান উপায়ের উপর নির্ভর করেই মনের ওই ঘনীভূত আবেগকে বাঁচিয়ে রাখবার আয়োজন। অবনীন্দ্রনাথের কথাগুলি ঠিক এবং এই দিক থেকেই ঠিক।

কিন্তু ঠিক নয়ও। ঠিক নয় এই কারণে যে, অর্ধ-অসহায় পর্যায়ের ওই মানুষগুলির কাছে কামনা আর কামনা-সফল-হওয়ার মাঝখানের ওই দীর্ঘ ব্যবধানটি এক চূড়ান্ত পরীক্ষার মতো। আর তাই, এই সময়টি জুড়ে নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য এমনি সব নানান শিল্পের সাহায্যে মনের আবেগটুকুকে বাঁচিয়ে রাখবার যে-চেষ্টা তার মূলে রয়েছে জীবন-সংগ্রামের নির্মম চাহিদা, অবসর-বিনোদন নয়—এবং সেই কারণেই অবনীন্দ্রনাথ যখন বলছেন ওই ঘনীভূত আবেগের আসল উপাদান হলো অবসর, তখন তাঁর কথা স্বীকারযোগ্য হতে পারে না।

বস্তুত, অবনীন্দ্রনাথের নিজের রচনাতেই স্বীকৃত হয়েছে, জীবনসংগ্রামের যে-পটভূমিতে ব্রতের জন্ম তার সঙ্গে জীবনসংগ্রামের আধুনিক পটভূমির অনেক তফাত এবং এ-তফাতের কথা মনে না রাখলে ব্রতের আদি-তাৎপর্য বোঝা যায় না[৩৯৫]:

> অনাবৃষ্টির আশঙ্কা আমাদের যদিই বা এখন কোনোদিন চঞ্চল করে তবে হয়তো 'হরি হে রক্ষা করো' বলি মাত্র; কিন্তু ঋতুবিপর্যয়ের মানে যাদের কাছে ছিলো প্রাণ-সংশয়, সেই তখনকার মানুষেরা কোনো অনির্দিষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা কেবল মুখে জানিয়ে তৃপ্ত হতে বা নিশ্চিত হতে পারত না; সে 'বৃষ্টি দাও' বলে ক্ষান্ত হচ্ছে না; সে বৃষ্টি সৃষ্টি করতে, ফসল ফলিয়ে দেখতে চলেছে।…এখনকার মানুষ এ-রকম বিশ্বাস করে না, ব্রতও করে না।
>
> ব্রত হলো মনস্কামনার স্বরূপটি। আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে নৃত্যে; এক কথায়, ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা।

ব্রতের স্বরূপটিকে বোঝাবার জন্যে কী অসামান্য বর্ণনা! আকারে যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন, অবনীন্দ্রনাথের "বাংলার ব্রত" ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় মহামূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু সেই সঙ্গেই এ-কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে,

অবনীন্দ্রনাথের এমন অপরূপ বর্ণনাও একদিক থেকে অসম্পূর্ণ। কেননা, আধুনিক যুগের সঙ্গে ব্রতের যুগের ওই মৌলিক প্রভেদকে স্বীকার করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি আধুনিক শিল্পীর অভিজ্ঞতা দিয়েই ব্রতের শিল্পকে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন[৩২৩] :

> অতৃপ্তির মাঝে মন দুলছে—এই দোলাতেই শিল্পের উৎপত্তি। কামনার তীব্র আবেগ এবং তার চরিতার্থতা—এ দুএর মাঝে যে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদের শূন্য ভরে উঠেছে নানা কল্পনায়, নানা ক্রিয়ায়, নানা ভাবে, নানা রসে।···মনের এই, উন্মুখ অথচ উৎক্ষিপ্ত নয়, অবস্থাটিই হচ্ছে শিল্পের জন্মাবার অনুকূল অবস্থা। এ সময় মানুষ সুন্দর অসুন্দর বেছে নেবার সময় পায়, যেমন-তেমন করে একটা কিছু করবার চেষ্টাই থাকে না।

তাই অবনীন্দ্রনাথের কাছে মূল কথাটা হলো অবকাশ আর অবসরের কথাই। সে-কথা এ-যুগের শিল্পীর পক্ষে সত্য হতে পারে ; কিন্তু ব্রতের বেলায় শুধু এইটুকু বললেই হয় না।

গঙ্গা শুকুশুকু আকাশে ছাই—পৃথিবীর চেহারাটা যখন এই রকমের পুড়ে-খাক-হয়ে যাওয়া তখন আষাঢ়ের জলধারার ছবিটিকে মনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে ওই অর্ধ-অসহায় মানুষগুলি বাঁচবে কিসের ভরসায়, কেমন করে ? তাই এতো রকমের আয়োজন,—নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য ; সবই হলো কামনা-সফল হওয়ার ছবিটিকে বাঁচিয়ে রাখবার আয়োজন। আধুনিক মানুষের আধুনিক অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে ব্রতগুলির বিচার করতে গেলে ভুল হতে পারে, মনে হতে পারে সুদীর্ঘ অবসর পাওয়া গিয়েছে বলেই বুঝি শিল্প-সম্ভোগ দিয়ে এই অবসরটিকে মধুর করে তোলবার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু তা নয়। আমাদের আধুনিক উৎপাদন-কৌশল অনেক উন্নত হয়েছে। তাই অনিশ্চয়তা কম, উৎকণ্ঠার কারণ কম,—মনের বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখবার আয়োজনে আমাদের অতোখানি মরীয়া হয়ে উঠতে হয় না। কিন্তু ব্রতের জন্ম উৎপাদন-কৌশলের ইতিহাসের যে-পর্যায়ে তার পটভূমি সম্পূর্ণ অন্য রকম : সময়ের ব্যবধানটা সত্যি বলতে, অবসর নয়, তার বদলে যেন বিশ্বাসের পরীক্ষা। কামনা অনেকদিন পর্যন্ত, কোথাও বা একমাস কোথাও বা দু'মাস, অতৃপ্ত থাকছে। শস্যের কামনায় বীজ বোনা আর শস্য ফলা, ফসল পাওয়া—এ দু'-এর মধ্যে সময়ের সুদীর্ঘ ব্যবধান। সে-ব্যবধানের যেন প্রতিটি মুহূর্ত জুড়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। এই অবস্থায় মনের শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে কামনা-সফল-হওয়ার ছবিটিকে চোখের সামনে তুলতে দেখা দরকার। আর তা দেখবার জন্যেই ব্রতের মধ্যে অতো রকমের

আয়োজন—নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য। এগুলিকে তাই সুদীর্ঘ অবসরকে বিনোদিত করবার কৌশল মনে করলে ভুল করা হবে; তার বদলে এগুলি হলো সুতীব্র অনিশ্চয়তা-বোধের হাত থেকে আত্মরক্ষার আয়োজন, মনের বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখবার কৌশল,—আর সেইদিক থেকেই জীবন-সংগ্রামের অঙ্গ।

জীবন-সংগ্রামের অঙ্গ কেন? নৃত্যে, নাট্যে, আলেখ্যে ওইভাবে কামনা সফল হওয়ার ছবিটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারলে সত্যিই কি বাস্তব পৃথিবীকে প্রভাবিত করা যাবে নাকি? প্রত্যক্ষভাবে নিশ্চয়ই নয়, তবুও পরোক্ষভাবে নিশ্চয়ই। শস্যের কামনায় ব্রত করলেই যে প্রকৃতি শস্যময়ী হয়ে উঠবে, তা নয়। কিন্তু প্রকৃতিকে শস্যময়ী করবার কাজে যারা কোমর বেঁধেছে তাদের বুকের বল অনেকখানি বেড়ে যাবে আর ওই নতুন উদ্দীপনায় নির্ভর করে তারা যখন সত্যিই ফসল ফলাবার কাজে অগ্রসর হবে তখন তারা আরো ভালো করে ফসল ফলাতে পারবে। তাই ওই ব্রতের দরুনই প্রকৃতির উপর একটা পরোক্ষ প্রভাব এসে পড়েই, আর এইদিক থেকেই ব্রত সেই অর্ধ-অসহায় মানুষগুলির কাছে বাস্তব জীবন-সংগ্রামের অঙ্গই।

কামনা আর কামনা-সফল-হওয়ার মাঝখানে যে অনিশ্চয়তার ব্যবধান তা সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে কৃষি-বিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়েই। তাই এই পর্যায়েই কামনা-সফল-হওয়ার কল্পনা দিয়ে ব্যবধানটিকে ভরাট করে তোলবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। নকলের সাহায্যে কামনা-সফল-হওয়ার কল্পনাকে ফুটিয়ে তোলাই হলো জাদুবিশ্বাসের প্রাণবস্তু। তাই কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়েই জাদুবিশ্বাসের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। শিকারজীবী পর্যায়ের চেয়ে বেশি: শিকারী যা চাইছে, যা কামনা করছে, তা বাস্তব পৃথিবীতেই রয়েছে—অন্তত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার নাগাল পাওয়া যায়। পশুপালন-জীবী পর্যায়ের চেয়ে বেশি: পশুরা মাঠে চরে, ঘাস খায়, বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু কৃষিবিদ্যা আবিষ্কারের প্রাথমিক অবস্থায় তা নয়: বীজ থেকে শস্য কেন জন্মায় তা জানা নেই, জানা নেই মাটির রহস্য। কিংবা, যদিই বা জানা থাকে তাও একান্ত অস্পষ্ট ও একান্ত প্রাথমিক ভাবেই। অপরপক্ষে, মানুষ এ-অবস্থায় যা চাইছে তা মানুষের চোখের সামনে নেই, তাকে চাওয়া আর তাকে পাওয়ার মধ্যে শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধান নয়,—শুধু সুদীর্ঘ অবকাশ নয়,—অনেক আর প্রায়-অসম্ভব অনিশ্চয়তাও। এ-কাজ

তাই ঢের বেশি কঠিন, এ-কাজের জন্যে তাই মনের বল প্রয়োজন অনেক বেশি, মনের বিশ্বাসকে জাগিয়ে রাখবার আয়োজন দরকার নানান রকম।

পশুপালনের সঙ্গে তুলনা করে কৃষি-আবিষ্কার প্রসঙ্গে অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[৩১] বলছেন :

> So long as they have pasture, cattle feed and breed of themselves, but by comparison with cattle-raising the work of tilling, sowing and reaping is slow, ardous and uncertain. It requires patience, foresight, faith. Accordingly, agricultural society is characterised by the extensive development of magic.
>
> চরবার জমি যতোক্ষণ আছে ততোক্ষণ পালিত-পশুর দল নিজেরাই চরে খাবে এবং সংখ্যায় বাড়বে। কিন্তু পশুপালনের তুলনায় জমি কোপানো, বীজ বোনা আর ফসল কাটার কাজ অনেক মন্থর, কঠিন, অনিশ্চিত। অতএব তার জন্যে দরকার ধৈর্য, দূরদৃষ্টি, বিশ্বাস। কৃষিভিত্তিক সমাজে তাই জাদুবিশ্বাসের অনেক ব্যাপক বিকাশ।

কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক স্তরের ধ্যানধারণাগুলিকে বুঝতে হলে তাই সর্বপ্রথম প্রশ্ন তোলা দরকার, এই জাদুবিশ্বাস এবং জাদুবিশ্বাস-মূলক অনুষ্ঠানাদির মূল কথাটা কী ?

প্রজনন ও ধনউৎপাদন : নারীর ফলপ্রসূতা ও প্রকৃতির ফলপ্রসূতা

কৃষিবিদ্যা মেয়েদের আবিষ্কার। কৃষি উপলক্ষে জাদুবিশ্বাসও স্বভাবতই নারী-কেন্দ্রিক। তার মানে শুধু এই নয় যে, ওই জাদুবিশ্বাস-মূলক আচার-অনুষ্ঠানগুলি প্রধানতই মেয়েলি ব্যাপার ; তাছাড়াও, মেয়েদের জীবনের মূল লক্ষণের উপর এই জাদুবিশ্বাস নির্ভরশীল। তাই এ-পর্যায়ের চিন্তা-চেতনায় শুধুই যে নারীপ্রাধান্য,—শক্তিপ্রাধান্য বা প্রকৃতি-প্রাধান্য—তাই নয় ; সন্তান-উৎপাদনের ব্যাপারে নারীর ভূমিকা এবং ফসল-ফলার ব্যাপারে প্রকৃতির ভূমিকা—এ-দু'-এর মধ্যে একটা গভীর যোগাযোগ কল্পিত হওয়াই স্বাভাবিক। সে-কল্পনা কতোখানি বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক তার আলোচনা তোলা নিশ্চয়ই আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য নয় ; তার বদলে আমাদের যুক্তি হলো, একমাত্র এই বিশ্বাসের দিক থেকেই তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার উৎস সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাবার সম্ভাবনা আছে।

প্রথমে এই জাদুবিশ্বাসের মূলকথাটা দেখা যাক। রবার্ট ব্রিফল্ট[৩১৮] বলছেন,

> The magical or religious rites intended to secure the fertility of the fields, were naturally within the special competence of the women who cultivated them, and whose fertility was linked to the earth's. Many of the women's religious associations were doubtless concerned originally with discharging that important function.
>
> অর্থাৎ, (সারমর্ম) মেয়েরাই জমি চাষ করতো ; ফলে স্বভাবতই জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় জাদু-অনুষ্ঠান ও ধর্মানুষ্ঠানগুলি মেয়েদেরই এক্তিয়ারে ছিলো ; মেয়েদের উর্বরতা-শক্তির সঙ্গে পৃথিবীর উর্বরাশক্তির যোগাযোগ কল্পনা করা হতো। আদিতে মেয়েদের অনেক ধর্ম-সম্প্রদায় যে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বই সম্পাদন করতো সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জাদুবিশ্বাসের মূল কথাটা কী? কামনা-সফল করবার একটা কাল্পনিক কৌশল হিসেবে কামনা-সফল হওয়ার একটা কোনো নকল তোলবার আয়োজন: শত্রুর কুশপুত্তলী দগ্ধ করেই আসল শত্রুকে দগ্ধ করায় বিশ্বাস, কিম্বা, আকাশে জলের ছিটে ছুঁড়ে বৃষ্টির নকল তুলে আসল বৃষ্টিকে আয়ত্বে আনায় বিশ্বাস। তেমনি, কামনাটা যদি প্রকৃতিকে ফলপ্রসূ করাই হয় তাহলে ফলপ্রসূতার বা ফলপ্রসূতা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের নকল তুলেই ওই কামনাটিকে সফল করবার কল্পনা করা হবে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ভিল-রা ফসল বোনবার আগে ক্ষেতের একটি পাথরের গায়ে সিঁদুর মাখায়। কেন মাখায়? এ-হলো ক্ষেতকে রজঃসলা করবার একটা নকল তোলা। পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের মানুষদের ধারণায় ওই ঋতুরজই প্রজননের প্রধানতম উপকরণ।

আবার এই জাদুবিশ্বাসের বিকাশ উল্টো দিক থেকেও হতে পারে। সন্তানবতী হবার কামনায় মেয়েরা প্রকৃতিতে ফল-ফলবার নকল তুলতে পারে। আমাদের দেশে আজো পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের নানা বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান টিকে আছে; তাই ওই জাদুবিশ্বাসের নমুনাও খুব বিরল নয়। দেখা যায়, সন্তান-লাভের কামনায় বন্ধ্যা মেয়েরা গাছের শাখায় ঢিল বেঁধে দেয়[৩১৯]। গাছের ঢিল হলো ফলের নকল; এইভাবে ফল ফলবার নকল তুলেই মেয়েরা ফলপ্রসূ হবার কামনাকে সফল করবার কল্পনা করে।

প্রকৃতির ফলপ্রসূতার সঙ্গে মেয়েদের ফলপ্রসূতার একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ভিত্তির উপরই জাদুবিশ্বাসটি প্রতিষ্ঠিত। এবং এই জাদুবিশ্বাস-মূলক অনুষ্ঠানের মূল কথা হলো, একটির সাহায্যে আর একটির কামনাকে সফল করবার চেষ্টা। এবং যে-ধরনের উৎপাদন-কাজের সঙ্গে মানুষের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তা হলো সন্তান-উৎপাদন; ফলে তারই উপমার উপর নির্ভর করে ওই স্তরের মানুষ প্রকৃতির উৎপাদন-রহস্যকেও বোঝবার চেষ্টা করছে। অর্ধ-অসহায় ওই মানুষগুলি প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করবার আশায় আর কোন পথেই বা এগোতে পারতো?

তাহলে, এই জাদুবিশ্বাসকে বোঝবার মূলসূত্র হলো, প্রজনন ও ধন-উৎপাদনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কল্পনা।

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[৪০০] বলেছেন:

> In the earliest phases of human society collective labour was a condition of survival. Food-gathering and hunting, at a low technical level, requird many hands. There was no danger in too many, because the surplus could always move away, but too few meant death. Production of the means of subsistence was inseparable from the reproduction of the group itself. And if the technique of production was precarious, so was that of reproduction. The infant mortality of the primitive peoples is enormous. The magical rites that cluster everywhere round the event of childbirth sprang from material necessity.
>
> Similar conditions recur at a higher level with the discovery of agriculture...The crops, tended labouriously by the women, were blessed or blighted by the goddess of childbirth.

মানবসমাজের সবচেয়ে প্রাকৃত পর্যায়ে জীবন-মরণ নির্ভর করেছে যৌথ-শ্রমের উপর। উৎপাদন-কৌশলের অনুন্নত পর্যায়ে খাদ্য-আহরণ ও শিকারের জন্যে অনেক হাতের প্রয়োজন পড়তো। সংখ্যাধিক্য ভয়ের কারণ ছিলো না, কেননা বাড়তি মানুষেরা অন্যত্র চলে যেতে পারতো। কিন্তু সংখ্যালঘুত্ব মানে ছিলো মৃত্যু। জীবনধারণের উপকরণগুলির উৎপাদন এবং দলের প্রজনন—দু'-এর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিলো। এবং উৎপাদন-কৌশলের মতোই প্রজনন-কৌশলও ছিলো অনিশ্চিত। আদিম মানুষদের মধ্যে শিশু-মৃত্যুর হার ভয়াবহ। সন্তানজন্ম ঘিরে সর্বত্রই যে-জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায় তার উৎসে আছে বাস্তব প্রয়োজনবোধ।

কৃষি আবিষ্কারের পর্যায়ে একই পরিস্থিতির উন্নতর পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।
…মেয়েরা যে-শস্য সযত্নে লালন করে তার উপর সন্তান-জন্মের দেবীর আশীর্বাদ
বা অভিশাপ।

আমাদের দেশে সন্তান-জন্মের দেবী হলেন ষষ্ঠী। আর ষষ্ঠীক বা ষষ্ঠীকা হলো ব্রীহিধান্য, "চলতি 'ষেটে ধান। এই ধান ৬০ দিনে পক্ক হয়, সেইজন্য ইহাকে ষষ্ঠীক কহে"[৪০১]। সন্তানদায়িনী দেবীর নামের সঙ্গে শস্যের এই সম্পর্ক কেন?

সন্তানের জন্মদান ও ফসল-ফলানো—আদিম মানুষের ধারণায় দু'-এর মধ্যে সম্পর্ক খুব নিবিড়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্[৪০২] অনুমান করেন আদিম নিড়ানি (*hoe*) পুরুষ-জননঅঙ্গের অনুকরণেই গঠিত হয়েছিলো, ভাষাতত্ত্ববিদ্[৪০৩] অনুমান করেন লিঙ্গ শব্দ থেকেই লাঙল শব্দের উৎপত্তি। যদি তাই হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে, প্রজননের উপমার সাহায্যেই মানুষ ফসল ফলার ঘটনাটিকে বুঝতে শুরু করেছে।

তান্ত্রিক ধ্যানধারণার নারীপ্রাধান্য

প্রজনন ও উৎপাদনের সাদৃশ্য-নির্ভর এই জাদুবিশ্বাসটির আলোচনা অবশ্যই বিস্তারিতভাবে করতে হবে। কেননা তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার উৎস অন্বেষণে এই জাদুবিশ্বাসটিই আমাদের কাছে সবচেয়ে মৌলিক সূত্র।

কিন্তু এই জাদুবিশ্বাসটির বিভিন্ন বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা তোলবার আগে তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা তুলবো। বৈশিষ্ট্যটি হলো নারী-প্রাধান্য বা শক্তি-প্রাধান্য বা দেবী-প্রাধান্য। আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, এই শক্তি-প্রাধান্য বা নারী-প্রাধান্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কৃষি-আবিষ্কারের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেই : কৃষি-কাজ মেয়েদের আবিষ্কার, কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ের ধ্যানধারণা তাই অনিবার্যভাবেই নারীপ্রধান।

প্রথমে দেখা যাক, তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে নারীপ্রাধান্য সত্যিই কী রকম। স্যর আর্থার এ্যাভেলন[৪০৪] বলছেন :

> …we have in the *Tantras* the recognition of the fine principle that this doctrine and its expression in ritual are…for all, whatever be their race or caste or sex. This marks a great advance on the parochial restrictions of the *Vedas* which are

so often placed in opposition to the *Tantra* by English writers. The *Sudra* and woman are under none of the *Vaidik* bans. What, again, can be finer than the high veneration of woman which the *Tantra* inculcates. The Sufi author of the Dabistan, describing, in the seventeenth century, the *Shaktas*, speaks of the Mother of the World in the following charmful passage: "This *Maya* is the maker of the productions of this world and of its inhabitants, and the Creator of the Spirits and of the bodies: the universe and its contents are born from Her: from respect of the said productions and of the mentioned effects She is entitled *Jagadamba*, or Mother of the Universe ...This sect hold women in great esteem and call them *Shaktis*, and to ill-treat a *Shakti*—that is, a women—is held to be a crime." As H. H. Wilson also himself points out, women, as manifestation of the Great Cause of all, are entitled to respect and even to veneration. Whoever offends them incurs the wrath of *Prakriti*, Mother of all, whilst he who propitiates them offers worship to *Prakriti* Herself. And so, at a time when, as some allege, in accordance with the *Vedas*, the rite of *Sati* was being practised, and many a woman was being horribly oppressed, it was the *Mahanirvana Tantra* which forbade it on the grounds above stated. In conformity, also, with these views, we find that according to the *Tantra*, alone of the great *Shastras*, a woman may be a spiritual teacher (*guru*) and initiation by her achieves increased benefit.

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, তন্ত্রমতে জাত-অজাতি এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠানের অধিকারী। স্ত্রী-শূদ্রের বিরুদ্ধে যে বৈদিক নিষেধ তন্ত্রের ক্ষেত্রে তার অভাব দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর সুফি লেখক শাক্তদের বর্ণনায় বলেছেন,—এই সম্প্রদায়ের মতে মায়া থেকেই জগতের জন্ম, তাই তাঁকে জগদম্বা বলা হয়। শাক্তরা মেয়েদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে, মেয়েদের প্রকৃতি বলে উল্লেখ করে, তাই মেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহার শাক্তদের কাছে প্রকৃতির বিরুদ্ধেই অপরাধ-বিশেষ। এইচ্. এইচ্. উইলসনও বলছেন, শাক্তমতে মেয়েরা আদি-কারণের প্রতীক, তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করলে প্রকৃতি ক্রুদ্ধা হন, তাদের উপাসনা করলে প্রকৃতিরই উপাসনা করা হয়। এই কারণেই, সতীদাহ-প্রথার দরুন এ-দেশে যখন বহু নারী নির্যাতিতা হতো তখন মহানির্বাণতন্ত্র এই প্রথাকে গর্হিত বলেছে। সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারেই মেয়েদের পক্ষে গুরু হওয়া সম্ভব, এমন কি মেয়েদের কাছে দীক্ষা নেওয়াই উত্তম।

তুলনায়, বৈদিক ঐতিহ্যের পুরুষ প্রাধান্য কী রকম চূড়ান্ত নারী-বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিলো তা অনুমান করা যেতে পারে বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যের মনোভাব থেকে। শঙ্কর[৩০৫] বলছেন, নরকের দ্বার কী? না, নারী।

গ্রীক সভ্যতার ক্ষেত্রে এই নারীবিদ্বেষ সামগ্রিকভাবে সমাজকে কোন নৈতিক অধঃপতনের গভীরে নিয়ে গিয়েছিলো তার আলোচনা এঙ্গেল্‌স্‌-এর গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়: এঙ্গেল্‌স্[৩০৬] বলছেন, *the degradation of women recoiled on the men themselves and degraded them too*—নারীর এই অধঃপতন পুরুষদের উপরেও প্রভাব বিস্তার করলো এবং তাদেরও অধঃপাতিত করলো। এও যেন এক রকম প্রকৃতির নিয়ম। আর তাই তন্ত্র-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৩০৭] মন্তব্য করছেন:

> শঙ্করাচার্য নারীকে নরকের দ্বার বলিয়াছিলেন, সেইহেতু ব্রহ্মানন্দগিরি শঙ্করাচার্যকে খুব একহাত তিরস্কার করিয়াছেন। তন্ত্রমতে নারীই আদ্যাশক্তি-রূপিণী—জগন্ময়ী—জগজ্জননী; সুতরাং নারী পুজনীয়া, অর্চনীয়া, সাদরে রক্ষণীয়া। খৃস্টানধর্মে নারীকে শয়তানের প্রলুব্ধা জীব বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। খৃস্টানধর্ম অনুসারে নারীসঙ্গ শয়তানের প্ররোচনায় হইয়া থাকে। অতএব মেয়েমানুষ ও মৈথুন খৃস্টানধর্মের সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাপাপজ। রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী বলেন যে, খৃস্টানধর্মের এবং হঠযোগী নিষ্কামকর্মীদিগের নারীর প্রতি এই বিতৃষ্ণার ভাব গোড়াকার বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই ঘটিয়াছিল। আমরা এ-সিদ্ধান্ত অমান্য করিতে পারি না। কিন্তু মজা এই, যে ধর্ম বা সাধন পদ্ধতিতে নারীর অত্যন্ত নিন্দা আছে, সেই ধর্মের ধার্মিকগণ পরে লাম্পট্যদোষে দুষ্ট হইয়া অধঃপাতে গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন লাম্পট্যদোষেই ঘটিয়াছিল; খৃস্টানধর্মের অধঃপতনও এই লাম্পট্যদোষেই ঘটে।

তান্ত্রিকাদি আচার অনুষ্ঠানগুলিও উত্তরকালের বিপরীত পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে গিয়ে কী ভয়ংকর বীভৎসতায় পর্যবসিত হয়েছিলো, তার আলোচনা অবশ্যই শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় উত্থাপন করছেন না; এবং আমরাও যেহেতু বর্তমানে তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার উৎস-সন্ধানে অগ্রসর হয়েছি সেইহেতু এখানে আমাদের পক্ষেও সে-আলোচনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের যুক্তির বর্তমান পর্যায়ে যেটুক কথা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক তা হলো, তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার নারী-প্রাধান্য এবং এইদিক থেকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুরুষ-প্রধান বৈদিক ধারাটির সঙ্গে এই তান্ত্রিক ধারার মৌলিক প্রভেদ।

আমাদের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি উঠতে পারে।

প্রথমত, তর্ক করে কেউ বলতে পারেন, তন্ত্র হাজার হোক শিবোক্ত-

শাস্ত্র—অতএব এই শাস্ত্রের প্রকাশভঙ্গির মধ্যেই প্রমাণ রয়েছে যে, এখানে পুরুষের ভূমিকা সত্যিই গৌণ নয়।

দ্বিতীয়ত, তর্ক করে আরো বলা যেতে পারে, তান্ত্রিক সাধনায় ভৈরবীর স্থান থাকলেও পুরুষ সাধকদের দৃষ্টান্ত একটুও বিরল নয়। অথচ, আমাদের যুক্তি যদি ঠিক হয়,—অর্থাৎ কৃষি-কেন্দ্রিক জাদু-অনুষ্ঠানই যদি তন্ত্রের উৎস হয় এবং সে-অনুষ্ঠান যদি একান্তভাবেই মেয়েলি ব্যাপার হয়—তাহলে তন্ত্র সাধনাও নারী-প্রধান হবার কথা।

একে একে এই দুটি যুক্তির বিচার করা যাক।

প্রথমত তান্ত্রিক গ্রন্থগুলির রচনাভঙ্গি। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[১০৮] একবার বলেছিলেন, "হাতের লেখা পুঁথি না পাইলে তন্ত্রের অনেক তত্ত্ব ঠিকমত বুঝা যায় না"। আমাদের মন্তব্য হলো, এমন কি ওই হাতের লেখা পুঁথিগুলিও যেহেতু অনেক উত্তরকালের সৃষ্টি সেইহেতু এগুলির রচনাভঙ্গি থেকে তন্ত্রের আদি ও অকৃত্রিম তাৎপর্য অনুমান করবার সুনিশ্চিত অবকাশ নেই। এ-রচনাভঙ্গি অর্বাচীন বলেই যে অনেকাংশে কৃত্রিম, এখানে তার সামান্য প্রমাণ দেওয়া যায়।

এক, শাস্ত্রীয় প্রমাণ :

> পদ্মপুরাণে পাষণ্ডোৎপত্তি অধ্যায়ে লিখিত আছে, লোকদিগকে ভ্রষ্ট করিবার জন্যই শিব নামের দোহাই দিয়া পাষণ্ডীরা অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছে।[১০৯]

এবং শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভৃগুও বলছেন[১১০],

> নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ।
> বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবস্থরাসবম্॥
> ব্রহ্মা চ ব্রাহ্মণাশ্চৈব যদ্‌যূয়ং পরিনিন্দথ।
> সেতুং বিধরণং পুংসামত পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ॥

> পবিত্রতাভ্রষ্ট মূঢ়বুদ্ধি জটাভস্ম ও অস্থিধারীগণ শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুন, যেখানে দৈবসুরা ও আসব রহিয়াছে। ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাদের আপনারা এত নিন্দা করেন, তাঁহারাই পুরুষদিগের সেতুস্বরূপ, এইজন্যই আপনারা পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অতএব, শাস্ত্রকারদের মতেই তন্ত্রের পক্ষে ওই শিবোক্ত-শাস্ত্র সাজবার চেষ্টাটা নেহাতই কৃত্রিম। এবং এই কৃত্রিমতা আরো প্রকট হয়ে পড়ে তন্ত্রসাধকদের ভঙ্গি থেকে।

তন্ত্র-সাধকদের মনোভাব কী রকম?

তন্ত্রের শাক্ত সাধকগণ বলেন যে, শিব ত স্থাণুসদৃশ, একটা বিদ্যমানতার দ্যোতকমাত্র, তাঁহার উপাসনা করি কোন হিসাবে? শক্তি না থাকিলে শিব ত শব, অথচ শক্তিশূন্য শিব হইতেই পারেন না। অতএব, শিব আছেন, মাথার উপর থাকুন, আমরা মায়ের—আদ্যাশক্তির উপাসনা করিব। কারণ, তিনিই ত সব—তিনি মেধা, তিনি মায়া, তিনি লজ্জা, তিনি ক্ষমা, তিনি বুদ্ধি, তিনি ধৃতি, তিনি বিদ্যা, তিনি ছায়া, তিনি শান্তি, তিনি ক্ষান্তি—তাঁহাকে পূজা করিব না ত কাহার পূজা করিব?[৪১১]

অতএব, ওই প্রথম আপত্তির উত্তর দিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত করতে চাই যে, যদিও উত্তরযুগে তান্ত্রিক গ্রন্থাদি শিবোক্ত-শাস্ত্র হিসেবেই রচিত হয়েছে তবুও রচনাভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্য থেকে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার নারীপ্রাধান্য সত্যিই অস্বীকৃত হয় না।

দ্বিতীয়ত, সাধনপদ্ধতির কথা।

আমাদের যুক্তি যদি ঠিক হয় তাহলে অনুমান করা প্রয়োজন যে, আধুনিক কালে তন্ত্রসাধক বলতে যদিও বহু (প্রধানতই?) পুরুষসাধককে দেখতে পাওয়া যায়, তবুও এককালে এ-সাধনা একান্তভাবেই নারীদের এক্তিয়ারে ছিলো।

এ-কথা অনুমান করবার মতো কোনো তথ্য আছে কি? আছে।

আচারভেদ তন্ত্র[৪১২] বলছে:

পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারো ভবেত্তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্॥

পঞ্চতত্ত্ব অথবা পঞ্চমকার, খপুষ্প অর্থাৎ রজস্বলার রজঃ ও কুলস্ত্রীর পূজা করিবে। তাহা হইলে বামাচার হইবে। ইহাতে নিজে বামা হইয়া পরাশক্তির পূজা করিবে।

বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্—পরাশক্তিকে বামা হয়ে পূজা করতে হবে। এবং এ-কথা শুধুমাত্র আচারভেদ তন্ত্রের কথা নয়, তন্ত্রের একটি প্রধানতম কথা। তাই স্যর ভাণ্ডারকার বলছেন[৪১৩]:

The ambition of every pious follower of the system is to become identical with *Tripurasundari*, and one of his religious exercises is to habituate himself to think that he is a woman. Thus the followers of the *Sakti* school justify their appellation by the belief that God is a woman and it ought to be the aim of all to become a woman.

> এই সম্প্রদায়ের নিষ্ঠাবান অনুসরকের উচ্চাকাঙ্খা হলো, ত্রিপুরাসুন্দরীর সঙ্গে অদ্বৈতভাব স্থাপন করা এবং এই সাধনপদ্ধতির একটি অঙ্গ হলো নিজেকে নারী জ্ঞান করতে অভ্যস্থ হওয়া। অতএব, শাক্ত সম্প্রদায়ের অনুগামীরা নিজেদের পদবীটিকে এই বলে ব্যাখ্যা করেন যে, ঈশ্বর নারীই এবং নারীত্বই সকলের আদর্শ।

তন্ত্রসাধকেরা এই রকম নারীভাবে সাধনা করবার চেষ্টা করেন কেন? এ-প্রশ্নের মাত্র একটিই বৈজ্ঞানিক উত্তর সম্ভবপর: তন্ত্রসাধনা আদিতে নারীদেরই সাধন-পদ্ধতি ছিলো—নারীভাবে সাধনার চেষ্টাটা তারই স্মারক।

পৃথিবীর অন্যান্য নানান ধর্মের বেলাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়: যে-সাধনা আদিতে শুধুমাত্র মেয়েলি ব্যাপার ছিলো তা উত্তরকালে পুরুষদের এক্তিয়ারে আসবার পরও সাধন-পদ্ধতি ও সাধকের ভঙ্গির মধ্যে নারীপ্রাধান্যের স্মারক টিকে থেকেছে।

রবার্ট ব্রিফল্ট[১১৪] দেখাচ্ছেন এবং অজস্র তথ্যের পর্যালোচনার ভিত্তিতেই দেখাচ্ছেন, কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-অনুষ্ঠান থেকেই উত্তরকালের নানা ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। এবং কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান থেকে উদ্ভূত বলেই আদিতে এই সম্প্রদায়গুলি মেয়েদের গুহ্যসম্প্রদায় মাত্র ছিলো। পরে এগুলির মধ্যে পুরুষদের প্রবেশাধিকার এবং ক্রমশ প্রাধান্যও দেখা দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতীত নারীপ্রাধান্যের স্মারক মুছে যায়নি। তাই বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, পুরুষ পুরোহিতদেরও নারীভাবে সাধনা করতে হচ্ছে এবং সাধনার সময় নারী সাজতে হচ্ছে।

তন্ত্র-সাধনাও সেই রকমই। বামাভাবে, বামা হয়ে, সাধনা করতে হবে।

বামাচার নামটির পিছনেও এই ইতিহাস লুকোনো আছে কি না তা ভেবে দেখা যেতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে বাম শব্দকে কাম অর্থে গ্রহণ করেছি—বামাচার অর্থাৎ কামাচার[১১৫]। কিন্তু ওই বামাচার নামটির—বিশেষ করে তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে বামাচার নামটির—পিছনে আরো কিছু লুপ্ত ইতিহাস থাকা অসম্ভব নয়। এ-সাধনা এককালে স্ত্রী-আচার মাত্র ছিলো বলেই হয়তো একে এখনো বামাচার বলা হয়। "কাহারও মতে ইহারা অনেক বেদবিরুদ্ধ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া বামাচারী নামে খ্যাত"[১১৬]। অবশ্যই বাম বা বামা কোনো শব্দকেই আক্ষরিক অর্থের দিক থেকে বেদবিরুদ্ধ ব্যঞ্জক বলে গ্রহণ করবার অবকাশ নেই। তবুও উদ্ধৃত মতবাদ অন্তত একটা অর্থে ভ্রান্ত নয়: বৈদিক আচার পুরুষপ্রধান বলেই স্ত্রী-আচার বা বামাচার স্বভাবতই বেদবিরুদ্ধ। অবশ্যই এই বামাচার নামটির নজির দেখিয়েই যদি দাবি করা

হয় যে, তন্ত্রসাধনা এককালে স্ত্রী-আচার মাত্র ছিলো, তাহলে আপত্তি তুলে হয়তো বলা হবে, তন্ত্রসাধনা বলতে শুধুমাত্র বামাচার নয়: নিত্যাতন্ত্রে ও কুলার্ণবে[৪১৭] সাত প্রকার আচারের কথা লিখিত আছে। কিন্তু এ-হেন আপত্তির বিরুদ্ধে খোদ তান্ত্রিকেরা যে ঘোরতর আপত্তি তুলবেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা,

> এখনকার বঙ্গীয় তান্ত্রিকগণের মধ্যে বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয়াচার মিশ্রিত দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত তান্ত্রিকেরা একথা স্বীকার করেন না। বামকেশ্বর তন্ত্রে ৫১ পটলে লিখিত আছে :—
>
> আচারো দ্বিবিধো দেবি বামদক্ষিণভেদতঃ।
> জন্মমাত্রং দক্ষিণং হি অভিষেকেন বামকম্॥
>
> দেবি! বামাচার ও দক্ষিণাচার ভেদে আচার দুই প্রকার। জন্মমাত্র দক্ষিণ এবং অভিষেক হইলে বামাচারী হয়।[৪১৮]

তাহলে অকৃত্রিম তন্ত্রসাধনা বলতে বামাচারই এবং বামাচার নামটির পিছনে ওই গোপন ইতিহাস থাকা অসম্ভব নয় যে, তান্ত্রিকাচার এককালে স্ত্রী-আচার মাত্রই ছিলো।

দেবী-রহস্য ও উদ্ভিদ-জগৎ

প্রশ্ন ওঠে, দেবীপ্রাধান্য-মূলক বা নারী-প্রাধান্য-মূলক এই জাতীয় ধ্যানধারণার ব্যাখ্যা কী? আমাদের যুক্তি অনুসারে সে-ব্যাখ্যার মূল-সূত্র পাওয়া যাবে কৃষি আবিষ্কারের দিক থেকেই।

প্রথমত দেখা যায়, দেবী-রহস্যের সঙ্গে উদ্ভিদ-জগতের সম্পর্ক রয়েছে। এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ[৪১৯] ইতিপূর্বেই কিছুকিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন; সেগুলি থেকেই আলোচনা শুরু করা যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে[৪২০] দেবী নিজেই বলছেন :

> ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ
> ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
> শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি। ইত্যাদি।
>
> অর্থাৎ, অনন্তর বর্ষাকালে নিজদেহ সমুদ্ভূত প্রাণধারক শাকের সাহায্যে আমি সারা জগতের পুষ্টি সরবরাহ করবো। তখন আমি জগতে শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হবো।

দেবীর ওই শাকম্ভরী নামটা নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তর্জমা করেছেন, *herb-bearing* বা *herb-nourishing*। কিন্তু তার চেয়েও চিত্তাকর্ষক হলো 'আত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ' বিশেষণটি। এই বিশেষণের মূলে এক অতি-প্রাচীন বিশ্বাস চাপা পড়ে আছে এবং হরপ্পার ধুলো সরিয়ে সে-বিশ্বাসের এমনকি একটি মূর্ত নিদর্শন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সে-নিদর্শন সম্পর্কে স্যর জন মার্সাল[২২] বলছেন, হরপ্পায় একটি পরমাশ্চর্য সিল আবিষ্কার হয়েছে। তার একপিঠে দেখা যায় একটি নগ্ন নারীমূর্তি। এই নারীর দুটি পা দু'পাশে সরানো এবং তার গর্ভের ভিতর থেকে একটি লতা গজিয়েছে।

হরপ্পার সিল[২১]

হরপ্পার হরফের পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে মার্কণ্ডেয় পুরাণের ওই 'আত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ' বিশেষণটির উপর আরো কিছুটা আলোকপাত করা হয়তো সম্ভব হতো, কিন্তু এই সিলটির গায়ে ছ'-অক্ষরে কী লেখা আছে তা আজো কেউই পড়তে পারেননি। তবে ওই দুর্বোধ্য হরফে যাই লেখা থাকুক না কেন, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সিলের উপরের নারী-চিত্রটির পিছনে লুকিয়ে আছে এক অতি-আদিম বিশ্বাস। রবার্ট ব্রিফল্ট-এর রচনা অনুসরণ করে আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মধ্যে আজো এ-বিশ্বাস টিকে আছে যে, নারী-দেহ থেকেই আদি-শস্যের উদগম হয়েছে। নারীদেহের সঙ্গে শস্য-উদগমের সম্পর্ক-মূলক এই আদিম বিশ্বাসটির বিস্তৃততর আলোচনায় আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করবো।

আপাতত দেখা যাক, দেবী-মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ আরো কী কী তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

যাঁর নাম দুর্গা তাঁরই নাম শাকম্ভরী। ফলে দুর্গোৎসবের সঙ্গে ফসলের সময়টার যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক। এবং তা আছেও। দুর্গোৎসব হলো শারদীয় উৎসব—ডালা যখন পাকা ফসলে ভরে ওঠবার সময় ঘনিয়ে আসে। তাই, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ[২৩] সিদ্ধান্ত করছেন, আদিতে দুর্গা ছিলেন শস্যদেবী,—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শস্যদেবীদের মতো ফসলের সময়টিতেই দুর্গোৎসবের আয়োজন। অবশ্যই, দুর্গাকে আমরা সাধারণত চিনি মহেশমর্দিনী রণচণ্ডীর রূপে। কিন্তু শ্রীযুক্ত চন্দ অনুমান করছেন, এ-রূপটি গৌণ, কেননা অর্বাচীন। এবং এই রণচণ্ডীর রূপটি যে অর্বাচীন শ্রীযুক্ত চন্দের মতে তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় রামায়ণ থেকে। রামায়ণের উপাখ্যান অনুসারে রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র রণচণ্ডী দুর্গার কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত চন্দ বলছেন, এ-উপাখ্যান বাল্মিকীর মূল রামায়ণে

নেই। মূল রামায়ণ অনুসারে রামচন্দ্র বর প্রার্থনা করেছিলেন দুর্গার বদলে সূর্যের কাছেই। এবং এর থেকে প্রমাণ হয়, দুর্গার ওই রণচণ্ডী রূপটি পরের যুগে রচিত—অর্থাৎ অর্বাচীন।

দুর্গাপূজার একটি প্রধান অঙ্গ হলো নবপত্রিকার পূজা। এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করছেন, এই অনুষ্ঠানটি দুর্গাপূজার কৃষি-পর্যায়েরই স্মারক[৪২৪]। কেননা, নবপত্রিকার ঘটের উপর রম্ভা, কচ্চি, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মান ও ধান্যের পাতা সাজানো হয়। এবং যেটা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয়, এই ন'টি উদ্ভিদের প্রত্যেকটিরই অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে কল্পনা করা হয় এক-একটি দেবী। এখানেও উদ্ভিদ-জগতের সঙ্গে দেবীমাহাত্ম্যের একটা যোগাযোগ চোখে পড়ে। এবং এখানে আমরা বিশেষ করে ডালিমের অধিষ্ঠাত্রী দেবীটির উল্লেখ করতে পারি। কেননা, আমরা একটু আগেই দেখেছি, পুরুষ হয়েও আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশ যখন কৃষিপর্যায়ের আসর জমাতে চান তখন তাঁকে যে-সব বিসদৃশ ব্যবহার করতে হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো এই ডালিম-ফল হাতে নেওয়া। নবপত্রিকার পূজার বেলায় কিন্তু এই অসঙ্গতি নেই। কেননা, এখানে ডালিমের অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে রক্তদন্তিকা বলে একটি দেবীকেই[৪২৫]।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ আরো দেখাচ্ছেন, শাকম্ভরী বলেই দুর্গা হলেন অন্নদা বা অন্নদাতা। অন্নপূর্ণা নামটির তাৎপর্যও নিশ্চয়ই এই দিক থেকেই বুঝতে পারা যায়[৪২৬]।

দেবীমাহাত্ম্যের সঙ্গে উদ্ভিদ-জগতের সম্পর্ক যে কতো ঘনিষ্ঠ তার আরো একটি নিদর্শন হিসেবে শ্রীযুক্ত চন্দ বলছেন, শাক্তরা সকালে উঠে কুলতরু বা কুলবৃক্ষকে প্রণাম করে[৪২৭]।

বলাই বাহুল্য, ভারতীয় সংস্কৃতির এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বোঝবার কাজে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের গবেষণার এই ইংগিতগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা ভারতীয় সংস্কৃতি স্পষ্টই দেবীবহুল এবং বিশেষ করে বাংলা দেশের নিজস্ব ঠাকুরদেবতা বলে যাঁদের স্বীকার করা হয় তাঁদের মধ্যে পুরুষ বলতে বোধহয় একমাত্র দক্ষিণ রায়। এবং বাংলার সংস্কৃতি যে প্রায় চোদ্দ আনাই তান্ত্রিক এবং তান্ত্রিক ধ্যানধারণার সবচেয়ে ব্যাপক ও বিশাল প্রসার যে বাংলা দেশের জমিতেই—এ-কথা বহুবার বহু বিদ্বান উল্লেখ

করেছেন[২৮]। কিন্তু এই ঘটনাটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যে বাংলা দেশের উর্বর জমির মধ্যেই লুকিয়ে আছে,—অর্থাৎ কৃষিবিদ্যার দিক থেকেই যে শেষ পর্যন্ত সে-ব্যাখ্যা পাবার সম্ভাবনা আছে,—এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দই বোধহয় সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মূল্যবান মূলসূত্রটি আবিষ্কার করা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যগুলি বিশ্লেষণ করেননি এবং শাক্ত মতবাদকে উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বোঝবার বদলে প্রধানতই জাতিগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি এর ব্যাখ্যা খোঁজবার চেষ্টা করেছেন[২৯]। ফলে শুধুই যে তাঁর গবেষণা দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছে তাই নয়; অনেক সময় তাঁর সিদ্ধান্তগুলি অর্ধ-সত্যমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে।

একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। শ্রীযুক্ত চন্দ বলছেন[৩০], কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বীজবপন-মন্ত্র প্রসঙ্গে কৃষির যে-অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে তাঁকেও ওই শস্যদেবী দুর্গারই অনুরূপ মনে করা যেতে পারে :

> The *Devi* named in a sacred formula (*mantra*) quoted by Kautilya in connection of sowing seeds in his *Arthasastra* is probably the prototype of *Durga* as corn spirit.

আমাদের মন্তব্য হলো, শুধুমাত্র এইটুকু বললে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য ইংগিতটুকুর আংশিক ব্যাখ্যামাত্র দেওয়া হয় এবং যে-কোনো অর্ধ-সত্যের মতোই ওই আংশিক ব্যাখ্যাটুকু অনেকাংশেই তুচ্ছ-মূল্য। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের[৩১] তর্জমা অনুসারে কৌটিল্যের গ্রন্থের ওইখানে লেখা আছে :

> সর্বপ্রকার বীজেরই প্রথম বপন সময়ে, ইহার প্রথম বীজমুষ্টি স্বর্ণ-সংযুক্ত জলদ্বারা সিক্ত করিয়া বপন করিতে হয়। নিম্নবর্তী মন্ত্র তৎসঙ্গে পাঠ করিতে হয়, যথা—'প্রজাপতি, কাশ্যপ সূর্যপুত্র ও পর্জন্য দেবকে সর্বদা নমস্কার জানাইতেছি। সীতাদেবী (কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম এখানে 'সীতা' বলিয়া ধৃত হইয়াছে) আমার বীজ ও ধনসমূহের বৃদ্ধি সাধন করুন'।

অতএব, এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে। এ-বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ নেই যে, কৃষির অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে এখানে একটি দেবীনাম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই দেবীর কাছেই বীজ ও ধনসমূহের বৃদ্ধি-সাধন কামনা করা হচ্ছে। এবং এইদিক থেকে কৌটিল্যের উদ্ধৃতিটি শ্রীযুক্ত চন্দের আলোচ্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিশ্চয়ই খাপ খায়। কেননা শ্রীযুক্ত চন্দের মূল সিদ্ধান্ত হলো অন্যান্য দেশের মতোই

আমাদের দেশেও শস্য-উদ্‌গম ও কৃষি-সাফল্যের অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে দেবীর কল্পনাই করা হয়েছে, দেবতার নয়। কিন্তু তবুও এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, কৌটিল্যের রচনায় এখানে দেবী ছাড়াও প্রজাপতি, কাশ্যপ প্রমুখ পুরুষদেবতাদের উদ্দেশ্যেও প্রণতি জানানো হচ্ছে। অর্থাৎ, এখানে দেখা যাচ্ছে, কৃষি-প্রসঙ্গেই দেবীমাহাত্ম্য অনেকাংশেই দেবমাহাত্ম্য দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। এবং এইদিক থেকে দেখা যায়, শ্রীযুক্ত চন্দের আলোচ্য সিদ্ধান্ত অর্থশাস্ত্রের ওই উক্তিটির সঙ্গে স্পষ্টভাবে খাপ খাচ্ছে না।

অতএব সমস্যা ওঠে এবং সে-সমস্যার সমাধান প্রয়োজন হয়।

কৌটিল্যের রচনায়, এইভাবে দেবীমাহাত্ম্য দেবমাহাত্ম্য-দ্বারা আচ্ছন্ন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে এখানে আরো একটি প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে-কৃষি কর্মের উল্লেখ তা ঠিক কোন পর্যায়ের কৃষিকাজ? কেননা, আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার হলেও,—এবং, অতএব, কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়ে মানবসমাজ নারীপ্রধান (ক্ষেত্রপ্রধান) ও তারই প্রতিবিম্ব হিসেবে দেবলোকও দেবীপ্রধান হলেও,—কৃষিকর্মের উন্নততর পর্যায়টি আর মেয়েদের এক্তিয়ারে ছিলো না। ফলে মানবসমাজ পুরুষ-প্রধান (বীজপ্রধান) এবং তারই প্রতিবিম্ব হিসেবে দেবলোকও দেবতা-প্রধান হয়ে দাঁড়ানোই স্বাভাবিক। অতএব, অর্থশাস্ত্রের এই উদ্ধৃতিটিতে বীজবপন-প্রসঙ্গে কৃষিদেবীকে আচ্ছন্ন করে ওই পুরুষ-দেবতাদের আবির্ভাব-রহস্যটুকু বুঝতে হলে প্রশ্ন তোলা দরকার, এখানে কৃষিকর্মের ঠিক কোন পর্যায়ের পরিচয়? কৌটিল্য[৩০২] বলছেন :

> তিনি (সীতাধ্যক্ষ, অর্থাৎ রাজকীয় কৃষিকর্মাধ্যক্ষ) বহু হলদ্বারা পরিকৃষ্ট নিজ (বা সরকারী) ভূমিতে (মতান্তরে, সেই সেই বীজের উপযোগপ্রাপ্ত ভূমিতে) উক্ত বীজসমূহ দাস (ক্রীতদাসাদি), কর্মকর (বেতনভোগী কর্মকর) ও দণ্ডনিষ্ক্রয়কারী পুরুষগণদ্বারা বপন করাইবেন।

কোন পর্যায়ের কৃষিকাজের পটভূমিতে এখানে বীজবপনের আলোচনা হচ্ছে তা কৌটিল্যের এই নির্দেশটি থেকেই অনুমান করা সম্ভব। ফলে পুরোনো পর্যায়ের কৃষিদেবী এখানে উপস্থিত থাকলেও তাঁর মহিমা অনিবার্যভাবেই পুরুষদেবতাদের পাশে অপেক্ষাকৃত ম্লান হয়েছে।

অবশ্যই, তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার উৎস-সন্ধানে কৃষিবিদ্যার বিশেষ করে ওই প্রাকৃত-পর্যায়টি নিয়েই আমাদের আলোচনা। কেন, তা মনে রাখবার জন্যে আমাদের মূল যুক্তিটির সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হতে পারে।

তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার প্রধানতম লক্ষণ হলো শক্তিপ্রাধান্য। তন্ত্রে শক্তিই প্রধান, পুরুষ অপ্রধান। তান্ত্রিকেরা শাক্ত, শক্তির সাধক।

তন্ত্রের শক্তি মানে কি? নিশ্চয়ই আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের এনার্জি নয়। তাই এ-কথা কল্পনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করবার চেষ্টাটা আত্ম-প্রবঞ্চনারই সামিল হবে যে, আমাদের দেশের প্রাচীনেরা যোগবলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জানতে পেরেছিলেন। আসলে, এই জাতীয় আধুনিক মতামতের সঙ্গে তন্ত্রের কোনো সম্পর্কই নেই। তন্ত্রে শক্তি মানে হলো মা, কিংবা আরো সরাসরিভাবে বললে বলা যায় স্ত্রীলোক, নারী। তাই তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অনুসন্ধান না করে কৃষিভিত্তিক সমাজবাস্তবের প্রতিবিম্ব অন্বেষণ করাই বিজ্ঞান-সম্মত প্রচেষ্টা হবে। সে-সমাজ নারীপ্রধান, কেননা কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার। এবং এই নারীপ্রাধান্যের প্রতিবিম্ব হিসেবেই তান্ত্রিক ধ্যানধারণা শক্তি-প্রধান বা নারী-প্রধান।

তন্ত্র-প্রসঙ্গে আধুনিক গবেষক[৪৩৩] বলছেন, এই জাতীয় সমস্ত রচনাতেই নারী-তত্ত্বের উপর এতোটা জোর দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষের কথা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বাদ পড়ে গিয়েছে :

> In all these writings the female principle is personified and made prominent, to the almost total exclusion of the male.
> এই সমস্ত রচনায় পুরুষতত্ত্বকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে নারীতত্ত্বকে ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট করা হয়েছে ও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

এই নারীপ্রাধান্যের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করতে এগিয়েই আমরা কৃষি-বিদ্যার আদি-পর্যায়ের কথা তুলতে বাধ্য হয়েছি। এবং আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তান্ত্রিক ঐতিহ্যের মূল প্রভেদকেও এইদিক থেকেই বোঝবার অবকাশ আছে।

বৈদিক অর্থনীতি পশুপালন-প্রধান। পশুপালন-নির্ভর সমাজ পুরুষপ্রধান। তারই প্রতিবিম্ব হিসেবে বৈদিক সাহিত্য অনিবার্যভাবেই পুরুষপ্রধান। বৈদিক সাহিত্যে শুধুই যে দেবী অপ্রধান ও এমন কি দুর্লভ তাই নয়; পুরুষসূক্তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এক আদি-পুরুষ থেকেই বিশ্বজগতের উৎপত্তি।

অপরপক্ষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাদের আর্যপূর্ব বলছেন,—বৈদিক সাহিত্যের পরিভাষায় যারা হলো অনার্য, কিংবা আধুনিক আমলাদের পরিভাষায় যাদের বলা হয়েছে এ্যাবরিজিন্‌স্—তাদের অর্থনীতি ছিলো মূলতই কৃষিপ্রধান। তাই তাদের ধ্যানধারণা থেকে দেবীপ্রাধান্য বা শক্তি-প্রাধান্য বা নারীপ্রাধান্যের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়নি।

ফলে, আমাদের দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র ধারাকে পাশাপাশি বয়ে যেতে দেখা যায়। একটি হলো পুরুষপ্রধান বৈদিক ধারা এবং অপরটি হলো নারীপ্রধান তান্ত্রিক ধারা। মনুস্মৃতির ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট[৩৪] বলছেন, শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ—শ্রুতি দু'রকম, বৈদিক ও তান্ত্রিক। যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, আমাদের দেশের শাসক-সম্প্রদায় এই দুটি ধারার মধ্যে বৈদিক ধারাটিকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সামগ্রিকভাবে দেশের সংস্কৃতিতে এই বৈদিক ধারাটিই প্রাধান্য পেয়েছে। জনৈক আধুনিক পণ্ডিতের বচন উদ্ধৃত করে ইয়োরোপীয় পণ্ডিত[৩৫] বলছেন, হিন্দুধর্মের তিন ভাগই হলো তান্ত্রিক। এবং

> In the popular knowledge and belief they have practically superseded the *Vedas* over a large part of India……
>
> ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই তান্ত্রিক ধ্যানধারণাই জনসাধারণের বিশ্বাস ও জ্ঞান হিসেবে বেদকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

শুধু তাই নয়[৩৬] :

> Their influence unquestionably extends far beyond those who profess to accept their authority. Wilson quotes a passage from one of these treatises which claims that 'many a man who calls himself a *Siva* or a *Vaisnava* is secretly a *Sakta*, and a brother of the left-handed.' Even the Jains of North India are said to have adopted formulæ and ritual from the *Tantras*, and the Lamaism or corrupt Buddhism of Nepal and Tibet owes much to the same source.
>
> যারা প্রকাশ্যভাবে তন্ত্রকে প্রামাণ্য মনে করে, তাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত তন্ত্রের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। উইলসন তন্ত্র সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখাচ্ছেন, যারা নিজেদের শৈব বা বৈষ্ণব বলে তাদের মধ্যে অনেকেই গোপনে গোপনে তান্ত্রিক এবং বামাচারীদেরই সহগোষ্ঠী। এমন কি, দেখা যায় উত্তর ভারতের জৈনরাও তন্ত্র থেকে মন্ত্র ও অনুষ্ঠান গ্রহণ করে এবং নেপাল ও তিব্বত অঞ্চলের লামা-বাদ নামের পতিত বৌদ্ধধর্ম তন্ত্রের কাছে বহুলাংশে ঋণী।

এই জাতীয় উক্তি নিশ্চয়ই অত্যুক্তি নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হলে আমরা অনায়াসেই বুঝতে পারি তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার প্রভাব আমাদের দেশের সংস্কৃতিক ঐতিহ্যে কী বিশাল ও গভীর। অর্থাৎ, শাসক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা যতোখানিই হোক না কেন, বৈদিক ঐতিহ্য আমাদের দেশের জনসাধারণের মনকে সত্যিই গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারেনি,—তার বদলে সাধারণ মানুষ ওই তান্ত্রিক ধ্যানধারণাকেই আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করেছে।

প্রশ্ন হলো, এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী? এর বাস্তব কারণ ঠিক কী? উত্তরে আমরা বলতে চাইছি, তথাকথিত 'আর্য'-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হবার পরও দেশের সাধারণ মানুষ অপেক্ষাকৃত পুরোনো পর্যায়ের কৃষিকাজেই ব্যাপৃত থেকেছে। শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্তের ভাষায়, এদেশের আদিবাসীদের মধ্যে যারা আর্য আক্রমণের সামনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলো তারা ......*remained as they were before, the tillers of the soil*[৪৩৭]। উৎপাদন-পদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্যটিকে বোঝবার আশাতেই আমরা ট্রাইব্যাল-সমাজের অসম্পূর্ণ-বিলোপ সংক্রান্ত প্রকল্পের সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং আমাদের যুক্তি অনুসারে যেহেতু একমাত্র উৎপাদন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই মানুষের ধ্যানধারণার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব সেইহেতুই তান্ত্রিকাদি, তথা লোকায়তিক, ধ্যানধারণার উৎস-সন্ধানে অগ্রসর হয়েও এই প্রকল্পটির বহির্রেখা আলোচনা করবার আশায় নিছক ধ্যানধারণার আলোচনা থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিলাম।

রাষ্ট্রনৈতিক আকাশে বহু ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যের বহু উত্থান-পতন সত্ত্বেও, আমাদের দেশে অন্তত ব্যাপকভাবে উৎপাদন-পদ্ধতির মৌলিক উন্নতি সমাজ-বিকাশের পুরোনো পর্যায়কে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে নতুন পর্যায়ের সমাজের বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি। আর, অসমাপ্তভাবে বিলুপ্ত ওই পুরোনো পর্যায়ের সমাজ-বাস্তবের প্রতিবিম্ব হিসেবেই আমাদের দেশের বৃহত্তর জনতার চেতনায় পুরোনো পর্যায়ের ধ্যানধারণাগুলিরও অমন বিস্তৃত ও গভীর প্রভাব থেকে গিয়েছে। দেশের শাসক-সম্প্রদায় নিশ্চয়ই মাতৃপ্রধান সমাজ-বাস্তবকে বহুলাংশেই ধ্বংস করতে পেরেছে এবং সতীদাহ-প্রথা প্রভৃতির উৎস-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক গবেষণা সমাধা হলে আমরা হয়তো স্পষ্টভাবেই দেখতে পাবো, এই মাতৃপ্রাধান্যকে অবদমন করবার জন্যে কতোখানি পশুবলের প্রয়োজন হয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন কি আমাদের দেশের সমাজবাস্তব থেকেও নারীপ্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। এ-বিষয়ে ডক্টর এরএন্‌-ফেল্‌স্‌ "ভারতবর্ষে মাতৃতন্ত্র" বলে বইতে অজস্র তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এবং ওই মাতৃপ্রধান সমাজ-বাস্তবকে পশুবলে বাইরের থেকে ভাঙবার চেষ্টা

হয়েছিলো বলেই সে-ভাঙন বহুলাংশেই কৃত্রিম হতে বাধ্য হয়েছিলো: ফলে দেশের ধ্যানধারণায় খুব মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেবার কথা নয়, তা দেখা দেয়ওনি। তাই আমাদের দেশে সতীদাহ-প্রথার পাশাপাশিই শাক্ত মতবাদের ব্যাপক ও গভীর প্রভাব দেখা যায়। যদিও অবশ্যই তান্ত্রিকমতে সতীদাহ-প্রথা নিন্দিত হয়েছে তবুও শাক্তদের দেশে সতীদাহ-প্রথার মতো কৃত্রিম পরিস্থিতি সত্যিই কল্পনা করা কঠিন। কেননা, শাক্ত মতবাদ নারী-প্রধান, মাতৃপ্রধান।

এই মাতৃপ্রধান ধ্যানধারণার দেশে কী ভাবে সতীদাহ-প্রথার প্রচলন সম্ভব হয়েছিলো এখানে তার আলোচনা তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার বদলে আমাদের মূল আলোচ্য-বিষয়টির দিকেই দৃষ্টি রাখা যাক। এবং সেই বিষয় হলো, তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার মাতৃপ্রাধান্য বা নারী-প্রাধান্য।

উৎপাদন-পদ্ধতির ইতিহাসের দিক থেকে, অর্থাৎ কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়ের দিক থেকেই প্রাচীন সংস্কৃতির নারীপ্রধান ধ্যানধারণাগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, নারীপ্রধান ধ্যানধারণাগুলির উৎস-সন্ধানে আমাদের পক্ষে পরীক্ষা করা দরকার উৎপাদন-পদ্ধতির ওই পর্যায়ে আজো যে-সব মানবদল আটকে পড়ে আছে তাদের—তাদের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে-পারা বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণ করলে তান্ত্রিকাদি মতবাদকে আমরা বুঝতে পারবো।

বলাই বাহুল্য, অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের গবেষণার উপর নির্ভর করেই এবং মূলত তাঁর গবেষণাদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই, আমরা এই মূল যুক্তির অবতারণা করবার প্রয়াস পেয়েছি। এই যুক্তির উপর নির্ভর করেই তিনি প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির নানা দুর্বোধ্য দিক বৈজ্ঞানিক আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। পক্ষান্তরে, আধুনিক গবেষকদের মধ্যে যাঁরা এই যুক্তিকে স্পষ্ট-ভাবে গ্রহণ করেননি তাঁদের রচনা বিচার করলে দেখা যায়, একটি মৌলিক সত্যের কাছাকাছি এসেও তাঁদের সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত কী ভাবে অস্পষ্ট এবং বিভ্রান্ত হয়েছে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে *Encyclopædia of Religion and Ethics*-এ অধ্যাপক স্টারবেক রচিত *Female Principle* শীর্ষক প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যাক।

শুরুতেই লেখক বলছেন, ধর্মবিশ্বাসের আদিমতম পর্যায়ে দেখা যায় দেবলোকে পুরুষ দেবতাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হয় গৌণ আর না হয় তো একেবারে শূন্য। আদিম ধর্মবিশ্বাস মূলতই দেবীপ্রধান। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের ক্রমবিকাশ অনুসরণ করলে চোখে পড়ে, এই দেবীমাহাত্ম্য ক্রমশই অপ্রধান হয়ে যাচ্ছে; দেবীদের চেহারা ঝাপসা হতে হতে দৃশ্যপট থেকে হয় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আর না হয় তো দেবীরা গৌণ হয়ে গিয়ে পুরুষ-দেবতাদের পত্নীমাত্রে পরিণত হচ্ছেন। কোথাও বা দেখা যায়, দেবীটি নিজের স্বরূপ বদলে শেষ পর্যন্ত পুরুষদেবতায় পরিণত হচ্ছেন। নজির হিসেবে লেখক এখানে রবার্টসন্ স্মিথের রচনা উদ্ধৃত করছেন: সেমিটিকদের ধর্মে আদিতে যাঁরা দেবী ছিলেন তাঁরাই নিজেদের নারীত্ব হারিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরুষ দেবতায় পরিণত হয়েছেন।

প্রশ্ন ওঠে, এই ঘটনার ব্যাখ্যা ঠিক কী? সুখের বিষয় অধ্যাপক স্টারবেক খুব একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খোঁজ করছেন না। এ-বিষয়ে তিনি স্পষ্টই সচেতন যে, উক্ত পরিবর্তনের পিছনে সমাজ-বিবর্তন মূলক কারণ রয়েছে। তিনি বলছেন[৩৮] :

> অনেক সময়ই দেখা যায় দেবীরা দেবলোকে উচ্চতম স্থান অধিকার করেছেন। সমাজসংগঠনের বৈশিষ্ট্য এবং সমাজে নারীর মর্যাদার উপর এই ঘটনাটি নির্ভর করে। ক্লান-জীবনে গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানা হলেন জননী; এই পরিস্থিতিতে দেবীমাতার পক্ষেই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করা সম্ভব।

অধ্যাপক স্টারবেক এমন কি এ-কথাও অস্বীকার করবেন না যে, এই দেবীমাহাত্ম্যের সঙ্গে কৃষিজীবনের যোগাযোগ আছে। কিন্তু সে-যোগাযোগ ঠিক কেন—সে-বিষয়ে তিনি স্পষ্টভাবে সচেতন নন। এবং এই কারণেই তাঁর মন্তব্য একটি মৌলিক সত্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছোনো সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অস্পষ্ট ও এমন কি অবান্তর হয়ে পড়েছে। তিনি বলছেন[৩৯] :

> নানা ক্লান ও শহর মিশে যুদ্ধবিগ্রহমূলক জাতিতে পরিণত হবার পর দেবীপূজার পক্ষে উপযুক্ত সুরক্ষিত উপত্যকার শান্ত কৃষিজীবন অপ্রধান হয়ে গেলো। এই নতুন পরিস্থিতিতে শৌর্য-বীর্যের মূল্য গেলো বেড়ে; ফলে অনিবার্যভাবেই প্রধান হয়ে উঠতে লাগলো পুরুষ দেবতারা এবং অপেক্ষাকৃত গৌণ পর্যায়ে নেমে এলো স্বভাব-দুর্বলা নারীজাতির প্রতিনিধি ওই

দেবীরা—তারা দেবতাদের পত্নীমাত্রে পরিণত হলো, অবদমিত হলো, বিস্মৃত হলো, আর না-হয়-তো আত্মরক্ষার আশায় তারা নিজেদের নারীত্বটুকু বর্জন করতে বাধ্য হলো।

সুরক্ষিত উপত্যকার শান্ত কৃষিজীবন দেবীমাহাত্ম্যের বিকাশের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু কেন? দু'রকম উত্তর পাওয়া যেতে পারে—সুরক্ষিত ও শান্ত প্রভৃতি শব্দের উপর জোর দিলে এক রকম উত্তর, আর, কৃষিজীবন বলে কথাটির উপর জোর দিলে অন্য রকম। এর মধ্যে প্রথম উত্তরটি নিশ্চয়ই ভুল, যদিও দুঃখের বিষয় অধ্যাপক স্টারবেক ওই প্রথম উত্তরটিকেই নির্ভুল মনে করেছেন। কেন মনে করেছেন? তার কারণ, কৃষি-আবিষ্কারের ব্যাপারে মেয়েদের ভূমিকার দিক থেকে সমস্যাটিকে বোঝবার বদলে তিনি পুরুষ-প্রধান সমাজের একটি অতিকথার (*myth*) সাহায্যেই সমস্যাটির ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। অতিকথাটি হলো, নারীরা স্বভাব-কোমলা বা স্বভাব-দুর্বলা—*weaker sex*। তাই শান্ত সুরক্ষিত আবহাওয়ায় নারী-মহিমার যে-বিকাশ সম্ভবপর শৌর্য-বীর্যের যুগে তা ম্লান হয়ে যাওয়া অনিবার্য। অথচ, এই যুক্তিটি যে অতিকথা মাত্র তার বহু প্রমাণ আমাদের দেশের সংস্কৃতিতেই দেখতে পাওয়া যায়: মহিষমর্দিনী, রণচণ্ডী, কালি—এঁরা আর যাই হোন না কেন, তথাকথিত স্বভাব-দুর্বলা বা স্বভাবকোমলা নন। তাছাড়া, বিদেশী পুরাণেও এ্যামাজনদের কাহিনী রয়েছে। ব্রিফল্ট[৪৪০] দেখাচ্ছেন,—এবং প্রভূত প্রমাণের উপর নির্ভর করেই দেখাচ্ছেন,—আজকের পিছিয়ে-পড়া অসভ্য মানুষদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের তুলনায় বেশি শক্তিশালী, সাহসী এবং এমন কি নিষ্ঠুরও; প্রাচীন সমাজে মেয়েরা যুদ্ধবিগ্রহের কাজে রীতিমতো অংশ-গ্রহণ করে। রবার্ট ব্রিফল্ট-এর[৪৪১] সিদ্ধান্ত হলো:

> The differentiation of the man as warrior and fighter is certainly not due to any constitutional indisposition or incapacity in primitive woman, but to economic necessities.
>
> অর্থাৎ কিনা, যুদ্ধবিগ্রহের কাজ যে পুরুষদেরই হয়ে দাঁড়ালো তার কারণ আদিম মেয়েদের কোনো স্বভাবগত প্রবৃত্তি বা অসামর্থ নয়,—তার বদলে প্রকৃত কারণটা অর্থনৈতিক।

অর্থনৈতিক কারণের দরুনই মাতৃপ্রধান সমাজের বদলে পিতৃপ্রধান সমাজ দেখা দিয়েছে। এই পুরুষ-প্রধান সমাজে শুধুই যে যুদ্ধবিগ্রহের শক্তি পুরুষদের হাতে এসেছে তাই নয়, মানুষ চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়েছে যে,

মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই বা প্রাকৃতিক কারণের দরুনই ভীরু ও দুর্বল। অতএব ওই 'উইকার-সেক্স' (*weaker sex*) সংক্রান্ত অতিকথা। এই অতিকথার উপর নির্ভর করেই অধ্যাপক স্টারবেক দেখাবার চেষ্টা করছেন যে, স্বাভাবিক শান্ত পরিবেশ ছেড়ে মানুষ যতোই যুদ্ধবিগ্রহের আবহাওয়ায় এসে পড়তে লাগলো ততোই বাড়তে লাগলো শৌর্য-বীর্যের সমাদর, অতএব শৌর্য-বীর্যে একচেটিয়া অধিকারী পুরুষদের প্রতিপত্তি এবং তারই প্রতিবিম্ব হিসেবে দেবলোকেও পুরুষদেরই মর্যাদা। কিন্তু এ-ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, কেননা দেবদেবীদের জন্মকথা ওই 'স্বভাব-দুর্বলা' সংক্রান্ত অতিকথাটির জন্মের চেয়েও অনেক প্রাচীন।

অধ্যাপক স্টারবেক-এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদেশী দৃষ্টান্ত তোলবার প্রয়োজন নেই। কেননা, অন্যান্য বিদ্বানেরা ইতিপূর্বে এর বিরুদ্ধে প্রভূত নজির সংগ্রহ করেছেন। তাছাড়া সমাজে শৌর্য-বীর্যের মর্যাদা বাড়বার দরুনই যে স্বভাব-কোমলা নারীদের প্রতিনিধিরা দেবলোকেও আভিজাত্য হারিয়েছিলেন—এ-হেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে চণ্ডী, চামুণ্ডা প্রভৃতি অনেকের সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যাবে।

বস্তুত, অধ্যাপক স্টারবেক নিজেই অনুভব করেছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর ওই সিদ্ধান্তটি অতো সরাসরি প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা, তিনি যেমন বলছেন, একমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই এর উল্টো ইতিহাস দেখা যায়। সে-ইতিহাসে দেবীমহাত্ম্যের বিকাশ অনেক পরের যুগে হয়েছে: ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্যে, অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যে, দেবীপ্রাধান্য তো দূরের কথা এমন কি দেবীদের নিদর্শনই একান্ত দুর্লভ। অথচ উত্তরযুগের হিন্দুধর্ম দেবীমাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। এই ঘটনাটির সঙ্গে অধ্যাপক স্টারবেক-এর সিদ্ধান্তের সঙ্গতি নেই, কেননা তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে আদিযুগে ছিলো দেবীমাহাত্ম্য—উত্তরযুগে তার বদলে দেবমাহাত্ম্যের বিকাশ হয়েছে। অতএব, নিজের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতীয় সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যাখ্যা করবার জন্য অধ্যাপক স্টারবেককে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিকাশের নতুন ধারা উদ্ভাবন করতে হয়েছে: সাধারণভাবে অর্থাৎ অন্যান্য দেশের বেলায়, যদিও মানুষ শান্ত ও নির্বিঘ্ন কৃষিজীবন ছেড়ে যুদ্ধবিগ্রহের দিকে অগ্রসর হয়েছিলো তবুও ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় যুদ্ধবিগ্রহের যুগের পর মানুষ শান্ত কৃষিজীবন গড়ে তুলেছে—এই হলো অধ্যাপক স্টারবেক-এর বলবার কথা। তিনি[৪৪২] বলছেন, বৈদিক সাহিত্য হলো একটা যুদ্ধবিগ্রহের যুগের সাহিত্য। আর্যরা তখন স্থানীয় অনার্যদের বিরুদ্ধে এবং নিজেদের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যেও, যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়েছে। স্বভাবতই, এ-

সময়কার সাহিত্য বহু দেববাদে ভরপুর হলেও তার মধ্যে দেবীমাহাত্ম্যের স্থান নেই। পরের যুগে ওই আর্যরা যখন কৃষিজীবনের শান্ত পরিবেশে থিতিয়ে বসতে লাগলো তখন ক্রমশই তাদের চেতনায় দেবীমাহাত্ম্যের বিকাশ ঘটা সম্ভব হলো—প্রমাণ : দুর্গা, কালি, সরস্বতী, শক্তি ইত্যাদি।

ওই তথাকথিত বৈদিক আর্যরা কবে কোথায় কীভাবে কৃষিকাজের শান্ত পরিবেশে থিতিয়ে বসতে লাগলো—সে-কথা অবশ্যই অধ্যাপক স্টারবেক আমাদের বলেননি। তাছাড়া হিন্দুধর্মের এই দেবীগুলি যে সত্যিই আর্য-বংশোদ্ভূত নয়, সে-কথা সংশয়াতীত। আর অধ্যাপক স্টারবেকের অনুমান যদি ঐতিহাসিকভাবে সত্যও হতো, তাহলেও এই কৃষিপরিবেশে আর্যদের সমাজ অত্যন্ত প্রকটভাবেই পুরুষপ্রধান হতে বাধ্য হতো। আমরা আগেই দেখেছি, বৈদিক মানুষদের পুরুষপ্রধান সমাজ—এবং অতএব পুরুষপ্রধান চিন্তাচেতনার আসল কারণটা—যুদ্ধবিগ্রহ-প্রবণতা নয়, তাদের পশুপালন-প্রধান অর্থনীতিই। রবার্ট ব্রিফল্ট[৩৩] বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে,

> The development of agriculture in its most productive form in those societies which were originally pastoral, instead of raising the economic power and importance of the earth-cultivating woman, has accentuated beyond measure the already established supremacy of the owners of the flocks and herds, and given rise to the most pronounced types of patriarchal society.
>
> অর্থাৎ, যে-সব সমাজ আগে পশুপালন-নির্ভর ছিলো সেগুলির ক্ষেত্রে উন্নততর পর্যায়ের কৃষিকাজ ভূমিকর্ষণকারিণী নারীদের অর্থনৈতিক শক্তি ও মর্যাদা বাড়াবার বদলে পশুর মালিক পুরুষদের ইতিপূর্বেই যে-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা প্রায় অসম্ভবভাবে বাড়িয়ে দিলো এবং সবচেয়ে চূড়ান্ত পুরুষপ্রধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত করলো।

তাই তথাকথিত আর্যরা পশুপালন-মূলক অর্থনীতির পর যদি কৃষি-ভিত্তিক সমাজ গড়ে থাকে তাহলে ঐতিহাসিকভাবে সে-সমাজ অতি প্রকটভাবেই পুরুষপ্রধান হওয়া স্বাভাবিক। কিংবা, যা একই কথা, ওই আর্যদের পক্ষে কৃষিকাজে থিতিয়ে বসবার পর তাদের ধর্মচেতনায় দেবীমাহাত্ম্যের বিকাশ ঘটা সত্যিই অস্বাভাবিক। অথচ, অধ্যাপক স্টারবেক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হবার চেষ্টা করছেন।

লেখকের সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত এইভাবে বিভ্রান্ত হলেও, এ-বিষয়ে

কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে, তিনি দেবী রহস্য-প্রসঙ্গে একটি মৌলিক সত্যের অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। মৌলিক সত্যটি হলো, কৃষিজীবনের সঙ্গে এই দেবী-রহস্যের যোগাযোগ। এবং, আমাদের যুক্তি অনুসারে, সে-যোগাযোগের কারণ এই নয় যে, কৃষিকাজের শান্ত পরিস্থিতিতে স্বভাব-কোমলাদের পক্ষে প্রধানা হয়ে ওঠা সম্ভব বা স্বাভাবিক; তার বদলে আসল কারণ এই যে, কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার।

এদেশের বেশির ভাগ মানুষ,—তাদের অনার্য বা আর্য-পূর্ব বা যে-কোনো নামেই অভিহিত করা হোক না কেন,—অনেক যুগ ধরে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পর্যায়ের কৃষিকাজের উপর নির্ভর করেই জীবনযাপন করেছে। তাই তাদের চেতনাতেও দেবীপ্রাধান্য বা শক্তি-প্রাধান্যের স্বাক্ষর থাকাই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে, বৈদিক ঐতিহ্য কোনোদিনই নারীপ্রধান হয়নি। সে-ঐতিহ্য অনুসারে শূদ্রের মতোই স্ত্রীলোকদেরও শাস্ত্রে অধিকার নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে-ধারাটি মাতৃপ্রধান বা নারী-প্রধান তা মূলতই অ-বৈদিক। তারই নাম তান্ত্রিক ধারা। যদিও সাধারণভাবে বলা যায়, দেশের শাসক-সম্প্রদায় এই দুটি স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে বৈদিক ধারাটিকেই গ্রহণ করেছে তবুও দেশের সাধারণ মানুষের চেতনায় মাতৃপ্রধান অ-বৈদিক ধারাটির প্রভাব অনেক প্রবল। তার কারণ, ওই অ-বৈদিক ধারাটির মধ্যে উৎপাদন-পদ্ধতির যে-পর্যায়ের প্রতিবিম্ব সাধারণ মানুষের জীবন মূলতই তার উপর নির্ভর করেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বোঝবার জন্য ভারতীয় ঐতিহ্যের এই দুটি ধারার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যে কতোখানি প্রয়োজন সে-বিষয়ে ইতিপূর্বে অন্যান্য বিদ্বানেরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করবার আগে শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার কুমারস্বামী[১১১] এই দুটি ধারার স্বাতন্ত্র্যের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন—তাঁর ধারণায়, একমাত্র তারই পটভূমিতে ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস বুঝতে পারা সম্ভব। আমাদের মন্তব্য হলো, ভারতীয় ঐতিহ্যের এই দুটি ধারার মধ্যে যে-ধারাটির প্রভাব ব্যাপকতর ও গভীরতর, সেটিকে—অর্থাৎ ওই মাতৃপ্রধান তান্ত্রিক ধারাটিকে,—একমাত্র কৃষিআবিষ্কারের পটভূমিতেই বুঝতে পারা সম্ভবপর।

অবশ্যই, অধ্যাপক স্টারবেক আরো একভাবে দেবলোকের স্ত্রী-পুরুষ ভেদকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছেন। তিনি বলছেন, প্রাকৃত পর্যায়ের ধর্ম-বোধটা ছিলো অনেকাংশেই অসংস্কৃত; নির্লিপ্ত ও উন্নত ধর্মচেতনার মতো নয়। তার মধ্যে অনেকটাই পার্থিব কামনা, এমন কি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেবার চেষ্টা মাত্র—*to adjust life to the immediate situations around it*: অভাব এবং অভাব-মেটাবার রকমারি চেষ্টাই

এই আদিম ধর্মচেতনার মূল কথা। অভাব-মেটানোর তাগিদ বলতে প্রধানতই দু'রকম। এক : আত্মরক্ষা আর নিরাপত্তা। দুই : শস্য, পশু ও সন্তানের সংখ্যাবৃদ্ধি। পুরুষেরা স্বভাবতই প্রথম উদ্দেশ্যটির পক্ষে উপযুক্ত, নারীরা দ্বিতীয়টির। ফলে, প্রথমটির তাগিদে পুরুষ-দেবতার উপাসনা এবং দ্বিতায়টির তাগিদে দেবীদের উপাসনাই স্বাভাবিক[৩৩৫]।

> প্রয়োজন বলতে, রক্ষা ও নিরাপত্তা। সে-উদ্দেশ্যে পুরুষ দেবতারাই বিশেষ উপযোগী। আর এক রকম প্রয়োজন হলো শস্য, পশু ও সন্তানের বৃদ্ধি। দেবীরাই উর্বরাশক্তি ও বংশবৃদ্ধির স্বাভাবিক ও সহজ প্রতীক হয়েছেন।

অথচ, বাস্তব তথ্য একেবারেই অন্য রকমের। রক্ষা ও নিরাপত্তা যে শুধু পুরুষদেবতাদেরই একচেটিয়া ব্যাপার নয় আমাদের দেশের ইতিহাসেই তার প্রচুর নজির দেখতে পাওয়া যায়—দেখা যায় দেবীদের কাছেই রক্ষা, নিরাপত্তা ও এমন কি যুদ্ধ-বিজয়ের কামনা জানানো হচ্ছে। অপরপক্ষে, পশু ও সন্তান-বৃদ্ধির ব্যাপারও দেবীদের একচেটিয়া এক্তিআরে নয়,—বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায় প্রধানত পুরুষ দেবতাদের কাছেই মানুষ পশু ও সন্তান-বৃদ্ধির কামনা জানাচ্ছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দু'রকম দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণ হয় যে, দেবলোকের স্ত্রী-পুরুষ ভেদটা মরলোকের নরনারীর কোনো রকম কাল্পনিক নিয়ত-বৃত্তির উপর নির্ভর করে না, তার বদলে নির্ভর করে মানবসমাজের স্ত্রী-প্রাধান্য বা পুরুষ-প্রাধান্যের উপর। এবং মানবসমাজের এই স্ত্রী-প্রাধান্য বা পুরুষ-প্রাধান্য নির্ভর করে উৎপাদন-পদ্ধতির পর্যায়ের উপর।

কিন্তু তার মানে কি এই যে, প্রাচীন পর্যায়ের চেতনায় দেবীমাহাত্ম্যের সঙ্গে মানবীর উর্বরা-শক্তির যোগাযোগ সত্যিই নেই? নিশ্চয়ই আছে। কেবল মনে রাখা দরকার, তার মূল কারণ হলো প্রজনন-ব্যাপারটি সম্বন্ধেও মানুষের যে-ধারণা তার একটা ইতিহাস আছে। সে-ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায় আমাদের দেশের পুরোনো পরিভাষার মধ্যেই। আমাদের দেশে পুরুষ-প্রাধান্যকে বলা হয়েছে বীজ-প্রাধান্য, নারীপ্রাধান্যকে বলা হয়েছে ক্ষেত্র-প্রাধান্য—পুরুষ-প্রধান সমাজের আবহাওয়ায় মানুষ মনে করেছে প্রজননের প্রধান কারণ হলো পুরুষ-শুক্র, নারী-প্রধান সমাজের আবহাওয়ায় মানুষ মনে করেছে প্রজননের মূল কারণ হলো নারীদেহের বৈশিষ্ট্যই। এই কারণেই দেখা যায়, পুরুষ-প্রধান বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে প্রজনন-কাজে পুরুষের ভূমিকাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। অথর্ববেদ[৩৩৬] অনুসারে বিবাহের সময় পুরোহিত বরকে বলবে : এই

নারীই হলো তোমার ক্ষেত্র, তুমি সেই ক্ষেত্রে বীজ-বপন করো। গুরুত্বটা স্পষ্টই বীজের উপর—বীজ-বপনের উপর। অপরপক্ষে, মাতৃপ্রধান তান্ত্রিক ধারা অনুসারে সন্তান-উৎপাদন ও ধন-উৎপাদন উভয় ব্যাপারেই পুরুষ অপ্রধান: নারীই জগদম্বা, নারী থেকেই সবকিছুর জন্ম।

মাতৃপ্রধান সমাজের প্রভাবে প্রজনন-কাজে নারীর প্রাধান্য স্বীকৃত হবার পরই,—অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠবার পরই,—দেবীমাহাত্ম্যের মধ্যে মানবীর উর্বরা শক্তির স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখা দিলো। এবং এইদিক থেকেই অধ্যাপক স্টারবেক-এর মন্তব্য সত্যিই একটি মূল সত্যের কাছাকাছি পৌঁছেছে—সন্তান-প্রসবিনী নারীর প্রতিনিধি হিসেবেই দেবলোকে আদিম দেবীগুলির আবির্ভাব হয়েছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মূল সত্যটিকে প্রায় স্পর্শ করেও অধ্যাপক স্টারবেক এর তাৎপর্য-বিশ্লেষণে অগ্রসর হলেন না। কয়েকটি দৃষ্টান্তে দেবীমাহাত্ম্যের সঙ্গে উর্বরা-শক্তির যোগাযোগ দেখানোর পর তিনি মোটের উপর এই দৃষ্টান্তগুলির মূল্য উপেক্ষা করবারই প্রস্তাব করলেন। কেননা, তাঁর ধারণায় ধর্মচেতনা হিসেবে এই স্তরের ধ্যানধারণা অবিশুদ্ধ ও অসংস্কৃত; তাই এগুলির উপর নির্ভর করে প্রকৃত ধর্মভাবের রহস্য উদ্ঘাটন করবার আশা নেই। কিন্তু শুরুতেই এগুলিকে আধুনিক অর্থে ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে নিয়ে এবং তারপর এগুলির মধ্যে আধুনিক অর্থে ধর্মবোধের পরিচয় না পেয়ে এগুলিকে অসংস্কৃত, ও অতএব ধর্মবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত হিসেবে লঘুমূল্য মনে করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা, এমন হতে পারে যে, এ-জাতীয় ধ্যানধারণা মানবচেতনার প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী পর্যায়েরই পরিচায়ক। অর্থাৎ, ধর্ম বলতে সত্যিই যা বোঝায় এগুলির মধ্যে তার বিকাশ ঘটেনি—ধর্মবিশ্বাসের বিকাশের জন্য যে-সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন এগুলির উৎস হয়তো সমাজ-বিকাশের তার চেয়েও প্রাচীন পর্যায়ের মধ্যে।

প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণার আলোচনায় পরে ফেরা যাবে।

কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-বিশ্বাস: প্রজনন ও উৎপাদন

কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার, মেয়েলি ব্যাপার। তাই কৃষিকেন্দ্রিক আদিম জাদুবিশ্বাসটির মূল কথা হলো, উর্বরাশক্তির দিক থেকে নারীর সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় ও গভীর যোগাযোগের কল্পনা। মাতৃপ্রধান সংস্কৃতির স্মারকগুলিকে

বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝবার কাজে এই জাছবিশ্বাসটিই সবচেয়ে মূল্যবান মূলসূত্র।

পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের চেতনায় আজো এই বিশ্বাসটির স্পষ্ট রূপ দেখতে পাওয়া যায়। তাই তাদের ধ্যানধারণা থেকে শুরু করলে প্রাচীন সংস্কৃতির নানান ছুর্বোধ্য বিষয় বুঝতে পারা যেতে পারে।

আদিম চিন্তা অনুসারে, মেয়েরা যে সার্থকভাবে কৃষিকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে তার কারণ মেয়েদের মধ্যে একটি অদ্ভুত শক্তি লুকোনো আছে; এই শক্তির দরুনই মেয়েরা সন্তানবতী হয় এবং এই শক্তির প্রভাবে তারা পৃথিবীকেও ফলপ্রসূ করে। আমেরিকায় ওরিনোকো[৪৪৭] বলে রেড্-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায়, প্রখর রোদে মেয়েরা ছেলে-কোলে ক্ষেতের কাজ করছে। এই নিয়ে জনৈক খৃস্টান পাদ্রী দলের পুরুষদের ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু তিনি যে-জবাব পান তা খুবই আশ্চর্য: "এ-সব ব্যাপার আপনি বোঝেন না বলেই অমন বিরক্ত হচ্ছেন। আপনি তো জানেন, একমাত্র মেয়েরাই সন্তানের জন্ম দিতে পারে; আমরা পুরুষেরা তা পারি না। তাই মেয়েরা যখন বীজ বোনে তখন জনার-ক্ষেতের প্রতি ডাঁটায় ছুটো—এমন কি তিনটে—করে শিষ গজায়, ম্যানিওক-ক্ষেতে প্রতিটি গাছ থেকে ছু'তিন ঝুড়ি করে মূল পাওয়া যায়। কেন? কেননা, মেয়েরা জানে কেমন করে সন্তানের জন্ম দেওয়া যায় এবং সেইভাবেই ওরা ক্ষেতের ফলকেও অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। বীজ বোনবার পর তা থেকে কী করে শস্য-উদ্গম হবে তা শুধু ওরাই জানে। তাই বীজ বোনবার কাজটা ওদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া ভালো। এ-সব ব্যাপার আমাদের চেয়ে ওরা ঢের ভালো জানে।"

ব্যাভেরিয়া আর অস্ট্রিয়ার চাষীরা[৪৪৮] এখনো বিশ্বাস করে যে, অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে গাছের প্রথম ফলটি খাওয়ানো গেলে পরের বছর সেই গাছ থেকে অজস্র বেশি ফল পাওয়া যাবে। স্যর জেম্স্ ফ্রেসার[৪৪৯] বলছেন, এর থেকেই বোঝা যায়, প্রকৃতিকে ফলপ্রসূ করবার আশায় নারীর ফলপ্রসূতার উপযোগিতায় কতোখানি বিশ্বাস। আবার উগাণ্ডায়[৪৫০] সাধারণের বিশ্বাস, বন্ধ্যা স্ত্রী ক্ষেতের পক্ষে ক্ষতিকর, বহু সন্তানবতী স্ত্রীর দরুন ক্ষেত থেকেও বহুলভাবে ফসল পাওয়া যায়। নিউজিল্যাণ্ড-এ[৪৫১] দেখা যায় অন্তঃসত্ত্বা নারী সম্বন্ধে যে-সব বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা আছে, ঠিক সেই বিধিনিষেধই রাঙালুর চাষ করবার সময় মেয়েদের উপর প্রযোজ্য হয়। ব্রিফল্ট[৪৫২] দেখাচ্ছেন, এমন কি আজকের ইয়োরোপে চাষীদের মধ্যে এই ধরনের বিশ্বাসের রেশ দেখা যায়। যেমন দক্ষিণ ইতালিতে কৃষকেরা মনে করে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মেয়েরা যদি বীজ বোনে তাহলে গর্ভস্থ ভ্রূণের অনুপাতেই গাছটি বড়ো হবে। স্যর জেম্স্ ফ্রেসার[৪৫৩] এই জাতীয় কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলছেন,

আদিম মানুষদের ধারণায় প্রকৃতিকে ফলপ্রসূ করবার ব্যাপারে নারীর উর্বরা-শক্তির উপযোগিতা যে কতোখানি তা এই থেকেই বুঝতে পারা যায়: সন্তানবতী নারী গাছগাছড়াকেও সুফলা করবে, বন্ধ্যা নারী গাছগাছড়াকেও নিষ্ফল করবে।

ব্রিফল্ট[৪৫৪] বলছেন,

> the assimilation of the fruit-bearing soil to the child-bearing woman is universal.
>
> ফলপ্রসূ পৃথিবীর সঙ্গে সন্তান-প্রসূ নারীর সম্পর্ক-কল্পনা সার্বভৌম।

কিংবা[৪৫৫]

> The fecundity of the earth and the fecundity of women are viewed as being one and the same quality.
>
> পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তি এবং নারীর উৎপাদিকা-শক্তি উভয়কেই এক এবং অভিন্ন ধরনের মনে করা হয়।

এই বিশ্বাস যে কতো ব্যাপক ও বহুমুখী রবার্ট ব্রিফল্ট-এর রচনা অনুসরণ করে তারই আরো কিছু কিছু পরিচয় পাবার চেষ্টা করা যাক।

ব্রেজিলে[৪৫৬] শস্যের উৎপত্তি নিয়ে নিম্নোক্ত কাহিনী প্রচলিত আছে: একটি কুমারী মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলো এবং সে জন্ম দিলো তুষার-শুভ্র এক শিশুর। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েই মারা যায়, তখন তাকে কবর দেওয়া হয়। এই কবরের উপরেই একটি গাছ গজায়। সে-গাছে ফল ফলে। ফল খেয়ে মানুষদের মনে হলো, দেবতা তাদের শরীরে প্রবেশ করছে। এই গাছই পৃথিবীর প্রথম শস্য-গাছ এবং ওই ফলই পৃথিবীর প্রথম ফসল।

শস্য যে নারীদেহ সমুদ্ভূত—এই আদিম বিশ্বাসটিকে গ্রীক কৃষকদের[৪৫৭] লোকসংগীতের মধ্যে এখনো টিকে থাকতে দেখা যায়: এক ইহুদি মেয়ে ফসল কাটে, মেয়েটি কখনো থামে কখনো নুয়ে পড়ে গমের শিষের উপর—মেয়েটি প্রসব করলো সোনার শিশু।

আবার, আমরা আগেই দেখেছি, নারী ও প্রকৃতির উর্বরা-শক্তির সাদৃশ্য-নির্ভর ওই জাদুবিশ্বাটির বিকাশ উল্টো দিক থেকেও হতে পারে। তাই প্রকৃতির ফলপ্রসূতার সাহায্যেই নারীকেও ফলপ্রসূ করবার আয়োজন দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে স্যর জেমস্ ফ্রেসার[৪৫৮] বলছেন, দক্ষিণ আমেরিকায় গুয়ারানি বলে রেড্-ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস, মেয়েরা যদি জোড়া-ফল খায় তাহলে

যমজ সন্তানের জন্ম হবে। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলেও ঠিক এই বিশ্বাসেরই নমুনা পাওয়া কঠিন নয়। স্যর ফ্রেসার[৪৫৯] আমাদের দেশ থেকেই এই বিশ্বাসের অন্যান্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছেন। যেমন: উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্রই মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠান এবং পূজা-পার্বণের একটি প্রধান অঙ্গ হলো নারকেল-এর ব্যবহার। নারকেল উর্বরা-শক্তিরই প্রতীক বা হয়তো সন্তানের প্রতীক। সন্তান-লাভের কামনা সফল করবার আশাতেই পুরোহিতেরা মেয়েদের নারকেল দেয়।

অন্যান্য লেখকদের রচনা থেকে এই বিশ্বাসেরই অন্যান্য নমুনা উদ্ধৃত করা যায়। যেমন, উইলিয়াম ক্রুক্[৪৬০] বলছেন, প্রাকৃতিক উর্বরতার মূলে রয়েছে জল আর তাই দেখা যায় সন্তানকামনায় বন্ধ্যা নারী জলের সাহায্য চাইছে। খণ্ডদের বিশ্বাস,—বন্ধ্যা নারীকে ছুটি স্রোতের সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়ে আনলে তার বন্ধ্যাত্ব দূর হবে। পাঞ্জাবের দিকে দেখা যায়, বন্ধ্যা নারীকে চৌকিতে বসিয়ে কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হয়, কুয়োর মধ্যে সে নগ্ন হয়ে স্নান করবে আর তারপর জামাকাপড় পরে চৌকিতে বসে উপরে উঠে আসবে। কুয়োর মধ্যে নামানো সম্ভব না হলে পিপুল গাছের তলায় কুয়োর জল এনে এই অনুষ্ঠান সমাধান করতে হবে। মধ্যভারতে জাঠদের বিশ্বাস, তিনটি গ্রামের সীমানায় গিয়ে স্নান করলে বন্ধ্যা নারী সন্তান-লাভ করবে। পাঞ্জাবের নানান জায়গায় মানুষের ধারণা, চৌমাথার মোড়ে পাঁচ-কুয়োর জলে নগ্ন হয়ে স্নান করলে বন্ধ্যা নারী সন্তান-লাভ করবে। রবার্ট ব্রিফল্ট[৪৬১] দেখাচ্ছেন, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যেও ঠিক একই বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, কেননা তাদের মধ্যেও দেখা যায় সন্তান-লাভের কামনায় মেয়েরা বৃষ্টিতে ভিজছে।

বন্ধ্যাত্ব-নিরসনের কামনা ছাড়াও বিবাহের একটি অনুষ্ঠান হিসাবে বর বা বধূ বা উভয়ের গায়েই জল ঢালবার প্রথা প্রচলিত আছে—মূল উদ্দেশ্যটা অবশ্যই ওই বন্ধ্যাত্ব-নিরসনের মতোই, অর্থাৎ উর্বরতা-মূলক প্রাকৃতিক বিষয়ের সাহায্যে নরনারীকেও ফলপ্রসূ করা। গোণ্ড-রা[৪৬২] বিয়ের সময় বরের গায়ে এমনভাবে জল ঢালে যাতে তা গড়িয়ে বধূর গায়েও পড়ে। হিমালয়-অঞ্চলে[৪৬৩] দেখা যায়, বিয়ের সময় মেয়ের বাপ মেয়ে-জামাই-এর হাত এক করে ধরে এবং তার উপর জল ঢালা হয়।

কিংবা, প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার সাহায্যে মানবীয় ফলপ্রসূতার কামনা সফল করবার বিশ্বাসের বিকাশ বিবাহ-অনুষ্ঠান উপলক্ষেই আরো নানানভাবে চোখে পড়তে পারে। থার্স্টন[৪৬৪] বলছেন, দক্ষিণ ভারতে নানা উপজাতির মধ্যে দেখা যায়, বিবাহ অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে বরকে মাটি চষবার বা মাটি-চষা সংক্রান্ত কোনো ক্রিয়ার অনুকরণ করতে হয়। কূর্মীদের[৪৬৫] প্রথা অনুসারে

নববধূর আঁচলে শস্যের বীজ বেঁধে দিতে হবে। অন্যত্র[৬৬] দেখা যায়, বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ হলো গাছ পোঁতবার ব্যবস্থা। বম্বে গেজেটিয়ার-এ[৬৭] অনুমান করা হয়েছে, মেয়েদের মাথায় সিঁথি কাটবার প্রথাটিতে ক্ষেতের ফাল অনুকরণ করবার আয়োজন—অন্তত সিঁথির সিঁদুর যে ফলপ্রসূ হবার কামনাতেই ব্যবহৃত হয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

থার্স্টন[৬৮] বলছেন, দক্ষিণভারতের স্থানবিশেষে বিবাহ-অনুষ্ঠানের আয়োজন হিসেবেই উইঢিবির উপর ধান এবং ডালের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়—বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে বীজগুলিতে অঙ্কুর উদ্গম হবে, তখন বরবধূ মিলে এই অঙ্কুরিত শস্য কুয়োয় বিসর্জন দিয়ে আসবে।

অন্যত্র[৬৯] ব্যবস্থা হলো, নবদম্পতী সরার উপর ন'-রকম বীজ বুনবে। কোথাও[৭০] আবার প্রথা আছে, বরকে ছুরি দিয়ে একটুখানি জমি কোপাতে হবে—তার উপর নববধূ বীজ বপন করবে, বীজ বপন করে জলসিঞ্চন করবে।

কোথাও[৭১] বা প্রথা আছে, বিবাহের সময় নববধূর কোলে একটি শিশু-সন্তান বসিয়ে দেওয়া—কিন্তু মানব সন্তানের বদলে গাছের ফলও হতে পারে। উত্তরভারত থেকে শুরু করে দক্ষিণভারত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নানা জায়গায় এই প্রথাটি দেখা যায়। গাছের ফল এবং মানুষের ফলকে সমজাতীয় মনে করবার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত এই প্রথার মধ্যে রয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠান হিসেবে বর বা বধূ বা উভয়কেই প্রথমে গাছের সঙ্গে মিলিত হতে হচ্ছে। রিজলি-র[৭২] বর্ণনা অনুসারে, বাংলাদেশে বাগ্দিদের মধ্যে প্রথা হলো, বিয়ের দিন সকাল বেলায় বরের সঙ্গে মহুয়াগাছের বিয়ে হবে: যুবকটি মহুয়া গাছকে আলিঙ্গন করবে, মহুয়াগাছের গায়ে সিঁদুর মাখিয়ে দেবে, তার কব্জিতে সুতো বেঁধে সুতোর অপর প্রান্ত গাছের চার পাশে জড়িয়ে দেওয়া হবে এবং শেষ কালে ওই সুতো দিয়ে বরের কব্জিতে মহুয়া পাতা বেঁধে দেবার পরই সে কনে-বাড়ি গিয়ে বিয়ে করতে পারবে। অন্যত্র[৭৩], বিয়ের আগে বর ও বধূ উভয়ের সঙ্গেই আমগাছের বিয়ে হয়, আমগাছের বদলে আমের ডালও হতে পারে। কুর্মীদের[৭৪] মধ্যে প্রথা হলো, বিয়ের আগে বরের সঙ্গে বিয়ে হবে আমগাছের, বধূর সঙ্গে বিয়ে হবে মহুয়াগাছের।

ব্রিফল্ট[৭৫] বলছেন, সারা পৃথিবী জুড়ে দেখতে পাওয়া যায়, বিবাহ-অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ হলো, বর-বধূর মাথায় শস্য স্থাপন করা। আমাদের দেশে ধান-দুর্বার ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক; ব্রিফল্ট-এর রচনা অনুসরণ করলে দেখা যায়, ইয়োরোপের কৃষক মহলেও এই অনুষ্ঠানই হয়তো অল্পবিস্তর রূপান্তরের আড়ালে আজো টিকে রয়েছে।

এই জাতীয় সমস্ত অনুষ্ঠানেরই মূল কথা হলো, প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা এবং মানবীয় ফলপ্রসূতা উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও যোগাযোগে বিশ্বাস। কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে এ-বিশ্বাস অনিবার্যভাবেই বসুমাতার আদিরূপটির জন্ম দিয়েছে। কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার। কৃষিভিত্তিক সমাজ মাতৃ-প্রধান। এই স্তরের মানুষদের ধারণায়, প্রজননের মূল রহস্য নারীপ্রকৃতির মধ্যে—পুরুষ অপ্রধান, বীজ অপ্রধান; নারীই প্রধান, ক্ষেত্রই প্রধান। মানবীয় ফলপ্রসূতা বলতে মূলতই নারীর ফলপ্রসূতা, উৎপাদিকা-শক্তি। এই স্তরের চেতনায়, পৃথিবী ও জননী এক এবং অদ্বিতীয়। পৃথিবীই আদি-জননী, আদি-জননীই পৃথিবী। রবার্ট ব্রিফল্ট[১১৩] বলছেন, মানবসংস্কৃতির আদিম পর্যায়ের বসুমাতাগুলিকে এই বিশ্বাসের বিকাশ হিসেবেই চেনবার চেষ্টা করতে হবে :

> পশ্চিম এসিয়া ও ইয়োরোপের ধর্মবিশ্বাসে মহামাতৃকাগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে তার মূলে ছিলো কৃষি-অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক—ফসলের মা, বা, সোনালি ফসলের জন্মদায়িনী বসুমাতা হিসেবেই তারা কল্পিত হয়েছিলো।

ব্রিফল্ট[১১৭] দেখাচ্ছেন, নারী ও পৃথিবীর মধ্যে অভেদ-কল্পনার দৃষ্টান্ত এতো অজস্র যে, তা নিয়ে পাতার পর পাতা লিখে যাওয়া যায়। রোমান আইনকর্তাদের মতে জননী ও জমি একই ধরনের। খৃস্টানদের ধর্মপুঁথিতে বলা হয়েছে, মাতৃগর্ভ থেকে আমি নগ্নভাবেই ভূমিষ্ঠ হয়েছি, নগ্ন অবস্থাতেই আমি সেখানে ফিরে যাবো। এস্কাইলাস বলছেন, পৃথিবীই সর্বমাতৃকা—কেননা পৃথিবী থেকেই সবকিছুর জন্ম এবং পৃথিবীতেই সবকিছুর লয়। ভার্জিল বলছেন, বন্দে শস্য-মাতৃকা, বন্দে সর্বমানবমাতৃকা। প্রায় একই ভাষায় অসভ্য জার্মানেরা গান গাইতো : বন্দে পৃথিবী, মানবমাতৃকা ; দেবতার আলিঙ্গনে তুমি মানব কল্যাণে অন্নদায়িনী হয়ে ওঠো। প্রাচীন ইরাণী ধর্মবিশ্বাস অনুসারে পৃথিবী থেকেই মানুষের উদ্ভব হয়েছিলো। মানবার্থক *Homo* শব্দটি ক্ষেত্রবাচক *Humus* শব্দ থেকে এসেছে। পৃথিবী থেকেই আদি-মানব আদমের উৎপত্তি ; তবুও মানুষ পোকার মতো মাটি থেকে জন্মেছিলো এ-কথা বিশ্বাস করবার জন্যে ল্যাক্টানটিউস ডিমোক্রিটাসকে ভর্ৎসনা করেছেন। জবাবে লুক্রেটিউস বলছেন, জন্তুজানোয়ার তো আর আকাশ থেকে পড়তে পারে না, পৃথিবীর বাসিন্দারা লোনা জলের হ্রদ থেকেও জন্মাতে পারে না ; পৃথিবীকে যে মা বলা হয় তা ঠিকই বলা হয়—কেননা পৃথিবী থেকেই সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে। এই প্রাচীন বিশ্বাসটির আরো অজস্র পরিচয় রবার্ট ব্রিফল্ট-

এর[৭৮] রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে আমাদের দেশের কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করতে পারি।

মেদিনীকোষ[৭৯] অনুসারে, মাতৃ শব্দের অর্থ পৃথিবী। বিশ্বকোষে[৮০] বলা হয়েছে : 'আদ্য-মাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী এবং পৃথিবী —এই সাতজনকে মাতা কহে'। ঋগ্বেদে[৮১] আছে, 'যদূর্ধ্বস্তিষ্ঠা দ্রবিণেহ ধত্তাদ্ যদ্বা ক্ষয়ো মাতুরস্যা উপস্থে'—ব্যাখ্যাকারেরা[৮২] বলছেন, এখানে 'মাতার' বলতে 'পৃথিবীর' বোঝায়—'মাতুঃ অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ'।

সন্তানের জন্ম হওয়াকে আমরা বলি ভূমিষ্ঠ হওয়া। কেন বলি? এর পিছনে ওই আদিম বিশ্বাসেরই রেশ খুঁজে পাওয়া যায় : মানবসন্তান পৃথিবীজাত—তাই ভূমিতে স্থিত বা ভূমিতে পতিত ফলের মতোই তাকে দেখবার চেষ্টা। ব্রিফল্ট[৮৩] বলছেন,

> জন্মের পরেই শিশুকে মাটিতে শুইয়ে দেবার প্রথা ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে। শিশুর সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্কমূলক বিশ্বাস এই প্রথার মধ্যে প্রকাশিত।

সিংহলের অসভ্য আদিবাসীরা[৮৪] মনে করে, জন্মের পরই শিশুকে মাটির উপর শুইয়ে দেওয়ার প্রথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিফল্ট[৮৫] দেখাচ্ছেন, ব্রেজিল, গোল্ডকোস্ট ও মধ্য-আফ্রিকার অসভ্য মানুষদের মধ্যে ঠিক একই অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। সিসিলিতে এখনো এই বিশ্বাস টিকে আছে : মেয়েরা মনে করে, সন্তান-জন্মের পরই যদি নবজাতককে ভূমিষ্ঠ করা বা মাটিতে শোয়ানো না হয় তাহলে হাসপাতালেই তার মৃত্যু হবে।

অস্ট্রেলিয়া[৮৬] এবং উত্তর-আমেরিকায়[৮৭] আদিবাসী মেয়েদের বিশ্বাস, পৃথিবীরই কোনো কোনো গুহা থেকে তারা পেটের ছেলে পেটে পায়। ওরা বলে, গুহাগুলোর আশপাশে মাটির উপর কান দিলে অজাত-শিশুদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়।

আফ্রিকার[৮৮] এক আদিবাসী-সর্দারকে চেয়ারে বসতে বলা হয়েছিলো। সে বললো, তার চেয়ে মায়ের কোলে বসা ঢের ভালো। এই বলে সে মাটির উপর বসে পড়লো।

সংক্ষেপে : আদিম মানুষদের বিশ্বাস, মানবীয় ফলপ্রসূতা ও প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে। কৃষিআবিষ্কারের পর্যায়ে স্বভাবতই এই বিশ্বাসটির উপরই বিশেষ গুরুত্ব অর্পিত হয়। কৃষিকাজ মেয়েদের

আবিষ্কার। কৃষিকেন্দ্রিক ধ্যানধারণা তাই নারীকেন্দ্রিক—প্রজনন ব্যাপারে পুরুষের ভূমিকা অপ্রধান। মানবীয় উৎপাদন-শক্তি বলতে নারীর ভূমিকাটুকুই প্রধান। অতএব, এই পর্যায়ের ধ্যানধারণা অনুসারে নারীর উৎপাদিকা-শক্তি এবং প্রকৃতির উৎপাদিকা-শক্তি—উভয়ের মধ্যে গভীর ও নিবিড় যোগাযোগ পরিকল্পিত হয়েছে।

অতএব একদিকে দেখা যায়, নারীর উৎপাদিকা-শক্তির উপরই প্রাকৃতিক উর্বরতা নির্ভরশীল: পৃথিবীর আদি-শস্য নারীদেহ-সমুদ্ভূত বলেই কল্পিত, কিংবা প্রজনন-সংক্রান্ত কোনো মেয়েলি ব্যাপারের সাহায্যেই প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা আয়ত্বে আনবার কল্পনা।

অপরদিকে দেখা যায়, প্রাকৃতিক উৎপাদিকা-শক্তির উপরই নারীর উৎপাদিকা-শক্তি নির্ভরশীল: পৃথিবীই আদি-জননী, মানবসন্তান পৃথিবী-সমুদ্ভূত, কিংবা প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের সাহায্যেই মানবীর সন্তান-কামনা সফল করবার আয়োজন করা হচ্ছে।

সমাজ-বিকাশের পিছন-দিককার পর্যায়ের মানুষেরা—*confused the process by which human beings reproduce their kinds with the process by which plants discharge the same function, and fancied that by resorting to the former they were simultaneously forwarding the latter*[১৮৯]—দুটি বিষয়ের মধ্যে তফাত করতে শেখেনি: একটি বিষয় হলো নিজেদের বংশবৃদ্ধি সংক্রান্ত পদ্ধতি, আর একটি বিষয় হলো গাছগাছড়ার বংশবৃদ্ধি সংক্রান্ত পদ্ধতি। অতএব তারা কল্পনা করেছে যে, প্রথমটির সাহায্যেই দ্বিতীয়টিকেও আয়ত্বে আনা সম্ভবপর।

কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখা দরকার যে, কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে প্রকৃতিকে আয়ত্বে আনবার কল্পনায় এই যে অনুষ্ঠান এরই সঙ্গে নারীপ্রাধান্যের যোগাযোগও অত্যন্ত স্পষ্ট। তার কারণ, কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার, তাই প্রাকৃত পর্যায়ের কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ নারীপ্রধান এবং অতএব, কৃষিকেন্দ্রিক এই অনুষ্ঠানটিও নারীপ্রধান। অধ্যাপক জর্জ টমসন[১৯০] যেমন বলছেন:

> the ritual for fertilising the soil was modelled on the ritual for reproducing the human species, that is the ritual of childbirth. The social status of the women corresponded to the importance of their part in the economic life. The community was ruled by female chiefs, whose sexual life was treated as a ceremonial cycle of mimetic magic. The queen had to conceive in order that the earth might become fruitful.

জননী ও পৃথিবী এক। আদিম *Earth-goddesses* বা *Earth-mothers* বা বসুমাতাগুলি এই বিশ্বাসেরই বিকাশ।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ[৪৯১] অনুমান করছেন, যে-বিশ্বাসটি থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আদিম বসুমাতা-পরিকল্পনার জন্ম সেই বিশ্বাসটিই আমাদের দেশের শাক্ত মতবাদকে বোঝবার মূলসূত্র। এবং লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস-সন্ধানে অগ্রসর হয়ে আমরা দেখেছি, লোকায়তিক ধ্যানধারণাকে বোঝবার জন্য শাক্ত মতবাদের আদি-তাৎপর্য বোঝবার প্রয়োজন আছে। অতএব আমাদের পক্ষে ওই আদিম বসুমাতাগুলির কিছুটা পরিচয় পাবার চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গ্রামদেবতা ও মোহেনজোদারোর বসুমাতা

মনিয়ার উইলিয়মস্[৪৯২], হপ্‌কিন্স[৪৯৩] প্রমুখ ইয়োরোপীয় বিদ্বানেরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, হিন্দুধর্মে আর্য-পূর্ব, বা তাঁদের পরিভাষায়, দ্রাবিড়-দের যদিই বা কোনো অবদান থাকে তাহলে তা নেহাতই নগণ্য এবং হিন্দুধর্মের যেটা হলো সবচেয়ে বীভৎস ও কুৎসিত দিক সেইটুকুই ওই অনার্যদের অবদান। অপরপক্ষে ওপ্পার্ট[৪৯৪] প্রমুখ গবেষকেরা হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে এই অনার্যদের অবদানটাকেই বড়ো করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

মোহেনজোদারো ও হরপ্পা আবিষ্কার হবার পর, স্যর জন মার্শাল[৪৯৫] বললেন, এই পুরোনো মতদ্বৈতের উপর নতুন আলোকপাত হলো; কেননা মোহেনজোদারো ও হরপ্পায় খুঁজে পাওয়া গেলো প্রাক্-আর্য যুগের বাস্তব কীর্তি। এই প্রসঙ্গে প্রাক্-আর্য যুগের যে বাস্তব কীর্তিগুলিকে স্যর জন মার্শাল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান মনে করলেন তা হলো অজস্র পোড়া-মাটির ছোটোছোটো নারীমূর্তি। এই জাতীয় নারীমূর্তি হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো উভয় স্থানেই পাওয়া গেলো—শুধু তাই নয়, বেলুচিস্তানের স্থান-বিশেষেও প্রত্নতত্ত্বমূলক খননকাজের ফলে এই জাতীয় বহু মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। স্যর জন অনুমান করছেন, এগুলির মধ্যে কয়েকরকম মূর্তিকে হয়তো নিছক খেলার পুতুল মনে করা যেতে পারে; কিন্তু সবগুলিকে পুতুল-মাত্র মনে করবার অবকাশ নেই। এগুলির মধ্যে কয়েক-রকম মূর্তির সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের যোগাযোগ থাকবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। দৃষ্টান্ত হিসেবে স্যর জন উল্লেখ করছেন, একরকম নারীমূর্তির কোলে সন্তান, আর একরকম নারীমূর্তির গর্ভে সন্তান। এবং তিনি মন্তব্য করছেন, সন্তান-কামনায় মেয়েরা

হয়তো ওই রকম সন্তানবতীর মূর্তি মানত করতো। আজো ভারতবর্ষের পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলে, নজির হিসেবে স্যর জন বলছেন, মাতৃত্বের কামনায় মাতৃমূর্তি মানত করবার প্রথা দেখা যায়। তাই তাঁর মতে এগুলির ব্যাখ্যা হলো : *ex-voto offerings, perhaps with a magical significance, for the purpose of procuring offspring*। এইখানে বলে রাখা যায়, অনুরূপ দৃষ্টান্তের আলোচনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[৭৬] দেখাচ্ছেন, এ-জাতীয় দৃষ্টান্তকে মানত-মূলক মনে করা অসঙ্গত ; কেননা, এর মূলে রয়েছে জাদুবিশ্বাস এবং ধ্যানধারণার ক্রমবিকাশের দিক থেকে মানত-মূলক মনোভাবের চেয়ে এই জাদুবিশ্বাস অনেক প্রাচীন পর্যায়ের পরিচায়ক। সেদিক থেকে, *ex-voto offerings* এবং *magical significance*—এই দুটি কথা পরস্পর-বিরোধী হতে পারে। তাছাড়া, একটু পরেই স্যর জন নিজেই দেখাচ্ছেন, সন্তান কামনা ছাড়াও এই মাতৃমূর্তিগুলির সঙ্গে ফসল-কামনা মূলক জাদুবিশ্বাসের যোগাযোগ থাকা খুবই সম্ভব।

অবশ্যই, স্যর জন বলছেন, হরপ্পা-মোহেনজোদারোতে পাওয়া নারীমূর্তির মধ্যে বেশির ভাগই হলো এক-ধাঁচের : প্রায় নগ্ন, দাঁড়ানো ভঙ্গি, পরিপাটি করে চুল বাঁধা, ইত্যাদি। বেলুচিস্তান অঞ্চল থেকে পাওয়া নারীমূর্তিগুলির সঙ্গে এগুলির তফাত আছে। বেলুচিস্তানের মূর্তিগুলি পূর্ণাঙ্গ নারীমূর্তি নয় : মাথা, ধড় এবং তারপর শেষ—মিনোয়ান ও মিসিনিয়ান মাতৃদেবীদের মতো। পরের যুগের বসুমাতার বা *Earth-goddess*-এর সঙ্গে এই মূর্তিগুলির মিল খুব বেশি।

পার্সিয়া থেকে শুরু করে ইজিয়ন পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ দেশ জুড়ে বহু জায়গাতেই ওই সিন্ধু-উপত্যকা ও বেলুচিস্তান থেকে পাওয়া মাতৃমূর্তির অনুরূপ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে : ইলাম, মেসোপটেমিয়া, ট্রান্সক্যাস্‌পিয়া, এসিয়া-মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রিট, বালকান্‌, ইজিপ্ট। স্যর জন বলছেন, এই মূর্তিগুলি সম্বন্ধে সাধারণত বলা হয়, এগুলি হলো মহা-মাতৃমূর্তি (*Great Mothers*) বা প্রকৃতিমাতার মূর্তি (*Nature Goddess*),—আনাতোলিয়ায় এই মাতৃতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিলো এবং তারপর তা পশ্চিম এসিয়ার নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে : মাইরেস্‌-এর ধারণায় এই মাতৃতন্ত্র আনাতোলিয়া বা সিরিয়া থেকে মেসোপটেমিয়ার দিকে বিস্তৃত হয়েছিলো, দ্য-মর্গান মনে করেন মেসোপটেমিয়া থেকেই এগুলি পশ্চিম দিকে বিস্তারলাভ করেছিলো। স্যর জন মার্শাল বলছেন, বেলুচিস্তান এবং সিন্ধু উপত্যকায় এই মাতৃতন্ত্রের পরিচয় পাবার দরুন প্রমাণ হলো যে, এর আগে পর্যন্ত ওই মাতৃতন্ত্রের বিস্তার যতোটুকু মনে হতো, আসলে তার চেয়ে বিস্তারটা অনেক বেশি : পৃথিবীর যে-দেশেই এর জন্মস্থান হোক না কেন, এ-বিষয়ে কোনো

সন্দেহ নেই যে, নব্যপ্রস্তর যুগেই—এমন কি হয়তো প্রত্ন-প্রস্তর-যুগেও প্রাচ্যের বহুদূর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিলো। ইতিপূর্বে অন্যত্র যে-সব মাতৃমূর্তি পাওয়া গিয়েছে সেগুলির সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার মাতৃমূর্তি-গুলির সাদৃশ্য অত্যন্ত গভীর; তাই এ-সিদ্ধান্ত সংবরণ করা কঠিন যে, সিন্ধুসভ্যতার ওই মূর্তিগুলিও বসুমাতার মূর্তিই এবং পশ্চিমাঞ্চলের অনুরূপ মূর্তি যে-উদ্দেশ্য সাধন করেছে এগুলিও নিশ্চয়ই তা সাধন করতো। হরপ্পা-মোহেনজোদারো আবিষ্কৃত হবার পর এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব অত্যন্ত বেড়ে গেলো; কেননা দেখা গেলো নীল-নদ থেকে সিন্ধু-নদ পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে একটানাভাবে—যে-ভূখণ্ড শুধুমাত্র ভৌগোলিকভাবেই সংযুক্ত নয়, তাম্র-প্রস্তর যুগে যার মধ্যে সংস্কৃতিক যোগাযোগও বর্তমান ছিলো,—এই মাতৃমূর্তিগুলি মাটি চাপা পড়ে রয়েছে। এই জাতীয় মাতৃকা সম্বন্ধে স্যর জন মার্সাল[৩১] মন্তব্য করলেন :

> ওই হলো মাতৃকা বা মহামাতৃকা এবং "প্রকৃতির" নমুনা—যে-প্রকৃতি থেকে ক্রমশ "শক্তি"র উদ্ভব হয়েছিলো। গ্রামদেবতারা তারই প্রতিনিধি। এই গ্রামদেবতাদের নাম বহু প্রকারের এবং স্থানবিশেষে তাদের গুণাগুণের মধ্যেও পার্থক্য আছে, কিন্তু তারা প্রত্যেকে একই শক্তির মূর্ত বিগ্রহ।...এই মাতৃকা জননশক্তির স্রষ্টা। পশ্চিম এসিয়ার মাতৃকাদেবীদের মতোই এগুলিরও উদ্ভব যে মাতৃপ্রধান সমাজে হয়েছিলো সে-কথা খুবই সম্ভবপর মনে হয়। সে-সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, এ-বিষয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না যে, অনার্য দেশবাসীদের জাতীয় দেবদেবীদের মধ্যে এই মাতৃকারা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলো। তার নানা রকম পরিচয় পাওয়া যায়। আদিম ট্রাইবদের মধ্যে এই মাতৃকাগুলির জনপ্রিয়তা চোখে পড়ে; তাছাড়া, এদের অনুষ্ঠান-উৎসবাদি ব্যাপারেও ব্রাহ্মণদের বদলে নীচজাতির অচ্ছুতেরা প্রধান অংশ গ্রহণ করে—উক্ত অচ্ছুতেরা পুরোনো ট্রাইবের লোক এবং তারাই জানে কেমন করে মানুষের কথা ওই মাতৃকাদের কর্ণগোচর করা যায়। আর্যপূর্ব ট্রাইবগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি কখনোই হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই ট্রাইবগুলির মধ্যে মাতৃকা বা বসুমাতার উপাসনা বিশেষ জোরালো হয়ে আছে দেখা যায়। বৈদিক পুরাণ-জগতে দেবীরা অপ্রধান; বৈদিক আর্যদের বসুমাতা 'পৃথিবী' আসলে মহামাতৃকা বা দেবীমাতা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মোহেনজোদারোর দেবীমূর্তি-প্রসঙ্গে স্যর জন মার্সালের ওই মন্তব্যগুলি আধুনিক ভারততত্ত্ববিদ্‌-দের উপর অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। কেননা, প্রধানত এই মন্তব্যের নির্দেশ অনুসারে অগ্রসর হয়েই আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকে বলছেন, শাক্ত মতবাদ শুধুই যে আজকের দিনে আমাদের দেশে বেঁচে রয়েছে তাই নয়—এর ইতিহাস অনেক হাজার

বছরের পুরোনো। দ্বিতীয়ত, এ-মতবাদের বিকাশ অতীতকালে শুধুমাত্র আমাদের দেশের গণ্ডিটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো না, দেশান্তরেও তার বিকাশ ঘটেছিলো। যেমন মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ[১৯৮] বলছেন :

> An enquiry into the ancient cultures would show that the cult of *Sakti* is very old in India as in other parts of the world. And it is quite possible that it existed along with Saiva and Pasupata cults in the days of the pre-historic Indus-Valley civilization.
>
> প্রাচীন সংস্কৃতি সংক্রান্ত অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায়, শাক্ত পুজা-পদ্ধতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সুপ্রাচীন। খুব সম্ভব, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতাতে শৈব ও পাশুপত পূজাপদ্ধতির পাশাপাশি এই শাক্ত পূজাপদ্ধতিও বর্তমান ছিলো।

তাই বলে এই শাক্ত-পূজাপদ্ধতিকে শুধুমাত্র অতীতের ঘটনা মনে করা চলবে না। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ[১৯৯] তাই বলছেন :

> The cult of *Sakti* produced a profound influence on general Indian thought. A topographical survey of India would show that the country is scattered over with numerous centers of *Sakti-sadhana*. It was widespread in the past and has continued unbroken till today.
>
> শাক্ত-পূজাপদ্ধতি সামগ্রিকভাবে ভারতীয় চিন্তাধারার উপর অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। স্থানবিবরণের দিক থেকে ভারতবর্ষের আলোচনা করলে দেখা যায়, দেশের উপর অসংখ্য শক্তিসাধনার কেন্দ্র ছড়ানো রয়েছে। অতীতে এই শাক্ত-ধর্ম অত্যন্ত প্রবল ছিলো এবং আজকের দিন পর্যন্ত তা অবিচ্ছেদভাবেই চলে আসছে।

আজো ভারতবর্ষের বুকে শক্তি-সাধনার কতো অসংখ্য কেন্দ্র ছড়ানো আছে তার নজির দেখাবার জন্যে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ স্যর জন উড্রফের "শক্তি ও শাক্ত" গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, উড্রফ্ প্রমুখের গবেষণা অনুসরণ করে শক্তি-সাধনার কেন্দ্রের দিক থেকে ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র আঁকলে তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হবে। এবং স্যর জন মার্শালের মন্তব্যকে আমরা যদি গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত থাকি তাহলে মানতে হবে শাক্ত ধ্যানধারণার সঙ্গে সম্ভবত মাতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থার যোগাযোগ ছিলো। ডক্টর এরেন্‌ফেল্‌স্ মাতৃপ্রধান[২০০] সমাজ-ব্যবস্থা ও তার স্মারকগুলির

দিক থেকে ভারতবর্ষের বাস্তবিকই একটি মানচিত্র প্রস্তুত করেছেন। এই মানচিত্রের সঙ্গে শক্তি-সাধনার কেন্দ্রের দিক থেকে আঁকা আমাদের প্রস্তাবিত মানচিত্রটির তুলনা করলে শাক্ত ধ্যানধারণার উৎস সংক্রান্ত সমস্যার উপর নিশ্চয়ই আলোকপাত হতে পারে। দুঃখের বিষয়, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের চেতনায় এই তুলনামূলক পদ্ধতির কথা,— এবং এর উপর নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের সম্ভাবনার কথা,—একবারও উদিত হয়নি। তার বদলে তিনি শাক্ত ধ্যানধারণার আলোচনা প্রসঙ্গে শুধুমাত্র নিগূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্বের অন্বেষণেই আত্মনিয়োগ করেছেন। এবং ঠিক এই কারণেই তাঁর অমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও শক্তি ও শাক্ত সম্প্রদায় সংক্রান্ত তাঁর আলোচনা বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শাক্ত ধ্যানধারণার উপর বৈজ্ঞানিক আলোকপাত করবার বদলে তিনি শুধুই অধিবিদ্যামূলক কূট বিচারের অবতারণা করেছেন। অথচ, তাঁর রচনা থেকে যে-দুটি কথা উপরে উদ্ধৃত করেছি সেই দুটির প্রতিই তিনি যদি উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে সম্মত হতেন তাহলে তাঁকে স্বীকার করতে হতো যে, শাক্ত ধ্যানধারণার আদি ও অকৃত্রিম রূপটির মধ্যে অধিবিদ্যামূলক ওই জাতীয় কূট তত্ত্বের অন্বেষণ করাই অপ্রাসঙ্গিক ও বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ প্রচেষ্টা হতে বাধ্য। কেন,—সে কথা স্পষ্টভাবে দেখা দরকার। স্যর জন মার্শালের মন্তব্য অনুসারে শাক্ত মতবাদের আদি-অকৃত্রিম রূপটিকে খুঁজে পাবার প্রধানত দু'রকম উপায় আছে। এক: হরপ্পা-মোহেনজোদারো এবং সে-আমলের সিন্ধু-নদ থেকে নীল-নদ পর্যন্ত সুবিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে মাটি-খুঁড়ে-পাওয়া মাতৃমূর্তিগুলির তাৎপর্য নির্ণয় করে। দুই: আধুনিক ভারতবর্ষের ট্রাইব্যাল ও আধা-ট্রাইব্যাল অঞ্চলের গ্রামদেবতা-গুলির তাৎপর্য নির্ণয় করে। অবশ্যই, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মধ্যযুগে রচিত তান্ত্রিক ও শৈবাদি পুঁথিপত্রের মধ্যে অধিবিদ্যামূলক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি স্পষ্টই অধ্যারোপের ফল— প্রাগৈতিহাসিক ধ্যানধারণার উপর বা, যা একই কথা, সমাজ-বিকাশের অত্যন্ত প্রাচীন পর্যায়ের ধ্যানধারণার উপর মধ্যযুগীয় ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধ্যান-ধারণার অধ্যারোপ। তান্ত্রিকাদি রচনায় এই জাতীয় অধিবিদ্যামূলক ধ্যানধারণা যে অধ্যারোপেরই পরিণাম তার একটি স্পষ্ট প্রমাণ হলো এই অধিবিদ্যামূলক ধ্যানধারণাগুলির মধ্যে অসংলগ্নতা ও পরস্পর-বিরোধিতা: বিভিন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের তত্ত্ব, বৈদান্তিক তত্ত্ব প্রভৃতি নানা প্রকার তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তান্ত্রিক পুঁথিপত্রগুলির মধ্যে। তাই স্পষ্টই বোঝা যায়, উত্তরযুগে এই জাতীয় তত্ত্ব কৃত্রিমভাবে শাক্ত ধ্যানধারণার উপর আরোপিত হয়েছে বা এই জাতীয় তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে কৃত্রিমভাবে শাক্ত ধ্যান-ধারণাগুলিকে পুরে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে, শাক্ত মতবাদের

আলোচনায় গবেষক যদি এই অধিবিদ্যামূলক কূট তত্ত্বের উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন,—দুঃখের বিষয়, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ তাই আবদ্ধ রেখেছেন,—তাহলে শাক্ত মতবাদকে উপলক্ষ্য করে হলেও তাঁর আলোচনা প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগীয় কূট অধিবিদ্যার আলোচনাই হয়ে দাঁড়াবে,—মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের আলোচনা যে-রকমটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোহেনজোদারো-প্রসঙ্গে স্যর জন মার্সালের মন্তব্যই আধুনিক বিদ্বানদের এ-বিষয়ে সচেতন করেছে যে, একদিকে মোহেনজোদারোর ওই নারীমূর্তিগুলি থেকে এবং অপরদিকে আধুনিক ভারতবর্ষের গ্রামদেবতাগুলির স্বরূপ-উপলব্ধির দিক থেকে—শাক্ত মতবাদের আদি-অকৃত্তিম রূপটিকে চেনবার চেষ্টা করা যায়। তাই আমাদের পক্ষে এখানে সুস্পষ্টভাবে দেখা দরকার এ-বিষয়ে স্যর জন মার্সাল ঠিক কী বলছেন[৫০১] :

> মোহেনজোদারো বা হরপ্পায় শক্তিবাদ সংক্রান্ত কোনো অপরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই কথাটি আমি খুব স্পষ্টভাবে বলে রাখতে চাই। যেটুকু প্রমাণ আছে তা প্রধানতই ইংগিতমূলক। ভারতবর্ষে শক্তি উপাসনা অত্যন্ত সুপ্রাচীন। বসুমাতার পুজাপদ্ধতি থেকেই এর জন্ম এবং শিবপুজাপদ্ধতির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাছাড়া, পশ্চিম-এসিয়ার রকমারি পুজাপদ্ধতির সঙ্গে এই শাক্ত উপাসনার কয়েকটি অঙ্গের সাদৃশ্য এত গভীর যে, আমরা তার কথা এড়িয়ে যেতে পারি না, বা, সিন্ধু উপত্যকার মানুষদের মধ্যে এর অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। শক্তিবাদের মূল কথা হলো, যৌন দ্বৈতভাব।…আদিম মাতৃকাউপাসনার এই বিকাশটির মধ্যে, দেবী পরিণত হয়েছেন নারী-শক্তির ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রূপে (শক্তি) বা এক অনাদি সত্যে (প্রকৃতি); এবং চিরন্তন পুরুষ-তত্ত্বের (পুরুষ) সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি বিশ্বের এমনকি দেবতাদেরও স্রষ্টা ও মাতা হয়েছেন (জগন্মাতা বা জগদম্বা)। সর্বোচ্চ রূপের দিক থেকে তিনি হলেন মহাদেবী, শিবের সঙ্গিনী, যাঁর (শিবের) পুজোর সঙ্গে, আমরা আগেই বলেছি, শক্তিবাদ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছিলো। তবুও তিনি শিবের স্রষ্টা ও শিবের চেয়েও বড়ো বলে কল্পিত হয়েছেন।…শক্তিবাদের অনেক তত্ত্ব ও আচার অনুষ্ঠান উত্তর যুগের হিন্দুধর্মের অবদান এবং তা প্রধানতই আর্য-প্রভাবের ফল। কিন্তু তার মৌলিক অঙ্গগুলি সুনিশ্চিতভাবেই অনার্য এবং এগুলি যৌন দ্বৈতের ধারণা থেকে উদ্ভূত—যে-যৌন-দ্বৈতের ধারণা, বার্থ বলছেন, ভারতবর্ষের মতোই পুরোনো।

মেডিটারেনিয়ানের কিনারায়, এসিয়া মাইনর-এ, মাতৃকা-তন্ত্রের যে-বিকাশ দেখা যায় তার সঙ্গে শক্তিবাদের তুলনা করে স্যর জন মার্সাল[৫০২] বলছেন :

> মৌলিক ধ্যানধারণার দিক থেকে এই (এসিয়ামাইনরের) পুজাপদ্ধতিগুলির সঙ্গে ভারতীয় শক্তিবাদের সাদৃশ্য যথেষ্ট স্পষ্ট। এই পুজাপদ্ধতিগুলির

> কেন্দ্রে আছেন মাতা বা প্রকৃতি দেবী, যিনি আত্মদেহ থেকে নিজের সঙ্গী দেবতাটির সৃষ্টি করেছেন—ঠিক যেমন ভারতবর্ষের দেবীমাতা শিবকে সৃষ্টি করলেন আর তারপর এই দেবতাটির সঙ্গে মিলিত হয়েই সবকিছুর জন্ম দিলেন…। ওই দেবীমাতার পূজাপদ্ধতির অঙ্গ হলো নির্বিচার যৌনমিলন ও রক্তবহুল বলিদান। এই পূজাপদ্ধতির সঙ্গে ভারতবর্ষীয় শক্তিপূজার আশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা বহুদিন থেকেই স্বীকৃত হয়েছে ; এবং একথাও স্বীকৃত হয়েছে যে, একজাতীয় সমাজ-ব্যবস্থা থেকেই (অর্থাৎ মাতৃপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা থেকেই) উভয়ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে) এই পূজাপদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিলো : প্রাক্-আর্য যুগে ভারতবর্ষ ও নিকট-প্রাচ্য উভয় দেশেই মাতৃপ্রধান সমাজ ছিলো বলে অনুমান করা হয়। যে-কথাটি স্বীকার করা হয়নি—এবং হরপ্পা-মোহেনজোদারো আবিষ্কৃত হবার শুধুমাত্র পরই যা দেখতে পাওয়া সম্ভবপর হলো,—তা এই যে, তাম্রপ্রস্তর যুগেও ভারতবর্ষ ও পশ্চিম-এসিয়া একই সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো !

সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিম এসিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিলো কি না এবং যদিই বা ছিলো তাহলে তা ঠিক কোন ধরনের যোগাযোগ,—এ-বিষয়ে প্রত্নতত্ত্বমূলক গবেষণার মূল্যকে ছোটো করবার প্রশ্ন নিশ্চয়ই ওঠে না। কিন্তু গবেষকের দৃষ্টি যদি শুধুমাত্র এই প্রশ্নটির উপর আবদ্ধ থাকে যে, 'এ-দেশ থেকে শক্তিবাদ ওদেশে রপ্তানি হয়েছিলো, না, ওদেশ থেকে তা এদেশে আমদানি হয়েছিলো ?'…—তাহলে তা আমাদের বর্তমান সমস্যা-প্রসঙ্গে অনেকাংশেই অবান্তর হতে বাধ্য। কেননা, এই আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির পরিণতি শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, বর্তমানে আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো, সেই সুদূর অতীতে এই জাতীয় ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস-অনুষ্ঠান ঠিক কোন্ ধরনের পার্থিব প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করেছে ? এই শক্তিবাদের বাস্তব কারণ ঠিক কী ? কোন্ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার চেষ্টায় মানবচেতনায় এই শক্তিবাদের আবির্ভাব হয়েছিলো ? কোনো-না-কোনো বাস্তব কারণ নিশ্চয়ই ছিলো, নিশ্চয়ই ছিলো কোনো-না-কোনো পার্থিব প্রয়োজন মেটাবার তাগিদ। কেননা শক্তিবাদ—তথা, যে-কোনো রকম ধ্যানধারণাই হোক না কেন,—নিশ্চয়ই অকারণও হতে পারে না, স্বয়ম্ভূও হতে পারে না। মানুষের পক্ষে পারিপার্শ্বিক পৃথিবীটাকে আয়ত্বে আনবার চেষ্টার পরিণাম হিসেবেই ধ্যানধারণার পক্ষে মানুষের চেতনায় আবির্ভূত হওয়া সম্ভবপর।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলছেন, সিন্ধুসভ্যতার ওই বসুমাতাগুলির সঙ্গে প্রাচীন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের বসুমাতাগুলির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। যদি তাই থাকে তাহলে অনুমান করতে হবে, যে-উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য,

যে-পার্থিব পরিবেশে, প্রাচীনকালের অন্যান্য দেশের মানুষেরা এই বসুমাতা মূর্তিগুলি গড়েছিলো, সেই উদ্দেশ্যেই প্রাচীনকালের সিন্ধুউপত্যকার মানুষেরাও গড়েছিলো তাদের বসুমাতা-মূর্তি। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যদি মূর্ত তথ্যের নির্ভরে সত্যিই প্রমাণ করেন যে, অন্যান্য দেশের শক্তিবাদ সিন্ধুসভ্যতার শক্তিবাদকে প্রভাবিত করেছিলো, কিংবা, সিন্ধুসভ্যতার শক্তিবাদ প্রভাবিত করেছিলো অন্যান্য দেশের শক্তিবাদকে,—তাহলেও, এই পার্থিব প্রয়োজন মেটানোর তাগিদটির কথা সত্যিই ছোটো হয় না। কেননা, ওই পার্থিব প্রয়োজনের দাবি মেটাবার তাগিদ ছাড়া কোনো মানবদলের মনেই এই শক্তিবাদের ঠাঁই হওয়া সম্ভব নয়[৩৩৪]। ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, দেশোদ্ভূতই হোক আর বিদেশাগতই হোক, শক্তিবাদের বিকাশের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রের প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রটির অভাবেই পশুপালনজীবী বৈদিক মানুষদের জীবনে শক্তিবাদের বিকাশ সম্ভবপর হয়নি। কিংবা, প্রত্নতত্ত্বেরই নজির রয়েছে যে, একই দেশে এবং একই জাতির জীবনে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেবার ফলে ওই বাস্তব-প্রয়োজনের তাগিদে রূপান্তর ঘটেছে—তাই শক্তিবাদের প্রভাবও বিলুপ্ত হয়েছে: এই জাতীয় নজির থেকে অনুমান করা যায়, শক্তিবাদের সম্যক-উপলব্ধি ব্যাপারে ওই পার্থিব প্রয়োজনের প্রসঙ্গটিই সবচেয়ে মৌলিক। অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের[৩৩৫] রচনা অনুসরণ করে এখানে কয়েকটি প্রত্নতত্ত্বমূলক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়।

ডানিউব-সংস্কৃতির প্রথম পর্যায়ে (Phase I) সামান্য কিছু কিছু ছোটো স্ত্রীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ-জাতীয় মূর্তি পাওয়া গিয়েছে অজস্র। তৃতীয় পর্যায়ে এ-জাতীয় মূর্তি অনুপস্থিত। তার মানে, ওই প্রাচীন সংস্কৃতির মানুষেরা যে-পার্থিব প্রয়োজনের দরুন এ-রকম মূর্তি গড়েছে, তৃতীয় পর্যায়ে পৌঁছবার পর সে-প্রয়োজনের তাগিদ নিশ্চয়ই কমে গিয়েছিলো। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এই তৃতীয় পর্যায়ের জীবন-যাপন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কী? অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড দেখাচ্ছেন, তৃতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হলো, পশুপালন ও যুদ্ধবিগ্রহ। যদি তাই হয় তাহলে সে-পর্যায়ে শুধুই যে মেয়েদের মহিমা ক্ষুণ্ণ হবার কথা তাই নয়, পৃথিবীতে উর্বরা-শক্তি সঞ্চার করবার তাগিদও শিথিল হওয়া সম্ভবপর।

রুমানিয়ার গুমেলনিটা-সংস্কৃতির প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় ছোটো ছোটো অজস্র মৃত্তিকা-মূর্তি—সমস্তই নারীমূর্তি। দ্বিতীয় পর্যায়ে নারীমূর্তির অভাব নেই কিন্তু তারই সঙ্গে পুরুষ-মূর্তির আবির্ভাবও চোখে পড়ে। গুমেলনিটা-সংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপের উপর আর একটি পরবর্তী সংস্কৃতির স্বাক্ষর পাওয়া যায়। তার বৈশিষ্ট্য হলো, পাথরের তৈরি তীরের ফলক আর যুদ্ধের কুড়ুল। এই সংস্কৃতির স্বাক্ষরগুলির মধ্যে নারীমূর্তি চোখে পড়ে না।

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন এ-জাতীয় প্রত্নতত্ত্বমূলক আরো প্রমাণের উল্লেখ করছেন। সেগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায়, একই স্থানে এবং একই জাতির মানুষদের বেলায় জীবনধারণ পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেবার ফলে এ-জাতীয় নারীমূর্তি রচনার প্রেরণাও ফুরিয়ে গিয়েছে। তার থেকেই অনুমান করা যায় যে, মাতৃমূর্তি-রচনার এই প্রেরণাটি মানবমনের কোনো শাশ্বত বা সনাতন বৃত্তির বিকাশ নয়; তার বদলে এর মূলে রয়েছে জীবনধারণ সংক্রান্ত পার্থিব প্রয়োজন। সেই একই প্রয়োজনের তাগিদে স্বতন্ত্র দেশের মানবদল পরস্পর নিরপেক্ষভাবেই মাতৃমূর্তি রচনায় মন দিতে পারে। কিংবা প্রত্নতত্ত্বের নজির থেকে যদি এ-কথা প্রমাণিত হয় যে, ওই সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ-দেশের মাতৃকাতন্ত্র ওদেশের মাতৃকাতন্ত্রকে প্রভাবিত করেছে তাহলেও, 'এই প্রভাব কী করে সম্ভবপর হলো?' সে-প্রশ্নের উত্তরে মানতেই হবে, জীবন-সংগ্রামের চাহিদার দরুন ওদেশের মানুষও নিশ্চয়ই একই পার্থিব প্রয়োজন বোধ করেছিলো—তা না হলে, এই মাতৃকাতন্ত্রের বিকাশের জন্য তাদের মনে উপযুক্ত জমিই তৈরি হবার কথা নয়।

স্যর জন মার্সালের যুক্তি অনুসরণ করে আমরা যদি এই মাতৃমূর্তিগুলিকে শক্তিবাদের বাস্তব প্রতীক বলে গ্রহণ করতে রাজি হই তাহলে আমাদের পক্ষে স্বীকার করা প্রয়োজন, শাক্ত-মতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবার কাজে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হবে, এ-মতবাদ মানবউন্নতির কোন ধরনের পর্যায়ে ঠিক কোন ধরনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিলো?

প্রত্নতত্ত্বলব্ধ ওই মাতৃমূর্তিগুলি যে উর্বরা-শক্তির কামনাতেই রচিত হয়েছিলো—এ-বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। কিন্তু ওই প্রাচীন মানুষদের কাছে উর্বরা-শক্তির কামনা বলতে ঠিক কী বুঝিয়েছে এবং এই মাতৃমূর্তিগুলির সাহায্যে তারা কী ভাবে সে-কামনা সফল করবার চেষ্টা করেছে—এ-বিষয়ে স্পষ্টতর ধারণা পাবার প্রয়োজন আছে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, এ-বিষয়ে একটা মত হলো, মূর্তিগুলি মানতমূলক। মাতৃত্বের কামনায় মেয়েরা তখনকার কালে এ-জাতীয় মাতৃমূর্তি মানত করতো। শুধুই যে মোহেনজোদারোর মাতৃমূর্তিগুলি প্রসঙ্গে এই জাতীয় মানত-মূলক মনোভাব অনুমান করা হয়েছে তাই নয়, প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসের এ-জাতীয় মূর্তিকেও অনেকে মানত-মূলক মনে করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[৮৩] দেখাচ্ছেন, এই মানত-মূলক উপচার (*votive offerings*) বলে শব্দকে পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, তার দরুন, বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের একটা সংস্কারগত ধারণা হতে পারে। এ-কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, ওই মূর্তিগুলির মধ্যে বিশেষ করে পরের যুগের মূর্তিগুলি মানতমূলক বলেই মনে হয়; কিন্তু এগুলির সবই মানত-মূলক নয়। এবং,

> ...their neolithic antecedents must have belonged to pre-deistic cults in which the very idea of an offering was unknown[৩০৭].

> এগুলির অগ্রবর্তী নব্যপ্রস্তরযুগের মূর্তিগুলি নিশ্চয়ই প্রাক্‌-ঈশ্বর পর্যায়ের অনুষ্ঠানাদির অন্তর্গত, যে-পর্যায়ে পুজোপচারের ধারণাটিই অজ্ঞাত ছিলো।

মানত করে এবং মনোবাঞ্ছা পূরণ হলে পর যে-পুজোপচার দেওয়া হয় তাকেই মানত-মূলক উপচার বলে: আপনি বিপদে পড়েছেন, আপনি তখন ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আপনি তাঁকে অমুক বা তমুক জিনিস দেবেন। প্রায়ই দেখা যায়, মনোবাঞ্ছা পূরণ হবার আগেই প্রতিশ্রুত দ্রব্য ঈশ্বরকে দেওয়া হচ্ছে। আজকের দিনে যাঁরা মানসিক করছেন তাঁরা হয়তো এই বলে সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, তাঁদের পক্ষে সবটাই ঈশ্বরভক্তির পরিচয়। আসলে কিন্তু তা নয়। এর মূলে রয়েছে অত্যন্ত আদিম পর্যায়ের এক জাতীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান। গ্রীসে গরু ভেড়ার রোগ হলে চাষিরা মাটির ষাঁড় গড়ে মন্দিরে দিয়ে আসতো, দেবী ডিমিটর যাতে মাটির ষাঁড় পেয়ে আসল ষাঁড়কে বাঁচিয়ে দেন। ঘটনাটিকে মানত হিসেবে দেখতে গেলে, দেবীকে খুশি করবার বদলে বরং বোকা বানাবার চেষ্টাই চোখে পড়ে: নকল ষাঁড়ের বদলে তাঁর কাছ থেকে আসল ষাঁড় আদায় করে নেবার চেষ্টা। দেবীই বা কেমন বুদ্ধিমতী যে ওই রকম একটা বাজে জিনিস পেয়ে খুশি হয়ে তার বদলে অমন ভালো জিনিস দিয়ে বসবেন? আসল কথা হলো, এই পুরো ঘটনাটির পিছনে অত্যন্ত প্রাকৃত পর্যায়ের একরকম বিশ্বাস টিকে রয়েছে—তারই নাম জাদুবিশ্বাস। মনে রাখা দরকার, এই জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে দেবদেবীকে তুষ্ট করবার বা খুশি করবার, করুণা চাওয়ার বা আশীর্বাদ চাওয়ার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কেননা, জাদুবিশ্বাস হলো প্রাক্‌-অধ্যাত্মবাদী পর্যায়ের চেতনা। জাদুবিশ্বাসের মূল কথা, প্রার্থনা-উপাসনা নয়—তার বদলে প্রকৃতিকে বশ করবার চেষ্টাই। তার মধ্যে প্রায় সবটাই অবশ্য মনগড়া, কল্পনা। কিন্তু তবুও প্রার্থনা-উপাসনা নয়। বৃষ্টির একটা নকল তুলে আকাশে আসল বৃষ্টি ডেকে আনবার আয়োজন করা, বা শত্রুর একটা মোমের মূর্তি পুড়িয়ে শত্রুকে বিনাশ করবার চেষ্টা করা—এগুলি আর যাই হোক ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করা নয়। তেমনি, মাটি দিয়ে সুস্থ ষাঁড়ের নকল করে আসল ষাঁড়কেও সুস্থ-সবল করে তোলবার আয়োজন; তার মধ্যে বাস্তব প্রাকৃতিক জ্ঞানের অভাব যতোই বিকট হোক না কেন, কৃপাভিক্ষার মনোভাব নেই,—যদিও অবশ্যই উত্তরযুগে, আধুনিক আধ্যাত্মিক অর্থে দেবদেবীদের জন্ম হবার পর, ওই

আদিম জাদু-বিশ্বাসটির উপর উত্তরযুগের প্রার্থনা-উপাসনার মনোভাব এসে জমেছে : দেবী ডিমিটর যেন নকল ষাঁড় পাওয়ার খুশিতেই আসল ও সুস্থ ষাঁড় ফিরিয়ে দেবেন[৩০৮]।

প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন ওই মাতৃমূর্তিগুলিকেও তাই মানত-মূলক মনে না করে জাদুবিশ্বাস-মূলক মনে করাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এবং সে জাদুবিশ্বাসের মূল কথা শুধুমাত্র মানবীর পক্ষে সন্তান-কামনাই নয়—প্রকৃতির ফলপ্রসূতার কামনাও।

স্যর জন মার্সাল যে-মূর্তিগুলিকে বিশেষ-করে মানত-মূলক উপচার বলে সন্দেহ করছেন সেগুলির মধ্যে প্রধানতই হলো, অন্তঃসত্ত্বা নারীর মূর্তি। মোহেনজোদারোর আমলে এই অন্তঃসত্ত্বা মাতৃমূর্তিগুলির তাৎপর্য মানত-মূলক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো কিনা, সে-আলোচনা স্বতন্ত্র। তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার আদি-তাৎপর্য অনুসন্ধানে আমাদের কাছে যে-বিষয়টি আপাতত সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তা হলো, এ-জাতীয় মূর্তিরচনার পিছনে আদিমতম মানববিশ্বাসের রূপটা কী রকম? কিংবা, কোন বিশ্বাস থেকে এই জাতীয় মূর্তি রচনার প্রেরণা জন্মেছে? আমাদের পদ্ধতি অনুসারে, সে-বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে আজকের পৃথিবীতেও যে-সব মানবদল পিছিয়ে-পড়া দশায় আটকে রয়েছে, তাদের ধ্যানধারণা পরীক্ষা করলে। বস্তুত, স্যর জন মার্সালের নিজের মন্তব্য বিশ্লেষণ করলেও এ-জাতীয় একটা যুক্তির উপরই নির্ভর করার পরিচয় পাওয়া যায়। সিন্ধুসভ্যতার মাতৃমূর্তি প্রসঙ্গেই তিনি[৩০৯] বলছেন, এ-দেশের কোনো কোনো আর্য-পূর্ব ট্রাইব কখনোই হিন্দুত্বের আওতায় এসে পড়েনি। কিন্তু এই অসভ্য মানুষগুলির মধ্যেই যে সভ্য মানুষদের ভুলে-যাওয়া অতীতকে দেখতে পাওয়া যেতে পারে, স্যর জন মার্সাল সে-সম্ভাবনার উপর সচেতনভাবে জোর দেননি।

মোহেনজোদারোর মাতৃ-মূর্তি

অন্তঃসত্ত্বা মানবী সংক্রান্ত একটি আদিম বিশ্বাস হলো, তার স্পর্শে প্রকৃতি ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

জুলুদের[৩১০] মধ্যে দেখা যায়, শস্য-বৃদ্ধির কামনায় অন্তঃসত্ত্বা মেয়েরা শস্য পেশাই করে ক্ষেতের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। সুমাত্রার মিনাংদের[৩১১] মধ্যে প্রথা হলো, ধানের-গোলা তৈরি করবার সময় কোনো অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে কিছুটা চাল খেতে হবে, কেননা তাদের বিশ্বাস এইভাবেই ধানে-ধানে গোলা ভরে যাবে। নিকোবার দ্বীপের[৩১২] আদিবাসীদের বিশ্বাস, অন্তঃসত্ত্বা নারীর উপস্থিতির ফলে, বা বাগানে যদি অন্তঃসত্ত্বা নারী বৃক্ষরোপণ

করে তাহলে, বাগান সুফলা হবে। আদিম ও অসভ্য মানুষদের মধ্যে এ-জাতীয় ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক এবং এমনকি ইয়োরোপের চাষীদের লোককথায়[১১৩] আজো এ-জাতীয় বিশ্বাসের রেশ খুঁজে পাওয়া যায়।

> The condition of the pregnant woman is often thought to have magical power, especially for fruitfulness......Probably for similar reasons pregnant cows were sacrificed at the Roman *Fordicidia* to the earth 'pregnant with the seed', the unborn calves burned, and their ashes used at the *Parilia*[১১৪].
>
> বিশেষ করে প্রকৃতিকে সুফলা করবার ব্যাপারে প্রায়ই মনে করা হয়েছে যে, মানবীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার জাদুশক্তি আছে।...খুব সম্ভব এই কারণেই রোমান ফর্ডিসিডিয়ায় বীজগর্ভ পৃথিবীর কাছে অন্তঃসত্ত্বা গাভী বলি দেওয়া হতো, পেরিলিয়ায় বাছুরের জ্রূণ পুড়িয়ে তার ছাই ব্যবহার করা হতো।

প্রজনন ও জননাঙ্গ : লতাসাধনা ও তান্ত্রিক যন্ত্র

ওই আদিম মাতৃপ্রধান বা শক্তিপ্রধান সংস্কৃতির সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনার অবকাশ স্বভাবতই এখানে পাওয়া যাবে না। তার বদলে আমরা আদি-মাতৃকা সংক্রান্ত বিশ্বাসের বিশেষ করে সেই দিকগুলিরই আলোচনা তুলবো, যেগুলি আমাদের তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার উপর আলোকপাত করতে পারে।
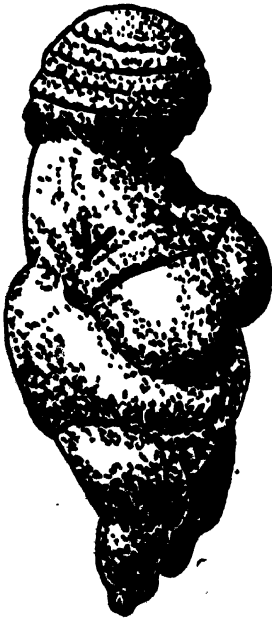
ভিলেনডর্ফের ভেনাস

তন্ত্র-সাধনায় এক রকম চিত্রের ব্যবহার আছে। সেগুলিকে যন্ত্র বলে। যন্ত্রগুলি স্ত্রী-জননাঙ্গের প্রতীক। আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-বিশ্বাস থেকেই এই যন্ত্রগুলির উদ্ভব হয়েছে: ক্রমোন্নতির কোনো এক পর্যায়ে মানুষ এই নারী-জননাঙ্গকেই প্রজননের মূল কারণ বলে কল্পনা করেছে আর তাই তারই সাহায্যে প্রকৃতির উর্বরা-শক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশকে আয়ত্তে আনতে চেয়েছে। কিন্তু মানুষের পক্ষে প্রজনন-রহস্য উদ্ঘাটন-প্রচেষ্টারও একটা ইতিহাস আছে: নারী-জননাঙ্গকেই প্রজননের প্রধানতম কারণ বলে কল্পনা করবার

আগে মানুষ অন্যভাবে প্রজনন-রহস্য বোঝবার চেষ্টা করেছে এবং সেই বোধের উপর নির্ভর করেই সে-পর্যায়ের মানুষ প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতাকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করেছে।

তান্ত্রিক যন্ত্রগুলি নিয়ে আলোচনা তোলবার আগে ওই প্রাকৃত বিশ্বাসটির ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত সামান্য আলোচনার অবতারণা করবো।

আমাদের আলোচনা এখানে কিছুটা বিক্ষিপ্ত হতে পারে। তাই আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে শুরু করাই বাঞ্ছনীয় হবে।

প্রথমত, আমরা দেখবার চেষ্টা করবো যে আদিম মানুষ ক্রমশই নারী জননাঙ্গকেই প্রজনন-শক্তির আধার বলে চেনবার চেষ্টা করেছে।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির ফলপ্রসূতাকে আয়ত্তে আনবার আশায় আদিম মানুষ স্বভাবতই ওই জননাঙ্গকেই অসামান্য গুরুত্ব দিয়েছে।

তৃতীয়ত, এই পর্যায়ের আদিম বিশ্বাসটির দিক থেকেই তন্ত্রের লতা-সাধনা, ভগযাগ ও যন্ত্রগুলিকে বোঝবার সুযোগ আছে।

অতএব, পৃথিবীর নানান জায়গায় আজো যে-সব মানবদল পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় আটকে রয়েছে তাদের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে বিশ্লেষণ করলে তন্ত্রের এই আপাতঃ-দুর্বোধ্য দিকগুলির উপর আলোকপাত হতে পারে।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যে-আদিমতম মাতৃমূর্তিটি আবিষ্কার করতে পেরেছেন তার নাম দেওয়া হয় 'ভিলেনডর্ফের ভেনাস' বা *Venus of Willendorf*। এই মূর্তিটি প্রত্ন-প্রস্তর যুগে রচিত হয়েছিলো। আবিষ্কৃত হবার সময় দেখা যায়, মূর্তিটির গায়ে লাল গিরিমাটি মাখানো। অতএব, অনুমিত হয়, মূর্তিটি আধুনিক অর্থে শিল্প-নিদর্শন হতে পারে না। এর সঙ্গে জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠানাদির সম্পর্ক নিশ্চয়ই ছিলো।

মূর্তিটি গড়বার সময় শিল্পির চেষ্টা ছিলো, নারীদেহের অন্যান্য অবয়বের অনুপাতে স্তনদ্বয়কেই প্রধানতম করে দেখানো : এর চোখমুখ প্রভৃতি স্পষ্টভাবে গড়বার কোনো উৎসাহই চোখে পড়ে না।

আদিম শিল্পীর এ-রকম প্রচেষ্টা কেন? উত্তরে প্রজনন-সংক্রান্ত আদিম ধারণার ক্রমবিকাশের আলোচনা তোলা দরকার।

আদিম মানুষের পক্ষে প্রজননের প্রকৃত রহস্য অনুমান করা সম্ভব নয়। তারা মৈথুনের সঙ্গে প্রজননের সম্পর্ক দেখতে শেখেনি। আধুনিক পণ্ডিতেরা[১১১] আদিম মানুষের এই অজ্ঞতার নানা রকম স্বাভাবিক কারণ অনুমান করে থাকেন। মৈথুনের অনুপাতে গর্ভসঞ্চারের দৃষ্টান্ত অবশ্যই

দুর্লভ ; তাই প্রাচীন মানুষদের পক্ষে মৈথুনকেই গর্ভসঞ্চারের কারণ মনে করা স্বাভাবিক নয়। ফলে, গর্ভসঞ্চার সংক্রান্ত নানারকম অবাস্তব ধারণা প্রশ্রয় পাওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুত, পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মধ্যে এ-জাতীয় নানা ধারণা দেখতে পাওয়া যায় এবং রূপকথা ও লোককথায় তার স্মারক খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

এ-জাতীয় ধারণার মধ্যে অত্যন্ত প্রাকৃত পর্যায়ের একটি ধারণা[১৬] হলো, সন্তানের প্রথম আবির্ভাব হয় নারীর বক্ষদেশে ; তারপর বক্ষস্থল থেকে সন্তান পেটের দিকে নেমে আসে। পেটের মধ্যে জরায়ু প্রভৃতি অঙ্গের কথা এই পর্যায়ের চিন্তাধারায় উদিত হয়নি। এই পর্যায়ের ধারণায় তাই স্তনদ্বয়ই প্রধানতম জননাঙ্গ। আধুনিক বিদ্বানেরা এ-জাতীয় ধারণার ব্যাখ্যা হিসেবে অনুমান করছেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার প্রথম লক্ষণ স্তনদ্বয়েই দেখা যায়।

ব্রিটিশ নিউগিনির সিনাউগোলোদের[১৭] মধ্যে আজো এই আদিম ধারণাটি টিকে থাকতে দেখা যায়। এবং এই ধারণাটির দিক থেকে শুধুই যে ওই ভিলেনডর্ফের ভেনাস-মূর্তিটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাই নয় ; এ্যাস্টেক্স্রা[১৮] বসুমাতার মূর্তি কল্পনা করে বহু স্তনবতী নারী হিসেবেই। গ্রীক দেবলোকের আর্টেমিসও আদিতে বসুমাতা-মাত্রই ছিলেন এবং এফিসস্-এ[১৯] তাঁকেও বহু স্তনবতী বলেই কল্পনা করা হতো। প্রাচীন-চেতনার কলা-কৌশল হিসেবে কোনো একটি অঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হলে হয় অঙ্গটিকে অস্বাভাবিকভাবে বড়ো করে চিন্তা করা হবে আর না হয় তো তার সংখ্যাবৃদ্ধি করা হবে। এখানে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের আর একটি মাতৃমূর্তির[২০] ছবি উদ্ধৃত করা হলো ; এই মূর্তিটির স্তনদ্বয়কেও অস্বাভাবিকভাবে বড়ো করে রচনা করা হয়েছে। কিন্তু সেইসঙ্গেই শিল্পী যেন নারী-জননাঙ্গ সম্বন্ধে—অন্তত গর্ভ সম্বন্ধে—সচেতন হচ্ছেন।
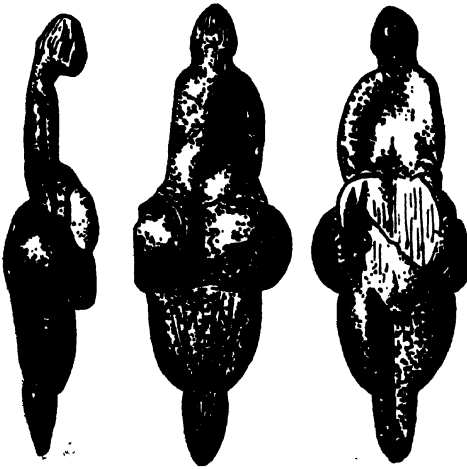
প্রত্নপ্রস্তর-যুগের আর একটি নারী-মূর্তি

প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যের দিক থেকেই দেখতে পাওয়া যায়, জননাঙ্গ হিসেবেই

মানুষ ক্রমশ নারীর যোনিকে চেনবার চেষ্টা করেছে। এখানে প্রত্ন-প্রস্তর যুগেরই আর একটি মাতৃমূর্তির ছবি উদ্ধৃত করা গেলো। এই মূর্তিটিতে অবশ্যই স্তনদ্বয়কে বাড়িয়ে বড়ো করে রচনা করবার চেষ্টা চোখে পড়ে ; কিন্তু তাছাড়াও— বিশেষত মূর্তিটির বাঁ হাতের নির্দেশ অনুসরণ করলে স্পষ্টই দেখা যায়,— শিল্পী যোনিকেও গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছেন।

প্রত্ন-প্রস্তর যুগেরই আর এক মাতৃ-মূর্তি[২১]

এর পর আমরা আরো তিনটি আদিম মাতৃকামূর্তির প্রতি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করবো। তিনটিই অত্যন্ত প্রাচীন যুগের মূর্তি এবং শাক্ত মত-বাদ যে প্রাচীন পৃথিবীর কতোখানি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিলো তার নিদর্শন হিসেবেও এই তিনটি মূর্তির সাক্ষ্য মূল্যবান। অবশ্যই ওই সাদৃশ্য থেকে কেউ যদি সিদ্ধান্ত করতে চান যে প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে ওই সুবিস্তীর্ণ এলাকা-জুড়ে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান প্রচলিত ছিলো, তাহলে আমাদের যুক্তির দিক থেকে সে-সিদ্ধান্ত খুব বেশি মূল্যবান হবে না। কেননা, আমরা দেখবার চেষ্টা করছি, এ-জাতীয় মূর্তি-রচনার পিছনে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাস্তব প্রয়োজন বোধ। সেই প্রয়োজন বোধের সাদৃশ্যের দরুনই মূর্তিগুলির মধ্যেও অমন নিকট সাদৃশ্য। বস্তুত, ভারতবর্ষের মাটি খুঁড়ে পাওয়া আদিম মাতৃমূর্তির সঙ্গে অন্যান্য দেশের মাতৃমূর্তির কতোখানি মিল আছে তাই দেখাবার জন্যেই জনৈক আধুনিক গবেষক[২২] এই তিনটি আদিম মাতৃমূর্তিকে পরস্পরের সঙ্গে

তুলনা করতে বলেছেন। প্রত্নতত্ত্বমূলক খননের ফলে ভারতবর্ষের সীমান্ত থেকে চিত্রে-প্রদর্শিত সব-উপরের বাঁদিকের মূর্তিটি খুঁজে পাওয়া যাবার পর মেজর গর্ডন দাবি করেন পৃথিবীর অন্যান্য কোথাওই ঠিক এ-রকম মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ কিনা, ও-জাতীয় মূর্তি অনুপম। তারই উত্তরে সিমোন কর্বিয়ান দেখাতে চেয়েছিলেন, অনুপম তো দূরের কথা, মেসোপটেমিয়ায় খুঁজে-পাওয়া, ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মূর্তির সঙ্গে এর সাদৃশ্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। চিত্রে মেসোপটেমিয়ার মূর্তিটিকে ভারতবর্ষে পাওয়া মূর্তিটির ঠিক নিচে আঁকা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রাগৈতিহাসিক ইউক্রেনের মূর্তিটির সঙ্গেও এ-গুলির নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথম মূর্তিটিকে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে (*Sari Dhari—North West Frontier Province of India*) প্রত্নতত্ত্ব-মূলক খননের ফলে উদ্ধার করা হয়েছে, দ্বিতীয়টি প্রাচীন মেসো-পটেমিয়ার (*Tell Ahmar*) এবং তৃতীয়টি প্রাচীন ইউক্রেন-এর (*Tripolje*)। এই মাতৃমূর্তি-গুলির রচনায় যোনি বা নারী-জননাঙ্গের উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপণ করবার চেষ্টাটা খুবই স্পষ্ট। এই যোনি ক্রমশই জ্যামিতিক ত্রিকোণের আকার ধারণ করছে। এখানে বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মাতৃমূর্তিটির দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। কেননা, তন্ত্রে যন্ত্র হিসেবে প্রচলিত চিত্রগুলির সঙ্গে এই মূর্তির নিম্ন-ভাগের সাদৃশ্যর আভাস পাওয়া যায়। তন্ত্রে যেগুলিকে যন্ত্র বলা হয় সেগুলি আর কিছুই নয়, ওই নারী-জননাঙ্গের প্রতীক-চিত্রমাত্র। তান্ত্রিক যন্ত্রের আলোচনায় আমরা একটু পরেই প্রত্যাবর্তন করবো। তার আগে দেখা দরকার, আদিম মাতৃপ্রধান বা শক্তি-প্রধান চিন্তাধারা ক্রমশই কী ভাবে নারী-জননাঙ্গ-কেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তিনটি আদিম মাতৃমূর্তি : উপরের বাঁ-দিকেরটি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাওয়া
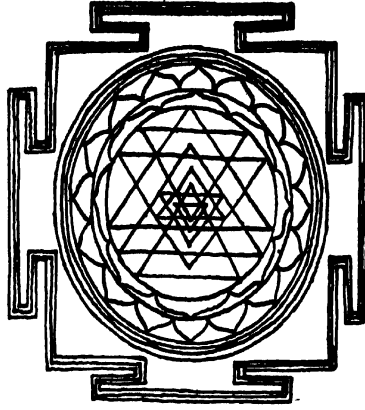
তান্ত্রিক যন্ত্রের কেন্দ্রে ত্রিকোণের সাহায্যে নারী-জননাঙ্গ বোঝবার দৃষ্টান্ত। ত্রিকোণের চিত্র ছাড়াও অষ্টদল-পদ্ম রয়েছে। তার তাৎপর্যও একই।

প্রাচীন মাতৃমূর্তির পরিকল্পনায় যদি জননাঙ্গকেই ক্রমশ নারীদেহের প্রধানতম অবয়ব বলে গ্রহণ করবার চেষ্টা দেখা যায় তাহলে স্বভাবতই কৃষিভিত্তিক প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নারী-দেহের অন্যান্য অবয়ব বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যোনি বা নারী-জননাঙ্গের মূর্তি খুঁজে পাওয়া বিস্ময়ের ব্যাপার হবে না। হরপ্পা-মোহেনজোদারোর[২৩] ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁজে পাওয়া এই জাতীয় একটি মৃন্ময় মূর্তির ছবি এখানে উদ্ধৃত করা গেলো।

মোহেনজোদারোর যোনি মূর্তি

মোহেনজোদারোর মানুষেরা এ-জাতীয় যোনি-মূর্তি রচনা করেছিলো কেন? এর পিছনে নিশ্চয়ই প্রজননের কামনা ছিলো। কিন্তু শুধুমাত্র প্রজননের কামনাই নয়। তার সঙ্গে জড়িত ছিলো ধনোৎপাদনের কামনাও—কৃষিকাজের সাফল্য-কামনাও। কেননা এই যোনি-মূর্তি মানব-বিশ্বাসের এমন এক স্তরের সাক্ষ্য বহন করছে, যেখানে শুধুমাত্র সন্তান-উৎপাদনই নয়—প্রাকৃতিক উৎপাদনও—নারী-জননাঙ্গের উপর নির্ভরশীল।

এই বিশ্বাসের এক অত্যাশ্চর্য মূর্ত প্রমাণ হরপ্পার ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে ৩৫৭ পৃষ্ঠায় হরপ্পার সেই সিলটির ছবি উদ্ধৃত করেছি।

কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসটির স্মারক সিন্ধুসভ্যতার মধ্যেই পরিসমাপ্ত নয়।

স্যর জন মার্শাল[২১] বলছেন :

> Although unique, so far as I am aware, in India, this striking representation of the Earth Goddess with a plant growing from her womb is not unnatural, and is closely paralleled by a terra cotta relief of the early Gupta age, from Bhita in the United Provinces, on which the Goddess is shown with her legs in much the same posture, but with a lotus issuing from her neck instead of from her womb.

আমি যতোদূর জানি, গর্ভসঞ্জাত লতাগুল্মসহ এ-জাতীয় বসুমাতা-মূর্তি যদিও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অনুপম, তবুও একে অস্বাভাবিক মনে করবার কোনো কারণ নেই। যুক্তপ্রদেশের ভিটা থেকে পাওয়া গুপ্তযুগের শুরুর দিকের একটি পোড়ামাটির ভাস্কর্য-নিদর্শনের সঙ্গে এর নিকট সাদৃশ্য রয়েছে : সেই নিদর্শনে দেখা যায় দেবীর পায়ের ভঙ্গি হরপ্পার ওই সিলটির বসুমাতা-মূর্তির মতোই, কেবল তার গর্ভ থেকে লতা বের না হয়ে ঘাড় থেকে পদ্মফুল বের হয়েছে।
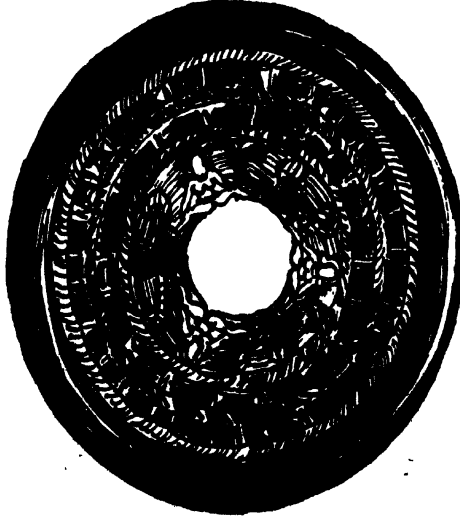
বসুমাতা? স্যর জন মার্শাল তক্ষশিলা থেকে এই নিদর্শন উদ্ধার করেছেন এবং তাঁর মতে এই নিদর্শনটির পিছনেও উর্বরা-শক্তির কামনা খুঁজে পাওয়া যায়[২২]।

দেবীর নাম ভগবতী। এই নামকরণ থেকেই অনুমান করা যায়, দেবীর

সমস্ত অঙ্গের মধ্যে জননাঙ্গটিকেই প্রধানতম বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে? তার কারণ, এর মূলেও প্রাচীন বিশ্বাসের সেই পর্যায়টিরই স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায়: নারী-জননাঙ্গ শুধুমাত্র সন্তান-এর উৎস নয়, পার্থিব ঐশ্বর্যের উৎসও :

> অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্যের নাম ভগ।
>
> ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
> জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরিতঃ ॥[১২৬]

কোন আদিম বিশ্বাসের প্রভাবে নারী-জননাঙ্গবাচক শব্দটিই ষড়ৈশ্বর্যবাচক শব্দে পরিণত হয়েছে,—সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে।

আপত্তি উঠতে পারে, ভগ বলতে আদিতে জনৈক বৈদিক দেবতাকেই[১২৭] বোঝাতো। ঐশ্বর্য বিতরণই ছিলো সে-দেবতার বৈশিষ্ট্য। তাই, এ-শব্দের ষড়ৈশ্বর্য-বাচকত্বের উৎপত্তি সেই দেবতার নাম থেকে হওয়াও অসম্ভব নয়।

উত্তরে বলা যায়, এ-কথা সত্যি হলেও এই প্রসঙ্গেই ওই আদিম বিশ্বাসটির কথা অপ্রধান হবে না। কেবল, সমস্যাটাকে একটুখানি অন্যদিক থেকে ভেবে দেখতে হবে: আদিতে যে-নাম ছিলো ঐশ্বর্যবাচক বা ঐশ্বর্য-বিতরণ-মূলক, সেই নামই নারী-জননাঙ্গবাচক হয়ে দাঁড়ালো কী করে? এ-প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তরই পাওয়া সম্ভবপর: নারী-জননাঙ্গকেই পার্থিব ঐশ্বর্যের উৎস বলে বিশ্বাস করা হয়েছিলো, তাই।

এই আদিম বিশ্বাসটির দিক থেকে তান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলিকে কতোখানি বুঝতে পারা সম্ভব তাই দেখা যাক।

প্রথমত, তন্ত্রমতে নারী-জননাঙ্গের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। 'স্ত্রীভগং পূজনাধারঃ'[১২৮] বা এইজাতীয় কথা তন্ত্রে বহুবার পাওয়া যায়। বস্তুত, তন্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ সাধনার নামই হলো ভগযাগ :

> তথাপি প্রত্যয়ো নো চেৎ ভগযাগমথাচরেৎ।
> কামিনীং যুবতীং যত্নাৎ পুষ্পিতাঞ্চ বিশেষতঃ ॥
> তামানীয় প্রযত্নেন স্বঞ্চ ভূষণমাচরেৎ।
> তাম্বূলৈস্তৈৎ স্বয়ং গন্ধৈর্ভূষণৈর্বসনৈস্তথা ॥
> মিষ্টান্নৈর্ভোজয়িত্বা চ ভক্ত্যা পরময়া শিবে।
> তাং বিবস্ত্রাং বিধায়ৈব স্থাপয়েদূর্দ্ধতল্পকে ॥
> ততঃ পূজাং বিধায়ৈব নানালঙ্কারসংযুতৈঃ।

তত্রৈব রময়েৎ যন্ত্রং রক্তচন্দনযাবকৈঃ ॥
ভগনাম্নাং ভগপ্রাণাং ভগদেহাং ভগস্তনীং।
পুজয়েদষ্টপত্রেষু মধ্যে দেবীং প্রপুজয়েৎ ॥
রক্তগন্ধৈঃ রক্তমাল্যৈঃ রক্তবস্ত্রৈর্মনোরমৈঃ।
পুজয়েদ্ভক্তিতো মন্ত্রী দেবীদর্শনকাম্যয়া ॥
এতস্মিন সময়ে দেবী রতিমিচ্ছতি সা যদা।
লতাস্তু রময়েদ্দেবী যাবদ্ধোমং করোতি ন ॥
পুষ্পিনী মকরন্দেন ততো হোমং সমাচরেৎ।
ওঁ নমস্তে ভগমালায়ৈ ভগরূপধরে শুভে ॥
ভগরূপে মহাভাগে ভোগমোক্ষৈকদায়িনী।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন মম সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥
ইত্যাদি, ইত্যাদি।
(তর্জমা : বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বলাই বাহুল্য, ওই আদিম বিশ্বাসটির উপরে এখানে পূজা, মোক্ষ ইত্যাদি নানাবিধ আধুনিক শব্দের পলি পড়েছে। তবু, তাকে অনুসন্ধান করবার জন্যে অন্তত একটি সূত্র উপরের উদ্ধৃতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। সূত্রটি হলো, 'লতা' শব্দের ব্যবহার। কেননা, তন্ত্র-সাহিত্যে 'লতা' শব্দের একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। সে-অর্থ হলো, নারী-জননাঙ্গ। এখানে কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করা যায় :

ততঃ পরলতাসক্তঃ পুনঃকার্য্যং তথৈব চ ॥[৫২৯]

কিংবা,

নগ্নাং পরলতাং পশ্যন্ জপেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥[৫৩০]

কিংবা,

মহাপূজাং প্রকুর্ব্বীত লতামণ্ডলমধ্যগঃ ॥[৫৩১]

কিংবা,

লতাভির্বেষ্টিতো ভূত্বা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥[৫৩২]

কিংবা,

রাত্রৌ তাম্বূলপুরাস্যো লতামণ্ডলমধ্যগঃ ॥[৫৩৩]
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তন্ত্র-বিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা এই 'লতা' শব্দের তাৎপর্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবেন না। কিন্তু কোন্ বিশ্বাসের প্রভাবে উদ্ভিদ-বোধক এই শব্দটিই নারী-জননাঙ্গ-বোধক শব্দে পরিণত হয়েছে তার আলোচনা সাধারণত তোলা হয় না। অথচ, সে-আলোচনা বাদ দিয়ে তন্ত্রের আদি-তাৎপর্য কী করে নির্ণয় করা সম্ভব?

এই প্রসঙ্গেই তন্ত্রের একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। তন্ত্রকাররা প্রশ্ন তুলেছেন, কী কী লক্ষণ থাকলে তন্ত্র বলা হবে? এবং উত্তরে বলছেন, সেই লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হলো তরু-উৎপত্তি বিষয়ের বর্ণনা: "উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্"[৩৩৪]।

তন্ত্রে শুধুই যে ওই পারিভাষিক অর্থে লতা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাই নয়। লতা-সাধনা বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধনারও নির্দেশ রয়েছে। এ-সাধনাও অতি গোপন,—উপরোক্ত সাধনার মতোই গুহ্যাৎ গুহ্যতরং। এবং অতি কঠিন এই সাধনা:

> বরং ফণী ধরিয়া বিষভক্ষণ করা সহজ, বরং সিংহশার্দুলের সহিত যুদ্ধ করা সহজ, কিন্তু লতা-সাধনা অতি কঠিন, অতি কঠোর।[৩৩৫]

এ-হেন গুহ্য ও কঠিন লতা-সাধনার মূল কথাটা কী? হুবহু উপরোদ্ধৃত ভগযাগের মতোই:

> এই সাধনার প্রধান অধিকরণ স্ত্রী, এইজন্য ইহাকে লতাসাধনা কহে। এই সাধনার বিষয় তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে…
>
> লতায়াঃ সাধনং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব হরবল্লভে।
> শতং কেশে শতং ভালে শতং সিন্দুরমণ্ডলে॥
> স্তনদ্বয়ে শতদ্বন্দ্বং শতং নাভৌ মহেশ্বরি।
> শতং যোনৌ মহেশানি উত্থায় চ শতত্রয়ম্॥
> এবং দশশতং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধিশ্বরো ভবেৎ।
> অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সাধনং ভুবি দুর্লভম্॥
> রজোঽবস্থাং সমানীয় তদ্ যোনৌ স্বেষ্টদেবতাম্।
> পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ ত্রিদিনং পূজয়েন্মহম্॥
> ইত্যাদি, ইত্যাদি।
>
> ॥ভাবার্থ: বিশ্বকোষ, ১৭ খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য॥

বলাই বাহুল্য, আমাদের আধুনিক রুচি ও নীতিবোধের কাছে এই জাতীয় চিন্তাধারা বীভৎস কামবিকারের পরিচায়কমাত্র এবং আমাদের আধুনিক জ্ঞানের দিক থেকে এই জাতীয় ব্যবস্থাকে কোনো প্রকার সাধনপদ্ধতি মনে করবার মতো উৎকট ও অসম্ভব ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। এবং এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের আধুনিক রুচিবোধ, নীতিবোধ এবং ধ্যানধারণাগুলি অমূলক নয়। তাই বীভৎস কামবিকার বা উৎকট ও অসম্ভব ধারণার তাগিদ ছাড়া আজকের দিনে তন্ত্রসাধন-পদ্ধতিতে প্রেরণা

পাবার কথা অচিন্ত্যনীয়। একথা ভুলে গিয়ে আজকের দিনে যদি কোনো দেশবাসী জনৈক বিদেশী বিচারকের তন্ত্রবিচারে মুগ্ধ হয়ে এই লতাসাধনাদির মধ্যেই অতীব উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক ধারণা আবিষ্কার করেন তাহলে তাঁর উদ্ভাবনশক্তি দেখে স্তম্ভিত হলেও আমরা মানতে বাধ্য হবো যে, দেশের মানুষকে তিনি এক অন্ধ বিকৃতির মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চাইছেন। কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই তান্ত্রিক সাধনাদি সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না। কেননা, এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় সংস্কৃতির, বিশেষ করে বাংলা দেশের সংস্কৃতির চোদ্দ আনার উপরই হলো তান্ত্রিক।

> বাস্তবিক এখন ভারতের সর্বত্রই, বিশেষত এই বাংলাদেশে যে-সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজাপদ্ধতি প্রচলিত, তাহা সমস্তই তান্ত্রিক।[৩৩৬]

এ-কথাকে অতিশয়োক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই প্রশ্ন ওঠে : নিছক কামবিকার, বা অন্তঃসারশূন্য আজগুবি ধারণামাত্র, একটি জাতির সাংস্কৃতিক জীবনকে কী করে এমন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারলো? এ-প্রশ্নের মাত্র দুটি উত্তর সম্ভবপর। এক, পুরো জাতটাই হলো কামবিকারগ্রস্ত। দুই, আধুনিক যুগের পটভূমিতে এই সব তান্ত্রিক ধ্যানধারণা বা সাধন-পদ্ধতির পরিণাম যাই হোক না কেন, এগুলির আদি-তাৎপর্য নিশ্চয়ই অন্য রকম ছিলো। অর্থাৎ, সমাজ-বিকাশের কোনো এক পর্যায়ে এই জাতীয় ধ্যান-ধারণা এবং সাধন-পদ্ধতিই বাস্তব অর্থে উদ্দেশ্যমূলক ছিলো, জীবনের কোনো এক বাস্তব তাগিদ মেটাতে চেয়েছিলো। আমরা এই দুটি সম্ভাবনার মধ্যে প্রথমটিকে অমূলক বলে প্রত্যাহার করতে চাই : পুরো জাতটাকে কামবিকারগ্রস্ত বলে কল্পনা করবার কোনো কারণ নেই। অর্থাৎ আমরা দেখতে চাই, আধুনিক যুগের পটভূমিতে ওই তান্ত্রিক সাধনাদি যতো বীভৎস বিকৃতি বলে প্রতীয়মান হোক না কেন, সমাজবিকাশের যে-পর্যায়ে এগুলির উদ্ভব হয়েছিলো একমাত্র তারই পটভূমিতে এগুলির আদি-তাৎপর্য অনুসন্ধান করা যাবে। এবং আমাদের দেশের উৎপাদন-কৌশলের উন্নতি ব্যাঘাতগ্রস্ত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থেকেছে বলেই সমাজবিকাশের সে-পর্যায়ের ধ্যানধারণা এবং আচার-অনুষ্ঠানের স্মারক এমন জোরালোভাবে আমাদের সংস্কৃতিকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৩৩৭] বলছেন :

> সে-সব খাঁটি বাংলার জিনিস যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাও, তবে বাঙালীর বৈষ্ণব ধর্ম, সহজিয়া ধর্ম এবং বাংলার তন্ত্র এবং তান্ত্রিক ধর্ম বুঝিবার এবং

জানিবার চেষ্টা কর।...বাঙালার বাঙালীকে ঠিকমতো বুঝিতে হইলে, এই দেশের বৈষ্ণব ধর্ম এবং তন্ত্রের ধর্ম বুঝিতে হইবে।

কিংবা[৩৮],

> এই সকল তন্ত্র-পুস্তকের মধ্যে বাঙালার দুই হাজার বছরের ইতিহাস লুকানো আছে, যুগে যুগে জাতির পদ্ধতি, রীতি নীতির কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই তন্ত্র-সাগর মন্থন করিতে পারিলে বাঙালার বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইতে পারে, বাঙালা ইতিহাসে বহু তমসাবৃত কোটরে আলোকমালা ফুটিয়া উঠিতে পারে।

কিংবা[৩৯],

> ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাঙালায় বহু জালজুয়াচুরি চলিয়াছিল, ঘটক ঠাকুরেরা অনেক সত্যের গোপন করিয়াছেন, স্মার্ত নাটোর ও নদীয়ার ব্রাহ্মণ রাজাদের প্রভাবে ও চেষ্টায় আরো অনেক গোলমাল গোলযোগ স্মৃতিশাস্ত্রের রূপার তবকে ঢাকা পড়িয়াছে। এই সকল আবরণ খুলিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে তন্ত্রের আলোচনা করিতে হইবে। বাংলার গত দুই হাজার বৎসরের প্রকৃত ইতিহাস প্রচার প্রয়োজন, তীব্রবুদ্ধি ঐতিহাসিকগণের সাহায্যে উহাদের আলোচনার প্রয়োজন এবং নির্ভয়ে সত্য কথা বলিবার বুকের পাটারও প্রয়োজন; এই তিন প্রয়োজন সিদ্ধি না হইলে বাঙালী জাতির অতীত ইতিহাস ঠিকমতো প্রকাশিত হইবে না, বাঙালার পুরাতন গৌরবের মহিমা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না।

আমাদের যুক্তিও নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমরা এ-কথাও বলতে চাই যে, ওই প্রাচীন ধ্যানধারণাগুলির উপর আধুনিক যুগের ধ্যানধারণা আরোপ করে এগুলির মহত্ত্ব বাড়াবার চেষ্টা করলেও আমরা খাঁটি বাংলার জিনিসকে খুঁজে পাবো না, তার বদলে বরং আত্মপ্রবঞ্চনাই করবো। এই জাতীয় আত্মপ্রবঞ্চনার নমুনা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতেও বিরল নয়। যেমন, তিনি[৪০] বলছেন, "আবার তন্ত্রকে জাগাইয়া তুলিতে না পারিলে জাতি হিসাবে আমরা উন্নত হইতে পারিব না। ইহাই আমার বিশ্বাস"। আমাদের বক্তব্য ঠিক এর উল্টো। তন্ত্রকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টার বদলে আমাদের পক্ষে এইটুকু স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার যে, আমাদের দেশের ওই তন্ত্রসাধনায় স্ত্রী-জননাঙ্গ প্রভৃতির উপর যে-গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো তার মূলে ছিলো অত্যন্ত আদিম পর্যায়ের এক বিশ্বাস: স্ত্রী-জননাঙ্গ শুধুই সন্তানদায়িনী নয়, শস্যাদি ঐশ্বর্যদায়িনীও। অতএব, এই বিশ্বাসটির স্বরূপ

উপলব্ধি করবার জন্য পিছু হটে পৃথিবীর প্রাচীন সংস্কৃতি এবং আধুনিক যুগেও যে-সব মানবদল পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে আটকে থেকেছে তাদের আচার-অনুষ্ঠান, সম্যকভাবে বিচার করা দরকার। সে-বিচারের সাহায্যে আমরা আমাদের সংস্কৃতির এই অঙ্গটিকে চিনতে পারবো এবং চিনতে পারবো বলেই তা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে পারবো[৫১১]।

আমরা একটু পরেই পৃথিবীর প্রাচীন সংস্কৃতির নানা দৃষ্টান্ত এবং পিছিয়ে-পড়া মানুষদের নানান আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা তুলবো। তার আগে দেখা যাক, তান্ত্রিকেরা নারী-জননাঙ্গের উপর যে এতোখানি গুরুত্ব আরোপ করছেন তার মূলে এই বিশ্বাসটিই বর্তমান আছে যে, নারী-জননাঙ্গের স্পর্শেই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য বর্ধিত হবে।

তন্ত্রে একজাতীয় চিত্রের ব্যবহার আছে। সেগুলিকে যন্ত্র বলে।

> যন্ত্র সাধারণত দুই প্রকার—পূজাযন্ত্র ও ধারণ-যন্ত্র। পূজাযন্ত্রে যে দেবতার পূজা করিতে হইবে, সেই দেবতার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হয়। ঐরূপ যন্ত্রকে পূজাযন্ত্র বলা হয়।
> যে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ধারণ করা হয় তাহার নাম ধারণ-যন্ত্র। এই ধারণ-যন্ত্র ভূর্জপত্রে অঙ্কিত করিয়া ধারণ করিতে হয়।...[৫১২]

যন্ত্র নামের এই চিত্রগুলির তাৎপর্য কী?

> তন্ত্রে লিখিত আছে,—যন্ত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, এইজন্য যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া দেবতার পূজা করিতে হয়।[৫১৩]

আমরা সাধারণত এই জাতীয় একটা ব্যাখ্যাই সহজে গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রগুলি যে পূজা, দেবতা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয়ের চেয়ে প্রাচীনতর,—অর্থাৎ, পূজা ও দেবতাদির বিষয় পরে কৃত্রিমভাবে যন্ত্রগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে,—যন্ত্রগুলিকে ভালো করে পরীক্ষা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমত, মোটের উপর একই চিত্রের সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর সম্পর্ক বা ঐক্য পরিকল্পিত হয়েছে[৫১৪]। তার থেকেই বোঝা যায়, উক্ত সম্পর্কাদির চেয়েও যন্ত্রগুলি প্রাচীনতর। দ্বিতীয়ত, বহু যন্ত্রের সঙ্গেই যন্ত্রসংযুক্ত দেবতাটির স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়। আধুনিক তান্ত্রিক গ্রন্থাদিতে কয়েকটি

প্রসিদ্ধ যন্ত্রের নাম হলো, গণেশযন্ত্র, শ্রীরামযন্ত্র, নৃসিংহযন্ত্র, গোপালযন্ত্র, কৃষ্ণযন্ত্র, শিবযন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয়যন্ত্র ইত্যাদি[৬৫]। উল্লেখিত দেবতাগুলি সকলেই পুরুষ। অথচ, যন্ত্রগুলি অবধারিতভাবেই নারী-জননাঙ্গের প্রতীকচিত্র।

তান্ত্রিক যন্ত্রগুলি যে নারী-জননাঙ্গের প্রতীকমাত্র, এ-বিষয়ে ইতিপূর্বেই দক্ষ বিদ্বানেরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শ্রীচক্রপূজা প্রসঙ্গে স্যর ভাণ্ডারকর[৬৬] বলছেন :

> It consists in the worship of picture of the female organ drawn in the centre of another consisting of a representation of nine such organs, the whole of which forms the *Sricakra*....The pictures are drawn on a *bhurja* leaf or a piece of silken cloth or a gold leaf. ইত্যাদি।

আমরা বলতে চাইছি, এইভাবে নারী-জননাঙ্গের চিত্র অঙ্কন করবার পিছনে এক আদিম বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়; সেই বিশ্বাস হলো নারী-জননাঙ্গের উপরই প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতাও নির্ভরশীল।

প্রথমে দেখা যাক, এ-বিষয়ে তন্ত্রের আভ্যন্তরীণ তথ্য কী রকম।

ইতিপূর্বে পৃঃ (৩৫৬-৩৫৮) দুর্গাপূজা-প্রসঙ্গে আমরা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের মতবাদ উদ্ধৃত করেছি। আদিতে দুর্গা যে শস্য-জননী ছিলেন এবং দুর্গোৎসব যে শস্য-উৎসবই ছিলো—সে-বিষয়ে শ্রীযুক্ত চন্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রমাণ হিসেবে তিনি কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করছেন। প্রথমত, দুর্গোৎসব হলো শারদোৎসব—ফসল পাকবার ঋতু তখন। দ্বিতীয়ত, শাকম্ভরী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দুর্গার নাম। তৃতীয়ত, দুর্গাপূজায় নবপত্রিকার গুরুত্ব। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, শ্রীযুক্ত চন্দের উল্লিখিত এই প্রমাণগুলি অসামান্য মূল্যবান। আমরা এখানে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যের অবতারণা করবো।

প্রথমত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৬৭] আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন,

> এখন যে সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গার প্রতিমা গড়িয়া আমরা পুজা করিয়া থাকি, শত বর্ষ পুর্বে ঠিক এমনভাবের প্রতিমা বাংলার কারিকর গড়িত না। গোড়ায় যখন সিংহবাহিনীর মৃন্ময়ী মূর্তির পুজা এ দেশে প্রচলিত হয়, তখন কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী, কেহই ছিলেন না।...আসল কথা এই যে, দুর্গোৎসবের সময়ে যে প্রতিমা গড়াইয়া, চণ্ডীমণ্ডপ জোড়া করিয়া আমরা যে উৎসব করিয়া থাকি, সে উৎসবে ঠিক সেই প্রতিমার পুজা হয় না; পুজা হয় ভদ্রকালীর, পুজা হয় পুর্ণ ঘটের, দেবীকে আহ্বান করিতে হয় যন্ত্রে ও ঘটে।

তাহলে দুর্গাপূজার আদি-অকৃত্রিম রূপটিকে চিনতে হলে পুত্রকন্যাপরিবৃতা ওই দশভুজাকে বাদ দিয়ে যন্ত্র ও ঘটের উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।

দুর্গাপূজার প্রধানতম অঙ্গ ওই যন্ত্র ও ঘটের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক। যন্ত্রটির নাম সর্বতোভদ্রমণ্ডল। এটি তন্ত্রের একটি বিখ্যাত যন্ত্র :
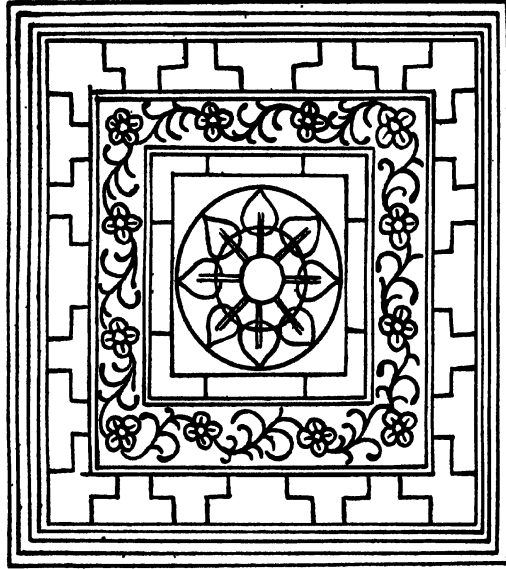
সর্বতোভদ্রমণ্ডল

এই চিত্রটি আঁকবার নির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে[৫৪৮] :

> ষট্‌ত্রিংশতা পদৈর্মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণম্।
> বহিঃপঙক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পংক্তিযুগ্মেন বীথিকা॥
> দ্বারশোভোপশোভাস্রাং শিষ্টাভ্যাং পরিকল্পয়েৎ।
> শাস্ত্রোক্তবিধিনা মন্ত্রী ততঃ পদ্মং সমালিখেৎ॥
> পদ্মক্ষেত্রস্তু সংত্যজ্য দ্বাদশাংশং বহিঃ সুধীঃ।
> তন্মধ্যং বিভজেদ্‌বৃত্তৈস্ত্রিভিঃ সমবিভাগতঃ॥
> আদ্যং স্যাৎ কর্ণিকাস্থানং কেশরাণাং দ্বিতীয়কম্।
> তৃতীয়ং তত্র পত্রাণাং মুক্তাংশেন দলাগ্রকম্।
> বাহ্যবৃত্তান্তরালস্তু মানেন বিধিনা সুধীঃ।
> নিধায় কেশরাগ্রেষু পরিতোঽর্ধনিশাকরান্॥
> লিখিত্বা সার্দ্ধসংস্থানি তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ।
> দলাগ্রাণাঞ্চ যন্মানং তন্মানাৎ বৃত্তমালিখেৎ॥

তদন্তরালং তন্মধ্যসূত্রস্তোভয়তঃ সুধীঃ।
আলিখেদ্বাহুহস্তেন দলাগ্রাণি সমন্ততঃ॥
দলমূলেষু যুগশঃ কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ।
এতৎ সাধারণং প্রোক্তং পঙ্কজং তন্ত্রবেদিভিঃ॥

....

অঙ্গুলোৎসেধবিস্তারাঃ সীমারেখাঃ সিতাঃ শুভাঃ।
কর্ণিকাং পীতবর্ণেন কেশরাণ্যরুণেন চ॥
শুক্ল-বর্ণানি পত্রাণি তৎসন্ধীন্ শ্যামলেন চ।
রজসা রঞ্জয়েন্মন্ত্রী যদ্বা পীতৈব কর্ণিকা॥
কেশরাঃ পীতরক্তাঃ স্যুররুণানি দলানি চ।
সন্ধয়ঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ স্যুঃ সিতেনাপ্যসিতেন বা॥
রঞ্জয়েৎ পীঠগর্ভাণি পাদাঃ স্যুররুণপ্রভাঃ।
গাত্রাণি তস্য শুক্লানি বীথিষু চ চতস্বষু॥
আলিখেৎ কল্পলতিকাং দল-পুষ্প-সমন্বিতাম্।
বর্ণৈর্নানাবিধৈশ্চিত্রৈঃ সর্ব্বদৃষ্টিমনোহরাম্॥
দ্বারানি শ্বেতবর্ণানি শোভা রক্তাঃ সমীরিতাঃ।
উপশোভাঃ পীতবর্ণাঃ কোণান্যসিতভানি চ॥
তিস্রো রেখা বহিঃ কার্য্যাঃ সিতরক্তাসিতাঃ ক্রমাৎ।
মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রমেতৎ সাধারণং মতম্॥

অর্থাৎ

তন্মধ্যে ৩৬টি ঘর লইয়া সুলক্ষণ পদ্ম অঙ্কিত করিবে। ৩৬টি ঘরের বাহিরের এক পংক্তিতে পীঠ, তাহার পরের দুই পংক্তিতে বীথিকা হইবে। পরে অবশিষ্ট দুই পংক্তি দ্বারা মধ্যস্থলে দ্বার, উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া শোভা এবং শোভাদ্বয়ের পার্শ্বে দুইটি করিয়া উপশোভা এবং পরে কোণ প্রস্তুত করিতে হইবে। যে ৩৬টি ঘর লইয়া পদ্ম অঙ্কিত, তাহার দ্বাদশটি ঘর বাহিরে পৃথক রাখিয়া তন্মধ্যস্থ ২৪টি ঘরকে ৩টি বৃত্ত দ্বারা সমভাগে বিভক্ত করিবে। উহার প্রথম বৃত্ত কর্ণিকা, দ্বিতীয় বৃত্ত কেশর ও তৃতীয়টি পদ্মপত্র। যে দ্বাদশাংশ বাহিরে রাখা হইয়াছে, উহা পত্রের অগ্র। তৃতীয় বৃত্তের মধ্যস্থ স্থানের পরিমাণে পদ্মপত্র রচনা করিবে। কেশর সমূহের অগ্রভাগে অর্ধচন্দ্র অঙ্কিত করিবে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা-সমূহের মধ্যভাগে সূত্রপাত করত পদ্মপত্রের অগ্রগুলির সমান মাপে বৃত্তরেখা আঁকিবে।

মধ্যস্থ সূত্রপাতের দুই পার্শ্বে স্থির হস্তে দলাগ্র আঁকিবে। দলমূলে দুই দুইটি করিয়া কেশর করিতে হয়। ইহাকেই তন্ত্রবেত্তারা সাধারণ পদ্ম কহেন।...

এক অঙ্গুলি উৎসেধ অর্থাৎ বেধ পরিমাণে শুভ্রবর্ণদ্বারা সীমারেখা সকল চিত্রিত করিয়া পীতবর্ণদ্বারা কর্ণিকা, রক্তবর্ণ গুণ্ডিকাদ্বারা কেশর ও শুক্লবর্ণদ্বারা পত্রসকল

রঞ্জিত করিয়া শ্যামবর্ণে সমস্ত সন্ধিস্থান চিত্রিত করিবে। প্রকারান্তরে যথা—কর্ণিকা পীতবর্ণ, কেশরসকল পীত রক্তবর্ণ, পত্রসকল রক্তবর্ণ, সন্ধি কৃষ্ণবর্ণ, পীঠগর্ভ শুক্লবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ, পীঠপাদ রক্তবর্ণ ও পীঠগাত্র শুক্লবর্ণ করিয়া বীথিচতুষ্টয়ে পত্র ও পুষ্প সহিত কল্পলতা সর্ববর্ণদ্বারা বিচিত্রিত করিবে। এই কল্পলতিকা দর্শনমনোহর করিবে। দ্বারসকল শুক্লবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ ও কোণ চতুষ্টয় কৃষ্ণবর্ণ করিবে। মণ্ডলের বহির্দেশে শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তিনটি রেখা চিত্রিত করিবে। এই প্রকারে সাধারণ সর্বতোভদ্রমণ্ডল নির্মাণ করিতে হইবে।

এতোখানি জ্যামিতিক নিষ্ঠা নিয়ে, শোভা এবং উপশোভায় বিভূষিত করে, এই যে সর্বতোভদ্রমণ্ডলটি আঁকবার নির্দেশ পাওয়া গেলো, এর মূল কথা কী? তন্ত্রবেত্তারা জানেন, এর মূল কথা হলো অষ্টদলপদ্ম ও বীথিকা :

ষট্‌ত্রিংশতা পদৈর্মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণম্।
বহিঃ পঙক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পংক্তিযুগ্মেন বীথিকা॥

সুলক্ষণ পদ্ম এবং বীথিকা ; ওই বীথিকার নাম কল্পলতিকা :

আলিখেৎ কল্পলতিকাং দলপুষ্পসমন্বিতাং।

প্রথমে মনে রাখা দরকার, তন্ত্রে এই পদ্ম এবং বীথিকার গুরুত্ব কতোখানি। কেননা, শুধুমাত্র সর্বতোভদ্রমণ্ডল নয়, প্রায় সমস্ত তান্ত্রিক যন্ত্রেরই মূল বিষয়বস্তু বলতে এই পদ্ম এবং বীথিকাই। এখানে কয়েকটি তান্ত্রিক যন্ত্রের ছবি দেওয়া গেলো (পৃঃ ৪০৭—৮) ; ছবিগুলিকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে খুঁটিনাটির তারতম্য থাকলেও অষ্টদলপদ্ম এবং বীথিকাই সমস্ত চিত্রের মূল বিষয়বস্তু।

অতএব, যন্ত্র-প্রসঙ্গে প্রধানতম প্রশ্ন ওঠে, ওই পদ্ম বা অষ্টদলপদ্মের প্রকৃত তাৎপর্য কী?

বাংলার পূজাপদ্ধতি এবং তন্ত্রের যন্ত্র-সংকেতের সঙ্গে সামান্যমাত্র পরিচয় যাঁর আছে তিনিই জানেন, তন্ত্রে পদ্ম বা অষ্টদলপদ্ম নারী-জননাঙ্গের প্রতীক মাত্র। অনেক সময় তান্ত্রিক রচনায় পদ্ম শব্দটিকে একেবারে সোজাসুজি সেই অর্থেই গ্রহণ করা হয়। যথা[১১] :

পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে সন্ততিস্তেন জায়তে॥

তন্ত্রে 'পদ্ম'-শব্দের এই জাতীয় ব্যবহার একটুও দুর্লভ নয়। বৌদ্ধতন্ত্র প্রসঙ্গে আধুনিক বিশেষজ্ঞ[১২] বলছেন :

চৈতন্যভৈরবী যন্ত্রম্

ত্রিপুরভৈরবী যন্ত্রম্

নিত্যা যন্ত্রম্

যন্ত্রপ্রস্তারিনী যন্ত্রম্
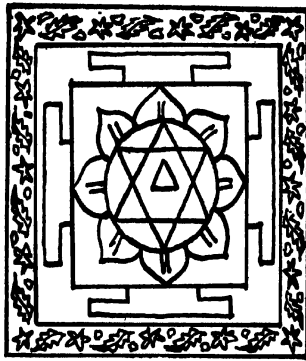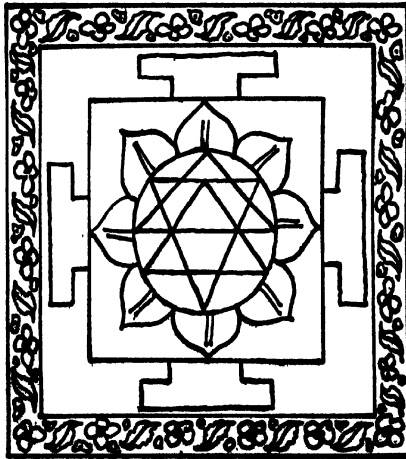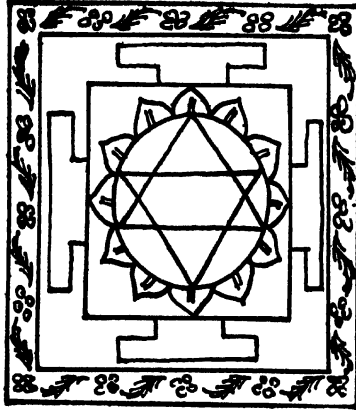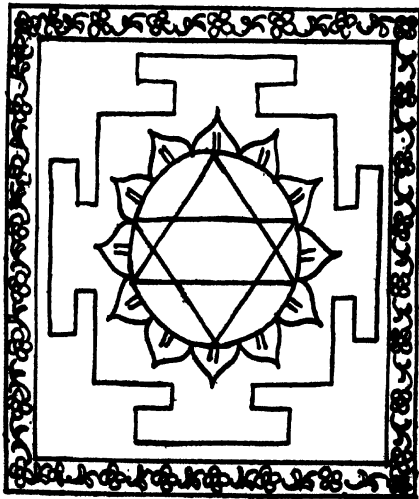
Vajra (with the variant *mani*) is a decent or mystic phrase for *linga*, the male organ, just as *padma*, lotus, is the literary rendering of *bhaga* or *yoni*.

অর্থাৎ, বজ্র (বা মণি) শব্দ পুরুষ-অঙ্গবাচক, যেমন পদ্ম শব্দ হলো নারী-জননাঙ্গের সাহিত্যিক প্রতিশব্দ।

এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার, পদ্মের এই প্রতীকী অর্থ শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয় :

In Egypt and amongst the Saivites in India, the lotus is a symbol of the reproductive act (Creuzer, *Symbolik und Mythologie*, Leipzig, 1836-43, 1, i, 412). The Buddhists of north countries still repeat, without suspecting the origin of the phrase, 'Om. The jewel in the lotus. Amen' (Brinton, *The Religious Sentiment*, 214). In the West, too, these symbols persist, even when, as also among the Buddhists, they contradict the central doctrine of the religion in which they appear[¹¹].

অর্থাৎ ভারতবর্ষের শৈবদের মধ্যে যে-রকম মিশরেও সেইরকম পদ্ম হলো যৌন-মিলনের (অঙ্গের ?) প্রতীক। উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধরা এখনো কথাগুলির মানে না জেনেই আবৃত্তি করে : 'ওম্ ! মণি পদ্মে হুং' ! পাশ্চাত্যেও এই প্রতীকগুলি টিকে থেকেছে, এমন কি—বৌদ্ধধর্মের মতোই—ধর্ম-বিশ্বাসটির সঙ্গে এর বিরোধ সত্ত্বেও।

তাহলে পদ্মের অর্থ নারীজননাঙ্গই। এই পদ্মই হলো সর্বতোভদ্রমণ্ডলের—তথা সমস্ত তান্ত্রিক যন্ত্রের—মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু সেই সঙ্গেই লক্ষ্য করা দরকার, তান্ত্রিক যন্ত্রগুলিতে শুধুমাত্র পদ্মের চিত্র নয় ; পদ্মকে ঘিরে রয়েছে বীথিকা। নারী-জননাঙ্গের সঙ্গে বীথিকার সম্পর্ক কী ? তান্ত্রিক যন্ত্র প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি স্বভাবতই সবচেয়ে মৌলিক। আমাদের যুক্তি অনুসারে, এর মূলে আছে এক আদিম বিশ্বাস : যে-বিশ্বাস থেকে দেবীর নাম হয়েছিলো শাকম্ভরী, কিংবা, যে-বিশ্বাসের মূর্ত পরিচয় হরপ্পার ওই অত্যাশ্চর্য সিলটিতে টিকে আছে। এবং, এইভাবে প্রাকৃতিক উর্বরতার সঙ্গে মানবীর উর্বরতার সংযোগ কল্পনা করা হয়েছে বলেই তন্ত্রে নারী-জননাঙ্গকে উদ্ভিদ-বাচক নাম (লতা) দেওয়া সম্ভব হয়েছিলো।

দুর্গাপূজার আলোচনায় ফেরা যাক। দুর্গাপূজার প্রধানতম অঙ্গ হলো যন্ত্র ও ঘট : সর্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর ঘট প্রতিষ্ঠা করা হবে।

> অনন্তর সর্বতোভদ্রমণ্ডলোপরি ঘট স্থাপন করিবে। যথা,—শুদ্ধ মৃত্তিকায় পঞ্চশস্য নিক্ষেপ করিবে, তদুপরি ধৌত সুলক্ষণ ঘট, তাহাতে দধ্যক্ষত (দধি মাখানো আতপ চাউল) দিয়া শুদ্ধ জলপূর্ণ করিয়া স্থাপন করিবে। তাহার কণ্ঠে আচারৎ লাল সুতা ও আলতা দেওয়া হয়। মধ্যে পঞ্চপল্লব (আম্র, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞীয়ডুম্বুর শাখা), অলভে কেবল আম্রপল্লব দিবে। তদভাবে দুইটি পানও দিবার ব্যবস্থা আছে। এক সরা চাউলে একটি হরিতকী কিংবা সুপারী দিয়া তদুপরি স্থাপন করিবে। তদুপরি একটি নির্দোষ সশীর্ষ ফল (নারিকেল অথবা কদলী) দিবে; ঐ ফলকে সিন্দুর রঞ্জিত করিবে। ঘটে একটি সিন্দুর পুত্তলিকা আঁকিবে, পুষ্পমাল্য দিয়া শোভিত করিবে…[৫৫২]

সর্বতোভদ্রমণ্ডলের অর্থ হলো নারী-জননাঙ্গ: সর্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর ঘট, ঘটের গায়ে সিন্দুরপুত্তলিকা—মানবীয় প্রজননের প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ নকল তোলবার আয়োজন। এইভাবে মানবীয় প্রজননের নকল তুলে কোন্ কামনা সফল করবার কল্পনা করা হচ্ছে তার আভাস আমরা আগেই পেয়েছি: নারী-জননাঙ্গের তান্ত্রিক নাম লতা, তান্ত্রিক যন্ত্রে অষ্টদলপদ্মকে ঘিরে রয়েছে বীথিকা। অর্থাৎ, নারী অঙ্গের জননশক্তির স্পর্শে প্রকৃতিকে ফলপ্রসূ করবার কল্পনা। ঘট-স্থাপনার মধ্যে সেই চেষ্টাকেই আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন করা হলো। শুদ্ধ মৃত্তিকায় পঞ্চশস্য নিক্ষেপ করে ফসল ফলানোর মহড়া শুরু হলো। আর তারপর ঘটের উপরস্থ পল্লবকে স্পর্শ করে কামনা জানানো হবে:

> ওঁ, অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ উজ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতের্নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ।[৫৫৩]
>
> অর্থাৎ, হে শক্তিমতী বৃক্ষ, (তুমি) বাঁচিয়া ওঠো ও ফলবতী হও। বনস্পতির পাতাকে সেবা করিয়া ধন প্রসব করো।

অনেক সময় ঘটের উপরের ডাবটির গায়েই সিন্দুরপুত্তলি এঁকে দিয়ে মানবীয় ফলপ্রসূতার সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার সাদৃশ্যে বিশ্বাসকে আরো স্পষ্ট ও অভ্রান্ত করবার আয়োজন দেখা যায়।

ওই যন্ত্র আর ঘটই হলো দুর্গাপূজার প্রধানতম অঙ্গ। তার মানে, কৃষি-আবিষ্কার পর্যায়ের এক আদিম বিশ্বাসই এ-পূজার প্রাণবস্তু। সে-দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ চন্দ নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। কিন্তু সেই প্রসঙ্গেই মনে করা দরকার, এই বিষয়টিকে আরো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন, আদিপর্বে দুর্গাপূজা আসলে পূজাই ছিলো না। পূজার বদলে ছিলো জাদুঅনুষ্ঠান। জাদুবিশ্বাসের মূল কথাও একটা কামনা সফল করবার চেষ্টাই। কিন্তু তা প্রার্থনা-উপাসনার সাহায্যে ঈশ্বরের করুণা উদ্রেক করে নয়। তার বদলে, কামনা সফল হওয়ার একটা নকল তুলে ওই নকলের সাহায্যেই বাস্তবভাবে কামনাটিকে সফল করবার কল্পনা। অষ্টদলপদ্মের ছবি এঁকে সিন্দুরপুত্তলীর ছবি এঁকে, মানবীয় ফলপ্রসূতার নকল তোলা হলো আর কল্পনা করা হলো প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার কামনাও এইভাবেই সফল হবে।

বলাই বাহুল্য, আমাদের আধুনিক চেতনার দিক থেকে এ বিশ্বাস একেবারে অর্থহীন। নারী-জননাঙ্গের সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার সম্পর্ক কোথায়? কিন্তু আধুনিক চেতনার মাপকাঠিতে তন্ত্রকে বোঝা যাবে না। তার বদলে, আমাদের পদ্ধতি অনুসারে, এই তান্ত্রিক বিশ্বাসটিকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের আচার-অনুষ্ঠানকে—বা পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের আচার-অনুষ্ঠানের স্মারকগুলিকে—বিচার করতে হবে।

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন-এর[৩৩৪] একটি উদ্ধৃতি থেকে শুরু করা যাক :

> In North America, when the corn is attacked by grubs, menstruating women go out at night and walk naked through the fields. Similar customs still survive among the European peasanty. Pliny recommended as an antidote to noxious insects that menstruating women should walk through the fields with bare feet, loose hair, and skirts drawn up to the hips. Demokritos, according to Columella, held the same

opinion : the women, he said, should run round the crop three times with bare feet and flowing hair. *The idea was evidently to diffuse the fertile energy with which the female body was believed at such times to be charged. Elsewhere the energy is regarded as inherent in their sex.* Among the Zulus, for example, the girls who perambulate must be naked but need not be actually menstruating at the time. This is the orgin of the well-known women's rite of exposing the genitalia by drawing up the skirts—a rite which in Greece was especially associated with Demeter ; and the custom common to many Greek cults of female votaries walking in procession without shoes, headbands or girdles belongs to the same circle of ideas.

অর্থাৎ (সংক্ষেপে), উত্তর আমেরিকায় ফসলে পোকা ধরলে ঋতুমতী মেয়েরা রাত্রে নগ্ন হয়ে ক্ষেতের উপর হাঁটে। ইয়োরোপের চাষীদের মধ্যে এ-প্রথা আজো টিকে আছে। খারাপ পোকার প্রতিষেধ হিসেবে প্লিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন, ঋতুমতী মেয়েরা খালিপায়ে এলোচুলে কোমরের ওপর পর্যন্ত কাপড় তুলে ক্ষেতের উপর হাঁটবে। কলিউমেল্লার মতে ডিমোক্রাইটসেরও সেই বিধান : তিনি বলেছেন, মেয়েরা খালিপায়ে আর এলোচুলে তিনবার দৌড়ে ক্ষেত প্রদক্ষিণ করবে। ধারণাটা স্পষ্টই এই যে, এ-অবস্থায় নারীদেহে যে-উর্বরাশক্তির আবির্ভাব হয় তাই এ-ভাবে ক্ষেতের মধ্যে সঞ্চারিত করা হবে। অন্যত্র দেখা যায়, ওই শক্তিকে নারীত্বের সহজাত শক্তি হিসেবেই মনে করা হচ্ছে। জুলুদের মধ্যে প্রথা হলো, ক্ষেতে ঘোরবার সময় মেয়েরা নগ্ন হবে, কিন্তু তখন ঋতুমতী যে হতেই হবে তা নয়। মেয়েদের জননাঙ্গ প্রদর্শন-মূলক অনুষ্ঠানাদিরও একই উৎস—এই অনুষ্ঠান গ্রীসে বিশেষ করে ডিমিটর-দেবীর সঙ্গে সংযুক্ত। নানান গ্রীক পূজাপদ্ধতিতে ব্যবস্থা দেখা যায়, পূজারিণীরা খালিপায়ে আর এলোচুলে সার বেঁধে হাঁটবে—ওই পূজাপদ্ধতিগুলিও একই জাতীয় ধারণা থেকে এসেছে।

নারী জননাঙ্গকেই মানুষ এককালে উৎপাদন-শক্তির আধার মনে করেছে আর তাই প্রাকৃতিক উৎপাদনে সংকট দেখা গেলে মেয়েরা নগ্নতার সাহায্যে সে-সংকট দূর করতে চেয়েছে। এখানে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়ের••• রচনা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায় :

during the famine which took place in the district of Gorakhpur..., parties of women, at night time, stripped themselves naked, went out of their houses, and taking the ploughs with them dragged the same across the field...

> The performance of a similar nudity-spell on the occassion of a longstanding draught has been recorded from Chunar in the district of Mirzapur. There...three women from a cultivator's family stripped themselves stark naked, all male-folk having been excluded from that place from beforehead. Then two of these nude women were yoked like oxen to a plough; while the third held the handle of the plough with her hands. Thereafter they began to imitate the action of ploughing
> ...whenever a draught occurs in Northern Bengal, the women-folk of Rajbansis or Kochs,...strip themselves stark naked and in that state of nudity, dance before the image of their Rain-god, *Hutum Deva*...
>
> সংক্ষেপে, গোরক্ষপুর, চুনার এবং উত্তর বাংলার নানান দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে, অনাবৃষ্টির সংকটকে অতিক্রম করবার কামনায় মেয়েরা নগ্নতার সাহায্য নিচ্ছে।

আমরা আগেই দেখেছি, বৃষ্টির সাহায্যে পিছিয়ে-পড়া মানুষেরা বন্ধ্যাত্ব-নিরসনের বা মানবীর প্রজননের কামনা সফল করতে চাইছে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে সে-বিশ্বাসেরই বিপরীত বিকাশ: মানবীর জননাঙ্গের সাহায্যে ওরা বৃষ্টিকে,—প্রকৃতির ফলপ্রসূতাকে,—আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছে। এই বিশ্বাসেরই আর একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, আমাদের দেশে কোনো কোনো অঞ্চলে লোকের ধারণা যে অতি-বৃষ্টির আসল কারণ হলো অতি বেশি সংখ্যায় নরনারীর মিলন[১১৬]। এ-জাতীয় বিশ্বাসাদির মধ্যে খুঁটিনাটির তারতম্য নিশ্চয়ই রয়েছে; কিন্তু সমস্তগুলিই এক মূল ধারণাচক্রের অন্তর্গত। সে-ধারণা অনুসারে, মানবীর প্রজনন ও প্রাকৃতির উৎপাদন—উভয়ই পরস্পরের প্রভাব-নির্ভর। দুঃখের বিষয় আধুনিক বিদ্বানেরা সবসময় ওই আদিম ধারণাটি সম্বন্ধে সম্যকভাবে সচেতন থাকেন না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় এবং তাঁর আগে ডক্টর উইলিয়াম ক্রুক, উল্লিখিত নগ্নতানুষ্ঠানের তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ডক্টর ক্রুক-এর[১১৭] মতে, বৃষ্টিদেবতার প্রাণে করুণা সঞ্চারের আশায় মেয়েরা অমন দীনহীন নগ্ন ভঙ্গি গ্রহণ করে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়[১১৮] কল্পনা করেছেন, নগ্নতার সাহায্যে মেয়েরা অনাবৃষ্টির দেবতাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। বলাই বাহুল্য, উভয় ব্যাখ্যাই কৃত্রিম। দেবতার প্রাণে করুণা সঞ্চারের কৌশল হিসেবে আমাদের দেশের মেয়েরা বিবস্ত্রা হতে নিশ্চয়ই অভ্যস্ত নয়। মেয়েদের নগ্ন হতে দেখে দেবতারা—তা সে

গোরক্ষপুরের অনাবৃষ্টির দেবতাই হোক আর উত্তর বাংলার বৃষ্টির দেবতাই হোক—কেন ভয় পাবে তাও বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তাছাড়া, নগ্নতামূলক এ-জাতীয় আচরণ আমাদের দেশের পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলে শুধুমাত্র বৃষ্টির কামনাতেই নয় এবং শুধুমাত্র আমাদের দেশেও নয়। এখানে দুটি উদ্ধৃতির সাহায্য নেওয়া যাক।

ডক্টর উইলিয়াম ক্রুক[৫৫৯] লিখছেন :

> Among the Ramoshis of the Dakkhin, the bridegroom is stripped naked before the anointing ceremony commences and the same custom prevails very generally in Upper India, ...Barren women worship a naked female figure at Bijapur. At Dayamava's festival in the Karnatak, women walk naked to the temple where they make their vows ; and the Mang, who carries the scraps of holy meat which he scatters in the fields to promote fertility, is also naked. (f. n. In the *Katha-Sarit-Sagara*, I, 154, the queen Kavalayavali worships the god stark naked).

রবার্ট ব্রিফল্ট[৫৬০] লিখছেন :

> Among the Hidatsas, the women, at the corn festival, carried at the end of sticks samples of all vegitables which they cultivated...They proceeded with them to the lodge. Here they stripped naked, and the elder men sprinkled both the fruits and the women with consecrated water. The men, in this instance, performed the fertilising function, but the festival was, we are told, 'initiated by the women'.

এ-জাতীয় আরো অনেক দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই উদ্ধৃত করা যায়। এবং এ-জাতীয় দৃষ্টান্তকে নিশ্চয়ই আধুনিক নীতিবোধ বা ধর্মবোধের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তার সহজ কারণ হলো, এ-রকম আচার-অনুষ্ঠান আধুনিক জীবনের অঙ্গ নয়। তার বদলে, প্রাচীন মানুষদের সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে জানতে-পারা তথ্যের দিক থেকে এগুলিকে বোঝবার চেষ্টা করলে আমরা দেখতে পাই, এক আদিম জাদুবিশ্বাস থেকেই এ-জাতীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম। সেই জাদুবিশ্বাস অনুসারে মানবীর জননশক্তির—এবং অতএব ওই জননশক্তির কেন্দ্র মানবীর জননাঙ্গও,—প্রকৃতিতে জননশক্তি

সঞ্চার করবে। আমাদের যুক্তি অনুসারে, এই আদিম জাদুবিশ্বাসটির দিক থেকেই ভগযাগ, লতাসাধনা, তান্ত্রিক যন্ত্র ইত্যাদির উপর আলোকপাত হওয়া সম্ভবপর।

ওই আদিম জাদুবিশ্বাস যে বস্তুনিষ্ঠ নয়, সে-বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নিশ্চয়ই নেই: প্রকৃতিকে চেনবার প্রচেষ্টায় মানুষের দারিদ্র্য প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনবার অক্ষমতারই অনুরূপ হতে বাধ্য। তার বদলে, এখানে যে-বিষয়ে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে তা হলো, আধুনিক বিদ্বানেরা আধুনিক ধ্যানধারণার সাহায্যে এই আদিম বিশ্বাসের যে-ব্যাখ্যা খুঁজেছেন তাও বস্তুনিষ্ঠার দিক থেকে সমান অর্থহীন: আদিম মানুষদের পক্ষে মানবীর জননাঙ্গের সাহায্যে প্রকৃতির জননশক্তি আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টাটা যেমনই কাল্পনিক, তেমনিই কাল্পনিক হলো আধুনিক বিদ্বানদের পক্ষে ওই প্রচেষ্টাকে দেবতার প্রাণে করুণা জাগানো বা দেবতাকে ভয় দেখানোর আয়োজন বলে ব্যাখ্যা করা।

তান্ত্রিক ধ্যানধারণার অন্যান্য কয়েকটি দিক: খপুষ্প ও পঞ্চমকার

আমাদের যুক্তি অনুসারে, আদিম পর্যায়ের কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানকে বিশ্লেষণ করেই তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার আদিতাৎপর্য অনুমান করা সম্ভব হতে পারে। আমাদের এই যুক্তিটির পক্ষে এখানে আরো কিছু কিছু নজির দেখাবার চেষ্টা করা যাক।

আদিম পর্যায়ের কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে ঋতুরজের জাদুবিশ্বাসগত তাৎপর্য প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে অধ্যাপক জর্জ টম্সনের মন্তব্য সুদীর্ঘভাবে উদ্ধৃত করেছি (পৃঃ ৩৩৬—৩৯)। অর্ধ-অসহায় অবস্থার ওই মানুষেরা প্রজনন-রহস্যকে যেটুকু বুঝতে পেরেছিলো সেই বোধ অনুসারে মানবীর ঋতুরজই এর মূল উপকরণ। এবং এই পর্যায়ের মানুষ জাদুবিশ্বাসের দিক থেকে যেহেতু মানবীয় ফলপ্রসূতার অনুকরণের সাহায্যে বা সংস্পর্শের সাহায্যে, প্রকৃতির ফল-প্রসূতাকেও আয়ত্তে আনবার কল্পনা করেছে সেইহেতু তাদের ধারণায় ঋতুরজ—বা সিন্দুর প্রভৃতি ঋতুরজের নকলগুলির,—গুরুত্ব অত্যন্ত অসামান্য।

তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার মধ্যে যদি ওই প্রাকৃত পর্যায়ের কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের স্বাক্ষর টিকে থাকে তাহলে তান্ত্রিক সাধনাতেও ঋতুরজের গুরুত্ব থাকাই স্বাভাবিক। এবং তা আছেও। তন্ত্র অনুসারে ঋতুরজের গুরুত্ব যে কতোখানি তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি[১১] থেকেই অনুমান করা যাবে:

ক্রমসংকেত খপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডোদ্ভব, গোলোদ্ভব, বজ্রপুষ্প, উল্লাস, প্রৌঢ়, ইত্যাদি—তন্ত্রে ঐ সকল তান্ত্রিক শব্দের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। আবার অনেক সাংকেতিক শব্দের অর্থ অভিষিক্ত গুরুর নিকট ভিন্ন আর কোনো প্রকারে জানা যায় না।

স্বয়ম্ভুকুসুম—প্রথম ঋতুমতীর রজঃ। যথা—

> হরসম্পর্কহীনায়াঃ লতায়াঃ কামমন্দিরে।
> জাতং কুসুমমাদৌ যন্মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥
> স্বয়ম্ভুকুসুমং দেবি রক্তচন্দনসংজ্ঞিতম্।
> তথা ত্রিশূলপুষ্পঞ্চ বজ্রপুষ্পং বরাননে॥
> অনুকূলং লোহিতাক্ষচন্দনং হরবল্লভং।

(মুণ্ডমালাতন্ত্র ২ প)

হর, অর্থাৎ পুরুষের সংস্রব ব্যতিরেকে লতা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যোনি হইতে যে কুসুম অর্থাৎ রজঃ হয়, তাহাকেই স্বয়ম্ভুকুসুম বা রক্তচন্দন বলা যায়। ইহার অভাবে ত্রিশূলপুষ্প ও বজ্রপুষ্প (চণ্ডালীর রজঃ) মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। ইহার অনুকল্প শিবপ্রিয় লোহিতাক্ষ চন্দন।

কুণ্ডলোদ্ভব—অথবা সধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা—

> জীবদ্ভর্তৃকনারীণাং পঙ্কমঞ্চেব কারয়েৎ।
> তস্যা ভগস্থ যদ্দ্রব্যং তৎকুণ্ডোদ্ভবমুচ্যত॥

(সময়াচারতন্ত্র ২য় প)

গোলোদ্ভব, অর্থাৎ বিধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা—

> মৃতভর্তৃকনারীণাং পঙ্কমঞ্চেব কারয়েৎ।
> তস্যা ভগস্থ যদ্দ্রব্যং তদ্গোলোদ্ভবমুচ্যতে॥

ইত্যাদি। ইত্যাদি।

তান্ত্রিক ধ্যানধারণা অনুসারে মানবীয় ফলপ্রসূতার সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার সম্পর্কটি ওই তান্ত্রিক পরিভাষা থেকেও অনুমান করা যেতে পারে। তান্ত্রিক পরিভাষায়, নারী জননাঙ্গের নাম লতা: নারী জননাঙ্গ থেকেই সন্তানের আবির্ভাব হয়, প্রকৃতিতেও লতায় ফল ফলে। কিন্তু সন্তানজন্মের আগে ঋতুরজঃ, ফলের আগে ফুল। তন্ত্রেও তাই ঋতুরজঃকে কুসুম, পুষ্প ইত্যাদি পরিভাষা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বলাই বাহুল্য, কুসুম বা পুষ্পের মতো কাব্যিক নাম সত্ত্বেও তন্ত্রের ওই কথাবার্তাগুলি আমাদের আধুনিক রুচিকে অত্যন্ত কঠোরভাবে পীড়িত করে। তার কারণ কি সত্যই এই যে, আমরা আজকের দিনে ঋতুরজের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে চিনতে শিখেছি এবং অতএব তন্ত্রের ওই কল্পনা আমাদের কাছে কুসংস্কার মাত্র? এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ

থাকতে পারে না যে, আমাদের আধুনিক জ্ঞানের কাছে তন্ত্রের ওই কল্পনা অন্ধ কুসংস্কারের আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে খপুষ্পাদি প্রসঙ্গে আমাদের রুচি যে এইভাবে পীড়িত হয় তার প্রকৃত কারণ আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়—তার বদলে আমাদের মনের একটি নতুন কুসংস্কার। আমরা লালিত হয়েছি পুরুষ-প্রধান সমাজে, আমাদের রুচি ও সংস্কারের উপর তাই পুরুষ-প্রধান সমাজের অনিবার্য স্বাক্ষর। ফলে, আমাদের পক্ষে ঋতুরজঃকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে মানব-দেহজাত অন্যান্য রক্তের সমতুল্য বলে গ্রহণ করতে পারা সম্ভব নয়। মাতৃ-প্রধান সমাজে এই রক্তের প্রতি যে-কুসংস্কার ছিলো পিতৃপ্রধান সমাজে তারই বিপরীত কুসংস্কার আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করতে চায়: মাতৃপ্রধান পরিবেশে মাতৃত্বের মূল উপাদান হিসেবে মানুষ যাকে পবিত্রতম মনে করেছে পিতৃপ্রধান পরিবেশে তাই এক রকম ঘৃণিত, অপবিত্র ও অশুচি-সূচক বস্তু। এও নিশ্চয়ই বস্তুনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার পরিচয় নয়, এক রকমের কুসংস্কারই। তবে, তান্ত্রিক কুসংস্কারের ঠিক উল্টো।

এখানে ভারতীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, অসমান উন্নতির ফলে আমাদের দেশের স্থান-বিশেষে সমাজ-বিকাশের ওই পিছিয়ে-পড়া পর্যায়টি এখনো বিলুপ্ত হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে আসাম অঞ্চলের (বিশেষত খাসি আর গারোদের) কথা উল্লেখ করা যায়; সে-অঞ্চলে মেয়েরা নাকি জাদু জানে, পুরুষদের ভেড়া করে রাখে। আবার সে-অঞ্চলেরই প্রধান তীর্থ কামরূপ-কামাখ্যা হলো যোনিপীঠ। অম্বুবাচীর দিন দেবী রজঃস্বলা হন—ওই দিনটিই এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। শুধু তাই নয়। এই স্তরের মানবচেতনায় জাদুবিশ্বাসের দাবি অনুসারে মানবীর (এবং অতএব দেবীর) দেহভাণ্ডের উপমা দিয়েই ব্রহ্মাণ্ডকে বোঝবার চেষ্টা; তাই কল্পনা করা হয় এই দিনটিতে পৃথিবীও রজঃস্বলা হন: সামনে ফসলের সময় এসেছে, ফসলের জন্ম দিতে হলে মানবীর অনুকরণে পৃথিবীকেও রজঃস্বলা হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত ও খর্ব হয়ে থাকবার দরুন এই অর্থনৈতিক বিকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক খিলানটির গায়েও দীর্ঘস্থায়ী কারুকার্যের মতো ওই পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের চিন্তা-চেতনার বহু স্মারক অত্যন্ত প্রকটভাবে টিকে থেকেছে। অবশ্যই, এইভাবে টিকে থাকতে গিয়ে সেগুলির একজাতীয় রূপান্তর ঘটতে বাধ্য: এককালে যে-চেতনা ছিলো জীবন-সংগ্রামের উপায়, সে-চেতনা জীবন-সংগ্রামের বাস্তব পটভূমি থেকে উৎপাটিত হয়ে জীবন-সংগ্রামের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে, অর্থহীন ও বীভৎস ধর্মমোহের রূপ গ্রহণ করেছে। ধর্মমোহের প্রকৃতিই ওই

রকম ; তার মধ্যে অতীতকে খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু আদি ও অকৃত্রিম তাৎপর্য-পূর্ণ অতীত হিসেবে নয়, বিপরীতে পর্যবসিত অতীত হিসেবে। অতীতের যে-জাদু-অনুষ্ঠান ছিলো জীবন-সংগ্রামের উপায়, ধর্মমোহ হিসেবে তাই হয়ে দাঁড়ায় জীবন-সংগ্রামের অন্তরায়। কাল্পনিক হলেও আদিম জাদুবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের ধ্যানধারণাগুলি কীভাবে তাকে জীবন-সংগ্রামের ব্যাপারে মানসিক উদ্দীপনা যুগিয়েছে তার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি ; ধর্মমোহের অঙ্গ হিসেবে আজকের দিনে এই আদিম বিশ্বাসের স্মারকই কী রকম অর্থহীন বীভৎসতায় পরিণত হয়েছে তার কিছু নমুনা দেখা যাক।

ত্রিবাঙ্কুরের মন্দিরে একটি প্রধান অনুষ্ঠানের নাম ত্রিপ্পুথারত্তু[৬৩২]। স্থানীয় বিশ্বাস অনুসারে দেবী বছরে আট-দশবার রজঃস্বলা হন, সেই উপলক্ষ্যেই উক্ত অনুষ্ঠান। দেবীর অঙ্গবস্ত্র তখন নাকি রক্তের দাগে লাল হয়ে যায়, এই বস্ত্রের একটু টুকরো পাবার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। অন্যত্র[৬৩৩] দেবী পার্বতীর অনুরূপ অবস্থা কল্পনা করে একই রকমের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়। এই বিশ্বাসই আধুনিক সমাজে কতো চূড়ান্ত কামবিকারে পরিণত হতে পারে তার একটি নমুনা হলো বাংলাদেশের গৌরীগরণ : "...এই অনুষ্ঠানের রক্তে নিষিক্ত ন্যাকড়া 'সিদ্ধবস্ত্র' রূপে সমাজে চলে—রোগ-বিনাশ, শত্রু-নিপাত, মামলা-জয়, পরীক্ষা-পাস ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ ফলপ্রদ বিশ্বাসে অনেকে তা সংগ্রহ করে রাখেন, মাদুলীতে ধারণও করেন। কিন্তু জিনিসটা কী তা হয়তো অনেকেই জানেন না।"[৬৩৪]

তন্ত্রের পঞ্চমকার সম্বন্ধে একই কথা। কুলার্ণব-তন্ত্র[৬৩৫] বলছে :

মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রামৈথুনমেবচ।
মকারপঞ্চকং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্॥

—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পাঁচটি বস্তুর নামের আদিতে 'ম' অক্ষরটি থাকায় ইহাদের সংক্ষিপ্ত নাম মকার।...

মকারপঞ্চকং দেবি দেবানামপি দুর্লভং।
মদ্যৈর্মাংসৈস্তথা মৎস্যৈর্মুদ্রাভির্মৈথুনৈরপি॥
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাসাধুরর্চ্চয়েৎ জগদম্বিকা।
অন্যথা চ মহানিন্দা গীয়তে থণ্ডিতৈঃ সুরৈঃ॥

পঞ্চমকার তন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। পঞ্চমকার ব্যতীত তান্ত্রিকের কোনো কার্যেই

অধিকার নাই। পঞ্চমকার দেবতাদিগেরও দুর্লভ ; মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা জগদম্বিকাকে পূজা করিতে হয়।

কিংবা[৩৩৬],

পঞ্চমেন বিনা দেবি চণ্ডিমন্ত্রং কথং জপেৎ।
—পঞ্চমকার ব্যতীত চণ্ডিমন্ত্র কেমন করিয়া জপ হইতে পারে ?

ইত্যাদি। ইত্যাদি। বস্তুত এ-সব কথা এমন কিছু নতুন কথা নয়। বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁরই পরিচয় আছে তিনি জানেন যে, পঞ্চমকার ছাড়া তন্ত্র সাধনা হয় না। এবং আজকের দিনে আমাদের উন্নততর ও মার্জিত রুচির কাছে এই পঞ্চমকার যে কী উৎকট বীভৎসতার রূপ গ্রহণ করেছে তাও আধুনিক বিদ্বানদের অনেকের রচনাতেই স্বীকৃত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করে পঞ্চমকারের বীভৎসতাকে ঢাকবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যাগুলি যে নেহাতই কৃত্রিম তার একটা প্রমাণ হলো এ-জাতীয় ব্যাখ্যায় সাধারণত চূড়ান্ত মন্তব্য হিসেবে বলা হয়, পঞ্চমকারের তাৎপর্য অতি গূঢ়, সাধারণের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। অর্থাৎ কিনা, ওই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আধুনিক বিদ্বানদের কাছে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার নগ্নতা-নিবারণের উপায়মাত্র :

যাঁহারা শাস্ত্রের মর্মার্থ বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই পঞ্চমকারের নামে নানা দোষারোপ করেন। ···গুরূপদেশ ব্যতীত এই সকল বিষয়ে কোনো আলোচনা চলিতে পারে না। অসি ধারার উপর দিয়া চলা, বাঘের সহিত গলাগলি করা এবং বিষধর সাপ লইয়া খেলা করা অপেক্ষাও কুলসাধন কঠিন ব্যাপার। কৌল সাধকগণ এই আচারকেও বেদবাহ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। একমাত্র জিতেন্দ্রিয় পুরুষই এই সকল আচারে অধিকারী। অসংযত ব্যক্তির পক্ষে পঞ্চতত্ত্বের সাধনা বিশেষ দুঃখের এবং পতনের কারণ হইয়া থাকে।[৩৩৭]

ইত্যাদি। ইত্যাদি। আমাদের মন্তব্য হলো, এইভাবে আধুনিক রুচি ও আধুনিক নীতিবোধ দিয়ে পঞ্চমকারের নগ্নতা-নিবারণ করবার বা পঞ্চমকারকে সমর্থন করবার চেষ্টাটা সম্পূর্ণ নিরর্থক। কেননা, আমাদের আধুনিক জীবনের পটভূমিতে এই পঞ্চমকার নিশ্চয়ই অর্থহীন বীভৎসতা-মাত্র। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমাদের যুক্তি হলো, এই বীভৎসতাই পঞ্চমকারের আদি-তাৎপর্য হতে পারে না। কেননা তাহলে, পঞ্চমকার-প্রাণ এই তান্ত্রিক সাধনা এতো বড়ো একটা দেশকে এতো শতাব্দী ধরে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারতো না।

তাহলে সমস্যা ওঠে : সেই আদি-তাৎপর্যের অনুসন্ধান কেমন করে সম্ভবপর হবে ? আমাদের পদ্ধতি অনুসারে, তার জন্যে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আজো যে-সব মানবদল পিছিয়ে-পড়া দশায় আটকে রয়েছে তাদের বিশ্বাস আর অনুষ্ঠানকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

পঞ্চমকারের মধ্যে আমরা বিশেষ করে মদ্য ও মৈথুন—এই দুটির আলোচনা তুলবো। কেননা, এই দুটি নিয়েই সন্দেহ জাগে সবচেয়ে বেশি। আধুনিক বিদ্বান[৩৩৮] যেমন বলছেন :

> বৈধ মাংস, মাছ এবং মুদ্রা সম্বন্ধে কোনো কথা উঠে না, কিন্তু মদ্য ও মৈথুন এই দুটিই সাধনার অঙ্গরূপে কীভাবে গৃহীত হইতে পারে—এই সন্দেহ জাগে।

অথচ তন্ত্র[৩৩৯] বলছে, মদ্যপান বিনা সাধনা সম্ভব নয় :

> বিনা মদ্যং মহেশানি ন সিদ্ধন্তি কদাচন।
> তস্মাদাদৌ প্রযত্নেন পীত্বা তাং পায়য়েদ্বুধঃ॥
>
> কিন্তু ইহাতে মদ্য বিনা কখনই সিদ্ধি হইতে পারে না। সেই জন্য পুর্বে যত্নপূর্বক স্বয়ং মদ্যপান করিয়া এবং তাহাকে পান করাইয়া জপ করিবে।

প্রশ্ন হলো, মানব-উন্নতির কোন্ স্তরের চেতনা আজো আমাদের দেশে এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপাসনা হিসেবে টিকে রয়েছে ?

পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মধ্যে মদ্যপানের দৃষ্টান্ত যথেষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। এই মদ্যপান যে আধুনিক অর্থে এবং আধুনিক উদ্দেশ্যে মদ্যপান নয় তার প্রমাণ হলো, প্রাচীন সমাজে মদ্যপানের অনুষ্ঠান-গত গুরুত্ব রয়েছে। আমরা এখানে বিশেষ করে দুটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করবো। কেননা এই দুটি অনুষ্ঠান থেকেই প্রাচীন মানুষদের মদ্য সংক্রান্ত ধ্যানধারণার তাৎপর্য অনুমান করবার সুযোগ হতে পারে।

একটি অনুষ্ঠান মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার কামনায়। আর একটি অনুষ্ঠান নবজাতককে লাভ করবার কামনায়। তাই এই দুটি অনুষ্ঠানকে পরীক্ষা করলে অনুমান করা যেতে পারে যে, আদিম মানুষের চেতনায় মদ্যও রক্তের মতোই জীবন ও জন্মের একটি মূল উপাদান বা অন্তত প্রধান সহায়ক। তাই নবজন্মের কামনা—তা সে মানবীয়ই হোক আর প্রাকৃতিকই হোক—যেহেতু তান্ত্রিক সাধনার আদি তাৎপর্য, সেইহেতু মদ্যপান বিনা তান্ত্রিক সাধনাকে প্রাচীনেরা অসম্ভব মনে করেছিলেন।

প্রথমত, প্রাচীন সমাজের এই দু'রকম অনুষ্ঠানকে পরীক্ষা করা যাক। মৃত্যুকে অতিক্রম করবার কামনায় মদ্যের ব্যবহার আধুনিক গবেষকদের কাছে অপরিচিত নয় :

The Irish wake is a familiar example of the practice of drinking to celebrate death. In West Africa the Tshi people drink heavily during the fast which follows a death, and the mourners are generally intoxicated. The same is the case among the Yorubas. But it is chiefly after the funeral that drinking is the rule of the feast.

At funerals among the Woolwa Indians there is much drinking of *mishla*. A long line of cotton is stretched, like a telegraph wire, from the house of the dead, where the drinking takes place, to the burial ground where the body has been deposited. 'I have seen the white thread following the course of the river for many miles, crossing and recrossing the stream several times'. As soon as a Bangala man dies, the family gets in a large supply of sugar-cane wine. Dancing and drinking are carried on for three or four days and nights, or until the wine is finished. The Guiana Indians drink and dance at the funeral feast.

Among the Tshinyai of the Zambesi the native beer, *pombe*, plays a considerable part in post-funeral rites. For the ceremony of *Bona*, a large quantity is prepared. Holes are bored above the grave and *pombe* is poured in. In one hole, in front of the house where the grave is, the mourners wash their hands with *pombe*. As the procession retires, a widow of the deceased (she is called *musimo*, the spirit) her head covered with calico, constantly calls out for *pombe*, which she drinks beneath the covering. At the house of the head widow, a large hole is dug and well-cemented. This is filled with *pombe*, and every one lies down and drinks it without help of spoon or vessel. A feast follows consisting of *pombe* and meat'[৭০].

মৃত্যু-উৎসবে মদ্যপান-ব্যবহারের একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত হলো আইরিসদের শব-সংকার। দক্ষিণ আফ্রিকায় টুশিরা কারুর মৃত্যু ঘটলে পর উপবাস দেয়, সেই উপবাসের সময় তারা অত্যন্ত বেশি মদ্যপান করে, শোকার্তরা সাধারণত মাতাল হয়ে যায়। ইয়োরুবাদের মধ্যেও একই ব্যাপার চোখে পড়ে। কিন্তু সাধারণত নিয়ম হলো, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর জ্ঞাতিভোজনের সময় মদ্যপান করা হবে।

উলওয়াদের মধ্যে দেখা যায়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় প্রচুর মদ্যপান করবার প্রথা আছে। সেই মদ্যের নাম মিশলা। মৃতের বাড়িতে মদ্যপান করা হয়, সেখান থেকে

কবরখানা পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তারের মতো সুতো টাঙিয়ে দেওয়া হয়। 'মাইলের পর মাইল ধরে নদীর কিনারা দিয়ে এবং নদীকে বারবার ডিঙিয়ে এই সুতো খাটানো হতে আমি দেখেছি'। বগলদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার পরিবারের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর পরিমাণ আখের মদ সংগ্রহ করে; তারপর তিনচার দিন ধরে, কিংবা যতোক্ষণ না মদটা শেষ হচ্ছে, সারা রাত তাদের নাচ এবং মদ্যপান চলে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমন্ত্রণে গিআনারা মদ্যপান করে এবং নাচে।

আবেলির তিসিন্নাইদের পচাই মদের নাম পম্‌বি; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের অনুষ্ঠানে এই মদের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বোনা' অনুষ্ঠানের জন্যে বিস্তর মদ তৈরি করা হয় এবং কবরের গর্ত খুঁড়ে পম্‌বি ঢালা হয়। বাড়ির সামনে কবরখানার উপরের একটি ওইরকম গর্তের গায়ে শোকতপ্তরা পম্‌বি দিয়ে হাত ধোয়। মিছিলটির ফিরতি পথে মৃতের এক বিধবা পত্নীকে সাদা কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়; ঘোমটার মধ্যে থেকে সে একটানা পম্‌বি চাইতে থাকে এবং প্রভূত পরিমাণে তা পান করে। প্রধানা বিধবার বাড়িতে একটা বড় গর্ত করা হয় এবং সেটা ভালো করে লেপন করে তার মধ্যে পম্‌বি ঢেলে ভরতি করা হয়। সকলে শুয়ে পড়ে সেই গর্তের ভিতর থেকে চামচ বা মগের সাহায্য ছাড়াই পম্‌বি পান করতে থাকে। তারপর মাংস ও পম্‌বির ভোজ হয়।

আমাদের দেশে তথাকথিত নিচুশ্রেণীর মানুষদের মধ্যেও এই জাতীয় প্রথা দুর্লভ নয়। যেমন, মেথর ধোপা প্রভৃতির মধ্যে দেখা যায়, আত্মীয়-বিয়োগ ঘটলে তারা তাড়ি বা ওই জাতীয় কোনো মদ প্রচুর পরিমাণে পান করে থাকে। সমাজের সদর মহলের মানুষ নয় বলেই এদের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সমাজ-বিকাশের পিছনকার পর্যায়ের অনেক কিছুই আজো অমনভাবে টিকে রয়েছে, তাই সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে পর আমাদের পূর্বপুরুষদের নানারকম দুর্বোধ্য বিশ্বাসের উপর আলোকপাত হতে পারে। ধোপা মেথরদের অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করে বৈদিক দেবতাদের বিশ্বাসকে বোঝাবার চেষ্টা অনেকের আত্মমর্যাদায় আটকাবে। কিন্তু সমাজ-বিকাশের যে পর্যায়ের ধ্যানধারণা মেথর প্রভৃতিদের মধ্যে আজো এইভাবে টিকে রয়েছে বৈদিক মানুষেরাও এককালে সেই পর্যায়ে জীবন যাপন করেছিলেন; তাই বৈদিক সাহিত্যে সেই পর্যায়ের বিশ্বাস খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে কেন?

ঋগ্বেদে[১১] দেবতারা গাইছেন:

> অপাম সোমম্‌ অমৃতা অভূম
> —আমরা সোম পান করে অমৃতত্ব লাভ করেছি।

বৈদিক ঋষিদের কাছে মস্ত বলতে ওই সোমই। তাঁদের বিশ্বাস

অনুসারে এই মদ্যের সাহায্যেই মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়ে অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

প্রাচীন পর্যায়ে আটকে-থাকা মানুষদের মধ্যেও তাই। তাই, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মদ্যের ব্যবহার, কবরের গায়ে গর্ত খুঁড়ে মৃতের উপর মদ্য ঢালবার আয়োজন, মদ্যপানরত আত্মীয়দের সঙ্গে সুতো বেঁধে কবরখানাকে সংযুক্ত করবার ব্যবস্থা—ইত্যাদি, ইত্যাদি। আজো আমাদের দেশে সাবেকি পদ্ধতিতে প্রস্তুত মদের নাম দেওয়া হয় মৃতসঞ্জীবনী।

প্রাচীন মানুষদের কল্পনায় মদ্য যদি মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার,—মৃত্যুর স্পর্শ কাটিয়ে জীবনকে ফিরে পাবার,—এক রকম উপকরণ হয়, তাহলে বুঝতে হবে প্রাচীন মানুষদের কাছে মদ্যের তাৎপর্যটা অন্য রকমের ছিলো : মদ্যের বাস্তব গুণাগুণ বোঝবার মতো জ্ঞানের সঙ্গতি তাদের ছিলো না, থাকবার কথা নয়। মদ্যপানের দৈহিক ফলাফল সংক্রান্ত তাদের যেটুকু অভিজ্ঞতা সেটুকু হলো, সাময়িকভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা এমন কি শক্তি-সামর্থ্যের বৃদ্ধি—অনেক সময় যেন মানুষটার প্রকৃতি বদলে গিয়ে নতুন মানুষে পরিণত হচ্ছে!

অতএব এই মদ্য নবজীবনের আধার, তরল জীবন—রক্তের মতো।

আর জীবন বলেই মদ্যের সাহায্যে মৃত্যুর স্পর্শকে উত্তীর্ণ হবার অতো রকম আয়োজন।

যদি তাই হয়, তাহলে মদ্যের ব্যবহার শুধুমাত্র মৃত্যু প্রসঙ্গেই হবার কথা নয়। জাদু-বিশ্বাস অনুসারে প্রাচীন মানুষের পক্ষে নবজাতককে পাবার—সন্তান-উৎপাদনের—সহায়ক হিসেবেও মদ্যের সংস্পর্শ মূল্যবান হবার কথা।

সাঁওতালদের সৃষ্টি-উপাখ্যানে[১১২] এই বিশ্বাসেরই ইংগিত পাওয়া যায়।

আদি-নর এবং আদি-নারী গড়বার পর মরণ-বুরু দেখলো তাদের মধ্যে সন্তান-উৎপাদনের কোনো তাগিদ নেই। অতএব মরণ-বুরু তাদের মদ তৈরি করতে শেখালো—এই মদ পান করবার পরই তাদের মধ্যে প্রজননের উৎসাহ প্রথম দেখা দিলো, তারই ফলে সম্ভব হলো মনুষ্যজাতির আবির্ভাব।

প্রাচীন পর্যায়ে আটকে-থাকা মানুষদের মধ্যে দেখা যায়, যৌন-মিলন-মূলক উৎসবের প্রধানতম অঙ্গ হলো মদ্যপান। আমরা আগেই দেখেছি, এবং পঞ্চমকারের মৈথুন-প্রসঙ্গে সে-কথার পুনরুল্লেখ করবো যে, এ-উৎসবের যৌন-মিলনকে আধুনিক সমাজের গণিকালয়ের আলোয় চিনতে গেলে খুবই ভুল হবে। কেননা সে-উৎসবের পিছনে মূল কথাটা হলো প্রকৃতিকে ফলপ্রসূ করবার কামনা। তেমনি, ওই উৎসবের মদ্য-ব্যবহারকেও আধুনিক সমাজের শুঁড়িখানার আলোয় চিনতে গেলে ভুল করা হবে; কেননা, তার পিছনে মূল কথা হলো, ওই তরল প্রাণশক্তি ব্যবহারের সাহায্যেই প্রকৃতিতে নবজন্মের আয়োজন করা।

নবজন্মের কামনায় এই তরল জীবনীশক্তির ব্যবহার আজো মানব-সমাজে কীভাবে টিকে রয়েছে তার কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায় দেশ-বিদেশের বিবাহ-অনুষ্ঠানকে বিশ্লেষণ করলে : বহু ক্ষেত্রেই বিবাহ-অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ হলো মদ।

> At Tipperah weddings the bride recives a glass of liquor from her mother. She takes this to the bridegroom, sits on his knee, and, after drinking some of the liquor, gives the rest to him. ...Among the Nakri Kunbis of Thana, liquor is given to the pair when the wedding ceremony is completed. The girl relatives of the Khyoungtha bride bar the entrance to the village against the bridegroom with a bamboo. Across this he has to drink with them a loving cup of fraternity before he is allowed to enter. At weddings in Morocco the priest hands to the pair a cup of wine which he has blessed. ......Among the Larkas, a cup of beer is given to each of the two parties; they mix the beer and then drink it. This completes the marriage. In the Moluccas, Japan, Bengal, Brazil, Russia, Scandinavia and many other districts of Europe, the bridal pair drinks, as the marriage ceremony or part of it, wine or beer from one vessel. At Beni-Israil weddings the bridegroom pours wine into the bride's mouth. In Korea and China the pair drink wine from two cups, which are tied together by a red thread. In Christian countries the rite is separated from the ceremonial proper, but is carried out independently when the pair receive together the wine of the Communion, which is to be partaken of immediately or soon after the marriage itself. Among the Gonds, the respective fathers of the bridal pair drink together'[১৩].

অর্থাৎ, (সারমর্ম), ত্রিপুরায় বিয়ের অনুষ্ঠান হিসাবে কনের মা কনেকে একপাত্র মদ দেয়; কনে সেই পাত্র নিয়ে বরের কাছে যায়, তার কোলে বসে পাত্র থেকে নিজে কিছুটা খায় আর তারপর বাকিটুকু বরকে খেতে দেয়। থানা অঞ্চলে নকরি কুনবিদের মধ্যে প্রথা হলো, বিবাহ-অনুষ্ঠানের শেষে বরবধূকে মদ্যপান করতে দেওয়া হবে। খিয়ুঙটায় কন্যাপক্ষের মেয়েরা বরের সামনে বাঁশ দিয়ে গ্রামে ঢোকবার পথ বন্ধ করে রাখে; বাঁশের উপাশে দাঁড়িয়ে এদের সঙ্গে মদ্যপান করবার পর তবেই তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়। মোরোক্কোর বিবাহানুষ্ঠানে পুরোহিত একটি মদের পাত্রে আশীর্বাদ বর্ষণ করে বরবধূকে পান করতে দেয়। লারকাদের মধ্যে প্রথা হলো, বর ও বধূ উভয়কেই এক

পাত্র করে মদ দেওয়া হয়; তারা পাত্রের মদ একসঙ্গে মিশিয়ে পান করে; এরই পর বিবাহানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি। মলুক্কাস, জাপান, বাংলা, ব্রেজিল, রাশিয়া, স্কাণ্ডিনেভিয়া এবং ইয়োরোপের নানা অঞ্চলে বিবাহ-অনুষ্ঠান বা তার অঙ্গ হিসেবে বরবধূকে একই পাত্র থেকে মদ পান করতে হয়। বেনি-ইস্রাইল-এর বিয়েতে বর কনের মুখে মদ ঢেলে দেয়। কোরিয়া আর জাপানে প্রথা হলো, লাল সুতো দিয়ে বাঁধা দুটি পাত্র থেকে বর ও বধূকে মদ্যপান করতে হবে। খৃস্টান দেশে যদিও মূল বিবাহ-অনুষ্ঠান থেকে এই ব্যবস্থাটুকু বিচ্ছিন্ন হয়েছে তবুও স্বতন্ত্রভাবে তা পালন করবার ব্যবস্থা দেখা যায়—বিবাহের অব্যবহিত পরে বর ও বধূকে মদ্যপান করতে হয়। গোণ্ডদের মধ্যে প্রথা হলো, দুই বেয়াই একসঙ্গে বসে মদ্যপান করবে।

প্রাচীন সমাজে প্রজননের আয়োজনেই বিবাহ।

তাহলে, প্রাচীন মানুষদের ধারণায় মদ্যের ব্যবহার শুধুমাত্র মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার আশায় নয়, নবজন্মের সাফল্য-কামনাতেও।

যদি দেখা যায়, এইভাবে একই বস্তু মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার আশায় এবং প্রজননের সাফল্য-কামনায়—উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে, তাহলে সে-বস্তুটির তাৎপর্য কী হতে পারে? প্রাণ, জন্ম, নবজীবন। যে-জীবন চলে গিয়েছে তাকে ফিরে পাবার চেষ্টা। আর যে-জীবন কামনা করা হচ্ছে তাকে সুনিশ্চিতভাবে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা। মদ্য সম্বন্ধে এই মনোভাবটির মূলে মানবদেহের উপর মদ্যের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রভাব সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাটা নিশ্চয়ই ছিলো: মদ্যপানের ফলে যে সাময়িক উৎসাহ-উদ্দীপনাদি পাওয়া যায় তা সম্যকভাবে বিচার করা আদিম মানুষদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি; ফলে ব্যক্তিত্বের ওই সাময়িক পরিবর্তনকে তারা মানবদেহে স্বতন্ত্র প্রাণশক্তির পক্ষে ভর করবার লক্ষণ বলেই ভুল করতে পারে। এই প্রাণশক্তি পানীয়ের মধ্যে দিয়ে মানবদেহে প্রবেশ করছে। ফলে, আদিম বিশ্বাস অনুসারে ওই পানীয়ই প্রাণশক্তি।

খৃস্টানদের ধর্মপুঁথিতে মদ্যকে যীশুর রক্ত বলে যে-কল্পনা করা হয়েছে তাও এই আদিম বিশ্বাসেরই পরিণাম। প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসের নানান দৃষ্টান্তে দেখা যায়, দশায়-পাওয়া, দিব্যোন্মাদনা, ঠাকুর-দেবতার ভর হওয়া প্রভৃতি নানান নামে যে-অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয় তার সঙ্গে মদ্যপানজনিত অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে[১১] ধর্মানুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত মদ্যপান করতে বাধ্য। তার কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠান থেকে এই জাতীয় ধর্মবিশ্বাসগুলির জন্ম; এবং সেই জাদু-অনুষ্ঠানের মূল কথা হলো, জীবনীশক্তির স্পর্শে বা জীবনীশক্তির একটা নকলের সাহায্যে প্রকৃতির জননশক্তিকেও আয়ত্তে আনবার আয়োজন।

অতএব, আমাদের মূল যুক্তি যদি ঠিক হয়,—যদি ওই কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-অনুষ্ঠান থেকেই তান্ত্রিকাদি সাধনার জন্ম হয়,—তাহলে নিশ্চয়ই মদ্যপান বিনা সে-সাধনার সম্ভাবনা থাকে না। তন্ত্র বলছে : বিনা মদ্যং মহেশানি ন সিদ্ধন্তি কদাচন।

পঞ্চমকারের মধ্যে অন্যতম মকার বলতে মৈথুন। এই 'ম'-কারটি যে তান্ত্রিক সাধনার প্রধানতম অঙ্গ তা প্রমাণ করবার জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয়, তন্ত্রে যেহেতু মানবীয় ব্যাপারের উপমান হিসেবেই বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা সেইহেতু তন্ত্রের বিশ্বরূপ-কল্পনাতেও[৭৭] এই মৈথুন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

অথচ আধুনিক রুচিবোধ এবং নীতিবোধের দিক থেকে তন্ত্রকে বিচার করতে গিয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা এই 'ম'-কারটি নিয়েই সবচেয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই বিষয়টির উল্লেখ করেই তন্ত্রকে অতি জঘন্য ও বিকৃত মনোভাবের পরিচায়ক বলে নিন্দা করে থাকেন। অপরেরা তন্ত্রকে সমর্থন করতে গিয়ে এই বিষয়টিকে হয় গোপন করতে চান বা কৃত্রিম ব্যাখ্যার সাহায্যে একে সমর্থন করতে চেষ্টা করেন।

প্রথমে এই রকম কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাক।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[৭৮] বলছেন :

> অন্তকথা খুলিয়া বলিতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিতে হয়,—হয়তো পিনাল কোডের ধারায়ও পড়িতে হয়। তবে একটা কিছু না বলিলে নয়—তাই কয়েকটি নমুনা দিতেছি—
>
> দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ।
> সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ॥
>
> মোট কথা এই যে,
>
> দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈঃ সেব্যমানো ন সিদ্ধতি।
> সর্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিদ্ধতি॥
>
> অর্থাৎ দুষ্কর কঠোর নিয়ম করিয়া সেবা করিলে কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হয় না। সর্বপ্রকার কামোপভোগ করিয়া যদি সেবা করো—তাহা হইলে নিশ্চয় শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হইবে।......
>
> একজন ইউরোপীয় লেখক বলিয়াছেন—ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ খুঁজিতে গেলে এই সকল জঘন্য বই ঘাঁটিতে হইবে। ভবিষ্যতে কোন হতভাগ্য পণ্ডিতের অদৃষ্টে যে সে দুর্ভোগ আছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সে দুর্ভোগ না

ভুগিলেও এত বড় ধর্মটা—কেন যে অধঃপাতে গেল, তাহা তো বুঝা যায় না। তাই কাহাকেও না কাহাকেও একদিন সে দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। কিন্তু যে ভুগিবে সে সত্য সত্যই ভারতের একটা মহা উপকার সাধন করিয়া যাইবে। সে অন্তত বলিবে—"বাপু! এ পথে আর আসিও না—এ পথে আসিলে অধঃপতন অবধারিত"।

মহামহোপাধ্যায়ের মতে এই তন্ত্র হলো বৌদ্ধধর্মের অধঃপাতে-যাওয়ার পরিণাম। তাঁর ওই মত কতোখানি স্বীকারযোগ্য সে-আলোচনা পরে তোলা যাবে। আপাতত আমাদের প্রশ্ন হলো, তান্ত্রিক ধর্মের আধুনিক সংস্করণটি যতো বীভৎসই হোক না কেন—এই বীভৎসতাই তন্ত্রের আদি-তাৎপর্য হতে পারে না। কেননা, শুধু বীভৎসতা, শুধু বিকৃতি এতো বড় একটা জাতকে, এতো শতাব্দী ধরে সত্যই এমনভাবে প্রভাবিত করে রাখতে পারে না। তাই প্রশ্ন ওঠে, সেই আদি-তাৎপর্য কী ছিলো? কেমনভাবে কোন পদ্ধতিতে, আমাদের পক্ষে তা অন্বেষণ করা সম্ভবপর? উত্তরটা মহামহোপাধ্যায়ের আশঙ্কা থেকেই অনুমান করা যেতে পারে: 'খুলিয়া বলিতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিতে হয়'। বস্তুত আমাদের যুক্তিও ঠিক তাই-ই। তন্ত্রের আদি রহস্য বুঝতে হলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করে পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়ে থাকা অসভ্য মানুষদের আচার-অনুষ্ঠান ও বাস্তব বিশ্বাসকেই পরীক্ষা করতে হবে। তাতে নিশ্চয়ই তন্ত্রকে সমর্থন করবার যুক্তি পাওয়া যাবে না; কিন্তু তন্ত্রকে বুঝতে পারবার—ব্যাখ্যা করবার,—একটা উপায় হতে পারে। এবং তার সাহায্যে 'ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ' বোঝা না গেলেও অনুন্নতির বা বাধাপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষণকে চিনতে পারা সম্ভব হবে।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তন্ত্রকে সমর্থন করতে চান। আর সেই কারণে আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিই তিনি অনুসরণ করতে উদ্যত হয়েছেন—অর্থাৎ কিনা, পিছিয়ে-পড়া মানুষদের দিকে তাকাবার বদলে উন্নততর জাতিদের দোহাই দিয়ে তন্ত্রের মহিমা প্রচার করবার চেষ্টা করছেন[১১]:

নরনারীর সঙ্গমটাকে জঘন্য ব্যাপার বলিয়া পরিচিত করিলেই, তাহার পর হইতে দুর্বল পুত্রকন্যা উৎপন্ন হইবে, যথাশাস্ত্র বংশরক্ষা দুষ্কর হইবে। জর্মন মনীষিগণ এইটুকু বুঝিতে পারিয়াই গত কুড়ি বৎসর কাল জর্মনির চিকিৎসকগণ মৈথুনের শাস্ত্র-সম্মত পদ্ধতি প্রকাশ্যভাবেই ব্যাখ্যা করিতেছেন।
……জর্মনির বিদ্বজ্জন সমাজে জীবসৃষ্টির পদ্ধতির ব্যাখ্যা লজ্জাজনক নহে। আমাদের দেশে যখন তন্ত্রধর্ম প্রবল ছিল, তখন মৈথুনটা গোপ্য, নিন্দনীয় ও

> জঘন্য ব্যাপার বলিয়া পরিচিত ছিল না। খৃস্টানী বুদ্ধিতে এখন তন্ত্রের পঞ্চমকারের নিন্দা করিলে চলিবে কেন?

কোন উদ্দেশ্যে জর্মনিতে আধুনিক যুগে প্রজনন-তত্ত্বের উপর অমন গুরুত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো এবং তার বাস্তব ফলাফলই বা কী হয়েছিলো—এ-আলোচনা অবশ্যই স্বতন্ত্র। আমাদের যুক্তির বর্তমান পর্যায়ে যে-কথাটুকু প্রাসঙ্গিক তা হলো, এইভাবে হাল-জর্মনির দোহাই দিয়ে তন্ত্রের মৈথুনকে সমর্থন করবার চেষ্টা অত্যন্ত প্রকটভাবেই কৃত্রিম। তার কারণ, তন্ত্র অতি প্রাচীন ব্যাপার—আমাদের দেশে এ-যুগে তার প্রভাব যতো গভীরই হয়ে থাকুক না কেন, সমাজ-বিকাশের এক অতি প্রাকৃত পর্যায়েই তার উৎস। বস্তুত, আমাদের আধুনিক সমাজ-বাস্তবের মধ্যে থেকে সেই প্রাকৃত সমাজ-বাস্তবের চিহ্ন অসমাপ্তভাবে বিলুপ্ত হয়েছে মাত্র; তাই তান্ত্রিক ধ্যানধারণা আজো আমাদের দেশে এতো ব্যাপক, এতো বিপুল প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। অতএব, সেই সুপ্রাচীন সমাজ-বাস্তবের দিক থেকেই তন্ত্রের তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে হবে—তার বদলে আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের নজির দেখিয়ে তন্ত্রের সমর্থন খোঁজবার চেষ্টাটা এ-যুগের বিদ্বানের পক্ষে তন্ত্রের প্রতি ভ্রান্ত অনুরাগের পরিচায়ক।

অতএব, আমরা আমাদের পদ্ধতি অনুসারে পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করে তন্ত্রের এই প্রধানতম মকারটির আদি-তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো।

আমরা ইতিপূর্বেই এ-বিষয়ে কিছু তথ্যের উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি, কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকৃতির উর্বরা-শক্তির সঙ্গে মানবীর উর্বরা-শক্তির নিবিড় সাদৃশ্য ও এমন কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়েছে। ফলে, এই স্তরের চেতনায় প্রজনন ও ধনউৎপাদন—সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং ফসল ফলানো—দুটি সম্পর্কহীন ক্রিয়া নয়। অর্থাৎ, ওই অর্ধ-অসহায় অবস্থায় মানুষেরা সন্তান লাভ সংক্রান্ত নানারকম ক্রিয়াকলাপের সাহায্যেই শস্য উদ্গমের আর শস্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে, কিংবা, অপরপক্ষে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার নকল তুলে নিজেদের প্রজনন-প্রচেষ্টাকেও সফল করতে চেয়েছে।

এ-বিষয়ে রবার্ট ব্রিফল্ট সুবিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন, শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করবার বদলে জমিতে চাষ দিয়ে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা শুরু হবার পর থেকে খাদ্য-উৎপাদন সংক্রান্ত জাদু-অনুষ্ঠানের মূল কামনা হলো পৃথিবীর উর্বরা-শক্তির বৃদ্ধি এবং সে-অনুষ্ঠানের মূল অঙ্গ হলো মৈথুন।

The belief that the sexual act assists the promotion of an abundant harvest of the earth's fruits, and is indeed indispensable to secure it, is universal in the lower phases of culture.[৭৮]

সংস্কৃতির নিম্নতর পর্যায়ে সর্বত্রই এই বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায় যে, মৈথুনের সাহায্যেই পৃথিবীতে বহুল পরিমাণে ফসল ফলানো যাবে, এমন কি পৃথিবীতে ফসল ফলানোর ব্যাপারে মানুষের মৈথুন অনিবার্যভাবে প্রয়োজন।

মধ্য-আমেরিকার আদিবাসীরা[৭৯] বীজ বপনের রাতে এবং বীজ বপনের ঠিক মুহূর্তটিতে ক্ষেতের উপর মৈথুন করবার উদ্দেশ্যেই কয়েকজনকে বিশেষভাবে নিয়োগ করে। মুসকোয়াকি নামের রেড্-ইণ্ডিয়ানদের[৮০] মধ্যে প্রথা হলো, বীজবপন উপলক্ষ্যে জনৈক যুবককে নির্বাচন করা হবে এবং তাকে একটি সঙ্গিনী দেওয়া হবে—সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যুবকটি ক্ষেতে যাবে। পেরুভিয়ানরা[৮১] ফসল পাকবার আগে পর্যন্ত কঠিন আত্মসংযম করে থাকে; তারপর ফসলের দিন ঘনিয়ে এলে স্ত্রী-পুরুষেরা একত্র সমবেত হয়, সকলেই দেহাভরণ খুলে ফেলে একটি দৌড়-প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়—এই প্রতিযোগিতায় যে-পুরুষ যে-নারীকে ধরতে পারবে তারই সঙ্গে মিলিত হবে। জাভা-দ্বীপে[৮২] কিষাণ-কিষাণীরা ধান ক্ষেতের মধ্যে মিলিত হয়—তাদের ধারণায় এই হলো শস্যকে প্রচুর করবার কৌশল।

রবার্ট ব্রিফল্ট[৮৩] দেখাচ্ছেন, ফসল পাবার কামনায় এইভাবে প্রকাশ্য মৈথুনে প্রবৃত্ত হবার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া নানান অঞ্চলেই চোখে পড়ে; তিনি চিলি, নিউমেক্সিকো, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া প্রভৃতির উল্লেখ করছেন।

হাণ্টার-এর[৮৪] বর্ণনা অনুসারে রাজমহল-পর্বত অঞ্চলের আদিবাসীদের যেটা সবচেয়ে বড়ো পরব তা স্পষ্টই কৃষিকেন্দ্রিক; এ-উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ হলো স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অবাধ মিলন। বস্তুত, পরবের সময়ে ওরা তরুণ-তরুণীর মিলনকে অনিবার্যভাবেই প্রয়োজনীয় মনে করে।

জয়পুর অঞ্চলে পাঞ্চাদের[৮৫] মধ্যে নববর্ষ উপলক্ষ্যে (ফসলের সময় থেকেই বর্ষারম্ভ; এবং নামেই প্রকাশ আমাদেরও আগে অগ্রহায়ণ থেকে বর্ষারম্ভ হতো) একমাস ধরে অবাধ যৌন-মিলনের উৎসব চলে।

এই উৎসবই চোখে পড়ে নিলগিরি পাহাড়ের কোটারদের[৮৬] মধ্যে। বলাই বাহুল্য, এ-জাতীয় উৎসব শুধু উৎসব নয়—গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানও।

বাটলারের[৮৭] বর্ণনা অনুসারে আসামের ট্রাইবদের মধ্যে বসন্তোৎসবের সময়ে মেয়েরা পরিপূর্ণ যৌন-স্বাধীনতা পায় এবং উৎসবকালীন আচরণ নিয়ে পরে তাদের কোনো রকম সমালোচনা শুনতে হয় না, দুর্নাম কুড়োতে হয় না।

হড্‌সনের[৮৮] বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, মণিপুরের নাগা ট্রাইবদের মধ্যে একই উৎসব বা অনুষ্ঠান বর্তমান রয়েছে।

এ্যাণ্ডারসন[৮৯] তাঁর বর্মা-অভিযান-এ উত্তর-বর্মার একটি উৎসবের বর্ণনা দিচ্ছেন; অন্যান্য জায়গায় প্রচলিত অবাধ মিলনোৎসবের সঙ্গে উত্তর-বর্মার এই উৎসবটির সাদৃশ্য অস্পষ্ট নয়।

কেবল এখানেও মনে রাখা দরকার, ইউরোপীয় পরিদর্শকদের চোখে যে-ঘটনা শুধুমাত্র উৎসব বলে মনে হয়েছে তা আধুনিক অর্থে উৎসব নয়। কেননা, আধুনিক অর্থে উৎসব বলতে প্রধানতই আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার মনে হয়। অথচ, ওই প্রাচীন পর্যায়ের মানুষদের কাছে এর গুরুত্ব অসামান্য,—এমন কি এতে যোগ দেওয়ার পিছনে একটা কঠিন কর্তব্যপরায়ণতার চাপও আছে। তাই, একে উৎসব না বলে অনুষ্ঠান বলাই সঙ্গত—হয়তো ধর্মানুষ্ঠানই বলা যেতো, কিন্তু আমরা দেখাতে চাই যে, সমাজ-বিকাশের যে-পর্যায়ে এই জাতীয় অনুষ্ঠানের বিকাশ সে-পর্যায় প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ও প্রাক্-ধর্মানুষ্ঠানিক। তাই একে জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠান বলাই শ্রেয়—ধর্মের আগে জাদুবিশ্বাস এবং ধর্মের সঙ্গে জাদুবিশ্বাসের গুণগত বৈষম্য।

আসল কথা হলো, আমাদের পক্ষে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের ওই উৎসব বা অনুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারা খুব কঠিন। শুধু তাই নয় এর তাৎপর্যকে ভুল বোঝবার সম্ভাবনাই প্রচুর। কেননা, শুধুই যে আমরা আমাদের আধুনিক রুচিবোধ আর নীতিবোধের দিক থেকে এ-জাতীয় অনুষ্ঠানকে কদর্য দুর্নীতিপরায়ণতা বলে মনে করতে পারি তাই নয়, প্রাকৃতিক নিয়ম সংক্রান্ত জ্ঞানের দিক থেকেও আমরা এতো বেশি এগিয়ে গিয়েছি যে, প্রাচীন মানুষদের ওই বিশ্বাসটিকে আমরা স্বভাবতই অবিশ্বাস্য রকমের কাল্পনিক বলে মনে করতে বাধ্য।

আসলে, প্রাচীন মানুষদেরও একটা কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান আছে। এবং যেহেতু অন্ন লাভের উপরই ওদের পুরো দলের জীবনমরণ নির্ভর করছে সেইহেতু ওদের ধারণায়, অন্নকে বহু করবার জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় এই অনুষ্ঠানটিকে, তারা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলেই মনে করে। স্যর জেম্‌স্ ফ্রেসার[৯০] যেমন বলছেন, মধ্য-আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে বীজবপন-উপলক্ষ্যে এই মৈথুন-অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যেরই অন্তর্গত—*in default of which it was not lawful to sow the seeds*, এ-অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে বীজবপনের কাজটাই বেআইনী।

অর্থাৎ, এক-কথায়, প্রাচীন মানুষদের এই যে ভিন্ন-রুচি ও ভিন্ন-নীতি তার পিছনেও অত্যন্ত বাস্তব ও মূর্ত কারণ ছিলো। সেটা হলো, বাঁচবার তাগিদ, কিংবা বাঁচবার পক্ষে সবচেয়ে প্রাথমিক যে প্রয়োজন—অন্ন—তারই তাগিদ।

কেবল, এই মূর্ত তাগিদটিকে মেটাবার জন্যে তারা যে-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে চাইছে সেটা তাদের পার্থিব দারিদ্র্যের অনুরূপ জ্ঞানের দারিদ্র্যেরই পরিণাম : তাদের ধারণায় উৎপাদনের একটা নকল তুলতে পারলেই প্রকৃতির উৎপাদন-বৃত্তিও আয়ত্তে আনা যাবে। সেটা ভুল, সেটা নিশ্চয়ই কল্পনামাত্র। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, প্রাচীন সমাজের পটভূমিতে এবং প্রাচীন মানুষদের চেতনা অনুসারে অনুষ্ঠিত এই মৈথুন নিছক নীতিবোধের অভাব নির্ণায়ক। আসলে, তাদের কাছে এইটে হলো নীতিবোধেরই বিকাশ—কেবল তাদের এই নীতিবোধ তাদের অর্থনৈতিক উন্নতিরই অনুরূপ। অন্যান্য সমাজের মতো প্রাচীন সমাজের নীতিবোধও নিরালম্ব নয়—অর্থনৈতিক জীবনের উপর, ধনউৎপাদন-পদ্ধতির উপর তা নির্ভরশীল।

আমাদের যুক্তি হলো, তন্ত্রের ওই প্রধানতম মকারটি যে এতো বড়ো একটা দেশকে এতোদিন ধরে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছে, তার কারণ এর পিছনে একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস ছিলো। সে-ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায় পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের পরীক্ষা করলে। মানবউন্নতির একটা বিশেষ স্তরে মৈথুন বলতে শুধুমাত্র রতিবাসনার চরিতার্থতা নয়, তার বদলে একরকম অনুষ্ঠান বিশেষ—এবং এ-অনুষ্ঠান সবচেয়ে মৌলিক অর্থনৈতিক চেষ্টারই অঙ্গ। আমাদের দেশের ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে এর স্মারক অমন প্রকটভাবে টিকে রয়েছে তার কারণ অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে আমাদের দেশের সমাজ-বাস্তব থেকে ওই প্রাচীন পর্যায়ের স্মারক মাত্র অসম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে।

অবশ্যই, তন্ত্রে আজ আমরা অনুষ্ঠানটিকে যে-রূপে দেখতে পাই তার মধ্যে ওই প্রাচীন পর্যায়ের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের পরিচয় নেই : তন্ত্রে মৈথুন ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ, উৎপাদন-পদ্ধতির অঙ্গ নয়। বস্তুত, ওই আদি-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হবার ফলে আদিম প্রক্রিয়াটির পক্ষে ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হওয়াটা একটি স্বাভাবিক বা জাগতিক নিয়মেরই ফল। কেননা, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান হলো সেইসব আচার-বিচারেরই আধার, যেগুলি এককালে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করবার জোরেই—জীবনোপায়ের সহায়ক ছিলো বলেই—মানুষের চেতনায় এবং মানবসমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পেরেছিলো। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এখানে বৈদিক যজ্ঞের উল্লেখ করা যায় : আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে যজ্ঞ এককালে দেবতাগণের কাছে অন্ন-লাভের উপায়মাত্র ছিলো এবং তা ছিলো বলেই বৈদিক মানুষদের

জীবনে যজ্ঞের স্থান অমন অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরকালে, ওই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যজ্ঞ পরিণত হলো নিছক ধর্মানুষ্ঠানে।

এবং এইভাবে অতীত পর্যায়ের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কোনো অনুষ্ঠান ধর্মানুষ্ঠানমাত্রে পরিণত হবার ফলে তার আদি-তাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসিত হওয়া শুধু স্বাভাবিক নয়, অনিবার্যও: যা ছিলো জীবনের সহায় তাই হয়ে দাঁড়ায় জীবনের পরিপন্থী। ফলে, তন্ত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতোই ওই প্রধান মকারটিও আজকের দিনে আমাদের কাছে শুধুই অর্থহীন ও বীভৎস কামবিকার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আজকের দিনে অনুষ্ঠানটিকে আমরা যে-ভাবে দেখছি সেই রূপটির মধ্যেই তার আদি ও অকৃত্রিম তাৎপর্যের পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর।

প্রশ্ন উঠবে, পৃথিবীর সবদেশের মানুষের পক্ষেই বন্যদশার নিচু স্তর থেকে সভ্যতার দিকে এগোবার পথটি যদি একই রকম হয় এবং এই মৈথুন-অনুষ্ঠান যদি ওই পথের কোনো এক স্তরের পরিচায়কই হয়, তাহলে শুধুমাত্র আমাদের দেশের ধর্মাচরণের মধ্যেই তার স্মারক কেন? উত্তরে বলবো, যদিও বাধাপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রাচীন জাদুঅনুষ্ঠানের এই দিকটি ধর্মানুষ্ঠানে পর্যবসিত হবার পরও অস্বাভাবিকভাবে পল্লবিত হয়েছে, তবুও তা শুধুমাত্র আমাদের দেশের ধর্মবিকাশের বৈশিষ্ট্য নয়। বস্তুত, প্রাচীন পর্যায়ের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় যেখানেই পাওয়া যায় সেখানেই এই প্রাচীন অনুষ্ঠানটিকেও দেখতে পাওয়া অসম্ভব নয়।

প্রাচীন গ্রীসে ডায়োনিসাস্‌কে কেন্দ্র করে যে ধর্মবিশ্বাস, অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[৩১] সুদীর্ঘভাবে তার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন, কৃষি-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের মধ্যেই তার উৎপত্তি এবং এই ডায়োনিসাস্‌-ধর্মের মধ্যে মদ্য, প্রকাশ্য মৈথুন প্রভৃতি তান্ত্রিক মকারগুলির পরিচয় সত্যিই অস্পষ্ট নয়।

আরো কতো প্রাচীন অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে এই মকারটির পরিচয় পাওয়া যায় তার নমুনা হিসেবে এখানে আমরা রবার্ট ব্রিফল্ট-এর[৩২] রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করতে পারি:

> The sacred festivals of Jurupai among the Uaupes and other tribes of the Amazon region are scenes of unrestricted sexual license in which old and young join without restraint. Among the Choroti every ritual dance is followed by public promiscuity, and similar rites are observed among the Bororo. Among the Patagonians the chief religious festival, or Kamaruko, concludes with a general sexual orgy. Among

> the tribes of the plains of North America and of the lower Mississippi valley the harvest festivals were attended with general license, and the old men and women exhorted the younger ones to indulge without restraint......
>
> ...Among the Dayaks of British North Borneo, at the festival called Bunut by which the fertility of the soil and a plentiful harvest of paddy are secured, general license takes place lasting exactly a quarter of an hour, after which perfect order and beseemingness are restored. During that time a naked man wanders in and out among the men and women, and each woman touches him as he passes. In the Malay Peninsula, during the rice-harvest the men of the Jakun tribes exchange wives.

মালয় পেনিনস্থলার জাকুনদের ওই অনুষ্ঠানটি আমাদের বৈষ্ণব পরকীয়াতত্ত্বের উপর কোনো রকম আলোকপাত করে কি না এবং বাংলাদেশের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক কী—এ-সব প্রশ্নের অবতারণা করতে গেলে আপাতত আমাদের আলোচনা অত্যন্ত বেশি বিক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা। তার বদলে বর্তমানে আমরা প্রকট তান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলিকেই বোঝবার চেষ্টা করবো। তন্ত্রের পুঁথিপত্রে আমরা সাধারণত যে-ভাবে এই মকারটির পরিচয় পাই তার মধ্যে অবশ্য দলগতভাবে যৌন-মিলনের কথাটা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আনন্দগিরি গাণপত্যদের যে-সম্প্রদায়টিকে উৎকট বামাচারী বলে বর্ণনা করছেন তার ক্ষেত্রে দেখা যায়, "সর্ব্বে বর্ণাঃ সমানজাতয়ঃ দাম্পত্যব্যবস্থা নাস্তি। যেন কেনাপি পুরুষেণ স্বস্বহেরম্বতাং বিভাব্য যাং কাঞ্চিৎস্ত্রিয়ং তচ্ছক্তিং বিচিন্ত্য স্মরতেন সম্ভোগঃ কার্যঃ'। ইত্যাদি, ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-এর[৩৯] গ্রন্থে সহজিয়াদের কিশোরী-ভজক সম্প্রদায়ের যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গেও আনন্দগিরির এই উক্তি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

তাহলে তন্ত্রের পঞ্চমকারের মধ্যে মদ্য ও মৈথুন বলে প্রধানতম দুটি মকারকে উর্বরতার কামনামূলক জাদুবিশ্বাসের দিক থেকেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। যদি তাই হয় তাহলে তন্ত্রের অন্যান্য মকারগুলির উপরও ওই আদিম বিশ্বাসই আলোকপাত করতে পারবে। এই যুক্তির উপর নির্ভর করেই আমরা তন্ত্র সাধনায় মৎস্যের তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছি। সুখের বিষয় শ্রীযুক্ত এস্. কে. দিক্ষীত[৪০] ইতিপূর্বেই মৎস্যের তাৎপর্য নিয়ে সুদীর্ঘ গবেষণা করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন, বহু দৃষ্টান্তেই প্রাচীন মাতৃপ্রধান ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মৎস্যের যোগাযোগ রয়েছে এবং এই মৎস্য অবধারিতভাবেই উর্বরতা-বৃদ্ধির প্রতীক।

এখানে আমাদের যুক্তির পক্ষে তাঁর সিদ্ধান্তটুকু^{৩৬} উদ্ধৃত করাই পর্যাপ্ত হবে ;

> In India, too, fish is looked upon with reverence...all varieties are emblems of fertility, and therefore used in marriage rites. The significance of fish in the religious rites pertaining to marriages of the Aos, the Chongis, the Lohars of the U. P., as well as of the Bengalis may, therefore, be now apparent... That is why fish is taboo to a Bengali widow, and is to be held in her hand by a Bengali bride in performing marriage rites....Mina (Fish) forms one of the *panchamakaras* (five *m*-s) of the *vama-margin* Saktas, a section of the Indian devotees of the Mother-Goddess, who have kept up faithfully most of the barbaric traditions conected with her worship in all their pristine purity.
>
> অর্থাৎ, সারমর্ম, ভারতবর্ষেও মাছ উর্বরতা-বৃদ্ধির কামনাতেই প্রযুক্ত হয়। এই কারণেই নানান বিবাহ-অনুষ্ঠানে মৎস্যের ব্যবহার দেখা যায়, বাংলায় বিধবাদের পক্ষে মৎস্য নিষিদ্ধ এবং বামমার্গাবলম্বী শাক্তদের পঞ্চমকারের মধ্যে একটি মকার ওই মাছই।

তাহলে, তন্ত্রের পঞ্চমকারের মধ্যে এই মকারটির উৎসেও উর্বরতার কামনামূলক সেই আদিম জাদুবিশ্বাসেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস-প্রসঙ্গে : অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

লোকায়তিক ধ্যানধারণা প্রসঙ্গে ওই পঞ্চমকারের আলোচনা কেন? কেননা, প্রাচীনেরাই লোকায়তিকদের প্রসঙ্গে এমন কথা বলেছেন যা প্রায় অনিবার্যভাবেই পঞ্চমকারের অন্তত প্রধানতম মকারগুলির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এবং প্রাচীনদের এ-জাতীয় উক্তি আধুনিক বিদ্বানদেরও চোখে পড়েছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক বিদ্বানেরা আধুনিক যুগের ধ্যানধারণা নিয়ে এতো বিভোর যে, ওই পঞ্চমকারের প্রসঙ্গ দেখে তাঁরা লোকায়তিকদের সম্বন্ধে শুধু ঘৃণাই প্রকাশ করেছেন, লোকায়তিক চিন্তাধারার আদি-তাৎপর্য সন্ধানে অগ্রসর হননি।

একটি নমুনা দেখা যাক। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[১৪৬] লিখছেন :

> Gunaratna, however, in his commentary on *Sad-darsana-samuccaya*, speaks of the Carvakas as being a nihilistic sect who only eat but do not regard the existence of virtue and do not trust anything else but what can be directly perceived. *They drank wine and ate meat and were given to unrestricted sex indulgence. Each year they gathered together on a particular day and had unrestricted intercourse with women.* They behaved like *common people* and for this reason they were called *lokayata.*
>
> কিন্তু ষড়-দর্শন-সমুচ্চয়ের টীকায় গুণরত্ন বলছেন, চার্বাকরা হলো এক রকম নাস্তিক সম্প্রদায়ের লোক যারা শুধুই খাওয়া-দাওয়া করতো এবং ধর্মাধর্ম মানতো না এবং যারা প্রত্যক্ষভাবে-জানতে-পারা ছাড়া আর কোনো কিছুর সত্তাই স্বীকার করতো না—তারা মদ্যপান করতো, মাংস ভোজন করতো এবং অবারিত মৈথুনে প্রমত্ত হতো। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে তারা একত্রিত হতো এবং মেয়েদের সঙ্গে নির্বিচারে মিলিত হতো। তারা সাধারণ লোকের মতো ব্যবহার করতো এবং এই কারণেই তাদের বলা হতো লোকায়ত।

প্রাচীন কালের কোনো একটি দার্শনিক সম্প্রদায় প্রসঙ্গে এ-জাতীয় উক্তি নিশ্চয়ই বিস্ময়কর। কিন্তু আধুনিক কালের অতো বড়ো একজন বিদ্বানের পক্ষে এই উক্তিটি সংগ্রহ এবং উদ্ধৃত করবার পরও এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকাও কম বিস্ময়কর নয়। অথচ, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এমনভাবে তথ্যটির উল্লেখ করলেন যেন মনে হয় এ-বিষয়ে আর কিছুই ভাববার নেই। কেননা, তিনি এ-নিয়ে আর কোনো আলোচনাই তুললেন না,—এ-কথা বলবার পরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। অতএব তাঁর এ-উক্তির একমাত্র তাৎপর্য এই হয়ে রইলো যে, লোকায়তিকেরা নেহাতই দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলো, তারা ধর্মাধর্মের প্রভেদ মানতো না এবং আধুনিক যুগের লম্পটদের মতোই মদ্য, মাংস ও মৈথুন নিয়ে প্রমত্ত থাকতো।

কিন্তু গুণরত্নের এই উক্তিকে অতোখানি সহজ-সরল অর্থে গ্রহণ করায় বাধা আছে। প্রথমে গুণরত্ন[১৪৭] ঠিক কী বলছেন তাই দেখা যাক :

॥ অথ লোকায়তমতম্ ॥

> প্রথমম্ নাস্তিক স্বরূপমুচ্যতে। কাপালিকাঃ ভস্মোদ্ধূলনপরাঃ যোগিনঃ ব্রাহ্মণাদ্যন্ত্যজাতাশ্চ কেচন নাস্তিকা ভবন্তি। তে চ জীবপুণ্যপাপাদিকং ন মন্যন্তে। চতুর্ভূতাত্মকং জগদাচক্ষতে। কেচিত্তু চার্বাকৈকদেশীয়া আকাশং পঞ্চমং

ভূতমভিমন্যমানাঃ পঞ্চভূতাত্মকং জগদিতি নিগদন্তি। তন্মতে ভূতেভ্যো মদশক্তিবচ্চৈতন্যমুত্পদ্যতে। জলবুদ্বুদবজ্জীবাঃ। চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ ইতি। তে চ মদ্যমাংসে ভুঞ্জতে মাত্রাদ্যগম্যাগমনমপিকুর্বতে। বর্ষে বর্ষে কস্মিন্নপি দিবসে সর্বে সংভূয় যথানামনির্গমং স্ত্রীভিরভিরমন্তে। ধর্মং কামাদপরং ন মন্যতে। তন্নামানি চার্ব্বাকাঃ লোকায়তাঃ ইত্যাদীনি। গলচর্ব অদনে। চর্ব্বয়ন্তি ভক্ষয়ন্তি তত্ত্বতঃ ন মন্যন্তে পুণ্যাপাপাদিকং পরোক্ষং বস্তুজাতমিতি চার্ব্বাকাঃ।...—লোকাঃ নির্ব্বিচারাঃ সামান্যাঃ লোকাস্তদ্বদাচরন্তি স্মেতি লোকায়তা লোকায়তিকা ইত্যপি। বৃহস্পতিপ্রণীতমতত্বেন বার্হস্পত্যাশ্চ ইতি॥

অর্থাৎ,

অনন্তর লোকায়তম। প্রথমে নাস্তিকদের কথা। কাপালিক :—ভস্ম আচ্ছাদিত যোগীগণ এবং অন্ত্যজ ব্রাহ্মণাদি কেহ কেহ নাস্তিক। তাহারা জীবগণের পুণ্য পাপ প্রভৃতির বিচার করে না। তাহারা জগৎকে চতুর্ভূতাত্মক বলিয়া মনে করে। চার্বাক প্রভৃতি মতাবলম্বীদিগের কেহ কেহ আকাশকে পঞ্চম ভূত রূপে ধরিয়া জগৎকে পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে চৈতন্য মদশক্তির ন্যায় আবির্ভূত হয়। জীবগণ জলবুদ্বুদ্ তুল্য। পুরুষ চৈতন্য-বিশিষ্ট শরীরমাত্র। তাহারা মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিয়া থাকে এবং মাতা প্রভৃতি অগম্য নারী প্রভৃতিতেও গমন করিয়া থাকে। <u>প্রতি বৎসর কোনো একদিনে</u> সকলে একত্র হইয়া যথাভিপ্রেত স্ত্রীগণের সহিত রমন করিয়া থাকে। কাম ব্যতীত ধর্ম নাই। এই জন্যই চার্বাকদিগকে লোকায়ত বলা হইয়া থাকে। পরোক্ষ বস্তুসমূহ হইতে জাত গলাধঃকরণ ও চর্বণ হেতুই চার্বাক বলা হইয়া থাকে।...নির্বিচারে <u>সাধারণ লোকের ন্যায়</u> আচরণ করে বলিয়াই তাহাদিগকে লোকায়ত বা লোকায়তিকও বলা হইয়া থাকে। তাহাদের মত বৃহস্পতি প্রণীত বলিয়াই তাহাদের বার্হস্পত্যও বলে।

গুণরত্নের কয়েকটি কথা বিচার করা যাক।

ওরা 'সাধারণ মানুষের মতো' ব্যবহার করে আর সেই কারণেই ওদের বলা হয় লোকায়ত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা আমাদের আশেপাশে যাদের দেখি,—কিম্বা খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর লেখক গুণরত্ন তাঁর আশেপাশে যাদের দেখতেন,—তারা কি সত্যিই ওইভাবে মদ খায়, মাংস খায়, প্রমত্ত হয় অবাধ মৈথুনে? তারা কি সত্যিই বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে ওইভাবে অবাধ-মিলনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে একত্র মিলিত হয়? নিশ্চয়ই নয়। এর সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ হলো, বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ। যারা লম্পট তারা নিশ্চয়ই দিনক্ষণ বেছে লাম্পট্য করে না। অতএব, গুণরত্নের লেখায় একটি নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়, লোকায়তিকদের এই বাৎসরিক সম্মেলনটার আসলে একটা আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য—*ritual significance*—নিশ্চয়ই ছিলো। তাহলে

গুণরত্নের ওই ‘সাধারণ মানুষ’ বলতে সত্যিই কি কোনো রকম অসাধারণ মানুষের দলকে বুঝতে হবে? তাও নয়। কেননা সমাজ-বিকাশের পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে সাধারণ মানুষ বলতে বোঝায় এই রকম মানুষই। এবং তাদের এ-জাতীয় আচরণ যে লাম্পট্য নয়, এ-কথা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। তাই গুণরত্নের সাধারণ মানুষেরা সত্যিই সাধারণ মানুষ,—কেবল অনুন্নত পর্যায়ের সাধারণ মানুষ, কিংবা এমনতরো কৃষিজীবীদের দল যাদের মধ্যে ওই অনুন্নত পর্যায়ের স্মারক অত্যন্ত জোরালো।

তাই মদ্য, মাংস ও মৈথুনের উপর তারা যে-গুরুত্ব আরোপ করে তাকে নিছক নীতিবোধের অভাব বা দুর্নীতিপরায়ণতা বলে অনুমান করা নিশ্চয়ই সঙ্গত নয়। অন্তত, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা যে একান্তই অসঙ্গত, এ-কথা নিশ্চয়ই অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতো ভারততত্ত্ববিদ্‌কে স্মরণ করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, অন্যান্য নানা শাস্ত্রের মতোই তন্ত্র-শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত সুবিস্তীর্ণ[৯৮]। এবং ষড়্‌-দর্শন-সমুচ্চয়ে বর্ণিত লোকায়তিকদের সঙ্গে তান্ত্রিকদের সাদৃশ্য যে সত্যিই কতোখানি তার আর একটি নজির হিসেবে এখানে মণিভদ্রের টীকার উল্লেখ করা যায়। ষড়্‌-দর্শন-সমুচ্চয়ের[৯৯] একটি শ্লোকে বলা হয়েছে: “পিব খাদ চ চারুলোচনে” —ইত্যাদি। টীকা-প্রসঙ্গে মণিভদ্র বলছেন, “পিবেতি অধরাদিপানং কুরু, খাদেতি ভোগান্ উপভুঙক্ষ্ব ইতি কাম্যুপদেশ”। অতএব, এখানেও কামতত্ত্বের কথা—এবং এই কামতত্ত্ব অত্যন্ত প্রকটভাবে তান্ত্রিক ধ্যানধারণারই পরিচায়ক।

তাছাড়া, গুণরত্ন স্পষ্টভাষায় বলছেন, লোকায়তিকেরা গায়ে ভস্ম মাখে, তারা যোগী, তারা কাপালিক।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত যদি এ-বিষয়ে সচেতন হতেন যে, এ-যুগেও আমাদের দেশে তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার এমন ব্যাপক ও গভীর প্রভাবকে শুধুমাত্র জাতীয় দুর্নীতিপরায়ণতা বলে ব্যাখ্যা করা চলে না এবং তিনি যদি গুণরত্ন-বর্ণিত লোকায়তিক ও তান্ত্রিক ধ্যানধারণার মধ্যে অমন স্পষ্ট যোগাযোগকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা না করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর মতো বিদ্বানের পক্ষে লোকায়তের উৎস-সংক্রান্ত সমস্যার উপর অত্যন্ত মূল্যবান আলোকপাত করা সম্ভবপর হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর মনে এ জাতীয় কোনো সমস্যাই জাগেনি। ব্যাপারটা আরো বেশি দুঃখের এই কারণে যে, তাঁর পূর্বগামী ভারততত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে অন্তত একজনের কাছে এই যোগাযোগটির কথা ধরা পড়েছে এবং এ-দিক থেকে যে অন্তত কিছুকিছু মৌলিক সমস্যা ওঠে তার পরিচয় তিনি দিয়ে গিয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি।

সেই মন্তব্যগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লোকায়তের উৎস-প্রসঙ্গে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করছেন তা স্বভাবতই অত্যন্ত কৃত্রিম হয়ে দাঁড়িয়েছে*** :

> It seems possible, therefore, that probably the *lokayata* doctrines had their beginnings in the preceding Sumerian civilization in the then prevailing customs of adorning the dead and the doctrine of bodily survival after death.
>
> অতএব, মনে হয়, পূর্ববর্তী সুমেরীয় সভ্যতায় মৃতদেহকে বিভূষিত করার যে প্রথা এবং মৃত্যুত্তীর্ণ দৈহিক সত্তায় যে বিশ্বাস—তারই মধ্যে লোকায়ত মতবাদের উৎস।

সিদ্ধান্তটি যে অত্যন্ত চমকপ্রদ এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই : দেশের সমস্ত ঐতিহ্য অগ্রাহ্য করে একেবারে সুমেরীয় সভ্যতার সংকার-ব্যবস্থার মধ্যে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লোকায়তিক ধ্যানধারণার বীজ অনুসন্ধান করছেন! ঠিক কোন ধরনের তথ্যের উপর নির্ভর করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাইছেন?

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে মাত্র একটি নজির পেশ করেছেন,—ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ।

যে-হেতু শুধু এই নজিরটির উপর নির্ভর করে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এতোবড়ো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চেয়েছেন সেইহেতু আমরা ছান্দোগ্য-উপনিষদের ওই উপাখ্যানটি সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করবো :

> প্রজাপতি এক সময়ে বলিয়াছিলেন—'যে আত্মা পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, অশনেচ্ছারহিত, পিপাসারহিত, যিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কামনা লাভ করেন ॥ ৮।৭।১ ॥
>
> দেব ও অসুরগণ উভয়েই লোকপরম্পরায় এই উপদেশের কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'যে আত্মাকে অনুসন্ধান করিলে সর্বলোক ও সর্বকাম্যবস্তু লাভ করা যায়, আমরা সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিব'। (এই উদ্দেশ্যে) দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরগণের মধ্যে বিরোচন (প্রজাপতির) অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহারা পরস্পরকে না জানাইয়া সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮।৭।২ ॥
>
> তাঁহারা দুইজন ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য আচরণ করিয়া বাস করিলেন। তদনন্তর প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী ইচ্ছা করিয়া তোমরা বাস করিলে?' তাঁহারা বলিলেন, 'ভগবানের বাক্য বলিয়াই বিদিত যে—যে-আত্মা

পাপরহিত, জরারহিত, শোকরহিত, অশনেচ্ছারহিত, যিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প—তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে হইবে। যিনি এই আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া জানেন, তিনি সর্বলোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ করেন। সেই আত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা করিয়া আমরা দুইজনে বাস করিয়াছি'॥ ৮।৭।৩॥

প্রজাপতি সেই দুইজনকে বলিলেন—'চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হয় ইনিই আত্মা'। তিনি আরও বলিলেন—'ইনিই অমৃত অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম'। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভগবন্! এই যে পুরুষ জলে দৃষ্ট হয়, আর এই যে পুরুষ দর্পণে দৃষ্ট হয়, ইহা কে?' প্রজাপতি বলিলেন—'এই সমুদয়েই আত্মা পরিদৃষ্ট হন'॥ ৮।৭।৪॥

প্রজাপতি বলিলেন—'জলপূর্ণ পাত্রে আপনাকে (দেখ), দেখিয়া আত্মার বিষয় যাহা বুঝিবে না, তাহা আমাকে বলিও।' তাঁহারা জলপূর্ণ পাত্রে আপনাদিগকে দেখিলেন। (অনন্তর) প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কী দেখিলে?' তাঁহারা বলিলেন—'হে ভগবন্! আমরা সমগ্র আত্মা—লোম ও নখ পর্যন্ত ইহার প্রতিরূপ দর্শন করিলাম'॥ ৮।৮।১॥

প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—'সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, সুবসন পরিধান করিয়া, পরিষ্কৃত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রে দর্শন কর'। তাঁহারা সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সুবসন পরিধান করিয়া এবং পরিষ্কৃত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রে দর্শন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কী দেখিলে?'॥ ৮।৮।২॥

তাঁহারা বলিলেন—'হে ভগবন্! এই আমরা যেমন সুন্দর অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত এবং পরিষ্কৃত, হে ভগবন্! তেমনি জলের মধ্যে এই দুইজন সুন্দর অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত এবং পরিষ্কৃত'। প্রজাপতি বলিলেন—'ইনিই আত্মা; ইনিই অমৃত ও অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম'। অনন্তর দুইজন শান্ত হৃদয় হইয়া প্রতিগমন করিলেন॥ ৮।৮।৩॥

তাঁহাদিগকে (চলিয়া যাইতে) দেখিয়া প্রজাপতি মনে মনে বলিলেন—'(ইহারা) আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়াই, আত্মাকে অবগত না হইয়াই চলিয়া গেল। ইহাদিগের মধ্যে যে ইহাকেই উপনিষৎ (অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান) বলিয়া গ্রহণ করিবে—দেবতাই হউক বা অসুরই হউক—সে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে'।

বিরোচন শান্ত হৃদয়ে অসুরগণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে এই উপনিষৎ শিক্ষা দিলেন—'এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করিবে এবং দেহেরই পরিচর্যা করিবে। দেহকে মহীয়ান করিলে এবং দেহের পরিচর্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক—এই উভয় লোকই লাভ করা যায়'॥ ৮।৮।৪॥

এইজন্য অদ্যাপি দানরহিত, শ্রদ্ধাবিহীন ও যজ্ঞরহিত ব্যক্তিকে অসুর বলা হয়। ইহাই অসুরগণের উপনিষৎ। তাহারা গন্ধমাল্যাদি এবং বসন ও অলঙ্কার দ্বারা মৃতব্যক্তির দেহকে সজ্জিত করে এবং মনে করে ইহার দ্বারা পরলোক জয় করিব॥ ৮।৮।৫॥

উপনিষদের উপাখ্যানটি অবশ্য এইখানেই শেষ নয়। এর পর বলা হয়েছে,

যদিও অসুরদের প্রতিনিধি বিরোচন ওইভাবে দেহকেই আত্মা বলে জেনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তবুও দেবতাদের প্রতিনিধি ইন্দ্র এর পর প্রজাপতির কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং দেহাত্মবোধের ভ্রম উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ক্রমশ সচ্চিদানন্দ আত্মাকে উপলব্ধি করবার দিকে অগ্রসর হন। উপাখ্যানটির এই শেষাংশের উপর অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল নয়। আমরা যতোটুকু উদ্ধৃত করেছি তারই উপর নির্ভর করে তিনি লোকায়তের উৎস-প্রসঙ্গে ওই অত্যাশ্চর্য সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন: লোকায়ত ধ্যানধারণা খাঁটি স্বদেশী মত নয়—খুব সম্ভব সুমেরীয় সভ্যতা থেকেই তার আমদানি হয়েছিলো।

অথচ, কতো বড়ো একজন বিদ্বান কতো তুচ্ছ যুক্তি ও তথ্যের উপর নির্ভর করে কতোখানি কাল্পনিক এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন—অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের উদ্ধৃত যুক্তিটি বোধ হয় তারই এক চূড়ান্ত নিদর্শন।

উপনিষদের উপাখ্যানটির ঠিক কী ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাইছেন?

প্রথমত, লোকায়ত হলো দেহতত্ত্ব, দেহাত্মবাদ। ছান্দোগ্যে বলা হয়েছে, এই দেহাত্মবাদ অসুরদের উপনিষৎ—বা প্রকৃত জ্ঞান। এই দেহাত্মবাদের দরুনই অসুরেরা মৃতদেহকে মাল্যগন্ধাদি ও বসন-অলঙ্কারে সুসজ্জিত করে। অসুর মানে হলো প্রাচীন সুমের-সভ্যতার মানুষ। এবং তাদের মধ্যেও এই জাতীয় সৎকার প্রণালীই প্রবর্তিত ছিলো। অতএব দেহাত্মবাদী ওই লোকায়তিক মতবাদ খুব সম্ভব প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা থেকেই আমদানি হয়েছিলো। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[১১] অবশ্যই বলছেন:

> The later Lokayatas or the Carvakas also believed that this body was the self, but the difference between them and the *dehatmavadins* referred to in the Chandogya is that they admitted "another world" where the bodies rose from the dead and prospered in the fine clothes, ornaments and food that were given to the dead body......This later on became so far changed that it was argued that since the self and the body were identical and since the body was burnt after death, there could not be any survival after death and hence there could not be another world after death.

পরের যুগের লোকায়ত বা চার্বাকরাও এই দেহকেই আত্মা মনে করেছে; কিন্তু ছান্দোগ্য-উপনিষদের দেহাত্মবাদীদের সঙ্গে চার্বাকদের একটা তফাত আছে; ছান্দোগ্যের দেহাত্মবাদীরা পরকাল মানে—সেই পরকালে মৃতদেহগুলির

পুনরুজ্জীবন হবে এবং তখন তারা ওই বস্ত্র, অলঙ্কার খাদ্য প্রভৃতি উপভোগ করবে। (ছান্দোগ্যের এই দেহাত্মবাদটা খুব সম্ভব প্রাচীন সুমেরীয়-সভ্যতা থেকে আমদানি হয়েছিলো)। কিন্তু উত্তর যুগে এই মতবাদটি এতোই পরিবর্তিত হলো যে, তর্ক করে বলা হলো, যেহেতু দেহই আত্মা এবং যেহেতু মৃত্যুর পর দেহ ভস্মীভূত হয় সেইহেতু মৃত্যুর পর আর কিছুই বাকি থাকে না এবং অতএব পরলোক বলেও কিছু নেই।

ছান্দোগ্যের ওই উপাখ্যানকে উপলক্ষ্য করে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লোকায়ত-দর্শনের সুমেরীয় উৎস প্রসঙ্গে যে অত্যাশ্চর্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেটিকে গ্রহণ করতে হলে অনেকগুলি কথা মেনে নেওয়া দরকার।

এক: বৈদিক সাহিত্যে অসুর বলতে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার মানুষদেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই: একমাত্র প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতাতেই মৃতদেহকে রতন-ভূষণ-খাদ্যের সম্ভার সহ কবর দেবার প্রথা ছিলো।

তিন: সুমেরীয় সভ্যতার এই সংকার প্রণালীর অন্তর্নিহিত দেহাত্মবাদই ক্রমশ লোকোত্তরে বিশ্বাস খুইয়ে ভারতীয় লোকায়ত দর্শনে পরিণত হয়।

দুঃখের বিষয়, এই তিনটি উক্তির একটিও ঐতিহাসিকভাবে সমর্থনযোগ্য হবে না।

প্রথমত, বৈদিক সাহিত্যে অসুর বলতে ঠিক কাদের বোঝানো হয়েছে তা আজো অনেকাংশে তর্কাধীন। এ-বিষয়ে প্রধানত দুটি মত পাই; কিন্তু সে-দুটির একটিও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সিদ্ধান্ত সমর্থন করবে না।

একটি মত[৩২] হলো, অসুর শব্দে প্রাচীন আর্যভাষাভাষীদের ইরাণীয় শাখাটিকে বোঝানো হয়েছে। এই মতের সমর্থকদের যুক্তি হলো, বৈদিক সাহিত্যে অসুর শব্দটি বরাবরই হীনার্থবাচক নয়: "পরো দেবেভিরসুরৈ যদস্তি" (ঋ. ১০. ৮২. ৫), "ইন্দ্রায় হি দ্যৌরসুরো অনম্যত" (ঋ. ১. ১৩১. ১), "অপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ" (ঋ. ৫. ৮৩. ৬), "মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্ত্তার উর্বিয়া পরি খ্যন্" (ঋ. ১০. ১০. ২), ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই পরমাত্মা অসুরই আবেস্তায় অহুর বা অহুরমজদ রূপ ধারণ করিয়াছে।... অসুর শব্দের হীনার্থবাচিতার সহিত আবেস্তার 'দএব' অর্থাৎ দেব শব্দের হীনার্থবাচিতা তুলনীয়। আবেস্তায় 'দএব' শব্দের অর্থ দৈত্য, আমাদের অসুর।... সম্ভবত ইরাণীয় ও ভারতীয় আর্যদিগের মধ্যে তীব্র ধর্মবিরোধের ফলেই সংস্কৃত ভাষার অসুর এবং ইরাণীয় ভাষার (আবেস্তার) 'দএব' (দেব) শব্দের অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে[৩৩]।

এই মতের সমর্থনে আরো বলা যায় যে, শতপথব্রাহ্মণ[৬০৪] অনুসারে অসুররাও প্রজাপতির পুত্র : দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীকে দখল করা নিয়ে তাদের ঘোর যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তারা শেষ পর্যন্ত দেবতাদের কাছে পরাজিত হয়। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও[৬০৫] বলা হয়েছে : দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতির উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ, ইত্যাদি। অর্থাৎ, দেব ও অসুর উভয়েই প্রজাপতির দুই সন্তান ; উভয়ে পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল। ইত্যাদি।

দ্বিতীয় মত হলো, আজো ছোটোনাগপুর অঞ্চলে অসুর নামের যে ট্রাইব টিকে আছে তারাই সম্ভবত বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখিত অসুরদের বংশধর। এই মত অনুসারে, প্রাচীন যুগে ওই অসুর-ট্রাইবের মানুষেরা বৈদিক মানুষদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ছোটনাগপুর অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে ; তারপর তারা আবার কোলারিয়ান ও দ্রাভিডিয়ান ট্রাইবের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার যোগাড় হয়েছে :

> Whether the Asura living in Chota-Nagpur are the offspring of these opponents of the Aryans or are connected with the Asura builders of those ancient embankments still found in the Mirzapur district, is, ofcourse, an open question ; yet there seems to be nothing to exculde such suppositions[৬০৬].

বলাই বাহুল্য, এই দুটি মতবাদের কোন্‌টি স্বীকারযোগ্য, সে-আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই। আমাদের যুক্তির পক্ষে যেটুকু কথা এখানে প্রাসঙ্গিক তা হলো, অসুরদের সনাক্তিকরণ সংক্রান্ত যে-প্রকল্পের ভিত্তিতে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লোকায়ত-দর্শনের সুমেরীয় উৎস অনুসন্ধান করছেন তার সঙ্গে এই দুটি মতবাদের একটিরও সঙ্গতি নেই এবং তিনি এই দুটি মতবাদের একটিকেও খণ্ডন করে আত্মপক্ষ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি।

দ্বিতীয়ত, সুমেরীয় সভ্যতার সংকার-পদ্ধতির কথা। যদি এমন হতো যে, প্রাচীন পৃথিবীতে একমাত্র সুমেরীয়াতেই ওই জাতীয় সংকার পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাহলে ছান্দোগ্য-বর্ণিত সংকার-পদ্ধতির দিক থেকে ভারতীয় সাহিত্যের ওই দেহাত্মবাদীদের সুমেরবাসী বলে সনাক্ত করবার কিছুটা অবকাশ থাকতো। কিন্তু এখানেও ঐতিহাসিক তথ্য অত্যন্ত নির্মমভাবে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের বিরুদ্ধে যায়। কেননা, এমন কি প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতাতেও শুধুমাত্র এইভাবে মৃতের সংকার হতো না—মৃতদেহকে কবর দেওয়া ছাড়াও দগ্ধ করবার প্রথা অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিলো[৬০৭]। তাছাড়া, বসন-ভূষণ-খাদ্য ইত্যাদির সম্ভার সহযোগে কবর দেবার প্রথাটা প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা ছাড়া—বস্তুত সুমেরীয় সভ্যতার বাইরেই—

অনেক ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো[১০৮]। এ-বিষয়ে প্রাচীন মিশর প্রভৃতির সুবিখ্যাত নজির উল্লেখ না করেও ভারতবর্ষীয় তথ্যেরই উল্লেখ করা যায়: মোহেনজোদারো-হরপ্পায়[১০৯] তার নজির পাওয়া গিয়েছে, কোনো কোনো বিদ্বান অনুমান করেছেন বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতর অংশে[১১০] এই জাতীয় সংকার পদ্ধতিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং আধুনিক যুগেও ভারতবর্ষের নানান ট্রাইবের[১১১] মধ্যে এই জাতীয় সংকার প্রণালীর দৃষ্টান্ত সত্যিই দুর্লভ নয়।

সংকার-প্রণালী নিয়ে আলোচনা অবশ্যই স্বতন্ত্র। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো রকম সন্দেহেরই অবকাশ নেই যে, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত যখন শুধুমাত্র এই সংকার-প্রণালীর নজির দেখিয়েই লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস হিসেবে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার উল্লেখ করতে চাইছেন তখন তাঁর মন্তব্য তুচ্ছ ও ভঙ্গুর প্রমাণাশ্রয়ী হয়েছে।

তাছাড়া, শুধুমাত্র সংকার-পদ্ধতি থেকেও দেহাত্মবাদে বিশ্বাস অনুমান করা যে সত্যিই সঙ্গত নয় তা অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত নিজেই অনুভব করেছেন। কেননা তিনি বলছেন, ছান্দোগ্য-বর্ণিত দেহাত্মবাদীদের সঙ্গে উত্তর যুগের লোকায়তিকদের মস্ত তফাত হলো, ওই দেহাত্মবাদীরা পরলোক মানতেন, কিন্তু লোকায়তিকরা তা মানতেন না। অবশ্যই এই প্রভেদকে তিনি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পরিণাম হিসেবে ব্যাখ্যা করবার একটা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে-বিষয়ে কোনো রকম তথ্য দেখাবার চেষ্টা করেননি। তার কারণ কি এই যে, উক্ত পরিণামের কথাটা অধ্যাপকের কল্পনামাত্র বলেই তাঁর মতো স্বনামধন্য বিদ্বানের পক্ষেও এ-বিষয়ে কোনো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি?

আসল কথা হলো, লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস সন্ধানে ছান্দোগ্যের ওই কাহিনীটিই আমাদের কাছে একমাত্র সম্বল নয়। এ ছাড়াও আমাদের কাছে বহু তথ্য রয়েছে। তথ্যগুলি খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত; এবং অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী বলে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তই বোধহয় সবচেয়ে দক্ষভাবে এগুলিকে সংকলিত করেছেন। কিন্তু এই খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলি থেকে লোকায়তর একটা সামগ্রিক রূপ পুনর্গঠন করবার চেষ্টার বদলে তিনি প্রধানতই ছান্দোগ্য-উপনিষদের ওই উপাখ্যানটির উপর নির্ভর করে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করলেন তা স্বভাবতই কাল্পনিক হয়ে রইলো।

আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো, দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা খোঁজবার আশায় শুধুমাত্র কোনো সংকার-পদ্ধতির বিশ্লেষণের মধ্যে আবদ্ধ থাকবার প্রয়োজন নেই। কেননা, তন্ত্র সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে দেহতত্ত্বের সুবিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়। আমরা আরো দেখাবার চেষ্টা করবো যে, কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-অনুষ্ঠানের মধ্যেই এই দেহতত্ত্বমূলক বিশ্বাসের

উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তার আগে লোকায়তর উৎস প্রসঙ্গে আর একটি প্রচলিত মতবাদের আলোচনা প্রয়োজন।

লোকায়তর উৎস-প্রসঙ্গে : ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয়[৬১২] ভারতীয় বস্তুবাদের ইতিহাসকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, এই চারটি পর্যায়ের নাম হলো, বার্হস্পত্য, লোকায়ত, চার্বাক ও নাস্তিক। এই পর্যায়-বিভাগ যে কতোখানি তথ্য-সম্মত, এখানে সে-আলোচনা আমরা তুলতে চাই না ; পাদটীকায়[৬১৩] আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো শাস্ত্রী মহাশয়ের পর্যায়-বিভাগটি বহুলাংশেই কাল্পনিক। তবুও—এবং আমাদের যুক্তির বর্তমান পর্যায়ে এই কথাটিই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক,—সুখের বিষয় ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ভারতীয় বস্তুবাদের ইতিহাস আলোচনায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত 'লোকায়ত' নামের ক্ষুদ্র কিন্তু দুর্মূল্য পুস্তিকাটিকে উপেক্ষা করেননি। বস্তুত, মহামহোপাধ্যায় লোকায়তিকদের সম্বন্ধে যে অভিনব তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং যেগুলির ভিত্তিতে তিনি লোকায়তিকদের সঙ্গে সহজিয়া, কাপালিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অভেদ প্রদর্শন করলেন সেগুলিকে ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয় উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। মহামহোপাধ্যায় বলেছিলেন, সহজিয়া প্রভৃতি এই সম্প্রদায়গুলি অধঃপাতে-যাওয়া বৌদ্ধধর্মের পরিণাম মাত্র। এ-মতবাদ কতোখানি স্বীকারযোগ্য তার আলোচনায় আমরা একটু পরে প্রত্যাবর্তন করবো। আপাতত আমাদের দ্রষ্টব্য হলো, ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয় কীভাবে মহামহোপাধ্যায়ের এই মতবাদটির উপরই আশ্রয় গ্রহণ করে ভারতীয় বস্তুবাদের ওই তথাকথিত 'চতুর্থ' পর্যায়টির ব্যাখ্যা করতে চাইছেন[৬১৪] :

> Some of the sects of degenerated Buddhists, in which laxity in sexual morals was one of the features, became gradually affiliated to the Lokayata school. One of these sects was the Kapalika sect. The Kapalikas are a very ancient sect. They drink wine, offer human sacrifices and enjoy women. They strive to attain their religious goal with the help of human corpses, wine and women. They are dreaded by all for inhuman cruelties...As *Kama* or the enjoyment of sensual

pleasure was the goal of this sect, it came gradually to be affiliated to the Nastika form of the Lokayata school according to which the *summum bonum* of the human life is...the enjoyment of gross sensual pleasure...Or, it may be, that the followers of the orthodox schools, through bitter contempt, identified the Lokayatikas with the fierce Kapalikas, as in the previous cases the Vedicists used freely the terms of abuse like 'bastard', 'incest' and 'monster' with regard to the Lokayatikas. At the time of Brihaspati, the author of Arthasastra, these Kapalikas were a distinct sect. In Gunaratna's time we find them identified with the Lokayata school which had already become a hated name in the country.

অর্থাৎ কিনা, অধঃপাতে-যাওয়া কয়েকটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ছিলো যৌন-শৈথিল্য; এগুলি ক্রমশ লোকায়ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এগুলির মধ্যে একটি হলো কাপালিক সম্প্রদায়। তারা মদ্যপান করে, নরবলি দেয় এবং নারী উপভোগ করে। তারা শব, মদ্য ও নারীর সাহায্যে ধর্মের আদর্শ লাভ করবার চেষ্টা করে। অমানুষিক নিষ্ঠুরতার জন্য তারা সকলের মধ্যেই আতঙ্ক সঞ্চার করে। যেহেতু এই সম্প্রদায়ের কাছে কামই হলো আদর্শ সেই-হেতু লোকায়ত সম্প্রদায়ের নাস্তিক রূপটির সঙ্গে স্বভাবতই এদের (কাপালিকদের) যোগাযোগ স্থাপিত হয়: নাস্তিক লোকায়তিকেরাও কামকেই পুরুষার্থ মনে করে। কিংবা, এমনও হতে পারে যে, আস্তিক সম্প্রদায়ের অনুগামীরা ঘৃণাভরেই লোকায়তিক ও নিষ্ঠুর কাপালিকদের অভিন্ন বলে উল্লেখ করছেন—যেমন কিনা, অন্যান্য দৃষ্টান্তে দেখা যায়, বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকেরা লোকায়তিকদের জারজ, পাষণ্ড ইত্যাদি নানা প্রকার গালিগালাজ করেছেন। অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা বৃহস্পতির যুগে কাপালিক একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ছিলো; গুণরত্নের সময়ে দেখা যায় লোকায়ত ও কাপালিকদের মধ্যে অভেদ স্বীকৃত হচ্ছে—লোকায়ত শব্দটি তখন ঘৃণাসূচক নামে পরিণত হয়েছে।

উদ্ধৃত অংশের তাৎপর্যটুকু বিশ্লেষণ করা যাক।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে অনুসরণ করে লেখক ধরেই নিচ্ছেন যে, কাপালিক (তথা তান্ত্রিকাদি) সম্প্রদায়গুলি অধঃপাতে-যাওয়া বৌদ্ধধর্মের নমুনামাত্র। অতএব, তাঁর কাছে প্রশ্ন হলো, এ-হেন অধঃপতিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে লোকায়তিকদের যোগাযোগ কী করে সম্ভব হলো? এ-সম্ভাবনার ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি আমাদের সামনে দুটি প্রস্তাব রাখছেন। এক, কাপালিকাদি সম্প্রদায় কামাচারী, লোকায়তিকরাও অর্থ ও কামকে পরম পুরুষার্থ মনে করেছে; অতএব কালক্রমে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্বাভাবিক

ঘটনামাত্র। দুই, কিংবা এমনও হতে পারে যে, বেদপন্থীদের কাছে কাপালিক শব্দটি আরো পাঁচরকম ঝাঁঝালো গালিগালাজের সামিল হয়েছিলো এবং অতএব লোকায়তিকদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের জন্যই তাঁরা এদেরও কাপালিক বলে গালাগাল দিতেন।

ডক্টর শাস্ত্রীর এই দুটি প্রস্তাবের মধ্যে কোনোটি কি গ্রহণযোগ্য?

প্রথমটি নয়। এখানে ডক্টর শাস্ত্রীর প্রধান যুক্তি হলো, লোকায়ত-মতে অর্থ ও কাম পরমপুরুষার্থ; কাপালিকাদি সম্প্রদায়গুলিও কামাচারী—অতএব এই কামপরায়ণতাই উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছিলো। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই কামাচারের পরিচয় শুধুমাত্র কাপালিকাদি আস্তিক-নিন্দিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বৈদিক সাহিত্যেও তার প্রভূত স্মারক টিকে থেকেছে। তার থেকে শুধু এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, সভ্যতার দিকে অগ্রসর হবার পথে কোনো এক পর্যায়ে এই কামাচার মানব-চেতনার অনিবার্য অঙ্গ ছিলো। প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, ডক্টর শাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুসারে এই লোকায়ত-কাপালিক সমন্বয় শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পরিচায়ক নয়, ভারতীয় বস্তুবাদের অধঃপতনের পরিচায়কও। কেননা ডক্টর শাস্ত্রী রচিত ভারতীয় বস্তুবাদের ইতিহাসের তথাকথিত প্রথম তিনটি পর্যায়ে এই কামপরায়ণ ব্যভিচারের পরিচয় নেই।

ডক্টর শাস্ত্রীর দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এই প্রস্তাব অনুসারে লোকায়ত ও কাপালিকাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য অন্বেষণ করা বৃথা; সাদৃশ্য শুধু এইটুকুই যে, উত্তরকালে বেদপন্থীদের কাছে লোকায়তিক ও কাপালিক উভয় নামই জারজ, পাষণ্ড ইত্যাদি ঘৃণাসূচক শব্দমাত্রে পরিণত হয়েছিলো। অথচ, এই সম্ভাবনাটির প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হলে ডক্টর শাস্ত্রীর পক্ষে স্ববিরোধী উক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে। কেননা, লোকায়তিক ও কাপালিকাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মৌলিক ও তত্ত্বগত সাদৃশ্য আছে সে-কথা ডক্টর শাস্ত্রী স্বীকার করছেন এবং প্রায় হুবহু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষাতেই স্বীকার করছেন[১১] :

> They (*Sahajias*) believe that *deha* or the material human body is all that should be cared for and their religious practices are connected with the union of men and women.

তাহলে ওই সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে লোকায়তিকদের সাদৃশ্য শুধু এইটুকুই নয় যে, বেদপন্থীরা উভয় সম্প্রদায়কেই ঘৃণার চোখে দেখেছেন। ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীকেও স্বীকার করতে হচ্ছে যে, মৌলিক তত্ত্বের দিক থেকেও লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিক, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য রয়েছে।

আমাদের যুক্তি অনুসারে কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-অনুষ্ঠানের মধ্যেই এ-জাতীয় ধ্যানধারণার উৎস। কিন্তু কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায় পার হয়ে উত্তর পর্যায়ে পৌঁছবার পরও ওই প্রাথমিক পর্যায়ের ধ্যানধারণার স্মারক উত্তরকালের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে টিকে থাকতে পারে। এবং এই কারণেই আমাদের দেশের শুধু তান্ত্রিক সাহিত্যেই নয়, মন্দির-ভাস্কর্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বামাচার বা কামাচারের অজস্র স্মারক চোখে পড়ে। কিন্তু ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-অনুষ্ঠানের দিক থেকে এ-জাতীয় ধ্যানধারণার আদি-তাৎপর্য অনুসন্ধান করেননি। ফলে, উত্তরযুগে বামাচারী চেতনার ব্যাপক প্রভাব ব্যাখ্যা করবার আশায় তিনি আরো একটি কৃত্রিম প্রকল্প উপস্থাপিত করছেন: লোকায়তর প্রভাবে ভারতীয় ইতিহাসের একটা যুগে ভোগবাহুল্যের প্রবাহে দেশ প্রায় ভেসে গিয়েছিলো[৩১২] :

> The Lokayatikas were a creed of joy, all sunny. Through their influence, at that period of Indian history, the temple and the court, poetry and art, delighted in sensuousness. Eroticism prevailed all over the country. The Brahmin and the Chandala, the king and the beggar, took part with equal enthusiasm in *Madanotsava*, in which *Madana* or *Kama* was worshipped......
>
> As a reaction against this practice of sexual romance, Vaisnavism made its appearance and the *Madanotsava* festival was replaced by *Dolotsava*.
>
> অর্থাৎ (সারমর্ম), লোকায়তিকেরা ছিলো আনন্দবাহুল্যের প্রচারক। তাদের প্রভাবে, ভারতীয় ইতিহাসের সেই যুগটিতে মন্দির, রাজদরবার, শিল্প, সাহিত্য সর্বত্রই ভোগবাহুল্য দেখা দিলো। সারা দেশ ভেসে গেলো কামাচারে। ব্রাহ্মণ আর চণ্ডাল, রাজা আর ভিখিরি, সকলেই সমান উৎসাহে মদনোৎসবে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করলো। এই মদনোৎসবে, মদন বা কাম-এর পুজো হতো।...
>
> এই যৌন আচরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই আবির্ভাব হলো বৈষ্ণবধর্মের এবং মদনোৎসবের স্থানে এলো দোলোৎসব।

ভারতীয় ইতিহাসের এটা যে ঠিক কোন যুগের কথা হচ্ছে সে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ডক্টর শাস্ত্রী অপ্রয়োজন বা হয়তো অস্বস্তিকর মনে করেছেন; তার কারণ লোকায়তর প্রভাবে রাজা থেকে ভিখিরি পর্যন্ত মেতে ওঠবার ওরকম একটা যুগের কথা আসলে কাল্পনিক, ঐতিহাসিক নয়। আপাতত না হয় সে-প্রশ্ন ছেড়েই দেওয়া গেলো। বর্তমানে শুধু মদনোৎসবের কথাই তোলা যাক: গুণরত্নের রচনাতেও লোকায়তিকদের সঙ্গে এই জাতীয় এক উৎসবের

যোগাযোগ সূচিত হয়েছে : বর্ষে বর্ষে কস্মিন্নপি দিবসে, ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মদনোৎসবটি ঠিক কী? ডক্টর শাস্ত্রীর রচনা থেকে এমন কি এ-ধারণাও জন্মাতে পারে যে, আমাদের দেশে লোকায়তিকদের প্রভাবেই এই উৎসব প্রবর্তিত হয়েছিলো, যে-রকম তিনি কল্পনা করছেন যে, একটা যুগে রাজসভা থেকে পর্ণকুটীর পর্যন্ত লোকায়তিকদের প্রভাবে ভেসে গিয়েছিলো!! কিন্তু এ-ধারণা যে কতোখানি কৃত্রিম তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবারও প্রয়োজন নেই।

আসল কথা হলো, মদনোৎসবের সঙ্গে লোকায়তিকদের সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েও ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এই উৎসবটির তাৎপর্য-বিশ্লেষণে বিশেষ কোনো উৎসাহের পরিচয় দেননি। তার বদলে তিনি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের[৩১৭] রচনা থেকে মদনোৎসবের একটি কবিত্বময় ও মনোরম,—কিন্তু একান্তভাবেই আধুনিক কল্পনার পরিণাম-বিশেষ,—বর্ণনার উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন : "ফুল আর ফাগ, গান আর নাচ, দোলা আর খেলা—এই সব মিলে একটা হাল্কা আমোদের আবহাওয়া সৃষ্টি করে ; সে-আবহাওয়ায় যৌন-নীতি সম্পর্কিত কঠোর নিয়মগুলি শিথিল হয় এবং পুরুষ ও নারী অবাধে মেলামেশা করে।" মদনোৎসবের সংস্কৃত সংস্করণ দোলোৎসবকে হয়তো এই রকম কবিত্ব করে বর্ণনা করা যেতে পারে ; কিন্তু মদনোৎসবকে নয়। মদনোৎসবের আদি-তাৎপর্য অন্বেষণের চেষ্টাটা অন্য রকম হওয়া উচিত।

সে-চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় ডক্টর উইলিয়াম্ ক্রুক্-এর[৩১৮] রচনায়। লোকায়তিকদের সঙ্গে যদি এ-জাতীয় উৎসবের কোনো সম্পর্ক সত্যিই স্বীকার করতে হয় তাহলে ডক্টর ক্রুক্-এর গবেষণা অনুসরণ করলে লোকায়তর উৎসের উপরও আলোকপাত হতে পারে।

উইলিয়াম ক্রুক্ প্রশ্ন তুলছেন, ভারতবর্ষের পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষ-দের মধ্যে ওই মদনোৎসব বা হোলির অঙ্গ হিসেবে যে-সব জটিল অনুষ্ঠানাদির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলির বর্ণনা সংগ্রহ করে এ-উৎসবের কোনো সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব কি না? তিনি এই উদ্দেশ্যে যে-তথ্য সংগ্রহ করলেন সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখলে দেখা যায়, এ-উৎসব অত্যন্ত জটিল এবং এর মধ্যে নানা রকমের অনুষ্ঠান রয়েছে : গাছ পোড়ানো, আগুন জ্বালানো, আগুনের উপর হাঁটা, গাছ পোঁতা, জল ঢালা ইত্যাদি এবং অবশ্যই ওই কামাচারও। অনুষ্ঠানের এই বিভিন্ন দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করে এবং দেশ-বিদেশের সমতুল্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করে, ডক্টর উইলিয়াম ক্রুক্ দেখাচ্ছেন, আগাগোড়াই এ-উৎসবের উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক উর্বরতা বাড়ানো। উপসংহারে তিনি [illegible]ছেন[৩১৯],

মোটের উপর এ-কথা মনে করা যায় যে, অনুষ্ঠানগুলির মূলে আছে মানুষ, পশু ও শস্যের উর্বরতা বাড়াবার কামনা। উদ্দেশ্যটা জাদুবিশ্বাস-মূলক; কিন্তু সে-জাদু-বিশ্বাসের নানামুখী বিকাশের জট খোলা কঠিন: জাদু-অনুষ্ঠানগুলি কখনো সরাসরি উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, কখনো বা উর্বরতা-বিরোধী কারণগুলির নিরসন-প্রচেষ্টায় নিযুক্ত। কোথাও আবার অনুষ্ঠানের পিছনে আরো বিশিষ্ট উদ্দেশ্য অনুমান করা যায়: যেমন বৃষ্টি-আনা, ঋতুকে আয়ত্ত করা, কোনো নির্দিষ্ট ফসল ফলানো।

আমাদের পক্ষে এখানে ওই মদনোৎসবের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করবার অবকাশ নেই; এ-উৎসব কোন্ প্রভাবের ফলে আধুনিক দোলোৎসবে পর্যবসিত হয়েছে তার আলোচনাও স্বতন্ত্র। আমাদের যুক্তির পক্ষে এখানে দুটি কথা বিশেষ-ভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, গুণরত্নের উক্তি থেকে অনুমান করা যায়, এ-জাতীয় কোনো উৎসবের সঙ্গে লোকায়তিকদের সম্পর্ক সত্যিই ছিলো। তাই ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী লোকায়তিকদের সঙ্গে মদনোৎসবের যে-সম্পর্ক অনুমান করেছেন তা অসঙ্গত নয়। কিন্তু তিনি এই সম্পর্কের যে-ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন তাও স্বীকারযোগ্য নয়। কেননা, এই মদনোৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য অনুসন্ধান করবার বদলে তিনি একে আধুনিক অর্থে নিছক আমোদ-প্রমোদ ও উচ্ছৃঙ্খলতার নিদর্শন বলে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এবং এইখানেই আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্যটির শুরু: মদনোৎসব বলে ওই প্রাচীন উৎসবটিকে আধুনিক অর্থে ভোগবাহুল্য বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই। প্রাচীন মানুষদের কাছে এ-উৎসব জীবন-সংগ্রামেরই অঙ্গ ছিলো। এ-উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ হলো কামাচার বা বামাচার; তাকে আধুনিক অর্থে কামপরায়ণতা মনে করা ভুল হবে। কেননা, মনে রাখা দরকার, অর্ধ-অসহায় সেই মানুষেরা প্রাকৃতিক নিয়মকানুন বলতে যেটুকু বুঝেছিলো সে-বোধ অনুসারে মানুষের ফলপ্রসূতা আর প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার মধ্যে সম্পর্ক আছে। তাই প্রজনন বা প্রজনন-সংক্রান্ত কোনো অনুষ্ঠানের সাহায্যেই তারা ওইভাবে প্রকৃতির ফলপ্রসূতাকেও আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করেছে।

এই জাদুবিশ্বাসই যদি মদনোৎসবের প্রাণবস্তু হয় এবং এই মদনোৎসবের সঙ্গে যদি তান্ত্রিকাদি—তথা লোকায়তিক—ধ্যানধারণার যোগাযোগ থাকে, তাহলে একে কোনো একটা মতবাদের অবনত বা পতিত রূপ মনে করবার কারণ নেই। তার বদলে বরং এ-কথাই মনে করা স্বাভাবিক যে, এখানেই সে-ধ্যানধারণার আদিমতম ও প্রাকৃততম রূপটিকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাই, কোনো একটা যুগে দেশশুদ্ধ লোক লোকায়ত মতবাদের মোহে পড়ে দেশটাকে একেবারে ব্যভিচারের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলো,—এমনতরো সিদ্ধান্ত অবশ্যই কাল্পনিক।

তন্ত্রের অর্থ, প্রাচীনত্ব ও সম্প্রদায়-ভেদ

তন্ত্র মানে কী? তন্ত্র কতো প্রাচীন? হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের সম্পর্ক কী রকম?

এবার এই প্রশ্নগুলির আলোচনা করা দরকার।

ইতিপূর্বে অনেকেই তন্ত্রের অর্থ-নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে কথাটির সবচেয়ে সরল শব্দার্থের প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ দেবার ইচ্ছা সবসময় চোখে পড়ে না। তার কারণ, তন্ত্রকে কোনো গূঢ় অধ্যাত্মবিদ্যা বলে ধরে নিয়ে অগ্রসর হলে ওই সরল শব্দার্থটির দিক থেকে তার উপর আলোকপাত হবার সম্ভাবনা থাকে না। অথচ, আমরা তন্ত্রের আদিরূপকে যে-অর্থে গ্রহণ করতে চাই তার সঙ্গে এই সরল শব্দার্থের সঙ্গতি অস্পষ্ট নয়।

তন্ ধাতুর উপর ষ্ট্রন্ প্রত্যয় করে তন্ত্র। তনোতি তন্যতে বা তন্ ষ্ট্রন্। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তৃত করা। বংশ-বিস্তার এর একটি মুখ্য অর্থ: তন্+অয়ট্=তনয়; সম্+তন্+ঘঞ=সন্তান। মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্ দেখাচ্ছেন, পুরোনো পুঁথিপত্রে তন্ত্রের প্রজননার্থক ব্যবহার বিরল নয়। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে 'কুলস্য তন্ত্র' শব্দ পাওয়া যায়; মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্-এর মতে তার অর্থ হলো *the principal action in keeping up a family, i,e, propagation*। কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রে, আপস্তম্বর ধর্মসূত্রে ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে নিম্নোক্ত অর্থে তন্ত্র শব্দের ব্যবহার হয়েছে: *any one propagating his family in regular succession*। মহাভারতে কুলতন্তুর অর্থ হলো *propagating the succession of a family*, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তন্তুকর্ত্রীর অর্থ *line of descendants*[৩২০]।

কিন্তু শুধু প্রজননই নয়। তন্ত্রের আক্ষরিক অর্থের মধ্যে খাদ্যাদি-উৎপাদনের ইঙ্গিতও খুঁজে পাওয়া যায়। তন্ত্রি কুটুম্বধারণে ঘঞ্। কুটুম্বকৃত্য=কুটুম্বদিগের ভরণাদি কার্য[৩২১]। স্বভাবতই, খাদ্যাদি-উৎপাদনই এই কার্যের মধ্যে অন্যতম। তাহলে, তন্ ধাতুর অর্থ যে 'বিস্তৃত করা' তা শস্য-উৎপাদনবৃদ্ধিও বোঝাতে পারে। গৌণ (?) অর্থ হিসেবে তন্ত্র বলতে তাঁত বোঝায়: কৃষিবিদ্যার পাশাপাশি এই বয়নকর্মও মেয়েদেরই আবিষ্কার এবং তা কৃষিরই আনুষঙ্গিক আবিষ্কার[৩২২]।

তন্ত্রের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠানের মধ্যেই তন্ত্রের উৎস: সে-অনুষ্ঠানের পিছনে মূল বিশ্বাস হলো মানবীয় প্রজননের সাহায্যে প্রকৃতির ফলপ্রসূতা-বৃদ্ধি। অতএব, তন্ত্রের এই জাতীয় শব্দার্থের সঙ্গে আমাদের উক্ত বিশ্লেষণের সঙ্গতি পাওয়া যায়।

তন্ত্র কতোদিনের পুরোনো? তান্ত্রিক পুঁথিপত্রগুলির সনতারিখ অনুসন্ধান করে অনেকে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। এবং এইদিক থেকে অগ্রসর হয়ে অনেকে সিদ্ধান্তে আসতে চাইছেন যে, ষষ্ঠ বা সপ্তম খৃষ্টাব্দে তন্ত্রের জন্ম[৩২৩]। আমরা বলতে চাই, এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমত, তান্ত্রিক গ্রন্থগুলি অবশ্য প্রায়ই অর্বাচীন। এই অর্বাচীনতা যে কতোখানি চূড়ান্ত হতে পারে তার দৃষ্টান্ত[৩২৪] উদ্ধৃত করা যায়:

> এদেশে মহানির্বাণতন্ত্র সর্বত্র বিশেষ আদৃত। কিন্তু অনেক স্থলে প্রবাদ প্রচলিত যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুরু এই তন্ত্রখানি রচনা করেন। শক্তিরত্নাকরে বৃহন্নির্বাণতন্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু নিতান্ত আধুনিক প্রাণতোষিণী ব্যতীত কোন প্রাচীন বা আধুনিক তন্ত্রসংগ্রহে মহানির্বাণতন্ত্রের উল্লেখ না থাকায়, ইহার আধুনিকত্বই প্রতিপন্ন হয়। আবার মেরুতন্ত্রে লণ্ড্রজ, ইংরেজ ইত্যাদি শব্দদ্বারা ভারতে ইংরেজাগমনের পর যে ওই তন্ত্র রচিত হইয়াছে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

অতএব, তন্ত্রের লিখিত গ্রন্থগুলি কতো পুরোনো তার হিসেবের উপর নির্ভর করেই তন্ত্রের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করা চলে না। অপরপক্ষে, আধুনিক গবেষকদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করছেন যে, এই তান্ত্রিক গ্রন্থাবলীর সনতারিখ যাই হোক না কেন, তান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান সেই সনতারিখের তুলনায় অনেক প্রাচীন। এখানে, সে-জাতীয় কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়।

> Their date, however, it is impossible to determine with any precision. The existing treatises are probably for the most part at least reproductions with additions and variations of older works which are no longer extant. In their present form they are usually ascribed to the 6th. or 7th. cen. of our era, but they may be considerably later. Tantrik usages and popular formulas were current and practised in a much earlier age; they belong to *a type of thought that is primitive* and among primitive peoples varies little in course of the centuries[৩২৫].
>
> এগুলির তারিখ সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। আজকাল যে-রচনাগুলি পাওয়া যায় সেগুলি খুব সম্ভব বিলুপ্ত ও প্রাচীনতর গ্রন্থেরই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। বর্তমানে এগুলিকে যে-রূপে পাওয়া যায় সাধারণত তার তারিখ ধরা হয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম খৃস্টাব্দ; এগুলি আরো পরের যুগের হতে পারে। কিন্তু ঢের পুরোনো যুগ থেকেই তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি প্রচলিত

ছিলো; এগুলি আদিম চিন্তাধারার পরিচায়ক এবং আদিম মানুষদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী উত্তীর্ণ হয়েও এ-জাতীয় চিন্তাধারায় পরিবর্তন সামান্যই ঘটে থাকে।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৩২০] বলছেন,

> দুই চারিজন বিশেষজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিয়া থাকেন যে, তন্ত্রধর্ম বৈদিক ধর্মের মতন পুরাতন এবং সনাতন।

অবশ্যই এই কথার ব্যাখ্যা হিসেবে উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যা অনুমান করছেন তা স্বীকারযোগ্য কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে:

> এই সকল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের বিশ্বাস যে, শ্বেতাঙ্গ আর্যদিগের উদ্ভবের সময়ে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণাঙ্গ আর্যও একদল ছিল। বেদে কৃষ্ণাঙ্গ আর্যদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা ইরান বা পারস্য দেশ হইতে বাহির হইয়া বর্তমান কাবুলের উত্তর উপত্যকা বাহিয়া, তাগ্‌লা-মাকান অধিত্যকা হইতে কাশ্মীরে নামিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল; পরে কাশ্মীর হইতে পার্বত্য প্রদেশ বাহিয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্যদিকে গান্ধার সুবাস্ত হইয়া লাট ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ পর্যন্ত ইহাদের বিস্তার ঘটিয়াছিল। ইহারাই নাকি ভারতবর্ষে তন্ত্রধর্ম আনয়ন করে…[৩২১]

উত্তরকালের উন্নততর ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে ওই শ্বেতাঙ্গ আর্যদের কপালেই অনেক বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে; তথাকথিত কৃষ্ণাঙ্গ আর্যগুলির ভারতবর্ষে আগমন-কাহিনীর পক্ষে ঐতিহাসিক সত্যের সম্ভাবনা অবশ্যই আরো সংকীর্ণ। তাছাড়া, দেশান্তরে শাক্ত ধ্যানধারণার বা তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের কোনো নিদর্শন পেলেই তা কোন্ পথে এ-দেশে এসেছিলো সে-কথা কল্পনা করবার প্রয়োজনও সত্যিই নেই। তার মানে এই নয় যে, প্রাচীন পৃথিবীতে দেশ থেকে দেশান্তরে ধর্মবিশ্বাস বা আচার-অনুষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানিটা একান্তই অসম্ভব ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তা ঘটেছিলো। আমাদের মন্তব্য শুধু এই যে, তাছাড়াও বিভিন্ন দেশে সমান্তরালভাবে, এবং অতএব পরস্পরের উপর প্রভাব-নিরপেক্ষভাবেই, একই বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা, মানববিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বাস্তব ভিত্তি আছে; সে-ভিত্তি শেষ পর্যন্ত মানুষের উৎপাদন-কৌশল: সমতুল্য পরিবেশে এবং সমতুল্য হাতিয়ারের উপর নির্ভর করে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষ পরস্পরের উপর প্রত্যক্ষ-প্রভাব

নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতির রহস্যকে মোটের উপর একইভাবে বোঝবার আয়োজন করতে পারে।

আমাদের এই মন্তব্যের পক্ষে জীবন্ত প্রমাণ হলো পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষগুলি। এদের মধ্যে যারা আজো কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়ে আটকে রয়েছে তাদের ধ্যানধারণা আর আচার-অনুষ্ঠান অন্তত কাঠামোর দিক থেকে একই রকম। এ-বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্ধৃত করেছি। এবং আমরা আরো দেখেছি যে, প্রাচীন মানুষদের মধ্যে যারা কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলো তাদের প্রত্নতত্ত্বমূলক ও অন্যান্য কীর্তিগুলি থেকেও একই বিশ্বাস, একই ধ্যানধারণা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অথচ, আজকের পৃথিবীতে নানান জায়গায় যে-সব মানবদল ওই রকমের পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে আটকে রয়েছে তাদের ধ্যানধারণার উপর পরস্পরের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুমান করা যে-রকম অসঙ্গত, সেই রকমই অসঙ্গত হলো তাদের উপর বিলুপ্ত পৃথিবীর মানুষদের ধ্যানধারণার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুমান করবার প্রচেষ্টা।

অতএব, কোনো সুদূর অতীতে পারস্যে বা মধ্য এসিয়ার কোথাও যদি তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় তাহলেই এ-কথা অনুমান করবার তাগিদ নেই যে, বাংলার তান্ত্রিক বিশ্বাসও সেখান থেকেই আসতে বাধ্য[*২৮]। একই পরিবেশে উভয় দেশের মানুষই প্রকৃতির সঙ্গে একইভাবে যুঝতে গিয়ে একই কথা চিন্তা করতে পারে। যে-কারণে, আজকের পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মধ্যেও আমরা এই তান্ত্রিক ধ্যানধারণা আর আচার-অনুষ্ঠানের নিদর্শন পেয়ে থাকি।

পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের কথা উঠলো বলেই এখানে কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য অবান্তর হবে না। তন্ত্রের কাল-নির্ণয় শুধুমাত্র সনতারিখের ব্যাপার হতে পারে না। কিংবা, সনতারিখের সাহায্যে তন্ত্রের কাল-নির্ণয় প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত অনেকাংশেই ভ্রান্ত হবার ভয়। তার কারণ, বিভিন্ন মানবদলের অসমান উন্নতি। এই অসমান উন্নতির ফলে পৃথিবীর নানান মানবদল উন্নতির নানান পর্যায়ে আটকে পড়ে আছে : যারা আজো কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায় পেরিয়ে আসতে পারেনি তাদের দিক থেকে বিচার করলে তন্ত্র কোনো আদিম কালের ব্যাপার নয়, সাম্প্রতিক—এমনকি সমসাময়িক—বিশ্বাস ও সাধনপদ্ধতি। আবার যারা সহস্র বছর আগে কৃষিবিদ্যার ওই প্রাথমিক পর্যায়টিকে পিছনে ফেলে এসেছে তাদের দিক থেকে বিচার করলে তন্ত্র সহস্র বছরের পুরোনো বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান।

অবশ্যই, সামগ্রিকভাবে এই কৃষিকাজই ভারতীয় অর্থনীতির প্রধানতম অঙ্গ এবং আমরা আগেই দেখেছি, এ-দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলো বলেই কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়ের নানান অঙ্গ

উত্তরযুগেও আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়নি। অতএব, আধুনিক যুগেও আমাদের দেশে ওই প্রাচীন পর্যায়ের ধ্যানধারণাগুলির এমন ব্যাপক ও গভীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখা দরকার যে, উত্তরকালে—বিশেষত লিখিত পুঁথিপত্রের মাধ্যমে,—তান্ত্রিক বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান হিসেবে যার পরিচয় পাওয়া যায় তাকেই তন্ত্রের আদি ও অকৃত্রিম রূপ মনে করলে ভুল হবে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৩২৯] বলছেন, "এখন যে ভাবে যে-সকল তন্ত্রগ্রন্থ এদেশে প্রচলিত আছে, তাহা হইতে তত্ত্বকথা খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন।" কিন্তু প্রশ্ন হলো, তার কারণ কী?

প্রথমত, আমরা আগেই বলেছি, যে-মূর্ত পরিস্থিতিতে এ-জাতীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের উদ্ভব, সেই পরিস্থিতি থেকে উৎপাটিত হয়ে উত্তরকালের পরিস্থিতিতেও টিকে থাকবার সময় এই বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান-গুলির আদি-তাৎপর্য অনিবার্যভাবেই বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছে: যতোই কাল্পনিক আর অসম্ভব হোক না কেন, মানসিক উদ্দীপনার উৎস হিসেবে অতীতে (বা, পিছিয়ে-পড়ে থাকা মানুষদের জীবনে, বর্তমানেও) এই তন্ত্রই ছিলো জীবন-সংগ্রামের অঙ্গ, উৎপাদন কৌশলের সহায়ক। অথচ, উত্তর-কালের ধর্মবিশ্বাস আর ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে টিকে থাকবার সময় এই তন্ত্রই আজ অর্থহীনতায় ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয়ত, উত্তরপর্যায়ে রচিত হয়েছে বলেই তান্ত্রিক পুঁথিপত্র-গুলির মধ্যে উত্তরকালের অজস্র ধ্যানধারণা অনিবার্যভাবেই প্রবেশলাভ করেছে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৩৩০] যেমন বলছেন, "বাঙ্গালীকে ব্রাহ্মণ-শাসনাধীন করিতে পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণগণকে তান্ত্রিক এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত অনেকটা আপোস করিতে হইয়াছিল।...আধুনিক তন্ত্রগ্রন্থে যে এই আপোসের নিদর্শন অতি সুস্পষ্ট, তাহা তন্ত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন।" আপোসজনিত ধ্যানধারণাগুলি শুধুই যে বিজাতীয় তাই নয়; বহুলাংশে পরস্পর-বিরোধীও—কেননা, তা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধ্যানধারণা। বিজাতীয়, কেননা এই সব তান্ত্রিক পুঁথিপত্রে পূজা, উপাসনা, মোক্ষ, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানের কথাও এসে জুটেছে; অথচ, তান্ত্রিক দেহতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো যে, তন্ত্রের আদি-রূপটির সঙ্গে আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার সঙ্গতি যে থাকতে পারে না, তা অনুমান করবার প্রকৃত কারণ রয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র বিজাতীয় ধ্যানধারণাই নয়, পরস্পর-বিরোধী ধ্যানধারণাও। আর, তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র, দুই-ই।

তন্ত্র যে তথাকথিত হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধতন্ত্র উভয়ের চেয়েও অনেক

প্রাচীন এবং উত্তরকালে হিন্দুধর্মমূলক ধারণা এবং বৌদ্ধধর্মমূলক ধারণা তন্ত্রের উপর প্রক্ষিপ্ত হয়েই যে তথাকথিত হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে,—একথা ইতিপূর্বে যোগ্য বিদ্বানেরা স্বীকার করেছেন। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৩৩১] বলছেন,

> তন্ত্রসাহিত্য পড়িয়া যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে ইহা মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তন্ত্রধর্মই বাংলার আদিম ধর্ম। ...এখন কথা এই যে, বৌদ্ধতন্ত্রধর্ম অতি পুরাতন কোন মূল তান্ত্রিক ধর্মের বৌদ্ধ সমন্বয়, কি একেবারেই একটা নতুন ধর্ম, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। আমার মনে হয়, একটা অতি পুরাতন তন্ত্রধর্ম এদেশে খুব প্রচলিত ছিল; বৌদ্ধধর্ম সেই ধর্মের সহিত মিশিয়া প্রবলতর আকার ধারণ করিয়াছিল। তন্ত্রের অধিকতর আলোচনা হইলে এ-প্রশ্নের মীমাংসা পরে হইবে।

পরে, তন্ত্রের অধিকতর আলোচনা করেই অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্ত[৩৩২] পাঁচকড়িবাবুর ওই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করতে চাইলেন :

> Tantrism is neither Buddhist nor Hindu in origin. : it seems to be a religious undercurrent, originally independent of any abstruse metaphysical speculation, flowing on from an obscure point of time in the religious history of India. With these practices and *yogic* processes, which characterise Tantrism as a whole, different philosophical, or rather theological, systems got closely associated in different times...

কিংবা[৩৩৩],

> Side by side with the commonly known theological speculations and religious practices, there has been flowing in India, an important religious undercurrent of esoteric *yogic* practices from a pretty old time ; these esoteric practices, when associated with the theological speculations of the Saivas and the Saktas, have given rise to Saiva and Sakta Tantrism ; when associated with the Buddhistic speculations, have given rise to the composite religious system of Buddhist Tantrism ; and again, when associated with the speculations of Bengal Vaisnavism, the same esoteric practices have been responsible for the growth of the esoteric Vaisnavite cult, known as the Vaisnava Sahajia movement.

অতএব৭৩,

> The real origin of the cult lies more outside Buddhism than inside it.

অর্থাৎ সংক্ষেপে, উৎসের দিক থেকে তন্ত্র বৌদ্ধও নয়, হিন্দুও নয়। অতি প্রাচীন কাল থেকে তন্ত্র-সাধনার স্রোত এ-দেশে প্রবাহিত ছিলো। আদিতে তার সঙ্গে কোনো রকম জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সম্পর্ক ছিলো না। সেই আচরণ ও যোগসাধনাই হলো সামগ্রিকভাবে তন্ত্রের প্রধান লক্ষণ। উত্তরযুগে তার সঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক কিংবা ধর্মমূলক মতবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিংবা,

দেশে সাধারণভাবে যে-সব ধর্মবিশ্বাস ও সাধনপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় তার পাশাপাশি অনেক পুরোনো যুগ থেকে আর একরকম গুহ্য সাধনার ফল্গুস্রোত বয়ে চলেছে। এই গুহ্য সাধনার সঙ্গে শৈব ও শাক্ত মতবাদের সম্পর্ক ঘটে জন্ম হয়েছে শৈব বা শাক্ত তন্ত্রের ; বৌদ্ধ চিন্তাধারার সম্পর্ক ঘটে জন্ম হয়েছে বৌদ্ধ তন্ত্রের ; বাংলার বৈষ্ণবধর্মের সম্পর্ক ঘটে জন্ম হয়েছে বৈষ্ণব সহজিয়া আন্দোলনের।

অতএব, এই তন্ত্রের উৎস সন্ধানে বৌদ্ধধর্মের ভিতরের চেয়েও বৌদ্ধ-ধর্মের বাইরের দিকেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা দরকার।

আমাদের যুক্তিও ঠিক তাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বৌদ্ধধর্মের বাইরের ঠিক কোন্ ক্ষেত্রটিকে অনুসন্ধান করে আমরা এই তন্ত্রের আদি-রূপকে উদ্ধার করতে পারবো? দুঃখের বিষয়, ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত এই মৌলিক প্রশ্নটির প্রতি তেমন গভীর মনোযোগ দেননি। তার বদলে তিনি বরং ওই বৌদ্ধাদি ধ্যানধারণাগুলিকে তন্ত্রের উপর প্রক্ষিপ্ত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও, আপেক্ষিকভাবে এগুলিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অবশ্যই, দেশে প্রচলিত ওই অতি-প্রাচীন তন্ত্রসাধনা বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে কী রূপ নিয়েছে তার আলোচনা অবান্তর নয়; ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত প্রধানতই সে-আলোচনা করেছেন এবং তাতে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উপর আলোকপাত হয়েছে। কিন্তু এই সম্প্রদায়গুলিকে বোঝবার ব্যাপারে তার চেয়ে মৌলিক কাজ হলো, ওই যে সুপ্রাচীন সাধনপদ্ধতি এ-দেশে প্রবাহিত ছিলো বলে স্বীকার করা হয়েছে তারই উৎস নির্ণয় করা।

আমাদের যুক্তি অনুসারে, সে-সমস্যা সমাধান করবার পদ্ধতি হবে, প্রাচীন পর্যায়ে আটকে-পড়ে-থাকা দেশবিদেশের মানুষগুলির বাস্তব বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করা। এবং এই পদ্ধতি অনুসারে অগ্রসর হয়েই আমরা দেখেছি যে, কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়ে আটকে-থাকা নানা জাতীয় মানবদলের দৃষ্টান্তে যে-বিশ্বাস ও আচরণ চোখে পড়ে তার মধ্যেই তন্ত্রসাধনার আদি-রূপটিকে আজো জীবন্তভাবেই আবিষ্কার করা সম্ভব।

বৌদ্ধ-তন্ত্র এবং হিন্দু-তন্ত্রের সমস্যাকে আরো একটু খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করা যায়। বিশ্বকোষের লেখক[৩৩৫] বলছেন :

> হিন্দুতন্ত্রের বিষয় পূর্বে যে-রূপ লিখিত হইল, বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে ঐরূপ বিবরণ বর্ণিত হইতে দেখা যায়। হিন্দুতন্ত্রোক্ত শিব দুর্গা প্রভৃতি নামগুলিই যেন বজ্রসত্ত্ব, বজ্রডাকিনী প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রেও চণ্ডী, তারা, বারাহী প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত আছে। শিবোক্ত তন্ত্রে যে-রূপ অদ্ভুৎ অদ্ভুত দেবমূর্তি কল্পিত হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রেও হেরুকাদি দেবদেবীর মূর্তিও তদ্রূপ বর্ণিত আছে।...
>
> বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও মালামন্ত্র, মাতৃকা, কবচ, হৃদয়াদি অতি গুহ্য বলিয়া জানেন। বৌদ্ধতন্ত্রেও ওই সকল গুহ্য বিষয় অধিকারী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নিষেধ আছে।...
>
> বুদ্ধমত-প্রতিপাদ্য বৌদ্ধশাস্ত্রে পঞ্চমকারের নিন্দা ও গ্রহণে নিষেধ আছে। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ তাহার অন্যথা করিয়া থাকেন। পঞ্চমকারের সেবা বৌদ্ধতন্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। যে মদ্যমাংস গ্রহণ বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে তাহার সুখ্যাতি দৃষ্ট হয়।...
>
> ...যিনি প্রকৃত সিদ্ধতান্ত্রিক বৌদ্ধতন্ত্রে তিনিই বীরনায়ক বলিয়া অভিহিত। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণও এই জগৎ বামোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে চক্রপূজা, বীরযাগ, ভগপূজা প্রভৃতির বিষয়ও বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মধ্যেও দক্ষিণাচারী এবং বামাচারীর মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়[৩৩৬] :

> ...the two Tantrik schools maintain that all beings are *vajrasattvas*, are the unique *Vajrasattva*; they also maintain that the nature of *vajra* is immanent in all beings and can be actualized by appropriate meditations and rites.
>
> Now the left-hand school conceives the nature of *vajra* according to the *Saivite* pattern; the right-hand school is nearer the *Vedantist* or *Yoga* tradition...

> In the Tantras of the *Saivite* type we have to deal with a Buddhist adaptation of *Saivism* and *Saktism.* The three traditional bodies of a Buddha are preserved, but the true nature of *vajrasattva* is his fourth body,...the body of *vajra;* it is with that body that the eternal *tathagata* or *bhagavat* eternally embraces his *sakti, Tara* or *Bhagavati.* From this erotic conception of the nature of being or the divine being it follows that, in order to actualize his real divine nature, the ascetic must perform the rites of union with a woman (*yogini, mudra*) who is the personification of *Bhagavati,* who is *Bhagavati* herself; as it is said, *buddhatvam yosidyonisamasritam,* 'Buddhahood abides in the female organ'......The most conspicuous topic of this literature is what is called the *stripuja,* 'worship of women' : disgusting practices, both obscene and criminal, including incest, are a part of this *puja,* which is looked upon as the true, heroic behaviour, (*dushkaracharya*) of a *bodhisattva,* as the fulfilment of the perfect virtues. Buddhist mythology and mysticism are freely mixed with *saktas:* the semen is the five Buddhas, etc...

বামাচার ও দক্ষিণাচারের তর্জমা হিসেবে *left-hand school* এবং *right-hand school* শব্দ ব্যবহারের মতোই আধুনিক রুচিবোধ ও নীতিবোধের নিক্তিতে লেখক ওই আদিম বিশ্বাসের যেভাবে মূল্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করছেন তা অবশ্যই ভ্রান্ত। কিন্তু আমাদের যুক্তির বর্তমান পর্যায়ে আলোচ্য বিষয় হলো, তথাকথিত বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদটা যে শেষ পর্যন্ত কতো কৃত্রিম তাই বিচার করা। উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে সে-স্বীকৃতির স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এবং ওই বৌদ্ধতন্ত্রের স্ত্রীপূজা বা 'বুদ্ধত্বম্ যোষিদ্‌যোনি-সমাশ্রিতম্' জাতীয় বাক্যের মধ্যে এ-ইঙ্গিত থেকে গিয়েছে যে, উক্ত ধ্যানধারণা শুধুমাত্র মাতৃপ্রধান সমাজের পরিচায়ক নয়, সেই আদিম জাতুবিশ্বাসেরও পরিচায়ক—যে-জাতুবিশ্বাস অনুসারে নারী-জননাঙ্গই সৃষ্টির আদি-কারণ : এ-জগৎ বামোদ্ভূত।

আমাদের যুক্তি অনুসারে, কৃষিবিদ্যা মেয়েদের আবিষ্কার। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ের কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ নারীপ্রধান। এই পর্যায়ের কৃষিবিদ্যার অপরিহার্য অঙ্গ যে-জাতুঅনুষ্ঠান তার মূল কথা হলো, নারীর প্রজননশক্তির সাহায্যে প্রকৃতির ফলপ্রসূতাকে আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টা। এই জাতু-অনুষ্ঠানের মধ্যেই তন্ত্রসাধনার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তরকালেও আমাদের দেশে উৎপাদন-কৌশলের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থেকেছে। ফলে

দেশের আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্র থেকে কৃষিবিদ্যার ওই প্রাথমিক পর্যায়ের স্মারকগুলি বিলুপ্ত হয়নি—যদিও এই স্মারকগুলির মধ্যে উক্ত আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যানধারণার আদি-তাৎপর্য অনিবার্যভাবেই বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছে। এই কারণেই আমাদের দেশে এতোদিন ধরে তন্ত্রসাধনার এমন ব্যাপক ও গভীর প্রভাব। অবশ্যই, উত্তরকালে এই তন্ত্রসাধনার উপর হিন্দু-ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের নানা বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তন্ত্রসাধনা দ্বিবিধ, হিন্দু ও বৌদ্ধ। স্বভাবতই, হিন্দুধর্মমূলক ও বৌদ্ধধর্মমূলক ওই অধ্যস্ত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখলে তন্ত্রসাধনার স্বরূপকে চেনা যাবে না। আমাদের দেশের বৈদান্তিকেরা সাধারণত একটি উপমা ব্যবহার করে থাকেন। তারই উপর নির্ভর করে আমরাও এখানে আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পারি। জবাফুলের সংস্পর্শে এসে স্ফটিক যদিও রক্তবর্ণ বলে প্রতিভাত হয় তবুও স্ফটিকের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে এই রক্তবর্ণের উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা ভুল হবে। তেমনিই, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে এসে তন্ত্রসাধনার উপর যে-সব ধ্যানধারণা অধ্যস্ত হয়েছে তারই উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখলে এ-সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভবপর হবে না।

আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করছেন যে, অতি আদিম যুগ থেকে আমাদের দেশে তন্ত্রসাধনার একটি স্রোত বয়ে চলেছে। তারই সঙ্গে হিন্দুধর্মের মিশেল হয়ে হিন্দুতন্ত্রের এবং বৌদ্ধধর্মের মিশেল হয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের জন্ম হয়েছিলো। যদি তাই হয় তাহলে মানা দরকার, তান্ত্রিক পুঁথিপত্রগুলির মধ্যে থেকে হিন্দুতন্ত্রের হিন্দুত্ব এবং বৌদ্ধতন্ত্রের বৌদ্ধত্ব সচেতনভাবে সরিয়ে রেখেই আমরা তন্ত্রসাধনার অকৃত্রিম রূপটির পরিচয় পেতে পারি।

হিন্দুতন্ত্রের পুঁথিপত্রে নানান কথা পাওয়া যায়: পূজা, মোক্ষ, স্বর্গপ্রাপ্তি, ব্রহ্মজ্ঞান। তাছাড়া নানান দেবদেবীর কথা তো আছেই। এমন কি বেদান্ত-দর্শনের অনেক ধ্যানধারণাও এই গ্রন্থগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। তন্ত্রসাধনার আলোচনায় স্বভাবতই এগুলির কথা অপ্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত।

বৌদ্ধতন্ত্রের পুঁথিপত্রে নির্বাণ, বজ্রসত্ব, প্রজ্ঞাপারমিতা, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাছাড়াও, যোগাচার মাধ্যমিক প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায়ের তত্ত্বকথাও বৌদ্ধতন্ত্রের পুঁথিতে বিরল নয়। গবেষকের দৃষ্টি এগুলির প্রতি আবদ্ধ হলে তন্ত্রসাধনার মৌলিক রূপটি তাঁর চোখে ধরা পড়বে না।

পুঁথিপত্রে পাওয়া তন্ত্রসাধনার রূপ থেকে এইভাবে হিন্দুধর্ম ও

ও হিন্দুদর্শন এবং বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শনের প্রসঙ্গ সচেতনভাবে বাদ দিলে কী বাকি থাকে? কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠান এবং তার অন্তর্নিহিত আদিম বিশ্বাস। পৃথিবীতে যে-সব মানবদল আজো ওই আদিম পর্যায়ের কাছাকাছি আটকে পড়ে আছে তাদের দিকে চেয়ে দেখলে এই বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের রূপটি আরো প্রকটভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়বে। তাই আমাদের পদ্ধতি অনুসারে, তন্ত্রকে বোঝবার জন্যে ওই পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের দিকে চেয়ে দেখা দরকার: তন্ত্রের লিখিত পুঁথিপত্রের মধ্যে যে-সব কথা উত্তরকালের ধ্যানধারণার জটিলতায় অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে সেগুলির জীবন্ত—অতএব স্পষ্টতর—রূপ পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

সহজিয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায় প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আমরা শুরুতেই দেখেছি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলছেন যে, নামান্তরের আড়ালে লোকায়তিক সম্প্রদায় আজো আমাদের দেশে টিকে রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করছেন। অতএব, লোকায়তর আলোচনায় আমাদের পক্ষে এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের স্বরূপকে বোঝবার চেষ্টা করা দরকার।

সহজিয়া বলতে ঠিক কী বোঝায়? সহজিয়া সম্প্রদায় এলো কোথা থেকে? মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[৩৩১] বলছেন, এই সহজিয়া সম্প্রদায় বা সহজযান আসলে হলো বৌদ্ধধর্মের অধঃপাতের ফল:

> যে পঞ্চকামোপভোগ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে চরিত্র-বিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্মের প্রাণ, যে চরিত্রবিশুদ্ধির জন্য হীনযান হইতেও মহাযানের মহত্ত্ব, যে চরিত্র বিশুদ্ধির জন্য আর্যদেব 'চরিত্র বিশুদ্ধি প্রকরণ' নামে গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন, সহজযান সেই চরিত্রবিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম নেড়ানেড়ীর দলে গিয়া দাঁড়াইল। সহজযানীরা সন্ধ্যাভাষায় গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাভাষার অর্থ আলো-আঁধারী ভাষা। কানে শুনিবামাত্র একরকম অর্থ বোধ হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহার গূঢ় অর্থ অতি ভয়ানক। তাঁহারা দেহতত্ত্বের গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন।...যে বোধিচিত্ত মহাযানমতে নির্বাণ পাইবার আশায় ক্রমেই আপনার উন্নতি করিতেছিলেন, দেহতত্ত্বের মধ্যে

আসিয়া তাহার যে কী দশা হইল তাহা আর লিখিয়া জানাইব না। জানাইতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়।

দেহতত্ত্বের আলোচনায় আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করবো। আপাতত দেখা যাক, মহামহোপাধ্যায় বৌদ্ধধর্মের এই ভয়াবহ অধঃপতনের কী ব্যাখ্যা দিচ্ছেন[৩৩৮] :

> বৌদ্ধধর্মে অনেকদিন হইতেই ঘুণ ধরিয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে যেদিন স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেইদিন হইতেই তাঁহাকে সঙ্ঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনেক কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের এক বিহারে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ ছয় শত বৎসর পর হইতে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল—ক্রমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইল। এইখান হইতেই ঘুণ ধরা আরম্ভ হইল।… ভিক্ষুর ছেলে—সে একেবারেই ভিক্ষু হইত।…আমাদের দেশে যেমন 'জাত বৈষ্ণব' বলিয়া একটা জাতি হইয়াছে—সেকালেও তেমনি 'জাত ভিক্ষু' বলিয়া একটা জাতির মত হইয়াছিল। উহাদের যত দলপুষ্টি হইতে লাগিল, আসল ভিক্ষুদের অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল। গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্বাহ করিত—ভিক্ষাও করিত—কেহ বা রাজমজুর হইত, কেহ বা রাজমিস্ত্রী হইত, কেহ বা চিত্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ বা স্যাকরা হইত, কেহ বা ছুতার হইত—অথচ ভিক্ষাও করিত, ধর্মও করিত, পূজাপাঠও করিত। বৌদ্ধধর্মের পৌরহিত্যটা ক্রমে নামিয়া আসিয়া কারিগরদের হাতে পড়িল।…লেখাপড়া, বিদ্যাবুদ্ধির নামগন্ধ পর্যন্ত বৌদ্ধদের মধ্যে লোপ পাইল।

প্রশ্ন হচ্ছে, মহামহোপাধ্যায়ের এই অনুমান যদি নির্ভুল হয় তাহলে এ-থেকে ঠিক কী সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব? এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে ওই তথাকথিত অধঃপতনের স্বরূপটিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ওই 'অধঃপতিত' বৌদ্ধধর্মের রূপটিকে বিশ্লেষণ করে কি তার মধ্যে শুধুমাত্র স্থূলবুদ্ধি, নির্বুদ্ধি এবং নিরক্ষরতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে? না, এমন কিছু কিছু নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যার সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমাদের পরিচয় ঘটেছে?

যদি প্রথম সম্ভাবনাটি ঠিক হয় তাহলে মানতে হবে, প্রাকৃতজনের সংস্পর্শে এসে বৌদ্ধধর্মের মহত্তর ও বৃহত্তর আদর্শগুলির স্থূল-ব্যাখ্যা শুরু হয়েছিলো। কিন্তু যদি দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি ঠিক হয়—যদি দেখা যায় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং জাত-আলাদা কিন্তু সুনির্দিষ্ট কতকগুলি আদিম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান এই তথাকথিত অধঃপাতে-যাওয়া বৌদ্ধধর্মের প্রাণবস্তু হয়ে দাঁড়ালো—তাহলে স্বীকার করতে হবে, সমাজের নিচের মহলের

মানুষদের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এসে পড়া সত্ত্বেও তাদের চিন্তাচেতনায় এই বৌদ্ধধর্ম কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। অর্থাৎ, সমাজের নিচের মহলের ওই মানুষদের বিশ্বাসাদির উপর যদিও কৃত্রিমভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রলেপ এসে পড়লো তবুও তারা আসলে তাদের আদিম বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান নিয়েই মেতে রইলো। এই সম্ভাবনা অনুসারে সহজিয়া-সম্প্রদায়কে অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের পরিচায়ক বলে মনে না করে কৃত্রিম বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচায়ক মনে করাই সঙ্গত হবে।

শোনা যায়, আধুনিক যুগে খৃস্টান পাদ্রীরা সাঁওতালদের খৃস্টধর্মভুক্ত করবার পরও তারা নিজেদের পুরোনো পুজো-পার্বণ পরিত্যাগ করে না। পুরোনো-পূজাপার্বণ-রত ওই আধুনিক যুগের খৃস্টান-সাঁওতালদের দৃষ্টান্ত কি খৃস্টধর্মের অধঃপতনের পরিচায়ক হবে? না, পুরোনো ধ্যানধারণাকে অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রেখে তারই উপর খৃস্টধর্মের কৃত্রিম প্রলেপের পরিচায়ক হবে?

আমাদের মন্তব্য হলো, সহজিয়া সম্প্রদায়ের উপর বৌদ্ধতত্ত্বের ওই প্রলেপটাই কৃত্রিম এবং অর্বাচীন। তাই একে বৌদ্ধধর্মের অধঃপাতের পরিচায়ক না বলে বরং আদিম জাদুবিশ্বাসের কৃত্রিম বৌদ্ধসংস্করণ মনে করাই ন্যায়সঙ্গত। এবং আমাদের কাছে এই প্রভেদটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পরিচায়ক হিসেবে গ্রহণ করলে এ-সম্প্রদায়ের মূল কথাগুলিকে বোঝবার সময় বৌদ্ধধর্মের মৌলিক তত্ত্বের উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে হবে এবং দেখতে হবে একদা-মহৎ কতকগুলি ধ্যানধারণা কীভাবে অশিক্ষিত ও মূর্খ মানুষদের চেতনায় স্থূল ও বিকৃত অর্থে প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ-পরিভাষায় কৃত্রিমভাবে সজ্জিত এক আদিম বিশ্বাসের পরিচায়ক বলে গ্রহণ করলে এই সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ওই বৌদ্ধ-পরিভাষাগুলিই অপ্রাসঙ্গিক বলে স্বীকৃত হবে এবং সে-ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের স্বরূপ উপলব্ধির উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র পদ্ধতি গ্রহণ করবার প্রয়োজন হবে।

আমরা ইতিপূর্বে কৃষিকেন্দ্রিক আদিম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মূল তত্ত্বগুলির বিচার করেও সেই নির্দিষ্ট বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায় কি না তা একটু পরেই দেখবো। কিন্তু তার আগে আমরা এটুকু বলে নিতে চাই, মহামহোপাধ্যায়ের নিজের রচনাতেই এমন ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় যে-ইঙ্গিত অনুসারে সমাজ-বিকাশের পিছনদিককার পর্যায়ে আটকে পড়ে থাকা মানুষদের মধ্যেই এই বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের স্পষ্টতর স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর।

মহামহোপাধ্যায়[৩০১] প্রশ্ন তুলছেন, বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল? উত্তরে তিনি বলছেন, প্রধানত মুসলমান আক্রমণের দরুনই বাংলা দেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়। কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। উড়িষ্যার জঙ্গলে,

চট্টগ্রামের রাঙামাটিতে আজো ওই বৌদ্ধধর্মের (অর্থাৎ মহামহোপাধ্যায় যাকে অধঃপতিত বৌদ্ধধর্ম বলছেন তার) জীবন্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অঞ্চলগুলি যে প্রধানতই দেশের পিছিয়ে-পড়া মানুষদের অঞ্চল সে-কথা প্রমাণ করবার প্রয়োজন নেই। কেবল প্রশ্ন হলো, মহামহোপাধ্যায় যে-সব ধ্যানধারণাকে অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের পরিচায়ক বলে অনুমান করছেন সেগুলি টিকে থাকবার মতো স্বাভাবিক জমি কেন এই পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের মানুষদের মধ্যেই পেলো? এইদিক থেকেও, ওই পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের সঙ্গে এ-জাতীয় ধ্যানধারণার একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক অনুমান করা সঙ্গত নয় কি?

শুধু তাই নয়, ওই সহজিয়া সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়[৩০] বলছেন, এ-জাতীয় সম্প্রদায় একটি নয়, বহু। পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে নানান নামের অন্তরালে মূলত এই একই সম্প্রদায়কে টিকে থাকতে দেখা যায় : কর্তাভজা, বাউল, বৈষ্ণব এবং আরো অনেক নাম। এবং শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৩১] এই জাতীয় সম্প্রদায়-গুলির মধ্যে তত্ত্বগত সাদৃশ্যের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: "সহজিয়া, বৈষ্ণব, শৈব, কিশোরীভজা, কর্তাভজা, পরকীয়া সাধনা—সবই রিরংসার উপর প্রতিষ্ঠাপিত।" এবং আমাদের যুক্তি অনুসারে এই জাতীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, উক্ত ধ্যানধারণার উৎসে যদি কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠানই বর্তমান থাকে এবং যদি বাংলা দেশের কৃষকদের উৎপাদন-পদ্ধতিতে খুব বড়ো রকমের মৌলিক উন্নতি দেখা না দিয়ে থাকে, তাহলে তাদের নানান দলের চেতনায় উক্ত ধ্যানধারণাগুলির প্রভাব নানান নামে প্রতিভাত হওয়াই সম্ভব এবং স্বাভাবিক।

অবশ্যই অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন নিজেও এই সহজিয়া সম্প্রদায়কে বৌদ্ধধর্মেরই স্মারক বলে গ্রহণ করতে চান। তবুও তাঁকে স্বীকার[৩২] করতে হচ্ছে যে, আধুনিক বিদ্বানদের এই সিদ্ধান্তটি সহজিয়াদের নিজেদের কাছে অজ্ঞাত :

> The Sahajias would by no means confess that they were Buddhists, nor refer to any Buddhist texts which would make it far easier to trace the doctrines to their genuine origin...... It is the duty of a historian and scholar to thrash out grains from the chaff and find out the true Buddhist elements in their views and practices.

অর্থাৎ, সহজিয়ারা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে তারা আসলে বৌদ্ধ। তারা কোনো বৌদ্ধ গ্রন্থেরও উল্লেখ করবে না—তাহলে তাদের মতের প্রকৃত উৎস

> খুঁজে পাওয়া সহজ হতো।…ঐতিহাসিক ও বিদ্বানের কর্তব্য হলো, ধানকুটে চাল বের করবার মতো করেই সহজিয়াদের মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠান থেকে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের অঙ্গগুলিকে খুঁজে বের করা।

ধান কুটে চাল বের করা! আমাদের যুক্তিও ঠিক তাই। কেবল কোন্‌টে চাল আর কোন্‌টে তুষ—এই নিয়ে তফাত। আমরা বলতে চাইছি, ওই বৌদ্ধধর্মের অঙ্গগুলিই তুষের মতো—সহজিয়ার স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে এই তুষই বাদ দিতে হবে।

বাদ দিলে কী পড়ে থাকে? কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠান।

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন সহজিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠানকে ভালো করে বিশ্লেষণ করবার কথা বলছেন। তাঁর এই নির্দেশ মেনেই অগ্রসর হওয়া যাক।

প্রথম প্রশ্ন হলো, এই প্রসঙ্গে সহজ শব্দটির মানে কী? ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত[৬১৩] বলছেন :

> The word 'Sahaja' literally means that which is born or which originates with the birth or origination of any entity.
>
> সহজ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, যা জন্মেছে বা যা একটা কিছুর জন্মের সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

অবশ্যই অধ্যাপক দাসগুপ্ত বৌদ্ধধর্মের আলোয় এই অর্থটিরও একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, তন্ত্র কথাটির শব্দার্থের পিছনেও এই জাতীয় একটা ইঙ্গিতই খুঁজে পাওয়া যায়। ইঙ্গিতটা হলো, প্রজনন ও উৎপাদন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত—কিংবা প্রজননের অনুকরণেই উৎপাদনকে আয়ত্তে আনবার পরিকল্পনা। 'সহ-জ' কথাটির মধ্যেও ওই একই ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায় না কি? এবং এই ইঙ্গিত থেকে কৃষিকেন্দ্রিক আদিম জাদুবিশ্বাসই অনুমান করা সম্ভব নয় কি?

যদি কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠানই এই সাধনপদ্ধতির উৎস হয় তাহলে সহজিয়াদের ধ্যানধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে নারীপ্রাধান্যের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া উচিত। এবং তা পাওয়া যায়।

সহজিয়াদের সাধন-পদ্ধতির মধ্যেও এই নারী-প্রাধান্যমূলক চিন্তার কী রকম পরিচয় পাওয়া যায় তাই দেখা যাক। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু[৬১৪] বলছেন :

> The Sahajias also believe that at a certain stage of spiritual

culture the man should transform himself into a woman and remember that he cannot have experience of true love so long as he cannot realise the nature of a woman in him.
অর্থাৎ, সহজিয়াদের বিশ্বাস অনুসারে সাধনার একটা পর্যায়ে পুরুষের পক্ষে নারীভাবে পর্যবসিত হওয়া প্রয়োজন এবং এ-কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, নারীত্বের অনুভূতি ছাড়া প্রকৃত প্রেমের অভিজ্ঞতা হয় না।

এই উক্তির সমর্থনে অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু[৬৬৫] সহজিয়াদের গান উদ্ধৃত করছেন :

পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
একদেহ হয়ে নিত্যতে যাবে॥

কিংবা,

স্বভাব প্রকৃতি হইলে তবে রাগ রতি॥

কিংবা,

প্রকৃতি আচার পুরুষ বেভার
যে জনা জানিতে পারে।

কিংবা,

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে।
ইত্যাদি। ইত্যাদি।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, তন্ত্রেরও এই একই উপদেশ : বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্। এবং আমরা দেখেছি, এ-থেকে অনুমান করা যায়, তন্ত্রসাধনা এককালে মেয়েদেরই সাধন-পদ্ধতি ছিলো। সহজিয়া-প্রসঙ্গেও একই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক মনোবিজ্ঞানের নজির দেখিয়ে অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু এই তত্ত্বের যে-আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন তা প্রায় হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে ; পাদটীকায়[৬৬৬] আমরা তাঁর সিদ্ধান্ত উল্লেখ করবো এবং সে-সিদ্ধান্ত কেন আমাদের কাছে প্রায় হাস্যকর মনে হয়েছে তারও আলোচনা তুলবো। আপাতত, সহজ-সাধনায় নারী-প্রাধান্যের দিকটিকে আরো ভালো করে দেখা যাক :

অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্ত[৬৬৭] বলছেন :

Another thing that deserves special attention in connection with the *yogic* practice of the Sahajia Buddhists is the conception of the female force. In the *Carya-songs* we find frequent reference to this female force variously called as the *Chandi, Dombi, Savari, Yogini, Nairamani, Sahaja-sundari*, etc., and we

> find frequent mention of the union of the *yogin* with this personified female deity.
> সহজিয়াদের যোগসাধনা প্রসঙ্গে স্ত্রী-শক্তি সম্বন্ধে তাদের ধারণার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন। চর্যা-পদে নানান নামে এই স্ত্রী-শক্তির উল্লেখ বারবার পাওয়া যায় : চণ্ডী, ডোম্বী, শবরী, যোগিনী, নৈরামণি, সহজসুন্দরী ইত্যাদি। এবং মানবীরূপে কল্পিত এই দেবীর সঙ্গে যোগসাধকের মিলনের উল্লেখও বারবার পাওয়া যায়।

লেখক স্বীকার করছেন[৩৪৮], সহজিয়াদের এই স্ত্রী-শক্তিটি তন্ত্রের শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় :

> This conception of Sakti of the Buddhist Sahajias is an adoption of the general Tantric conception of the Sakti.
> বৌদ্ধ সহজিয়াদের শক্তির এই ধারণা তন্ত্রের শক্তির ধারণাকেই গ্রহণ করবার ফল…

তন্ত্রসাধনার শক্তির আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেই করেছি এবং আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, কৃষি-আবিষ্কারের পটভূমিতেই তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব।

অবশ্যই, সহজ-সাধনার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছেন বলেই ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত[৩৪৯] বলছেন, ওই শক্তির সঙ্গে সাধকের যে-সঙ্গমের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে তাকে দৈহিক বা শারীরিক অর্থে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলনই যে সহজ-সাধনার একটি প্রধানতম অঙ্গ এ-কথা শুধু ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত নন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানেরা সকলেই স্বীকার করেছেন। আমাদের যুক্তি অনুসারে ওই সহজসাধনাও যদি কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠান থেকেই জন্মলাভ করে থাকে তাহলে এ-রকমটা না-হয়ে উপায় নেই। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠানের সেই আদি-অকৃত্রিম রূপটিই সহজ-সাধনার মধ্যে আজো অবিকৃতভাবে দেখতে পাওয়া সম্ভব। বিশেষত, সহজিয়া-সাহিত্যে ওই বৌদ্ধ-প্রলেপের দরুন এই সঙ্গম-সাধনার উপর নানা রকম বৌদ্ধ পরিভাষা প্রক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সহজিয়া-সাহিত্যে এই মৈথুনকে প্রভাস্বর ও নিরাত্মাদেবীর মৈথুন, শূন্যতা ও করুণার মৈথুন, প্রজ্ঞা ও উপায়ের মৈথুন—প্রভৃতি নানান পরিভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু পরিভাষাটা যাই হোক না কেন, তার মূলে ঠিক কী আছে তা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর[৩৫০] নিম্নোক্ত উক্তি থেকেই অনুমান করা সম্ভবপর :

যোগাচারমতে যেমন কিছুই থাকে না বিজ্ঞানমাত্র থাকে, সহজমতে তেমনি কিছুই থাকে না আনন্দমাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনো বা মহাসুখ বলেন। সে সুখ স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগজনিত সুখ।

আমাদের যুক্তি অনুসারে, তন্ত্রের মতোই ওই সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিও আদিম কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস থেকেই জন্মলাভ করেছে। বস্তুত, তন্ত্রসাধনার আদি-অকৃত্রিম রূপটির সঙ্গে সহজিয়া প্রভৃতি এই সাধনসম্প্রদায়গুলির কোনো মৌলিক পার্থক্য অন্বেষণ করা অনেকাংশেই অনর্থক। ওই আদিম তন্ত্রসাধনার উপর যেমন কৃত্রিমভাবে কখনো বৈদান্তিক আবার কখনো বৌদ্ধ চিন্তাধারা অধ্যস্ত হয়েছে তেমনি কৃত্রিমভাবেই সহজসাধনার উপরও আরোপিত হয়েছে প্রধানত বৌদ্ধ ধ্যানধারণা। ফলে, সহজিয়া সাহিত্য বৌদ্ধ-ধ্যানধারণায় যেন ভরপুর। তবুও এই বৌদ্ধ-ধ্যানধারণা সহজ-সাধনার পক্ষেও বাহ্যিক ও কৃত্রিম। এর একটা প্রমাণ হলো, ওই বৌদ্ধ-ধ্যানধারণা যেমন অনায়াসে সহজ-সাধনার উপর অধ্যস্ত হয়েছে তেমনি অনায়াসেই অ-বৌদ্ধ ধ্যানধারণাও এর উপর অধ্যস্ত হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্ত সহজিয়া সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সংস্করণের কথা বলেছেন। কিংবা ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্তের বই থেকেই এ-বিষয়ে একটি আরো চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলছেন[৩১], বৌদ্ধ-সহজিয়াদের কোনো কোনো পুঁথির মতোই বৈষ্ণব-সহজিয়াদের কোনো কোনো পুঁথিতে দেখা যায় রচনাভঙ্গিটা শিবোক্ত শাস্ত্রের মতোই—অর্থাৎ, শাক্ত ও শৈবদের তন্ত্র যে-রকম শিব ও শক্তির কথোপকথনরূপে রচিত, বৈষ্ণব সহজিয়াদের কোনো কোনো পুঁথিও সেই রকমই শিব ও শক্তির কথোপকথন হিসেবেই রচিত। তাছাড়া, আনন্দ-ভৈরবে[৩২] লেখা আছে, শিব বা হর তাঁর বিভিন্ন শক্তিদের সঙ্গে কুচনীদের দেশে (অর্থাৎ, নারীপ্রধান কোচ্-ট্রাইবের দেশে) এই সহজিয়া পদ্ধতিতে সাধনা করেছিলেন :

এক এক গুণে কৈল এক এক প্রকৃতি।
হরকে ভজয়ে সবে ভাবে উপপতি॥
শক্তি জানে রসতত্ত্ব আর জানে শঙ্করে।
সহজ বস্তু আস্বাদিল কুচনি নগরে॥

আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্ত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুমান করতে পেরেছেন যে, সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ধ্যানধারণার উপর যদিও পরবর্তী কালে—এবং অতএব কৃত্রিমভাবেই—বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধ্যানধারণা

প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলো, তবুও এ-সম্প্রদায়ের আদি-অকৃত্রিম রূপটির সঙ্গে বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব কোনো ধ্যানধারণার মৌলিক এবং আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নেই। তিনি বলছেন, আমাদের দেশে বহুদিনের পুরোনো একটি সাধন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো এবং তারই উপর উত্তরকালের রকমারি ধ্যানধারণা প্রক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে পরবর্তী যুগে রকমারি সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্তের মতে যে-প্রাচীন সাধনপদ্ধতিটি আগে থাকতেই দেশে প্রচলিত ছিলো এবং যার সঙ্গে পরে বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের নানান ধ্যানধারণা মিশেছে, তা হলো একরকম গুহ্য যোগসাধনা।

তিনি[৭০৩] বলছেন, 'আমাদের দেশে এক গুহ্য সাধনপদ্ধতি প্রচলিত ছিলো। তাকেই ঘিরে বিভিন্ন সহজিয়া সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা গজিয়েছিলো। কিন্তু এই গুহ্য সাধনপদ্ধতি হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনো ধর্মেরই অন্তর্গত নয়। এ হলো যোগসাধনা—তারই সঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দু বিভিন্ন ধর্মমতের সংস্রব ঘটবার ফলে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। এই গুহ্যসাধনার প্রধানতম অঙ্গ হলো যৌন-সুখকে যোগপদ্ধতিতে আয়ত্তে এনে তাকে অতীন্দ্রিয় আনন্দে পরিণত করা। তার ফলে দেহ ও মন উভয়েরই বলবৃদ্ধি হয়। এই যোগসাধনা ও তার অঙ্গগুলির সঙ্গে শিব-শক্তিমূলক দর্শনের যোগাযোগ হয়ে হিন্দু-তন্ত্রের কেন্দ্র হয়েছে; তারই সঙ্গে উত্তর-যুগের বৌদ্ধধর্মের প্রজ্ঞা-উপায়মূলক চিন্তার যোগাযোগ হয়ে বিভিন্ন তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে—সহজিয়া সম্প্রদায় তারই অন্তর্গত; আবার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের রস ও রতিরূপে কল্পিত রাধা ও কৃষ্ণের ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওই একই যোগসাধন পদ্ধতি বাংলা দেশে বৈষ্ণব-সহজিয়া আন্দোলনে পরিণত হয়েছে' (স্বাধীন তর্জমা)।

যোগ-এর উৎস

তাহলে অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্তের এই মন্তব্য অনুসারে সহজিয়া, তথা তান্ত্রিক সাধনার অকৃত্রিম রূপটিকে খুঁজে পেতে হলে যোগসাধনার আদি-তাৎপর্য অনুসন্ধান করা দরকার। অবশ্যই উত্তরকালের পাতঞ্জলি প্রণীত যোগসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা যোগসাধনার যে-পরিচয় পাই তার সঙ্গে নর-নারীর ওই সঙ্গম—বা ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত যাকে যৌন-তৃপ্তির উদ্গতি (*sublimation*) বলে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন, তার—সম্পর্ক নেই। অতএব, যোগসাধনার এই উত্তরকালের সংস্করণকে পরীক্ষা করে

ওই সুপ্রাচীন যোগ-সাধনপদ্ধতির পরিচয় পাবার আশা করা উচিত হবে না।

অতএব, আমাদের আলোচনার এই পর্যায়ে প্রশ্ন ওঠে, উত্তরকালে যোগসাধনা বলতে যাই বোঝাক না কেন, এই সাধন-পদ্ধতির আদিরূপটি ঠিক কেমন ছিলো? কিংবা, যা একই কথা, কোথা থেকে এই সাধন-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিলো? লোকায়তর উৎস-সন্ধানেও এ-প্রশ্ন অবান্তর হবে না। কেননা, আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, গুণরত্ন বলছেন লোকায়তিকেরা গায়ে ভস্ম মাখে, তারা মিথুনাসক্ত, তারা যোগী। অর্থাৎ, আদিতে লোকায়তর সঙ্গে যোগ-এরও যে একটা সম্পর্ক থাকা সম্ভবপর, এ-ইংগিত গুণরত্নের রচনা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

বলাই বাহুল্য, যোগ-এর উৎস-সংক্রান্ত সমস্যা কঠিন ও জটিল। আমাদের পক্ষে এখানে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তোলা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। অতএব আমরা এখানে উক্ত সমস্যার শুধু সেইদিকটুকুরই আলোচনা তুলবো যেটুকু আমাদের যুক্তির বর্তমান পর্যায়ে একান্তই প্রাসঙ্গিক।

এখানে আমাদের যুক্তির পক্ষে ঠিক কোন প্রশ্ন একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক? প্রশ্নটা হলো, যোগসাধনার আদি-রূপটির সঙ্গে আদিম কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-বিশ্বাস বা জাদু-অনুষ্ঠানের সম্পর্ক অনুমান করবার মতো কোনো ইংগিত খুঁজে পাওয়া যায় কিনা? এই প্রশ্নটি এখানে না-উঠে পারে না। তার কারণ, আমাদের যুক্তি অনুসারে তান্ত্রিকাদি—তথা লোকায়তিকও—ধ্যানধারণার উৎসে রয়েছে ওই আদিম কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসই।

অবশ্যই উত্তরকালে এই তন্ত্রের উপর নানারকম অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ধ্যানধারণা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। অতএব, আমাদের এই যুক্তির সমর্থনে প্রথমে দেখানো প্রয়োজন ছিলো যে, যদিও আমরা উত্তরকালে তন্ত্রকে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিসেবে নানারূপে দেখতে পাই, তবুও তার আদি এবং অকৃত্রিম রূপটি এ-জাতীয় সম্প্রদায়বিভাগের চেয়েও অনেক প্রাচীন।

এই কথাটি প্রতিপন্ন করবার আশায় আমরা প্রধানতই বৃদ্ধসম্মতির উপর নির্ভর করেছি। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত উভয় বিদ্বানই তন্ত্রবিষয়ে সুপণ্ডিত। এবং উভয়ের রচনাতেই এই কথাটি স্বীকৃত হয়েছে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "তন্ত্রের যে কোন পুঁথি পাঠ কর না কেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, অতি পুরাতন একটা শক্তি-ধর্মের বুনিয়াদের উপর বৌদ্ধ মনীষা একটা নতুন ধর্মের প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; পরে নব্য-হিন্দুর ব্রাহ্মণ-প্রতিভা বৌদ্ধের সেই মনীষা-প্রাসাদের উপর ব্রাহ্মণ্যের লেখা গাঢ় করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন।" ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্তও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন। কেবল তিনি

সেই আদিম সাধনপদ্ধতিটিকে শক্তিধর্ম না বলে *sexo-yogic practice* আখ্যা দিচ্ছেন। তাঁর মতে এই যৌন-যোগ-সাধনাই তন্ত্রের আদিরূপ। উত্তরকালে এরই সঙ্গে হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানাপ্রকার ধ্যানধারণার সংমিশ্রণ হয়ে তন্ত্রের নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিলো।

অতএব, আমাদের যুক্তির দিক থেকে প্রশ্ন উঠলো, ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত যাকে ওই যৌন-যোগসাধন পদ্ধতি বলে বর্ণনা করছেন তার সঙ্গে আদিম কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠানের যোগাযোগ অনুমান করবার মতো কোনো ইংগিত পাওয়া যায় কি? লেখক যদি তাঁর বর্ণনায় 'যোগ' শব্দটি ব্যবহার না করতেন তাহলে অবশ্যই আমাদের সমস্যা অপেক্ষাকৃত লঘু হতো। কেননা, পঞ্চমকার-প্রাণ তন্ত্রের মৈথুনাদি যে আদিম কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-অনুষ্ঠানেরই স্মারক—এ-কথা আমরা ইতিপূর্বেই দেখাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু 'যোগ' বলতে অন্তত আধুনিক কালে আমাদের মনে প্রধানতই এমন সব ধারণা জাগে যার সঙ্গে ওই আদিম অনুষ্ঠানের সম্পর্ক কল্পনা করা আয়াস-সাধ্য।

ফলে, আমাদের কাছে ওই দ্বিতীয় প্রশ্নটি—অর্থাৎ, আধুনিক কালে যোগ বলতে যাই বোঝাক না কেন, তার আদিরূপটির সঙ্গে কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠানের সম্পর্ক ছিলো কি না,—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো।

আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে কেউকেউ ইতিপূর্বেই 'যোগ'-এর উৎস-প্রসঙ্গে এমন কোনো কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেছেন যা থেকে আমাদের অনুমানটিরই অন্তত আভাস পাওয়া যায়। তাই এ-জাতীয় সিদ্ধান্তের আলোচনা থেকেই আমাদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে।

অধ্যাপক বেলভেলকার ও রানাডে[৩৪৪] সিদ্ধান্ত করছেন, আদিতে 'যোগ' একরকমের অবৈদিক সাধন-পদ্ধতিই ছিলো। দেশের আর্য-পূর্ব আদিবাসীদের মধ্যেই এই সাধন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি রচিত হবার সময় বৈদিক আর্যরা এ-দেশের অনেকখানি অভ্যন্তর-প্রদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করেছিলো। ফলে, এই যুগ-বরাবরই তাদের সঙ্গে স্থানীয় আর্য-পূর্বদের সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। সে-ঘনিষ্ঠতার পরিণাম হিসেবেই বৈদিক আর্যদের চিন্তাচেতনায় ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে স্থানীয় আর্যপূর্বদের নানাবিধ বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান প্রবেশলাভ করে। অবশ্যই, বৈদিক আর্যদের কাছে প্রধানতম বিষয় ছিলো যাগযজ্ঞ। ফলে, আর্যপূর্বদের কাছ থেকে গৃহীত বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানাদিকেও তারা এই যাগযজ্ঞেরই অঙ্গীভূত করে নেবার চেষ্টা করেছে। সেগুলি তাই আর্যপূর্বদের বিশ্বাসাদিরই একরকম আর্য-

সংস্করণে পরিণত হয়েছিলো। এ-জাতীয় একটি পরিণতিরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো যোগ-সাধনা। অর্থাৎ, এই যোগ-সাধনা প্রকৃতপক্ষে কোনো এক প্রাক্-আর্য সাধনপদ্ধতিরই আর্য-সংস্করণ মাত্র।

যে-আর্যপূর্বদের কাছ থেকে এই যোগ-সাধনা গৃহীত হয়েছিলো তাদের সনাক্ত করবার প্রচেষ্টায় লেখকদ্বয় অনুমান করছেন, হয়তো আর্য-আক্রমণের ফলেই এরা উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিলো। কিংবা, এমনও হতে পারে যে, মানবোন্নতির সোপান ভেঙে যাযাবর জীবনের চেয়ে তারা তখনো খুব বেশি উঁচুতে উঠে আসতে পারেনি। এই দ্বিতীয় সম্ভাবনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক রানাডে আর বেলভেলকার বলছেন, আজকের দিনেও ভারতবর্ষের বুক থেকে এ-জাতীয় অনুন্নত মানবদলের পরিচয় বিলুপ্ত হয়নি : *such people are not extinct in India even up to the present day*[৩৫৫]।

আমাদের মন্তব্য হলো, অধ্যাপকদ্বয়ের এই উক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদিও দুঃখের বিষয় তাঁরা সে-গুরুত্বের প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ দেননি। কেননা, তাঁদের ওই মন্তব্য যদি অভ্রান্ত হয়, অর্থাৎ, যদি সে-জাতীয় অনুন্নত পর্যায়ে সত্যিই আমাদের দেশে কোনোকোনো মানবদল আজো টিকে থাকে, তাহলে যোগ-সাধনার আদিরূপটিকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে তাদেরই বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানকে বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হওয়াই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হওয়া উচিত। এবং এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত পদ্ধতি অনুসারে অগ্রসর হলে লেখকদ্বয় অত্যন্ত মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হবার অবকাশ পেতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা তা করেননি। তার বদলে তাঁরা ওই মূল্যবান উক্তিটির বিকল্প হিসেবে কল্পনা করেছেন, হয়তো আর্য-আক্রমণের ফলেই আলোচ্য আর্য-পূর্বরা উদ্বাস্তুর অবস্থায় পরিণত হয়েছিলো এবং অতএব তারা একরকম যাযাবর-বৃত্তিই গ্রহণ করেছিলো। এ-জাতীয় একটি বিকল্পের সম্ভাবনা লেখকদ্বয়ের কল্পনায় উদিত হচ্ছে কেন? কেননা, তাঁরা যাযাবর-বৃত্তিকেই আদি-যোগসাধকদের প্রধানতম লক্ষণ বলে চেনবার চেষ্টা করছেন। তার কারণ হয়তো এই যে, আমাদের চলতি ধারণা অনুসারে যোগীরা গৃহহীন পরিব্রাজক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যোগসাধনার আদিরূপটিকে উদ্ধার করবার জন্য ওই যাযাবর-বৃত্তির উপরই অমন ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করবার প্রয়োজন আছে কি? নিশ্চয়ই নয়। এমন কি, লেখকদ্বয়ের নিজেদের উক্তির দিক থেকেও নয়। কেননা, তাঁরা নিজেরাই বলছেন, আর্যপূর্বদের কয়েকটি অত্যদ্ভুত এবং অতি-প্রাকৃত বিশ্বাসাদিরই আর্য-সংস্করণ হিসেবে কালক্রমে যোগ-সাধনার উদ্ভব হয়েছিলো। যদি তাই হয়,—এবং ওই তথাকথিত যাযাবর-বৃত্তি নিশ্চয়ই সে-রকম কোনো অত্যদ্ভুত ব্যবহার নয়,—তাহলে যোগ-সাধনার উৎস-সন্ধানে সবচেয়ে মৌলিক

প্রশ্ন হওয়া উচিত: সেই অতি-প্রাকৃত বিশ্বাসাদির স্বরূপটা কী রকম ছিলো?

সুখের বিষয় লেখকদ্বয় গ্রন্থের অন্যত্র[৭৬] এই প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এবং সেখানে তাঁরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই আদিম জাদুবিশ্বাস ও জাদুঅনুষ্ঠানের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

অধ্যাপক বেলভেলকার এবং রানাডে বলছেন, যোগসাধনার মূল কথা হলো শরীর-মনের একরকম অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা,—সেই প্রচেষ্টার সাহায্যে শুধুই যে শরীর ও মনের নির্দিষ্ট শক্তিকে জাগিয়ে তোলায় বিশ্বাস তাই নয়, নানাপ্রকার প্রাকৃতিক শক্তিকেও আয়ত্তে আনবার কল্পনা করা হয়। যোগ-সাধকেরা মনে করেন, এ-জাতীয় শক্তিকে জাগরিত করা সত্যিই সম্ভব। প্রশ্ন ওঠে, এ-হেন বিশ্বাস এলো কোথা থেকে? লেখকদ্বয় বলছেন, বৈদিক যাগ-যজ্ঞকে বিশ্লেষণ করলেও তার পিছনে ওই একই বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব তাঁদের মতে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তর্নিহিত ওই বিশ্বাসটির বিশ্লেষণ থেকেও যোগ-সাধনার উৎস সংক্রান্ত সমস্যার উপর আলোকপাত হতে পারে। এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তর্নিহিত ওই বিশ্বাসটিকে সনাক্ত করতে গিয়ে তাঁরা বলছেন, অন্তত বহু ক্ষেত্রেই একে আদিম মানুষদের জাদু-বিশ্বাস—*sympathetic magic*—না বলে উপায় নেই। বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে যে জাদুবিশ্বাসের স্থান সত্যিই ছিলো তারই আর একটি নজির হিসেবে লেখকদ্বয় বৈদিক দীক্ষার কথা উল্লেখ করছেন; বৈদিক দীক্ষার সঙ্গে আদিম মানুষদের সমজাতীয় অনুষ্ঠানের তুলনা করলে সহজেই দেখতে পাওয়া যাবে, ওই বৈদিক অনুষ্ঠানটিতে আদিম জাদুবিশ্বাসের পরিচয় কতো স্পষ্ট!

বৈদিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে আদিম জাদুবিশ্বাসের এই পরিচয় থেকে যোগসাধনার উৎস-সংক্রান্ত সমস্যার উপর কোন্ ধরনের আলোকপাত হতে পারে? লেখকদ্বয়ের ধারণায়, বৈদিক অনুষ্ঠানের এ-জাতীয় অঙ্গ স্থানীয় আর্যপূর্বদের কাছ থেকেই গৃহীত হয়েছিলো এবং যোগসাধন পদ্ধতিও কালক্রমে এইভাবেই আর্য সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়েছে। যোগ-সাধনার মূল বিশ্বাস হলো প্রাণায়াম, আসন প্রভৃতি কয়েকটি শারীরিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে যেমন চিত্তকে সংহত ও শক্তিশালী করা সম্ভব তেমনিই চিত্তের একাগ্রতা প্রভৃতি কয়েকটি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে শারীরিক শক্তিকেও উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। শুধু তাই নয়। এইভাবে নিজের মধ্যে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে তারই সাহায্যে প্রকৃতিকেও আয়ত্তে আনা যেতে পারে। এই জাতীয় ধারণায় জাদুবিশ্বাসের প্রভাব অস্পষ্ট নয়। আদিম ধর্মাচরণ ও ধর্মবিশ্বাসের মূলে এ-জাতীয় বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত

ব্যাপক ও গভীর। পারিভাষিক অর্থে 'যোগ' শব্দটি প্রচলিত হবার আগেই ওই আদিম বিশ্বাসটি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

অবশ্যই আমরা ইতিপূর্বে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, বৈদিক সাহিত্যে যা-কিছু আদিম তাই আর্য-পূর্বদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছিলো, এ-কথা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা, বৈদিক মানুষদেরও একটা অতীত ছিলো : পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত মানবজাতির মতোই বৈদিক মানুষদের পক্ষেও আদিম পর্যায় পার হয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছে; এবং, অতএব, সেই আদিম পর্যায়ের চিন্তাচেতনার অনেক স্মারক বৈদিক সাহিত্যে টিকে থাকা নিশ্চয়ই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু তবুও যোগ-সাধনার আদিরূপ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সমস্যাটি প্রসঙ্গে অধ্যাপকদ্বয়ের উদ্ধৃত মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্ভাবনা একদিক থেকে যথেষ্ট বেশি। অর্থাৎ আদিম জাদুবিশ্বাস বা জাদু-অনুষ্ঠান থেকেই যদি যোগসাধনার উৎপত্তি হয়ে থাকে তাহলে তার পক্ষে আদিতে ওই তথাকথিত আর্য-বহির্ভূতদের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের অঙ্গ হবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত প্রবল। তার কারণ, বৈদিক মানুষদের জীবন প্রধানতই পশুপালন-নির্ভর ছিলো; তুলনায় তথাকথিত আর্য-পূর্ব বা আর্য-বহির্ভূতরা প্রধানতই কৃষি-নির্ভর জীবনযাপন করতো এবং আমরা আগেই দেখেছি, পশুপালনের চেয়ে কৃষিকাজের পক্ষেই জাদুবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি (পৃ. ৩৪৭)।

অধ্যাপক এ. ই. গফ্‌-ও অনুমান করছেন, স্থানীয় অনার্য আদি-বাসীদের কাছ থেকেই বৈদিক আর্যরা কালক্রমে যোগসাধন-পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছিলো। অতএব, যোগ-সাধনার আদিরূপকে খুঁজে পাবার আশায় লেখক[৩১১] অসভ্য অধিবাসীদের অত্যদ্ভুত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের দিকেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে চাইছেন :

> আর্যরা তখন যে-সব আধ-বুনো জাতিদের সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছিলো ও যাদের উন্নয়ন-সাধন করছিলো তাদের কাছ থেকেই আর্যরা এই যোগ-সাধন-পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছিলো। যোগ অনুসারে, সাধারণ অবস্থার তুলনায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মর্মর-মূর্তির মতো নিশ্চল করে রাখবার অভ্যাস এবং ক্যাটালেপ্সি রোগে শরীরটা যে-রকম স্থাণু ও স্পর্শকাতরহীন হয়ে যায় সে-রকম অবস্থায় পৌঁছোনোর চেষ্টাই সাধকের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই অবস্থাটিকেই সাধকেরা নির্বিকল্প সমাধিতে বিলীন হয়ে যাওয়া বলে কল্পনা করেন। মাঝে মাঝে সাধকের স্নায়ুতন্ত্র এবং মস্তিষ্কের অসুস্থ উচ্ছ্বাস দেখা দেয়, ফলে প্রত্যক্ষ ও কল্পনার মধ্যে প্রভেদ মুছে যাবার উপক্রম হয় এবং শুধুই যে যোগী নিজেকে অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী বলে মনে করেন তাই নয়, অপরেও তাঁকে এ-জাতীয় শক্তির অধিকারী বলে বিবেচনা করে।

আগন্তুক আর্যরাই যে এদেশের আধবুনো অধিবাসীদের উন্নত করে তুলেছিলো—এমনতরো একটা কল্পিত ইতিহাসের সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের 'হোয়াইট্‌-ম্যান্‌স্‌-বার্ডেন' বলে অতিকথাটির অপরূপ সাদৃশ্য সত্ত্বেও, এককালে এমন কি আমাদের বিদগ্ধ-মহলেও ওই কল্পিত ইতিহাসটি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো। সুখের বিষয় আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই সংস্কারগত মতবাদটি থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছেন। তাই অধ্যাপক গফ্‌-এর উদ্ধৃত সিদ্ধান্তের মধ্যে মূল্যবান মন্তব্যটা অন্য। তিনি বলছেন, যোগসাধনার উৎসে প্রাকৃত পর্যায়ের বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান অনুমান করবার অবকাশ রয়েছে এবং এই কথাটি প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে লেখক আদিম সংস্কৃতি-সংক্রান্ত নৃতত্ত্বমূলক গবেষণা থেকেই আলোক পাবার চেষ্টা করছেন। তিনি এখানে টেলর-এর গবেষণার নজির দেখাচ্ছেন। টেলর[৩৩৮] বলছেন, ধ্যান, উপবাস, মাদকদ্রব্য ইত্যাদির সাহায্যে একটা অসুস্থ অবস্থা সৃষ্টি করাই অনেক সময় আদিম মানুষদের কাছে একরকমের পুরুষার্থ:

> নিচু-পর্যায়ের জাতিদের মধ্যে এবং এমন কি তাদের চেয়ে অনেক উন্নত অবস্থাতেও, ধ্যান, উপবাস, মাদকদ্রব্য, উত্তেজনা এবং রোগজনিত অসুস্থ উচ্ছ্বাসের দশা প্রায়ই চোখে পড়ে এবং বিশেষত পৌরাণিক ভাববাদে বিভোর জাতিগুলি এই অবস্থাকে সম্মানের চোখে দেখে।
>
> সভ্যতার নিম্ন পর্যায়ে সর্বত্রই চোখে পড়ে, রোগ, শ্রান্তি, অসুস্থ-উত্তেজনা বা মাদকদ্রব্যের প্রভাবজনিত মায়া-দৃশ্যগুলির বাস্তবতায় সকলেই গভীরভাবে বিশ্বাসী। উপবাস, তপস্যা, মাদকদ্রব্য ইত্যাদির সাহায্যে অসুস্থ উত্তেজনা সৃষ্টি করবার একটি উদ্দেশ্য হলো, এইভাবে রোগীরা অশরীরী জীবের দর্শন পাবে এবং সেই অশরীরী জীবের কাছ থেকেই তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও এমন কি পার্থিব শক্তিও সংগ্রহ করতে পারবে।

প্রশ্ন হলো, টেলার-এর এ-জাতীয় মন্তব্য আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপর সত্যিই কতোটুকু আলোকপাত করতে পারে? আমাদের ধারণায় খুব বেশি নয়। কেননা, এ-জাতীয় বর্ণনা থেকে আমাদের মূল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। আমাদের কাছে প্রশ্নটা এই নয় যে, আদিম মানুষদের মনে ভ্রান্ত ধারণা ছিলো কি না। তার বদলে, আমাদের প্রধান প্রশ্ন হলো, আজকের দিনে আমরা যে-বিশ্বাসকে সহজেই আত্মপ্রবঞ্চনা বলে চিনতে পারি ওই আদিম মানুষেরা কেন তাকেই ও-রকম পরম গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলো? এ-কি শুধুই তাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ফল? টেলর-এর সিদ্ধান্ত মোটের উপর ওই রকমই কোনো এক কথায় পরিসমাপ্ত হয়। কেননা, ওই 'কেন'-র কোনো বৈজ্ঞানিক উত্তর তিনি অনুসন্ধান করেননি।

কিংবা, যেটুকু উত্তর তিনি দিয়েছেন তার বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তব মূল্য অত্যন্ত সংকীর্ণ।

আমাদের মন্তব্য হলো, ক্রমোন্নতির যে-পর্যায়ে এবং অতএব জীবন-সংগ্রামের যে-অবস্থায় মানুষ এককালে এ-জাতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অবলম্বন করবার চেষ্টা করেছে তারই পটভূমিতে বিচার না করলে আদিম মানুষের জীবনে এ-জাতীয় বিশ্বাসের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। অতএব, প্রাচীনদের জীবনে এ-বিশ্বাসের তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের পক্ষে সর্বপ্রথম মনে রাখা দরকার তাদের অসম্ভব আর অভাবনীয় দৈন্যের কথা: প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনবার দিক থেকে দৈন্য, আর তারই অনুপাতে প্রকৃতিকে চেনবার দৈন্য, জ্ঞানের দৈন্য। আমরা আগেই দেখেছি, আদিম মানুষদের পক্ষে এই অভাবনীয় দৈন্যের সঙ্গে যোঝবারই একটা উপায় হলো জাদু-বিশ্বাস আর জাদু-অনুষ্ঠান: জাদু-অনুষ্ঠানের দরুন বহির্জগতের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব নিশ্চয়ই পড়ে না, কিন্তু অনুষ্ঠানরত মানুষগুলির মনের উপর একটা প্রভাব পড়ে এবং তারই দরুন পরোক্ষভাবে প্রকৃতির উপরও একটা প্রভাব বিস্তৃত না হয়ে পারে না। ফলে, জাদু-বিশ্বাস ভ্রান্ত কুসংস্কার হলেও আদিম মানুষদের জীবনের বাস্তব পটভূমিতে তা জীবন-সংগ্রামের অঙ্গও। আমরা আরো দেখেছি, কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়েই এই জাদু-বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। অতএব, এখানে বিশেষ করে সেই পর্যায়টির কথাই ভেবে দেখা যাক। প্রকৃতির উৎপাদিকা-শক্তির রহস্য তখনো মানুষের কাছে অজ্ঞাত আর তাই মানুষের পক্ষে প্রকৃতির ফলপ্রসূতাকে আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টাও অনেকাংশেই সুদূর-পরাহত। অথচ, ওই অর্ধ-অসহায় মানুষকেই তার জ্ঞান ও শক্তির অনুপাতে প্রায় অসম্ভব কঠিন এই সমস্যাটির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সে চেয়েছে, প্রকৃতিকে ফলপ্রসূ হতে বাধ্য করতে। অতএব, এই সুকঠিন সমস্যাটির সমাধানের জন্য তার নিজের মধ্যে,—অন্তত তার নিজের ধারণায়,—একটা প্রচণ্ড শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। যে-পদ্ধতি ও উপকরণের সাহায্যে সে এই অতিমানবীয় শক্তিকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে—ধ্যান, উপবাস, মাদকদ্রব্য বা অসুস্থ উত্তেজনা—সেগুলিকে আমরা আধুনিক ও উন্নত জ্ঞানের মানদণ্ডে উৎকট কুসংস্কার বলে বুঝতে পারি। কিন্তু শুধুমাত্র উৎকট কুসংস্কার বলে বুঝলেই এগুলিকে ঠিকমতো চেনা হবে না। ওই অর্ধ-অসহায় মানুষদের কাছে এগুলি কোন্ ধরনের জীবনোপায় ছিলো, সে-কথাও স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার।

ধ্যান, উপবাস, মাদকদ্রব্য এবং ওই জাতীয় অন্যান্য উপায়ের সাহায্যে সাধকের মধ্যে এক অতি-মানবীয় শক্তি জাগিয়ে তোলবার আদিম কল্পনা

থেকেই যে যোগ-এর উৎপত্তি হয়েছিলো এবং এই সাধন-পদ্ধতি যে আদিতে পশুপালনজীবী বৈদিক মানুষদের পরিবর্তে কৃষিজীবী তথাকথিত আর্য-বহির্ভূত আদিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত থাকবার সম্ভাবনা—এ-কথার প্রতি অধ্যাপক বেলভেলকার ও রানাডে এবং অধ্যাপক এ. ই. গফ্ ইতিপূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু আদিম কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-অনুষ্ঠান থেকেই যে যোগ-সাধনার উৎপত্তি সে-কথা তাঁরা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেননি। অতএব আমরা সেই বিষয়টির দিকেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করবো। অবশ্য, আমরা আগেই বলেছি, যোগের উৎস-সংক্রান্ত জটিল সমস্যাটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তোলা এখানে আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তার বদলে, আমাদের যুক্তির পক্ষে যেটুকু প্রসঙ্গের অবতারণা করা প্রয়োজন আমরা শুধু সেইটুকুরই উল্লেখ করবো।

আমাদের কাছে সমস্যাটা বিশেষ করে উঠেছিলো তন্ত্রসাধনার অঙ্গ হিসেবে 'যোগ' বলতে যে বিশেষ প্রণালীটি চোখে পড়ে তাই নিয়ে। কথাটা জরুরী। বিশেষ করে এই কারণে জরুরী যে, পাতঞ্জল-যোগদর্শন প্রভৃতি পরের যুগের রচনায় যোগসাধনার যে-পরিচয় আমরা পাই তা অনেক অর্বাচীন বলেই পরের যুগের ধ্যানধারণার সংমিশ্রণে অনেক বেশি জটিল। যোগসাধনার এই জটিল ও অর্বাচীন রূপটির দিক থেকেই যোগের আদিরূপ হঠযোগ বলে নিন্দিত হয়েছে। অপরপক্ষে, তন্ত্রসাধনার অঙ্গ হিসেবে যোগ বলে যে-সাধনপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় তারই মধ্যে যোগসাধনার অপেক্ষাকৃত আদিমরূপটি টিকে থেকেছে। তাই, অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্ত তন্ত্র-প্রসঙ্গে যে-পদ্ধতিটিকে *sexo-yogic-practice* বলে বর্ণনা করছেন তারই আলোচনা থেকে যোগ-এর উৎস সংক্রান্ত সমস্যার উপর আলোকপাত হবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি।

তন্ত্রের এই যোগসাধনার মূল কথাটা কী? অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্ত[৮০৯] বলছেন :

> The most important of the secret practices is the yogic control of the sex-pleasure so as to transform it into transcendental bliss, which is at the same time conducive to the health both of the body and the mind.
>
> ওই গুহ্যসাধনাগুলির প্রধানতম অঙ্গ হলো যোগপদ্ধতিতে রতিসুখের নিরোধ, যাতে সে-রতিসুখ ঐশি আনন্দে পরিণত হয়; তারই সাহায্যে শরীর ও মনের স্বাস্থ্য (শক্তি) বৃদ্ধি পাবে।

অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্ত বলছেন, বৈষ্ণব-সহজিয়াদের গানে এবং

ছোটোবড়ো অসংখ্য রচনায় বারবার এই যোগ-পদ্ধতিরই উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, হিন্দু-তন্ত্র এবং বৌদ্ধ-তন্ত্র এবং বৌদ্ধ-গান ও দোহার সবচেয়ে মৌলিক কথা বলতে ওই যোগ-পদ্ধতিরই কথা। এরই সঙ্গে শিব-শক্তির তত্ত্ব মিলে হিন্দু-তন্ত্র, প্রজ্ঞা-উপায়ের তত্ত্ব মিলে বৌদ্ধ-তন্ত্র এবং রাধা-কৃষ্ণ বা রস-রতির তত্ত্ব মিলে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে।

যোগসাধনার,—অন্তত তান্ত্রিক যোগসাধনার—সঙ্গে রতিসাধনার বা কামসাধনার সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্ত নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। কিন্তু এ-সাধনা শুধুই যে রতি-নিরোধ বা *yogic control of the sex pleasure* বুঝিয়েছে সে-কথা মনে করাও ঠিক হবে না। এমন কি আমাদের পুঁথিপত্রের মধ্যে আজো যেখানে যোগসাধনার আদিরূপটির কথা স্মারক হিসেবে টি:ক রয়েছে সেখানে রতি-নিরোধের বিপরীত উপদেশও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, যোগশিখা উপনিষদে[৩০] বলা হয়েছে :

রজসো রেতসো যোগাদ্ রাজ-যোগ ইতি স্মৃতঃ ॥

তাহলে যোগসাধনার মধ্যে আপাত-বিরোধী দুটি দিকের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। পঞ্চমকার প্রভৃতির আলোচনায় আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, তান্ত্রিক সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো মৈথুন। অপরপক্ষে, অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্তের উদ্ধৃত উক্তিটির মধ্যে ঠিক এর বিপরীত কথা,—রতি-নিরোধের কথা,—পাওয়া যাচ্ছে। বস্তুত, প্রয়োগ ও নিরোধ,—উভয়বিধ প্রক্রিয়াই তান্ত্রিক যোগসাধনার অঙ্গ। এবং আমরা যে-হেতু আদিম কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানাদি থেকেই তন্ত্র সাধনার উৎপত্তি অনুমান করবার চেষ্টা করছি সেই-হেতু আমাদের কাছে এখানে প্রধান প্রশ্ন হবে, আদিম কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করলে তন্ত্রসাধনার বা তান্ত্রিক যোগের ওই আপাতঃ-বিরোধী দুটি দিকের উপর আলোকপাত হয় কি না।

স্যর জেম্‌স্ ফ্রেসার[৩১] ইতিপূর্বেই এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন, প্রাকৃতিক জননশক্তির কামনায় যে-আদিম বিশ্বাস রতি-প্রয়োগ হিসেবে বিকশিত হয় তাই আবার বিকল্পে রতি-নিরোধ হিসেবে বিকশিত হতে পারে :

> To the student who cares to track the devious course of the human mind in its gropings after truth, it is of some interest to observe that the same theoretical belief in the sympathetic

influence of the sexes on vegetation, which has led some peoples to indulge their passions as a means of fertilising the earth, has led others to seek the same end by directly opposite means....... If we ask why it is that similar beliefs should logically lead, among different peoples, to such opposite modes of conduct as strict chastity and more or less open debauchery, the reason, as it presents itself to the primitive mind, is perhaps not far to seek. If rude man identifies himself, in a manner, with nature; if he fails to distinguish the impulses and processes in himself from the methods which nature adopts to ensure the reproduction of plants and animals, he may leap to one of two conclusions. Either he may infer that by yielding to his appetites he will thereby assist in the multiplication of plants and animals; or he may imagine that *the vigour that he refuses to expend in reproducing his own kind, will form as it were a store of energy whereby other creatures, whether vegitable or animal, will somehow benefit in propagating their species.* Thus from the same crude philosophy, the same primitive notions of nature and life, the savage may derive by different channels a rule either of profligacy or of asceticism.

মানবমনের সত্যান্বেষণবৃত্তির বিবিধ বিকাশ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুদের পক্ষে একটি বিষয় চিত্তাকর্ষক হতে পারে: উদ্ভিদ জগতের-উপর যৌন-জীবনের অনুকরণ-জনিত প্রভাব সংক্রান্ত তত্ত্বগত যে-বিশ্বাস পৃথিবীকে ফলবতী করবার উদ্দেশ্যে কোনো মানবদলকে কামপরায়ণতার পথে নিয়ে গিয়েছে সেই বিশ্বাসই এবং সেই উদ্দেশ্যই অপর মানবদলকে একেবারে বিপরীত উপায়ের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সমজাতীয় বিশ্বাসই বিভিন্ন মানবদলকে কঠিন শুচিতা ও প্রায় প্রকাশ্য লাম্পট্যের মতো সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহারের প্রতি কেন আকৃষ্ট করলো?—এ-প্রশ্ন তুললে আদিম মানুষদের দিক থেকে কারণটা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। আদিম মানুষ যদি কোনোভাবে নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন মনে করে, যদি সে নিজের অন্তর্গত প্রবৃত্তি ও পদ্ধতির সঙ্গে প্রকৃতিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্মদানসংক্রান্ত পদ্ধতির পার্থক্য বুঝতে না পারে, তাহলে তার পক্ষে দু'রকম সিদ্ধান্তের মধ্যে যে-কোনো একটি গ্রহণ করা সম্ভব। সে হয়তো মনে করতে পারে যে, তার নিজের কাম চরিতার্থতার সাহায্যেই উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর সংখ্যাবৃদ্ধি করা যাবে; কিংবা সে কল্পনা করতে পারে নিজের বংশবৃদ্ধি নিরুদ্ধ করে যে-শক্তিক্ষয় সে বন্ধ করলো সেই সঞ্চিত-শক্তির সাহায্যেই উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাণীরা নিজেদের বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে সহায়তা লাভ করবে। অতএব, ওই একই আদিম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে,—প্রকৃতি ও জীবন সংক্রান্ত ওই একই

ধারণা থেকে—আদিম মানুষ দুটি স্বতন্ত্র পথে রিরংসা বা রতি-নিরোধ উভয় বিধিই গ্রহণ করতে পারে।

স্যর জেম্‌স্ ফ্রেসার[৩৩২] এ-বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্যের উল্লেখ করছেন। নিকরগুয়া বলে রেড-ইণ্ডিয়ানরা বীজ বোনবার সময় থেকে ফসল কাটার দিনটি পর্যন্ত সুকঠিন ব্রহ্মচর্য পালন করে ; পুরুষেরা স্ত্রীদের সঙ্গে এক বাড়িতে রাত্রি যাপন করে না, নুন বা তাড়ি খায় না—এককথায়, স্পানিস ঐতিহাসিক যেমন বলছেন, এই সময়টিতে তাদের কঠিন আত্মসংযমের পালা। আধুনিক যুগ পর্যন্ত মধ্য-আমেরিকার কোনো কোনো রেড-ইণ্ডিয়ান ট্রাইবকে শস্য বৃদ্ধির কামনায় ব্রহ্মচর্য পালন করতে দেখা গিয়েছে : কেকচি-জাতির মধ্যে বীজবপন প্রসঙ্গে পাঁচদিন এবং অন্য কোনো কোনো জাতির মধ্যে তেরো দিন কঠোর সংযম পালনের নিয়ম। হাঙ্গেরিতেও একই নিয়ম চোখে পড়ে : কৃষকদের বিশ্বাস এ-ভাবে সংযম পালন না করলে শস্য দুর্বল হবে। মধ্য-অস্ট্রেলিয়ায় কাইটিস নামের ট্রাইবের মধ্যে প্রথা হলো, শস্য-বৃদ্ধি কামনায় মোড়ল যতোদিন জাদুঅনুষ্ঠান চালাবে ততোদিন পর্যন্ত সে স্ত্রী-সংসর্গ করবে না ; তার বিশ্বাস এই নিয়মটি ভঙ্গ হলে বীজ থেকে ঘাস উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যোগসাধন-পদ্ধতি যদি আর্য-বহির্ভূতদের যাদুবিশ্বাস থেকেই গৃহীত হয়ে থাকে এবং ওই তথাকথিত আর্য-বহির্ভূতদের প্রধানতম জীবনোপায় বলতে যদি কৃষিকাজই হয়ে থাকে, তাহলে আদিম মানুষদের কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ এই নিরোধ-সাধনা স্বভাবতই যোগের উৎস-সংক্রান্ত সমস্যার উপর আলোকপাত করতে পারে।

তন্ত্রের দেহতত্ত্ব

সম্প্রদায়-বিশেষের পরিভাষায়, যোগ-সাধনার এই তান্ত্রিক সংস্করণটির নাম কায়াসাধনা[৩৩৩]। অতএব, তান্ত্রিক যোগসাধনার আলোচনা থেকে স্বভাবতই দেহতত্ত্বের আলোচনায় গিয়ে পড়তে হয়। লোকায়তর উৎস সন্ধানে এই দেহতত্ত্বের আলোচনাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লোকায়তিকের সঙ্গে তান্ত্রিক বা কাপালিকাদির যে যোগাযোগের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তার ভিত্তি বলতে শুধুমাত্র এইটুকুই নয় যে, পুরোনো পুঁথিপত্রে উভয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে। তাছাড়াও, দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকেও

লোকায়তিক ও তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার মধ্যে যোগাযোগটা অস্পষ্ট নয়। লোকায়ত বলতে বোঝায় বস্তুবাদ, দেহাত্মবাদ; অর্থাৎ কিনা, আত্মা নেই, ঈশ্বর নেই, পরকাল নেই, পরলোক নেই, দেহই হলো চরম ও সার সত্য। আবার, দেহবাদই হলো তান্ত্রিকাদি বিশ্বাসের প্রাণবস্তু,—যদিও অবশ্যই আধুনিক বিদ্বানেরা আধুনিক ধ্যানধারণার প্রভাবে ওই দেহতত্ত্বের উপর বস্তুবাদ-বিরোধী —এবং অতএব বিজাতীয়—আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা আরোপ করে বিষয়টিকে কৃত্রিমভাবে রহস্যময় করে তুলেছেন।

দেহতত্ত্বের মূল কথাটা কী? এ-বিষয়ে যোগ্যতম আলোচনা পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রচনায়। আমরা স্বভাবতই দেহতত্ত্বের মূল কথাটির বর্ণনায় তাঁরই রচনা অনুসরণ করবো। কিন্তু তার আগে আমাদের পক্ষে আদিম কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের মূল কথাটুকু মনে রাখবার প্রয়োজন আছে। কেননা, শুধুমাত্র এই বিশ্বাসটির দিক থেকেই তন্ত্রসাধনার অপরাপর দিকগুলির মতোই দেহতত্ত্বকেও বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে পারা সম্ভব। তা না হলে, তন্ত্রের দেহতত্ত্ব আমাদের কাছে এক দুর্বোধ্য ও এমনকি উদ্ভট কল্পনা বলে প্রতীয়মান হবে। বস্তুত, শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই অনুভব করেছেন[৬৬৪] যে, তাঁর অমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সত্ত্বেও আধুনিক পাঠকদের কাছে তন্ত্রের দেহতত্ত্ব 'গাঁজাখোরি' মনে হতে পারে। আমাদের যুক্তি অনুসারে তার কারণ, প্রাচীন মানুষের সঙ্গে আধুনিক মানুষের অনেক তফাত,—প্রাচীন বিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানের অনেক তফাত। এবং তান্ত্রিক দেহতত্ত্বের মধ্যে প্রাচীন বিশ্বাসের স্বাক্ষর রয়েছে বলেই আধুনিক জ্ঞানের মাপকাঠিতে তার মূল্য প্রতিপন্ন করবার বদলে আদিম মানুষদের বিশ্বাস সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্যের দিক থেকেই দেহতত্ত্বের মূল কথাটা বোঝবার আর বিচার করবার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টাটা ঠিক এর বিপরীত। তিনি আধুনিক মনের কাছ থেকে এই আদিম বিশ্বাসটিরই সমর্থন খুঁজছেন এবং যুক্তিতর্কের দিক থেকে এ-সমর্থন অসম্ভব বলেই তিনি "সদ্‌গুরুর কৃপায় সাধনার এবং আরাধনার অপূর্ব্ব রসাস্বাদনে ধন্য"[৬৬৫] হবার কথা বলছেন। বলছেন[৬৬৬], "কেবল ভাষার সাহায্যে ঠিকমত দেহতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব বুঝান যায় না; সঙ্গে সঙ্গে সাধনশীল না হইলে উহার মর্ম বুঝা কঠিন।"

পুরাণ তন্ত্রে প্রযুক্ত নানা শব্দের পারিভাষিক অর্থ আমাদের জানা নাই। তাই পুরাণ তন্ত্রের অনেক কথা এখন আমাদের গাঁজাখোরি বলিয়া মনে হয়। উহার যে কোনটাই গাঁজাখোরি নহে—উদ্ভট, অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে, তাহা দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ জানিতেন এবং বুঝাইয়া দিতে পারিতেন[৬৬৪]।

আমাদের মন্তব্য হলো, স্বয়ং পাঁচকড়িবাবু পুরোনো তন্ত্রের পারিভাষিক অর্থ যতোখানি উদ্ধার করেছেন, এবং তারই উপর নির্ভর করে তান্ত্রিক দেহতত্ত্বের যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তার মূল্য কম নয় এবং দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হিসেবে তাঁকে পাওয়াও আমাদের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমরা বলতে চাই, মহাপুরুষদের সাধনালব্ধ গূঢ় অনুভূতির দোহাই দিয়ে তাঁর পক্ষে পুরোনো তন্ত্রকে আধুনিক রুচি আর বুদ্ধির কাছে সত্যগর্ভ বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাটাই বরং এক উদ্ভট, অসম্ভব এবং আজগুবি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। "কেবল ভাষার সাহায্যে ঠিকমতো দেহতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব বুঝানো যায় না।"[৩৩৮] আমাদের যুক্তিও নিশ্চয়ই তাই। কেননা, তন্ত্র প্রাচীন। এবং প্রাচীন বলেই তন্ত্রের তত্ত্বকে বুঝতে হলে ভাষাগত অর্থনির্ণয়ের পরও প্রাচীন মানুষদের বিশ্বাস সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্যের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই দেহতত্ত্বের ভাষাগত অর্থ হিসেবে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যে-তথ্য দিয়েছেন আমরা তা বোঝবার চেষ্টা করবো প্রাচীন মানুষদের বিশ্বাস-সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্যের আলোয়।

তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি এবং তন্ত্রের দেহতত্ত্ব একই সূত্রে বাঁধা। আমরা ইতিপূর্বে কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠানের দিক থেকেই তান্ত্রিক সাধনার প্রধান অঙ্গগুলি বোঝবার চেষ্টা করেছি। অতএব, আদিম কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের দিক থেকেই আমরা তন্ত্রের দেহতত্ত্বকেও বোঝবার আশা করতে পারি। তাই, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে দেহতত্ত্বের বর্ণনা দেখবার আগে ওই কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের মূল কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন।

কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের মূল কথাটা কী? মানবীয় প্রজননের সাহায্যে বা সংস্পর্শে প্রকৃতির উৎপাদনকে আয়ত্তে আনবার পরিকল্পনা। তাহলে, এই বিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করলে প্রকৃতি সংক্রান্ত কোন্ তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়? স্বভাবতই, সে-তত্ত্ব অনুসারে মানবীয় প্রক্রিয়া আর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সমজাতীয়, উভয়ের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। কেননা, সন্তান-উৎপাদনের রহস্য আর শস্য-উৎপাদনের রহস্য যদি একই মূল রহস্যের দুটি দিক না হয় তাহলে একটির সাহায্যে অপরটিকে আয়ত্তে আনবার পরিকল্পনা কী করে সম্ভবপর হবে? তাই কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের মূলে এই তত্ত্বটি অন্তর্নিহিত থাকতে বাধ্য যে, মানবীয় ব্যাপারকে সম্যকভাবে চিনতে পারলে, বা বুঝতে পারলে, প্রকৃতির রহস্যকেও বুঝতে পারা যাবে, চিনতে পারা যাবে।

কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের মধ্যে এ-তত্ত্ব বীজাকারে আছে। এবং ঠিক এই তত্ত্বটিই নানা রকম শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, নানানভাবে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে তন্ত্রের দেহতত্ত্বে পরিণত হয়েছে। তন্ত্রের দেহতত্ত্বের মূল কথা হলো, মানবদেহকে বিশ্লেষণ করেই, মানবদেহ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেই, আমরা বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যকেও বুঝতে পারবো, কেননা মানবদেহের রহস্য আর বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য আসলে সমজাতীয়—উভয়ের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই।

দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৩৩৯] বলছেন :

"যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। অর্থাৎ, "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে"। ইহাই সকল তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই সকলে তন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্ত্রের এই ব্যাখ্যা পুরাণাদি নানা শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছে।…
তন্ত্রের প্রায় সকল সাধনা ও আরাধনার দুইটা দিক আছে ; একটা বাহিরের বা বিশ্বতত্ত্বের দিক, আর একটা ভিতরের বা দেহতত্ত্বের দিক। সকল সিদ্ধিরই বিকাশের দুইটা দিক আছে, একটা জগতের বা বাহ্য প্রকৃতির দিক, অপরটা ভিতরের বা দেহগত প্রকৃতির দিক। তুমি আত্মশক্তি বিকাশের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পার, অথবা বাহ্যশক্তি আয়ত্ত করিয়া আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পার।……তন্ত্র বলিতেছেন যে, যখন ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ড একই পদ্ধতি অনুসারে, একই রকমের উপাদানের সাহায্যে নির্মিত, উভয়ের মধ্যে একইভাবে নানা শক্তির খেলা হইতেছে, তখন দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি তোমার অনুকূল, সহায়ক হইবে।…
এ দেশের সিদ্ধগণ বলেন যে, মনুষ্যদেহের মতন পূর্ণাবয়ব যন্ত্র আর নাই ; এমন যন্ত্র আর কেহ গড়িতে পারে না, এমন যন্ত্র নির্মাণ করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব এই যন্ত্রস্থ সকল গুপ্ত এবং সুপ্ত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে অন্য কোন স্বতন্ত্র যন্ত্র ব্যতিরেকে তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।… প্রকৃতির সকল গুপ্ত শক্তি-সমূহের সহিত দেহের গুপ্ত বা সম্মূঢ় শক্তির কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কি ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বা কি ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায়, ইহা যে সাধনার ফলে জানা যায় বা আয়ত্তগত করিতে পারা যায়, তাহাই তন্ত্রসাধনা। এই তন্ত্রসাধনার মূল হইল দেহতত্ত্ব। তাই দেহের কথা লইয়া তন্ত্র আগাগোড়া ব্যস্ত"।

আধুনিক বিদ্বানেরা এ-বিষয়ে দ্বিমত হবেন না যে, তান্ত্রিক সম্প্রদায়-গুলিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মানবদেহের বৃহত্তর সংস্করণ হিসেবেই চেনবার প্রচেষ্টা

দেখা যায়। সহজিয়া সাহিত্য-প্রসঙ্গে অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্ত[৭১০] বলছেন, এ-সাহিত্যে মানবদেহের উপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপণ করা হয়, ধরে নেওয়া হয় যে, মানবদেহের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড বীজাকারে বর্তমান আছে; তান্ত্রিক যোগসাধনা-প্রসঙ্গে সর্বত্রই এই তত্ত্বের গুরুত্ব দেখা যায় এবং সহজিয়াদের বেলায় যেহেতু ওই সাধনাই হলো প্রধান কথা সেইহেতু সহজিয়া সাহিত্যে প্রধানতম তত্ত্ব বলতে এই দেহতত্ত্বই। অধ্যাপক মণীন্দ্র-মোহন বসু[৭১১] যদিও সহজিয়াদের সাধন-পদ্ধতিকে তান্ত্রিক আখ্যা দিতে সম্মত নন, তবুও তিনি অন্তত এ-কথা মানছেন যে, "শরীরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে সহজিয়ারা তন্ত্রের অনুসরণ করিয়াছেন সত্য"। "শরীরের মধ্যে বিবিধ নাড়ী-চক্রাদির কল্পনা করিয়া তান্ত্রিকগণ শরীরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সহজিয়ারা তান্ত্রিক মত অনুসরণ করিয়া তদনুরূপ নাড়ী এবং চক্রের স্থানে সরোবরাদির কল্পনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহারা মূলত তান্ত্রিকগণের নিকট ঋণী, যদিও সরোবরের কল্পনায় তাঁহারা কিছু নূতনত্বের সন্ধান দিয়াছেন"[৭১২]। আমরা যেহেতু ইতিপূর্বেই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, একই আদিম বিশ্বাস থেকে শাক্ত তন্ত্র, বৌদ্ধ তন্ত্র, সহজিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিলো সেইহেতু এই জাতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ মৌলিক তত্ত্বের মিল আছে, তাই আমাদের বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য হওয়া উচিত। ওই জাতীয় একটি মৌলিক বিষয় বলতে যে দেহতত্ত্বই, এ-কথায় আধুনিক বিদ্বানেরা দ্বিমত হবেন না। অতএব এই দেহতত্ত্ব শাক্ত বা বৌদ্ধ তন্ত্রেরই হোক, কিংবা সহজিয়া-সাহিত্যেরই হোক,—আমাদের যুক্তির দিক থেকে তা একই আদিম বিশ্বাসের বিবিধ প্রকাশমাত্র। বস্তুত, কুলার্ণব প্রভৃতি তান্ত্রিক পুঁথিতে দেহতত্ত্বের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তা উত্তরযুগের আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার সংমিশ্রণের ফলে জটিল রূপ ধারণ করেছে। অপরপক্ষে, শ্রমনিরত সরল মানুষদের মুখে লোকসঙ্গীত হিসেবে টিকে থাকবার সময় দেহতত্ত্বের কথাটাও অনেক সরল ও অকৃত্রিমভাবে থাকবার সুযোগ পেয়েছে। সহজিয়ারা বলছে,

> সকলের সার হয় আপন শরীর।
> নিজ দেহ জানিলে আপনে হবে স্থির ॥[৭১৩]

কিংবা,

> ভজনের মূল এই নর বপু দেহ।
> আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে ॥[৭১৪]

কিংবা,

আপন শরীর তত্ত্ব জানে যেই জন।
সেই ত পরম যোগী শাস্ত্রের বচন ॥[৬১৫]

ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আধুনিক মনের কাছে এ-জাতীয় বক্তব্য অত্যদ্ভুত ও এমন কি অর্থহীন বলেই প্রতীয়মান হয় এবং সন্ধ্যা-ভাষার দুরূহতাই তার একমাত্র কারণ নয়। তাই প্রশ্ন ওঠে, দেহতত্ত্বকে আমরা কী ভাবে বোঝবার চেষ্টা করবো? আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই দেহতত্ত্বের মধ্যে একটা নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিষয়টিকে আরো রহস্যময় করে তুলেছেন। অপরপক্ষে, এর মধ্যে কোনো গূঢ় সত্যের সন্ধান না করে যদি সহজ সরল অর্থেই একে গ্রহণ করা যায় তাহলে আমাদের কাছে প্রধান প্রশ্ন হবে, কোনো এককালে—বা মানবোন্নতির কোনো এক পর্যায়ে—এ-জাতীয় আপাত-অদ্ভুত ধ্যানধারণাই মানুষের কাছে চরম সত্য বলে কী করে প্রতীত হয়েছিলো? এবং আমাদের যুক্তি হলো, কৃষি-কর্মের অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক পর্যায়ের আচার-অনুষ্ঠানগুলি পরীক্ষা করলে যে-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় তারই দিক থেকে এই দেহতত্ত্বের উপর আলোকপাত হওয়া সম্ভব। কেননা এই বিশ্বাস অনুসারে, মানব-রহস্য ও প্রকৃতি-রহস্যের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই।

তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বকে পরীক্ষা করলে এই কথাটি আরো স্পষ্টভাবে বোঝবার অবকাশ হতে পারে। প্রথমত মনে রাখা প্রয়োজন, তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব একই সূত্রে বাঁধা। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৬১৬] যেমন বলছেন, "দেহতত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায় না। কারণ তন্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, জীবদেহ—বিশেষত মানবদেহ—যে-পদ্ধতি অনুসারে সৃষ্ট হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সেই একই পদ্ধতি অনুসারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবসৃষ্টির মধ্যে পদ্ধতির কোনরূপ বৈষম্য নাই।" কিংবা[৬১৭], "সৃষ্টিতত্ত্ব দেহতত্ত্বের সহিত মিলাইয়া লেখা। বিশ্বসৃষ্টি এবং মনুষ্য বা জীবদেহসৃষ্টি যে একই প্রকরণ অনুসারে হইয়া থাকে, ইহা তন্ত্রের সিদ্ধান্ত।"

যদি তাই হয়, তাহলে তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বটা কী রকম হবার কথা? শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৬১৮] বলছেন,

> "যে পদ্ধতিক্রমে নরনারীর সংযোগে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়, সেই পদ্ধতিক্রমে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে বিশ্বসংসারের উদ্ভব হইয়াছে। পুরুষের প্রভাবে নূতন জীবে আমিত্বের বোধ ফুটিয়া উঠে, দেহের

মধ্যে যাহা কতকটা স্থিতিবাচক, তাহারই সৃষ্টি হয়, আর নারীর প্রভাবে দেহের নাম ও রূপ, যাহা কিছু পরিবর্তনশীল তাহারই সৃষ্টি হয়। তাই তন্ত্র অনুমান করেন যে, মেদ, মজ্জা, অস্থি, নখ, প্রভৃতি পিতৃবীর্যে সৃষ্টি হয়; মাতৃরজে শোণিত, মাংস, চর্ম, কেশ প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়া থাকে। তেমনি বিশ্বসংসারে পুরুষপ্রকৃতির প্রেরণায় সৃষ্টির বিকাশ হয়। সৃষ্টির পূর্বে পুরুষ ও মূলাপ্রকৃতির মধ্যে একটা স্পন্দনের—কম্পনের—ভাব অনুভূত হয়। এই স্পন্দন-জন্যই পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে বিয়োগ ও মিলন ঘটে। এই মিলনের ফলে বিন্দুর সৃষ্টি বা পতন; আর সেই বিন্দুর মধ্যে সৃষ্টিপ্রকৃতির লীলা হইতে থাকে, সেই লীলার ফলেই বিশ্বসৃষ্টির বিকাশ। এই বিন্দুতে বিলাস করিয়া মহামায়া সৃষ্টি ঘটাইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম বিন্দুবিলাসিনী।...মহাকাশে যাহা স্পন্দন, নরনারীর মধ্যে তাহা কাম ও মদনের লীলা।...কাম ও মদনজন্য যেমন নতুন জীবের নাম ও রূপের বিকাশ হয়, তেমনি পুরুষপ্রকৃতির মধ্যে কাম ও মদনের স্পন্দনজন্য বিশ্বব্যাপী নাম এবং রূপের বিকাশ হইয়াছে। ইহাই হইল বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবসৃষ্টির মধ্যে সমতাবিষয়ক গোটা কয়েক মোটা কথা। তন্ত্রবিশেষে বিশ্বসৃষ্টির জন্য শিবশক্তির এবং জীবসৃষ্টির জন্য নর-নারীর মিলনের একতা পদে পদে খুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আছে।”

আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো, এইভাবে মানবীয় প্রজনন-পদ্ধতির অনুরূপ হিসেবেই বিশ্বসৃষ্টিকে বোঝবার চেষ্টা শুধুমাত্র আমাদের দেশের তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়ে থাকা মানুষদের আদিম ধ্যানধারণার যে-পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে মোটের উপর একই সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়; নানান ক্ষেত্রে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেও এই আদিম চিন্তাধারার স্মারক টিকে থেকেছে, যদিও আমাদের দেশের তান্ত্রিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ওই দেহতত্ত্ব শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে যে-রকম জটিল রূপ ধারণ করেছে সে-রকম দৃষ্টান্ত অন্যত্র সত্যিই দুর্লভ। বিশেষ করে সেই কারণেই, তন্ত্রের দেহতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের জটিলতায় পথভ্রান্ত হবার বিপদ থেকে নিজেদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আমাদের পক্ষে ওই আদিম বিশ্বাসটি সম্বন্ধে সচেতন থাকবার প্রয়োজন আছে। দুঃখের বিষয়, আধুনিক বিদ্বানেরা ঠিক এর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছেন। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকেই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখানো যায়। তন্ত্রের দেহতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের সমর্থনে সাধনলব্ধ গূঢ় অনুভূতি প্রভৃতির নজির দেখাবার পর যখন তিনি এই তত্ত্বটিরই অপেক্ষাকৃত

আদি-অকৃত্রিম রূপের সম্মুখীন হয়েছেন তখনই তিনি আধুনিক নীতিবোধ ইত্যাদির প্রভাবে পড়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষে অধীর হয়ে উঠেছেন। তন্ত্রের দেহতত্ত্বকে আধুনিক মনের পক্ষে স্বীকারযোগ্য সনাতন সত্য বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা না করে তিনি যদি প্রাচীন তন্ত্রকে প্রাচীন চেতনারই পরিচায়ক বলে গ্রহণ করতে সম্মত হতেন তাহলে সে-চেতনার প্রাকৃত রূপটির সম্মুখীন হয়ে তাঁর পক্ষে এ-ভাবে শিহরিত হবার প্রয়োজন হতো না।

> "এইখানে আর একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখিব। দেহসৃষ্টি এবং বিশ্বসৃষ্টি একই পদ্ধতিক্রমে হইয়াছে, এই সাধারণ সিদ্ধান্তটা বা generalisation বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ কামবজ্রযান নাম দিয়া একটা উপাসক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যখন পাঠানগণ এদেশে প্রথম আগমন করেন, তখন বাঙ্গালায় এই সম্প্রদায়ের সাধকদিগের বেজায় প্রাবল্য ছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই সম্প্রদায়ের প্রচলিত দুই চারিখানি তন্ত্রগ্রন্থ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। সে সকল গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে, কারণ উহা এতই কুৎসিত ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনায় পূর্ণ। তাঁহাদের মত এই যে, মনুষ্যদেহ যেমন কামের সাহায্যে সৃষ্ট বা উৎপন্ন, বিশ্বসৃষ্টিও তেমনি কামের সাহায্যে সৃষ্ট বা উৎপন্ন। কামে যেমন রেতঃস্খলন হয় এবং রজঃ ও রেতের সম্মেলনে জীবের সৃষ্টি হয়, তেমনি বিশ্বসৃষ্টি শক্তিসমন্বিত শিবলিঙ্গের রেতঃস্খলন হইতে উৎপন্ন। এই হেতু বিশ্বসৃষ্টিকে তন্ত্রে বিসৃষ্টি বা discharge বলিয়াছে। অর্থাৎ কামান্ধ বিশ্বব্যাপী আত্মা হইতে এই বিশ্বসৃষ্টি একটা স্খলন বা বিসৃষ্টি-মাত্র। এই সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকগণের মত এই যে, যেমন যুবক-যুবতী সদা রিরংসায় পূর্ণ থাকে, তেমনি বিশ্বব্যাপী শিব ও শক্তি সদাই নিত্যনব সৃষ্টির জন্য রিরংসায় পূর্ণ। তাঁহাদের নিত্যসম্মিলনে ক্ষণে-ক্ষণে বিসৃষ্টি হইতেছে, ফুটিতেছে, উঠিতেছে, ডুবিতেছে, শুকাইতেছে। বিশ্বসৃষ্টির রিরংসা এবং জীবদেহগত রিরংসার সামরস্য ঘটাইতে পারিলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। ইহারা তাই সদাই কামসাধনা করিত। ইহাদের অত্যাচারের প্রভাবে জাতিটা একেবারেই নির্বীর্য হইয়া পড়িয়াছিল। সাধনার দোহাই দিয়া ইহারা নির্লজ্জভাবে সমাজের সর্বাঙ্গে কামের প্রকট বিকাশ ঘটাইত। মন্দিরে, মঠে, দেবায়তনে, সর্বত্রই রিরংসার ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখিত।… আমার মনে হয়, জগন্নাথের শ্রীমন্দির এই কামচক্রযানীদের প্রভাবকালেই নির্মিত হইয়াছিল। বিমলার ক্ষেত্র কামচক্রযানীদের পুণ্যক্ষেত্র ছিল।…বিশ্বসৃষ্টি এবং দেহসৃষ্টির সমরসতা এই শ্রীমন্দিরেই

পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অশ্লীল ছবির মধ্যে পুরুষমাত্রেই কামযানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, নারীমাত্রেই দেবদাসী অথবা ভিক্ষুনী। মন্দিরটা আগাগোড়া বৌদ্ধ কামযানীদের principles বা মতানুসারে নির্মিত। দেশীয় ভাস্কর্য পদ্ধতির উপর সৃষ্টিতত্ত্বের অর্থবাদ পাষাণের লেখায় ফুটান আছে।"[৩৭৯]

বিমলাক্ষেত্রের ভাস্কর্য-প্রসঙ্গে এ-মন্তব্য নিশ্চয়ই লঘুমূল্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ওই কামযানকে বৌদ্ধসম্প্রদায়-মাত্র বলে বর্ণনা করে এবং অতএব বিমলাক্ষেত্রের ভাস্কর্যকে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-বিশেষেরই মতানুসারে নির্মিত বলে ব্যাখ্যা করলেই কি প্রকৃত সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়? আমরা বলতে চাই, তা যায় না। কেননা, এ-ভাস্কর্যের মূল সমস্যাটা কামসাধনার বিষয়বস্তু নিয়ে, এবং সে-বিষয়বস্তু শুধু বৌদ্ধ ধ্যানধারণারই নিজস্ব তত্ত্ব নয়, তার বদলে এক আদিম বিশ্বাস, যে-বিশ্বাসের সঙ্গে উত্তরকালে বৌদ্ধ ধ্যানধারণার সংমিশ্রণ হয়ে বৌদ্ধ তন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিলো। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই স্বীকার করছেন, 'অতি পুরাতন একটা শক্তিধর্মের বনিয়াদের উপর বৌদ্ধ মনীষা একটা নতুন ধর্মের প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, পরে নব্য-হিন্দুর ব্রাহ্মণ্য-প্রতিভা বৌদ্ধের সেই মনীষা-প্রাসাদের উপর ব্রাহ্মণ্যের লেখা গাঢ় করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন।' বিমলাক্ষেত্রে পাষাণের লেখায় ফুটানো অর্থবাদের মৌলিক তাৎপর্যটিকে খুঁজে পেতে হলে সেই আদিম বিশ্বাস—পাঁচকড়িবাবু যাকে অতি পুরাতন শক্তি-ধর্মের বনিয়াদ বলে বর্ণনা করছেন—থেকেই অগ্রসর হতে হবে। আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, এই আদিম বিশ্বাস বলতে উর্বরতা-মূলক জাদুবিশ্বাসই। তার উপর নিশ্চয়ই বৌদ্ধ এবং তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য ধ্যানধারণা আরোপিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বাসটি ঢাকা পড়েনি বা তার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়নি। ঐতিহাসিকভাবে যদিই বা এ-কথা প্রমাণিত হয় যে, কামচক্রযানী বৌদ্ধরাই বিমলাক্ষেত্রের ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলো, তাহলেও এই ভাস্কর্যকে শুধুমাত্র বৌদ্ধ বললে অতি-সারল্যের দোষ হবে। কেননা, ওই কামচক্রযান নামের বৌদ্ধ সম্প্রদায়টিকে নিছক বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলা যায় না; তার বদলে এ-হলো বৌদ্ধ কারুকার্যে-শোভিত সেই আদিম বিশ্বাসমাত্র। অর্থাৎ কিনা, এ-ক্ষেত্রে আদিম জাদুবিশ্বাসটির উপর বৌদ্ধ পরিভাষা এসে জমলেও, বৌদ্ধ ধ্যানধারণার দ্বারা মূল বিশ্বাসটির পরিবর্তন হওয়ার বদলে আদিম বিশ্বাসটির দ্বারা বৌদ্ধ-ধ্যানধারণাগুলিই জীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু তন্ত্রের উপর উত্তরকালে শুধুমাত্র বৌদ্ধ প্রলেপই পড়েনি; তন্ত্রের দেহতত্ত্বের সঙ্গে উত্তরকালের পৌরাণিক হিন্দু ধ্যানধারণার মিশ্রণের ফলও ঠিক একই রকম হতে দেখা যায়—অর্থাৎ কিনা, উক্ত

ধ্যানধারণাগুলির নিচে দেহতত্ত্বের কথাটা ঢাকা পড়বার বদলে বরং পৌরাণিক ধ্যানধারণাগুলিই দেহতত্ত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
পাতালং ভূধরা লোকা আদিত্যাদিনবগ্রহাঃ॥
নাগাশ্চ সর্ব্বদেহিনাং পিণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ।
পাদাধস্তুতলং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধং বিতলং তথা॥
জান্বনোঃ সুতলঞ্চৈব তলঞ্চ সন্ধিরন্ধ্রকে।
তলাতলং গুল্ফমধ্যে লিঙ্গমূলে রসাতলম্॥
পাতালং কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌ লক্ষয়েদ্বুধঃ।
ভূর্লোকো নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তথা হৃদি॥
স্বর্লোকঃ কণ্ঠদেশে তু মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি।
জনলোকস্তদূর্দ্ধঞ্চ তপোলোকো ললাটকে॥
সত্যলোকো মহাযোনৌ ভুবনানি চতুর্দশ।
ত্রিকোণে চ স্থিতো মেরু রুদ্রলোকে চ মন্দরঃ॥
কৈলাসো দক্ষিণে কোণে বামকোণে হিমালয়ঃ।
বিন্ধ্যো বিষ্ণুস্তদূর্দ্ধে চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ॥

এইভাবে পুরাণের ব্রহ্মাণ্ড-বর্ণনায় যেখানে যাহা ন্যস্ত হইয়াছে তাহাই যে মনুষ্যদেহে বিদ্যমান, তন্ত্র তাই দেখাইতেছেন।...কেবল তাহাই নহে। তন্ত্র ইহাও ইঙ্গিত করিতেছেন যে, পুরাণে হরগৌরীর কৃষ্ণরাধিকার যে-সব লীলা উপাখ্যানের আকারে বর্ণিত আছে, তাহা দেহগত স্ত্রীত্ব এবং পুংস্তের নানা লীলার বাহ্যিক অভিব্যঞ্জনা মাত্র। এই দেহতেই কৈলাস, এই দেহতেই হিমালয়,—এই দেহতেই বৃন্দাবন, এই দেহতেই গোবর্ধন; এই দেহাভ্যন্তরেই হরগৌরী বা কৃষ্ণরাধিকা নানা লীলানাট্য প্রকাশ করিতেছেন।[৮০] ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি॥

তান্ত্রিক দেহতত্ত্ব উত্তরকালে কীভাবে পৌরাণিকাদি চিন্তাকে আত্মসাৎ ও এমন কি পরিপাক করে নিয়েছিলো তার আলোচনা দীর্ঘতর করবার প্রয়োজন নেই। তার বদলে, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দেহতত্ত্বের বাস্তব অবদানটা কী রকম, সে-বিষয়ে আমাদের পক্ষে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে।

তন্ত্রমতে মানবদেহই ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার, সর্বসত্যের আধার। স্বভাবতই তন্ত্রে এই মানবদেহের রহস্য-উদ্ঘাটন করবার যে-উৎসাহ দেখা দিয়েছিলো তা ভারতবর্ষের আর কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দেবার কথা নয়। ফলে, প্রাচীন ভারতে এ্যানাটমি-ফিসিওলজি বিজ্ঞান বলতে যেটুকু, তাতে তান্ত্রিকদের অবদান বড়ো কম নয়। এখানে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যায়। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল[৮১] দেখাচ্ছেন, এ্যারিস্টটল্-এর

মতো চরক-ও কল্পনা করেছিলেন যে, হৃৎপিণ্ডই চেতনার কেন্দ্র; চৈতন্য যে মস্তিষ্কেরই এক স্নায়বিক ক্রিয়া এ-কথা সর্বপ্রথম তান্ত্রিকেরাই আবিষ্কার করেন। বলাই বাহুল্য, অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার আগে পর্যন্ত আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের পূর্বগামীরাও স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাননি এবং এমনকি অতি-আধুনিককালে পাভ্‌লভ্‌-আবিষ্কৃত কণ্ডিশ্যণ্ড-রিফ্লেক্স পদ্ধতির প্রয়োগ করে স্নায়ুতন্ত্র সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পাবার যে-অসীম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, আধুনিক ইউরোপের বৈজ্ঞানিক-জগৎ তার মাত্র অসম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছে[৮২]। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, স্নায়ুতন্ত্র সংক্রান্ত বাস্তব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যতোটা পাওয়া গিয়েছে তা নেহাতই সাম্প্রতিক ও এখনো অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ। কথাগুলি বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন এই কারণে যে, দেশপ্রেমের প্রেরণায় আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানে ভারতের অবদান সংক্রান্ত একটা সংস্কারগত এবং অতএব অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্ত উৎসাহ দেখা দিতে পারে। দুঃখের বিষয়, আধুনিক বিদ্বানদের[৮৩] মধ্যে অনেকের বেলাতেই এ-জাতীয় অবৈজ্ঞানিক উৎসাহ দেখা দিয়েছে, তন্ত্রের দেহতত্ত্বের মধ্যে তাঁরা আধুনিক অর্থে স্নায়ু-বিজ্ঞানের তত্ত্ব অন্বেষণ করেছেন। বিষয়টি আরো জটিল হয়েছে এই কারণে যে, আমাদের আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই আধ্যাত্মিক সাধন-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। ফলে, তন্ত্রের ষড়চক্র, কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করবার সাধনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁরা নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধান করে তন্ত্রের দেহতত্ত্বকে রহস্যময় করেছেন। তন্ত্রে বিশ্বাস নিয়ে তান্ত্রিক বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝবার সম্ভাবনা নেই; তার উপর, উত্তরকালের আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার মোহ নিয়ে তান্ত্রিক বিশ্বাসের মধ্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করলে পরিস্থিতিটি জটিলতায় আরো অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনে রাখা দরকার, তান্ত্রিক বিশ্বাস অত্যন্ত প্রাচীন; তাই প্রাচীন বিশ্বাস সংক্রান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যেই এর উপর আলোকপাত হতে পারে।

তাহলে, ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে তান্ত্রিকদের অবদান বলতে ঠিক কী? স্নায়ুতন্ত্র-বিষয়ে তান্ত্রিক সিদ্ধান্তাবলী নয়, তার বদলে মানবদেহকে জানবার ব্যাপারে তান্ত্রিকদের দৃষ্টিভঙ্গি। অতএব, আমরা এখানে তন্ত্রের নাড়ি, শিরা, চক্র, কুলকুণ্ডলিনী, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা দেবার চেষ্টা করবো না—তন্ত্রে স্নায়ুতন্ত্রকে কীভাবে বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে সে-বিষয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের[৮৪] দক্ষ আলোচনা আছে তা পাঠ করলে উৎসাহী পাঠকেরা দেখতে পাবেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে স্নায়ুতন্ত্র-বিষয়ে তান্ত্রিক ধারণাবলী কী রকম প্রাকৃত ও স্থূল। আমাদের মন্তব্য হলো, তা সত্ত্বেও ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে

তন্ত্রের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সে-গুরুত্বের প্রকৃত কারণ হলো মানবদেহের প্রতি তান্ত্রিকদের দৃষ্টিভঙ্গি। দেহোত্তর আত্মার কল্পনায় বিভোর হয়ে আমাদের দেশের বেশিরভাগ সম্প্রদায়ই মানবদেহকে অত্যন্ত তুচ্ছ করতে চেয়েছে: বিদেহ-মুক্তিই অনেক সম্প্রদায়ের কাছে পরম পুরুষার্থ। তাছাড়া, শবের সঙ্গে পরিচয় বাদ দিয়ে মানবদেহকে জানবার কোনো উপায় নেই। হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি একমাত্র যে-শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গেই শবদেহের পরিচয়, সমাজের সদরমহল এদের প্রতি শুধু ঘৃণা ও বিদ্বেষই প্রকাশ করেছে। অপরপক্ষে, তন্ত্রে শবদেহের স্পর্শকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়নি। শুধু তাই নয়; ওই হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি শ্রেণীর মানব-মানবী তন্ত্রসাধকদের কাছে সম্মানের আসন লাভ করেছে। অপরপক্ষে, শবদেহের স্পর্শকে ঘৃণার চোখে দেখতে শেখার দরুন আমাদের দেশে বিজ্ঞান-চর্চা কীভাবে বাধা পেয়েছে তার একটি অত্যন্ত সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে: "প্রথম যখন কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় তখন শবব্যবচ্ছেদ করার জন্য ছাত্রের অভাব হয়েছিলো।"[৩৮৫]

কিন্তু এই আনুষঙ্গিক মন্তব্যের সূত্র ধরে আরো বিক্ষিপ্ত না হয়ে আমাদের মূল যুক্তিতে প্রত্যাবর্তন করা যাক। আমরা দেখাবার চেষ্টা করছি, তন্ত্রের দেহতত্ত্ব আপাতত যতোই অদ্ভুত মনে হোক না কেন, তন্ত্রসাধনার অন্যান্য অঙ্গগুলির মতোই এই তত্ত্বের উপরও কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের আলোচনা আলোকপাত করতে পারে। সে-বিশ্বাসের মূল কথা হলো মানবীয় উৎপাদনের সাহায্যে প্রাকৃতিক উৎপাদনকে আয়ত্তে আনা যায়; যদি তাই হয় তাহলে মানবদেহের মধ্যেই প্রাকৃতিক রহস্যের সংক্ষিপ্তসার খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এবং এই হলো দেহতত্ত্বের মূল কথা: যা আছে দেহভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। স্বভাবতই, এই তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্বের উৎপত্তিকেও মানবীয় সন্তান উৎপত্তির অনুরূপ হিসেবেই কল্পনা করা হয়েছে: তন্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতির আদি-মৈথুন থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি।

আমাদের যুক্তি যদি ঠিক হয়,—অর্থাৎ, কৃষিকেন্দ্রিক আদিম জাদু-বিশ্বাস থেকেই যদি তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের উদ্ভব হয়ে থাকে,—তাহলে ওই সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের অনুরূপ চিন্তাধারার পরিচয় অন্যান্য কৃষিভিত্তিক সভ্যতার ক্ষেত্রেও খুঁজে পাওয়া উচিত। এবং তা পাওয়া যায়ও।

প্রাচীন চীনের চিন্তানায়কেরা[৩৮৬] সৃষ্টির সূত্রপাত হিসেবে পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের মতোই ইঅঙ (*yang*=পুরুষ) এবং ইন্ (*yin*=নারী)-এর যৌন মিলন কল্পনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়। সে যুগের চীন-চিন্তাধারাতেও মানবদেহকে ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার বলে কল্পনা করবার পরিচয় পাওয়া যায়:

he (মানব) *is described as a microcosm—a world in miniature*[৬৮৭]. ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার বলেই প্রত্যেক মানবদেহই তান্ত্রিক সম্প্রদায়গুলির কাছে ব্রহ্মাণ্ডের মতোই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় উপাদান দিয়ে সৃষ্ট। সহজিয়ারা[৬৮৮] যে রকম বলেন :

> সকল শরীরে হয় অর্ধাঙ্গ অবলা॥
> পুরুষ প্রকৃতি দুই দেহমধ্যে আছে,
>
> কিংবা,
>
> একরূপ দুই হয় ভিন্ন দেহ নয়।
> প্রকৃতি পুরুষ নাম বাহিরে দেখায়॥

সে-যুগের চীন চিন্তাধারা অনুসারেও তাই :

> In some men the *Yang* predominates ; in others the *Yin*. As in the case of Nature, so man has his seasons of spring, summer etc., and his days and nights···His great business, therefore, is to frame and fashion his life so as to live in conformity with the *Tao*, or observed order of the universe[৬৮৯].
>
> ইত্যাদি, ইত্যাদি

এই জাতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে তন্ত্রের দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও এমন কি সাধন-পদ্ধতির সাদৃশ্যও বিস্ময়কর নয় কি? সৃষ্টিতত্ত্বের দিক থেকে পলিনেসিয়ার মাওরিদের চিন্তাধারার সঙ্গেও তন্ত্রের মিল চোখে পড়ে; তাদের ধারণাতেও বিশ্বসৃষ্টির সূত্রপাত মানবীয় প্রজননের অনুরূপ পদ্ধতিতে—অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর মৈথুন থেকেই—হয়েছিলো।

> Throughout this cycle of Polynesian cosmogonic myth, one fact, not without parallel in other religions, is clear. O-te-papa, the primal barren earth or rock, represents the female principle, which is fructified and made to give birth to all things living, by the fertilising rain which falls from the super-incumbent male Tangaloa, the sky[৬৯০].

মাওরিদের এই বিশ্বাসের সঙ্গে প্রাচীন চীন ও ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য দেখে আধুনিক গবেষক বিস্ময় বোধ করছেন।

It is also noteworthy that creation is ascribed to sexual congress in cosmogonies, so diverse as the Hindu, Maori and Taoist[৬৯১].

কিন্তু আদিম পর্যায়ের উৎপাদন-পদ্ধতির দিক থেকে বিষয়টিকে বোঝাবার চেষ্টা করলে, এ-জাতীয় সাদৃশ্যের নিদর্শন দেখে বিস্ময়বোধ করবার কারণ থাকে না। বস্তুত, কৃষিবিদ্যা আবিষ্কারের ভিত্তিতেই যেহেতু মানুষ পুরোনো পৃথিবীর কয়েকটি ক্ষেত্রে সভ্যতা গড়ে তুলতে পেরেছিলো, সেইহেতু ওই প্রাচীন সভ্যতাগুলির পৌরাণিক কাহিনীর তলায় কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস-প্রসূত এ-জাতীয় কল্পনার পরিচয় পাওয়াই স্বাভাবিক। অধ্যাপক জর্জ টমসনের[৬৯২] গবেষণা অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই, এদিক থেকে প্রাচীন চীনের ওই সৃষ্টি-উপাখ্যানের সঙ্গে প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার সৃষ্টি-উপাখ্যানের কী আশ্চর্য সাদৃশ্য এবং কেন এই সাদৃশ্য! অবশ্যই, এখানে আমাদের পক্ষে প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার ওই সৃষ্টি-উপাখ্যানকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করবার অবকাশও নেই, হয়তো প্রয়োজনও নেই। তার বদলে, তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বকে বোঝবার জন্যে প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার সমজাতীয় সৃষ্টি-উপাখ্যান প্রসঙ্গে অধ্যাপক জর্জ টমসনের[৬৯৩] সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটুকু উদ্ধৃত করলেই হবে :

It still moves within the forms of primitive thought, *the evolution of the world being expressed in terms of sexual reproduction.*

অর্থাৎ, (মেসোপটেমিয়ার সৃষ্টিকাহিনীমূলক) এ-কল্পনা তখনো আদিম চিন্তাধারার কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ, কেননা এখানেও বিশ্বের বিকাশ সন্তান-উৎপাদনের উপমান হিসেবেই পরিকল্পিত।

সাংখ্য-দর্শনের উৎস

অধ্যাপক জর্জ টমসনের উপরোদ্ধৃত বর্ণনা অত্যন্ত সহজেই আমাদের সাংখ্য-দর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয় না কি? সাংখ্য-কারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ[৬৯৪] বলছেন,

যথা স্ত্রী-পুরুষসংযোগাৎ সুতোৎপত্তিস্তথা প্রধান-পুরুষসংযোগাৎ সর্গস্যোৎপত্তিঃ।

—অর্থাৎ, যথা স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে সন্তানোৎপত্তি হয় সেইরূপ প্রধান-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির উৎপত্তি হয়।

অতএব, এইভাবে তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে অগ্রসর হয়ে আমরা স্বভাবতই সাংখ্য-দর্শনের সমস্যার সম্মুখীন হই। সাংখ্য-দর্শন এলো কোথা থেকে? সাংখ্য-দর্শনের উৎপত্তি কী?

সাংখ্যের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে আধুনিক বিদ্বানেরা অনেক গবেষণা করেছেন এবং আমরা এ-বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়েছি। তাঁদের সিদ্ধান্তাদির আলোচনায় আমরা একটু পরেই প্রত্যাবর্তন করবো এবং আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, তাঁদের এই গবেষণা সত্ত্বেও সাংখ্যের উৎপত্তি-সংক্রান্ত সমস্যা আজো অনেকাংশেই অমীমাংসিত হয়ে রয়েছে। তার প্রধান কারণ, সাংখ্যের আলোচনায় আধুনিক গবেষকেরা তন্ত্রের সঙ্গে সাংখ্যের সম্পর্কের ইংগিতগুলিকে—এবং মৌলিক তত্ত্বের দিক থেকে তন্ত্রের সঙ্গে সাংখ্যের গভীর সাদৃশ্যকেও—প্রায় সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষা করে থাকেন। অথচ, এই উপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠার পরিচায়ক নয়। আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, আধুনিক গবেষকেরা যদি সাংখ্যের সঙ্গে তন্ত্রের এই সম্পর্ক ও মৌলিক সাদৃশ্যের দিককে উপেক্ষা না করতেন, তাহলে সাংখ্যের উৎস-সংক্রান্ত সমস্যা আজ আর এ-ভাবে অমীমাংসিত থাকতো না—যে-মাতৃপ্রধান চেতনার মধ্যে তন্ত্রের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যেই সাংখ্যের উৎপত্তিও আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়।

প্রথমত, আমরা এ-বিষয়ে কয়েকটি ঐতিহাসিক ইংগিতের উল্লেখ করবো। তারপর, তন্ত্র এবং সাংখ্যের মধ্যে মৌলিক তত্ত্বগত সাদৃশ্যের আলোচনা তোলা যাবে। এবং তারপর আমরা সাংখ্যের উৎস-প্রসঙ্গে আধুনিক গবেষকদের বিভিন্ন মতামতের পর্যালোচনার চেষ্টা করবো।

তন্ত্র-সাহিত্যের বর্ণনায় আধুনিক বিদ্বান লিখছেন:

> বারাহতন্ত্রে লিখিত আছে—এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ ও কপিলোক্ত অনেক উপতন্ত্র আছে। জৈমিনি, বশিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, পুলস্ত, ভার্গব, সিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ অনেক উপতন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাহাদের আর সংখ্যা করা যায় না[৬৯৫]।

উপতন্ত্র-রচক এই কপিল ঠিক কে—সে-প্রশ্নের উত্তর আমরা নিশ্চয়ই জানি না। বারাহতন্ত্রে লিখিত ওই কপিলোক্ত উপতন্ত্রই যে সাংখ্য-দর্শন,—এমনতরো কথা অনুমান করবার পক্ষে নিশ্চয়ই কোনো জোরালো যুক্তি নেই। কিন্তু এখানে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক ইংগিতকে অগ্রাহ্য করাও যুক্তিযুক্ত হবে না।

যেমন, আমরা ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখেছি যে, তান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রধানতম ক্ষেত্র বলতে বিশেষ করে বাংলা দেশই; এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[৩৯৬] সিদ্ধান্ত করছেন,

> সাংখ্যমত কপিলের মত, চিরকাল প্রবাদ। কপিলের বাড়ি পুর্বাঞ্চলে, অর্থাৎ বঙ্গবগধচেরদিগের দেশে। গঙ্গাসাগর যাইতে কপিলাশ্রম আছে, কবতক্ষের ধারে কপিল মুনির গ্রাম। কপিলবাস্তুও কপিল মুনির বাস্তু। কারণ অশ্বঘোষ বলিতেছেন, গোতমঃ কপিলো নাম মুনিধর্ম্মভৃতাং বরঃ। তাঁহারই বাস্তুতে কপিলবাস্তু নগর। বাস্তবিকও কপিলকে কেহ ঋষি বলে না। তাঁহার নাম করিতে গেলেই বলে আদিবিদ্বান। বাল্মীকী যেমন আদিকবি, তিনিও তেমনি আদিবিদ্বান। শ্বেতাশ্বতরে তাঁহাকে "পরমর্ষি" বলা হইয়াছে, কিন্তু ভাব, ভাষা ও মত দেখিলে এখানিকে নিতান্ত অল্পদিনের পুস্তক বলিয়া বোধ হয়।…সাংখ্য ও যোগের যে সকল পুস্তক আছে সবগুলিই নূতন।…কিন্তু অশ্বঘোষের লেখা ও কৌটিল্যের উক্তি দেখিয়া সাংখ্য যে খুব প্রাচীন তাহা বেশ অনুভব হয়। সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে আদিবিদ্বান কপিলের নামও নাই, গন্ধও নাই।…উপরের লেখা হইতে তিনটি কথা বুঝা যায় যে, সাংখ্যমত সকলের চেয়ে পুরাণ, উহা মানুষের করা এবং পুর্বদেশের মানুষের করা। উহা বৈদিক আর্য্যদের মত নহে, বঙ্গবগধ ও চেরজাতির কোন আদিবিদ্বানের মত।

তাহলে, শুধুই যে তন্ত্রসাহিত্যে তন্ত্র-রচক হিসেবে কপিলের নাম পাওয়া যাচ্ছে তাই নয়, প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশের দিক থেকেও তন্ত্রের এলাকা এবং সাংখ্যের এলাকা যে একই, এ-কথা অনুমান করবার অবকাশও রয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই আরো একটি ইংগিতের কথা তোলা যায়। আধুনিক বিদ্বানেরা যদিও সকলেই স্বীকার করছেন যে, সাংখ্যমত খুবই প্রাচীন, তবুও এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, সাংখ্য-দর্শনের খুব বেশি প্রাচীন পুঁথিপত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাচীনতম পুঁথি বলতে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকা, আধুনিক বিদ্বানদের[৩৯৭] অনুমান অনুসারে তার তারিখ আনুমানিক ২০০ খৃস্টাব্দ। এই সাংখ্য-কারিকার লেখক বলছেন, 'কপিলমুনি এই শাস্ত্র আসুরিকে দেন, আসুরি তা পঞ্চশিখকে দেন এবং পঞ্চশিখ দ্বারা উহা পরে বহুধা বিস্তারিত হয়'[৩৯৮]। এবং এইভাবে শিষ্যপরম্পরায় প্রাপ্ত সাংখ্যমতকেই ঈশ্বরকৃষ্ণ আখ্যায়িকা ও বিচারভাগ বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্তরূপে বিচার করলেন। কিন্তু যে-কথা বিশেষ চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয় তা হলো, ঈশ্বরকৃষ্ণ এখানে ওই সাংখ্যমত বা সাংখ্যশাস্ত্রকে সাংখ্য না বলে 'ষষ্টিতন্ত্র' নামে অভিহিত করছেন[৩৯৯]। ষষ্টিতন্ত্র বলে এই চিত্তাকর্ষক শব্দটি আধুনিক বিদ্বানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তাঁরা অনুমান করতে চাইছেন, এ হলো সাংখ্যের কোনো এক বিলুপ্ত আদি-

গ্রন্থের নাম। কিন্তু সে-অনুমানে বাধা আছে। প্রথমত, ঈশ্বরকৃষ্ণের রচনায় এমন কোনো ইংগিতই নেই যার উপর নির্ভর করে আমরা এ-কথা অনুমান করতে পারি ; বরং তাঁর রচনা থেকে অনুমান করা সঙ্গত যে, ষষ্টিতন্ত্র কোনো গ্রন্থবিশেষের নাম না হয়ে সম্প্রদায়বিশেষের ধ্যানধারণার নাম। যদি তাই হয় তাহলে সে-সম্প্রদায়ের পক্ষে ওই তন্ত্র শব্দটি তান্ত্রিক অর্থেই গৃহীত হয়েছিলো কিনা তা ভেবে দেখবার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা যায় যে, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে[১০০] সাংখ্য-বাদীরা তন্ত্রান্তরীয়াঃ বলে উল্লিখিত হয়েছেন। এবং গুণরত্ন[১০১] যে-দুটি সুপ্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থের উল্লেখ করছেন তার মধ্যে একটির নাম হলো আত্রেয়তন্ত্র। এ-গ্রন্থ অবশ্যই বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু তার নামের সঙ্গে তন্ত্রশব্দের যোগাযোগ উপেক্ষণীয় নয়।

কিন্তু ষষ্টিতন্ত্র বলে ওই নামটি নিয়ে আরো প্রশ্ন ওঠে। সাংখ্যের নাম ষষ্টিতন্ত্র কেন? আধুনিক বিদ্বানেরা[১০২] অনুমান করছেন, সাংখ্যতে ষাটটি তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাই জন্যে। কিন্তু এ-অনুমান সম্পূর্ণ কৃত্রিম। প্রথমত মনে রাখতে হবে, এ-অনুমানের পিছনে যে ভ্রান্ত ধারণা থেকে গিয়েছে, তা হলো সংখ্যা শব্দ থেকেই সাংখ্য নামের উৎপত্তি। এই ভ্রান্ত ধারণার বশেই এককালে পণ্ডিতেরা মনে করেছিলেন যে, সাংখ্য-দর্শন পিথাগোরীয়-দর্শনেরই সমগোত্রীয়। কিন্তু পিথাগোরীয়-দর্শনের সঙ্গে সাংখ্যের কোনো তত্ত্বগত সম্পর্কই নেই ; এবং সংখ্যা-নির্ণয় প্রচেষ্টা থেকেই যদি সাংখ্য নাম হয় তাহলে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের পক্ষেই সাংখ্য নাম অনেক বেশি প্রযোজ্য হওয়া উচিত ছিলো—কেননা, ওই সংখ্যা-নির্ণয় প্রচেষ্টা উক্ত দুটি দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রকট। সুখের বিষয় এইজাতীয় যুক্তির উপর নির্ভর করে আধুনিক বিদ্বানেরা[১০৩] আর সংখ্যা শব্দ থেকে সাংখ্যের উৎপত্তি অনুমান করতে চান না। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'ষষ্টিতন্ত্র' বলে নামটির ব্যাখ্যায় তাঁরা ওই ভ্রান্তির উপর নির্ভর করেই অগ্রসর হতে চান,—সাংখ্যে ষাটটি তত্ত্বের উল্লেখ আছে বলেই তার নাম ষষ্টিতন্ত্র। কিন্তু, সাংখ্যে ৬০টি তত্ত্বের উপদেশ সত্যিই নেই : প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, ১১টি ইন্দ্রিয়, ৫টি তন্মাত্র, ৫টি মহাভূত এই ২৪ এবং পুরুষ, মোট পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নিয়েই সাংখ্য দর্শন। ফলে, ৬০টি তত্ত্বের তালিকা দিয়ে ষষ্টিতন্ত্র নামটির ব্যাখ্যা খোঁজ করবার যে-সব প্রচেষ্টা করা হয়েছে সেগুলির বেলায় প্রতিটি তালিকার কথা অবধারিতভাবেই কৃত্রিম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো একটি তালিকার সঙ্গেই অপর কোনো তালিকার মিল নেই এবং প্রতিটি তালিকাকে পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে, সেগুলির মূল উপাদান হলো তালিকাকারদের উদ্ভাবনী-শক্তি[১০৪]। অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত করতে চাই যে, তত্ত্বসংখ্যা নির্ণয়ের দিক থেকে যে-রকম সাংখ্য নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না, সেই রকমই ষষ্টিতন্ত্র নামটিরও নয়। অপরপক্ষে ষষ্টিতন্ত্র নামের

পিছনে আর একরকম তাৎপর্যের আভাস পাওয়া অসম্ভব নয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (পৃ. ৩৫০) আমাদের দেশে সন্তান-দায়িনী দেবীর নাম ষষ্ঠী এবং ষষ্টিক বা ষষ্টিকা বলতে আবার ব্রীহীধান্যও বোঝায়—সেদিক থেকে ষষ্টিতন্ত্র নামটির পিছনে কৃষিভিত্তিক ধ্যানধারণার—তন্ত্রের—আভাস খুঁজে পাওয়া অসম্ভব না হতেও পারে। এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার যে, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ[১০৫] বলে সাংখ্যের পরিভাষাগুলি অবধারিতভাবেই কৃষিজীবন থেকেই সংগৃহীত। অতএব, এ-জাতীয় ইংগিত থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, যে-কৃষিভিত্তিক মাতৃপ্রধান সমাজজীবনকে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার মধ্যে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখেছি সাংখ্য-দর্শনের পিছনেও তারই স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা, যা প্রায় একই কথা, আদিতে হয়তো তন্ত্র আর সাংখ্য সমগোত্রীয় ছিলো।

সুখের বিষয়, তন্ত্রের সঙ্গে সাংখ্যের সম্পর্ক প্রসঙ্গে এ-জাতীয় ক্ষীণ ও ভঙ্গুর ইংগিতই আমাদের একমাত্র সম্বল নয়। কেননা, উভয় ধ্যানধারণার মধ্যে তত্ত্বগত মৌলিক সাদৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্যই, সে-কথা ভারতীয় দর্শনের সাধারণ পাঠ্য-পুস্তকে স্বীকৃত হয় না। অথচ, ওই সাদৃশ্যের দিকটা একটুও অস্পষ্ট নয়। সুখের বিষয়, যে-কথা পাঠ্যপুস্তকের লেখকদের চোখে পড়তে চায়নি, তা অত্যন্ত সহজেই শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের[১০৬] দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে :

> আবার সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিক কাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অবিরাম মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্মাচরণ করিলাম বলিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সেই তন্ত্রের প্রভাবে প্রায় শতযোজন দূরে, ভারতের পশ্চিমাংশে কাণফোঁড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্য উৎসব করিতেছে। সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙালা দেশের ছয় কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্য-দর্শন মনে পড়ে।

আমাদের দেশে তন্ত্রের প্রভাব যে কতো ব্যাপক, কিংবা, আমাদের দেশের আধুনিক পরিবেশে এই তন্ত্র যে কী বিকট বীভৎসতায় পরিণত হয়েছে তা

দেখাবার জন্য আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ওই মন্তব্য উদ্ধৃত করিনি। কেননা, এ-সব কথা আমরা ইতিপূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। বর্তমানে, বঙ্কিমচন্দ্রের যে-মন্তব্যের প্রতি আমরা বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে চাইছি তা হলো, এই তন্ত্রের সঙ্গে সাংখ্যের সম্পর্কের কথা। তান্ত্রিক ধ্যানধারণা বা আচার-অনুষ্ঠানের পরিচয় দেখলে বঙ্কিমচন্দ্রের সাংখ্য-দর্শন মনে পড়ে; যদিও, 'সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি' কিনা এই প্রশ্ন আমাদের পক্ষে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে।

মৌলিক তত্ত্বের দিক থেকে তন্ত্র আর সাংখ্যের সাদৃশ্য সত্যিই বিস্ময়কর। সাংখ্যের মতোই, প্রকৃতি আর পুরুষ নিয়েই তন্ত্রের তত্ত্ব, যদিও সম্প্রদায়ভেদে ওই প্রকৃতি আর পুরুষ তন্ত্রে নানান আখ্যা পেয়েছে—শিব ও শক্তি, রতি ও রস, প্রজ্ঞা ও উপায় ইত্যাদি। আবার, এই দু'য়ের মধ্যে তন্ত্র অনুসারে প্রকৃতিই প্রধান—তাই হিন্দু তান্ত্রিকেরা শাক্ত; তাই চর্যা-সঙ্গীতে চণ্ডালী, ডোম্বী, শবরী, যোগিনী, নৈরামণি, সহজসুন্দরী ইত্যাদির প্রাধান্য; তাই বৈষ্ণব-সহজিয়াদের বক্তব্য,

> পুরুষের দেহ ত্যাগ করিয়া
> প্রকৃতি স্বরূপ হবে।
> তবে হে জানিহ রাধার স্বরূপ
> হৃদয়ে দেখিতে পাবে॥
> প্রকৃতি হইলে প্রকৃতি মিলয়ে
> পুরুষ দেহতে নাই।
> আছয়ে পরেশ শোধন করিলে
> তুরিতে পারিবে ভাই॥[১০৭]

তন্ত্রের মতোই, সাংখ্য-দর্শনেও প্রকৃতিই প্রধান। পুরুষ নেহাতই অপ্রধান এবং উদাসীন। এই কারণেই, প্রাচীনদের পরিভাষায় সাংখ্য হলো প্রধান-কারণ-বাদ। প্রধান-কারণবাদ বলতে প্রাচীনেরা আবার জড়বাদ বা বস্তুবাদ বুঝতেন—আধুনিক পরিভাষায় *materialism*। স্বভাবতই, আধুনিক বিদ্বানেরা প্রকৃতি বলতে *primordial matter* বোঝেন। সেটা নিশ্চয়ই ভুল নয়; কিন্তু শুধু ওইটুকু বললে এই প্রকৃতিরই আর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা অস্পষ্ট থেকে যাবে। কেননা, প্রকৃতি বলতে সাংখ্যে শুধুমাত্র *primordial matter*-ই বোঝায় না, *female principle*-ও বোঝায়। এদিক থেকে সাংখ্য-দর্শন শুধুমাত্র জড়বাদ বা বস্তুবাদ নয়, নারীপ্রাধান্যমূলক চিন্তার পরিচায়কও।

প্রকৃতি শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে স্ত্রীলিঙ্গ। ইহার নামান্তর 'প্রধান' বা 'অব্যক্ত' স্ত্রীলিঙ্গ নয়। শব্দের লিঙ্গ দ্বারা তাহার বাচ্যবস্তুর লিঙ্গ সংস্কৃত ব্যাকরণে বুঝানো হয় না। এখানেও বাচক শব্দের লিঙ্গ খুব বড় জিনিস নয়; কিন্তু বাচ্য-বস্তুটিকে স্ত্রীরূপেই সাংখ্য কল্পনা করিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষকে মোহিত করে—যেমন নারী পুরুষকে বশ করে; প্রকৃতির ক্রিয়াও নারীর লাস্য ও হাস্য এবং হাব ও ভাবের অনুরূপ কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃতিকে কোথাও লজ্জাশীলা বধূ (কারিকা ৬/১), কোথাও নর্তকী (সূত্র ৩৬৯) রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহার ফলে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ ও সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ উভয়ই নরনারীর সম্বন্ধ ও সম্বন্ধচ্ছেদের মতো ভাবা হইয়াছে। অনাদিকাল হইতে নর ও নারীর যে লীলা জগতে চলিয়া আসিয়াছে—কবি ও দার্শনিক যাহাকে অনেক সময় সনাতন—চিরসত্য—মনে করিয়াছেন, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির লীলার বর্ণনায়ও যেন তাহাই মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সাংখ্য কাব্য নয়, দর্শন। কিন্তু দার্শনিকের ভিতর কি কবিমন থাকিতে পারে না? গ্রীক দার্শনিক প্ল্যাতোর কি ছিল না? সাংখ্যের মনে উহা স্পষ্টত উপস্থিত থাকুক বা না-থাকুক, তাহার পরবর্তী চিন্তায় অনেকক্ষেত্রে পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধটাকে নরনারীর সনাতন সম্বন্ধের রূপক রূপেই দেখা হইয়াছে। ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মত এখানে কিছু উপস্থিত করিতে না পারিলেও ইহা বোধহয় বলা যায় যে, অর্ধ-নারীশ্বর বা হরগৌরীর যে কল্পনা পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহাতে সাংখ্য দর্শনের ছায়া পড়িয়াছে। আর, বৈষ্ণব ধর্মের একটা দিকে রাধা-কৃষ্ণের যে কল্পনা পাওয়া যায়, তাহাও কি সাংখ্যের নিকট ঋণী হইতে পারে না? ভাবিবার মতো প্রশ্ন বলিয়া মনে হয়, তাই ইহাদের উল্লেখ এখানে করিলাম। ইতিহাস যদি কোনটি আগে কোনটি পরে নিশ্চিতভাবে বলিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে কে ঋণী এবং কে ঋণদাতা, এই প্রশ্নের মীমাংসা সহজেই হইয়া যাইত। কল্পনাগুলির সাদৃশ্য এত বেশি যে, কোনো একটা সাধারণ উৎস হইতে ইহারা বিভিন্ন ধারারূপে বহির্গত হইয়াছে, ইহাও অচিন্তনীয় নয়।[১০৮]

অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যের জন্য আমরা তাঁর কাছে বিশেষ ঋণী, কেননা সাংখ্যের উৎস ও বিকাশ নিয়ে বহু গবেষণা হলেও উল্লিখিত দিকটির প্রতি সাধারণত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্ধ-নারীশ্বর ও রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও অধ্যাপক ভট্টাচার্য এখানে তন্ত্রের কথা তুলছেন না, অথচ তন্ত্রের সঙ্গেই পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের দিক থেকে সাংখ্যের সাদৃশ্য সবচেয়ে প্রকট এবং আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, কৃষিকেন্দ্রিক জাদুঅনুষ্ঠান এবং জাদুবিশ্বাস থেকেই তন্ত্রের উৎস। অতএব, অধ্যাপক ভট্টাচার্য এখানে যে 'সাধারণ উৎসর' ইংগিত করছেন, আমাদের যুক্তি অনুসারে তা হলো অনুন্নত পর্যায়ের বাস্তব জীবনসংগ্রামই। আমাদের এই যুক্তিটি ব্যাখ্যা করবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হবো।

প্রথমত মনে রাখা দরকার, সাংখ্য যদিও পুরুষ-প্রকৃতির তত্ত্বের উপদেশ দিয়েছে তবুও এই দুয়ের মধ্যে প্রকৃতিই প্রধান—পুরুষ শুধু অপ্রধান নয়, উদাসীনও। এবং আমরা দেখলাম, এই প্রকৃতি বলতে শুধুই *primordial matter* বোঝায় না, *female principle*-ও বোঝায়। কথাটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আমাদের যুক্তি অনুসারে এই নারীপ্রধান ধ্যানধারণায় অনিবার্যভাবেই নারীপ্রধান সমাজ-বাস্তবের প্রতিবিম্ব অনুমান করা যায়।

তাহলে, প্রশ্ন ওঠে, সাংখ্য-দর্শনে পুরুষের স্থান ঠিক কী রকম? প্রথমত মনে রাখতে হবে, সাংখ্যের আদিরূপটি ঠিক কোথা থেকে সংগ্রহ করা যাবে, এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-মহলে বাদানুবাদ আছে। আমরা পরে সাংখ্যের উৎস সংক্রান্ত বিভিন্ন মতের আলোচনা-প্রসঙ্গে সে-প্রশ্নে প্রত্যাবর্তন করবো। আপাতত এইটুকু বলা দরকার যে, সাংখ্যের আদিরূপের পরিচয় শুধুমাত্র সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র বা এমনকি, সাংখ্য-কারিকা থেকেও সংগ্রহ করবার চেষ্টা করলে ভুল হবে। তাই, পুরুষ সম্বন্ধে সাংখ্যের তত্ত্ব এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে যেভাবে পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে সাংখ্য-দর্শনে পুরুষের স্থান বোঝা যাবে না।

উত্তরকালে, প্রধানত সাংখ্য-প্রবচন-সূত্রের প্রভাবেই, আমাদের ধারণা হয়েছে যে, সাংখ্যে পুরুষ বলতে আত্মাই বোঝায়। তাই আধুনিক লেখকেরা প্রকৃতি ও পুরুষের ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসেবে *matter* এবং *soul* এই দুটি কথা ব্যবহার করে থাকেন এবং অতি সহজেই ধরে নেওয়া হয় যে, সাংখ্য-মতে পরম-পুরুষার্থ বা মুক্তি বলতে, বুঝি এই আত্মার ত্রিতাপনাশেরই ইংগিত করা হয়েছে; এ-ধারণাও সাধারণত স্বীকৃত হয়েছে যে, মুক্তি বা ত্রিতাপনাশের পদ্ধতি হিসেবে সাংখ্য ওই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি থেকে পুরুষ বা আত্মার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করবার উপদেশ দিয়েছে। আমরা একটু পরে দেখবো, এ-জাতীয় তত্ত্ব সাংখ্য-দর্শনের উপর বেদান্তর প্রভাবেরই পরিণাম।

আপাতত কথা হলো, সাংখ্য-দর্শনের আদি-রূপ অনুসারে পুরুষ বলতে আত্মা বা *soul* বোঝায়নি। কালক্রমে অবশ্যই সাংখ্যের পুরুষ আত্মাবাচক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো; কিন্তু এখানে আমাদের আলোচনাটা সাংখ্যের আদি-রূপ নিয়ে, এবং আদি-পর্বে সাংখ্যের ওই পুরুষ বলতে আত্মা বোঝাতো না—তার বদলে পুরুষমানুষই বোঝাতো। এ-বিষয়ে অধ্যাপক বেল্‌ভেলকার ও রানাডে[৮৯] ইতিপূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থের ক্রিয়াকাণ্ড প্রসঙ্গে পুরুষ শব্দটির প্রয়োগ বিশ্লেষণ করে তাঁরা সিদ্ধান্ত করছেন:

> This clearly shows that *Purusa* originally denoted the human being with its peculiar bodily structure and not any inner or spiritual entity in dwelling therein. (In the first and second

group of our Upanisadic texts, this is almost the exclusive sense in which the term is used.)
অর্থাৎ, এ-থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আদিতে পুরুষ বলতে দেহবিশিষ্ট মানবই বুঝিয়েছে—এই দেহাভ্যন্তরের কোনো আধ্যাত্মিক সত্তা নয়। (আমাদের পর্যায়-বিভাগ অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের উপনিষদগুলিতে পুরুষ শব্দ প্রায় সর্বত্রই একমাত্র এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।)

অবশ্যই, ব্রাহ্মণ-উপনিষদাদির মতো বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই সাংখ্যের আদিরূপটির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা—এ-প্রশ্ন স্বতন্ত্র। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, আদিতে সাংখ্য বৈদিক আর্যদের মতো ছিলো না এবং আমরা পরে দেখবো, এ-বিষয়ে অধ্যাপক রিচার্ড গার্বে এবং হেন্‌রিখ্‌ জিমার প্রমুখ পাশ্চাত্যের বিদ্বানেরাও মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হবেন। এবং, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে যাঁরা বৈদিক সাহিত্যের উপরই নির্ভর করে সাংখ্যের উৎস ও বিকাশ সংক্রান্ত ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন তাঁদের সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই অসম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তা-সত্ত্বেও, আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো যে, সাংখ্যের আদিরূপটিকে পুনর্গঠন করবার উদ্দেশ্যে ওই বৈদিক সাহিত্যের ইংগিতগুলি—এবং বিশেষত বেদান্তসূত্রের উক্তিগুলিই—আমাদের কাছে অমূল্য; তার কারণ, বৈদিক চিন্তাধারার সামনে প্রধানতম প্রতিপক্ষ বলতে ছিলো সাংখ্য ধ্যানধারণা। সাংখ্য-প্রবচন-সূত্রে, এমন কি সাংখ্য-কারিকায়, সাংখ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে বৈদান্তিক চিন্তার সঙ্গে সাংখ্যের আপোষের চেষ্টাটাই প্রধান; অপরপক্ষে, উপনিষদাদি গ্রন্থের যেখানে সাংখ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে প্রধানতম চেষ্টা হলো, সাংখ্যের মূল তত্ত্বকে খণ্ডন করবার বা বৈদান্তিক তত্ত্বের চেয়ে ছোটো করে দেখাবার। তাই আদিতে সাংখ্য ভারতীয় চিন্তাধারায় অবৈদিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক হলেও ওই উপনিষদাদি গ্রন্থের মধ্যেই পূর্বপক্ষবর্ণন হিসেবে সাংখ্যের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে সাংখ্যের আদিরূপটিকে অনুমান করবার অবকাশ আছে। এ-প্রশ্নের আলোচনায় আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করবো। আপাতত আমাদের যুক্তি শুধু এইটুকুই যে, আদিতে সাংখ্যে পুরুষ অর্থে যে আত্মা বা *soul* বোঝায়নি—তার বদলে রক্তমাংসের পুরুষমানুষই বুঝিয়েছে,—অধ্যাপক বেল্‌ভেলকার ও রানাডের এই সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ সাহিত্যের স্বাক্ষরের উপর নির্ভরশীল হলেও স্বীকারযোগ্য।

অতএব, সংক্ষেপে: প্রকৃতি আর পুরুষ নিয়েই সাংখ্যের মূল তত্ত্ব। কিন্তু প্রকৃতি বলতে শুধুমাত্র *primordial matter*-ই নয়, *female principle*-ও। অপরদিকে, পুরুষ বলতে আদিতে *soul* বা আত্মা নয়; তার বদলে পুরুষমানুষই।

এই প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে প্রাধান্য কিন্তু প্রকৃতিরই এবং এইদিক থেকেই আমরা দেখাবার চেষ্টা করছি যে, সাংখ্য-দর্শনে মাতৃপ্রাধান্যমূলক চেতনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অতএব এইখানে একটি মৌলিক সমস্যা ওঠে : সাংখ্য যদি সত্যিই মাতৃপ্রাধান্যমূলক ধ্যানধারণার পরিচায়ক হয়, তাহলে তার মধ্যে পুরুষের তত্ত্ব একান্তই কী ভাবে স্থান পেতে পারে? কিংবা, পুরুষ যদি একান্তভাবেই অপ্রধান এবং উদাসীন হয় এবং প্রকৃতির তত্ত্বই যদি সাংখ্যের প্রধান তত্ত্ব হয়, তাহলে এই সাংখ্যের মধ্যে পুরুষের কথা ওঠেই বা কেন?

প্রাচীন আচার্যরাও সাংখ্যের বিরুদ্ধে যে-আপত্তি তুলেছেন তার মধ্যেও এই সমস্যাটিরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, শঙ্করাচার্য[১১০] সাংখ্য-মত খণ্ডনের যুক্তি হিসেবে বলছেন, যদিও সাংখ্যকারেরা অন্ধ ও পঙ্গুর বা লৌহ ও অয়স্কান্তের দৃষ্টান্ত দিয়ে পুরুষ আর প্রকৃতির সম্বন্ধটা ব্যাখ্যা করতে চান তবুও সে-ব্যাখ্যা স্বীকারযোগ্য হতে পারে না। শঙ্কর বলছেন, সাংখ্যবাদীরা দু'রকম দৃষ্টান্তের সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন। এক অন্ধ ও পঙ্গুর দৃষ্টান্ত : পঙ্গু প্রবৃত্তিশক্তিবিহীন হলেও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন এবং অন্ধ দৃষ্টিশক্তিবিহীন হলেও প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্ন—অতএব পঙ্গু অন্ধের উপর অধিষ্ঠিত হয়ে তাকে প্রবর্তিত করতে পারে। কিংবা, দুই : অয়স্কান্ত যেমন 'স্বয়ং অপ্রবর্তমান থাকিয়াও লৌহকে প্রবর্তিত করে, সেইরূপ পুরুষও প্রধানকে প্রবর্তিত করে।' কিন্তু, উভয় দৃষ্টান্তই বিফল :

> সে পক্ষে দোষ এই যে, প্রধানের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীন প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হয়, অথচ পুরুষের প্রবর্তকত্ব স্বীকার করা যায় না। অবশ্যই তাহা সাংখ্যের পক্ষে দোষ—স্বীকৃতহানি দোষ। বিবেচনা কর, উদাসীন পুরুষ কিরূপে প্রধানকে প্রেরণ করিবে? পঙ্গুর বাক্‌শক্তি প্রভৃতি আছে, তদ্দ্বারা সে অন্ধকে প্রেরণ করিতে পারে; কিন্তু পুরুষের এমন কোন প্রবর্তক ব্যাপার নাই, যদ্দ্বারা পুরুষ প্রধানকে কার্য্যে প্রবর্তিত (কার্যোন্মুখ) করিতে পারেন। পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তিনি চুম্বকের ন্যায় কেবলমাত্র সন্নিধানবলে প্রধানকে প্রবর্তিত করেন, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। তাঁহার সন্নিধান নিত্য—চিরকালই সমান—তদনুসারে প্রধানের প্রবৃত্তিও নিত্য ও সদা কাল সমান থাকা উচিত। দেখা যায়, চুম্বকের সন্নিধান অনিত্য। অর্থাৎ, কদাচিৎ (কখনো)। বিশেষতঃ তাহা পরিমার্জন ও ঋজুভাবে স্থাপনাদি অপেক্ষা করে। এই সকল কারণে পুরুষ ও চুম্বক উভয়ই অনুপন্যসনীয়, অর্থাৎ অযোগ্য দৃষ্টান্ত। আরও দেখো, প্রধান অচেতন ও পুরুষ উদাসীন। সে কারণে উক্ত উভয়ের সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব। সম্বন্ধ ঘটনা করায়—এমন তৃতীয় পদার্থ সাংখ্যমতে নাই।

শঙ্করাচার্যের এই যুক্তি সাংখ্যমতকে ধূলিসাৎ করে কিনা, সে-আলোচনা

স্বতন্ত্র। কিন্তু, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এখানে তিনি সাংখ্য-মতের মূল অন্তঃবিরোধটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন : "কথঞ্চোদাসীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়েৎ"—উদাসীন পুরুষ কীভাবে প্রধানকে প্রবর্ত্তন করতে পারে ?

এই অন্তঃবিরোধের কথা শুধুই যে প্রাচীন আচার্যদের চোখে পড়েছে, তাই নয়। আধুনিক বিদ্বানেরাও এ-বিষয়ে সচেতন হয়েছেন যে, সাংখ্য-দর্শনে পুরুষের স্থান রয়েছে অথচ তা থাকবার যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। অধ্যাপক রিচার্ড গার্বে[১১] লিখছেন,—যদিও, দুঃখের বিষয়, এখানে তিনি সাংখ্যর পুরুষ শব্দ ব্যবহার না করে তারই প্রতিশব্দ হিসেবে *soul* কথাটি ব্যবহার করে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বোঝবার ব্যাপারে কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন,—

> What place, however, in a system which holds such views is to be found for the soul (অর্থাৎ, পুরুষ)? Strangely enough, former scholars who made exhaustive investigations into the Samkhya system did not succeed in answering this question. They regard the soul (অর্থাৎ, পুরুষ) in this system as entirely superfluous, and hold that its founder would have shown himself much more logical if he had altogether eliminated it.
>
> যে-দর্শনের এই জাতীয় মতবাদ, সে-দর্শনে পুরুষের স্থান কী হতে পারে? বিস্ময়ের কথা হলো, ইতিপূর্বে যে বিদ্বানেরা সাংখ্য-দর্শন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেছেন তাঁরা এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাননি। তাঁদের মতে, এ-দর্শনে পুরুষের তত্ত্ব বাহুল্য মাত্র এবং তাঁরা বলেন এ-দর্শনের প্রবর্তক যদি ওই পুরুষের কথা একেবারেই বাদ দিতেন তাহলে তিনি অনেক সুসঙ্গত কাজ করতেন।

অধ্যাপক গার্বে নিজে কীভাবে সাংখ্য-দর্শনে ওই পুরুষের স্থানকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন, সে-প্রশ্ন অবশ্যই স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁর উক্তি থেকে এটুকু নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, ওই সাংখ্য-দর্শনে পুরুষের কোনো স্থান থাকা যুক্তিযুক্ত নয়, অথচ তা রয়েছে। আমরা দেখাতে চাইছি যে, এইটিই হলো সাংখ্যের সবচেয়ে মূল আত্মবিরোধ।

এই জাতীয় আত্মবিরোধের ব্যাখ্যা কী ? আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, মাতৃপ্রধান সমাজ-বাস্তবের মধ্যেই এমন এক স্वবিরোধ লুকিয়ে রয়েছে যা ওই মাতৃপ্রধান সমাজের প্রতিবিম্ব নারীপ্রধান দর্শনের মধ্যে এইভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব আমরা, আমাদের পদ্ধতি অনুসারে, সাংখ্য-দর্শনের এই বৈশিষ্ট্যটিকে বোঝবার আশায় মাতৃপ্রধান সমাজ-বাস্তবের আলোচনায় ফিরে যাবো।

আসাম-অঞ্চলে খাসিদের মধ্যে আজো মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থা অনেকাংশেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

> Their social organization presents one of the most perfect examples still surviving of matriarchal institutions, carried out with a logic and thoroughness which, to those accustomed to regard the status and authority of the father as the foundation of society, are exceedingly remarkable. Not only is the mother the head and source and only bond of union of the family; in the most primitive parts of the hills, the Synteng country, she is the only owner of real property, and through her alone is inheritance transmitted. The father has no kinship with his children, who belong to their mother's clan.[১১২]
>
> এবং, অতএব—
>
> The Khasis have a saying, '*From the Woman sprang the clan.*' This does not leave much scope for the man. As a husband he is a stranger to his wife's people, who *refer to him curtly as a 'begetter.'*[১১৩]

অর্থাৎ, খাসিদের সমাজসংগঠন হলো, আজো মাতৃপ্রধান ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকবার একটি প্রায় নিখুঁত দৃষ্টান্ত; এ-ব্যবস্থা এতো যুক্তিযুক্তভাবে ও ভালো করে পালন করা হয় যে, যাঁরা পিতার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিকেই সমাজের ভিত্তি বলে চিন্তা করতে অভ্যস্ত তাঁদের কাছে বিস্ময়কর বোধ হবে। শুধুই যে পারিবারিক ক্ষেত্রে মাতাই প্রধান ও একমাত্র বন্ধন তাই নয়, সিণ্টেঙ প্রদেশের মতো সবচেয়ে আদিম পার্বত্য অঞ্চলে সম্পত্তিতে প্রকৃত অধিকার শুধু মায়েরই এবং এই মাতৃত্বসূত্রেই উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হয়। পিতার সঙ্গে সন্তানদের জ্ঞাতিসম্বন্ধ নেই; সন্তানেরা মাতৃগোত্রান্তর্গত।

এবং অতএব,

খাসিদের মধ্যে প্রবাদ আছে, 'নারী থেকেই ক্লানের (গোত্রান্তর্গত সকলের) উদ্ভব'। ফলে, এ-ব্যবস্থায় পুরুষদের ভূমিকা বলতে খুব বেশি কিছু থাকবার কথা নয়। স্বামী হিসেবে স্ত্রীর আত্মীয়দের কাছে সে আগন্তুক অনাত্মীয় মাত্র। স্ত্রীর আত্মীয়রা তাকে তাচ্ছিল্যভরে 'জন্মদাতা' বলে উল্লেখ করে।

অতএব, মাতৃপ্রধান সমাজে পুরুষের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই সমাজে একদিকে পুরুষ জন্মদাতা

বলে স্বীকৃত। এটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—নারীর সঙ্গে পুরুষের মিলন ঘটলে পরই সন্তানজন্ম সম্ভব হয়। আবার অপরদিকে কিন্তু এই পুরুষের সঙ্গে সন্তানদের কোনো আত্মীয়তা নেই; কেননা, সন্তানেরা মাতৃবংশের অন্তর্গত—তাদের জন্মদাতা পিতা তাদের কাছে স্বতন্ত্র গোত্রান্তর্গত আগন্তুক ব্যক্তিমাত্র। মাতৃপ্রধান সমাজে এটাও সমান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই।

আমাদের যুক্তি হলো, সাংখ্য-দর্শনে পুরুষের ভূমিকাটিকে কেন্দ্র করে যে-অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজের পুরুষের ভূমিকাসংক্রান্ত ওই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিবিম্ব অনুমান করা যায়।

সাংখ্য একদিকে বলছে, প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের মিলনের দরুনই সৃষ্টি: "যথা স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে সন্তান-উৎপত্তি হয় সেইরূপ প্রধান-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির উৎপত্তি হয়।" আবার অপরদিকে সাংখ্য বলছে, প্রকৃতিই প্রধান—পুরুষ নেহাতই অপ্রধান এবং উদাসীন। এই দ্বিবিধ মনোভাব কী করে একইসঙ্গে থাকতে পারে তা বুঝতে আমাদের পক্ষে অসুবিধে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনেই যদি সৃষ্টি সম্ভব হয় তাহলে তা সত্ত্বেও পুরুষ কেন এতোখানি গৌণ হয়ে যাবে? কিংবা, পুরুষ যদি সত্যিই অমন একান্তভাবে অপ্রধান ও উদাসীন হয় তাহলে সৃষ্টিব্যাপারে তার একান্তই কোনো ভূমিকা কী করে থাকতে পারে? প্রাচীন আচার্যরা তাঁদের নিজেদের পরিভাষায় সাংখ্যের বিরুদ্ধে এই আপত্তিই তুলেছেন। তাঁরা দেখাচ্ছেন অন্ধ-পঙ্গু বা অয়স্কান্ত-লৌহের দৃষ্টান্ত দিয়েও সাংখ্য এই মূল অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে না। এবং আধুনিক গবেষকদের মধ্যেও অনেকেই বলছেন যে, সাংখ্য-দর্শন প্রবর্তক ওই পুরুষের কথাটুকু বাদ দিলেই অনেক সুসঙ্গত মনোভাবের পরিচয় দিতেন। আমাদের যুক্তি হলো, সাংখ্য-ধ্যানধারণার মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজের প্রতিবিম্ব খুঁজে পাওয়া যায় বলেই সে-সমাজে পুরুষের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব তাই সাংখ্য-দর্শনে পুরুষের তত্ত্বকে কেন্দ্র করে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, মাতৃপ্রধান সমাজের মনোভাবটির দিক থেকে সাংখ্য-দর্শনের এই উভয় তত্ত্বেরই একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। এ-সমাজের মানুষ একদিকে দেখছে সন্তান-উৎপাদন ব্যাপারে পিতার একটা ভূমিকা রয়েছে, আবার অপর-দিকে তারা দেখছে যে, তা সত্ত্বেও পিতার সঙ্গে সন্তানের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তারা ভাবছে, নারী থেকেই গোত্রের উৎপত্তি,—*From the Woman sprang the clan*; আবার অপরদিকে, অবজ্ঞাসূচকভাবে হলেও, পিতাকে—পুরুষকে—'জন্মদাতা' বলে স্বীকার করতে তারা বাধ্য হচ্ছে: *refer to him curtly as a begetter.*

এই মনোভাব নিয়ে এবং দেহভাণ্ডের অনুরূপ হিসেবেই যদি ব্রহ্মাণ্ডকে বোঝবার চেষ্টা করা যায়, তাহলে? তাহলে একদিকে যে-রকম বলতে হয়

স্বষ্টির জন্য প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের একটা মিলন প্রয়োজন আবার অপরদিকে তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে, প্রকৃতিই প্রধান, প্রকৃতিই স্বষ্টির আদিকারণ এবং পুরুষ শুধুই অপ্রধান নয়, উদাসীন, নির্লিপ্ত ও নিশ্চেষ্ট।

প্রশ্ন উঠতে পারে, দার্শনিক চিন্তাকে সমাজবাস্তবের এতোখানি হুবহু প্রতিবিম্ব মনে করবার চেষ্টাটা যান্ত্রিক, অতএব অবৈজ্ঞানিক, মনোভাবের পরিচায়ক কিনা ? উত্তরে বলবো, দার্শনিক চিন্তার কাঠামোটা যে কতো গভীর-ভাবে সমাজবাস্তব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্বয়ং মার্ক্স্-এর[১১৪] রচনাতেই দেখতে পাওয়া যায় :

> ...what would old Hegel say in the next world if he heard that the *general* (*Allgemeine*) in German and Norse means nothing but the common land (*Gemeinland*), and the *particular*, *Sundre*, *Besondere*, nothing but the separate property divided off from the common land? Here are the logical categories coming damn well out of "our intercourse" after all.

মার্ক্স্-এর এ-উক্তি আমাদের বৈশেষিক দর্শনের সামান্য ও বিশেষ সংক্রান্ত সমস্যার উপর আলোকপাত করে কিনা, গবেষকেরা অবশ্যই তার আলোচনা তুলবেন। বর্তমানে আমাদের যুক্তি শুধু এইটুকু যে, হেগেল-দর্শনের সামান্য ও বিশেষ-এর মতো জটিল দার্শনিক 'পদার্থে'র মধ্যে যদি এইভাবে সমাজ-বাস্তব প্রতিফলিত হয়ে থাকে তাহলে সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতির প্রাধান্য ও পুরুষের ঔদাসীন্যের মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজের প্রতিবিম্ব অন্বেষণ করা অন্তত আপাত-অযৌক্তিক মনোভাবের পরিচায়ক হবে না।

পুরুষের ভূমিকা সংক্রান্ত সাংখ্যের এই অন্তর্বিরোধ থেকে তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাও নিশ্চয়ই মুক্ত নয়। কেননা, প্রকৃতি আর পুরুষের তত্ত্ব নিয়েই তন্ত্র, এবং তন্ত্রেও প্রকৃতির প্রাধান্য এমনই প্রকট এবং তার পাশে পুরুষের ভূমিকা এতোই গৌণ যে, আপাত-দৃষ্টিতে এমন কি এ-কথাও মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, নেহাতই কৃত্রিম ও অসংলগ্নভাবে তন্ত্রে ওই পুরুষের কথা প্রবেশলাভ করেছে। তন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকটির কথা উত্থাপন করিনি। তার কারণ আমাদের মনে হয়েছিলো, সাংখ্য-প্রসঙ্গেই এই দিকটির আলোচনা তোলা যুক্তিযুক্ত হবে। মূল তত্ত্বের দিক থেকে সাংখ্যের সঙ্গে তন্ত্রের সাদৃশ্য সত্যিই বিস্ময়কর !

বস্তুত, এই কারণেই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃত মন্তব্যটি থেকে শুরু করতে চেয়েছি। কেননা, তন্ত্রের সঙ্গে সাংখ্যের মৌলিক সাদৃশ্য সত্যিই বিস্ময়কর

হলেও আরো বিস্ময়কর ঘটনা হলো আধুনিক বিদ্বানেরা সাংখ্যের উৎপত্তি সংক্রান্ত বহু আলোচনা করলেও এ-বিষয়ে তন্ত্রের সাক্ষ্যকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করে থাকেন। ফলে সাংখ্যের উৎস সংক্রান্ত নানারকম মতবাদ উদ্ভাবন করে তাঁরা যেন তারই গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে যান, সমস্যাটি মোটের উপর রহস্যময়ই হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, তন্ত্রের সঙ্গে সাংখ্যের গভীর সাদৃশ্যের কথা মনে রাখলে এবং তন্ত্রের উৎস-প্রসঙ্গে আমাদের যুক্তি স্বীকৃত হলে সাংখ্যের মতো ওই আপাত-বিস্ময়কর দার্শনিক চিন্তার উৎস আমাদের কাছে আর রহস্যময় হয়ে থাকে না।

আধুনিক গবেষকেরা সাংখ্যের উৎস-প্রসঙ্গে যে মতবাদ রচনা করেছেন আমরা একটু পরেই তার আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করবো। তার আগে সাংখ্যের সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্কটাকে আরো একটু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা দরকার।

প্রথমত, বঙ্কিমচন্দ্র যদিও সাংখ্যের সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্কটি দেখতে পেয়েছেন তবুও তাঁর মতে এ-সম্পর্কের ব্যাখ্যা হলো, তন্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি সাংখ্য-দর্শনের কাছ থেকেই পাওয়া : "সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি"। বস্তুত শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই নন, ইউরোপীয় বিদ্বানেরাও শাক্ত ধ্যানধারণার ব্যাখ্যায় এ-জাতীয় একটা সহজ সমাধানকে গ্রহণ করাই নিরাপদ বোধ করেছেন। যেমন শাক্ত ধ্যানধারণা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> It has been supplied with a philosophical justification, being a popularised version of the Samkhya principle of the union of the soul of the universe (*purusa*) with the primordial essense (*prakriti*).[১১৫]
>
> অর্থাৎ, সংক্ষেপে, এই শাক্ত মতবাদ সাংখ্য-দর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের এক জনপ্রিয় সংস্করণ হিসেবে দার্শনিক ব্যাখ্যার মর্যাদাও লাভ করেছে।

আমাদের মন্তব্য হলো, আদি-অকৃত্রিম সাংখ্যের পুরুষকে *soul of the universe* আখ্যা দেওয়ার মতোই শাক্ত মতবাদকে সাংখ্যের জনপ্রিয় সংস্করণ বলে কল্পনা করাটাও ঐতিহাসিক বোধের পরিচায়ক নয়। আদিতে সাংখ্যের পুরুষ যে আত্মা বা *soul* বোঝায়নি, এ-বিষয়ে কিছু তথ্য আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি; যদিও কীভাবে এই পুরুষই ঔপনিষদিক চিন্তার প্রভাবে ক্রমশ আত্মা—এমনকি, উপনিষদের নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মাই—বোঝাতে শুরু করেছে সে-আলোচনা এখনো আমাদের পক্ষে বাকি আছে। কিন্তু তন্ত্রের ওই প্রকৃতি আর পুরুষের তত্ত্বের জন্য যে কোনো দার্শনিক সম্প্রদায়ের কাছেই ঋণী হবার প্রয়োজন নেই—অতএব সাংখ্যের কাছেও নয়—সে-কথা আমরা বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছি। কেননা, আমরা দেখেছি যে, কৃষিকেন্দ্রিক

জাদুবিশ্বাস থেকেই তন্ত্রের শুধু মৌলিক তত্ত্বগুলিই নয়—এমনকি, আচার-অনুষ্ঠানের দিকগুলিও—অনিবার্যভাবেই জন্মলাভ করেছে। এখানে আমরা তাছাড়াও আর একটি যুক্তির অবতারণা করতে চাই। যদিই বা ধরে নেওয়া যায় যে, তন্ত্রের ওই পুরুষ-প্রকৃতির তত্ত্ব সাংখ্যের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছে, তাহলেও এইপ্রসঙ্গে আরো একটি মৌলিক সমস্যা বাকি থাকে : সাংখ্যের ওই পুরুষ-প্রকৃতির তত্ত্বই বা এলো কোথা থেকে? কপিল নামের জনৈক আদি-বিদ্বানের মস্তিষ্ক থেকে? কিন্তু কপিল যে সত্যিই কে ছিলেন তা আমাদের জানা নেই। এমন কি, কপিল বলতে আদ্যিকালের কোনো এক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাতো কি না তাও সন্দেহের কথা। অপরপক্ষে, ওই প্রকৃতি আর পুরুষের নারীবাচকত্ব আর পুরুষবাচকত্বের প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব দিলে এ-কথাই সন্দেহ করবার সুযোগ থাকে যে, সাংখ্যের মতো ওই আপাত-বিস্ময়কর দার্শনিক চিন্তাধারা একজন ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্ক-প্রসূত না হওয়াই স্বাভাবিক —কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পর্যায়ে এ-জাতীয় কল্পনার অন্তত মূল কাঠামোটুকু সার্বভৌম এবং অনিবার্যও। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, প্রাচীন চীন এবং প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়াতেও বিশ্বসৃষ্টিকে নর-নারীর মিলন-প্রসূত হিসেবেই বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছিলো এবং অধ্যাপক জর্জ টম্সন দেখিয়েছেন সে-চিন্তার বীজ আদিম সমাজের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। দুঃখের বিষয় আদিম সমাজের চিন্তাচেতনার দিক থেকে সাংখ্যের উৎসকে বোঝবার চেষ্টা আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে দেখা যায় না। ফলে সাংখ্যের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে তাঁরা যে-মতবাদগুলি প্রণয়ন করেছেন সেগুলি ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা এবার সংক্ষেপে সেই মতবাদগুলি বিচার করবো।

সাংখ্যের উৎস-প্রসঙ্গে আধুনিক বিদ্বানেরা যে-সব মতবাদ রচনা করেছেন তা নিয়ে আলোচনা তোলবার আগে আমাদের পক্ষে বলে নেওয়া প্রয়োজন, এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য বলতে ঠিক কী পাওয়া যায়, কিংবা ঠিক কোন্ ধরনের মালমশলার সাহায্যে আধুনিক বিদ্বানেরা তাঁদের ওই মতবাদগুলিকে নির্মাণ করবার চেষ্টা করে থাকেন।

প্রথমত, মনে রাখা দরকার, সাংখ্যদর্শনের নিজস্ব পুঁথিপত্র বলতে সত্যিই যৎসামান্য এবং সাংখ্যের প্রাচীনত্বের তুলনায় এই পুঁথিগুলি নেহাতই অর্বাচীন। মূল পুঁথি বলতে দুটি। এক : ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা—তাতে মোট ৭২টি শ্লোক পাওয়া যায়। দুই : সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র। যদিও এই সাংখ্য-প্রবচন-সূত্রকে কপিলের নিজস্ব রচনা বলেই উল্লেখ করা হয় তবুও আধুনিক বিদ্বানেরা[১১৩] নিঃসন্দেহেই প্রমাণ করেছেন যে, এই সূত্রগুলি নেহাতই

অর্বাচীন—আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত। তুলনায়, ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা নিশ্চয়ই প্রাচীনতর—আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দীর রচনা।

ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকার উপর দুটি খুব নামকরা ভাষ্য আছে। এক, গৌড়পাদের ভাষ্য—আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে রচিত। দুই, বাচস্পতি-মিশ্রের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী—আনুমানিক নবম শতাব্দীতে রচিত।

সাংখ্য-প্রবচন-সূত্রের উপর সবচেয়ে বিখ্যাত ভাষ্য বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্য—অনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত। এই সাংখ্য-প্রবচন ভাষ্য, এমন কি সাংখ্য-প্রবচন-সূত্রও—যে সাংখ্য-দর্শনের মূল তত্ত্বগুলিকে অত্যন্ত প্রকটভাবে বিকৃত করেছে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই; আমরা একটু পরে তার আলোচনা তুলবো। আপাতত এইটুকু কথাই পর্যাপ্ত হবে যে, সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র বা বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য থেকে সাংখ্যের আদিরূপটিকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

সাংখ্যের নিজস্ব সাহিত্য বলতে বাকি থাকে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা। কিন্তু, এ-কারিকাও যদি দ্বিতীয় শতাব্দীর রচনা হয় তাহলে তার মধ্যেও সাংখ্যের আদি-অকৃত্রিম রূপটির পরিচয় পাবার সম্ভাবনাও খুব বেশি নয়; কেননা, এ-বিষয়ে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না যে, সাংখ্য-দর্শন অন্তত সনতারিখের দিক থেকে অনেক অনেক পুরোনো। এ-কথার পক্ষে নানান রকম প্রমাণ রয়েছে। যেমন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[১১৭] বলছেন, "কৌটিল্য তিনটি মাত্র দর্শনের উল্লেখ করেন—সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত; কৌটিল্য ২৩০০ বৎসর পূর্বের লোক"। এবং "বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ-কথা অশ্বঘোষ একপ্রকার বলিয়াই গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের গুরু আডার কলম উদ্রক দু'জনেই সাংখ্য-মতাবলম্বী ছিলেন"। অধ্যাপক রিচার্ড গার্বে[১১৮] এমনকি অথর্ববেদ-এর মধ্যেও সাংখ্যের উল্লেখ খুঁজে পাচ্ছেন। তাছাড়া, উপনিষদাদি প্রাচীন সাহিত্যে সাংখ্য বা অন্তত সাংখ্যের মূল পরিভাষার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—এই জাতীয় উল্লেখ থেকেই কয়েকজন আধুনিক বিদ্বান অনুমান করছেন যে, সাংখ্যের আদিরূপটিকে ওই উপনিষদাদি গ্রন্থ থেকেই অনুমান বা পুনর্গঠন করতে হবে। অতএব, সাংখ্যের নিজস্ব সাহিত্যের বাইরে সাংখ্যের বা সাংখ্য-দর্শনের মূল তত্ত্বগুলির পরিচয় প্রধানত কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তা এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে।

উপনিষদে সাংখ্যের উল্লেখ হিসেবে আধুনিক বিদ্বানেরা প্রধানত নিম্নোক্ত নজিরগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান:

কঠোপনিষৎ: ১,৩-১০ও১১॥২,৩-৭ও৮॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ: ১,-৮ও১০॥৩-১২॥৪,-৫ও১০॥৫-২,৭ও৮॥৬,-১০,১৩ও১৬॥

প্রশ্নোপনিষৎ : ৪,৮॥
মৈত্রায়ণী উপনিষৎ : ২,৫॥৩,২-৫॥৪,৩॥৫,২॥৬:৫,১০,১৯,২৮,৩০,৩৪,॥৭,১॥

এ-ছাড়া অবশ্যই মহাভারতের মধ্যে, বিশেষত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, সাংখ্যের সুদীর্ঘ উল্লেখ রয়েছে। এবং অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলছেন, চরকসংহিতায় সাংখ্যের যে-প্রাচীনতর রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিক বিদ্বানেরা, দুঃখের বিষয়, তার প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ দেন না[১১৯]। আমাদের মন্তব্য হলো, চরকসংহিতার সাক্ষ্য অবশ্যই মূল্যবান; কিন্তু এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—তথা আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে প্রায় সকলেই—অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি মূল্যবান সাক্ষ্যের প্রতি কিছুটা যেন উদাসীন। সেটি হলো, বেদান্তসূত্র। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের কাল-নির্ণয় অনুসারেও এই ব্রহ্মসূত্র খৃস্টপূর্ব ২০০-র পরে রচিত নয়; অপরপক্ষে চরকসংহিতা ৭৮ খৃস্টাব্দে রচিত। কিন্তু শুধুমাত্র এই সনতারিখের প্রাচীনত্বই নয়, আমরা একটু পরেই দেখাবার চেষ্টা করবো যে, এই ব্রহ্মসূত্রের সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করেছেন বলেই আধুনিক বিদ্বানেরা একটি মূল ভ্রান্তির বশবর্তী হয়েছেন। সে-ভ্রান্তি হলো, উপনিষদে সাংখ্যের বা সাংখ্য-দর্শনের তত্ত্বগুলির নাম-উল্লেখ থেকেই তাঁরা কল্পনা করেছেন যে, সেখানেই সাংখ্য-দর্শনের প্রাচীনতর রূপটির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। অথচ ব্রহ্মসূত্রের সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য না করলে তাঁরা স্পষ্টই দেখতে পেতেন যে, বাদরায়ণের মতে উপনিষৎ বা বেদান্তের প্রধানতম প্রতিপক্ষ বলতে এই সাংখ্য-দর্শনই অতএব উপনিষদে সাংখ্যের উল্লেখগুলি সাংখ্য-দর্শনের ব্যাখ্যা বা বর্ণনা নয়—তার বদলে আদি-সাংখ্যের খণ্ডন-প্রচেষ্টাই। অতএব, ব্রহ্মসূত্র থেকে সাংখ্যের প্রতি বেদান্ত বা উপনিষদের ভঙ্গিটিকে ভালো করে বুঝে নিয়ে তারপর উপনিষদের ওই অংশগুলির ব্যাখ্যা খোঁজা প্রয়োজন। আমরা পরে প্রধানত সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করবো।

মোটের উপর এই হলো সাংখ্য-দর্শনের আদিরূপকে পুনর্গঠন করবার মালমশলা। এগুলির কথা মনে রেখে এবার আধুনিক বিদ্বানদের সিদ্ধান্তগুলি পর্যালোচনা করা যাক।

অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ[১২০] বলছেন, উপনিষদের মধ্যে—বিশেষত কঠ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের কোনো কোনো উক্তির মধ্যেই—সাংখ্য-দর্শনের বীজ আবিষ্কার করা যায়। অতএব তাঁর মতে, এ-বিষয়ে দুটি প্রচলিত সিদ্ধান্ত বর্জন করা প্রয়োজন। প্রথম সিদ্ধান্ত হলো, কপিল নামের জনৈক আদি-বিদ্বানই সাংখ্য-দর্শন প্রবর্তন করেছিলেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো, রিচার্ড গার্বে প্রমুখ কোনো কোনো আধুনিক গবেষক যেমন বলছেন, বেদ-বহির্গত মানুষদের চিন্তা-চেতনার মধ্যেই এ-দর্শনের উদ্ভব হয়েছিলো। উপনিষদের

মধ্যেই সাংখ্য-দর্শনের বীজ আবিষ্কার করতে হলে এই উভয় সিদ্ধান্তকেই কেন পরিহার করা প্রয়োজন তার আলোচনা দীর্ঘ করবার দরকার পড়ে না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, অন্যান্য প্রাচীন রচনায় সাংখ্যের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে কঠ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাওয়া সাংখ্য-দর্শনের সংস্করণটির মিল আছে কিনা? যদি না-থাকে তাহলে সেই অমিলের ব্যাখ্যা কী? অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ বলেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় সাংখ্যের যে-রূপকে আমরা দেখতে পাই তার সঙ্গে কঠ ও শ্বেতাশ্বতর-তে পাওয়া রূপটির বৈষম্য আছে। এই বৈষম্যের ব্যাখ্যা হলো, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর-র সংস্করণটিই সাংখ্যের আদি-সংস্করণ; উত্তরকালে দুটি স্বতন্ত্র পথে বিকশিত হতে হতে গীতায় ও কারিকায় সাংখ্য দুটি স্বতন্ত্র মূর্তি, ধারণ করেছে।

জে. ডাহ্‌ল্‌ম্যান্‌-এর[১২১] মতে সাংখ্যের আদিরূপটিকে ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়; কিন্তু সাংখ্যের এই ঔপনিষদিক সংস্করণটির সঙ্গে গীতায় পাওয়া সংস্করণটির অমিল নেই। অতএব উত্তরকালে সাংখ্যের বিকাশকে দু'মুখো মনে করবার কোনো কারণ নেই। উপনিষদ আর গীতায় সাংখ্যের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাই উত্তরকালে পরিবর্তিত হয়ে কারিকার সাংখ্যে পরিণত হয়েছে।

ডাহ্‌ল্‌ম্যানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে নানাবিষয়ে মতান্তর থাকলেও অধ্যাপক বেল্‌ভেলকার ও রানাডে[১২২] উপরোক্ত বিষয়ে মোটের উপর তাঁর সঙ্গে একমত। অর্থাৎ, উপনিষদ ও গীতায় সাংখ্যের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই এবং এই পরিচয়ই হলো সাংখ্যের আদি-অকৃত্রিম পরিচয়। অবশ্যই, এ-পরিচয়ের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে কঠ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মধ্যে। অতএব, অধ্যাপক বেল্‌ভেলকার ও রানাডে সিদ্ধান্ত করছেন, "ওল্ডেনবার্গ যখন কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মধ্যে সাংখ্যের উৎস অনুসন্ধান করেন তখন আমরা মোটের উপর তাঁর সঙ্গে একমত হই।"

ডক্টর ই. এইচ. জনস্টন[১২৩] "প্রাচীন সাংখ্য" নামের বইতে সাংখ্যের উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্যার নতুন করে আলোচনা তুলেছেন। যদিও তিনি অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ-এর মতো শুধু কঠ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মধ্যেই সাংখ্যের সূত্রপাত আবিষ্কার করতে রাজি নন, তবুও তিনি মোটের উপর ঔপনিষদিক সাহিত্যের মধ্যেই এ-সূত্রপাত দেখতে চান: কেবল শ্বেতাশ্বতর ও কঠ উপনিষদের বদলে তিনি বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য এবং প্রশ্ন উপনিষদের সাক্ষ্যগুলির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে চান।

আধুনিক বিদ্বান-মহলে উপনিষদ-সাহিত্যের মধ্যেই সাংখ্যের উৎস আবিষ্কার করবার আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত জ্যাকবির[১২৪] রচনাবলী। অন্যান্য কয়েকজন আধুনিক বিদ্বানের মতো জ্যাকবিও

মনে করেন যে, সাংখ্য-দর্শনের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্মের চেয়েও প্রাচীন এবং গীতায়—বা মহাভারতে—সাংখ্য-দর্শনের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে আদি অকৃত্রিম সাংখ্য-দর্শনের সঙ্গে বেদান্ত-দর্শনের সংমিশ্রণ চোখে পড়ে। তাহলে, প্রশ্ন ওঠে, সেই আদি-সাংখ্যের রূপ কী? জ্যাকবি এখানে তিনটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এক: এপিক সাংখ্য—অর্থাৎ কিনা, মহাভারতে সাংখ্য-দর্শনের যে-সংস্করণটির পরিচয় পাওয়া যায়। দুই: ক্লাসিক্যাল্ সাংখ্য—অর্থাৎ কিনা, ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় সাংখ্য-দর্শনের যে-সংস্করণটির পরিচয় পাওয়া যায়। তিন: প্রাক্-ক্লাসিক্যাল সাংখ্য—অর্থাৎ কিনা, সাংখ্যের সেই আদি-রূপ, যার সঙ্গে বৈদান্তিক চিন্তাধারার সংমিশ্রণ হবার ফলেই শেষ পর্যন্ত ওই "এপিক সাংখ্য" বা সাংখ্যের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংস্করণটির উদ্ভব হয়েছিলো। জ্যাকবির কাল-নির্ণয় অনুসারে, এই প্রাক্-ক্লাসিক্যাল বা আদি-সাংখ্যের যুগ হলো খৃস্টপূর্ব ৮০০; তারপর, খৃস্টপূর্ব ৫০০ বরাবর তা ক্লাসিক্যাল-সাংখ্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ওই প্রাক্-ক্লাসিক্যাল-সাংখ্য সম্বন্ধে জ্যাকবির কয়েকটি মন্তব্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। যেমন তিনি বলছেন, এই আদি-সাংখ্যের বক্তব্যটা উত্তরকালের মতো মোটেই অধিবিদ্যামূলক ছিলো না—জ্ঞানের বদলে কর্মের উপরই প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হতো এবং মার্জিত দার্শনিক-মহলের পরিবর্তে এই সাংখ্যের উপদেশ জনসাধারণের উদ্দেশ্যেই যে প্রচারিত হতো তা অনুমান করবারও যথেষ্ট কারণ আছে। জ্যাকবির এ-জাতীয় মন্তব্যের তাৎপর্য কেন গুরুত্বপূর্ণ সে-কথা পরে বোঝা যাবে। আপাতত প্রশ্ন হলো, তিনি যাকে ওই প্রাক্-ক্লাসিক্যাল বা আদি-সাংখ্য বলে উল্লেখ করতে চান তার পরিচয় কোথায় পাওয়া যাবে? উত্তরে জ্যাকবি বলছেন, উপনিষদ-সাহিত্যের মধ্যেই—তবে তা শ্বেতাশ্বতর বা কঠ উপনিষৎ নয়, তার বদলে ছান্দোগ্য-উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ খণ্ডের মধ্যে, যেখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সৎস্বরূপ থেকে তেজ, অপ্ ও অন্নের সৃষ্টি হয়েছিলো, এই আদি দেবত্রয়ের মিশ্রণেই জগদুৎপত্তি হয়েছিলো অতএব অগ্নি সূর্যাদি সমুদয় বস্তুতে আদি দেবত্রয়ের অবস্থিতি আছে।

তাহলে, আধুনিক বিদ্বান-মহলে এই হলো একজাতীয় সিদ্ধান্ত এবং এ-জাতীয় সিদ্ধান্তের মূল কথা হলো, ঔপনিষদিক সাহিত্যের মধ্যেই সাংখ্যের বীজ খুঁজে পাওয়া সম্ভব—যদিও অবশ্য ঠিক কোন্ উপনিষদের ঠিক কোন্ অংশের মধ্যে এই বীজ লুকোনো আছে, সে-প্রশ্নে উক্ত বিদ্বানেরা একমত নন।

কিন্তু এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত স্বীকারযোগ্য হতে পারে না। ঔপনিষদিক

সাহিত্যের মধ্যেই সাংখ্য-দর্শনের বীজ অন্বেষণ করা নিষ্ফল প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এ-মন্তব্যের চূড়ান্ত প্রমাণ অবশ্য ওই ঔপনিষদিক সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যই। কিন্তু সে-সাক্ষ্য বিচার করবার আগে আমরা বলতে চাই, ওই আধুনিক বিদ্বানেরা সাংখ্যের আদিরূপ সন্ধানের সময় এ-বিষয়ে বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত মূল্যবান ইংগিতগুলিকে অগ্রাহ্য করেছেন বলেই উপনিষদের মধ্যে কোথাও কোথাও সাংখ্য-দর্শনের পরিভাষা ব্যবহৃত হতে দেখে ভ্রান্তভাবে কল্পনা করেছেন যে, তার মধ্যেই প্রকৃত সাংখ্য-দর্শনের বীজ লুকোনো রয়েছে। তাই, উপনিষদের এই অংশগুলিকে বিশ্লেষণ করবার আগে আমরা এ-বিষয়ে বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের মূল্যবান ইংগিতগুলির উল্লেখ করবো।

প্রথমত, এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে, বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক চিন্তাধারাকেই সুসংহত ও সুসম্বদ্ধভাবে প্রকাশ করা। অতএব বলা যায় যে, উপনিষদের মূল দার্শনিক তত্ত্বের সুসংহত পরিচয় আমরা বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের মধ্যেই খুঁজে পাবো।

এই উক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে কেউ বলতে পারেন, উত্তরকালে বিভিন্ন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে প্রত্যেকেই মূল উপনিষদের নজির দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যাটিই শ্রুতিসঙ্গত। এবং আমরা যদি এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কেই গোঁড়ার মতো সমর্থন করবার চেষ্টা না করি—যদি আমরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে এই সম্প্রদায়গুলির যুক্তি ও উদ্ধৃতিকে বিচার করতে রাজি হই—তাহলে আমাদের পক্ষে এর মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কেই বৈদান্তিক চিন্তাধারার একমাত্র পরিবাহক বলে ঘোষণা করা উচিত হবে না। অতএব, আমাদের পূর্বপক্ষ অনুসারে, উপনিষদের মধ্যেই বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের সংমিশ্রণ রয়েছে; এ-জাতীয় বিভিন্ন তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করবার ফলেই আমাদের দেশে উত্তরযুগে বেদান্ত নাম নিয়েই বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিলো। তাই প্রাচীন আচার্যদের ধর্মমোহের কাছে কথাটা যতোই অপ্রীতিকর হোক না কেন, আধুনিক ঐতিহাসিকের পক্ষে এ-কথা স্বীকারযোগ্য যে, ব্রহ্মসূত্রের মধ্যেই ঔপনিষদিক চিন্তাধারা বলে কোনো একটিমাত্র নির্দিষ্ট চিন্তাধারার পরিচয় আবিষ্কার করবার প্রস্তাবটি অসঙ্গত।

এই যুক্তির উত্তরে আমরা বলবো, উপনিষদগুলিকে বিভিন্ন চিন্তাধারার সংমিশ্রণ হিসেবে দেখবার চেষ্টাটা ঐতিহাসিকভাবে সঙ্গত হোক আর নাই হোক, এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না

যে বিভিন্ন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একদিক থেকে যে-রকম দার্শনিক তত্ত্বের অমিল আছে অপরদিক থেকে আবার তেমনিই মৌলিক দার্শনিক তত্ত্বের মিলও আছে। এ-কথার সবচেয়ে সহজ দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ এ-প্রশ্ন নিয়ে দুটি প্রধান বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দার্শনিক দ্বন্দ্ব যতোই থাকুক না কেন, চিন্ময় ব্রহ্মই যে জগৎকারণ সে-বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ই একমত। অর্থাৎ, বৈদান্তিক চিন্তার সাধারণ দার্শনিক কাঠামো বলতে একটিই, যদিও এই কাঠামোর মধ্যে নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এবং বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে আমরা বেদান্ত-দর্শনের ওই সাধারণ কাঠামোটিরই পরিচয় পাই। অতএব স্বীকার করা দরকার, সাধারণভাবে উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বকে চেনবার চেষ্টায় বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রই আমাদের কাছে প্রাচীনতম ও প্রামাণ্যতম—অতএব প্রধানতম—সহায়।

তাহলে, উপনিষদের মধ্যেই সাংখ্যের বীজ অন্বেষণ করা একান্তই সঙ্গত কিনা,—অর্থাৎ, ঔপনিষদিক চিন্তার সাধারণ কাঠামোটির মধ্যে সাংখ্য-দর্শনের কোনো স্থান থাকা একান্তই সম্ভবপর কি না—এ-সমস্যার সমাধানে ব্রহ্মসূত্রের সাক্ষ্যই প্রধানতম বলে গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু আধুনিক বিদ্বানেরা এ-বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন এবং সেই ঔদাসীন্যই উপনিষদের মধ্যে সাংখ্য-দর্শনের বীজ আবিষ্কার সংক্রান্ত কল্পিত কাহিনীর মূল উপজীব্য। কেননা, ব্রহ্মসূত্রের সাক্ষ্য অনুসারে বেদান্ত দর্শনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ওই সাংখ্য-দর্শনই।

ব্রহ্মসূত্রে অবশ্যই বেদান্ত-দর্শনের আরো কয়েকটি দার্শনিক প্রতিপক্ষের খণ্ডন রয়েছে, কিন্তু সাংখ্যের বিরুদ্ধে দার্শনিক অভিযানের তুলনায় এগুলি গৌণ। স্বয়ং শঙ্করাচার্যও[১২০] এই কথাই বলেছেন। ব্রহ্মসূত্রের ওই সাংখ্য-খণ্ডনই প্রধান-মল্লনিবর্হণের মতো। অর্থাৎ, মল্লক্ষেত্রে প্রধান মল্লকে পরাস্ত করলেই যে-রকম অপেক্ষাকৃত অপ্রধানদেরও পরাস্ত করা হয় তেমনি যেসব যুক্তির সাহায্যে সাংখ্য খণ্ডিত হলো তারই সাহায্যে পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতিও নিরস্ত বা খণ্ডিত হবে।

ব্রহ্মসূত্র রচনা করবার সময় বাদরায়ণ বারবার নানানভাবে ও নানানদিক থেকে এই সাংখ্য-দর্শনের দাবি খণ্ডন করবার প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন। বস্তুত, ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে পূর্বপক্ষ খণ্ডনের যে-ক'টি পদ্ধতি প্রচলিত আছে বাদরায়ণ তার প্রায় প্রতিটিরই প্রয়োগ করেছেন সাংখ্য-দর্শনের বিরুদ্ধে: তিনি যুক্তির সাহায্যে দেখাতে চাইছেন, সাংখ্যের প্রধান-কারণবাদ কিছুতেই স্বীকারযোগ্য নয়; তিনি লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখাবার চেষ্টা করছেন, সাংখ্যের পরিণামবাদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; তিনি শ্রুতির সাহায্যে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন, সাংখ্য-দর্শন

সর্বতোভাবে বেদবিরুদ্ধ। উপনিষদের ব্যাখ্যায় স্বয়ং বাদরায়ণ যে-মতটিকে এতোবার এতোভাবে খণ্ডন করবার চেষ্টা করলেন উপনিষদের মধ্যেই সে-মতবাদের বীজ অন্বেষণ করা কী ভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে? অতএব আমাদের যুক্তি অনুসারে, উপনিষদের মধ্যেই সাংখ্য-দর্শনের বীজ আবিষ্কার করার প্রচেষ্টাটাই যে ভ্রান্ত সে-বিষয়ে চরম প্রমাণ হলো বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র।

আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো, আধুনিক বিদ্বানেরা উপনিষদের যে-অংশগুলিতে সাংখ্যের বীজ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সাংখ্য-দর্শনের খণ্ডন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়; অতএব উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বাদরায়ণ যে সাংখ্য-মত খণ্ডনের অতো আয়োজন করেছেন, তা আসলে উপনিষদের দর্শনের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠারই পরিচায়ক। এবং বাদরায়ণের প্রতি পরিপূর্ণ নিষ্ঠা বজায় রেখে শঙ্করাচার্য খুব জোর দিয়েই বলছেন যে, প্রকৃত বৈদিক ঐতিহ্যের মধ্যে সাংখ্য-দর্শনের কোনো স্থান নেই। এ-বিষয়ে শঙ্করাচার্যের উক্তিগুলি এখানে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না।

শ্রুতিতে কপিলের নাম আছে। শঙ্করাচার্য[১২৩] বলছেন, এই উল্লেখ থেকে বিশেষ কিছু প্রমাণ হয় না:

> বিশেষত যে শ্রুতিটি কপিলমাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন—কেবল সেই শ্রুতিটি দেখিয়াই কপিলমতের উপর শ্রদ্ধাস্থাপন করা উচিত হয় না। কারণ, কপিল শব্দটি ব্যক্তিবিশেষের বোধক নহে। (কপিল অনেক, তন্মধ্যে কোন্ কপিল সাংখ্য শাস্ত্র বলিয়াছেন এবং কোন্ কপিল বা শ্রুতি কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছেন, তাহারই বা স্থিরতা কি?) শ্রুতি কপিলের অপ্রতিহত জ্ঞান বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র সগরসন্তাননাশক বাসুদেব নামক অন্য কপিলেরও স্মরণ করিয়াছেন। সাংখ্যবক্তা কপিল ভেদজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, পরন্তু তাহা অবৈধ, অর্থাৎ বেদানুমোদিত নহে; সেজন্য তাহা অপ্রমাণ বা অগ্রাহ্য।

আবার[১২৭],

> কেবল প্রধান বলিয়াছেন বলিয়াই নহে, নানা জীব বলাতেও কপিলের স্মৃতি বেদবিরুদ্ধ এবং বেদানুযায়ী শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।…বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশ প্রসঙ্গ (স্মৃতির আনর্থক্য) যে দোষ নহে, তৎপ্রতি অন্যহেতুও আছে।—
> সাংখ্যস্মৃতিতে যে প্রধানের পর পরিণামাত্মক মহত্তত্ত্বের ও অহংতত্ত্বের উল্লেখ আছে, সেগুলি কিন্তু লোকে বা বেদে কুত্রাপি উপলব্ধি হয় না। ভূত ও ইন্দ্রিয়বর্গ লোক ও বেদ উভয়প্রসিদ্ধ; সুতরাং সেগুলির স্মরণ অযোগ্য নহে। কিন্তু

প্রকৃতির পরিণাম মহৎ ও অহংকার—যাহা সাংখ্যস্মৃতির কল্পিত, তাহা লোকে ও বেদে উভয়েই অপ্রসিদ্ধ। যেহেতু অপ্রসিদ্ধ সেই হেতুই তাহা স্মরণের অযোগ্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে শঙ্করাচার্যের এই যে কথা—"কপিলস্য তন্ত্রস্য বেদবিরুদ্ধত্বং বেদানুসারিমনুবচনবিরুদ্ধত্বঞ্চ" ইত্যাদি, কিংবা, "অ-লোক-বেদ-প্রসিদ্ধত্বাত্তু মহদাদীনাং", ইত্যাদি—এ কি তিনি সাংখ্য-দর্শনকে হেয় প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে দেশের প্রকৃত ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করেই প্রচার করতে চাইছেন? তা বলা যায় না। কেননা, দেশের প্রকৃত ঐতিহ্য থেকে এ-বিষয়ে রিচার্ড গার্বে আরো প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। রিচার্ড গার্বের সিদ্ধান্তটি মূল্যবান, তাই আমরা সুদীর্ঘভাবে সে-সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করবো।

গার্বের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করবার আগে বলে রাখা দরকার যে, তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে সাংখ্য থেকেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি এবং সাংখ্য-প্রবর্তক কপিলের নাম থেকেই কপিলবাস্তুর নামকরণ হয়েছিলো। তাই তিনি বলছেন, পুরাণ, মহাভারতাদি গ্রন্থে কপিল সম্বন্ধে যে-সব নানাবিধ কাল্পনিক ও পরস্পর-বিরোধী তথ্য পাওয়া যায় সেগুলির মূল্য খুব বেশি নয়। অপরপক্ষে[১২৮]—

> কপিল সম্বন্ধে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহ্য হলো কপিলবাস্তু নামটি—যার অর্থ কপিলের বাসস্থান। ওই আদিবিদ্বানের সম্মানেই স্থানটির নামকরণ হয়েছিলো; কিন্তু তিনি সেখানে জন্মেছিলেন, না বাস করতেন সে-বিষয়ে কিছু জানা নেই।......সাংখ্য-দর্শনের উৎপত্তি ঠিকমতো বোঝবার জন্য মনে রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব সবচেয়ে কম ছিলো বলেই এখানে বিশ্বের ও মানবসত্তার রহস্য শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার প্রথম প্রচেষ্টা সম্ভব হয়েছিলো। কেননা, সাংখ্য-দর্শনের যে-পুঁথিগুলি আমাদের সামনে রয়েছে তার মধ্যে শ্রুতির প্রতি যতোকিছু নির্ভরতা, তার সবটুকুই উত্তর-কালে সাংখ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে; সাংখ্যের উপর এইভাবে গ্রথিত সমস্ত বৈদিক অঙ্গগুলিকে বাদ দিলেও সাংখ্য-দর্শনের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। মূল তত্ত্বের দিক থেকে সাংখ্য-দর্শন আদিতে বেদবাহ্য এবং ব্রাহ্মণ্য-ঐতিহ্য মুক্ত ছিলো এবং এখনো তাই হয়ে আছে। মহাভারতে (১৩, ১৩৭০২) সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র এবং পাশুপত সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র হিসেবেই বেদের উল্লেখ দেখা যায়; এবং ১৩৭১১ শ্লোকে সর্ব-বেদের (অর্থাৎ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ) পাশে স্বতন্ত্র দুটি সনাতন সম্প্রদায় হিসেবেই সাংখ্য ও যোগের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে যে-প্রভেদ এককালে নিশ্চয়ই বর্তমান ছিলো, এখানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তরকালে সাংখ্য-দর্শন যে আস্তিক-দর্শনের অন্তর্গত হয়েছে তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই; তার থেকে প্রমাণ হয়, সংযত সারল্যের গুণে সাংখ্য-দর্শন বেদান্তের অলৌকিকত্বের সামনে মাথা

নোয়ায়নি; এবং ব্রাহ্মণেরাও, মূল্যবান তত্ত্বকথা গ্রহণ করতে পারবার ক্ষমতার দরুন, এই সাংখ্য-দর্শনকেও গ্রহণ করেছিলো।……মৌখিকভাবে বেদকে স্বীকার করা এবং ব্রাহ্মণদের উৎসাহ—এই দুটি কারণই সাংখ্য-দর্শনের পক্ষে আস্তিক্যপদ লাভ করার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিলো। (স্বাধীন তর্জমা)

আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো, রিচার্ড গার্বের এই মহামূল্যবান মন্তব্যের মধ্যে দুর্বলতম অংশ বলতে শেষের কথাগুলিই। কেননা, সাংখ্য-দর্শনের পক্ষে আস্তিক্যপদ লাভের যে সহজ-সরল ব্যাখ্যা তিনি এখানে দিয়েছেন তা স্বীকারযোগ্য হতে পারে না। বস্তুত, নিজস্ব মৌলিক তত্ত্বগুলি বিসর্জন দেবার পরই সাংখ্য-দর্শন আস্তিক বলে স্বীকৃত হয়েছে: অর্থাৎ আদি-সাংখ্য এবং আস্তিক-সাংখ্য মোটেই এক নয়। সাংখ্য-দর্শনের ইতিহাসে এই গুণগত পরিবর্তনটির কথা রিচার্ড গার্বে একেবারেই স্বীকার করেন না।

আপাতত, আমাদের মন্তব্য হলো, গার্বের উদ্ধৃত মন্তব্যে সাংখ্য-দর্শনের আদি-অবৈদিকত্ব সংক্রান্ত যে-যুক্তি ও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা অগ্রাহ্য করবার কোনো কারণ নেই। এবং যদিও গার্বে নিজে বাদরায়ণের এবং অন্যান্য বৈদান্তিক আচার্যের মন্তব্যকে একেবারে গুরুত্ব দেননি, তবুও তাঁর সিদ্ধান্ত এঁদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যায়নি। কিন্তু বাদরায়ণের সাক্ষ্যকে গুরুত্ব না দেবার ফলে গার্বের নিজের সিদ্ধান্তের মধ্যেই স্ব-বিরোধিতা থেকে গিয়েছে; তার আলোচনায় পরে প্রত্যাবর্তন করা যাবে।

সাংখ্যের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে আমরা যে-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি তার পক্ষে প্রধানতম প্রয়োজন হলো আধুনিক বিদ্বানদের ওই মতবাদটি খণ্ডন করা, যে-মতবাদ অনুসারে উপনিষদের মধ্যেই সাংখ্য-দর্শনের বীজ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অতএব আমরা সুবিস্তৃতভাবে সে-মতবাদের আলোচনা করলাম। সুখের বিষয়, বৃদ্ধসম্মতি হিসেবে রিচার্ড গার্বের নাম ছাড়াও এখানে আমরা আরো কয়েকজন আধুনিক বিদ্বানের নাম উপস্থিত করতে পারি যাঁদের সিদ্ধান্তের গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করতে ভারতীয় দর্শনের ছাত্র-মাত্রই দ্বিধা করবেন: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং হেইন্‌রিখ্ জিমার। মহামহোপাধ্যায়ের উক্তি আমরা ইতিপূর্বেই (পৃঃ ৫০৮) কিছুটা উদ্ধৃত করেছি; তাই এখানে জিমার-এর সিদ্ধান্ত আলোচনা করা যাক। সাংখ্য-মত প্রসঙ্গে জিমার[১২৯] বলছেন:

সাংখ্যের তত্ত্বগুলি বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের অন্তর্গত নয়।…দুটি ধ্যানধারণার উৎস স্বতন্ত্র: সাংখ্য ও যোগ জৈনদের যান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং এই জৈন চিন্তাধারাকে সুদীর্ঘ তীর্থঙ্কর পরম্পরার দিক থেকে আধা-ঐতিহাসিক এবং আধা-পৌরাণিকভাবে, প্রাচীন ভারতের এক সুদূর

বন্য অ-বৈদিক যুগ পর্যন্ত পিছনে দেখতে পাওয়া যায়। অতএব, সাংখ্য আর যোগের মূল ধারণাগুলি অসম্ভব পুরোনো। তবুও, আস্তিক রচনায় এগুলির আবির্ভাব অনেক পরের ঘটনা—উপনিষদের অপেক্ষাকৃত নবীন অংশে এবং গীতায়-ই প্রথম এই ধারণাগুলির আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাও বৈদিক দর্শনের মূল ধ্যানধারণার সঙ্গে ইতিমধ্যেই মিশ্রিত হয়ে। তীব্র প্রতিরোধের দীর্ঘ ইতিহাস উত্তীর্ণ হয়ে আর্যদের ব্রাহ্মণ মনের রুদ্ধ দরজা শেষ পর্যন্ত খুলে গেলো, এবং স্থানীয় সভ্যতা থেকে ইংগিত ও প্রভাব গ্রহণ করতে শুরু করলো। তারই ফলে দুটিঐতিহ্যের মিলন হলো। (স্বাধীন তর্জমা)

তাহলে জিমার এবং গার্বে উভয়েই সিদ্ধান্ত করছেন, সাংখ্য-যোগের মূল কথাগুলি আদিতে ভারতীয় আদিবাসীদের চিন্তাধারার,—অতএব অ-বৈদিক ঐতিহ্যের,—অন্তর্গত ছিলো এবং কালক্রমে তা বৈদিক ঐতিহ্য-দ্বারা গৃহীত হয়েছিলো। এ-সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই মূল্যবান, যদিও এ-সিদ্ধান্তের প্রকৃত তাৎপর্য দু'জন বিদ্বানের মধ্যে কেউই নির্ণয় করবার চেষ্টা করেনি। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত হয়েছে। সেই দুটি ধারাকে আমরা আর্য ও অনার্য বা আর্য ও দ্রাবিড় বা বৈদিক ও অবৈদিক—যে-কোনো নামেই উল্লেখ করি না কেন, দুটি ধারার মধ্যে পার্থক্যটা জাতিগত নয়, তথাকথিত আর্যদের কোনো রকম সনাতন মনস্তত্ত্ব-জনিতও নয়। এই প্রভেদের মূলে ছিলো উৎপাদন পদ্ধতির মৌলিক প্রভেদ : পশুপালন-প্রধান অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বৈদিক ধ্যানধারণা স্বভাবতই পুরুষ-প্রধান, কৃষিমূলক অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অ-বৈদিক ধ্যানধারণা স্বভাবতই মাতৃপ্রধান বা নারীপ্রধান। এই নারীপ্রধান ধ্যান-ধারণারই প্রকটতম উদাহরণ হলো তন্ত্র : তন্ত্রমতে প্রকৃতিই প্রধান, জগৎ বামোদ্ভূত, অকৃত্রিম তন্ত্রের সাধনপদ্ধতিও বামাচার বা স্ত্রীআচার। আধুনিক বিদ্বানেরা যদি অনুমান করতে বাধ্য হন যে, আদিতে সাংখ্যমতও ওই অ-বৈদিক ঐতিহ্যেরই অন্তর্গত ছিলো, তাহলে স্বীকার করা প্রয়োজন যে, যে-ধ্যানধারণা-গুলিকে আমরা ব্যাপক অর্থে তান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে থাকি, আদিতে সাংখ্য বলতে তারই অপেক্ষাকৃত দার্শনিক সংস্করণ বুঝিয়েছে। প্রাচীন-রচনায় আমরা এ-ইংগিত পেয়েছি যে, লোকায়তিক ধ্যানধারণা এবং ওই তান্ত্রিক ধ্যানধারণা অভিন্ন ছিলো এবং এই দুয়ের মধ্যে তত্ত্বগত সাদৃশ্যও ঠিক কোথায় তা আমরা তন্ত্রের দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বোঝবার চেষ্টা করেছি : মানবদেহের অনুরূপ হিসেবে তন্ত্রে বিশ্বরহস্যকে বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে বলেই তার আদি-অকৃত্রিম রূপটির মধ্যে অধ্যাত্মবাদের বা ভাববাদের কোনো স্থান হয়নি। তাই, উত্তরযুগে ওই তান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলির উপর অধ্যাত্মবাদের আর ভাববাদের প্রলেপ যতোই মাখানো হোক না কেন,

আদিতে এই ধ্যানধারণা লোকায়তিক বা বস্তুবাদীই ছিলো—সে-বস্তুবাদ আদিম বলেই অস্ফুট, দুর্বল এবং অচেতন। বস্তুবাদের আদিম রূপটির—তথা, ওই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণার—আলোচনা পরে তোলা যাবে। আপাতত আমাদের মন্তব্য হলো, সাংখ্যের আদিরূপটিকেও যদি একই বেদবাহ্য ঐতিহ্যের অন্তর্গত বলে স্বীকার করতে হয়, তাহলে তার উৎসকেও একইভাবে বোঝবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই কারণে আমরা শুরুতেই সাংখ্যের সঙ্গে তন্ত্রের এ-সাদৃশ্যের প্রতি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করেছি এবং আমরা দেখেছি, সাদৃশ্যের পরিচয় শুধুমাত্র কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ইংগিতের মধ্যেই আবদ্ধ নয়—মূল দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট! অবশ্যই সাংখ্য-দর্শনও যে আদিতে প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ও লোকায়তিক বা বস্তুবাদী চেতনারই অঙ্গ ছিলো সে-বিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনা এখনো বাকি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে যাঁরা সাংখ্যকে অ-বৈদিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক বলে ঘোষণা করলেন তাঁরাও তাঁদের নিজেদের সিদ্ধান্তের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যের দিকে অগ্রসর হতে পারেননি। অতএব, আমাদের পক্ষে তাঁদের যুক্তির প্রধান দুর্বলতাকে বিশ্লেষণ করেই অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে।

গার্বে এবং জিমার উভয়েই বলছেন, সাংখ্য-মত আদিতে অ-বৈদিক হলেও কালক্রমে তা বৈদিক ঐতিহ্যের মধ্যে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছিলো।

সাংখ্য-দর্শনের বৈদিক-ঐতিহ্য-স্বীকৃত সংস্করণটির পরিচয় হিসেবে গার্বে ভগবদ্গীতা ও উপনিষদের সেই অংশগুলিরই উল্লেখ করছেন যেগুলির নজির দেখিয়ে ওল্ডেনবার্গ-প্রমুখ বিদ্বানেরা উপনিষদের মধ্যেই সাংখ্য-দর্শনের বীজ আবিষ্কার করবার কল্পনা করেছিলেন। অতএব, এখানে অন্তত একটি বিষয়ে গার্বে ওবং ওল্ডেনবার্গ-এর মতের মিল দেখা যায়। বিষয়টি হলো, গীতা ও উপনিষদের আলোচ্য অংশগুলির মধ্যে প্রকৃত সাংখ্যমতেরই উল্লেখ আছে। আমাদের মন্তব্য হলো, সাংখ্য-বিচারে ব্রহ্মসূত্রের সাক্ষ্যকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন বলেই আধুনিক বিদ্বানেরা উপনিষদে সাংখ্য-দর্শনের খণ্ডন-প্রচেষ্টাকেই সাংখ্য-পরিচয় বলে কল্পনা করবার মতো ভ্রান্তিকে এতোখানি প্রশ্রয় দিতে পেরেছেন।

প্রথমত, বাদরায়ণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, বৈদিক সাহিত্যে সাংখ্য-দর্শনের অব্যক্তাদি পারিভাষিক শব্দ দেখলেই, সাংখ্য-চিন্তাধারা অনুমান করবার সুযোগ নেই :

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন, শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দর্শয়তি চ ॥১।৪।১

বৈদান্তিক আচার্যরা এই সূত্রটির ভাষ্য-রচনা করবার সময় স্বভাবতই আরো

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, শ্রুতিতে মহৎ, অব্যক্ত প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখলেই সাংখ্য চিন্তাধারা কল্পনা করা যায় না। শঙ্কর[১৩০] যেমন বলছেন ;

> সাংখ্য যে স্বতন্ত্র ত্রিগুণ অব্যক্ত প্রতিপাদন করে, সেই অব্যক্তই যে কঠশ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। কঠশ্রুতিতে কেবল সাংখ্যের অব্যক্ত শব্দটি পঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে সত্য; কিন্তু তাহার অর্থের প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। অর্থাৎ, যে অব্যক্তশব্দ সাংখ্য স্মৃতিতে ত্রিগুণ অচেতন পদার্থবিশেষের বোধক, কঠশ্রুতির অব্যক্তও যে সেই অব্যক্তই, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান জন্মে না। যাহা ব্যক্ত নয় তাহাই অব্যক্ত, এ-অর্থ বা এরূপ যোগার্থ লইয়া দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্মতত্ত্বেও অব্যক্ত শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। অব্যক্ত-নামে কোনো রূঢ় (সর্ববিদিত) পদার্থ নাই। যাহা কেবলমাত্র সাংখ্যের রূঢ়ি, সাংখ্যের পরিভাষা, তাহা লইয়া বেদার্থ নিরূপণ হয় না।

বাদরায়ণের কাছে উপনিষদের তত্ত্ব এবং সাংখ্যের স্বরূপ—উভয় বিষয়ই সম্যকভাবে বোঝবার পক্ষে এই বিষয়টির গুরুত্ব অত্যন্ত মৌলিক। তাই তিনি একাধিকবার এ-কথা উত্থাপন করেছেন। পাছে সাংখ্যবিদ পণ্ডিতেরা উপনিষদের নজির দেখিয়েই ত্রিগুণাত্মক অচেতন প্রধানকে বা প্রকৃতিকেই, জগৎকারণ বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন, এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য তিনি বলছেন :

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥ ১।১।৫ ॥

ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলছেন :

> সাংখ্যকল্পিত জড়রূপা প্রকৃতি বেদান্তশাস্ত্রে জগৎকারণরূপে স্থান পাইতে পারে না, অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রে অচেতন প্রকৃতির জগৎকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয় না। অথবা, সৃষ্টিবিষয়ক বেদান্তবাক্যের "অচেতন প্রধান জগৎকারণ" এরূপ অর্থও হয় না, অর্থাৎ প্রকৃতি বা প্রধান তদ্‌বাক্যস্থ পদের বাচ্য বা বোধ্য নহে। কেননা, যে জগৎকারণ, সে ঈক্ষিতা, এইরূপ শুনা যায়। যেহেতু ঈক্ষিতৃত্ব শুনা যায় সেইহেতু প্রধান অশব্দ,—অর্থাৎ শ্রৌত শব্দের অপ্রতিপাদ্য।—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শুধু তাই নয়। সাংখ্য যে আদিতে বেদ-বিরুদ্ধ ছিলো তার প্রমাণ হিসেবে বাদরায়ণ প্রমুখ সাংখ্য-বিরোধী দার্শনিকদের উক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের কাছে একমাত্র প্রমাণ নয়। সাংখ্য-কারিকা প্রভৃতি গ্রন্থেও আদি-

সাংখ্যের এই স্পষ্ট বেদ-বিরোধিতার চিহ্ন থেকে গিয়েছে। এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী চক্রবর্তী[১৩১] আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

> খুব সম্ভব এমন এক যুগে কপিল-দর্শন প্রণীত হয় যখন বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার প্রবল প্রভাব ছিলো এবং সাধারণের বিশ্বাস ছিলো যে বিহিত-পদ্ধতিতে যজ্ঞ করলে যজমানের স্বর্গলাভ হবে। বৈদিক পুরোহিতের কাছে স্বর্গই ছিলো পরম-পুরুষার্থ। কিন্তু এর বিরুদ্ধে সাংখ্য প্রবল প্রতিবাদ ঘোষণা করে এবং প্রমাণ করতে চায়, স্বর্গের কথা অমূলক এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ অনর্থক। 'দৃষ্টবদানুশ্রবিক :' ইত্যাদি সাংখ্য-কারিকার দ্বিতীয় শ্লোকে তার প্রমাণ আছে। অবশ্যই কারিকা খুব প্রাচীন গ্রন্থ নয়; কিন্তু তবুও তা প্রাচীন ঐতিহ্যের বাহক। (স্বাধীন তর্জমা)।

তাহলে শুধু যে বৈদান্তিকেরাই বলছেন সাংখ্য বেদবাহ্য ও বেদ-বিরুদ্ধ তাই নয়, সাংখ্যের নিজস্ব সাহিত্য থেকেও আদি-সাংখ্যের বেদবিরোধিতার[১৩২] পরিচয় মুছে যায়নি। এদিক থেকেও বেদান্তের মধ্যেই আদি-সাংখ্য আবিষ্কার অত্যন্ত অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা হতে বাধ্য।

আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে যাঁরা উপনিষদের ভিতরেই সাংখ্য-চিন্তার পরিচয় পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বাদরায়ণ এবং তাঁর অনুগামী বৈদান্তিক আচার্যদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলবেন, এইভাবে সাংখ্যের প্রধানকে 'অশব্দ' অর্থাৎ বৈদিক ঐতিহ্য বিরুদ্ধ বা বৈদিক ঐতিহ্য বহির্গত বলে প্রমাণ করবার চেষ্টাটা নেহাতই আত্মপক্ষ সমর্থনে গায়ের-জোরের কথা। কেননা, উপনিষদের অংশ-বিশেষে এবং গীতায় সাংখ্যের তত্ত্ব রয়েছে এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই রয়েছে। অর্থাৎ, চলতি কথায় আমরা যাকে বলি ফ্যাক্ট—চোখের-সামনে থাকা বাস্তব সত্য—তা অস্বীকার না করে বাদরায়ণ বা বৈদান্তিক আচার্যদের কথা স্বীকার করা যায় না।

অতএব আমাদের পক্ষে এখানে ভালো করে দেখা দরকার, উপনিষদাদি গ্রন্থে সত্যিই কী আছে। প্রধানাদি সাংখ্য-দর্শনের পারিভাষিক শব্দ যে আছে সে-কথা বাদরায়ণও অবশ্যই অস্বীকার করবেন না। কিন্তু সাংখ্য-দর্শনের পারিভাষিক শব্দ থাকা মানেই সাংখ্যের দার্শনিক তত্ত্ব থাকা নয়। বস্তুত, উপনিষদাদির যে-অংশে আধুনিক বিদ্বানেরা সাংখ্যের নিদর্শন পাচ্ছেন বলে কল্পনা করেন সেগুলিকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, আসলে সেখানে সাংখ্যের খণ্ডনই বর্তমান। এইটেই হলো আসল ফ্যাক্ট এবং এ-ফ্যাক্ট অগ্রাহ্য না করলে সবিনয়ে স্বীকার করতেই হবে যে, আধুনিক বিদ্বানদের তুলনায় বাদরায়ণ উপনিষদের প্রকৃত ঐতিহ্যের অনেক কাছে ছিলেন বলেই, উপনিষদ-

রচকদের পদানুসরণ করে ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে প্রধানকারণবাদ খণ্ডনের প্রচেষ্টাকেই অতোখানি প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

উপনিষদাদির আলোচ্য অংশে ঠিক কী আছে? সাংখ্য-তত্ত্ব, না, সাংখ্য-খণ্ডন? এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে সাংখ্যের আদি-অকৃত্রিম তত্ত্ব বলতে ঠিক কী বোঝায়, সে-বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কোথা থেকে সে-ধারণা পাওয়া যাবে? আমাদের যুক্তি অনুসারে, ওই বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র থেকেই। তার কারণ, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সাংখ্য-দর্শনের এর চেয়ে পুরোনো আর কোনো উল্লেখ আমরা পাই না। অর্থাৎ কিনা, সাংখ্য-মত হিসেবে বাদরায়ণ তাঁর ব্রহ্মসূত্রে ঠিক যে মতবাদটিকে খণ্ডন করছেন তাকেই সাংখ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে স্বীকার করা প্রয়োজন। তা না হলে কল্পনা করতে হয়, বাদরায়ণ সাংখ্য নাম দিয়ে কোনো এক কল্পিত দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। সে রকম একটা কল্পনা যে নেহাতই অসম্ভব, আশাকরি সকলেই তা মানবেন। সাংখ্য নিশ্চয়ই ব্রহ্মসূত্রের চেয়েও পুরোনো, ব্রহ্মসূত্র রচনাকালে সাংখ্য নিশ্চয়ই ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিলো; তা না হলে সাংখ্য-খণ্ডনে বাদরায়ণের অতোখানি উৎসাহের আর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্তু সাংখ্যের দার্শনিক তত্ত্ব বলতে ঠিক কী বোঝাতো এ-বিষয়ে বাদরায়ণের রচনায় পূর্বপক্ষ হিসেবে বর্ণিত সাংখ্যের ওই পরিচয়টির চেয়ে পুরোনো আর কোনো পরিচয় আমাদের জানা নেই। তাই এই পরিচয়টির উপর নির্ভর না করে সাংখ্যের আদিরূপ সংক্রান্ত অন্য যে-কোনো মতবাদ দাঁড় করবার চেষ্টা করলে তা মনগড়া হবারই সম্ভাবনা। এই কথাটি স্বীকার করলে মানতে হবে, অন্যত্র আমরা সাংখ্যের যে-পরিচয় পাই—এমনকি সাংখ্য-কারিকা ও সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র নামে উত্তর-কালে রচিত সাংখ্যের ওই দুটি পুঁথিতে সাংখ্য-দর্শনের যে-পরিচয় পাওয়া যায়—তার সঙ্গে আদি-অকৃত্রিম সাংখ্যের কতোখানি মিল আছে, এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে হলেও আমাদের পক্ষে বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে প্রত্যাবর্তন করে সেখানে সাংখ্যের যে-পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে এগুলিকে মিলিয়ে দেখা দরকার। এবং উপনিষদাদির অংশ-বিশেষে সাংখ্য-দর্শনের পারিভাষিক শব্দের পরিচয় পেলেও আমাদের পক্ষে এই পদ্ধতি অনুসারেই বিচার করা প্রয়োজন যে, সেখানে সাংখ্য-তত্ত্ব না সাংখ্য-খণ্ডন—ঠিক কিসের নমুনা রয়েছে। কেননা, উপনিষদ যদিও অবশ্যই ব্রহ্মসূত্রের চেয়ে পুরোনো, তবুও উপনিষদে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়নি কোনটি সাংখ্য-মত এবং কোনটি সাংখ্য-মত নয়, ব্রহ্মসূত্রেই সর্ব প্রথম স্পষ্টভাবে সে-কথা বলে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে, ব্রহ্মসূত্রে যে-কথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে তারই আলোয়, উপনিষদে যে-কথা স্পষ্ট-ভাবে বলা হয়নি তা বোঝবার চেষ্টা করা ছাড়া আর উপায় কি?

বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য-মত হিসেবে নির্দিষ্ট কোন্ দার্শনিক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়? প্রাচীনদের পরিভাষায় তার নাম হলো, অচেতন-কারণ-বাদ বা প্রধান-কারণ-বাদ। অর্থাৎ, অচেতন বা জড় প্রকৃতিই জগৎকারণ। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য[১৩৩] যেমন বলেছেন, "সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই যে, যেমন ঘটাদি মৃন্ময় পদার্থে মৃত্তিকারূপের অন্বয় থাকায় মৃত্তিকা-জাতি সে-সকলের কারণ, তেমনি, যে-কিছু বাহ্য ও আন্তরিকভাবে (পদার্থ) আছে, সে সমস্তই সুখদুঃখমোহ রূপে অন্বিত থাকায় সুখদুঃখমোহাত্মক কোনো এক সামান্য পদার্থ সে-সকলের কারণ। সুখদুঃখমোহাত্মক সেই সামান্য পদার্থটি ত্রিগুণ ও মৃত্তিকাদির ন্যায় অচেতন"। সাংখ্য-দর্শনকে এই অর্থে বুঝেছিলেন বলেই স্বয়ং বাদরায়ণ সাংখ্য-খণ্ডনের একটি চূড়ান্ত যুক্তি হিসেবে বলছেন,

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥২।২।১॥
প্রবৃত্তেশ্চ ॥২।২।২॥
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অর্থাৎ, অচেতন প্রধানের পক্ষে জগৎকারণ হওয়া সম্ভবই নয়, কেননা জগতে রচনা বা উদ্দেশ্য-সাধনের (*purposiveness*) পরিচয় আছে এবং তা অচেতন-জনিত হতে পারে না। এবং "রচনা দূরে থাকুক, রচনাসিদ্ধির জন্য যে প্রবৃত্তি,—অনুকূল প্রচেষ্টা,—তাহাও অচেতন প্রধানের পক্ষে স্বাধীন-ভাবে হওয়ার সম্ভাবনা নেই।...হেতু এই যে, মৃত্তিকার ও রথাদি অচেতনের তাদৃশী বিশিষ্ট প্রবৃত্তি দেখা যায় না। মৃত্তিকাই হউক আর রথাদিই হউক, কুম্ভকারের ও রথবাহকের অধিষ্ঠান ব্যতীত আপনা হইতে কেহ কখনও মৃত্তিকাকে ও রথকে বিশিষ্ট কার্যাভিমুখ হইতে দেখে নাই।...যেহেতু, অনুমান সমর্থক দৃষ্টান্ত নাই, সেইহেতু অচেতনের প্রবৃত্তি অননুমেয়।...যেহেতু অচেতনের বিশিষ্ট কার্য প্রবৃত্তির অনুমান দুর্ঘট, সেইহেতুই অচেতন জগৎকারণের অনুমানও দুর্ঘট।"[১৩৪]

জগৎকারণ হিসেবে অচেতন বস্তুকে স্বীকার করা একান্তই সম্ভবপর কিনা—এ-প্রশ্ন অবশ্যই স্বতন্ত্র। আধুনিক বস্তুবাদীরা নিশ্চয়ই বলবেন, তা সম্ভবপর এবং বাদরায়ণের উপরোক্ত যুক্তি সত্ত্বেও। আমাদের পক্ষে বর্তমানে এই সমস্যার আলোচনায় প্রবেশ করবার প্রয়োজন নেই। কেননা, এখানে আমাদের মূল সমস্যা হলো সাংখ্যের আদিরূপটিকে সনাক্ত করা। এবং সাংখ্যের বিরুদ্ধে প্রাচীনদের এ-জাতীয় যুক্তি থেকে আমরা অন্তত এটুকু অনুমান করতে পারি যে, আদিতে সাংখ্য শুধুমাত্র নিরীশ্বরবাদই ছিলো না, বস্তুবাদ বা

জড়বাদও ছিলো। আধুনিক পরিভাষায় শুধুমাত্র *atheism* নয়, *materialism*-ও। তাই উত্তরকালে সাংখ্য-প্রসঙ্গে আমরা যে-সব অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী চিন্তার পরিচয় পাই, আদি-সাংখ্যের দিক থেকে সেগুলিকে অর্বাচীন ও প্রক্ষিপ্ত ধ্যানধারণার নমুনা বলেই অভিহিত করা প্রয়োজন।

এইখানে আমাদের মন্তব্যটি আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমরা নিরীশ্বরবাদ ও বস্তুবাদের কথা একই সঙ্গে উল্লেখ করলাম, কেননা এ-দুয়ের মধ্যে একটা তত্ত্বগত যোগাযোগ আছে, যেমন তত্ত্বগত যোগাযোগ আছে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের মধ্যে। সাংখ্য যে আদিতে নিরীশ্বরবাদই ছিলো এবং পরে তার উপর জোর করে ঈশ্বরতত্ত্ব চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিলো, এ-বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা বড়ো বেশি দ্বিমত হবেন না। এমন কি, আমাদের সনাতনপন্থী বিদ্বানেরাও তা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করছেন। কিন্তু সাংখ্যে যে আদিতে সুস্পষ্ট জড়বাদও ছিলো এবং উত্তরযুগে সাংখ্য-কারিকা ও সাংখ্য-সূত্রের মতো গ্রন্থেও ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাও যে বিজাতীয় ও প্রক্ষিপ্ত ধ্যানধারণারই নমুনা মাত্র—এ-বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা সম্যকভাবে সচেতন নন। এর কারণ কী এবং কী ভাবে এই কারণেই তাঁরা উপনিষদের মধ্যেও সাংখ্য-দর্শনের বীজ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন, তার আলোচনা তোলা প্রয়োজন।

প্রথমত, সাংখ্যে ঈশ্বরের স্থান আছে কী? পণ্ডিত কালিবর বেদান্তবাগীশ[১৩৫] লিখছেন :

> …মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণ, এই সকল গ্রন্থে কপিল সম্বন্ধে যেরূপ ইতিহাস প্রকটিত আছে তাহা দেখিলে কপিল ঈশ্বরনাস্তিক ছিলেন বলা দূরে থাকুক, তিনি সম্পূর্ণ আস্তিক, ঈশ্বরের প্রধান ভক্ত বা অবতার না বলিয়া থাকা যায় না। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ দেখিলে অনুভব হয়, তিনি একজন ঈশ্বরনাস্তিকের অগ্রগণ্য।…প্রথম অধ্যায়ের ৯২ সূত্র "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"।…ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু আভাস দিয়াছেন যে, এ-স্থলে ঈশ্বরাপলাপ করা কপিলের উদ্দেশ্য নহে ; বাদীর মুখস্তম্ভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ঈশ্বর নাই বলিবার অভিপ্রায় থাকিলে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এরূপ না বলিয়া "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ বিস্পষ্ট উক্তি করিতেন। ভাষ্যকার যাহাই বলুন, আমরা বুঝি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ", "ঈশ্বরাভাবাৎ" ফলকল্পে তুল্য।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় এখানে কপিলের গ্রন্থ বলতে সাংখ্য-সূত্রেরই উল্লেখ করছেন। এবং এই গ্রন্থে যে যে স্থানে "যে যে ভাবের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা আছে তাহা একত্রিত করিয়া" বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাঁর উপরোক্ত মন্তব্যের সঙ্গে সাংখ্য-সূত্রের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়

অন্যান্য উক্তিগুলির সহজ সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং এই কারণেই বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে শেষ পর্যন্ত উপরোক্ত উক্তিকে শুধরে বলতে হয়েছে যে, সাংখ্যের প্রকৃত কথাটা হলো, "নিত্য-ঈশ্বর নাই, কিন্তু জন্য-ঈশ্বর আছেন।"

এদিক থেকে অধ্যাপক গার্বের[৩৩] মন্তব্য আরো সংস্কারমুক্ত। তিনি দেখাচ্ছেন, প্রথমত সাংখ্য-সূত্র নামের গ্রন্থটিকে কপিলের রচনা বলে কল্পনা করবার কোনো কারণ নেই; এ-গ্রন্থের রচনাকাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী। বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য আরো শ' দেড়েক বছর পরের রচনা। এবং ওই সাংখ্য-সূত্রের মধ্যেও সাংখ্য-দর্শনের আদি অকৃত্রিম রূপটিকে দেখতে পাওয়া যায় না। কেননা, এই গ্রন্থের একটি মূল চেষ্টা হলো, সাংখ্য এবং উপনিষদের চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক প্রভেদকে অস্বীকার করা। গার্বে বলছেন, সাংখ্য-তত্ত্বের সঙ্গে ঈশ্বর এবং উপনিষদের ব্রহ্মের তত্ত্বের কোনো গরমিল নেই, কিংবা সাংখ্যের দিক থেকে স্বর্গলাভমূলক পুরুষার্থের কথায় অসঙ্গতি নেই—এর চেয়ে অসম্ভব অনুমান আর কিছুই হতে পারে না; অথচ, সাংখ্য-সূত্রকার সেই কথাটি প্রচার করবার জন্যেই বিস্তর অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত, ওই সাংখ্য-সূত্রের মধ্যে বৈদান্তিক প্রভাব যে কতো প্রকট তার পক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গার্বে নিম্নোক্ত সূত্রটির উল্লেখ করেছেন:

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ॥ সাংখ্যসূত্র : ৪,৩॥

অর্থাৎ, "যদি সকৃৎ শ্রবণে বিবেকজ্ঞান না হয় তবে তাহা বার বার শ্রবণ করিবে। (শ্বেতকেতু সাত বার শ্রবণের পর বিবেকজ্ঞান পাইয়াছিলেন)"। সাংখ্য-সূত্রের এই সূত্রটি যে একেবারে হুবহু ব্রহ্মসূত্রের (৪।১।১) পুনরুক্তিমাত্র, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। কিংবা, সাংখ্যসূত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের ১১৬ সূত্র হলো:

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা॥

এ-তত্ত্ব যে খাঁটি বৈদান্তিক তত্ত্ব এবং এমন কি 'ব্রহ্মরূপতা' বলে পরিভাষাটিও যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বেদান্ত-দর্শন থেকে গৃহীত হয়েছে, সে-বিষয়েই বা সন্দেহের অবকাশ কোথায়? বলাই বাহুল্য, এ-জাতীয় কথা যদি সত্যিই সাংখ্য-দর্শনেরই প্রতিপাদ্য হতো তাহলে বাদরায়ণের পক্ষে বেদান্ত-দর্শনের প্রধানতম প্রতিপক্ষ হিসেবে সাংখ্যকেই খণ্ডন করবার অমন তাগিদ থাকতো না।

তাহলে এই সাংখ্য-সূত্র বলে পুঁথিটি নামে সাংখ্য হলেও বিজাতীয়,—অর্থাৎ বৈদান্তিক,—চিন্তাধারায় ভরপুর। এবং সাংখ্য সূত্রেরই যদি এই দশা হয়, তাহলে বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য যে এ-বিষয়ে আরো অনেক চূড়ান্ত আপোসের পরিচয় দেবে সে-বিষয়ে আর বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়? স্বভাবতই আদি-সাংখ্যের নিরীশ্বরতাকে উড়িয়ে দেবার আশায় তাঁকে নানা রকম অত্যদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করতে হয়েছে; অধ্যাপক গার্বে এই বিস্ময়কর যুক্তিগুলির তালিকা করে দিয়েছেন।

সাংখ্য যে আদিতে এই রকম নিরীশ্বরবাদই ছিলো,—অতএব আজকাল সাংখ্য-দর্শনের মধ্যে আমরা যে-সব আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের পরিচয় পাই, সেগুলি যে উত্তরকালে সাংখ্যের উপর প্রক্ষিপ্ত ধ্যানধারণা মাত্র—এ-বিষয়ে স্পষ্টভাবে সচেতন হলেও আধুনিক বিদ্বানেরা আর একটি বিষয় সম্বন্ধে সম্যক-ভাবে সচেতন হননি। বিষয়টি হলো, আদি-সাংখ্য শুধুই নিরীশ্বরবাদ নয়, জড়বাদ বা বস্তুবাদও। এই বিষয়টি সম্বন্ধে সম্যকভাবে সচেতন নন বলেই আধুনিক বিদ্বানেরা সাধারণত সাংখ্য-দর্শনকে বস্তুবাদ না বলে দ্বৈতবাদ বা *dualism* আখ্যা দিয়ে থাকেন।

দ্বৈতবাদ বলা হয় কেন? কেননা, সাংখ্যে প্রকৃতি ছাড়াও পুরুষের তত্ত্ব রয়েছে এবং প্রকৃতি অচেতন-পদার্থ হলেও পুরুষ চেতন পদার্থ।

অতএব, আমাদের পক্ষে প্রশ্ন তোলা দরকার সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি ছাড়াও ওই পুরুষের তত্ত্ব আছে বলেই কি তাকে বস্তুবাদ না বলে দ্বৈতবাদ বলা প্রয়োজন? উত্তরে আমরা বলতে চাই, অন্তত আদি-সাংখ্যকে এই-ভাবে দ্বৈতবাদ বলবার প্রয়োজন নেই। কেননা তা যদি থাকতো তাহলে বাদরায়ণ-প্রমুখ প্রাচীনেরা সে-তাগিদ অনুভব করতেন—অর্থাৎ, সাংখ্যকে সরাসরি অচেতনকারণ-বাদ না বলে তাঁরা একে অচেতন-চেতন-কারণবাদ বা ওই ধরনের কোনো আখ্যা দিতে বাধ্য হতেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রাচীনেরা সাংখ্যকে শুধুমাত্র অচেতনকারণ-বাদ আখ্যা দিতে কোনো রকম দ্বিধা বোধ করেননি। তার কারণ কি এই যে, তাঁরা জানতেন না সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি ছাড়াও পুরুষের তত্ত্ব আছে? নিশ্চয়ই জানতেন। কিন্তু তা ছাড়াও তাঁরা জানতেন যে, এই পুরুষের স্থান সাংখ্য-দর্শনের আদি-অকৃত্রিম সংস্করণটিতে এমনই গৌণ যে, তা থাকলেও যেন না থাকারই সামিল। কেননা পুরুষ অপ্রধান, পুরুষ উদাসীন। "কথঞ্চোদাসীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্তয়েৎ?" —উদাসীন পুরুষ কী ভাবে প্রধানকে প্রেরণ করবে? এবং বৈদান্তিকেরা অত্যন্ত স্পষ্টভাষাতেই বলেছেন, এ-বিষয়ে সাংখ্য-দর্শনের অন্ধ-পঙ্গু বা লৌহ-অয়স্কান্তের উপমা কোনোমতেই সন্তোষজনক হতে পারে না। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, আধুনিক বিদ্বানেরাও অনেকেই কী ভাবে সাংখ্য-দর্শনের মধ্যে পুরুষের

স্থান নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন: ন্যায়সঙ্গতভাবে সাংখ্যতত্ত্বের সঙ্গে পুরুষের কোনো মৌলিক যোগাযোগ নেই, অথচ তা রয়েছে; জগৎকারণ অচেতন প্রকৃতি বা প্রধানের পাশে পুরুষের তত্ত্বটুকু বাস্তবিকই এতো গৌণ যে, সাংখ্য-দর্শনের প্রবর্তকেরা এটুকু বাদ দিলেই বরং আরো যুক্তিসঙ্গত মনোভাবের পরিচয় দিতেন। আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, আদিতে পুরুষ বলতে চেতন-আত্মার পরিবর্তে পুরুষমানুষই বোঝাতো এবং সাংখ্য-তত্ত্বের মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজবাস্তব প্রতিবিম্বিত হয়েছে বলেই সে-সমাজে পুরুষের স্থানকে কেন্দ্র করে যে-অন্তর্বিরোধ, তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সাংখ্য-দর্শনের পুরুষতত্ত্বটি নিয়ে অন্তর্বিরোধের মধ্যে। আপাতত, সে-যুক্তির কথা বাদ দিয়েও আমরা দেখাতে চাইছি যে, সাংখ্য-দর্শনে পুরুষের তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও আদি-সাংখ্যকে দ্বৈতবাদ মনে করা ঠিক হবে না; কেননা ওই প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে গুরুত্ব সমান নয়—প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির স্থান এমনই গৌণ ও অকিঞ্চিৎ যে, আধুনিক বিদ্বানেরা এমন কি একথাও মনে করেছেন যে, এই তত্ত্বটিকে বাদ দিলেই বরং সাংখ্যকারেরা আরো বেশি সুসংলগ্ন চিন্তার পরিচয় দিতেন। এবং বাদরায়ণ প্রমুখ প্রাচীন বিদ্বানেরাও তর্ক করে বলেছেন, অচেতনকারণবাদ হিসেবে সাংখ্যের যেটা মূল দুর্বলতা (আমরা বলতে পারি বৈশিষ্ট্য) তা ওই উদাসীন পুরুষটির তত্ত্ব যোগ করেও খুব কিছু পরিবর্তিত হয় না। অতএব, প্রাচীন ও আধুনিক বিদ্বানদের এই যুক্তি যদি ঠিক হয় তাহলে, পুরুষের তত্ত্ব আছে বলেই সাংখ্য-দর্শনকে বস্তুবাদ বা *materialism* না বলে দ্বৈতবাদ বা *dualism* বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[৩৭] প্রাচীন সাংখ্য সংক্রান্ত আর একটি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন যার তাৎপর্য আমাদের এই যুক্তিকে সম্যকভাবে সাহায্য করতে পারে। তিনি দেখাচ্ছেন, সাংখ্য-দর্শনের প্রাচীনতর একটি রূপের পরিচয় পাওয়া যায় চরক-সংহিতায়,—যদিও দুঃখের বিষয়, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলছেন, আধুনিক বিদ্বানেরা এই রূপটির প্রতি এখনো উপযুক্ত মনোযোগ দেননি। অতএব প্রশ্ন হলো, চরক-সংহিতায় সাংখ্য-দর্শনের যে-পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার দিক থেকে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ কী রকম? চরকের মতে, প্রকৃতিরই অব্যক্ত অংশটির নাম পুরুষ। প্রকৃতির যেটা বিকার বা পরিণামের দিক তার নাম ক্ষেত্র এবং প্রকৃতির যেটা অব্যক্ত দিক তার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ: অব্যক্তমস্য ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞমৃষয়ো বিদুঃ। অব্যক্ত এবং চেতনা একই। এই চেতনা বা অব্যক্ত-প্রকৃতি থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে অহংকার, অহংকার থেকে পঞ্চভূত এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি এবং সেই উৎপত্তিকেই আমরা সৃষ্টি আখ্যা দিয়ে থাকি।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের যুক্তি যদি ঠিক হয়,—অর্থাৎ, চরক-

সংহিতায় যদি সত্যিই সাংখ্য-দর্শনের কোনো প্রাচীনতর পর্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেই পরিচয় অনুসারে সাংখ্যের পুরুষও যদি প্রকৃতিরই অব্যক্ত অংশমাত্র হয়,—তা হলে সাংখ্যের আদিরূপটিকে দ্বৈতবাদ না বলে বস্তুবাদ আখ্যা দেবার সম্ভাবনা অনেক বাড়ে না কি? এবং সাংখ্য-দর্শন এইভাবে মূলত বস্তুবাদী ছিলো বলেই ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী বৈদান্তিক চিন্তাধারার পক্ষ থেকে সাংখ্য-দর্শনকেই প্রধানতম প্রতিপক্ষ বলে গ্রহণ করবার তাগিদটাও অনেক ভালো করে বুঝতে পারা যায়।

সাংখ্য হলো অচেতনকারণবাদ, প্রধানকারণবাদ। সাংখ্যমতে পুরুষ নেহাতই অপ্রধান এবং উদাসীন। এই মূল কথা ক'টি মনে রেখে এবার আমরা উপনিষদের সেই অংশগুলির বিচার করবো যেগুলির মধ্যে আধুনিক বিদ্বানেরা সাংখ্য-দর্শনের বীজ আবিষ্কার করবার কল্পনা করেছেন। এ-জাতীয় অংশের তালিকা আমরা ইতিপূর্বেই তৈরি করেছি; এখানে সে-তালিকা থেকে কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা যাক :

কঠোপনিষৎ থেকে :

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ॥ ১,৩,১০॥

মহৎ হইতে জগতের বীজরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; তিনি শেষ, তিনি পরা গতি॥ ১, ৩, ১১॥

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব হইতে মহান আত্মা অধিক, মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ॥ ২,৩,৭,॥

অব্যক্ত হইতে ব্যাপক এবং অ-লিঙ্গ পুরুষ শ্রেষ্ঠ, যাঁহাকে জানিয়া জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ২,৩,৮,॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ থেকে :

ঈশ্বর এই পরস্পরসংযুক্ত ক্ষর ও অক্ষর, ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমুদয় বিষয় ধারণ করিয়া আছেন। আর অনীশ (অর্থাৎ ঈশ্বরত্ববিহীন) আত্মা ভক্তৃভাববশতঃ অবিদ্যাদি বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু দেবকে (অর্থাৎ ঈশ্বরকে) জানিয়া সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হয়॥১,৮॥

প্রধান (অর্থাৎ প্রকৃতি) ক্ষর; হর (*the soul*, হিউমের তর্জমা) অমৃত ও অক্ষর। সেই 'একঃ দেবঃ' প্রকৃতি ও আত্মাকে নিয়মিত করেন। তাঁহার চিন্তন এবং তাঁহার সহিত সংযোগ ও একত্বদ্বারা অন্তে সম্পূর্ণরূপে সমুদয় মোহ নষ্ট হয়॥১,১০॥

পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মাই মহান প্রভু, ইনি অন্তঃকরণের প্রবর্তক, সুনির্মল পরমপদ প্রাপ্তির নিয়ন্তা, জ্যোতির্ময় ও অব্যয় ।।৩,১২।।

লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা বহু প্রজার উৎপাদিকা এক অজার সহিত শয়ন করিয়া এক অজ উপভোগ করে ; অপর অজ এই ভুক্তভোগ্যাকে পরিত্যাগ করে ।। ৪,৫।।

মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে ; তাঁহার অঙ্গসমূহ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে ।।৪, ১০।।

যে অদ্বিতীয় (পরমাত্মা) প্রত্যেক কারণ, সমুদয় রূপ এবং সমুদয় বীজের অধিষ্ঠাতা, যিনি সকলের অগ্রে প্রসূত ঋষি কপিলকে (=কনকবর্ণ হিরণ্যগর্ভ ?) জ্ঞানদ্বারা পোষণ করেন এবং তাঁহাকে জন্মাইতে দেখিয়াছিলেন ।।৫, ২।।

যিনি (পরমাত্মা) গুণত্রয়যুক্ত হইয়া সুখদুঃখাদি ফলবৎ কর্ম করেন, তিনিই সেই কর্মের ফলভোগ করেন। তিনি নানারূপ ত্রিগুণ, ত্রিবর্ত্মা হইয়া নিজকর্মবশে সঞ্চরণ করেন ।।৫, ৭।।

যিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র রবিতুল্যরূপ, যিনি সংকল্প ও অহংকারের সহিত মিলিত হইয়া বুদ্ধি ও আত্মগুণ সমন্বিত হইয়া লৌহকণ্টকের অগ্রভাগের ন্যায় দৃষ্ট হন ।।৫, ৮।।

যে অদ্বিতীয় দেবতা উর্ণনাভের ন্যায় স্বভাবতঃ প্রধানজাত তন্তুসমূহদ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের ব্রহ্মে প্রবেশ বিধান করুন ।।৬, ১০ ।।

যিনি নিত্যদিগের মধ্যে নিত্য, চেতনাবদ্‌দিগের মধ্যে চেতনাবান, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তুসকল বিধান করিতেছেন, সেই কারণরূপী দেবকে সাংখ্য-যোগ দ্বারা জানিয়া সাধক সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হন ।।৬, ১৩।।

(হিউমের[১৩৮] তর্জমা অনুসারে এখানে সাংখ্য-যোগ *discrimination and abstraction*—প্রাচীন ভাষ্যকারদের অনুসরণ করেই হিউম এ-তর্জমা করেছেন)।

তিনি বিশ্বকৃৎ, বিশ্ববিৎ, স্বয়ম্ভূ, কালের কর্তা, গুণী, সর্ববিৎ, প্রধানের ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বামী গুণের ঈশ্বর এবং সকলের স্থিতি, বন্ধন ও মোক্ষের কারণ।।৬, ৮৬।।

একইভাবে, গীতা-বর্ণিত সাংখ্যও[১৩৯] বাদরায়ণ-খণ্ডিত সাংখ্য নয়।

এখানে, একটি অত্যন্ত সরল প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন : বাদরায়ণ সাংখ্য-মত হিসেবে যে-অচেতনকারণবাদকে খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন, উপনিষদের উদ্ধৃত উক্তিগুলির মধ্যে কি সেই মতেরই পরিচয় পাওয়া যায়, না, সেই মতকে চেতনকারণবাদের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাই চোখে পড়ে ? উপনিষদের ওই অংশগুলিতেও কি জগৎকারণ হিসেবে অচেতন প্রধানকেই চেনবার চেষ্টা করা হয়েছে ? এখানেও কি পুরুষকে অপ্রধান এবং উদাসীন হিসেবে গৌণ জ্ঞান করা হয়েছে ? নিশ্চয়ই নয়। বরং তার বিপরীত কথাই এই উক্তিগুলির মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কঠোপনিষদ বলছে, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। একি সাংখ্যের মত, না, সাংখ্যমত খণ্ডন ? অন্তত, সাংখ্যমত হিসেবে বাদরায়ণ

যে-মতটি খণ্ডন করছেন এখানে নিশ্চয়ই তার পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যখন প্রধানকে ছোটো করে পুরুষ, পরমাত্মা, দেব ও ঈশ্বরের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যখন বলা হচ্ছে অদ্বিতীয় দেবতাই উর্ণনাভের ন্যায় আত্মস্বভাব প্রসূত প্রকৃতি দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করেছেন—তখন কি আমরা সে-কথাকে সাংখ্যের উপদেশ বলে গ্রহণ করবো, না, সাংখ্যের অচেতনকারণ-বাদকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করে, চেতনকারণ-বাদকেই প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন বলে স্বীকার করতে বাধ্য হবো ?

মনে রাখতে হবে, সাংখ্য-দর্শন মানে অব্যক্ত, মহৎ, প্রকৃতি, পুরুষ প্রভৃতি কয়েকটি দার্শনিক পরিভাষামাত্র নয় ; তাই উপনিষদের মধ্যে ওই পরিভাষা-গুলির পরিচয় পেলেই সাংখ্য-দর্শনের বীজ খুঁজে পাওয়া গেলো বলা যায় না। তার বদলে, সাংখ্য একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ, যে-মতবাদটিকে খণ্ডন করবার জন্য বাদরায়ণ অতো রকমের আয়োজন করেছেন। সে-মতবাদ অনুসারে অচেতন প্রকৃতি বা প্রধানই জগৎকারণ ; পুরুষ নেহাতই অপ্রধান এবং উদাসীন। এই কথাটি মনে রাখলে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে, উপনিষদের মধ্যেই ওই সাংখ্যমতের বীজ খুঁজে পাওয়া সত্যিই যাচ্ছে না ; তার বদলে সাংখ্যমত খণ্ডনেরই একটা প্রবল প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অতএব, উপনিষদের এই সাক্ষ্যগুলি থেকে বুঝতে পারা যায় যে, সাংখ্যমত শুধুই যে উপনিষদ-বিরুদ্ধ তাই নয়, তুলনায় প্রাচীনতরও। উপনিষদ রচনার আগে থাকতেই এই মতটি নিশ্চয়ই এদেশে প্রচলিত ছিলো ; তা না হলে উপনিষদকারেরা কী করে এই মতকে এ-ভাবে খণ্ডন করবার চেষ্টা করলেন ?

এদিক থেকে, শঙ্করাচার্য[১১০] যখন বলেন, উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সাংখ্যাদিমত খণ্ডনের একান্ত প্রয়োজন,—'বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ সম্যগ্দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি সাংখ্যাদিদর্শনানি নিরাকরণীয়ানীতি'—তখন তিনি নিশ্চয়ই আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে যাঁরা বেদান্ত বা উপনিষদের মধ্যেই সাংখ্যের বীজ অনুসন্ধান করেন তাঁদের তুলনায় সাংখ্য ও উপনিষদ উভয় মতবাদকেই অনেক সম্যকভাবে বোঝবার সহায়তা করেন।

অধ্যাপক রিচার্ড গার্বের কথায় ফিরে আসা যাক। তিনি যখন সিদ্ধান্ত করছেন যে, সাংখ্য আদিতে অ-বৈদিক মত ছিলো, তখন আমরা তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহজেই একমত হতে পারি। বেদান্ত-সূত্রকারের সাংখ্য-খণ্ডনই এর একমাত্র প্রমাণ নয়। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি পশুপালন-নির্ভর বৈদিক সমাজ পুরুষ-প্রধান ছিলো বলেই বৈদিক চিন্তাধারাতেও এই পুরুষ-প্রাধান্যের স্বাক্ষর পাওয়া যায় ; অপরপক্ষে সাংখ্য-দর্শনের প্রধান বা প্রকৃতি শুধুই অচেতনবস্তুবাচক বা *material principle* নয়, তাছাড়াও

নারীবাচক বা *female principle*-ও। কিন্তু অধ্যাপক গার্বে সেইসঙ্গেই যখন বলেন, কালক্রমে এই সাংখ্য-দর্শনই উপনিষদাদির মধ্যে স্বীকৃত বা গৃহীত হয়েছিলো, তখন স্বভাবতই আমরা তাঁর মন্তব্যটিকে মেনে নিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করি। কেননা, উপনিষদের চিন্তাধারা শুধুই ভাববাদী বা *idealistic* নয়, পুরুষপ্রধানও (পৃঃ ১৫২)। অতএব, উপনিষদের চিন্তাধারার মধ্যে কালক্রমে সাংখ্য-মতের স্থান হওয়ার সম্ভাবনা সত্যিই সঙ্কীর্ণ। এবং উপনিষদের মধ্যে সাংখ্য-মত স্বীকৃত হবার নিদর্শন হিসেবে অধ্যাপক গার্বে উপনিষদের যে-অংশগুলির উল্লেখ করছেন, সেগুলিকে স্পষ্টভাবে বিচার করলেও আমরা দেখতে পাই যে, আসলে সেখানে সাংখ্যমত গ্রহণ করবার পরিবর্তে সাংখ্যমত খণ্ডন করবার প্রচেষ্টাটাই প্রকট। আমরা আরো বলতে চাই যে, অধ্যাপক গার্বের যুক্তি এখানে স্বপক্ষদোষদুষ্টও হয়েছে। কেননা, সাংখ্য যে আদিতে শুধু নিরীশ্বরবাদই নয়, বস্তুবাদও ছিলো—একথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। এবং একথা যদি ঠিক হয় তাহলে তাঁকে মানতে হবে যে, অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী উপনিষদের মধ্যেই কালক্রমে নিরীশ্বরবাদী ও বস্তুবাদী সাংখ্য-দর্শনেরও স্থান হয়েছিলো।

আদিসাংখ্যকে যে বস্তুবাদী বলাই বাঞ্ছনীয়—একথা অধ্যাপক গার্বে কী ভাবে স্বীকার করছেন? বৌদ্ধদর্শনের আদিরূপটির সঙ্গে সাংখ্যের আদিরূপটির সাদৃশ্য দেখাবার উদ্দেশ্যে তিনি[১৪১] বলছেন:

> ...it is a merit of Oldenberg to have emphatically pointed out the fact that primitive Buddhism does not yet know the often mentioned speculations on the nothingness of the world, but that, on the contrary, the idea of nothingness belongs to the later metaphysics of the Buddhists. The world of objects is, therefore, considered to be real by Buddha as well as by Kapila (c.f. Sutra I, 79; VI, 52); and this world of objects comprehends also the *psychic organs and states* according to the systems of both. As in Sankhya philosophy, even the highest internal processes, like thinking, volition, judging, etc., are mechanical functions of Matter, which are not to be ascribed to the Atman, but must be known to be *anatman*, so Buddha teaches, too, that... 'sentiments, conceptions and cognition' are *anatta* (= *anatma*).

সাংখ্য-মতে যদি চিন্তা, ইচ্ছা, বিচার প্রভৃতি মানসব্যাপারগুলিও অচেতনবস্তু

বা *matter*-এরই যান্ত্রিক বিকাশমাত্র হয়,—যদি এগুলিও আত্মজনিত না হয়ে অনাত্মজনিতই হয়,—তাহলে বৌদ্ধ দর্শনের আদিরূপটির সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকুক আর নাই থাকুক, অন্তত উপনিষদের চিন্তার মধ্যে তার স্থান কষ্টকল্পিত হতে বাধ্য। কেননা, উপনিষদ মূলতই ভাববাদী এবং এই ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদের সংঘর্ষই দর্শনের ইতিহাসে সবচেয়ে মৌলিক দ্বন্দ্ব[১৪২]। এবং অধ্যাপক গার্বেও স্বীকার করেছেন যে, উপনিষদের চিন্তার সঙ্গে সাংখ্যের যে-বিরোধ, তা আসলে ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদেরই মূল বিরোধ। অধ্যাপক গার্বে[১৪৩] বলছেন, "আমার মতে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে, উপনিষদের ব্রহ্মন্-আত্মন্‌মূলক যে ভাববাদী মতবাদ,—যে-মতবাদ বেদ থেকেই শুরু এবং উত্তরকালে যা বেদান্ত দর্শনের কেন্দ্র হয়েছে—সেই মতবাদটি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতবাদের তুলনায় প্রাচীনতর। এই ভাববাদ সংহত-রূপে এবং সোৎসাহে প্রচারিত হতে শুরু হবার পর এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবেই সাংখ্য-দর্শনের উদ্ভব হয়েছিলো"।

বেদান্ত ভাববাদী, সাংখ্য বস্তুবাদী—দুয়ের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ। উপরোক্ত উক্তির মধ্যে এই স্বীকৃতিটি অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, আমরা দুয়ের মধ্যে উপনিষদের ভাববাদকেই প্রাচীনতর এবং সাংখ্যের বস্তুবাদকে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া-মাত্র বলে স্বীকার করতে বাধ্য। বরং, আমাদের পক্ষে নিছক ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে যেটুকু সংগ্রহ করা সম্ভবপর, তার সাক্ষ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, আমরা আগেই দেখেছি, উপনিষদ-সাহিত্যের মধ্যে—এবং বিশেষ করে ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে—সাংখ্য-মতের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রচেষ্টাটা স্পষ্ট; অপরপক্ষে সাংখ্যের কোনো গ্রন্থেই আমরা উপনিষদের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে অভিযানের লক্ষণ দেখতে পাই না। অবশ্যই, এ-কথা ঠিক যে, ষষ্টিতন্ত্র প্রভৃতি সাংখ্যের আদি গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হয়েছে এবং সাংখ্য-সূত্র ও এমন কি সাংখ্যকারিকাও অনেক পরের রচনা বলেই এগুলির মধ্যে সাংখ্যের আদিরূপটির পরিচয় নেই। সাংখ্যের আদিগ্রন্থ উদ্ধার করা সম্ভব হলে তার মধ্যে বৈদান্তিক ভাববাদের বিরুদ্ধে সচেতন অভিযানের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেতো কিনা সে-কথা কল্পনা করেও কোনো লাভ নেই। হয়তো যেতো; কিন্তু তার থেকেই প্রমাণিত হতো না যে, উপনিষদের ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবেই সাংখ্য-দর্শনের সূত্রপাত হয়েছিলো। কেননা, তন্ত্রের সঙ্গে সাংখ্যের সাদৃশ্যের দিক থেকে এবং সাংখ্যকে তন্ত্রেরই দার্শনিক সংস্করণ হিসাবে চেনবার দিক থেকে, আমরা যে-কথা বোঝবার চেষ্টা করছি তা হলো সাংখ্য আগে না উপনিষদ আগে,—এই তর্কই অনেকাংশে ভ্রান্তিপ্রসূত। আসলে বেদান্ত ও সাংখ্য—দুটি চিন্তাধারা বৈদিক ও অবৈদিক দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পরিচায়ক। এবং

বৈদিক ও অবৈদিক এই দুটি সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যকে আধুনিক বিদ্বানেরা অনেক সময় নিছক জাতিগত পার্থক্যের দিক থেকে বোঝবার চেষ্টা করে ভুল করেছেন; কেননা, এই দুটি সংস্কৃতির মধ্যে যে-পার্থক্য, তার সঙ্গে জাতিগত পার্থক্যের সম্পর্ক থাকুক আর নাই থাকুক, অন্তত নিছক জাতিগত পার্থক্য হিসেবে তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা যায় না। আমরা ইতিপূর্বেই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, তান্ত্রিক ও বৈদিক ঐতিহ্যের মধ্যে যে-মৌলিক পার্থক্য তার ব্যাখ্যা উৎপাদন-পদ্ধতির পার্থক্যের দিক থেকেই খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর : পশুপালন-প্রধান জীবন বলেই বৈদিক সমাজ পুরুষ-প্রধান এবং বৈদিক সমাজের প্রতিফলন হিসেবে বৈদিক চিন্তাধারাও পুরুষ-প্রধান। অপরপক্ষে কৃষি-নির্ভর মাতৃপ্রধান সমাজের প্রতিফলন হিসেবে, তান্ত্রিক চিন্তাধারা শক্তি-প্রধান বা মাতৃপ্রধান। তন্ত্রের সঙ্গে সাংখ্যের সাদৃশ্য যদি সত্যিই মৌলিক হয় তাহলে বৈদান্তিক চিন্তাধারার সঙ্গে সাংখ্য-মতের বিরোধটিকেও এই দিক থেকেই বোঝবার অবকাশ থাকে নাকি?

অবশ্যই এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠবে। সাংখ্যের প্রকৃতি বলতে শুধু-মাত্র *female principle* নয়; *material principle*-ও। তাই নারীপ্রাধান্য ও পুরুষ-প্রাধান্যমূলক প্রভেদ ছাড়াও সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের দিক থেকে যে-তফাত—তার ব্যাখ্যা উপরোক্ত উক্তির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই বস্তুবাদের দিক থেকে এখানে নতুন সমস্যাও ওঠে। বৈদান্তিক বা উপনিষদের চিন্তাধারা যতো চূড়ান্ত ভাববাদীই হোক না কেন, তারও একটা অতীত ছিলো এবং সেই অতীতটিকে পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই লোকায়তর মতোই একরকম প্রাকৃত বস্তুবাদী ধ্যানধারণার ধ্বংসস্তূপের উপর বৈদান্তিক ভাববাদের আবির্ভাব ঘটেছে, যদিও সেই প্রাকৃত বস্তুবাদের সঙ্গে লোকায়তিক বস্তুবাদের মূল প্রভেদ হলো এ-বস্তুবাদ পুরুষ-প্রধান চেতনার অঙ্গ, তন্ত্র ও সাংখ্যের মতো নারীপ্রাধান্যের পরিচায়ক নয়। বৈদিক ঐতিহ্য অতি দীর্ঘ; সংহিতা থেকে শুরু করে উপনিষদ পর্যন্ত সহস্রাধিক বছর ধরে রচিত হয়েছে তার সাহিত্যিক নিদর্শন। এবং এই সহস্রাধিক বছরের সাহিত্যিক নিদর্শন হুবহু একই ধ্যানধারণার পরিচায়ক নয়: এ-সাহিত্যের প্রাচীনতর অংশে ভাববাদের পরিচয় নেই এবং সেদিক থেকে পুরুষপ্রধান চিন্তার পরিচায়ক হলেও লোকায়তর মতোই তা অস্ফুট বস্তুবাদই। সেই অস্ফুট ও আদিম বস্তুবাদের ধ্বংসস্তূপের উপরই কালক্রমে উপনিষদের ভাববাদের অবির্ভাব হয়েছে। অতএব এদিক থেকে বলা যায়, উত্তরকালে বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকেরা যে-বস্তুবাদী চিন্তাকে অমন ঘৃণার চোখে দেখতে শিখেছিলেন, সেই বস্তুবাদই তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছে—বৈদিক ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাতাদের

কাছে—সত্যের মর্যাদা পেয়েছিলো। কামাচার অর্থে বামাচার প্রসঙ্গেও আমরা ইতিপূর্বে (পৃঃ ১০৩—১১২) এই বৈশিষ্ট্যটিই লক্ষ্য করেছি। আমরা দেখেছি, এই কামাচার বা বামাচার মানবোন্নতির প্রাচীন পর্যায়ের জাদুবিশ্বাসেরই পরিচায়ক ; তার মূল কথা হলো প্রাকৃতিক উৎপাদনকে মানবীয় প্রজননের অনুকরণেই আয়ত্তে আনবার কল্পনা। বৈদিক ঐতিহ্যে সেই জাদুবিশ্বাসের স্মারক থেকেই প্রমাণিত হয় এ-ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাতারা মানবোন্নতির সেই প্রাচীন পর্যায়েই জীবন-যাপন করতেন, যদিও তাঁদের অর্থনীতি মূলতই বা প্রধানতই পশুপালন-নির্ভর ছিলো বলেই, এ-জাদুবিশ্বাস শুধুই পুরুষপ্রধান নয়, লোকায়তিক বামাচারের তুলনায় অনেকাংশেই গৌণ। কারণ, ওই লোকায়তিক সংস্কৃতি মূলতই কৃষিনির্ভর, এবং কৃষিকাজের তুলনায় পশুপালনের ক্ষেত্রে জাদুবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কম (পৃঃ ৩৪২—৩৪৭)।

তাহলে, কালক্রমে লোকায়তর সঙ্গে বৈদান্তিক ধ্যানধারণার যতো প্রভেদই দেখা যাক না কেন, এই বৈদিক ঐতিহ্যেরও যেটা প্রাচীনতম পর্যায় তার সঙ্গে লোকায়তিক চিন্তার সাদৃশ্য দেখা যায়। আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, এই সাদৃশ্যের মূল কারণ হলো উভয়েই প্রাক্-বিভক্ত সমাজের—এবং অতএব প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণার—পরিচায়ক : বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকেরা ওই প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে তুলেছিলেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, এবং তারই প্রতিবিম্ব হিসেবে তাঁদের ধ্যানধারণায় আবির্ভাব হয়েছিলো অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের। কিন্তু সে-ভাববাদের নিচে, প্রাক্-বিভক্ত সমাজের স্মৃতি বহন করে একটা অস্ফুট বস্তুবাদের ইতিহাস চাপা পড়ে আছে, এবং প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্যানধারণার স্মৃতি হিসেবেই তার সঙ্গে লোকায়তিক চিন্তাধারার ওই সাদৃশ্য। বৈদিক সাহিত্যে ওই প্রাক্-বিভক্ত সমাজের স্মৃতি হিসেবেই গণ ও ব্রাত্যের কীরকম গৌরবময় অতীতের পরিচয় পাওয়া যায় তার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেই করেছি (পৃঃ ২২৯—২৩২)।

ওই প্রাক্-বিভক্ত সমাজ ও তার প্রাক্ অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণার আলোচনায় পরে প্রত্যাবর্তন করা যাবে। তার আগে লোকায়ত, সাংখ্য ও তন্ত্রের কথাটা আরো ভালো করে দেখা যাক।

লোকায়ত, তন্ত্র, সাংখ্য : অসুর-মত

এই প্রসঙ্গে আর একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়ের উল্লেখ করা যাক। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে, তন্ত্রও শুধুমাত্র নারীপ্রধান ধ্যানধারণার পরিচায়ক নয় ;

দেহতত্ত্বের দিক থেকে এই চিন্তাধারাকে বস্তুবাদ আখ্যা দেবার প্রয়োজন আছে,—সে-বস্তুবাদ যতো আদিম, যতো অস্ফুট এবং জ্ঞানের দৈন্যে তা যতোই অসম্পূর্ণ ও মানব শৈশবের পরিচায়ক হোক না কেন। বস্তুত, গুণরত্ন প্রমুখের রচনায়, তন্ত্রের সঙ্গে লোকায়তর সম্পর্কমূলক যে-ইংগিত পাওয়া যায়, আমরা তার ব্যাখ্যা তন্ত্রের এই অস্ফুট বস্তুবাদের দিক থেকেই পাবার চেষ্টা করেছি। অতএব, তন্ত্রের সঙ্গে সাংখ্যের যদি তত্ত্বগত সাদৃশ্য থাকে—সাংখ্য যদি তন্ত্রেরই অপেক্ষাকৃত মার্জিত ও দার্শনিক সংস্করণ হয়,—তাহলে সাংখ্যের সঙ্গে লোকায়তরও একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। স্বভাবতই, আস্তিকদের রচনায় আমরা এই সম্পর্কটির ইংগিত প্রত্যাশা করবো না। কেননা, আদি-সাংখ্য অবৈদিক মতবাদ হওয়া সত্ত্বেও, উত্তরকালে তাকে আস্তিক করে নেবার এমন প্রবল চেষ্টা করা হয়েছে যে, সাংখ্যের আদিরূপটিই আমাদের কাছে অনেকাংশে অপরিচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, আস্তিক-সাহিত্যের বাইরেই আদি-সাংখ্যের সঙ্গে লোকায়তর সম্পর্কমূলক ইংগিত অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত হবে।

সুখের বিষয়, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত[১৪৪] ইতিপূর্বেই এই বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন যে, জৈন লেখকরা সাংখ্য এবং লোকায়তর মধ্যে খুব বড়ো রকমের কোনো তফাত স্বীকার করেননি।

> After the treatment of the views of the *lokayata nastikas*, the *Sutra-kritanga-sutra* treats of the Samkhyas. In this connection Silanka says that there is but little difference between the *lokayata* and the Samkhya, for though the Samkhyas admit souls, these are absolutely incapable of doing any work, and all the work is done by *prakriti* which is potentially the same as the gross elements. The body and the so-called mind is therefore nothing but the combination of the gross elements, and the admission of separate *purusas* is only nominal. Since such a soul cannot do anything, and is of no use (*akimcitkara*), the Lokayatas flatly deny them.

সূত্রকৃতাঙ্গসূত্রে লোকায়ত নাস্তিকদের মত আলোচনার পর সাংখ্যমত আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শীলাঙ্ক বলছেন, লোকায়ত ও সাংখ্যের মধ্যে সামান্যই প্রভেদ আছে; কেননা যদিও সাংখ্য-দর্শনে আত্মা স্বীকৃত হয়েছে তবুও সে-আত্মার পক্ষে কোনো ক্রিয়াই সম্ভব নয়—সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতির এবং প্রকৃতি বলতে স্থূলভূতেরই অব্যক্ত অবস্থা। অতএব, দেহ এবং তথাকথিত মন স্থূলভূতের সংমিশ্রণ ছাড়া কিছুই নয় এবং স্বতন্ত্র পুরুষের স্বীকৃতিটা নামমাত্রই।

এই আত্মা অক্রিয় ও অকিঞ্চিৎকর বলেই লোকায়তরা এঁকে সরাসরি অস্বীকার করেছে।

জৈন গ্রন্থে লোকায়তর সঙ্গে সাংখ্যের এই যে-সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হয়েছে, সাধারণত তার প্রতি উপযুক্ত গুরুত্ব অর্পণ করা হয় না। কিন্তু বাদরায়ণ যে-ভাবে সাংখ্যমতকে অচেতনকারণ-বাদ বা বস্তুবাদ বলেই সনাক্ত করতে চেয়েছেন এবং চরক-সংহিতায় পুরুষকে যে-ভাবে প্রকৃতিরই অব্যক্ত অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে আমরা হয়তো দেখতে পাবো, জৈন লেখকদের এই উক্তি আসলে অতিশয়োক্তি নয়।

লোকায়তর সঙ্গে তন্ত্র ও সাংখ্যের কোনো-একটা সম্পর্ক অনুসন্ধান করা যে একান্তই অসম্ভব নয় এখানে আমরা সে-বিষয়ে আরো কয়েকটি চিত্তাকর্ষক তথ্য উপস্থিত করবো।

প্রথমত দেখা যায়, লোকায়তকে নানানভাবে অসুর-মত বলে বর্ণনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তার পিছনে নিশ্চয়ই লোকায়তকে নিন্দা করবার উৎসাহ ছিলো; কিন্তু তা সত্ত্বেও এরই মধ্যে কিছুটা ঐতিহাসিক তথ্যের আভাস থাকা অসম্ভব নয়।

আমরা ইতিপূর্বেই (পৃ: ৪৩৮) এ-বিষয়ে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতবাদ দীর্ঘভাবে আলোচনা করেছি। তিনি বলছেন, ছান্দোগ্য-উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে দেহাত্মবাদের—অতএব, লোকায়ত-মতের—পরিচয় পাওয়া যায়, এবং ছান্দোগ্যে এ-কথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, মতবাদটি অসুরদের মধ্যেই প্রচলিত ছিলো। এই তথ্য থেকে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লোকায়ত-মতের সুমেরীয় উৎস-সংক্রান্ত প্রকল্পে পৌঁছতে চেয়েছেন। আমরা সে-প্রকল্পের সমালোচনা করেছি। কেননা, অসুর বলতে যে প্রাচীন সুমেরীয়দেরই বুঝতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া, সংকার-পদ্ধতির যে-সাক্ষ্যকে লেখক অতোখানি গুরুত্ব দিয়েছেন তার প্রকৃত তাৎপর্যও তাঁর প্রকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করে না।

কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, ছান্দোগ্যের এই সূত্রটি কোন অর্থে লঘুমূল্য। আসলে, অসুর বলতে যাদেরই বোঝাক না কেন, ছান্দোগ্যের নির্দেশ অনুসারে আমরা লোকায়ত-মতকে তাদেরই মধ্যে পরিব্যাপ্ত বা আয়ত বলে অনুমান করতে পারি। তাছাড়া, লোকায়ত বলতে যে অসুর-মতই বুঝতে হবে এ-বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্যে আরো নানান নির্দেশ পাওয়া যায়।

মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ[১৫৫] অনুসারে দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরগুরু শুক্রের রূপ ধারণ করে ইন্দ্রের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে অসুরদের মধ্যে এই ভ্রমাত্মক লোকায়ত-মত প্রচার করেছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণেও[১১৬] মোটের উপর একই উপাখ্যান পাওয়া যায়: মায়ামোহ অসুরদের পতন ঘটাবার জন্যই তাদের মধ্যে এই লোকায়ত-মত প্রচার করেন।

লোকায়ত-মত যে আসলে অসুরদেরই মত এ-বিষয়ে আর একটি উল্লেখ-যোগ্য তথ্য পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়[১১৭]। শ্রীভগবান বলছেন, "ইহলোকে দুইজাতি সৃষ্টি হইয়াছিল—দৈবী ও আসুরী। হে পার্থ, দৈবী বিস্তারপূর্বক বর্ণন করিয়াছি। এক্ষণে আসুরী শোনো"।

এই আসুরী বলতে কী মত বোঝায়? শ্রীধরস্বামী বলছেন, লোকায়ত-মত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই আসুরী মতের বর্ণনায় অবশ্যই প্রায় চোদ্দ আনাই ঘৃণা ও বিদ্বেষ। কিন্তু তাছাড়াও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কথা পাওয়া যায়। আসুরী-মত অনুসারে—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥[১১৮]

প্রথম পংক্তিটির অর্থ নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকতে পারে। খুব সম্ভব এর অর্থ হলো ঈশ্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থে জগৎ সত্য নয়, কেননা ঈশ্বরই নেই। কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিটির অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট: জগৎ কামোদ্ভূত, স্ত্রী-পুরুষের মিলন-জাত।

আসুরী-মতের এই কথাটি কিন্তু আমাদের কাছে নতুন নয়। তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় আমরা এই মতেরই পরিচয় পেয়েছি, এই মতেরই পরিচয় আমরা পেয়েছি সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বে: "যথা স্ত্রী-পুরুষসংযোগাৎ সুতোৎপত্তিস্তথা প্রধান-পুরুষ-সংযোগাৎ সর্গস্যোৎপত্তিঃ"।

শ্রীধরের কথা যদি ঠিক হয়—অর্থাৎ আসুরী-মত বলতে গীতায় যদি লোকায়ত-মতই বুঝিয়ে থাকে—এবং এই সৃষ্টিতত্ত্বই যদি আসুরী-মতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে এরই সূত্র ধরে আমরা লোকায়ত, তন্ত্র এবং সাংখ্যের মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে পাই নাকি?

আরো কথা আছে। সাংখ্য-কারিকার শেষে ঈশ্বরকৃষ্ণ[১১৯] বলছেন, "এই পরম পবিত্র শাস্ত্র কপিল মুনি অনুকম্পা-পুরঃসর আসুরীকে প্রদান করিয়াছিলেন। আসুরী পুনরায় সেই শাস্ত্র পঞ্চশিখকে উপদেশ দেন এবং পঞ্চশিখ দ্বারা ইহা পরে বহুধা বিস্তৃত হয়।"

এখানে আসুরী ব্যক্তি-বিশেষের নাম, না, এর আর কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে—সে-প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই খুব জোর করে দেওয়া যায় না।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, বৌধায়ন[১৫০] বলছেন, কপিল বলে এক অসুর ছিলেন, তিনি দেবতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং তিনি যে-উপদেশ দিয়েছেন তা সর্বের পরিত্যজ্য।

ঋগ্বেদের[১৫১] ষষ্ঠ-মণ্ডলে অসুরদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের অভিযান-বর্ণনা পাওয়া যায়। তারই এক জায়গায় বলা হয়েছে :

> ইন্দ্র চয়মানের পুত্র অভ্যবর্তীর প্রতি অনুকূল হইয়া বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করিয়াছিলেন। তিনি হরিয়ুপীয়ার পূর্বভাগে অবস্থিত বৃচীবানের বংশধরদিগকে বধ করেন, তখন পশ্চিমভাগে অবস্থিত (বরশিখের) শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হইয়াছিল[১৫২]।

বৃচীবান কোনো অসুর-ট্রাইবের নাম হতে পারে[১৫৩]। হরিয়ুপীয়া তাদেরই নগর, অর্থাৎ কোনো এক অসুর-নগর। এ-নগর কোথায় ছিলো? হরপ্পা আবিষ্কারের পর ডি.ডি. কোসাম্বী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বি.বি. রায় প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেছেন, খুব সম্ভব এই হলো ঋগ্বেদ-উল্লিখিত ওই অসুর-নগর। এম. হুইলারও[১৫৪] এ-সম্ভাবনাকে অস্বীকার করছেন না—ওই হরিয়ুপীয়া আর হরপ্পা এক-হওয়া অসম্ভব নয়। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, জন মার্শাল দাবি করছেন, প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যে প্রমাণ এ-নগরে মাতৃপ্রধান শাক্ত বা তান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রচলিত ছিলো। একেও কি অসুর-নগরে আসুরী-মতের সাক্ষ্য বলা যায়?

শুধু মাতৃপ্রধান বা শক্তিপ্রধান ধ্যানধারণাই নয়। ওই অসুর-মত বলতে যে অধ্যাত্মবাদ-বিরোধী অস্ফুট বস্তুবাদই বোঝা হতো ঋগ্বেদেই[১৫৫] তার ইংগিত পাওয়া যায়।

> ত্বং মায়াভিরপ মায়িনোঽধমঃ স্বধাভির্যে
> অধিশুপ্তাবজুহ্বত।
> ত্বং পিপ্রোর্নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ প্র
> ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষ্বাবিথ॥
>
> —তুমি (ইন্দ্র) মায়াসমূহের দ্বারা, যাহারা নিজেদে মুখে স্বধা (অন্নহবিঃ) প্রদান করিত, সেই মায়াবীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলে; হে নরগণের রক্ষক, তুমি পিপ্রুর নগরগুলি ধ্বংস করিয়াছিলে এবং দস্যুদিগের হত্যালীলা হইতে ঋজুপথগামীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে।

এখানে যে অসুরদেরই উল্লেখ করা হয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তারা নিজেদের মুখেই স্বধা প্রদান করতো। এ-কথার ব্যাখ্যায়

সায়নাচার্য কৌষীতকী ও বাজসনেয়ীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কৌষীতকী বলেন, "অসুরা বা আত্মন্নজুহবুরুদ্ধাতেঽগ্নৌ তে পরাভবন্"—অর্থাৎ, অসুরেরা অগ্নিকে পরাভূত করিয়া নিজেদেরই হোম করিত। বাজসনেয়ী বলেন, "দেবাশ্চ হ বা অসুরাশ্চাস্পর্ধন্ত ততো হাসুরা অভিমানেন কস্মৈ চ ন জুহুম ইতি স্বেষ্বেবাস্যেষু জুহ্বতশ্চেরুস্তে পরাবভূবুঃ"—অর্থাৎ, দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্ধাযুক্ত হইল, তাহার পর অসুরেরা অভিমান ভরে ঠিক করিল, 'আমরা কাহাকেও হোম করিব না'; এবং অতএব নিজেদের মুখে হবিপ্রদান করিয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং অবমাননা করিল।

গুণরত্ন[১৫৬] বলেছিলেন, চর্ব থেকেই চার্বাক নামের উৎপত্তি—গলচর্ব অদনে, ইত্যাদি। যদি তাই হয় তাহলে যে-অসুরেরা দেবতার উদ্দেশ্যে হবি-প্রদানের প্রতিবাদে নিজেদের মুখেই অন্নহবির বা স্বধা প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলো তাদেরও চার্বাকপন্থী বলে সনাক্ত করবারই প্রলোভন হয় নাকি? এবং এই অসুরদের ধ্যানধারণাই যদি তন্ত্র ও সাংখ্যের সঙ্গে অভিন্ন হয় তাহলে এদিক থেকেও তন্ত্র ও সাংখ্যকেও লোকায়ত-মত বলেই গ্রহণ করবার সম্ভাবনা বাড়ে না কি?

এইভাবে তন্ত্র, লোকায়ত ও সাংখ্যের সম্পর্ককে বোঝবার চেষ্টা করলে আরো কয়েকটি বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত সাংখ্যের সঙ্গে যোগ-এর সম্পর্ক। সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে, উত্তরযুগে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ[১৫৭] এর বিপরীত কথা অনুমান করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাংখ্য ও যোগের মধ্যে প্রভেদটাই বরং উত্তরকালের অবদান। আমরা ইতিপূর্বেই যোগের উৎস সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি যে, পরের যুগে যোগশাস্ত্র বলতে যাই বোঝাক না কেন, আদিম কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস এবং জাদু-অনুষ্ঠানের মধ্যেই তার উৎস অনুসন্ধান করবার সুযোগ আছে। আমরা আরো দেখেছি যে, ওই আদিম কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের মধ্যেই তান্ত্রিক ধ্যানধারণা এবং আচার-অনুষ্ঠানের সূচনা দেখতে পাওয়া যায়। এবং এইদিক থেকে বুঝতে পারা যায়, তন্ত্রসাধনা ও যোগসাধনা আদিতে কেন পৃথক নয়। অপরপক্ষে, তন্ত্র এবং সাংখ্যের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, উভয়েরই এক উৎস অনুমান করবার সুযোগ আছে। অতএব আমাদের যুক্তির বর্তমান পর্যায়ে আমরা বলতে পারি যে, যে-কারণে তন্ত্রের সঙ্গে যোগের সম্পর্ক, সেই কারণেই সাংখ্যের সঙ্গেও

যোগের সম্পর্ক আদি ও অকৃত্রিম। অতএব, সাংখ্যের সঙ্গে যোগের সম্পর্ক পরের যুগেই স্থাপিত হয়েছে এ-কথা মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই। তার বদলে বরং অনুমান করা যায়, কৃষিকাজের আদিম পর্যায়ে তন্ত্রের দিকটি সাধনার দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পারেনি—কালক্রমে হয়তো তন্ত্রের দিকটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করে সাংখ্য-দর্শনে পরিণত হয়েছে এবং অনুষ্ঠানের দিকটি পরিণত হয়েছে স্বতন্ত্র যোগ সাধনায়। তারপর ক্রমশ আরো উত্তরকালের দার্শনিকদের প্রচেষ্টায়, এই সাংখ্য এবং যোগ উভয়ই আস্তিক, অর্থাৎ, বৈদিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত এবং আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ সেশ্বর মোক্ষশাস্ত্রে পরিণত হয়েছে—পুরুষের ত্রিতাপ-নাশই তখন সাংখ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু এতোখানি পরিবর্তনের পরও দুয়ের মধ্যে যে-আদিম সম্পর্ক, তা সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হতে পারেনি।

তাহলে তন্ত্র, যোগ, সাংখ্য,—এবং ব্যাপক অর্থে লোকায়তিক ধ্যান-ধারণা,—এগুলির উৎস অনুসন্ধান করতে করতে আমরা যদি সুদূর অতীতে ফিরে যেতে পারি তাহলে কিসের পরিচয় পাবো? কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস এবং জাদু-অনুষ্ঠান। তবুও তন্ত্র, সাংখ্য ও যোগ ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে শুধুমাত্র অতীতের ব্যাপার নয়; সাম্প্রতিক যুগেও এদের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর। এ-ঘটনার ব্যাখ্যা কী? আমাদের দেশের বাধাপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক বিকাশ: সামগ্রিকভাবে দেশের মানুষ কৃষিকাজের প্রাথমিক পর্যায়কে পিছনে ফেলে খুব বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেনি। তাই সে-পর্যায়ের ধ্যানধারণা ও সাধনপদ্ধতির স্মারক এমন গভীর ও ব্যাপকভাবে সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত টিকে থেকেছে। বর্তমানকালেও তান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রভাব প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে দীর্ঘভাবে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে আমরা তার সঙ্গে শুধুমাত্র একটি কথা যোগ করতে চাই: আদিসাংখ্যকে যেহেতু তান্ত্রিক তত্ত্বেরই দার্শনিক সংস্করণ হিসেবে গ্রহণ করবার সুযোগ রয়েছে, সেইহেতু আমাদের দেশে আধুনিক যুগেও সাংখ্য-দর্শনের বিপুল ও গভীর প্রভাবকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে স্বতন্ত্র প্রকল্পের প্রয়োজন নেই।

"যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে"।

দুর্গা, কালী জগদ্ধাত্রী—দেবীনামের তালিকা নিশ্চয়ই দীর্ঘতর করা যায়। কয়েকটি নামের বিশ্লেষণ আমরা ইতিপূর্বে করেছি: অন্নপূর্ণা, শাকম্ভরী, ভগবতী। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য অনুসারে এঁরা সকলেই সাংখ্যের প্রকৃতি।

আমাদের যুক্তিও এদিক থেকে স্বতন্ত্র নয়। কেবল আমরা আরো বলতে চাই যে, সাংখ্যের ওই প্রকৃতিতত্ত্বকে, কিংবা এই দেবীগুলিকে ঠিকমতো বুঝতে হলে সমাজবিকাশের এমন এক স্তরে ফিরে যেতে হবে যেখানে মেয়েরা বড়ো, আর যে-পর্যায়ের মানুষদের ধারণায় নারীর উৎপাদিকা-শক্তি আর প্রাকৃতিক উৎপাদিকা-শক্তি একই সূত্রে বাঁধা এবং পরস্পরের উপর প্রভাবশীল। এই পর্যায়ের কথা আমাদের ঐতিহাসিকেরা এখনো সম্যকভাবে উদ্ধার করেননি; ফলে তন্ত্র ও সাংখ্যের অনেক আদিম তত্ত্ব আজো আমাদের কাছে রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। শুধু তাই নয়; সমাজবিকাশের সেই পর্যায়টি নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা যেদিন সম্যকভাবে বিচার করবেন, সেইদিন আমরা আরো স্পষ্টভাবে জানতে পারবো—

অনেক হাজার বছর আগে সিন্ধুসভ্যতার মানুষেরা, কোন্ আদিম বিশ্বাসের প্রভাবে ওই সব ছোটোছোটো পোড়ামাটির মাতৃমূর্তি গড়ায় মন দিয়েছিলো ?

কোন্ আদিম বিশ্বাসের প্রভাবে, আজো আমাদের গ্রামাঞ্চলে এ-জাতীয় মূর্তি রচনার বিরাম নেই ?

কোন্ আদিম বিশ্বাসের প্রভাবে, আমাদের বাংলা সাহিত্য শক্তি, ডোম্বী, রজকী, শবরী, নৈরামণি, সহজসুন্দরী প্রভৃতির মাহাত্ম্যে এমন ভরপুর হয়ে উঠেছিলো ?

এই আদিম বিশ্বাস ও তার বাস্তব ভিত্তিকে যেদিন স্পষ্টভাবে চিনতে পারা সম্ভব হবে, সেইদিনই আমরা সাংখ্য-দর্শনের আদিরূপটির সমস্ত বৈশিষ্ট্যও হৃদয়ঙ্গম করবার পথে অগ্রসর হবো।

কিন্তু এই বিষয়গুলিকে সম্যকভাবে চিনতে হলে আমাদের নিজেদের মনের দুটি সংস্কারের সমালোচনা করবার সাহসও অর্জন করতে হবে। এক : পিতৃপ্রধান সমাজের সংস্কার—কেননা, তন্ত্র, সাংখ্য প্রভৃতি ধ্যানধারণায় মাতৃ-প্রধান সমাজেরই স্বাক্ষর টিকে আছে। দুই : সাধারণভাবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সংস্কারও। কেননা, তন্ত্র, সাংখ্য প্রভৃতি যে-ধ্যানধারণাকে ব্যাপক অর্থে আমরা এখানে লোকায়তিক বলে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছি, সেগুলি শুধুই নারী-প্রাধান্যের পরিচায়ক নয়; তাছাড়াও এগুলি হলো প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী—এবং সেই অর্থে বস্তুবাদী—ধ্যানধারণাও। এবং আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো যে, এই জাতীয় ধ্যানধারণার প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী বা বস্তুবাদী দিকটির মধ্যে প্রাক্-বিভক্ত সমাজেরই প্রতিবিম্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রাক্-বিভক্ত সমাজ ও প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী চেতনা

লোকায়ত, তন্ত্র, সাংখ্য—আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসের মধ্যেই এই ধ্যানধারণাগুলির উৎস, এবং এ-দেশের উৎপাদন কৌশলের বিকাশ অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত বলেই অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পর্যায়ের কৃষিকাজই এখানে প্রধানতম জীবনোপায় হয়েছে। ফলে তারই উপর প্রতিষ্ঠিত ওই ধ্যানধারণাগুলিই দেশের সংস্কৃতিতে বহু দীর্ঘদিন ধরে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। লোকায়ত-মতকে এইদিক থেকেই লোকেষু আয়ত—অর্থাৎ, জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—মনে করা যায়।

অপরপক্ষে, লোকায়তর আর একটি অর্থ আছে। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[৫৫৮] যেমন বলছেন, 'ইহলোক ঐ দর্শনের সর্বস্ব, তজ্জন্যই উহার ঐরূপ নামকরণ হয়'। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্নের[৫৫৯] মতেও লোক—অর্থাৎ দৃশ্যমান ইহলোক—ব্যতীত, উত্তরকাল স্বীকার করে না বলেই এ-দর্শনের নাম লোকায়ত। সেন্ট পিটার্সবার্গ অভিধানেও[৫৬০] লোকায়ত শব্দকে *materialism* বা বস্তুবাদ অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে।

তন্ত্রের দেহতত্ত্ব এবং সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ এই দ্বিতীয় অর্থটির উপর আলোকপাত করে। মানবদেহের অনুরূপ হিসেবেই তন্ত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চেনবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। ফলে উত্তরকালে তন্ত্রের উপর অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের প্রলেপ যতোই পড়ুক না কেন, তার আদিরূপটি ওই দেহবাদ বা বস্তুবাদই—সে-বস্তুবাদ যতো মূক, অব্যক্ত ও অচেতন হোক না কেন, যতোই অসম্ভব হোক না কেন তার বাস্তব জ্ঞানের দৈন্য। আদি-সাংখ্যের প্রধানকারণ-বাদ বা অচেতনকারণবাদ এই অস্ফুট বস্তুবাদেরই পরিচ্ছন্ন দার্শনিক সংস্করণ, এবং বৈদান্তিক বা চেতনকারণবাদী চিন্তাধারার প্রধানতম প্রতিপক্ষ।

আমরা যে-চিন্তাধারাকে লোকায়ত বলে সনাক্ত করবার চেষ্টা করেছি বস্তুবাদ ছাড়াও তার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নারীপ্রাধান্য বা মাতৃ-প্রাধান্য। আমরা ইতিপূর্বেই এই বৈশিষ্ট্যটির ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে আমরা লোকায়তিক চিন্তাধারার বস্তুবাদমূলক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা উত্থাপন করবো।

আমাদের প্রধান প্রতিপাদ্য হবে, প্রাক্-বিভক্ত সমাজের স্বাক্ষর বহন করছে বলেই লোকায়ত-মত প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী, এবং সেই অর্থেই অচেতনকারণ-বাদ বা বস্তুবাদ। এবং আমাদের মূল যুক্তি হবে, চেতনকারণ-বাদ বা ভাব-বাদের যেটা বাস্তব ভিত্তি (*material basis*), প্রাক্-বিভক্ত সমাজে তার বিকাশ সম্ভব নয় অতএব সে-পর্যায়ের ধ্যানধারণাও চেতনকারণ-বাদ বা ভাববাদে

পরিণত হবার সুযোগ পায় না। অর্থাৎ, লোকায়তর অচেতনকারণ-বাদকে বোঝবার উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রধানতম আলোচ্য হবে চেতনকারণ-বাদের জন্মকাহিনী।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চেতনকারণ-বাদের আবির্ভাব কাহিনী নিয়ে আলোচনা তোলবার আগে সাধারণভাবে চেতনকারণ-বাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

চেতনকারণ-বাদের মূল কথাটা কী? চিন্তা বা ধারণা বা জ্ঞান বা মন বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি—এককথায় কোনো-না-কোনো প্রকার চেতন-পদার্থই—চরম সত্য বা পরম সত্তা। যা-কিছু সত্য, যা-কিছু বাস্তব তা এর উপর নির্ভরশীল হিসেবে, এরই দাবি মিটিয়ে, তবে সত্য বা বাস্তব। অতএব তথাকথিত বহির্বাস্তব, চেতন-নিরপেক্ষ অর্থে সত্য নয়। চেতনা বা মানবসত্তার দাবি মেটানো-না-মেটানোর উপরই সবকিছুর সত্তা নির্ভরশীল।

অবশ্যই দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ বা চেতনকারণ-বাদের রূপ সর্বত্রই এক নয়। কিন্তু উপরোক্ত যুক্তিটিই চেতনকারণ-বাদমাত্রের মূল ভিত্তি। বিভিন্ন চেতনকারণ-বাদী দার্শনিক এই কাঠামোটির ভিতরেই বিভিন্নভাবে তাঁদের মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন।

চেতনাই সর্বশক্তিমান,—স্রষ্টার মতো। মানুষের ধ্যানধারণায় এ-জাতীয় কথা আবির্ভাব হবার বাস্তব সর্ত কী? জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছেদ; শুধু তাই নয়, জ্ঞানের তুলনায় কর্মকে হেয় বা নিম্নবৃত্তি বলে মনে করা। কেননা, কর্মের মধ্যে বহির্বাস্তবের অবধারিত যাথার্থ্যের অনিবার্য স্বীকৃতি[৩১]; কর্মবাদ দিয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সত্যনিরূপণের প্রচেষ্টা তাই বহির্বাস্তবের যাথার্থ্য-স্বীকৃতির দায়মুক্ত। তখন চেতনাই চরম সত্য, সর্বশক্তি-মান, সর্বনিয়ন্তা।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি (পৃঃ ৭৯—৮৬) আদিম প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্যানধারণা অনিবার্য ঐতিহাসিক কারণে এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। কেননা, উৎপাদন-কৌশলের দৈন্য বা অনুন্নতিই সে-সমাজের ভিত্তি—এই দৈন্যের দরুনই উদ্বৃত্ত-উৎপাদন সম্ভব নয়, তাই উদ্বৃত্তজীবী শ্রেণীর আবির্ভাবও সম্ভব নয়। শ্রমে অংশগ্রহণ করবার দায়িত্ব সকলেরই। আর তাই মানুষের ধ্যানধারণাও বহির্বাস্তবের যাথার্থ্য-স্বীকৃতির দায়মুক্ত নয়। উৎপাদন-কৌশলের উন্নতির ফলে উদ্বৃত্ত-উৎপাদন—এবং অতএব উদ্বৃত্তজীবী শ্রেণীর আবির্ভাব—হবার পরই বহির্বাস্তব এই শ্রেণীর মনের চাহিদা মেটাতে বাধ্য হয়েছে আর তখন থেকেই মানুষের মাথায় এ-যুক্তির আবির্ভাব হয়েছে যে, মনের চাহিদাই—চেতনার চাহিদাই—সর্বশক্তিমান, জগৎ-নির্মাতা। মিশরের পুরোহিত-রাজ পিরামিডের কথা ভাবলেন, বহির্জগতে গগন-চুম্বী পিরামিড

গড়ে উঠলো—বহির্জগৎ মনের দাবি মানলো। কেননা, যে লক্ষ মানুষের কায়িক শ্রম এই অসাধ্য-সাধন করতে পেরেছে তারা দাস, তারা হীন, তারা নীচ—সমাজের সদর-মহলে তাদের স্থান নেই, আর তাই সদর-মহলের ধ্যান-ধারণায় তাদের ওই অবদানটারও স্বীকৃতি নেই।

> In the face of all these creations, which appeared in the first place to be products of the mind, and which seemed to dominate human society, the more, modest productions of the working hand retreated into the background, the more so, since the mind that plans the labour-process...was able to have the labour that had been planned, carried out by other hands than its own. All merit for the swift advance of civilization was ascribed to the mind...and so there arose, in the course of time, that idealistic outlook on the world which, especially since the decline of the ancient world, has dominated men's minds.[১৬২]

আমরা দেখেছি (পৃঃ ৩১—৩৩) লোকায়তিকদের ধ্যানধারণা এইভাবে শ্রমের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়নি, কেননা বার্তা বা কৃষিকাজই তাদের কাছে প্রধানতম বিদ্যা। আর তাই তাদের চেতনাও মুক্তি পায়নি বহির্বাস্তবের যাথার্থ্য-স্বীকৃতির দায়িত্ব থেকে। প্রাচীন সমাজের সেই পর্যায়টি—মেয়েরা যখন কৃষিকাজ আবিষ্কার করে নিজেদের ফলপ্রসূতার অনুরূপ হিসেবেই প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতাকে বোঝবার চেষ্টা করছে, এবং নিজেদের দেহের উপমান হিসেবেই প্রকৃতিকেও বুঝতে চেষ্টা করছে—প্রকৃত-পক্ষে প্রাক্-বিভক্ত সমাজেরই একটি পর্যায়। এই কারণেই বার্তাকেন্দ্রিক ওই ধ্যানধারণাও প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী, এবং সেই অর্থে বস্তুবাদী—সে-বস্তুবাদ যতো অস্ফুট ও প্রাকৃতই হোক না কেন।

লোকায়তিক অচেতনকারণ-বাদের তাৎপর্য বোঝবার আশায় আমরা অধ্যাত্মবাদ বা চেতনকারণ-বাদের উৎস নিয়ে আলোচনা তুলবো। ঘুরিয়ে বা নেতিমূলকভাবে হলেও এ-আলোচনা লোকায়তিক বস্তুবাদের উপর আলোক-পাত করতে পারে। কেননা, ধ্যানধারণার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই চেতনকারণ-বাদ যে-পর্যায়টিকে পিছনে ফেলে এসেছে সেই পর্যায়টিই হলো ওই লোকায়তিক প্রাক্-অধ্যাত্মবাদ বা অস্ফুট বস্তুবাদ।

কিন্তু যে-হেতু আমরা চেতনকারণ-বাদের আবির্ভাবকে শ্রেণীসমাজ-জনিত জ্ঞান ও কর্মের বিচ্ছেদের পরিণাম হিসেবেই বোঝবার চেষ্টা করবো, সেই হেতু আমাদের পক্ষে প্রথমে সাধারণভাবে শ্রেণীসমাজের উৎপত্তি-সংক্রান্ত

ঐতিহাসিক নিয়মের পটভূমিটিকে মনে রাখা প্রয়োজন। উৎপাদন-কৌশলের উন্নতিই আদিম প্রাক্-বিভক্ত সমাজ থেকে শ্রেণীবিভাগের দিকে অগ্রগতির মূল কারণ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, উৎপাদন-কৌশলের উন্নতির ঠিক কোন্ বৈশিষ্ট্যটি থেকেই মানবসমাজে ক্রমশ শ্রেণীবিভাগ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো? এঙ্গেলস্ দেখাচ্ছেন, পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির বেলাতেই হুবহু একরকম নয়। কোথাও বা কৃষিকাজের উন্নতি থেকে, আবার কোথাও বা পশুপালনের উন্নতি থেকে শ্রেণীবিভক্ত (ও রাষ্ট্রশক্তি-শাসিত) সমাজের উদ্ভব। কেননা, একদিকে যেমন কৃষিকাজের উন্নতি, অপরদিকে তেমনি পশুপালনের উন্নতি থেকেই মানুষের পক্ষে উদ্বৃত্ত-উৎপাদনের ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেলো। (পৃঃ ৩০০ দ্রষ্টব্য)।

আমেরিকার ইরোকোয়া নামের আদিবাসীরা কৃষি-উন্নতির পথ ধরেই প্রাক্-বিভক্ত সমাজের সীমারেখা পেরিয়ে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করেছিলো; সেই অবস্থাতেই কলম্বাসের অনুগামীদের আক্রমণে তাদের অগ্রগতি নিরুদ্ধ হয়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে সিন্ধু-উপত্যকার ধুলোর নিচে এই অগ্রগতির কাহিনী নিশ্চয়ই ঢাকা পড়ে রয়েছে। কেননা, ওখানের প্রত্নতত্ত্বমূলক নিদর্শনগুলির মধ্যে একদিকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-শক্তি এবং শ্রেণীশোষণের পরিচয়, আবার অপরদিকে দেখা যাচ্ছে কৃষি-উৎপাদনই ছিলো ওই নাগরিক জীবনের প্রধানতম সম্পদ। দ্রষ্টব্য এই যে, ওই শ্রেণীশোষণ ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-শক্তির পর্যায়ে পৌঁছেও সিন্ধুসভ্যতার মানুষগুলির চেতনা থেকে মাতৃপ্রধান ধ্যানধারণার স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। অবশ্যই আদি-তন্ত্র ও আদি-সাংখ্যের মতো এই মাতৃপ্রধান ধ্যানধারণা তখনো প্রাক্-অধ্যাত্মবাদ বা অচেতনকারণ-বাদের পর্যায়েই ছিলো কিনা, তা খুবই সন্দেহের কথা। বরং রাষ্ট্র-শক্তি ও শ্রেণীশোষণের পটভূমিকায় টিকে থাকবার সময় এগুলির পক্ষে অধ্যাত্মবাদী চেতনার অঙ্গীভূত হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও মাতৃপ্রাধান্যমূলক ধ্যানধারণার সঙ্গে কৃষি-আবিষ্কারের সম্পর্ক যে কতো ঘনিষ্ঠ এবং মানবচেতনায় এই মাতৃপ্রধান ধ্যানধারণার প্রভাব যে কতো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, হরপ্পা-মোহেনজোদারোর প্রত্নতত্ত্বমূলক নিদর্শনগুলিই তার পরিচায়ক। অর্থাৎ, সিন্ধুসভ্যতা নিশ্চয়ই রাতারাতি গড়ে ওঠেনি; তার পিছনেও একটা দীর্ঘযুগের ক্রমোন্নতির ইতিহাস অনুমান করতে আমরা বাধ্য। সে-ইতিহাস নিশ্চয়ই কৃষিকাজ আবিষ্কার থেকে শুরু করে কৃষিকর্মের ওই অতোখানি উন্নত পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপৃত, যে-পর্যায়ে পৌঁছে কৃষিজাত উদ্বৃত্তের উপর নির্ভর করে অমন নগরজীবন ইত্যাদি গড়ে তোলা সম্ভবপর। অতএব অনুমান করবার সুযোগ আছে যে, সিন্ধু-উপত্যকায় যে-মাতৃপ্রধান ধ্যানধারণার পরিচয় পাই, তারও আদিরূপ আদি-তন্ত্রের মতোই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদীই ছিলো,

যদিও যে-পটভূমিকায় মাতৃপ্রধান ধ্যানধারণার এই স্মারকগুলি পাওয়া গিয়েছে, সেখানেও এগুলির পক্ষে ওই আদিম প্রাক্-অধ্যাত্মবাদসূচক হবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই নেই।

তন্ত্রের দুটো দিক। মাতৃপ্রধান ও প্রাক্-আধ্যাত্মিক। কৃষি-আবিষ্কার-জাত ধ্যানধ্যারণা বলেই তা মাতৃপ্রধান। প্রাক্-বিভক্ত-সমাজ-জাত বলেই তা প্রাক্-আধ্যাত্মিক। কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে মানব-সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হয়নি।

অপরপক্ষে, প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ধারণামাত্রেই মাতৃপ্রধান হতে বাধ্য নয়। তার কারণ, প্রাক্-বিভক্ত সমাজমাত্রই কৃষিনির্ভর—বা অনুন্নত পর্যায়ের কৃষি-নির্ভর—হতে বাধ্য নয়। এ-আলোচনার জন্য প্রাক্-বিভক্ত সমাজ ছেড়ে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দিকে অগ্রসর হবার দ্বিতীয় পথটির কথা উত্থাপন করা প্রয়োজন।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (পৃ. ৩০০—৩০২), বৈদিক মানুষদের ইতিহাস এই পথটির পরিচায়ক। পশুপালনের উন্নতির উপর নির্ভর করেই তারা প্রাক্-বিভক্ত সমাজ ছেড়ে শ্রেণীসমাজের দিকে অগ্রসর হতে পেরেছিলো। পশুপালন-নির্ভর সমাজ পিতৃপ্রধান, বৈদিক ধ্যানধারণাও তাই পুরুষ-প্রধান (পৃ. ৩২০—৩২৮)। কিন্তু পুরুষ-প্রধান এই ধ্যানধারণার আদি-পর্যায়ের মধ্যে প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় (পৃ. ১০২—১১২ এবং পৃ. ১৫১—১৫২); সেই দিকটি হলো বৈদিক সমাজের প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়ের স্বাক্ষর। কেননা, প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণায় প্রাক্-বিভক্ত সমাজের প্রতিবিম্ব : কৃষি-নির্ভর প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্যানধারণা মাতৃপ্রধান, পশুপালন-নির্ভর প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্যানধারণা পুরুষপ্রধান—কিন্তু দুই-ই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী। এবং এইদিক থেকেই বুঝতে পারা সম্ভব, বৈদিক চিন্তাধারার সঙ্গে উত্তরযুগে লোকায়তিক চিন্তাধারার যতোই পার্থক্য থাকুক না কেন, বৈদিক চিন্তাধারারও প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী অর্থে একটা লোকায়তিক অতীত ছিলো।

অধ্যাত্মবাদের আবির্ভাব-ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা এই বৈদিক ধ্যানধারণার ক্রমবিকাশ নিয়েই আলোচনা তুলবো। তার প্রধান কারণ হলো, প্রাক্-বিভক্ত সমাজ থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দিকে অগ্রগতির, —এবং তারই প্রতিবিম্ব হিসেবে প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণার পক্ষে অধ্যাত্মবাদে পরিণতির—সুবিস্তীর্ণ সাহিত্য ওই বৈদিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই সুলভ। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা প্রধানত তারই আলোচনা করবো।

তৃতীয় খণ্ড

ভাববাদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বরুণ : ভাববাদের উৎস-সন্ধানে

অধ্যাপক উইণ্টারনিৎস্[১] অনুমান করছেন, বৈদিক আর্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর দক্ষিণ আফ্রিকার দিন্‌ক এবং কাফির ট্রাইবদের মতোই ছিলো, আর তাই বৈদিক আর্যরাও এদের মতোই গোসম্পদকে চরম মূল্যবান মনে করতেন।

দিন্‌ক এবং কাফিরেরা প্রধানতই পশুপালক। কিন্তু সেই সঙ্গেই তারা চাষবাসও শুরু করেছে এবং ধাতুর ব্যবহার খানিকটা আয়ত্তে এনেছে। অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে আধুনিক ট্রাইবদের যে-স্তরবিভাগ করা হয় (পৃঃ ৩০০) সে-বিভাগ অনুসারে আফ্রিকার এই ট্রাইবগুলি পশুপালনের দ্বিতীয় স্তরে পড়ে[২]। সমাজ-বিবর্তনের সাধারণ নিয়ম অনুসারে এইখান থেকেই অকৃত্রিম ট্রাইব্যাল-সংগঠনে ভাঙনের সূচনা দেখা যায়[৩]। অর্থাৎ একে প্রাক্-বিভক্ত সমাজ ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মধ্যবর্তী সীমানা মনে করা যায়—পিছনে প্রাক্-বিভক্ত সমাজের স্মৃতি, সামনে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আভাস। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ট্রাইবগুলির মধ্যে ক্লান-সংগঠন বা জ্ঞাতিভিত্তিক সংগঠন অনেকাংশেই অক্ষুণ্ণ থাকলেও এবং এমন কি এদের মধ্যে টোটেম্-বিশ্বাসের স্মারক অত্যন্ত প্রবল হলেও—ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাজশক্তির আভাস দেখা দিয়েছে। তারই প্রতিবিম্ব হিসেবে দেবলোকের কল্পনাও কিছু অংশে আধুনিক হয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি বা স্পষ্টভাবে নয়।

ভাষাতত্ত্বের সাক্ষ্য বিচার করে অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড[৪] অনুমান করছেন, প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয়েরাও বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়বার সময়ে অর্থনৈতিক উন্নতির এই স্তরটিতেই পৌঁছেছিলেন। অর্থাৎ, তথাকথিত আর্যরাও সে সময়ে মূলতই পশুপালক, যদিও তাঁরা তখন কিছুটা কৃষিকাজ ও ধাতুর ব্যবহার শিখেছেন। তাঁদের সমাজ-সংগঠনও জ্ঞাতিভিত্তিক বা ক্লান-সংগঠন। তাই তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনকেও পশুপালনের দ্বিতীয় স্তর বলা হয়েছে।

এদিক থেকে, ভারতে আর্যোদয়-সংক্রান্ত মতবিরোধের মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যায় অধ্যাপক উইণ্টারনিৎস্-এর উপরোক্ত অনুমান নিশ্চয়ই নির্ভুল। এবং এ-অনুমানের তাৎপর্যগুলি সত্যিই দুর্মূল্য। কেননা, বৈদিক আর্যদের সঙ্গে আফ্রিকার এই ট্রাইবগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির সাদৃশ্য যদি মৌলিক হয় তাহলে আমাদের পদ্ধতি অনুসারে অনুমান করবার সুযোগ

থাকে যে, প্রাচীনকালে বৈদিক আর্যরা মোটের উপর কী ভাবে জীবনযাপন করতেন তার অন্তত কিছুটা পরিচয় আজকের দিনেও আমাদের পক্ষে স্বচক্ষে দেখতে পাবার সুযোগ আছে। শুধু তাই নয়; অর্থনৈতিক অবস্থাই যদি সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি হয় তাহলে আফ্রিকার ওই ট্রাইবগুলির সাংস্কৃতিক জীবন সংক্রান্ত জ্ঞান বৈদিক সংস্কৃতির উপরেও আলোকপাত করতে পারে।

আফ্রিকার দিন্‌কদের সম্বন্ধে অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যান[৫] বলছেন, গোসম্পদই ওদের সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি; ফলে,

> the desire to acquire a neighbour's herds is the common cause of these inter-tribal raids which constitute Dinka warfare.

অধ্যাপক উইণ্টারনিৎস্[৬] বলছেন, ঠিক এই কারণেই বৈদিক সাহিত্যে

> the old word for 'war' or 'battle' is originally 'desire for cattle' (*gavisti*).

বৈদিক আর্যদের মতোই আফ্রিকার এই ট্রাইবগুলির সমাজ-ব্যবস্থা পুরুষ-প্রধান। পশুপালনমূলক অর্থনীতির তাগিদেই যে এরা মাতৃপ্রাধান্যের পরিবর্তে পিতৃপ্রাধান্যের প্রচলন করেছে, সে-বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—অনেক ক্ষেত্রে পিতৃপ্রাধান্যের নিচে মাতৃপ্রাধান্যের ধ্বংসাবশেষ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে এবং উত্তরাধিকারসূত্রের মধ্যে মাতৃপ্রাধান্যের স্পষ্ট স্মারক টিকে থেকেছে[৭]। বৈদিক মানুষদের জীবনে পশুপালন-নির্ভরতা কী ভাবে আদিম মাতৃপ্রাধান্য বদলে পিতৃপ্রাধান্যের প্রবর্তন করেছিলো এ-বিষয়ে বিদ্বানেরা এখনো গবেষণা করেননি; আদিম মাতৃপ্রাধান্যের স্মারক হিসেবে অদিতির সাক্ষ্যকে গ্রহণ করা যায় কিনা তা ভেবে দেখবার অবকাশ আছে। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যে-অবস্থায় বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিলো তা পুরোপুরি পুরুষপ্রধান—পশুপালন-নির্ভর বলেই পুরুষপ্রধান।

বৈদিক আর্যদের মতোই আফ্রিকার এই ট্রাইবদের মধ্যেও যজ্ঞ ও স্তোত্রের বহুল প্রচলন চোখে পড়ে; আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা এই যজ্ঞ ও স্তোত্রকে *sacrifices* ও *hymns* আখ্যাই দেন। এদের যজ্ঞ প্রধানতই পশুযাগ এবং বৈদিক আর্যদের মতোই এদের পশুযাগেও মেধ্য পশুটির পেটের অংশই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়। আফ্রিকার ট্রাইবদের পশুযাগ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে বলা হয়েছে, the contents of the

large intestine of the victim are scattered about and over this mound[৮] ; কিংবা, at the yearly sacrifice, one man, in whom the ancestral spirit is immanent, kills a sheep or a bull, and smears its blood and the contents of the large intestine upon the grave[৯], ইত্যাদি। বৈদিক পশুযাগের বেলায় পশুটিকে বধ করবার পর "অধ্বর্যু পেট চিরিয়া বপা বাহির করিয়া লন। তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা দুইখানা কাঠে সেই বপা লইয়া শামিত্র অগ্নিতে তপ্ত করেন; পরে উত্তরবেদির নাভিস্থিত আহবনীয় অগ্নির উপরে ধরিয়া থাকেন। অগ্নির উত্তাপে বপা গলিয়া বিন্দুবিন্দু আগুনে পড়িতে থাকে। অধ্বর্যু সঙ্গে সঙ্গে বপার উপর ঘি ঢালেন। সেই বপার কিয়দংশ যথাবিধি আপ্রীমন্ত্র পাঠের পর আগুনে ফেলিয়া অন্তিম প্রযাগ যাগ সম্পন্ন হয়। বপার অবশিষ্ট প্রধান যাগের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়"[১০]। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[১১] বলা হয়েছে যজ্ঞে এই পশুর বপাটিই প্রধানতম অঙ্গ বলে বিবেচিত: "অনন্তর মনুষ্যগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞ জানিবার উদ্দেশে যজ্ঞের কোন চিহ্ন দেখিব বলিয়া দেবগণের যজ্ঞভূমিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা (যজ্ঞভূমির) নিকটে বিচরণ করিতে করিতে অঙ্গহীন (বপাহীন) পশুকে শয়ান (যজ্ঞভূমিতে পতিত) অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন এবং বুঝিলেন, এই যে বপাটুকু তাহাই পশু। সেইজন্য এই যে বপাটুকু তাহাই পশু"।

অবশ্যই যজুর্বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে যে-ভাবে যজ্ঞকে জটিল ও পল্লবিত অবস্থায় দেখতে পাই আফ্রিকার ট্রাইবদের যজ্ঞ নিশ্চয়ই সে-রূপ ধারণ করেনি। কিন্তু ঋগ্বেদেও যজ্ঞের এ-জাতীয় জটিল পরিণতি দেখা যায় না—যদিও উত্তরকালে বৈদিক যজ্ঞ ওই রকম জটিল অনুষ্ঠানে পরিণত হবার পর তার মধ্যে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিরই বিনিয়োগ-ব্যবস্থা হয়েছিলো।

বৈদিক আর্যদের কাছে স্বর্গের এক দেবতার নাম বরুণ এবং অধ্যাপক রথ[১২] অনুমান করছেন, আদিপর্বে এই বরুণই ছিলেন বৈদিক দেবলোকের মধ্যে প্রধান; কালক্রমে তাঁর গৌরব ইন্দ্রের গৌরবের নিচে চাপা পড়েছিলো। আফ্রিকার দিন্‌করা তাদের এই বরুণেরই নাম দেয় দেনগ্‌ডিং (*Dengdit*)।

> They worship a high god, Dengdit, lit. 'Great Rain', sometimes called Nyalich and a host of ancestral spirits called *yok*. The Nyalich is the locative of a word meaning 'above', and, literally translated, signifies 'in the above'.[১৩]

এবং দিন্‌কদের বিশ্বাস অনুসারে[১৪] তিনিই দ্যাবা-পৃথিবীকে পরস্পর থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। ঋগ্বেদে বরুণ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা।

দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা।

অর্থাৎ,

—দ্যৌ ও পৃথিবী বরুণের ধর্মদ্বারা এবং প্রভূত বলের দ্বারা চিরকাল পৃথক হইয়া আছে॥ ঋগ্বেদ : ৬. ৭০. ১॥

ধীরা ত্বস্য মহিনা জনূংষি বি যস্তস্তম্ভ রোদসী চিদুর্বী।

অর্থাৎ,

—ইহার (বরুণের) জন্ম মহান এবং ধীর, ইনি পৃথিবী ও স্বর্গকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন॥ ঋগ্বেদ : ৭. ৮৬. ১॥

যঃ স্কম্ভেন বি রোদসী অজো ন দ্যামধারয়ৎ।

অর্থাৎ,

—যিনি (বরুণ), অন্তরীক্ষে যেমন আদিত্য দ্যৌকে ধারণ করেন, সেইরূপ দ্যৌ ও পৃথিবীকে পৃথকরূপে ধারণ করিয়াছিলেন॥ ঋগ্বেদ : ৮. ৪১. ১০॥

এইখানে বলে রাখা যায় যে, বৈদিক দেবতাদেরও কিন্তু আফ্রিকার ট্রাইবদের দেবতাদের মতোই আধুনিক আধ্যাত্মিক অর্থে পরিপূর্ণ দেবত্বপ্রাপ্তি হয়নি। দিন্‌কদের বরুণদেব দেনগ্‌ডিৎ সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

> among the Niel Dinkas he appears as a less remote being who at one time ruled his tribe in human guise.[১৫]

ঋগ্বেদেও দেখি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,

এভির্নৃভির্নৃতমো অস্য শাকৈ রায়ো বিভক্তা সংভরশ্চ বস্বঃ॥

অর্থাৎ,

—সামর্থ্যের সহিত যিনি (ইন্দ্র) এই নরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর, তিনি ধনের বিভাগকর্তা এবং ধনের পরিবর্ধক॥ ঋগ্বেদ : ৪. ১৭. ১১॥

ঋগ্বেদে (৬. ৩৬. ১) ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, "তুমি প্রকৃতই অন্ন"। এর সঙ্গে নবাভিষিক্ত রাজার প্রতি নাইজেরিয়ার জুকুনদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলনা করা যায় : they bow down before him and cry : "Our rains, our crops, our health, our wealth."[১৬]

বরুণের সঙ্গে বৈদিক মানুষদের সম্পর্কটা যে সখার মতোই সে-বিষয়ে অধ্যাপক ম্যাকডোন্যাল[১৭] ইতিপূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,

> Varuna is on a footing of friendship with his worshipper, who communes with him in his celestial abode and sometimes sees him with the mental eye.

এখানে ওই *worshipper* শব্দ কতোখানি প্রাসঙ্গিক সে-প্রশ্ন অবশ্যই অবান্তর নয়, কেননা, অনেক সময় বৈদিক দেবতারা যেন মানুষদেরই একজন। অগ্নিকে বলা হচ্ছে "নৃবৎসখা সভাবান" (ঋগ্বেদ : ৪. ২. ৫)—অর্থাৎ, মানুষদের মতোই আমাদের সখা এবং সভায় স্থিত। অতএব, ঋগ্বেদে শুধুমাত্র বরুণের সঙ্গেই বৈদিক মানুষদের এ-রকম সখার সম্বন্ধ নয়। অর্যমা সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোন্যাল[১৮] বলছেন, "In less than a dozen passages the word has only the appellative senses of 'comrade' and 'groomsman' এবং অর্যময় কথার অর্থ হলো relating to a comrade। ইন্দ্র ও অগ্নির প্রতিও একই সখাভাব ব্যক্ত হতে দেখা যায়।

ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে,

> যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে সখায় ইন্দ্রমূর্তয়ে ॥
>
> অর্থাৎ,
>
> —প্রত্যেক কর্মের প্রারম্ভে ইন্দ্রের মূর্তিযুক্ত সখাকে আমরা আহ্বান করি, প্রত্যেক যজ্ঞে ॥ ঋগ্বেদ : ১. ৩০. ৭ ॥

অগ্নির উদ্দেশে বলা হয়েছে,

> আ হি ষ্মা সূনবে পিতাপির্যজত্যাপয়ে সখা সখ্যে বরেণ্যঃ ॥
>
> অর্থাৎ
>
> —হে (অগ্নি) তুমি শ্রেষ্ঠ ; পিতা পুত্রের প্রতি, বন্ধু বন্ধুর প্রতি এবং সখা সখার প্রতি যেরূপ আচরণ করে, তুমি আমাদিগের প্রতি সেইরূপ অভীষ্ট দান কর॥ ঋগ্বেদ : ১. ২৬. ৩ ॥

কিন্তু আফ্রিকার দিন্‌করা কি বৈদিক মানুষদের মতো এরকম কবিতা রচনা করে? করে। তাদের রচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সেলিগ্‌মানের[১৯] মন্তব্য অত্যন্ত মূল্যবান, বৈদিক সাহিত্যের—বিশেষত ঋগ্বেদের—উপর তা আলোক-পাত করতে পারে :

> The Southern Dinka (to whom the following specially refers) do not appear to use set forms of prayer, but seem to *ask in*

ordinary simple sentences that their immediate want may be granted. They also have a number of hymns which are sung when an ox is slaughtered to avert drought or sickness; but as Mr. Shaw informed the writer, men sang them when doing light work, and lately during a severe thunderstorm every one joined in lustily to appease the elements. They also burst into one of those songs when bidding farewell to the Sirder who visited them recently. The following songs collected and translated by Mr. Shaw were composed by the *tiet* Wal of Bang village, who asserts that his spirit is Deng, that is Dengdit....

ওদের স্তোত্রর একটি নমুনা :

Father Rain falls into a solitary place.
Father Rain falls into a solitary place.
The Lord was in untrodden ground.
Hold the Father well, He holds our few souls.
Hold the Rain well, He holds our few souls.[২০]

পৃথিবীতে আজো যারা পশুপালন-জীবিকার দ্বিতীয় স্তরে আটকে রয়েছে এই হলো তাদের সাহিত্যের নমুনা। বৈদিক আর্যরাও এক সময়ে ওই পর্যায়েই জীবন-যাপন করতেন এবং আজকের ওই আফ্রিকার ট্রাইবদের মতোই সাহিত্য-রচনাও করতেন। অধ্যাপক সেলিগ্‌মানের মন্তব্য অনুসারে দিন্‌কদের সাহিত্যে আধুনিক আধ্যাত্মিক অর্থে প্রার্থনা-উপাসনার পরিচয় নেই; তার পরিবর্তে সহজ-সরল ভাষায় মনের কামনাগুলির সফলতা চাওয়া : *to ask in ordinary simple sentences that their immediate want may be granted*। ঋগ্বেদেও তাই; অন্তত ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশগুলিতে নিশ্চয়ই তাই। সে-আলোচনায় আমরা একটু পরেই প্রত্যাবর্তন করবো। তার আগে, বৈদিক সংস্কৃতির বিচারে নৃতত্ত্বমূলক জ্ঞানের উপযোগিতা সংক্রান্ত কয়েকটি সাধারণ কথা আলোচনা করে নেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। কেননা, বহু শতাব্দী ধরে আমাদের দেশে বৈদিক সাহিত্যকে চরম শ্রদ্ধাভক্তির দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে বলেই এ-সম্বন্ধে আমাদের মনে সাধারণভাবে একটা রহস্যঘন আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। তার দরুন, বৈদিক সাহিত্যের সবচেয়ে সহজ ও স্পষ্ট অর্থও আমাদের চোখে পড়তে চায় না—কার্ল মার্কস্‌ যাকে বলেছেন, *a certain judicial blindness* (পৃঃ ১৭৬)। নৃতত্ত্বের দিক থেকে বোঝবার চেষ্টা

করলে আমাদের কাছে অন্তত একটি কথা স্পষ্ট হয়ে থাকবে: যাঁরা এ-সাহিত্য রচনা করেছিলেন তাঁরা ঠিক কোন্ স্তরের জীবন-যাপন করতেন। এ-বিষয়ে চেতনা, আমাদের মনের ওই রহস্যঘন আবহাওয়াকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং বৈদিক সাহিত্যের সহজ-সরল ইংগিতগুলিকে গ্রহণ করবার জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করা যাবে।

বৈদিক সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্বের জ্ঞান

কিন্তু নৃতত্ত্বের দিক থেকে প্রাচীন সাহিত্যকে বোঝবার বিরুদ্ধে আধুনিক মনের একটা বাধাও আছে; সে-বাধার কথা শুধুমাত্র আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়।

প্রাচীন রোমের আধুনিক ইতিহাস প্রসঙ্গেও অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[২১] মন্তব্য করছেন, এ-সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিকদের নিয়ে মুস্কিল এই যে, ট্রাইব্যাল-সমাজ বলতে ঠিক কী বোঝায়, সে-প্রশ্ন না তুলেই এঁরা প্রাচীন রোমের ট্রাইব্যাল সংগঠনগুলির ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন।

এর কারণ, ট্রাইব্যাল-সমাজকে সম্যকভাবে চেনবার বিরুদ্ধে আধুনিক মনের প্রতিবন্ধ। কেননা, সে-সমাজের অকৃত্রিম রূপটি হলো প্রাক্-বিভক্ত সাম্য-সংগঠন। সেখানে আধুনিক অর্থে পরিবার-জীবন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রশক্তির পরিচয় নেই; অথচ আধুনিক মনের কাছে এগুলিই পবিত্রতম সমাজ-উপকরণ। আজীবন গবেষণার ফলে মর্গান ট্রাইব্যাল-সমাজের স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর গবেষণা যুগান্তকারী হলেও আধুনিক বিদ্বান-সমাজে স্বীকৃত হয়নি।

গ্রীক-পুরাণে দেবী এথিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন পূর্ণ রণসাজে সজ্জিতা অবস্থায়। কিন্তু বাস্তব পৃথিবীতে কোনো মানবীই এ-সুযোগ পায় না। তেমনি, বাস্তব ইতিহাসে মানবজাতির কোনো শাখাও সভ্য ও উন্নত অবস্থায় আবির্ভূত হবার সুযোগ পায়নি। আধা-জানোয়ারের মতো অবস্থা থেকে শুরু করেই কয়েক লক্ষ বছরের প্রচেষ্টায় মানুষ নানা পর্যায় পার হয়ে শেষ পর্যন্ত সভ্যতার আঙিনায় এসে পৌঁছেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধেও এই কথা। বৈদিক আর্যদের সম্বন্ধেও এই কথাই। এ-কথা ভাবতে আমাদের আত্মাভিমান হয়তো কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়; কিন্তু প্রাচীন-সমাজকে সম্যকভাবে চেনবার বিরুদ্ধে আসল বাধাটা এই রকম মান-অভিমানের[২২] ব্যাপার নয়। কেননা, আমাদের

আরো সুদূর পূর্বপুরুষেরা বনমানুষ ছিলেন—এ-কথা স্বীকার করায় অভিমান আহত হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি হলেও জীবজগতের ক্রমবিকাশের কাহিনী শুনতে আমাদের আটকায় না। কিন্তু প্রাচীন-সমাজের প্রকৃত কাহিনী শুনতে আটকায়। তার কারণ, মানব-ইতিহাসের ওই অতীত অধ্যায়গুলি মৃত ও মূক অতীতমাত্র নয়; ভবিষ্যতের উপর থেকেও সেগুলি যবনিকা উত্তোলনের আয়োজন করে।

এই কারণেই মর্গানের গবেষণার বিরুদ্ধে আধুনিক সমাজের এতোখানি প্রতিবন্ধ। এবং সে-প্রতিবন্ধের দরুন প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে আছে। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন যুগ প্রসঙ্গে ট্রাইব বা ট্রাইব্যাল সমাজ প্রভৃতি কথা যতো সহজে ব্যবহার করেন, তার অনুপাতে এ-সমাজের প্রকৃত রূপটিকে চেনবার ও স্বীকার করবার উৎসাহ প্রদর্শন করেন না।

বৈদিক সাহিত্য-বিচারের ভূমিকায় এই কথাগুলি তোলা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা, আধুনিক বিদ্বানদের রচনায় বৈদিক সমাজ প্রসঙ্গে ট্রাইব শব্দের ব্যবহার দুর্লভ নয়; কিন্তু ট্রাইব্যাল-সমাজ বলতে ঠিক কী বোঝায় সে-আলোচনা দুর্লভ। অথচ, তা বাদ দিয়ে কী ভাবে বৈদিক সাহিত্য বোঝা যেতে পারে? কেননা, বৈদিক সাহিত্যে যদি ট্রাইব্যাল-সমাজ বা তার স্পষ্ট স্মারক পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলতে হবে, ট্রাইব্যাল-সমাজ বলতে ঠিক কী বোঝায় এবং ঠিক কোন্ দিক থেকে সে-সমাজের সঙ্গে আধুনিক সভ্য সমাজের প্রভেদ? ভারততত্ত্ববিদেরা কিন্তু এ-প্রশ্ন তোলেন না। তার বদলে এমন কি অনেক সময় তাঁরা অসভ্য মানুষ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট, অবাস্তব ও খেয়ালী ধারণার উপরই নির্ভর করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে অধ্যাপক উইণ্টারনিৎস্-এর রচনারই উল্লেখ করা যায়। *Aryan Tribes* প্রভৃতি শব্দ তাঁর গ্রন্থে দুর্লভ নয়। অথচ, বৈদিক আর্যদের এই ট্রাইব্যাল অবস্থার বর্ণনায় তিনি শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত যে,

> We hear in the hymns of the Rigveda of incest, seduction, conjugal unfaithfulness, the procuring of abortion, theft and robbery. All this, however, proves nothing against the antiquity of the Rigveda. Modern ethnology knows nothing of "unspoiled children of nature" any more than it regards all primitive peoples as rough savages or cannibal monsters. The ethnologist knows that a step-ladder of endless gradations of the most widely differing cultural conditions leads from the primitive peoples to the half-civilized peoples, and right

> up to the civilized nations. We need not therefore imagine the people of the Rigveda either as an innocent shepherd people, or as a horde of rough savages, nor, on the other hand as a people of ultra-refined culture.[২৩]

এ-মন্তব্যে আধুনিক নৃতত্ত্বের প্রতি মৌখিক অনুরাগের পরিচয় যতোখানিই থাকুক না কেন, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার চিহ্নমাত্র নেই। কেননা, নৃতত্ত্বের শিক্ষা নিশ্চয়ই এই নয় যে, আদিম মানুষেরাও আধুনিক মানুষদের মতোই চুরি, ডাকাতি, গর্ভপাত, প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতে অভ্যস্ত ছিলো। বরং ঠিক তার উল্টোই। ঋগ্বেদের অংশবিশেষে যদি সত্যিই এ-জাতীয় আচরণের পরিচয় পাওয়া যায় তাহলে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হবে যে, ঋগ্বেদের ওই অংশগুলি সমাজ-বিকাশের এমন একটা পর্যায়ে রচিত হয়েছিলো যখন বৈদিক আর্যরা প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত ট্রাইব্যাল সমাজের পরিধি ছেড়ে শ্রেণীসমাজের দিকে অনেকখানিই অগ্রসর হয়েছিলেন। ট্রাইব্যাল সমাজ থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দিকে অগ্রগতির বর্ণনায় এঙ্গেল্স্[২৪] বলছেন,

> The power of these primordial communities had to be broken, and it was broken. But it was broken by influences which from the outset appear to us as a degradation, a fall from the simple moral grandeur of the ancient gentile society. The lowest interests—base greed, brutal sensuality, sordid avarice, selfish plunder of common possessions—usher in the new civilized sociaty, class society ; the most outrageous means—theft, rape, deceit, treachery—undermine and topple the old classless gentile society.

বিশাল বৈদিক সাহিত্য এক-আধবছরের রচনা নয়। আধুনিক বিদ্বানদের বিচারে এক ঋগ্বেদেরই প্রাচীনতম ও অর্বাচীনতম অংশগুলির রচনা-কালের মধ্যে দু'হাজার বছরের ব্যবধান থাকা অসম্ভব নয়। এই সুদীর্ঘ যুগ ধরে বৈদিক মানুষদের সমাজ নিশ্চয়ই একই পর্যায়ে থেমে থাকেনি। বৈদিক সাহিত্য-বিচারে আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে এঙ্গেল্স্ ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আবির্ভাব প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করছেন, বৈদিক সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকেই তা বহুলাংশে সমর্থিত হয়। এবং বর্তমান পরিচ্ছেদে আমাদের মূল যুক্তি হবে, সমাজ বিবর্তনের এই মৌলিক

পরিবর্তনটির প্রতিবিম্ব হিসেবেই বৈদিক মানুষদের চেতনায় প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণার ধ্বংসস্তূপের উপর অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী ধ্যানধারণার আবির্ভাব হয়েছিলো। বস্তুত, ট্রাইব্যাল-সমাজের সঙ্গে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের কথা মনে না রাখলে বৈদিক সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ইতিহাস বোঝা যায় না এবং এইকারণেই বৈদিক সাহিত্য-বিচারে নৃতত্ত্বের জ্ঞান শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অপরিহার্যও। অধ্যাপক উইন্টারনিৎস্ একটি পাদটীকায়, নেহাতই আনুষঙ্গিক মন্তব্য হিসেবে, বৈদিক আর্যদের সঙ্গে আধুনিক আফ্রিকার ট্রাইবদের অর্থনৈতিক জীবনের সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু এই আধুনিক যুগের পশুপালনজীবী ট্রাইবদের সঙ্গে বৈদিক আর্যদের সাদৃশ্য-বিচার থেকে বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় আমাদের পক্ষে আরো কীভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব সে-প্রশ্ন তোলেননি। ট্রাইব্যাল-সমাজকে সম্যকভাবে চেনবার বিরুদ্ধে আধুনিক মনের প্রতিবন্ধ এর কারণ হতে পারে।

ঋগ্বেদ-সংহিতা : পার্থিব সম্পদের কামনা

আফ্রিকার দিন্‌করা সাহিত্য রচনা করে, কিন্তু তা মুখেমুখে। কেননা, লেখার হরফ তারা আবিষ্কার করেনি। পশুপালনজীবী পর্যায়ে লেখার হরফের আবিষ্কার হয়নি।

বৈদিক আর্যরাও সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা লিখতে জানতেন না। তাই মুখেমুখে সাহিত্য রচনা করতেন। ঘোর-পুত্র কণ্ব ঋষি মরুৎগণকে উদ্দেশ্য করে বলছেন :

> মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্যইব ততনঃ গায় গায়ত্রমুক্‌থ্যম্॥
> অর্থাৎ,
> —মুখেতে শ্লোক রচনা কর, মেঘের মত তাহাকে বিস্তারিত কর, গায়ত্রীছন্দে উক্‌থ্য গান কর॥ ঋগ্বেদ : ১. ৩৮. ১৪॥

কিসের গান ? কামনার গান, কামবর্ষী গান। আদিম সমাজে কামনা ছাড়া গান নেই। কিসের কামনা ? অন্নের কামনা, ধনের কামনা, পশুর কামনা, সন্তানের কামনা, নিরাপত্তার কামনা। মোক্ষলাভের কথা নয়, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কথা নয়—আফ্রিকার দিন্‌কদের মতোই বৈদিক সাহিত্যেও সহজ সরলভাবে নেহাতই পার্থিব, নেহাতই লোকায়তিক কামনা প্রকাশ করবার আয়োজন।

অস্মে রায়ো দিবেদিবে সং চরন্তু পুরুস্পৃহঃ।
অস্মে বাজাস ঈরতাম্॥

অর্থাৎ,

—হে অগ্নি! অতিশয় কাম্য ধনসমূহ আমাদিগের নিকট প্রতিদিন সঞ্চরণ করুক; অন্নসমূহ আমাদিগকে কর্মের প্রেরণা দিক॥ ঋগ্বেদ: ৪.৮.৭॥

প্র যংসি হোতর্বৃহতীরিষো নোঽগ্নে মহি দ্রবিণমা যজস্ব।

অর্থাৎ,

—হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে অন্ন দান কর। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে মহৎ ধন দান কর॥ ঋগ্বেদ: ৩.১.২২॥

ব্রহ্মণস্পতে সুযমস্য বিশ্বহা রায়ঃ স্যাম রথ্যো বয়স্বতঃ।
বীরেষু বীরাঁ উপ পৃঙ্‌ধি নস্ত্বং যদীশানো ব্রহ্মণা বেষি মে হবম্॥

অর্থাৎ,

—হে ব্রহ্মণস্পতি, সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যাপী অন্নযুক্ত ধনের আমরা যেন অধিপতি হই; আমাদের বীরগুলিকে তুমি বীর (পুত্র) উৎপাদন কর; তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের অন্নযুক্ত স্তুতির অভিলাষী॥ ঋগ্বেদ: ২.২৪.১৫॥

হুবহু এই জাতীয় পার্থিব কামনাই সুবিশাল ঋগ্বেদ-সংহিতাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এখানে আরো কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা যায়।

ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো রক্ষা রাজন্নঘায়তঃ।
ন রিষ্যেত্ত্বাবতঃ সখা॥

অর্থাৎ,

—হে রাজন সোম! আমাদের দুঃখদানে অভিলাষী সকল লোক হইতে রক্ষা কর; ত্বৎসদৃশ ব্যক্তির সখা কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় না॥ ঋগ্বেদ: ১.৯১.৮॥

সোম যাস্তে ময়োভুব উতয়ঃ সন্তি দাশুষে।
তাভির্নোঽবিতা ভব॥

অর্থাৎ,

—হে সোম! যজমানের সুখজনক তোমার যে সকল রক্ষণ আছে তদ্দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ১.৯১.৯॥

ইমং যজ্ঞমিদং বচো জুজুষাণ উপাগহি।
সোম ত্বং নো বৃধে ভব॥

অর্থাৎ,

—হে সোম! তুমি আমাদের এই যজ্ঞ ও এই স্তুতি দ্বারা প্রীত হইয়া আগমন কর এবং আমাদের বর্ধন কর॥ ঋগ্বেদ : ১. ৯১. ১০॥

আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্।
ভবাং বাজস্ত সংগথে॥

অর্থাৎ,

—হে সোম! তুমি বর্ধিত হও, তোমার বীর্য দ্বারা সকলে সংযুক্ত হউক; তুমি আমাদের অন্নদাতা হও॥ ঋগ্বেদ : ১. ৯১. ১৬॥

আ প্যায়স্ব মদিন্তম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ।
ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ সখা বৃধে॥

অর্থাৎ,

—অত্যন্ত মদযুক্ত হে সোম! সমস্ত লতাবয়বদ্বারা বর্ধিত হও; শোভন অন্নযুক্ত হইয়া তুমি আমাদের সখা হও ও বর্ধিত হও॥ ঋগ্বেদ : ১. ৯১. ১৭॥

স শ্রুধি যঃ স্মা পৃতনাসু কাসু চিদ্দক্ষায্য ইন্দ্র
ভরহূতয়ে নৃভিরসি প্রতূর্তয়ে নৃভিঃ।
যঃ শূরৈঃ স্বঃ সনিতা যো বিপ্রৈর্বাজং তরুতা।
তমীশানাস ইরধন্ত বাজিনং পৃক্ষমত্যং ন বাজিনম্॥

অর্থাৎ,

—হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধের নেতা; তুমি প্রধান প্রধান যুদ্ধে মরুৎগণের সহিত স্পর্ধাপূর্বক শত্রুসংহারে সমর্থ; তুমি শূরগণের সহিত স্বয়ং (সংগ্রামসুখ) অনুভব কর। ঋত্বিকগণ স্তব করিলে তুমি তাহাদিগকে অন্নপ্রদান কর; আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ কর। অভ্যর্থনা-সমর্থ ঋত্বিকগণ গমনশীল অন্নবান ইন্দ্রকে অশ্বের ন্যায় সেবা করে॥ ঋগ্বেদ : ১. ১২৯. ২॥

দস্মো হি ষ্মা বৃষণং পিন্বসি ত্বচং কং চিদ্যাবীরররুং শূর মর্ত্যং পরিবৃণক্ষি মর্ত্যম্।
ইন্দ্রোত তুভ্যং তদ্দিবে তদ্রুদ্রায় স্বযশসে।
মিত্রায় বোচং বরুণায় সপ্রথঃ সুমৃলীকায় সপ্রথঃ॥

অর্থাৎ,

—হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুক্ষয়কারক অতএব বৃষ্টিপূর্ণ ত্বক্-রূপ জলের আবরণকে (মেঘকে) ভেদ করিয়া (জল) সেচন কর; এবং মর্ত্যের ন্যায় গমনশীল মেঘকে ধরিয়া বৃষ্টিশূন্য করিয়া ছাড়িয়া দাও, যেমন কোন বীর গমনকারী শত্রুকে নিগৃহীত করে। হে ইন্দ্র! তোমার এই কার্য আমরা তোমার নিকট, দ্যুর নিকট, যশোযুক্ত রুদ্রের নিকট ও প্রজাদিগের সুখদায়ী মিত্র ও বরুণের নিকট বলিব॥ ঋগ্বেদ : ১. ১২৯. ৩॥

অস্মাকং ব ইন্দ্রমুশ্মসীষ্টয়ে সখায়ং বিশ্বায়ুং প্রাসহং যুজং বাজেষু প্রাসহং যুজম্।
অস্মাকং ব্রহ্মোতয়েঽবা পৃৎস্বষু কাসু চিৎ।
ন হি ত্বা শত্রুঃ স্তরতে স্তৃণোষি যং বিশ্বং শত্রুং স্তৃণোষি যম্॥
অর্থাৎ,
—হে ঋত্বিকগণ! আমাদিগের যজ্ঞে ইন্দ্রকে কামনা করি। ইন্দ্র আমাদিগের সখা, সর্বগামী, শত্রুদিগের অভিভবকারী এবং তিনি আমাদিগকে অন্নসমূহদ্বারা যুক্ত করেন। তিনি আমাদিগের সহায়ভূত হইয়া শত্রুবিনাশ করেন এবং মরুৎগণের সহিত মিলিত হন। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পালনার্থ আমাদের কর্ম রক্ষা কর। সংগ্রামে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না। তুমিই সমস্ত শত্রুকে নিবারণ কর॥ ঋগ্বেদ; ১. ১২৯. ৪॥

এতা বো বশ্ম্যুদ্যতা যজত্রা অতক্ষন্নায়বো নব্যসে সম্।
শ্রবস্যবো বাজং চকানাঃ সপ্তির্ন রথ্যো অহ ধীতিমশ্যাঃ॥
অর্থাৎ,
—হে যজনীয় বিশ্বদেবগণ! আমি তোমাদের উদ্যত স্তুতিগুলিকে কামনা করি। তোমরা নূতনতর স্তুতির যোগ্য। আমাদিগের ন্যায় অন্ন ও বলাভিলাষী মনুষ্যগণ তোমাদের জন্য স্তুতি রচনা করিয়াছে। রথের অশ্বের ন্যায় তোমাদের দল আমাদের কর্মে আগমন করুক॥ ঋগ্বেদ: ২. ৩১. ৭॥

অস্য মে দ্যাবাপৃথিবী ঋতায়তো ভূতমবিত্রী
বচসঃ সিষাসতঃ।
যযোরায়ুঃ প্রতরং তে ইদং পুর উপস্তুতে
বসূয়ুর্বাং মহো দধে॥
অর্থাৎ,
—হে দ্যাবাপৃথিবী! যে স্তোতা ঋত অনুযায়ী তোমাদিগকে বাক্যের দ্বারা প্রীত করিতে ইচ্ছা করে, তোমরা তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ হও। তোমাদের অন্ন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দ্যাবাপৃথিবীকে সকলে স্তুতি করে, অন্নকাম হইয়া মহা স্তোত্রদ্বারা তোমাদের স্তব করিব॥ ঋগ্বেদ: ২. ৩২. ১॥

মাকির্নেশন্মাকীং রিষন্মাকীং সং শারি কেবটে।
অথারিষ্টাভিরা গহি॥
অর্থাৎ,
—(হে পূষন), আমাদিগের গরুগুলি যেন নষ্ট না হয়, তাহারা যেন হিংসিত না হয়, তাহারা যেন গর্তে না পড়িয়া যায়; এইরূপে অমঙ্গলহীন গরুগুলির সহিত তুমি আগমন কর॥ ঋগ্বেদ: ৬. ৫৪. ৭॥

নূ গৃণানো গৃণতে প্রত্ন রাজন্নিষঃ পিন্ব বসুদেয়ায় পূর্বীঃ।
অপ ওষধীরবিষা বনানি গা অর্বতো নৄন্‌ঋচসে রিরীহি॥

অর্থাৎ,

—হে পুরাতন রাজা (ইন্দ্র), তুমি স্তুত হইয়া তোমার দেয় যে ধনসমূহ সেইগুলি এবং অন্নসমূহ শীঘ্র আমাদিগকে দাও; এবং বৃষ্টি, ওষধিসমূহ নির্বিষ বৃক্ষগুলি, গরুগুলি, অশ্বগুলি এবং মনুষ্যগুলি আমাদিগকে দাও ॥ ঋগ্বেদ : ৬. ৩৯. ৫ ॥

উদ্ধৃতিগুলি খুব কিছু সযত্ন-চয়নের পরিচায়ক নয়—প্রায় এলোমেলোভাবে নমুনা-পরিদর্শন বা *sample survey*-র মতো করেই গ্রহণ করা হয়েছে। এর থেকেই অনুমান করা যাবে ঋগ্বেদের কবিরা যে-কামনা অবলম্বন করে কবিতা বা গান রচনা করতেন সেগুলির স্বরূপ মূলতই লোকায়তিক : পরলোক বা পরকাল-সম্পর্কিত কামনা নয়, মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা-উপাসনা নয়।

অবশ্যই দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত এই সাহিত্য। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, আধুনিক আধ্যাত্মিক অর্থে ঋগ্বেদের দেবতাদের দেবত্বপ্রাপ্তি হয়নি। উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যেই তাঁদের সখা বা বন্ধুভাবে আহ্বান করবার পরিচয় রয়েছে। এখানে সে-প্রসঙ্গে আরো কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়।

হয়ে দেবা যূয়মিদাপয়ঃ স্থ তে মৃলত নাধমানায় মহ্যম্।
মা বো রথো মধ্যমবালৃতে ভূন্মা যুষ্মাবৎস্বাপিষু শ্রমিম্ম ॥

অর্থাৎ,

—হে দেবগণ (বিশ্বদেবগণ)! তোমরাই আমাদের বন্ধু। আমরা, যাহারা যাচ্ঞা করিতেছি, তাহাদের অভিমত ফল প্রদান কর। তোমাদের রথ আমাদের যজ্ঞে যেন মন্দগতি না হয়। তোমাদের ন্যায় বন্ধু পাইয়া আমরা যেন শ্রান্ত না হই ॥ ঋগ্বেদ : ২. ২৯. ৪ ॥

নিষ্বিধ্বরীস্ত ওষধীরুতাপো রয়িং ত ইন্দ্র পৃথিবী বিভর্তি।
সখায়স্তে বামভাজঃ স্যাম মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥

—অর্থাৎ,

—হে ইন্দ্র, ওষধিসমূহ এবং জল তোমারই নির্মিত, তোমার ধন পৃথিবী ধারণ করে; আমরা তোমার সখা এবং তোমার ঈপ্সিত ধনের ভাগী (বামভাজঃ); তুমি শ্রেষ্ঠ দেবগণের মধ্যে একমাত্র অসুর ॥ ঋগ্বেদ : ৩. ৫৫. ২২ ॥

পুরাণমোকঃ সখ্যং শিবং বাং যুবোর্নরা দ্রবিণং জহ্নাব্যাম্।
পুনঃ কৃণ্বানাঃ সখ্যা শিবানি মধ্বা মদেম সহ নূ সমানাঃ ॥

অর্থাৎ,

(হে অশ্বিদ্বয়!) তোমাদিগের বাসস্থান পুরাতন, তোমাদিগের সখ্য মঙ্গলকর, তোমাদিগের ধন জাহ্নবীতে অবস্থিত; পুনরায় তোমাদের বন্ধুত্ব মঙ্গলময় হউক, আমরা মধুদ্বারা তোমাদের সহিত সমানভাবে আনন্দ করি ॥ ঋগ্বেদ : ৩. ৫৮. ৬ ॥

সংক্ষেপে : ঋগ্বেদ সংহিতা মুখেমুখে রচনা-করা কবিতা বা গানের সংকলন। কেননা, বৈদিক মানুষেরা তখনো লেখার হরফ আবিষ্কার করেননি—লেখার হরফ পশুপালনজীবী পর্যায়ের পরের আবিষ্কার। এ-সাহিত্য তবুও বিলুপ্ত হয়নি; কেননা কানে শুনে পরম যত্নে মুখস্থ করে রাখবার ব্যবস্থা ছিলো। তাই নাম শ্রুতি। কামনাই হলো এ-সাহিত্যের প্রাণবস্তু। এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, পৃথিবীতে আজো যে-সব মানবদল পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় আটকে রয়েছে তাদের পরীক্ষা করলে দেখা যায়, প্রাচীন সমাজে কামনা ছাড়া গান হয় না। শুধু তাই নয়; প্রাচীন মানুষদের কাছে সমস্ত গানেরই একটা প্রয়োগের দিক আছে, কাজের সঙ্গে সম্পর্কের দিক আছে। ঋক-মন্ত্রগুলিরও যে এককালে এই বৈশিষ্ট্য ছিলো তার স্মৃতি উত্তরযুগেও বৈদিক মানুষদের মন থেকে মুছে যায়নি: "প্রত্যেক মন্ত্রের কোনও-না-কোন কর্মে, কোনও-না-কোন অনুষ্ঠানে, বিনিয়োগ হইত। যাজ্ঞিকদের মতে প্রত্যেক মন্ত্রই কোনও-না-কোন কাজে লাগিবে, কোনও-না-কোন অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইবে। অকেজো মন্ত্রের কোন সার্থকতা নাই।"[২৫] অবশ্যই পরের যুগে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির যে-বিনিয়োগ নির্দিষ্ট হয়েছে বৈদিক সংস্কৃতির আদিপর্বেও যে এগুলি সেই ভাবেই এবং সেই কাজেই প্রযুক্ত হতো সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী[২৬] যে-রকম বলছেন, এই ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে বৈদিক যজ্ঞের আদি-তাৎপর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না: "আর্যেতর অন্যান্য জাতির মধ্যেও যজ্ঞানুষ্ঠান কোনও-না-কোন প্রকারে বিদ্যমান ছিলো এবং এখনো আছে…। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠান কালক্রমে অত্যন্ত পল্লবিত হইয়া অত্যন্ত জটিলতা পাইয়াছিল। বহু অনুষ্ঠানের গোড়ার তাৎপর্য লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাৎপর্য আরোপ-করিবার লোকের অভাব ছিল না!" আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের মতে ব্রহ্মবাদী বা ব্রাহ্মণগ্রন্থের লেখকেরা উত্তরযুগে যজ্ঞের উপর এইভাবে নিজেদের কল্পনা-প্রসূত তাৎপর্য আরোপ করেছিলেন। যজ্ঞকথার আলোচনায় আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করবো। আপাতত আমাদের মন্তব্য শুধু এই যে, প্রাচীন সমাজের সাহিত্য বলেই আধুনিক কালের অসভ্য মানুষদের সাহিত্যের মতোই ঋগ্বেদের ছন্দোবদ্ধ রচনাগুলির একটা প্রয়োগের দিক—কর্মের সঙ্গে সম্পর্কের দিক—ছিলো; এবং উত্তরকালের ওই বিনিয়োগ-ব্যবস্থার মধ্যে তারই স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায়, যদিও তার আদিতাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সে-বিষয়ে বিদ্বানেরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

তৃতীয়ত, যে-কামনাগুলিকে কেন্দ্র করে ঋগ্বেদের এই কবিতা বা গানগুলি গড়ে উঠেছিলো তা মূলতই পার্থিব বস্তুর কামনা: ধন, অন্ন, পশু, পুত্র, নিরাপত্তা, ইত্যাদি। এমন কি যে-দেবতাদের কাছে এই কামনার চরিতার্থতা

চাওয়া হয়েছে তাঁদেরও তখনো আধুনিক আধ্যাত্মিক অর্থে দেবত্বপ্রাপ্তি ঘটেনি। এদিক থেকে, ঋগ্বেদ-কে আমরা বহুলাংশেই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী চেতনার পরিচায়ক বলবো। এবং বর্তমান পরিচ্ছেদে আমাদের মূল যুক্তি হবে, এই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী চেতনা প্রাক্-বিভক্ত প্রাচীন সমাজ-জীবনেরই পরিচায়ক।

সমষ্টির কামনা, ব্যষ্টির কামনা নয়

ঋগ্বেদের প্রাক্-বিভক্ত সমাজের স্মারকগুলিকে সনাক্ত করবার চেষ্টা করা হয়নি। ফলে, ঋগ্বেদের কবিতাগুলির একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রকট ও স্পষ্টভাবে আমাদের চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও তা বৈদিক সাহিত্যবিদ্‌দের চোখে পড়তে চায়নি। বৈশিষ্ট্যটি হলো, ওই যে ধন, অন্ন, পশু, পুত্র, নিরাপত্তা প্রভৃতির কামনা,—যে-কামনাকে সমগ্র ঋগ্বেদের মূলসূত্র বলে দেখতে পাওয়া যায়,—তা কোনো ব্যক্তিবিশেষের কামনা নয়, সমষ্টিগত কামনা। নিজের জন্যে চাওয়া নয়, দলের জন্যে চাওয়া। "আমাকে দাও"—এমন কথা ঋগ্বেদের কোথাওই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় বললে নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলা হবে। কেননা দ্বিসহস্রাধিক বছর ধরে রচিত এই সুবিশাল সাহিত্যের সুর আগাগোড়া এক নয়। আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো, এ-সাহিত্যের অর্বাচীনতম অংশে ব্যক্তিবিশেষের উচ্চাকাঙ্খা ও দম্ভ সমষ্টিগত জীবনকে পদদলিত করবার আয়োজন করেছে। কিন্তু তবুও এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই যে, ঋগ্বেদের প্রধানতম কথা হলো "আমাদের দাও", "আমাকে দাও" নয়: আমাদের ধন বর্ধিত হোক, আমাদের পশু বর্ধিত হোক, আমাদের অন্ন বর্ধিত হোক, আমাদের শত্রুর বিনাশ হোক, আমাদের নিরাপত্তার আয়োজন হোক। এমনকি পুত্রের জন্য যে-কামনা তাও প্রধানতই সমষ্টিগত: আমাদের বীর পুত্র উৎপন্ন হোক। একটি কামনা ঘুরেফিরে বারবার—প্রায় ধুয়ার মতো—ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে, অর্থাৎ প্রাচীনতম অংশটিতে, ব্যক্ত হয়েছে: বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ, অর্থাৎ, আমরা বীর পুত্রের জন্য সভায় বিশেষ করিয়া বলিতেছি। দ্বিতীয় মণ্ডলে বাইশবার (এবং নবম মণ্ডলে একবার) এই ধুয়াটির উল্লেখ পাই।

ইতিপূর্বে যে-ঋক্‌গুলি উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যেই এই সমষ্টিগত-কামনার দিকটি দেখতে পাওয়া কঠিন হবে না। এখানে আরো কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করবো।

ব্রহ্মণস্পতে ত্বমস্য যন্তা সূক্তং চ বোধি তনয়ং চ জিন্ব।
বিশ্বং তদ্ভদ্রং যদবন্তি দেবা বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥
অর্থাৎ,
—হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি ইহার নিয়ামক। তুমি সূক্তকে জান এবং তনয় দান কর; দেবতারা যাহাদিগকে রক্ষা করেন তাহারা সমস্তই মঙ্গলময়; আমরা বীর পুত্রসমূহের জন্য এই সভায় তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি॥ ঋগ্বেদ: ২, ২৩. ১৯ এবং ২. ২৪. ১৬॥

মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ্ মর্ত্যস্য
রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে।
অর্থাৎ,
—হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি আমাদিগের উপদ্রবকারী শত্রুকে হিংসা কর, তাহারা যেন আমাদিগকে কদাপি না প্রাপ্ত হয়; হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ঋগ্বেদ: ১. ১৮. ৩॥

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা সুজিহ্বস্ত্রিরা দিবো বিদথে পত্যমানঃ।
দেবেষু চ সবিতঃ শ্লোকমশ্রেরাদস্মভ্যমা সুব সর্বতাতিম্॥
অর্থাৎ,
—হে হিরণ্যপাণি সবিতা, তুমি শোভন জিহ্বাযুক্ত, তুমি তিনবার স্বর্গ হইতে এই সভায় আসিতেছ; হে সবিতা, দেবগণের মধ্যে এই শ্লোকটিকে লইয়া যাও এবং সর্বপ্রকারে আমাদিগকে কাম্যফল প্রেরণ কর॥ ঋগ্বেদ: ৩. ৫৪. ১১॥

শৃণ্বন্তু নো বৃষণঃ পর্বতাসো ধ্রুবক্ষেমাস ইলয়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শৃণোতু যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম ভদ্রম্॥
অর্থাৎ,
—হে কামবর্ষী পর্বতসমূহ (মরুৎগণ), আমাদের শ্রবণ কর; অন্ন (ইলা) দ্বারা আনন্দিত হইয়া নিশ্চল রূপে আমাদিগকে শ্রবণ কর; আদিত্যগণের সহিত অদিতি আমাদিগকে শ্রবণ করুন এবং আমাদিগকে মরুৎগণ মঙ্গলময় সুখ প্রদান করুন॥ ঋগ্বেদ: ৩. ৫৪. ২০॥

অস্মভ্যং তদ্বসো দানায় রাধঃ সমর্থয়স্ব বহু তে বসব্যম্।
ইন্দ্র যচ্চিত্রং শ্রবস্যা অনু দ্যূন্ বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥
অর্থাৎ,
—আমাদিগকে সেই ধন দান করিবার জন্য যাচ্ঞা করিতেছি; হে ইন্দ্র, তোমার ধন প্রভূত, তুমি আমাদিগকে দানের জন্য সমর্থ কর; সেই সঞ্চিত ধন ভোগ করিতে ইচ্ছা করি; আমরা বীর পুত্রের জন্য এই সভায় তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি। ঋগ্বেদ: ২. ১৩. ১৩ এবং ২. ১৪. ১২॥

অস্মভ্যং রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ে।
শ্রবো বসূনি সং জিতম্ ॥
অর্থাৎ,
—হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা দুইজন দেবতাদিগের আনন্দজনক অন্ন লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে অন্ন এবং ধনসমূহ জয় করিয়া দাও॥ ঋগ্বেদ : ৯. ৭. ৯॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা পার্থিব সম্পদের কামনায় ভরপুর। কিন্তু সে-সম্পদ ব্যক্তির জন্য নয়, সমষ্টির জন্য।

ঋগ্বেদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা একেবারেই নেই বা ব্যক্তিগত সম্পদের কামনা কোথাওই দেখতে পাওয়া যায় না,—এ-দাবি ভুল হবে। কেননা, বৈদিক মানুষদের সমাজজীবন একই জায়গায় থেমে থাকেনি: প্রাক্-বিভক্ত সমাজের পরিধি ছেড়ে কালক্রমে বৈদিক আর্যরাও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। আমরা শুরুতেই দেখেছি, পশুপালন-নির্ভরতার যে উচ্চ স্তরটিতে বৈদিক আর্যরা জীবন যাপন করতেন বলে অনুমান করবার সুযোগ রয়েছে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাকে প্রাক্-বিভক্ত ও শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের মধ্যবর্তী সীমা-প্রদেশ বলে সনাক্ত করা অসম্ভব নয়। অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের পিছন দিকে প্রাক্-বিভক্ত সমাজের স্মৃতি, সামনে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আভাস। তাই ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতর অংশগুলিতে যে-পার্থিব সম্পদের কামনা, তা মূলতই বা প্রধানতই ব্যষ্টিকেন্দ্রিক নয়—গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। অথচ, ঋগ্বেদের এই বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকট হওয়া সত্ত্বেও বেদ-বিদেরা তার আলোচনা তোলেননি। কেননা, আধুনিক বিদ্বানদের চেতনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি সনাতন; তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা বৈদিক সাহিত্যে যতোই গৌণ হোক না কেন এই বৈশিষ্ট্যটি আধুনিক বিদ্বানদের চোখে পড়ে না। আমরা ইতিপূর্বে (পৃঃ ১৭৬) দেখেছি, মার্ক্স্ একেই বলেছেন *judicial blindness*।

প্রাক্-বিভক্ত সাম্যসমাজের স্মারক

ঋগ্বেদ-সংহিতায় প্রাক্-বিভক্ত সাম্য-সমাজের স্মৃতি শুধু এইটুকুই নয় যে, এ-সাহিত্যের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির চেতনার অভাব, বা এখানে পার্থিব সম্পদের কামনাটা প্রধানতই সাধারণের জন্য,—একার জন্য বা একের জন্য নয়; তাছাড়াও আরো নানান দিক থেকে ঋগ্বেদ-সংহিতায়

প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজের স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে বৈদিক আর্যদের সমান বা সাম্য-জীবন সংক্রান্ত কয়েকটি চিত্তাকর্ষক তথ্য উদ্ধৃত করবো।

ইন্দ্রের আহ্বানকারীরা পরস্পরের সহিত মিলিত ও সমান-দক্ষ (ঋগ্বেদ : ৭. ২৬. ২) এবং মরুৎগণের স্তোতারাও সকলে সমান (ঋগ্বেদ : ৬. ৬৬. ১)। অগ্নিকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে :

> বিশ্বাসাং ত্বা বিশাং পতিং হবামহে সর্বাসাং সমানং দম্পতিং ভুজে॥
> অর্থাৎ,
> —সমস্ত প্রজাদিগের (=যজমানদিগের : সায়ন) পতি, তোমাকে (অগ্নিকে) আমরা আহ্বান করি, সকলের সমান পালক, যিনি গৃহের পতি, তাঁহাকে॥ ঋগ্বেদ : ১. ১২৭. ৮॥

> সমানৈর্নৃভির্যদ্‌যুক্তো বিবে রপাংসি॥
> অর্থাৎ,
> —সমান নরগণের সহিত মিলিত হইয়া (তুমি, হে অগ্নি) রাক্ষসদিগকে বিতাড়িত কর॥ ঋগ্বেদ : ১. ৬৯. ৮॥

ইন্দ্রকে আহ্বান করে বলা হচ্ছে, তুমি সকলের প্রতি সমান (১. ১৩১. ২); তুমি সেই সাধারণ ধনের ভাগ আমাদের দাও যাহাতে আমাদের শরীরের উপকার সাধন হয় (ঋগ্বেদ : ২. ১৭. ৭); তিনি গাভিসকলের পালক এবং সকলের প্রতি সমান (ঋগ্বেদ : ৪. ৩০. ২২)। বৈশ্বানর সকলের প্রতি সমান (ঋগ্বেদ : ৪. ৫. ৭); সূর্য আমাদিগকে অভিলষিত প্রদান করেন ; তিনি সকলের প্রতি সমান (ঋগ্বেদ : ৭. ৬৩. ৩); ইন্দ্র শত্রুবিমর্দক, গোবিশিষ্ট, অন্নদাতা এবং সকলের প্রতি সমান (ঋগ্বেদ : ৮. ৪৫. ২৮); ইন্দ্র সমান ধনাচ্ছাদক ও বসুপ্রেরক (ঋগ্বেদ : ৮. ৯৯. ৮)। আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, শুধুই যে দেবতারা সব মানুষের প্রতি সমান তাই নয় মানুষেরাও দেবতাদের সঙ্গে সমান হয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে,

> পুনঃ কৃণ্বানাঃ সখ্যা শিবানি মধ্বা মদেম সহ নূ সমানাঃ॥
> অর্থাৎ,
> —পুনরায় মঙ্গলময় সখ্য করিয়া, সোমদান করিয়া, আমরা তোমাদের সহিত সমান হইয়াছি॥ ঋগ্বেদ : ৩. ৫৮. ৬॥

এমনকি দেবতাদের পরস্পরের মধ্যেও একটা সাম্য-সম্পর্কের ইংগিত পাওয়া

যায়। ইন্দ্র ও অগ্নির সমান জনক, তাঁরা যমজ ভ্রাতার মতো (ঋগ্বেদ: ৬. ৫৯. ২); নাসত্যদ্বয় দেবগণের সঙ্গে সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হোন (ঋগ্বেদ: ৭. ৭৩. ২); অশ্বিদ্বয়ের সমান উৎপত্তিস্থান এবং সমান বন্ধু (ঋগ্বেদ: ৮. ৭৩. ১২); উষাসমূহ সমান বিখ্যাত (ঋগ্বেদ: ৪. ৫১. ৮) এবং পরস্পরের সঙ্গে সমান (ঋগ্বেদ: ৪. ৫১. ৯); মরুৎগণ শোভার্থ সমানরূপ আভরণ ব্যক্ত করেন (ঋগ্বেদ: ৭. ৫৭. ৩); মরুৎগণ তাঁদের সাধারণ বসতি থেকে নির্গত হন (ঋগ্বেদ: ৫. ৮৭. ৪)।

আমরা ইতিপূর্বে (পৃ. ২২৯) ব্রাত্য শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি, বৈদিক মানুষেরাও একসময়ে প্রাক্-বিভক্ত সাম্যসমাজে জীবন যাপন করতেন বলেই তাঁদের সাহিত্যের একটা পর্যায়ে 'গণ' 'ব্রাত' প্রভৃতি এই প্রাক্-বিভক্ত সমাজ ব্যঞ্জক শব্দগুলিরও বিশেষ সমাদর ছিলো। উত্তরকালে সে-সমাজ ভেঙে যায় এবং এই শব্দগুলিও নিন্দিত হয়। হয়তো সেই ভাঙন ধরবার মুখোমুখী সময়েই বৈদিক কবিরা অতীতের স্মৃতি উদ্বুদ্ধ করে ব্যাকুল কণ্ঠে সকলকে আহ্বান করেছিলেন:

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম।
দেবা ভাগঃ যথাপূর্বে সংজানানা উপাসতে॥
অর্থাৎ,
—তোমরা একত্র মিলিত হও, এককণ্ঠে ঘোষণা কর, একত্র মন বিনিময় কর; যেরূপ অতীতের দেবতাগণ সচেতনভাবে একত্র তাঁহাদের ভাগ গ্রহণ করিতেন॥
ঋগ্বেদ: ১০. ১৯১. ২॥

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥
অর্থাৎ,
—মন্ত্র সমান হউক, সমিতি সমান হউক, মন সমান হউক, বিচার একরূপ হউক। তোমাদের সহিত একই মন্ত্রে আমি মন্ত্রণা করি, তোমাদের সহিত একই হবি দ্বারা আমি হোম করি॥ ঋগ্বেদ: ১০. ১৯১. ৩॥

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥
অর্থাৎ,
—তোমাদের প্রচেষ্টা সমান হউক, হৃদয়গুলি এক হউক, মন এক হউক, যাহাতে তোমাদের ঐক্য স্থাপিত হয়॥ ঋগ্বেদ: ১০. ১৯১. ৪॥

এই মন্ত্রগুলিই হলো ঋগ্বেদের সর্বশেষ মন্ত্র। ঋগ্বেদের শেষ বা দশম মণ্ডলটি অনেক পরের যুগের রচনা। ততোদিনে আদিম সাম্যসমাজ কী ভাবে ভেঙে গিয়েছে তার আলোচনায় আমরা একটু পরেই প্রত্যাবর্তন করবো। এই ভাঙনের মুখেই ঋগ্বেদের কবি সেই অতীত স্মৃতির কাছে আবেদন জাগাতে চাইছেন—"অতীতে দেবতাগণ সচেতনভাবে একত্র তাঁহাদের ভাগ গ্রহণ করিতেন।" কিন্তু এই ব্যবস্থাই যদি অতীত-ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তাহলে ঋগ্বেদের ইংগিত থেকেই অনুমান করবার সুযোগ থাকে যে, কালক্রমে সে-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছিলো : উদিন্ন্বস্য রিচ্যতেঽংশো ধনং ন জিগ্যুষঃ—অর্থাৎ, জিতধনে (ইন্দ্রের) অংশ অপরের অংশ হইতে অধিক (ঋগ্বেদ : ৭.৩২.১২)।

অতীতে একত্রে ভাগ গ্রহণ করার তাৎপর্য কী? অংশ মানে কী? এ-জাতীয় প্রশ্নর উত্তর পেতে হলে প্রাচীন প্রাক্‌বিভক্ত সমাজের বৈশিষ্ট্যর আলোচনা তুলতে হবে।

ভগ ও অংশ : ধনবণ্টন

ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে (৯. ১১৪. ৩) সাতজন এবং দশম মণ্ডলে (১০ .৭২. ৮) আটজন আদিত্যের উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু সেখানে তাঁদের নামের তালিকা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় মণ্ডলে (২. ২৭. ১) ছয়জন আদিত্যের উল্লেখ দেখা যায় এবং তাঁদের নামের তালিকাও পাওয়া যায় : মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ, অংশ। এঁদের মধ্যে আমরা বিশেষ করে ভগ ও অংশের কথা আলোচনা করবো।

ভগ শব্দের অর্থগুলি[১১] দেখা দরকার। প্রথমত ভগ মানে হলো *dispenser, giver*—যিনি দেন। কী দেন? প্রাচুর্য, ধন, সৌভাগ্য—*bounty, wealth, fortune*। এই হলো ভগ-র দ্বিতীয় অর্থ। এবং এই অর্থেই ভগবান শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য হলো ঐশ্বর্যবান, ধনবান, প্রাচুর্যবান, সৌভাগ্যবান। যেমন, ইন্দ্রের বিশেষণ মঘবান—মঘ মানে ধন, ঐশ্বর্য; মঘবান মানে ধনবান, ঐশ্বর্যবান। ভগবান মানেও তাই। কিন্তু ভগের একটি তৃতীয় অর্থও আছে এবং সেই অর্থে ভগ ও অংশ অভিন্ন। অর্থাৎ, ভগের তৃতীয় অর্থ হলো অংশ, *share*। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোন্যাল[১৮] বলছেন,

> The word *Amsa* which occurs less than a dozen times in the Rigveda is almost synonymous with *bhaga*, expressing both the concrete sense of 'share, protion' and that of 'apportioner'.

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের শেষ সূক্তে বলা হয়েছে, "অতীতে দেবতাগণ সচেতনভাবে একত্র তাঁহাদের ভাগ গ্রহণ করিতেন"। আবার সপ্তম মণ্ডলে বলা হয়েছে, ইন্দ্রের অংশ অন্যদের চেয়ে বেশি। ভগ বলতে যদি অংশ বা *share* বোঝায় তাহলে ভগের ইতিহাস বৈদিক সমাজের একটি বৈশিষ্ট্যের উপরও আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু আমাদের আধুনিক ধ্যানধারণার সাহায্যে সে বৈশিষ্ট্যকে বোঝা যাবে না; অগ্রসর হতে হবে প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে পারা তথ্যের উপর নির্ভর করে।

প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজে মানুষ যেটুকু ধনসম্পদ আহরণ বা উৎপাদন করতে পেরেছে তার উপর কারুরই ব্যক্তিগত মালিকানা জন্মায়নি—তা পুরো দলের সম্পদ, সমষ্টিগত সম্পদ। দলের সকলেই এ-সম্পদের সমান অংশীদার। অতএব, এ-সমাজে একটি প্রধানতম কাজ হলো ধনবণ্টন। সে-বণ্টন সমবণ্টন হতে হবে, কেননা সকলেই এই ধনে সমান অংশীদার। একটি ট্রাইব যে-সম্পদ সংগ্রহ করবে তা ট্রাইবের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্লানের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করার প্রয়োজন, একটি ক্লান যে-সম্পদ সংগ্রহ করবে তা ক্লানের অন্তর্গত সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা প্রয়োজন। বণ্টনের বা বিভাগের দায়িত্ব ট্রাইব বা ক্লানের প্রধানদের উপরে এবং সমবণ্টনের কৌশল হিসেবে অক্ষ বা পাশার ছক ব্যবহৃত হয় (casting the lot): যার যা দান পড়লো সে তাই পাবে—অতএব কারুর পক্ষেই অনুযোগ-এর সুযোগ নেই। মনে রাখা দরকার, 'দান পড়া' অর্থে 'দান' শব্দটির সঙ্গে দয়ার দানের সম্পর্ক নেই—প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজ ভেঙে যাবায় পরই দান-পড়ার দান দয়ার-দান অর্থে পর্যবসিত হয়েছে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। দান-পড়ার দান হলো ভাগ্যের কথা, বিধাতার ব্যাপার—যদিও এই বিধাতা শব্দের আদি-তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনা এখনো বাকি আছে। এবং এই দিক থেকে ভাগ ও ভাগ্য শব্দের মধ্যেও সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়।

এই হলো আদিম সমাজের ধনবণ্টন ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার সাহায্যেই সে-সমাজের অর্থনৈতিক সাম্য বজায় থাকে। আদিম সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও তাই *primitive communism* বা আদিম সাম্যব্যবস্থা বলা হয়। এইদিক থেকেই অধ্যাপক জর্জ টমসন প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের *moira*, *lachos* ও *kleros* শব্দের উপর নূতন আলোকপাত করেছেন। আমরা তাঁরই গবেষণা অনুসরণ করে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের ভগ এবং অংশকে বোঝাবার চেষ্টা করবো। বৈদিক সাহিত্যের আদিম সমবণ্টন পদ্ধতির স্মারকগুলিকে বোঝবার সুবিধে হতে পারে এই আশায় প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক জর্জ টমসনের[৮৮] মন্তব্য কিছুটা উদ্ধৃত করা যায়:

The basic meaning of the word *moira* is a share or portion. As John the Deacon remarked in his commentary on Hesoid, the Moirai (goddesses of Fate) are "dispensations." or "divisions". With *moira* is associated another word, *lachos*, a portion given or received by the process of casting lots. One of the Moirai bore the name of Lachesis, the goddess of Allotment. In this sense *lachos* is synonymous with *kleros*, which, commonly used of a lot or holding of land, originally denoted a piece of wood used for casting lots......The land was to be distributed by lot among the tribes, and the territory of each tribe was to be subdivided by lot among the "Families" or clans. In the seventh Olympian, Pindar relates how the island of Rhodes was divided into three *moirai* by the sons of Helios. That these three *moirai* correspond to the three immigrant tribes is clear from the Homeric version of the same tradition.. ... Booty was distributed in the same way. Just as the island of Rhodes, allotted to Helios, is described by Pindar as his *lachos* or *geras*, his lot or his privilege, so the same terms—*moira* or *lachos*, *geras* or *time*—are applied to the share of the spoils allotted to each warrior. The process of distribution is called as before a *dasmos* ; and just as the king received a *temenos* which was "set apart" for him, so in the distribution of booty he received a "chosen gift" reserved from the general allotment. And here, too, the ultimate authority seems to have been vested in the people......

Plutarch goes on to remark that the equality of the common meal was destroyed in course of time by the growth of luxury (he should, rather, have said the growth of private property) but persisted in the public distribution of meat at state sacrifices...It may therefore be concluded that in its application to food, booty and land the idea of Moira reflects the collective distribution of wealth through three successive stages in the evolution of tribal society. Oldest of all was the distribution of food, which goes back to the hunting period. Next came the distribution of chattels and inanimate movables acquired by warfare, which was a development of hunting ; and, last, the division of land for purposes of agriculture.

The use of the lot was, of course, a guarantee of equality. The goods were divided as equally as possible, and then the portions were distributed by a process which, since it lay outside human control, was impartial......

প্রাচীন গ্রীক-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে অধ্যাপক জর্জ টমসনের এই মন্তব্যগুলি মনে রেখে এবার আমরা ঋগ্বেদের ধনবণ্টন-সংক্রান্ত তথ্যগুলি বোঝবার চেষ্টা করবো।

প্রথমত দেখা যাক, ঋগ্বেদে ধন-বিভাগের প্রসঙ্গ কতোখানি মৌলিক।

রায়ো বন্তারো বৃহতঃ স্যামাস্মে অস্তু ভগ ইন্দ্র প্রজাবান ॥
অর্থাৎ
—হে ইন্দ্র, আমরা ধনের বণ্টনকর্তা হইয়া মহান হইব। তুমি আমাদিগকে প্রজাযুক্ত ভগ দাও ॥ ঋগ্বেদ : ৩. ৩০. ১৮ ॥

এখানে বণ্টনকর্তা বলতে "আমরাই"; ইন্দ্র প্রজাযুক্ত যে-ভগ দেবেন তা আমরা বণ্টন করে নেবো। তাই ভগ বলতে এখানে হয়তো ধন বা ঐশ্বর্যই। কিন্তু অন্যত্র দেখা যায় বৈদিক দেবতারাই বিভাগকর্তা বা বণ্টনকর্তা।

যো গা উদাজৎস দিবে বি চাভজন্মহীব রীতিঃ শবসাসরৎপৃথক্ ॥
অর্থাৎ
—যিনি (ব্রহ্মণস্পতি) গরুগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই নিজবলের দ্বারা মহাস্রোতের ন্যায় সেই গরুগুলিকে দেবতাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন ॥ ঋগ্বেদ : ২. ২৪. ১৪ ॥

আ নঃ স্পার্হে ভজনতা বসব্যে যদীং সুজাতং বৃষণো বো অস্তি।
অর্থাৎ,
—আমাদের অর্জিত ধনসমূহে আমাদিগকে ভাগধেয় কর, যেহেতু তোমরা (মরুৎগণ) সুজাত এবং কামবর্ষী ॥ ঋগ্বেদ: ৭. ৫৬. ২১ ॥

বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরূর্মা উপাক আ সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি ॥
অর্থাৎ,
—হে চিত্রভানু, তুমি যজমানদিগকে সদ্য (ধন) দান কর, তুমি যেন বিভাগকর্তা—সিন্ধু যেমন তাহার সমীপস্থ তরঙ্গগুলিকে বিভাগ করে, তদ্রূপ ॥ ঋগ্বেদ : ১.২৭.৬ ॥

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ সবিতারং নৃচক্ষসম্ ॥
অর্থাৎ,

—বৈচিত্র্যযুক্ত ধনসমূহের বিভক্তা, মনুষ্যের প্রকাশকারী সবিতাকে আহ্বান করি।
ঋগ্বেদ : ১.২২.৭. ॥

যদদ্য ভাগং বিভজাসি নৃভ্য উষো দেবি মর্ত্যত্রা সুজাতে ॥
অর্থাৎ,
—হে সুজাতা দেবি উষা, মনুষ্যের রক্ষাকর্ত্রি, তুমি আজ মনুষ্যদিগের মধ্যে (ধন) ভাগ করিতে যাইতেছ ॥ ঋগ্বেদ : ১.১২৩.৩ ॥

যুবামন্দ্রাগ্নী বসুনো বিভাগে তবস্তমা শুশ্রব বৃত্রহত্যে ॥
অর্থাৎ,
—ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা দুইজন বৃত্রের অনলের জন্য অতিশয় বলপ্রকাশ করিয়াছিলে এবং ধন বিভাগ করিয়াছিলে ॥ ঋগ্বেদ : ১.১০৯.৫ ॥

য আদৃত্যা পরিপন্থীব শূরোঽযজ্বনো বিভজন্নেতি বেদঃ ॥
অর্থাৎ,
—যিনি সমাদরে পরিপন্থী যজ্ঞবিহীন ব্যক্তিদিগের ধন অপহরণপূর্বক ভাগ করিতে করিতে আসিতেছেন, সেই ইন্দ্র ॥ ঋগ্বেদ : ১.১০৩.৬ ॥
(এখানে war booty-র বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিভাগ-বর্ণন হচ্ছে; পরে আমরা এ বিষয়ে আরো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করবো। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিভাগ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

প্রজাভ্যঃ পুষ্টিং বিভজন্ত আসতে রয়িমিব পৃষ্ঠং প্রভবন্তমায়তে ॥
অর্থাৎ,
—প্রজাদিগের মধ্যে ধন বিভক্ত করিয়া দিয়া (গৃহস্থগণ) গৃহে বাস করেন, যেমন গৃহাগত অতিথিগণকে ধন বিভক্ত করিয়া দেন, সেইরূপ ॥ ঋগ্বেদ : ২.১৩.৪ ॥

ক্ষপাং বস্তা জনিতা সূর্যস্য বিভক্তা ভাগং ধিষণেব বাজম্ ॥
অর্থাৎ,
—যিনি (ইন্দ্র) রাত্রির আচ্ছাদয়িতা সূর্যের জনক এবং ঐশ্বর্যশালীর ন্যায় অন্নের ভাগগুলি বিভক্ত করেন ॥ ঋগ্বেদ : ৩.৪৯.৪ ॥

দেবং বো অদ্য সবিতারমেষে ভগং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ ॥
অর্থাৎ,
—আজ সেই দেবতা সবিতার নিকট গমন করি, যিনি ভগ, রত্ন এবং আয়ুকে বিভাগ করিতে করিতে আসেন ॥ ঋগ্বেদ : ৫.৪৯.১ ॥
(এর পরের ঋকটিতেও সবিতার বর্ণনাতেই বলা হয়েছে—জ্যেষ্ঠং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ।)

ভগো বিভক্তা শবসাবসা গমদ্রুব্যচা অদিতিঃ শ্রোতু মে হবম্ ॥
অর্থাৎ,
—ভগ, অন্ন এবং রক্ষণ বিভক্ত করিয়া আগমন করুন এবং সর্বব্যাপী অদিতি আমার আহ্বান শুনুন ॥ ঋগ্বেদ : ৫.৪৬.৬ ॥

সত্রা মদাসস্তব বিশ্বজন্যাঃ সত্রা রায়োঽধ যে পার্থিবাসঃ।
সত্রা বাজানামভবো বিভক্তা যদ্দেবেষু ধারয়থা অসুর্যম্ ॥
অর্থাৎ,
—(হে ইন্দ্র), তোমার পানজনিত শক্তি বিশ্বহিতের জন্যই; অধোদেশে যে ধনসমূহ আছে তাহাও (বিশ্বহিতের জন্যই)। তুমি প্রকৃতই অন্ন এবং অন্নের বিভক্তা হইয়াছিলে এবং এইজন্যই তুমি দেবগণের মধ্যে বলবত্তম ॥ ঋগ্বেদ : ৬.৩৬.১ ॥

…ইন্দ্রঃ একো বিভক্তা তরণির্মঘানাম্।
অর্থাৎ,
—ইন্দ্র ত্রাণকর্তা এবং ধনসমূহের একমাত্র বিভক্তা ॥ ঋগ্বেদ : ৭.২৬.৪ ॥

…মহো অর্ভস্য বস্বনো বিভাগে।
উভা তে পূর্ণা বস্বনা গভস্তী ॥
অর্থাৎ,
—মহান ও অল্প (উভয়) ধনের বিভাগকালে তোমার (ইন্দ্রের) উভয় হস্ত ধনের দ্বারা পূর্ণ ছিল ॥ ঋগ্বেদ : ৭.৩৭.৩ ॥

যদদ্য দেবঃ সবিতা সুবাতি স্যামাস্য রত্নিনো বিভাগে ॥
অর্থাৎ,
—আজ যে দেব সবিতা আমাদিগকে দিতেছেন, আমরা সেই রত্নবানের বিভাগ কার্যে উপস্থিত থাকিব ॥ ঋগ্বেদ: ৭.৪০.১ ॥

ত্বং নো মিত্রো বরুণো ন মায়ী পিত্বো ন দস্ম দয়সে বিভক্তা।
অর্থাৎ,
—মিত্র ও বরুণের ন্যায় মায়াযুক্ত হইয়া হে দর্শনীয় (ইন্দ্র), তুমি আমাদিগের অন্নের বিভক্তা ও দাতা হও ॥ ঋগ্বেদ : ১০.১৪৭.৫ ॥

তাহলে ঋগ্বেদের কবিতা ও গানগুলি প্রধানতই কামনার কবিতা ও গান। সে-কামনা প্রধানতই পার্থিব সম্পদের কামনা। এই পার্থিব সম্পদ একার জন্য নয়, সকলের জন্য : "আমার" জন্য চাওয়া নয়, "আমাদের" জন্য চাওয়া। সকলের জন্য বা সাধারণের জন্য এই সম্পদ সকলের মধ্যে বিভাগ করে দেবার কামনাও জানানো হয়েছে। এইভাবে সকলের মধ্যে অর্জিত ধন বিভাগ করবার ব্যবস্থাও প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজেরই বৈশিষ্ট্য।

নিম্নোক্ত ঋক্‌টি অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য; সায়নভাষ্য থেকে অনুমান হয় এর মধ্যে কোনো আদিম জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠানের ইংগিত থাকা সম্ভব। তবুও আদিম সাম্যাবস্থার সাক্ষ্য হিসেবে ঋক্‌টি মূল্যবান বিবেচিত হতে পারে; কেননা এর মধ্যে সমবন্টনের একটা ইংগিত পাওয়াও হয়তো অসম্ভব নয়।

> যুযুৎসতঃ সবয়সা তদিদ্বপুঃ সমানমর্থং বিতরিত্রতা মিথঃ।
> আদীং ভগো ন হব্যঃ সমস্মদা বোল্হুর্ন রশ্মীন্ত্‌ সমযংস্ত সারথিঃ॥
> অর্থাৎ,
> —পরস্পর সমান অর্থ বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সমানবয়স্ক (ব্যক্তিগণ) তাঁহার (অগ্নির) শরীরকে যেমন স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করে, ভগ আমাদিগের হব্যকে তদ্রূপ করেন, সারথি যেরূপ রশ্মিদ্বারা রথকে সংযত করে॥ ঋগ্বেদ: ১. ১৪৪. ৩॥

নিম্নোক্ত ঋক্‌টিতে ভগ শব্দ অংশ বা *share* হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঋক্‌টির প্রতি বৈদিক কবি নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করতে চেয়েছিলেন, কেননা ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে এই ঋক্‌টিই সাতটি সূক্তে পাওয়া যায়:

> নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
> শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥
> অর্থাৎ,
> —হে ইন্দ্র, স্তোতাদিগের প্রতি দেয় দক্ষিণা তুমি দোহনপূর্বক আমাদের দাও। স্তোতৃদের শিক্ষা দাও, আমাদের ভগ পূর্ণ কর, আমরা বিশেষভাবে এই সভায় বীরপুত্রের জন্য তোমাকে অনুরোধ করি॥ ২. ১১. ২১: ২. ১৫. ১০: ২. ১৬. ৯: ২. ১৭. ৯: ২. ১৮. ৯: ২. ১৯. ৯: ২. ২০. ৯॥

এবার অংশের আলোচনা করা যাক। অংশ ও তৎজাত শব্দ ঋগ্বেদে এগারো বার উল্লিখিত হয়েছে। অংশ মানে যে ভাগ বা *share* এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহ নেই; কিন্তু অংশ শব্দ প্রসঙ্গে একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। অংশ শব্দের ব্যবহারের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধের প্রসঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। তাই অংশ শব্দ বিশেষ করে *war booty*-র *share* বা যুদ্ধে অর্জিত ধনসম্পদের ভাগ বোঝাতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে অনুমান করবার অবকাশ থাকে যে, অন্যান্য প্রাচীন সমাজের মতোই বৈদিক সমাজেও যুদ্ধে-জেতা ধনসম্পদের উপর কারুর একার অধিকার ছিলো না; তাতেও সকলের অংশ বা ভাগ ছিলো।

বয়ং জয়েম ত্বয়া যুজা বৃতমস্মাকমংশমুদবা ভরেভরে।
অর্থাৎ,
—(হে ইন্দ্র), আমরা তোমার সহিত যুক্ত হইয়া শত্রুকে জয় করি। তুমি আমাদের অংশ রক্ষা কর॥ ঋগ্বেদ : ১. ১০২. ৪ ॥

যাভির্ভরে কারমংশায় জিন্বথ…
অর্থাৎ,
—যাঁহাদের (অশ্বিনীদ্বয়ের) সহায়তায় তুমি (অগ্নি) যুদ্ধে ধ্বনি করিয়া আমাদের অংশ জয় কর॥ ঋগ্বেদ : ১. ১১২. ১ ॥

আ নস্তুজং রয়িং ভরাংশং ন প্রতিজানতে।
বৃক্ষং পক্বং ফলমঙ্কীব ধূনুহীন্দ্র সংপারণং বসু॥
অর্থাৎ,
—হে ইন্দ্র, আমাদের শত্রুদের ধনের অংশ আমাদিগকে দিতে প্রতিজ্ঞা কর ; যেমন অঙ্কুশহস্ত ব্যক্তি বৃক্ষ আন্দোলিত করিয়া পক্ব ফল (আহরণ করে) সেইরূপ আমাদের ধন আহরণ কর॥ ঋগ্বেদ : ৩. ৪৫. ৪ ॥

দেবো ভগঃ সবিতা রায়ো অংশ ইন্দ্রো বৃত্রস্য সংজিতো ধনানাম্।
ঋভুক্ষা বাজ উত বা পুরন্ধিরবন্তু নো অমৃতাসস্তুরাসঃ॥
অর্থাৎ,
—ভগ, সবিতা, বৃত্রের বিজেতা ইন্দ্র, জিত ধনের অংশ আমাদিগকে দিন। সেই মৃত্যুহীন (দেবগণ) ত্বরান্বিত হইয়া, বহুভাবে আমাদিগকে এবং আমাদের ধন ও অন্নকে রক্ষা করুন॥ ঋগ্বেদ : ৫. ৪২. ৫ ॥

প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্য বিচার করে অধ্যাপক জর্জ টমসন যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা মনে রাখলে ঋগ্বেদের এই বিভাগ, ভগ, অংশ প্রভৃতির সাক্ষ্যগুলিকে বোঝবার সুবিধে হতে পারে। প্রধানত তিন রকম প্রসঙ্গে তিনি *moira*-র উল্লেখ লক্ষ্য করেছেন। এক, অন্নবিভাগ। দুই যুদ্ধের অর্জিত ধনের বিভাগ। তিন, বিভিন্ন ট্রাইব ও ক্লানের মধ্যে চাষের জমি বিভাগ। এবং তিনি বলছেন, এ-থেকে ট্রাইব্যাল-সমাজের তিনটি পর্যায়ের সমবণ্টন-ব্যবস্থা অনুমান করা যায়। প্রাচীনতম বণ্টন-ব্যবস্থা বলতে অন্ন-বিভাগ, শিকারজীবী পর্যায় থেকেই এর শুরু। তারপর শিকার থেকে (পশুপালন এবং প্রধানতই পশুলাভের কামনায়) যুদ্ধ বিগ্রহের পর্যায়ে উপনীত হবার সময় থেকে, বণ্টন বলতে প্রধানতই যুদ্ধে জিত গোসম্পদ প্রভৃতিরই বণ্টন। সর্বশেষে, কৃষিজীবী পর্যায়ে পৌঁছে চাষের জমি বিভাগ বা বণ্টন করবার ব্যবস্থা।

অধ্যাপক জর্জ টম্সনের এই সিদ্ধান্তকে প্রাচীন সমাজের সম-বণ্টন

সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্য হিসেবে গ্রহণ করে আমরা ঋগ্বেদের সাক্ষ্যগুলি বোঝবার চেষ্টা করবো।

অন্ন-বিভাগের কথা ঋগ্বেদে বিরল নয়; আমরা ইতিপূর্বে সে-বিষয়ে কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছি। এবং এমনকি আদিম শিকারজীবী পর্যায়ের বণ্টন ব্যবস্থার কথাও যে বৈদিক ঋষিদের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি তারই একটি চিত্তাকর্ষক সাক্ষ্য হিসেবে আমরা বৈদিক সাহিত্যে শ্বঘ্নিন শব্দের উল্লেখ পাই কিনা সে-বিষয়ে ভেবে দেখবার অবকাশ আছে। শ্বঘ্নিন বলতে একদিকে যেমন শিকারী বোঝায় আবার অপরদিকে তেমনি দ্যূতকারকেও বোঝায়[৩০]। শিকারের সঙ্গে পাশার এই সম্পর্ক শিকারজীবী পর্যায়ের অক্ষের সাহায্যে *(casting the lot)* অন্ন-বণ্টনের আদিম কৌশলটির ইতিহাসের ইংগিত দেয় কিনা, সে-বিষয়ে বেদবিদেরা আশা করি চিন্তা করবেন।

যুদ্ধে-জিত ধন-বণ্টনের কথাও ঋগ্বেদে বিরল নয়; আমরা অংশ শব্দটির সূত্রে বিশেষ করে এই ইংগিতটিরই সন্ধান করেছি।

বৈদিক আর্যরা প্রধানতই পশুপালক ছিলেন; তাই কৃষির জন্য জমি-বিভাগের কথা বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ততো বেশি করে বা ততো স্পষ্টভাবে পাবার কথা নয়। তবুও, আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো ঋগ্বেদের অর্বাচীনতম অংশে—দশম মণ্ডলে—কৃষির সঙ্গে অক্ষের সম্পর্কের ইংগিত পাওয়া যায় এবং প্রাচীন সমাজের সমবণ্টন-কৌশল হিসেবে অক্ষের ব্যবহারকে যদি আমরা সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্য হিসেবে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হই, তাহলে কৃষিপ্রসঙ্গে এই অক্ষের উল্লেখের পিছনে আমরা হয়তো ভূমি-বণ্টন-ব্যবস্থার ইংগিত অনুসন্ধান করতে পারি।

কিন্তু এ-আলোচনা তোলবার আগে ঋগ্বেদের অক্ষ সংক্রান্ত তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন।

প্রাচীন সমাজে সম-বণ্টনের কৌশল হিসেবে অক্ষের ব্যবহার চোখে পড়ে। —যার যা দান পড়বে সে তাই পাবে। অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[৩১] দেখাচ্ছেন, আদিম সাম্যসমাজের স্মারক হিসেবে এই কৌশলটির পরিচয়, এমনকি গ্রীসে নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠবার পরেও গণতান্ত্রিক শাসন-নীতির অঙ্গ হিসেবে বহুলাংশেই বর্তমান ছিলো। বৈদিক সাহিত্যেও অক্ষ-প্রসঙ্গের অভাব নেই, যদিও আধুনিক বিদ্বানেরা[৩২] একে জুয়াখেলা অর্থেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেই অর্থই একমাত্র অর্থ কিনা তা ভেবে দেখবার অবকাশ আছে।

দশম মণ্ডলের অক্ষসূক্তে (ঋগ্বেদ : ১০. ৩৪) নিশ্চয়ই জুয়াখেলার বর্ণনা রয়েছে এবং জুয়া অর্থে অক্ষের নিন্দাও রয়েছে। "যে-ব্যক্তি পাশা ক্রীড়া করে

তাহার শত্রু তাহার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করে, যদি কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, দিবার লোক কেহ নাই। যেরূপ বৃদ্ধ ঘোটককে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করে না, সেইরূপ দ্যূতকার কাহারও নিকট সমাদর পায় না"—(ঋগ্বেদ : ১০. ৩৪. ৩)—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এবং অতএব, "অক্ষৈঃ মা দীব্যঃ কৃষিম্ ইৎ কৃষস্ব" (১০. ৩৪. ১৩),—অর্থাৎ অক্ষের সাহায্যে কখনো জুয়া খেলো না, বরং কৃষিকাজ করো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ঋগ্বেদের এই মণ্ডলই সবচেয়ে অর্বাচীন এবং আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, ঋগ্বেদের এই মণ্ডলটিতেই প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজ ভেঙে যাবার পরিচয় প্রকট হয়েছে। তাই দশম মণ্ডলে অক্ষকে যে-ভাবে জুয়াখেলায় প্রযুক্ত হতে দেখা যায় তা' বৈদিক সাহিত্যে অক্ষের আদি-তাৎপর্য না হতেও পারে। তাছাড়া দ্রষ্টব্য হলো, জুয়াখেলার অর্থ ছাড়াও এই অক্ষসূক্তেই অক্ষের অন্য প্রয়োগ সংক্রান্ত কিছু কিছু ইংগিত আছে। অক্ষসূক্তের ব্যাখ্যার ভূমিকায় সায়ন সর্বানুক্রমণী থেকে উদ্ধৃত করছেন, প্রাবেপাঃ সলূনা মৌজবান্বাক্ষোঽক্ষ কৃষিপ্রশংসা চাক্ষকিতবনিন্দা চ। অর্থাৎ, কিতব বা জুয়া অর্থে অক্ষের নিন্দা এবং অক্ষ-কৃষি-প্রশংসাই এই অক্ষসূক্তের মূল প্রতিপাদ্য। এ-কথার মানে যাই হোক না কেন অন্তত এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে, জুয়াখেলার অর্থ ছাড়াও বৈদিক মানুষদের কাছে অক্ষের একটা অন্য ব্যবহার জানা ছিলো। এবং অক্ষের অন্য কোনো ব্যবহারের কথা অনুমান না করলে নিম্নোক্ত সাক্ষ্যগুলিকেও নেহাতই বৈদিক যুগের জুয়াড়িদের মাত্রারিক্ত উচ্ছৃঙ্খলতা বলেই গ্রহণ করতে হয়। আমাদের যুক্তি হলো, বৈদিক সাহিত্য প্রাচীন বলেই আধুনিক ধ্যানধারণা দিয়ে বা আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। আধুনিক লাম্পট্য-ব্যবহারের অনুরূপ হিসেবে বৈদিক বামাচারকে (পৃ. ১০২-১১২) বা আধুনিক শুঁড়িখানার আলোয় বৈদিক সুরাপানকে[৩৩] বোঝা যায় না। তেমনিই, আধুনিক জুয়াড়ির উপমান হিসেবে বৈদিক মানুষদের অক্ষ দেবতা এবং দ্যূতকার দেবতাকে (ঋগ্বেদ : ১০.৩৪) চেনবার চেষ্টা করা ভুল হবে। অর্থাৎ, কালক্রমে এই অক্ষক্রীড়াই যদিও জুয়াখেলায় পরিণত হয়েছিলো, তবুও বৈদিক সাহিত্যে অক্ষের প্রতি যে-সম্মান ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তার পিছনে অক্ষের প্রাচীন মহিমার স্মারক থাকতে পারে।

অথর্ববেদে[৩৪] পাশার দান ফেলার সঙ্গে বরুণের নিয়ম প্রবর্তনের তুলনা করা হয়েছে : দ্যূতকার যে-ভাবে অক্ষের দান ফেলেন দেবতা বরুণও সেইভাবেই নিয়মের প্রবর্তক হন। এর মধ্যে নিশ্চয়ই অংশ-বণ্টনের কথা নেই; কিন্তু পাশার দান পড়ার সঙ্গে অমোঘ নিয়মের—ঋতের—সম্পর্কও তুচ্ছ নয়।

তারই পরিচয় পাওয়া যায় শতপথব্রাহ্মণের রাজসূয়-যজ্ঞের[৩৫] বর্ণনায়,

যদিও বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য উল্লেখের মতো এই উল্লেখটিতেও পাশা বা অক্ষের ব্যবহার অনেকাংশেই দুর্বোধ্য। কিন্তু এটুকু বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শতপথব্রাহ্মণের এই বর্ণনায় রাজা ন্যায় ও নিয়মের ধারক হবার প্রতিজ্ঞা প্রসঙ্গেই পাশার ছকগুলি হাতে গ্রহণ করেন। এর থেকে কি অনুমান করা যায় না যে, এখানেও অক্ষ জুয়ার আয়োজনে নয়, তার বদলে ওই অক্ষ ন্যায় ও নিয়মের সঙ্গে জড়িত ?

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অক্ষসূক্তেও অক্ষগুলি হাতে ধারণ করে ঋতের বা সত্য ও নিয়মের আনুগত্য অঙ্গীকার করবার ইংগিত রয়েছে; এবং এই ইংগিতকে শুধুমাত্র পাশাখেলার ব্যাপারে নিয়মনিষ্ঠ হবার অঙ্গীকার বলে কল্পনা করায় বাধা হলো, অক্ষকেই[৩৬] এখানে মহৎ গণের সেনানী এবং ব্রাতের রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে :

যো বঃ সেনানীর্মহতো গণস্য
রাজা ব্রাতস্য প্রথমো বভূব
তস্মৈ কৃণোমি ন ধনা রুণধ্মি
দশাহং প্রাচীস্তদৃতং বদামি ॥
অর্থাৎ,
—যিনি তোমাদিগের মহৎ গণের দলপতি (সেনানী) এবং ব্রাতের শ্রেষ্ঠ রাজা হইলেন, তাঁহাকেই আমি বলিতেছি যে, আমি ধন রোধ করিতেছি না, দশ অঙ্গুলি বিস্তৃত করিয়া ঋত বলিতেছি। ॥ ঋগ্বেদ : ১০.৩৪.১২ ॥

শেষ অংশে ধন রোধ না করবার অঙ্গীকারটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোন্যাল[৩৭] বলছেন, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেই ধনদায়ী অক্ষের দানের সঙ্গে দেবতাদের তুলনা করা হয়েছে।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৪.১.৪) যা ভালো তার সবকিছু রৈক্কর ভাগে পড়বার কথা পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গেই পাওয়া যায় অক্ষের উল্লেখ; যদিও অবশ্যই ছান্দোগ্যর এই অংশটির প্রকৃত তাৎপর্য অনেকাংশেই দুর্বোধ্য। তেমনিই ঋগ্বেদের উপরোক্ত উক্তিগুলির দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও অক্ষের সঙ্গেই অংশ-বণ্টনের ও ধনপ্রাপ্তির একটা অস্পষ্ট ইংগিত খুঁজে পাওয়া যায় কি না তা বেদবিদেরা বিচার করে দেখতে পারেন।

অক্ষ-প্রসঙ্গেই আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। অন্যান্য প্রাচীন সমাজের মতোই বৈদিক সমাজেও সভা-সমিতির স্থান যে কী রকম পরম গুরুত্বপূর্ণ, সে-বিষয়ে একটু পরেই আমরা আলোচনা তুলবো। আপাতত আমাদের মন্তব্য শুধু এই যে, এই কথাটি মনে রাখলে বৈদিক মানুষের জীবনে অক্ষের গুরুত্বকেও নেহাত জুয়াখেলা মনে করবার অবকাশ থাকে না। কেননা

অক্ষরাজকে সভাস্থাণু (*pillar of the assembly*) বলা হয়েছে এবং এই সভার একটি অন্যতম কাজ বলতে যে পাশার দান ফেলাই ছিলো—সেবিষয়ে আধুনিক বেদবিদেরা নিঃসন্দেহ। কেবল, প্রাচীন সমাজের শাসন-ব্যবস্থায় পাশার দান-ফেলাসংক্রান্ত সাধারণভাবে-জানতে পারা তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়টিকে বোঝবার চেষ্টা করেননি বলেই তাঁরা এ-বিষয়ে অস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছেন :

> Sabha is the name of the assembly of the Vedic Indians as well as the hall where they met in assembly...The hall was clearly used for dicing, presumably when the assembly was not transacting public business: a dicer is called *Sabha sthanu,* pillar of the assembly, doubtless because of his constant presence there.[৩৮]

বৈদিক মানুষদের সভায় দ্যূতকারের যে-এতোখানি গুরুত্ব তার কারণ কি এই যে, ওই সভায় তিনিই ছিলেন ধনের বিভাগকর্তা এবং অক্ষই ছিলো সে-বিভাগের কৌশল? এই প্রশ্নটি অন্তত অপ্রাসঙ্গিক নয়; কেননা ঋগ্বেদে সমিতি এবং ধনবিভাগ বা অংশ-বণ্টনের উল্লেখ একত্রে পাওয়া যায়।

> যদগ্ন এষা সমিতির্ভবাতি দেবী দেবেষু যজতা যজত্র।
> রত্না চ যদ্‌বিভজাসি স্বধাবো ভাগং নো অত্র বসুমন্তং বীতাৎ॥
> অর্থাৎ,
> —হে অগ্নি, যখন এই সমিতিতে আসিয়া যজনীয় দেবতাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীপ্তিমান হও ; এবং যে রত্নসমূহ ও অন্নসমূহ তুমি বিভক্ত কর তাহার সমৃদ্ধ ভাগ এইস্থানে (সমিতিতে) আমাদিগকে দাও॥ ঋগ্বেদ : ১০.১১.৮॥

> ত্বমগ্নে রাজা বরুণো ধৃতব্রতস্ত্বং মিত্রো ভবসি দস্ম ঈড্যঃ।
> ত্বমর্যমা সৎপতির্যস্য সংভুজং ত্বমংশো বিদথে দেব ভাজয়ুঃ॥
> অর্থাৎ,
> —হে অগ্নি, যেহেতু তুমি ব্রতধারী, সেইহেতু তুমি রাজা বরুণের তুল্য ; শত্রুর অভিভবকারী এবং স্তুতিযোগ্য বলিয়াই তুমি মিত্র-(দেবতা)র তুল্য ; তুমি সাধুগণের পালক বলিয়াই অর্যমার তুল্য ; এবং তাহার ধনের অংশ তুমি এই বিদথে (সভায়) দান করিয়া থাক॥ ঋগ্বেদ : ২. ১. ৪॥

এমনকি, দেবতাগণও এই সভাতেই তাঁদের ন্যায্য ভাগ পেয়ে থাকেন।

অগ্নে যহ্বস্য তব ভাগধেয়ং ন প্র মিনন্তি বিদথেষু ধীরাঃ ॥
অর্থাৎ,
—হে অগ্নি, ধীরগণ সভাগুলিতে (বিদথগুলিতে) তোমার মহান ভাগটিকে হিংসা করে না ॥ ঋগ্বেদ : ৩. ২৮. ৪ ॥

অতএব, ধনবণ্টন-প্রসঙ্গ থেকে আমরা সভা-সমিতির আলোচনায় উপনীত হই।

সভা ও সমিতি

প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজের শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে পারা তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হলে, বৈদিক সাহিত্যে সভা ও সমিতির গুরুত্ব বুঝতে পারা যাবে। অতএব আমরা এখানে এ-বিষয়ে মর্গানের গবেষণা থেকেই শুরু করবো।

মর্গান দেখাচ্ছেন, ট্রাইব্যাল সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতোই রাষ্ট্রব্যবস্থারও পরিচয় নেই। তাহলে সে-সমাজের শাসন কাজ ঠিক কী ভাবে চলে?

ট্রাইব্যাল-সংগঠনের মূলে হলো ক্লান। এই ক্লানের শাসন-পরিচালন পদ্ধতি থেকেই আমাদের আলোচনা শুরু করতে হবে।

ক্লানের শাসন-পরিচালন ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা ক্লানের সভার— মর্গানের পরিভাষায় তার নাম *council*। সভার সভ্য বলতে ক্লানের অন্তর্গত সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীই।

এই সভাই ক্লানের প্রধানদের নির্বাচন করবে—অর্থাৎ ক্লানের অন্তর্গত সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীই মত প্রকাশ করে প্রধানদের নির্বাচন করবে।

নির্বাচিত হবার পর সর্দার ও মোড়ল ক্লানের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করলে তাদের নেতৃত্বচ্যুত করে নতুন নির্বাচন করা হবে। মর্গান[৩৯] তাই বলছেন, এদের পদমর্যাদা নামেমাত্র আজীবনের জন্য; পদচ্যুত হবার এই সম্ভাবনার দরুন কার্যত সে-পদ সংব্যবহারকালীন মাত্র।

সামগ্রিকভাবে ট্রাইবের শাসন-পরিচালন সংক্রান্ত চূড়ান্ত দায়িত্ব ট্রাইবের সমিতির উপর। বিভিন্ন ক্লান-নির্বাচিত মোড়ল ও সর্দার এই সমিতির সভ্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বিভিন্ন ক্লানের সাধারণ মানুষ সমিতির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবার সুযোগ পাবে না। কেননা, সমিতির বৈঠক কখন বসবে তা আগে থাকতে সকলকে জানানো থাকে। দ্বিতীয়ত, এ-বৈঠক প্রকাশ্যে বসে। তৃতীয়ত, সমিতির বৈঠকে যে-কোনো ক্লানের যে-কোনো

সাধারণ ব্যক্তি বক্তৃতা দিতে পারে এবং সমিতির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে।

কন্‌ফেডারেসির স্তরেও একটি উচ্চতম সমিতি আছে। ট্রাইবের শাসন-পরিচালন ব্যাপারে যে-রকম ট্রাইবের সমিতির চূড়ান্ত ক্ষমতা তেমনি সামগ্রিক-ভাবে কন্‌ফেডারেসি-স্তরে শাসন-পরিচালনের চূড়ান্ত দায়িত্ব তার সমিতির উপর।

তাহলে ট্রাইব্যাল সংগঠনে ক্লান থেকে শুরু করে কন্‌ফেডারেসি পর্যন্ত শাসন-পরিচালনের চূড়ান্ত দায়িত্ব নির্ভর করছে প্রকাশ্য এবং একান্ত গণতান্ত্রিক সভা-সমিতির উপর: ক্লান-স্তরে সভা, ট্রাইব-স্তরে সমিতি, কন্‌ফেডারেসি স্তরে সমিতি। মর্গান[৪০] তাই বলছেন, *the council was the great feature of ancient society,*—এই সভাসমিতিই হলো প্রাচীন সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বৈদিক সাহিত্য প্রাচীন বলেই প্রাচীন-সমাজের এই বৈশিষ্ট্য সে-সাহিত্যেও প্রতিফলিত। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে আমরা নানান শব্দ পাই: সভা, সমিতি, বিদথ ইত্যাদি। বিদথ শব্দ প্রসঙ্গে সায়ন এক জায়গায় বলছেন, "বেদনার্হা বিবদমানয়োঃ" অর্থাৎ যে-স্থান বিবাদরত ব্যক্তিদিগের আবেদনের উপযোগী (ঋগ্বেদ ১. ১৬৭. ৩)। আধুনিক বিদ্বানেরা এগুলির তাৎপর্য নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন; কিন্তু প্রাচীন-সমাজ সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্যের আলোয় ঋগ্বেদের সভা, সমিতি ও বিদথকে বোঝবার চেষ্টা করেননি। ফলে ভারততত্ত্ববিদেরা এ-বিষয়ে নানা রকম অস্পষ্ট এবং পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সিদ্ধান্তগুলির তালিকার জন্য অধ্যাপক কীথ্ ও ম্যাক্‌ডোনাল-এর *Vedic Index*[৪১] দ্রষ্টব্য।

ট্রাইব্যাল-সমাজ সংক্রান্ত সাধারণভাবে-জানতে-পারা তথ্যকে অগ্রাহ্য করবার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করবো। কীথ্ ও অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনাল বলছেন, *Samiti denotes an "assembly" of the Vedic tribes*[৪২]—অর্থাৎ, সমিতি বলতে বৈদিক ট্রাইবদের এ্যাসেমব্লি বোঝাতো। যদি তাই হয় তাহলে ঋগ্বেদের সমিতিকে সম্যকভাবে চিনতে হলে ট্রাইব মানে কী এবং ট্রাইবের এ্যাসেমব্লি বলতে ঠিক কী বোঝায়—এ-প্রশ্ন অগ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু আলোচ্য বিদ্বানেরা সে-প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। আরো কথা আছে। তাঁরা বলছেন, *the assembly disappears as an effective part of government in the Buddhist texts, the Epic and the Law-books*[৪৩]। মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উত্তরকালে সমাজ-সংগঠনে কোন্ ধরনের পরিবর্তনের ফলে শাসন-পরিচালনের ব্যাপারে ওই সমিতির গুরুত্ব লুপ্ত হলো সে-আলোচনা না তুললে আমাদের কাছে এ-মন্তব্যের তাৎপর্য পূর্ণাঙ্গ হয়

না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, মহাভারতের আলোচনা প্রসঙ্গে হপ্‌কিন্স[১১] দেখাতে চাইছেন, অভিজাত শ্রেণীর যুদ্ধ পরিষদ এবং পুরোহিত শ্রেণীর সংসদ গড়ে ওঠবার ফলেই পুরাকালের গণতান্ত্রিক সমিতি ভেঙে গিয়েছিলো।

আমাদের মূল যুক্তির পক্ষে এখানে সভা, সমিতি ও বিদথ সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। আমারা শুধুমাত্র এটুকু দেখাবার চেষ্টা করছি যে, বৈদিক সাহিত্যে প্রাক্-বিভক্ত সমাজের বহু স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায়। মর্গানের গবেষণা থেকে আমরা দেখলাম, প্রাক্-বিভক্ত সমাজের শাসন-পরিচালন ব্যাপারে প্রধানতম দায়িত্ব সভা-সমিতির উপর। অতএব আমাদের যুক্তির পক্ষে এখানে দুটি বিষয়ের উল্লেখই পর্যাপ্ত হবে: (ক) ঋগ্বেদে সভা, সমিতি, বিদথের প্রভূত গৌরবময় স্থান রয়েছে, যদিচ (খ) উত্তরকালের রচনায় (পুরাণ, মহাভারত, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে) এই সভা-সমিতির গৌরব লুপ্ত হতে দেখা যায়। অবশ্যই, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ইতিহাসে[১২] দেখা যায়, আদি-অকৃত্রিম প্রাক্-বিভক্ত ট্রাইব্যাল-সংগঠন ভেঙে যাবার পরও এই সভা-সমিতিমূলক শাসন-পরিচালন ব্যবস্থার রেশ বহুদিন পর্যন্ত টিকে ছিলো। তার মধ্যে প্রকৃত ট্রাইব্যাল-সমাজের অকৃত্রিম সভা-সমিতির পরিচয় না থাকলেও অন্তত তার স্মৃতির পরিচয়টুকু অস্পষ্ট নয়। ঋগ্বেদ-সংহিতা দীর্ঘ যুগ ধরে রচনার সংগ্রহ; তাই ঋগ্বেদেও সভা, সমিতি ও বিদথের তাৎপর্য যে সর্বত্রই আদি-অকৃত্রিম প্রাক্-বিভক্ত সমাজের শাসন-পরিচালন ব্যবস্থার পরিচায়ক—এ-কথা মনে করাও ভুল হবে। কিন্তু তা না হলেও ঋগ্বেদের সভা, সমিতি ও বিদথ যে বৈদিক আর্যদেরই প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়ের স্মৃতি বহন করছে এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। অতএব এর থেকেই প্রমাণ হবে যে, বৈদিক আর্যরাও এককালে প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়েই জীবন-যাপন করেছিলেন।

ঋগ্বেদে সভা, সমিতি ও বিদথের গৌরব যে কতোখানি এবার তাই দেখা যাক।

> ত্বমগ্নে বৃজিনবর্তনিং নরং সক্মন্‌পিপর্ষি বিদথে বিচর্ষণে।
> যঃ শূরসাতা পরিতক্ম্যে ধনে দভ্রেভিশ্চিৎসমৃতা হংসি ভূয়সঃ ॥
> অর্থাৎ,
> —হে বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত অগ্নি, তুমি বিপথগামী নরকে সমবেত কর্মের উপযোগী সভায় (বিদথে) সংশোধন করিয়া থাক; যুদ্ধগুলির দ্বারা যাহারা চারিদিকে ধন বিতরণ করিয়াছে তুমি তাহাদিগের বলিষ্ঠ শত্রুগুলিকে হনন কর॥ ঋগ্বেদ: ১.৩১.৬॥

> সং যন্মহী মিথতী স্পর্ধমানে তনূরুচা শূরসাতা যতৈতে।
> অদেবয়ুং বিদথে দেবয়ুভিঃ সত্রা হতং সোমসুতা জনেন॥

অর্থাৎ,

—যে দুইজন পরস্পর অত্যন্ত হিংসাযুক্ত এবং স্পর্ধিত হইয়া দৈহিক বল ও শৌর্য প্রদর্শন করিয়া হিংসা করিতে সচেষ্ট, সোমসবনকারী দেবতার অনুমোদিত জনসমূহ কর্তৃক সেই দেবতাবিহীন নরগণ বিদথে (সভায়) নিহত হইল॥ ঋগ্বেদ: ৭. ৯৩. ৫॥

উতাশিষ্ঠা অনু শৃণ্বন্তি বহ্নয়ঃ সভেয়ো বিপ্রো ভরতে মতী ধনা।
বীলুদ্বেষা অনু বশ ঋণমাদদিঃ স হ বাজী সমিথে ব্রহ্মণস্পতিঃ॥

অর্থাৎ,

—শীঘ্রগামী অশ্ব আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করিয়া এবং অতএব আমাদিগের যজ্ঞে তাহারা সভার উপযোগী হইয়া এবং ধনযুক্ত হইয়া প্রবেশ করে; ইহার পর প্রবল রাক্ষসদিগের দ্বেষকারী সেই অন্নবান ব্রহ্মণস্পতি এই সভায় আমাদিগের অভিলাষ অনুরূপ দাবীও (ঋণ) দিয়াছিলেন॥ ঋগ্বেদ: ২. ২৪. ১৩॥

গোমাঁ অগ্নেঽবিমাঁ অশ্বী যজ্ঞো নৃবৎসখা সদমিদপ্রমৃষ্যঃ।
ইলাবাঁ এষো অসুর প্রজাবান্ দীর্ঘো রয়িঃ পৃথুবুধ্নঃ সভাবান্॥

অর্থাৎ,

—হে অসুর (অগ্নি), আমাদের এই যজ্ঞ গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত, অন্নযুক্ত, প্রজাযুক্ত, প্রচুর ধনযুক্ত এবং প্রভূত ধনোৎপাদনের কারণযুক্ত কর; হে অগ্নি তুমি মানুষের ন্যায়ই আমাদের সখা এবং সভার সদস্য (সভাবান্)॥ ঋগ্বেদ: ৪. ২. ৫॥

সোমো ধেনুং সোমো অর্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্মণ্যং দদাতি।
সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ॥

অর্থাৎ,

সোম ধেনু দান করেন, সোম শীঘ্রগামী অশ্ব দান করেন এবং সোম কর্মক্ষম বীর দান করেন। সেই সোম গৃহস্থিত বিদথের উপযুক্ত, সভার উপযোগী, পিতার শ্রবণের উপযোগী (হবি) ইহাকে (=যজমানকে) দান করিয়াছিলেন॥ ঋগ্বেদ; ১. ৯১. ২০॥

যূয়ং গাবো মেদয়থা কৃশং চিদশ্রীরং চিৎকৃণুথা সুপ্রতীকম্।
ভদ্রং গৃহং কৃণুথ ভদ্রবাচো বৃহদ্বো বয় উচ্যতে সভাসু॥

অর্থাৎ,

—হে গরুগণ, তোমরা মেদযুক্ত হও এবং ক্ষীণ অথবা অশ্লীল (বিকৃত?) অঙ্গবিশিষ্ট হইয়াও শোভন লক্ষণযুক্ত হও; গৃহকে ভদ্র কর, বাক্যকে ভদ্র কর, এই কথাই আমরা বিশেষভাবে সভাগুলিতে বলিতেছি, তোমাদের অন্ন প্রচুর॥ ঋগ্বেদ: ৬. ২৮. ৬॥

অশ্বী রথী সুরূপ ইৎ গোমাঁ ইদিন্দ্র তে সখা।
শ্বাত্রভাজা বয়সা সচতে সদা চন্দ্রো যাতি সভামুপ॥

অর্থাৎ,

—হে ইন্দ্র, তোমার সখা অশ্বযুক্ত, রথযুক্ত, সুন্দর এবং গোযুক্ত; অন্নের দ্বারা ধনলাভের যোগ্য (ব্যক্তি) সর্বদা তোমার সহিত মিলিত হয় এবং সজ্জিত হইয়া সভায় গমন করে॥ ঋগ্বেদ : ৮. ৪. ৯ ॥

সর্বে নন্দন্তি যশসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ।
অর্থাৎ,

—(হে সোম), সকলে সভার উপযোগী সখ্যযুক্ত বন্ধুদিগের সহিত, প্রসিদ্ধিযুক্ত তোমাকে পাইয়া আনন্দিত হয়॥ ঋগ্বেদ : ১০. ৭১. ১০ ॥

ত্বেষং রূপং কৃণুত উত্তরং যৎ সংপৃঞ্চানঃ সদনে গোভিরদ্ভিঃ।
কবির্বুধ্নং পরি মর্মৃজ্যতে ধীঃ সা দেবতাতা সমিতির্বভূব॥
অর্থাৎ,

—(হে প্রাতঃস্মরণীয় অগ্নি), গৃহে গরুগুলিদ্বারা, জলসমূহের দ্বারা সম্পৃক্ত হইয়া যে উৎকৃষ্ট রূপ তুমি পরিগ্রহ কর এবং ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হইয়া ধনোৎপাদনের উপায়সমূহ (বুধ্ন) নিজ তেজের দ্বারা বিস্তৃত কর, সেই তেজ, হে দেবতা, তুমি সমিতিতে স্থাপিত করিয়াছ॥ ঋগ্বেদ : ১. ৯৫. ৮ ॥

পরি সদ্মেব পশুমান্তি হোতা রাজা ন সত্যঃ সমিতীরিয়ানঃ।
সোমঃ পুনানঃ কলশাঁ অযাসীৎ সীদন্মৃগো ন মহিষো বনেষু॥
অর্থাৎ,

—হোতা পশুযুক্ত হইয়া রাজার ন্যায় যেরূপ গৃহ অভিমুখে গমন করে সেইরূপ সত্যপরায়ণ পবিত্র সোম সমিতিতে আসিয়া কলসসমূহে প্রবেশ করে, বনেস্থিত মহিষ ও পশুগুলি যেমন উপবেশন করে॥ ঋগ্বেদ : ৯. ৯২. ৬ ॥

বয়ং ত ইন্দ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমা বদেম।
অর্থাৎ,

—হে ইন্দ্র, আমরা তোমার চিরদিনের প্রিয় এবং মহান বীর; আমরা এই সভায় কথা বলিতেছি॥ ঋগ্বেদ : ২. ১২. ১৫ ॥

স রেবান্যাতি প্রথমো রথেন বসুদাবা বিদথেষু প্রশস্তঃ॥
অর্থাৎ,

—সেই ধনবান রথে করিয়া প্রথমে গমন করেন এবং সভাসমূহে প্রশস্তরূপে ধনদান করেন॥ ঋগ্বেদ : ২. ২৭. ১২ ॥

নৃপেশসো বিদথেষু প্র জাতা অভীমং যজ্ঞং বি চরন্ত পূর্বীঃ॥
অর্থাৎ,

—সভাসমূহতে জাত নররূপীগণ এই যজ্ঞের অভিমুখে বিচরণ করুন॥ ঋগ্বেদ : ৩. ৪. ৫ ॥

ক্বতং নো যজ্ঞং বিদথেষু চারুং কৃতং ব্রহ্মাণি সূরিষু প্রশস্তা।
উপো রয়ির্দেবজুতো ন এতু প্র ণঃ স্পার্হাভিরূতিভিস্তিরেতম্ ॥
অর্থাৎ,
—(হে ইন্দ্র বরুণ), আমাদিগের যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছে, সভাসমূহে বীরগণের মধ্যে সুন্দর প্রশস্ত স্তুতিগুলি সমাপ্ত হইয়াছে; দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ধনসমূহ আমাদিগের নিকট আগমন করুক এবং স্পৃহণীয় রক্ষা দ্বারা আমাদিগকে তোমরা বর্ধিত কর ॥ ঋগ্বেদ: ৭.৮৪.৩ ॥

বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বৈদিক সমাজ যতো অবধারিতভাবেই পুরুষপ্রধান হোক না কেন ঋগ্বেদেই এমন কিছুকিছু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যা থেকে অনুমিত হয় যে, ওই অংশগুলি রচিত হবার সময়েও নারীদের সভাগমন-অধিকার বর্তমান ছিলো।

গুহা চরন্তী মনুষো ন যোষা সভাবতী বিদথ্যেব সং বাক্ ॥
অর্থাৎ,
—মানুষ নিগূঢ়ভাবে বিচরণ করে, যেমন সভাস্থিতা নারী সভার উপযোগী বাক্য প্রয়োগ করে ॥ ঋগ্বেদ: ১ ১৬৭.৩ ॥

ত্রী ষধস্থা সিন্ধবস্ত্রিঃ কবীনামুত ত্রিমাতা বিদথেষু সম্রাট্।
ঋতাবরীর্যোষণাস্তিস্রো অপ্যাস্ত্রিরা দিবো বিদথে পত্যমানাঃ ॥
অর্থাৎ,
—হে সিন্ধুগণ, তিনটি লোক, কবিদিগের তিনটি মাতা, বিদথগুলির সম্রাট্, ঋতযুক্ত তিনটি নারী দিবসে তিনবার সভায় আগমন করে॥ ঋগ্বেদ: ৩.৫৬.৫ ॥

দিবসে তিনবার সভায় আগমন-প্রসঙ্গ অবশ্যই যজ্ঞের কথা মনে করিয়ে দেয়। অন্যত্রও সভার সঙ্গে যজ্ঞের সম্পর্কের ইংগিত পাওয়া যায়।

ব্রাতংব্রাতং গণংগণং সুশস্তিভিরগ্নের্ভামং মরুতামোজ ঈমহে।
পৃষদশ্বাসো অনবভ্ররাধসো গন্তারো যজ্ঞং বিদথেষু ধীরাঃ ॥
অর্থাৎ,
—ধীর আমরা প্রতি ব্রাতে ও প্রতি গণে অগ্নি ও মরুৎগণের ওজঃ এবং বিচিত্রবর্ণ অশ্বসমূহ ও ত্রুটিবিহীন ধনসমূহ—যাহা যজ্ঞের অভিমুখে গমন করে সেইগুলিকে—শোভন স্তুতিদ্বারা এই বিদথগুলিতে যাচ্ঞা করিতেছি ॥ ঋগ্বেদ: ৩.২৬.৬ ॥

অতএব, সভার প্রসঙ্গ থেকে আমরা বৈদিক যজ্ঞের আলোচনায় উপনীত হই। বস্তুত, যজ্ঞকথা বাদ দিয়ে বৈদিক সাহিত্যের আলোচনাই সম্ভব নয়। এবং

যজ্ঞকথা প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের আলোচনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটি আপত্তি উঠতে পারে।

বৈদিক যজ্ঞের আদিরূপ ও রূপান্তর

পূর্বপক্ষ বলবেন, বৈদিক যজ্ঞই হলো সামগ্রিকভাবে বৈদিক সাহিত্যের প্রাণবস্তু। অতএব, ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে বিচার করবার বা বোঝবার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পটভূমি বলতে এই যজ্ঞই। তাই, কোন্ যজ্ঞে কোন্ মন্ত্রের কী বিনিয়োগ তার আলোচনা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির উপর নির্ভর করে বৈদিক মানুষদের সমাজ-ইতিহাস অন্বেষণ করার প্রচেষ্টা ভ্রান্ত হতে বাধ্য।

যজ্ঞই মুখ্য। যজ্ঞই প্রাথমিক। সায়নাচার্যও এই রকমই একটা যুক্তির উপর নির্ভর করেছেন বলেই ঋগ্বেদের আগে যজুর্বেদের ভাষ্যকে স্থান দেবার প্রয়োজন বোধ করেছেন—যজ্ঞই যজুর্বেদের প্রধানতম উপজীব্য। এবং সায়ন[১৩] বলছেন, "যজ্ঞে যজুর্বেদবিৎ ঋত্বিকের প্রাধান্য পরিকীর্তিত হইয়া থাকে। সেইজন্য সর্বপ্রথম যজুর্বেদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতঃপর হোমকরণসমর্থ ঋত্বিকের জন্য ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।" কেননা, "অধ্বর অর্থাৎ যজ্ঞকে যোজিত যিনি করেন—ইহাই অধ্বর্য্যু বা অধ্বরযু শব্দের যোগার্থ এবং যজ্ঞের নেতা এইটিই তাৎপর্য।"[১১] অবশ্যই শ্রুতিতে যে ঋগ্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রথমত্ব কথিত হয়েছে সে-কথা স্বয়ং সায়নও স্বীকার করছেন; কিন্তু শ্রুতির এই মন্তব্যের অর্থ ঠিক কী? সায়ন[১৮] বলছেন, "সর্বাগ্রে ঋকের পাঠ করা হয় বলিয়া যে উহার শ্রেষ্ঠত্ব বা উপাদেয়ত্ব, তাহা নহে। যজ্ঞের অঙ্গকে দৃঢ় করিবার ক্ষমতা ইহার আছে, সেইজন্য এই ঋক্ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়।...মন্ত্রার্থজ্ঞান ব্যতীত যজুর্বেদ-বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি আসিতে পারে না। সুতরাং মন্ত্রার্থজ্ঞান বিষয়ে এবং অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তিকরণাংশে যজুর্বেদেরই প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। অতএব তাহার ব্যাখ্যাই প্রথমে করা উচিত।"...

অতএব, আগে যজ্ঞ এবং এই যজ্ঞের পটভূমিকা বাদ দিয়ে ঋগ্বেদের মন্ত্রের আলোচনা ব্যর্থ ও ভ্রান্ত।

উত্তরে আমরা নিশ্চয়ই এমন দাবি করবো না যে, কোন্ যজ্ঞে ঋগ্বেদের কোন্

মন্ত্রের কী ভাবে বিনিয়োগ হচ্ছে তার থেকে মন্ত্রগুলির আদি-তাৎপর্যের উপর কোনোরকম আলোকপাতই হয় না। বস্তুত, পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্যের ভিত্তিতে আমরা মনে করতে পারি, আদিম সমাজে কাজ বা উৎপাদনক্রিয়া ছাড়া গান হয় না এবং গান ছাড়া কবিতা হয় না এবং জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠান *(ritual)* আদিম মানুষের কাছে জীবনসংগ্রামের—উৎপাদন-ক্রিয়ার—একটি অন্যতম সহায়। ঋগ্বেদ যদি প্রাচীন সমাজের গান ও কবিতার সঙ্কলন হয়, তাহলে সে-গান বা কবিতার সঙ্গে কাজের—অতএব, জাদুঅনুষ্ঠান বা *ritual*-এরও—কোনো-না-কোনো প্রকার আদি-সম্পর্ক অনুমিত হতে বাধ্য। পরের যুগে মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ থেকে সেই আদি-সম্পর্কের ইংগিত খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। কেননা, যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে যেভাবে যজ্ঞকথা বর্ণিত হয়েছে তা পরবর্তী যুগের ব্যাপার—অতএব অনেকাংশে কৃত্রিম—হলেও শুধুমাত্র আকস্মিক উদ্ভাবনের পরিণাম নয়; অর্থাৎ তার পিছনেও একটা পুরোনো ইতিহাসের কিছু কিছু ইংগিত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং সে-ইতিহাস অনুসরণ করলে আমরা হয়তো প্রাচীন-সমাজের জাদুঅনুষ্ঠান বা *ritual*-এরই পরিচয় পেতে পারি।

কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, উত্তরকালে আমরা যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের যে-পরিচয় পাই তা প্রাচীনসমাজের জাদুঅনুষ্ঠান বা *ritual*-এর সঙ্গে অভিন্ন। অর্থাৎ, যজ্ঞের পিছনে তার স্মৃতি লুকোনো থাকলেও যজ্ঞের মধ্যেই তার আদি-অকৃত্রিম রূপটির পরিচয় টিঁকে থাকার সম্ভাবনা অল্পই। কিংবা, যা একই কথা, উত্তরকালে যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণে আমরা যজ্ঞের যে-রূপ দেখি তাই যজ্ঞের আদিরূপ নয়। প্রাচীন সমাজের *ritual* থেকেই যজ্ঞের জন্ম; কিন্তু যজ্ঞের মধ্যেই সে-*ritual*-এর আদি-তাৎপর্য নেই। এই বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

আধুনিক জ্ঞানের মানদণ্ডে প্রাচীন সমাজের জাদুঅনুষ্ঠান নিশ্চয়ই অবাস্তব, অসম্ভব, ভ্রান্ত। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কামনা-সফল হবার একটা কাল্পনিক ছবি ফুটিয়ে তুলেই আধা-অসহায় অবস্থার মানুষগুলি মনে করে যে, এইভাবে কামনা বাস্তবিকই সফল হতে বাধ্য। কিন্তু সমস্ত ক্রিয়াটুকু কাল্পনিক হলেও ওই পর্যায়ের মানুষদের কাছে তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল নয়। কেননা, ওই কল্পনাই তাদের জীবন-সংগ্রামে মানসিক উদ্দীপনার একটি প্রধানতম উৎস। এই কারণেই অধ্যাপক জর্জ টম্সন[৮৯] প্রাচীন মানুষদের জাদুঅনুষ্ঠানকে *an illusory technique supplementary to the real technique* বলে বর্ণনা করেছেন: বাস্তব পৃথিবীর উপর এই কাল্পনিক অনুষ্ঠানটির কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু একটা পরোক্ষ প্রভাব থাকতে বাধ্য।

কেননা, যারা এতে বিশ্বাস করছে তাদের মনের বল, তাদের সাহস ও বিশ্বাস, অনেকাংশে এই সাফল্য-কল্পনার সাহায্যেই বেড়ে যাচ্ছে; তাই তারা অনেক ভালো করে, অনেক সার্থকভাবে, জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হতে পারছে। ফলে শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান বাস্তব পৃথিবীকেও প্রভাবিত করছে। অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন[৩০] বলছেন, *It changes their subjective attitude to reality, and so indirectly it changes reality.*

এ-জাতীয় অনুষ্ঠান কাল্পনিক হওয়া সত্ত্বেও যে প্রাচীন-সমাজের পটভূমিতে বাস্তব জীবন-সংগ্রামের সহায়ক হতে পারে, তার মূল কারণ হলো প্রাচীন-সমাজের সমষ্টিজীবন। শ্রীমতী জেন হ্যারিসন্[৩১] বলছেন,

> Collectivity and emotional tension, two elements that tend to turn the simple reaction into a rite, are—specially among the primitive peoples—closely associated, indeed scarcely separable. The individual among savages has but a thin and meagre personality; high emotional tension is to him only caused and maintained by a thing felt socially; it is what the tribe feels that is sacred, that is matter for ritual.

কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, সমাজের পটভূমি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ প্রাচীন *ritual*-গুলিকে বর্জন করতে পারে: যে-সব আচার-অনুষ্ঠান পূর্বপুরুষদের জীবনে দীর্ঘ যুগ ধরে পরম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে পরবর্তী পর্যায়েও মানুষ সেগুলিকে পরম পবিত্র বলেই আঁকড়ে থাকতে চায়। তাই, শ্রেণীসমাজের পটভূমিতেও *ritual*-গুলি টিকে থাকে, আকস্মিকভাবে উবে যায় না।

কিন্তু তা হলেও ওই আচার-অনুষ্ঠানগুলির আদি-তাৎপর্য এবং উত্তর-তাৎপর্য এক নয়। অর্থাৎ, নবপর্যায়ে *ritual*-গুলিরও নবরূপ বিকশিত হয় এবং এই নবরূপটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে *ritual*-গুলির আদি-তাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসিত হয়েছে। তারও নির্দিষ্ট কারণ আছে।

প্রথমত, প্রাচীন-পর্যায়ের মতো এগুলি আর সমষ্টিগত অনুষ্ঠান থাকে না, তার বদলে শ্রেণীবিশেষের গোপন বিদ্যার রূপ গ্রহণের দাবি করে।

দ্বিতীয়ত, এগুলি আর সামগ্রিক স্বার্থে নিযুক্ত নয়—অন্তত নিযুক্ত বলে কল্পিত নয়; তার পরিবর্তে ব্যষ্টির স্বার্থে প্রযুক্ত বলেই কল্পিত হয়।

তৃতীয়ত, উদ্বৃত্তজীবীর গোপন বিদ্যা হিসেবে এবং তারই খণ্ড স্বার্থে প্রযুক্ত হিসেবে কল্পিত বলে আদিম অনুষ্ঠানগুলির নবরূপ আর বাস্তব জীবন-সংগ্রামের অঙ্গ নয়। কেননা মূলতই কাল্পনিক কৌশল হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন পর্যায়ে এগুলি যে-কারণে বাস্তব কৌশলকে সাহায্য করতে পেরেছে সে-কারণ বা সেই সর্ত—প্রাচীন মানুষের সমষ্টিজীবন—ইতিমধ্যে ভেঙে গিয়েছে এবং এইভাবে বাস্তব জীবনসংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হবার ফলেই ওই আদিম আচার-অনুষ্ঠানের নেতিবাচক দিকটি—কাল্পনিক এবং অবাস্তব চরিত্রটিই—যেন বাধাবন্ধনহীন স্বাধিকারপ্রমত্ত ও সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠবার আয়োজন করে। একই কারণে এগুলির নবরূপ অসামান্য জটিল ও পল্লবিত হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

এই কথাগুলিকে সাধারণভাবে জানতে-পারা মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেই আমরা বৈদিক যজ্ঞের ইতিহাস বোঝবার চেষ্টা করবো।

ঋগ্বেদে অবশ্যই যজ্ঞ, যজমান, ঋত্বিক প্রভৃতির উল্লেখ আছে; এমন কি উত্তর-সাহিত্য বর্ণিত কোনো কোনো বিশিষ্ট যজ্ঞের পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেমন, অধ্যাপক কীথ্[১২] বলছেন, প্রথম মণ্ডলের ১৬২ এবং ১৬৩ সূক্ত অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু উত্তর-সাহিত্যে—যজুর্বেদ এবং ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে—বৈদিক যজ্ঞকে আমরা যে-জটিল ও পল্লবিতরূপে দেখি ঋগ্বেদে নিশ্চয়ই তার পরিচয় নেই। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, ঋগ্বেদের যুগে যজ্ঞ পরবর্তী কালের মতো ছিলো না।

বৈদিক যজ্ঞের আদিরূপ যে অনেকাংশেই আদিম-সমাজের জাদুঅনুষ্ঠান ধরনের ছিলো এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেই আদিম অনুষ্ঠানগুলির যে মৌলিক রূপান্তর ঘটেছিলো,—এ-বিষয়ে ইতিপূর্বে ওল্ডেনবার্গ, কীথ্ প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানেরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে আমরা অধ্যাপক কীথ্-এর[১৩] একটি উক্তি উদ্ধৃত করবো।

অশ্বমেধ-প্রসঙ্গে তিনি বলছেন,

> There is a good deal in the Indian ritual which is in accord with the theory of a vegetation ritual....The obscenity of the conversation, Oldenberg suggests, is possibly due to vegetation magic, and this is no doubt its function, as in the dialogue of a hetaria and a Brahmacarin at the Mahavrata, rather than an entertainment of the gods or the remains of popular

> freedom of speech...The ritual was not in the Brahmana period consciously a vegetation ritual, but this does not disprove the possibility that this was part of its original character.

যদি তাই হয়,—যদি আদিম সমাজের *vegetation-ritual*-ই কালক্রমে পরবর্তী-সাহিত্য বর্ণিত অশ্বমেধ-যজ্ঞে পরিণত হয়ে থাকে, তাহলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের আদি-তাৎপর্য বোঝবার জন্য ওই *vegetation-ritual* এবং আদিম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তার বাস্তব ভূমিকা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন; এবং এ-বিষয়ে শ্রীমতী জেন হ্যারিসনের গবেষণা নিশ্চয়ই বেদবিদ্‌দের কাছে মূল্যবান বলে পরিগণিত হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধ্যাপক কীথ্‌ শুধুই যে এ-সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করেছেন তাই নয়; এইভাবে নৃতত্ত্বের আলোয় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের আদি-তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টার বিরুদ্ধেই তাঁর প্রবল প্রতিবন্ধ আছে। প্রসঙ্গান্তরে তিনি এই নৃতত্ত্বমূলক পদ্ধতি সম্বন্ধে বলছেন,[৫৪]

> These speculations are acute and ingenious, but serious discussion they can hardly demand.

এবং শ্রীমতী জেন্‌ হ্যারিসন্‌-এর গবেষণা তাঁর কাছে যেন নেহাতই হাসির ব্যাপার:

> The projection theory of religion is carried to its logical conclusions in a most amusing, because serious, work by Miss J. Harrison, *Themis* (1912). The author has a personal animus against the Olympians as non-matriarchal, and now interprets religion in terms of sociological epistemology.[৫৫]

আমরা যদি অধ্যাপক কীথ্‌-এর প্রথমোক্ত উক্তিকে গ্রহণ করি,—অর্থাৎ, আদিম সমাজের *vegetation ritual*-এর মধ্যেই যদি বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের আদিরূপটিকে খুঁজে পাওয়া যায় বলে স্বীকার করি,—তাহলে মানতে বাধ্য হবো যে, উত্তরকালে এই অনুষ্ঠান শুধুই যে জটিল ও পল্লবিত হয়েছে তাই নয়, অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই শ্রেণীস্বার্থ-রঞ্জিতও হয়ে উঠেছে। কেননা শ্রীমতী জেন্‌ হ্যারিসন্‌ প্রমুখের গবেষণাকে ও-রকম ঠাট্টার চোখে না দেখলে অধ্যাপক কীথ্‌ নিজেই স্বীকার করতেন, প্রাচীন সমাজের সমষ্টিগত পটভূমিতে *vegetation ritual* বলে

অনুষ্ঠান সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠি-স্বার্থে নিযুক্ত; অপরপক্ষে উত্তরকালের সাহিত্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের সে-রূপ দেখা যায় না। আপস্তম্ব বলছেন, সার্বভৌম রাজা অশ্বমেধ-যজ্ঞ করতে পারেন (২০. ১. ১); বৌধায়নেরও সেই মত (২৫. ১)। এবং অধ্যাপক কীথ্ এই জাতীয় আরো অন্যান্য তথ্যের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত করছেন,[৫৬]

> As revealed in the later texts, the sacrifice is essentially one of princely greatness. The steed for a year roams under guardianship of a hundred princes, a hundred nobles with swords, a hundred sons of heralds and charioteers bearing quivers and arrows, and a hundred sons of attendants and charioteers bearing staves···

বাজপেয় যজ্ঞ-প্রসঙ্গেও অধ্যাপক কীথ্ একই ইংগিত দিচ্ছেন—তাঁর মতে উত্তরকালে এ-যজ্ঞের আদিরূপটিকে পুরোহিত-শ্রেণী মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে নিয়েছিলো[৫৭] :

> But the rite thus depicted is essentially already a priestly one ; the original rite in its popular form has been intended in honour of Indra alone...But in sacerdotalizing the rite, the priests have still retained its popular features...

কিন্তু আদিম প্রাক্-বিভক্ত সমাজের সঙ্গে উত্তর-পর্যায়ের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পটভূমির পার্থক্য মনে না রাখলে এখানে *sacerdotalizing* এবং *popular features* বলতে ঠিক কী বোঝায় তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না।

যজমান শব্দের সাক্ষ্য

নৃতত্ত্বের আলোয় বৈদিক যজ্ঞের উৎস-সন্ধান এবং সমাজতত্ত্বের আলোয় সেগুলির রূপান্তর-নিরূপণ করবার দায়িত্ব সম্যকভাবে পালিত হয়নি বলেই বৈদিক গবেষকদের কাজ আজো অনেকাংশে অসমাপ্ত আছে। আমরা সেদিকে যোগ্য বেদবিদ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

অবশ্যই আমাদের পক্ষে এখানে সে-আলোচনার সুযোগ বা প্রাসঙ্গিকতা নেই। কেননা আমাদের যুক্তির পক্ষে তা প্রয়োজন নয়। আমাদের যুক্তির পক্ষে এখানে শুধু এটুকু প্রতিপন্ন করবার প্রচেষ্টাই পর্যাপ্ত যে, বৈদিক সমাজের মতোই বৈদিক অনুষ্ঠানগুলিরও একটা ইতিহাস আছে। উত্তরকালের সাহিত্যে আমরা বৈদিক যজ্ঞের যে-রূপ দেখছি, তাই যজ্ঞের আদিরূপ নয় এবং এই রূপ-পরিবর্তন বলতে শুধুমাত্র এটুকু বোঝায় না যে, কালক্রমে যজ্ঞ অত্যন্ত জটিল ও পল্লবিত হয়েছিলো; তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, পরবর্তীকালে যজ্ঞের উদ্দেশ্য এবং চরিত্রও মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের প্রতিপাদ্য হবে, অধ্যাত্মবাদের আবির্ভাব এই মৌলিক পরিবর্তনেরই পরিণাম।

আমরা প্রথমে এ-বিষয়ে যজমান শব্দটির সাক্ষ্য গ্রহণ করবো, কেননা এই শব্দটির পিছনে একটা ইতিহাসের ইংগিত আছে। যজমান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং বাস্তব অর্থের মধ্যে যে-বিরোধ, তা থেকেই ওই ইংগিত পাওয়া যায়।

মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্[৫৮] বলছেন, যজমান শব্দের অর্থ হলো,

The person paying the cost of a sacrifice, the institutor of a sacrifice (who, to perform it, employs a priest or priests, who are often hereditary functionaries in a family), any patron, host, rich man,...

অর্থাৎ, যিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যজ্ঞসম্পাদন করান। দ্রষ্টব্য হলো, যজ্ঞ-সম্পাদনের দায়িত্ব যজ্ঞীয় পুরোহিতদের বা ঋত্বিকদের উপর, যজমান নিজে যজ্ঞকর্ম করেন না। যজ্ঞ-ফল কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁরই; এবং তাঁর হয়ে যজ্ঞ করে দেবার জন্য তিনি ওই পুরোহিতদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দান করেন। এই কারণেই যজমান ধনী ও বিত্তশালী—*patron, host, rich man*।

বলাই বাহুল্য, উত্তরকালের সাহিত্যে আমরা যজমান শব্দটিকে এই অর্থেই নিযুক্ত হতে দেখি। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা এখানে ছান্দোগ্য-উপনিষদ[৫৯] থেকে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি।

> কুরুদেশ শিলাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলে উষস্তি চাক্রায়ণ...অত্যন্ত দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়া ইভ্য-গ্রামে বাস করিতেছিলেন।...পরদিবস প্রাতঃকালে উষস্তি নিদ্রাত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "হায়, যদি কিঞ্চিৎ অন্ন পাইতাম, কিছু অর্থলাভ হইত। ঐ রাজা যজ্ঞ করিবেন; ঋত্বিকগণের সমুদয় কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি আমাকে বরণ করিতে পারিতেন"। (জায়া তাঁহাকে পূর্বদিবসের ভুক্তাবশিষ্ট কুল্মাষ

দিলেন এবং তাহা ভক্ষণ করিয়া তিনি সেই প্রারব্ধ যজ্ঞে গমন করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, ইতিমধ্যে যে-ঋত্বিকগণ যজ্ঞসম্পাদন আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারা অনধিকারী)।...অনন্তর যজমান তাঁহাকে বলিলেন, "আমি আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি।" উষস্তি বলিলেন, "আমি উষস্তি চাক্রায়ণ।" যজমান বলিলেন, "এই সমুদয় ঋত্বিক-কর্মের জন্য আমি সর্বত্র আপনার অন্বেষণ করিয়াছিলাম। আপনার সন্ধান পাই নাই বলিয়াই অন্য সমুদয় লোককে বরণ করিয়াছি। আপনিই আমার সমুদয় ঋত্বিক-কার্যের ভার গ্রহণ করুন"। উষস্তি বলিলেন, "তাহাই হউক। এখন ইহারাই আমার অনুমতিতে স্তুতিগান করুক। আপনি ইহাদিগকে যে-পরিমাণ অর্থ দিবেন আমাকেও সেই পরিমাণ অর্থ দিবেন"। যজমান বলিলেন, "তাহাই হইবে"।

অবশ্যই, পরবর্তী সাহিত্যে যজমান শব্দটিকে আমরা এই অর্থেই প্রযুক্ত হতে দেখি : ঋত্বিকদের তিনি অর্থ দেবেন এবং এই পারিশ্রমিকের বিনিময়েই ঋত্বিকেরা তাঁর হয়ে যজ্ঞ-সম্পাদন করে দেবেন।

কিন্তু আমরা যে-অর্থে বৈদিক যজ্ঞের আদিরূপ বোঝবার চেষ্টা করছি তার সঙ্গে যজমান শব্দের এ-তাৎপর্যের সঙ্গতি নেই। কেননা, যজ্ঞ বলতে আদিতে যদি প্রাচীন সমাজের অনুষ্ঠান-নির্ভর উৎপাদন-ক্রিয়াই বুঝিয়ে থাকে, তাহলে তা অনিবার্যভাবেই যৌথকর্মপদ্ধতি হতে বাধ্য। অর্থাৎ, স্বয়ং যজমানের পক্ষে তাতে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

অতএব, যজ্ঞ-প্রসঙ্গে আমাদের কাছে একটি প্রধান প্রশ্ন এই হয়েছে যে, উত্তরকালে যজমান শব্দের তাৎপর্য যাই হোক না কেন, আদিতে তার স্বতন্ত্র কোনো তাৎপর্য ছিলো কিনা ; এবং যদি তা থাকে তাহলে সেই স্বতন্ত্র তাৎপর্যের মধ্যে আমরা এমন কোনো ইংগিত পাই কিনা যা থেকে অনুমান করা সম্ভব যে, এককালে স্বয়ং যজমানও যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর পাবার আশায় আমরা প্রথম যজমান শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ বিচার করবার চেষ্টা করেছি।

যজ্‌+শানচ্‌=যজমান। এখানে আত্মনেপদ (শানচ্‌) ব্যবহৃত হয়েছে। এবং ব্যাকরণের নিয়ম হলো, ক্রিয়ার ফল যখন কর্তার অভিপ্রায় সিদ্ধ করে তখন ধাতুর আত্মনেপদ হয় এবং অতএব, আত্মনেপদ ব্যবহৃত হয় : "স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে"।

তাহলে, ব্যুৎপত্তির দিক থেকে যজমান শব্দের অর্থ হলো, যিনি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যজ্ঞকর্ম করেন। যজমান শব্দটিকে আমরা বাস্তবভাবে যে-অর্থে নিযুক্ত হতে দেখি তার সঙ্গে এর তফাত কোথায় ? সেখানেও যজমানই যজ্ঞফলভোগী ; কিন্তু তিনি স্বয়ং যজ্ঞকর্মে অংশ গ্রহণ করছেন না—তার বদলে অর্থব্যয় করে যজ্ঞ-সম্পাদনকারী নিযুক্ত করছেন।

আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি যে, ওই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেই যজমান শব্দের আদি-তাৎপর্যের পরিচয় পাওয়া যাবে এবং ঋগ্বেদ যেহেতু বৈদিক মানুষদের প্রাচীনতম সাহিত্য-নিদর্শন সেইহেতু ঋগ্বেদে যজমান শব্দের ওই আদি-অর্থে ব্যবহার খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হওয়া উচিত নয়। অতএব আমরা প্রশ্ন তুলেছি, অর্থব্যয় করে ঋত্বিক নিয়োগের পরিবর্তে নিজে যজ্ঞ করছেন—এই অর্থে ঋগ্বেদে যজমান শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় কি?

> এ বা নৃভিরিন্দ্রঃ সুশ্রবস্যা প্রখাদঃ পৃক্ষো অভিমিত্রিণো ভূৎ।
> সমর্য ইষঃ স্তবতে বিবাচি সত্রাকরো যজমানস্য শংসঃ॥
> অর্থাৎ,
> —(ইন্দ্র) কর্মনির্বাহক নররূপ যজমানগণ কর্তৃক প্রদত্ত হবিযুক্ত অন্ন শোভন অন্নের ইচ্ছায় ভক্ষণ করেন; মিত্রযুক্ত যজমানের জন্য বিবিধ কোলাহলযুক্ত সংগ্রামে তাহার প্রশংসা করিয়া মঙ্গলবিধান করেন॥ ঋগ্বেদ: ১. ১৭৮. ৪॥

দ্রষ্টব্য হলো, যজমান এখানে ব্যক্তিবিশেষ নন; মিত্রযুক্ত ও বহু। তাঁরা নিজেরাই সমবেতভাবে হবিযুক্ত অন্ন প্রদান করছেন এবং মঙ্গললাভ করছেন—যজ্ঞ-ফল অভিলাষী কোনো এক যজমানের দ্বারা অর্থবিনিময়ে নিযুক্ত হয়ে ঋত্বিকেরা যজ্ঞ করে দিচ্ছেন না। এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা যায় যে, ঋগ্বেদে সাধারণ-হবি বা *common oblation*-এর উল্লেখ পাওয়া যায়: "তদিৎ সমানমাশাতে বেনন্তা ন প্র যুচ্ছতঃ ধৃতব্রতায় দাশুষে"—তাঁহারা দুইজন (মিত্র ও বরুণ) সেই সাধারণ (হবি) ভক্ষণ করেন, তাঁহারা অভিলাষযুক্ত হইয়া দানশীল ব্রতধারীকে সিদ্ধমনস্কাম করেন (ঋগ্বেদ: ১. ২৫. ৬)।

ঋগ্বেদে বহুবচনে এবং নিজেরাই যজ্ঞ-সম্পাদনকারী অর্থে যজমান শব্দের ব্যবহার বিরল নয়:

> যজিষ্ঠং ত্বা যজমানা হুবেম জ্যেষ্ঠমঙ্গিরসাং
> বিপ্র মন্মভির্বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ।
> পরিজ্মানমিব দ্যাং হোতারং চর্ষণীনাম্।
> শোচিষ্কেশং বৃষণং যমিমা বিশঃ প্রাবন্তু জুতয়ে বিশঃ॥
> অর্থাৎ,
> —যজনীয়দিগের শ্রেষ্ঠ তোমাকে (অগ্নিকে) আমরা যজমানগণ আহ্বান করি,—হে অঙ্গিরাগণের জ্যেষ্ঠ বিপ্র, জ্বালাময় জনন ও মন্ত্রসমূহের দ্বারা, সূর্যের ন্যায় চতুর্দিকে গমনকারী, হে মনুষ্যদিগের মুখপাত্র, তোমাকে সেই স্বর্গে প্রবেশকামী যজমানগণ প্রীত করুক, হে জ্বালাময় কেশযুক্ত (অগ্নি)॥ ঋগ্বেদ: ১. ১২৭. ২॥

ঈলে চ ত্বা যজমানো হবির্ভিরীলে সখিত্বং সুমতিং নিকামঃ ॥
অর্থাৎ,
—তোমাকে (অগ্নিকে) যজমানগণ হবিসমূহের দ্বারা স্তব করে এবং সুমতির অভিলাষ করিয়া তোমার সখিত্বের জন্য স্তব করে ॥ ঋগ্বেদ : ৩. ১. ১৫ ॥

মা তে হরী বৃষণা বীতপৃষ্ঠা নি রীরমন্ যজমানাসো অন্যে।
অত্যায়াহি শশ্বতো বয়ং তে অরং সুতেভিঃ কৃণবাম সোমৈঃ ॥
অর্থাৎ,
—তোমার (ইন্দ্রের) কোমল পৃষ্ঠযুক্ত অশ্ব দুইটি অন্য যজমানদিগের প্রীতির কারণ যেন না হয় ; তাহাদের অতিক্রম করিয়া তুমি আগমন কর, আমরা তোমার রথের অরদণ্ডগুলিকে অভিষুত সোমের দ্বারা মসৃণ করিয়া দিব ॥ ঋগ্বেদ : ৩. ৩৫. ৫ ॥

আসানেভির্যজমানো মিয়েধৈর্দেবানং জন্ম বসূয়ুর্ববন্দ ॥
অর্থাৎ,
—যজ্ঞফললাভার্থ উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত যজমান ধনকামনায় দেববৃন্দকে বন্দনা করিয়াছিলেন ॥ ঋগ্বেদ : ৬. ৫১. ১২ ॥

রায়স্পোষং যজমানেষু ধত্তম ॥
অর্থাৎ,
—(হে ইন্দ্রাবরুণ), যজমানদিগের ধন বর্ধিত কর ॥ ঋগ্বেদ : ৮. ৫৯. ৭ ॥

রায়স্পোষং যজমানেষু ধারয়
অর্থাৎ,
—(হে অগ্নি), যজমানদিগের ধন বর্ধিত কর ॥ ঋগ্বেদ : ১০. ১২২. ৮ ॥

উত্তরকালের সাহিত্যে যজ্ঞের যে-রূপটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেখানে দেখা যায় হবি-প্রদান, সোমসবন প্রভৃতি কাজ যজমান-নিযুক্ত ঋত্বিক-বিশেষেরই দায়িত্ব ; যজমানের দায়িত্ব নয়। কিন্তু পুরাকালে এ-জাতীয় কাজ যে-যজমানদেরই ছিলো,—অর্থাৎ, যজমানেরা নিজেরাই যে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতেন,—সে-কথা ঋগ্বেদ-রচনার যুগেও বৈদিক ঋষিদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

শাস্তে যজমানঃ হবির্ভিঃ।
অর্থাৎ,
—যজমান হবিসমূহদ্বারা শাসন করেন ॥ ঋগ্বেদ : ১. ২৪. ১১ ॥

যজমানায় শিক্ষসি সুন্বতে ভূরি তে বসু।
অর্থাৎ,
—(হে ইন্দ্র), তুমি সোমসবনকারী যজমানকে তোমার প্রভূত ধনসম্পদে শিক্ষা দিয়া থাক॥ ঋগ্বেদ : ১. ৮১. ২॥

ভদ্রা শক্তিঃ যজমানায় সুন্বতে।
অর্থাৎ,
—সোমসবনকারী যজমানকে মঙ্গলময় শক্তি (প্রদান করেন) ॥ ঋগ্বেদ : ১. ৮৩. ৩॥

সুকৃতে সুদানবে বিশ্বেদহ যজমানায় সুন্বতে
অর্থাৎ
—শোভনকর্মকারী দানশীল সোমসবনকারী যজমানকে…॥ ঋগ্বেদ : ১. ৯২. ৩॥

পুষন্নসু প্র গা ইহি যজমানস্য সুন্বতঃ অস্মাকং স্তুবতামুত।
অর্থাৎ,
—হে পুষণ, সোমসবনকারী যজমানের গরুগুলির অনুগমন কর; স্তবকারী আমাদের (গরুগুলির অনুগমন কর)॥ ঋগ্বেদ : ৬. ৫৪. ৬॥

ইন্দ্রাগ্নী শৃণুতং হবং যজমানস্য সুন্বতঃ।
অর্থাৎ,
—হে ইন্দ্র-অগ্নি, সোমসবনকারী যজমানদের আহ্বান শ্রবণ কর॥ ঋগ্বেদ : ৬. ৬০. ১৫॥

সুন্বতো বৃধো যজমানস্য সৎপতে
অর্থাৎ,
—সোমসবনকারী যজমানের মঙ্গলকারী ও বর্ধক॥ ঋগ্বেদ : ৮. ১২. ১৮॥

ধেনুষ্ট ইন্দ্র সূনৃতা যজমানায় সুন্বতে গামশ্বং পিপ্যুষী দুহে।
অর্থাৎ,
—হে ইন্দ্র, তোমার স্তুতিরূপ বাক্য গাভীরূপে, সোমসবনকারী যজমানকে গরু, অশ্ব দোহনদ্বারা সমৃদ্ধ করায়॥ ঋগ্বেদ : ৮. ১৪. ৩॥

অবশ্যই বৈদিক সাহিত্য সুদীর্ঘ যুগের রচনা। আমরা আগেই বলেছি, এক ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতম ও অর্বাচীনতম অংশের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দ্বিসহস্রাধিক বছর হতে পারে। অতএব, এই ঋগ্বেদ সংহিতার আগাগোড়াই —সমস্ত ঋকেই—যে একই রকম সমাজবাস্তব প্রতিফলিত হবে, তা

কল্পনা করা যুক্তি-বিরুদ্ধ। এবং বাস্তবভাবেও দেখা যায় যে, তা নয়। এই ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যেই চোখে পড়ে, যজ্ঞে যজমানের ভূমিকায় পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে এবং তারই ফলে যজমান শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও এমন কি অজ্ঞ অভিলাষী-মাত্রে পরিণত হচ্ছে : তখন শুধু যজ্ঞের ফলটাই তার, কিন্তু যজ্ঞকর্মে তার কোনো অবদান নেই।

এই পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের পরিচয় দেখা যাক। প্রথম স্তরে আমরা দেখতে পাই, যজমানের সঙ্গে স্তোতার একটা পার্থক্য ফুটে উঠছে, যে-পার্থক্যের পরিচয় পূর্বোক্ত ঋক্‌গুলিতে চোখে পড়ে না।

> প্র হি ক্রতুং বৃহথো যং বনুথো রধ্রস্য স্থো যজমানস্য চোদৌ।
> অর্থাৎ,
> —(হে ইন্দ্রসোম), দ্বেষকারীকে উত্তমরূপে হিংসা কর, যজমানের শত্রুর প্রতি প্রেরক হও॥ ঋগ্বেদ : ২. ৩০. ৬॥
>
> শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন।
> অর্থাৎ,
> —(হে ইন্দ্র), শক্তিমান হইয়া তুমি যজ্ঞেযুক্ত যজমানের প্রেরয়িতা হও এবং আমিও যজ্ঞে তোমার সমস্ত কর্ম কীর্তন করিতে অভিলাষী॥ ঋগ্বেদ : ১. ৫১. ৮॥

এখানে যজমানের সঙ্গে স্তোতার যে-প্রভেদ সূচিত হচ্ছে তাই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায়—

> আষাম প্রাঞ্চো যজমানমচ্ছ—
> অর্থাৎ,
> —আমরা যজমানের অভিমুখে আসি॥ ঋগ্বেদ : ৫. ৪৫. ৫॥
>
> সুতংভরো যজমানস্য সৎপতির্বিশ্বাসামূধঃ স ধিয়ামুদঞ্চনঃ।
> অর্থাৎ,
> —পুত্রবর্ধনকারী (ব্যক্তি) যজমানের সর্বপ্রকার শোভন ফলের প্রাপয়িতা॥ ঋগ্বেদ : ৫. ৪৪. ১৩॥
>
> ······সবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু॥
> অর্থাৎ,
> —(হে অগ্নি) যজমানের পক্ষে সবিতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞকে বহন কর॥ ঋগ্বেদ : ৬. ১৫. ১৬॥

যজমান কীভাবে যজ্ঞকর্মের বাস্তব দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছে তা দেখবার জন্যে ঋগ্বেদের ৪. ১৭. ১৫ ঋকের সঙ্গে ১. ২৪. ১১ ঋকের ইংগিতকে তুলনা করা যায়। ১. ২৪. ১১-র দেখি "শাস্তে যজমানঃ হবির্ভিঃ"—যজমান হবিসমূহদ্বারা শাসন করে; অতএব এখানে যজমান আর হোতা অভিন্ন। অথচ, ৪. ১৭. ১৫-য় দেখা যায়, "অসিক্ন্যাং যজমানো ন হোতা,"—অর্থাৎ, অসিক্নীতীরে যজমানই যেন হোতা। এখানে 'ন' বা 'যেন' শব্দটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক; এর থেকে অনুমান করা যায় যে, অসিক্নীতীরে তখনো হোতা ও যজমানের মধ্যে প্রভেদ প্রকট হয়নি, অথচ আলোচ্য ঋকের রচয়িতার অভিজ্ঞতায় তা হয়েছে।

ঋত্বিক এবং যজমানের মধ্যেও প্রভেদ ফুটে উঠতে দেখা যায়:

> কৃধি রত্নং যজমানায় সুক্রতো ত্বং হি রত্নধা অসি।
> আ ন ঋতে শিশীহি বিশ্বম্ ঋত্বিজং সুশংসো যশ্চ দক্ষতে॥
> অর্থাৎ,
> —হে শোভনকর্মযুক্ত (অগ্নি), তুমি রত্নাকর, যজমানকে রত্ন প্রদান কর; আমাদের যজ্ঞে সমস্ত ঋত্বিকগণকে অনুপ্রেরিত কর, যাহাতে শোভন স্তুতি বর্ধিত হয়॥ ঋগ্বেদ: ৭. ১৬. ৬॥

ঋগ্বেদে অধ্বর্যুর উল্লেখও পাওয়া যাচ্ছে এবং যজমানের সঙ্গে তার প্রভেদ ঠিক কতোখানি পরিস্ফুট হয়েছে তা বিচার করা দরকার:

> শংসাবাধ্বর্যো প্রতি মে গৃণীহীন্দ্রায় বাহঃ কৃণবাব জুষ্টম্।
> এদং বর্হির্যজমানস্য সীদাথা চ ভূদুক্থম্ ইন্দ্রায় শস্তম্॥
> অর্থাৎ,
> —হে অধ্বর্যু, আমরা দুইজন স্তুতি করিব, আমার সহিত চুক্তিবদ্ধ হও, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রীতিযুক্ত স্তব করিব, যজমানের এই কুশে উপবেশন কর, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উকৃথ্য প্রশস্ত হউক॥ ঋগ্বেদ: ৩. ৫৩. ৩॥

যজ্ঞকর্মে বাস্তব অংশগ্রহণের দায়িত্ব-মুক্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত যজমান কী ভাবে শুধু নিশ্চেষ্টই নয়, চেতনাহীন ব্যক্তিমাত্রে পরিণত হয়েছিলেন—এই বিষয়টি দেখবার জন্য আমরা এখানে ঋগ্বেদের একটি অর্বাচীনতম ঋক উদ্ধৃত করবো।

> যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি।
> যো অনূচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎকা স্বিৎ তত্র যজমানস্য সংবিৎ॥

অর্থাৎ,

—যাঁহাকে বহুরূপে কল্পনা করিয়া ঋত্বিকগণ এই যজ্ঞকে সচেতনভাবে বহন করিয়া থাকেন এবং যিনি বেদবিদ্যাপারঙ্গম ব্রাহ্মণদ্বারা যুক্ত (আরাধিত),—সেখানে আর যজমানের চেতনার কী প্রয়োজন ? ॥ ঋগ্বেদ : ৮. ৫৮. ১ ॥

এই ঋকটি বালখিল্য সূক্তের অন্তর্গত। অষ্টম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তকে বালখিল্য সূক্ত বলা হয়। অত্যন্ত অর্বাচীন বলেই এগুলির মূল্য কম—সায়ন এগুলির টীকা দেননি। কিন্তু অমন অর্বাচীন বলেই এর সাক্ষ্য আমাদের বর্তমান যুক্তির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ : এখানে যজমানকে যে-ভাবে যজ্ঞ-ব্যাপারে অজ্ঞ ও সম্বিতহীন বলে কল্পনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে পূর্বোক্ত ঋকগুলির তুলনা করলে বোঝা যায় যে, যজমানের ভূমিকায় ইতিমধ্যে অনেক তফাত হয়ে গিয়েছে।

আলোচ্য ঋকটির ব্যাখ্যায় আধুনিক বেদ-বিদ্ বলছেন, "যৎ কর্মনি ঋত্বিগেব সাবধানোঽস্তি, তত্র যজমানস্য প্রজ্ঞাপাটবেন কিং প্রয়োজনমস্তি ? ন কিঞ্চিৎ অপীতি ভাবঃ"।

সংক্ষেপে : যজমান শব্দের ইতিহাস বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এর থেকে বৈদিক যজ্ঞের ইতিহাস এবং এমনকি বৈদিক মানুষদের সমাজ-ইতিহাসেরও আভাস পাওয়া যেতে পারে। আমরা অনুমান করবার চেষ্টা করেছি, আদিতে যজ্ঞ বলতে যৌথ-অনুষ্ঠান বোঝাতো। যাঁরা যজ্ঞফলাভিলাষী তাঁরা—যজমানেরা—নিজেরাই যজ্ঞ-কর্মে অংশগ্রহণ করতেন। যজমান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে এ-ইংগিত পাওয়া যায় এবং ঋগ্বেদের অংশবিশেষে যজমান শব্দের বাস্তব প্রয়োগ এই ইংগিতটিকেই সমর্থন করে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হলো, যজমান শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ। অতএব এই সাক্ষ্যগুলিকে আমরা বৈদিক মানুষদের সমাজ-জীবনের প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়ের স্মারক বলে সনাক্ত করবার চেষ্টা করেছি। কেননা, প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়ে শ্রম বা উৎপাদন-কর্ম একান্তই যৌথ যদিও অবশ্যই তা জাদু-অনুষ্ঠান বা *ritual*-এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। কালক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য মানবজাতির মতোই বৈদিক মানুষদেরও প্রাক্-বিভক্ত প্রাচীন সমাজ-সংগঠন ভেঙে যায় এবং তারই ফলে যজ্ঞ ও যজমান শব্দের আদি-তাৎপর্যও পরিবর্তিত হয়। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি যজমান বলতে একরকম বিত্তশালী ব্যক্তিকেই বোঝানো হচ্ছে—যজ্ঞ-বিষয়ে তাঁর নিজের কোনো জ্ঞান বা চেতনার প্রয়োজন নেই, কেননা তিনি যজ্ঞে অংশগ্রহণ করবার দায়িত্ব-মুক্ত—তাঁর হয়ে যজ্ঞ করে দেবার জন্য অর্থব্যয় করে পেশাদার পুরোহিত নিয়োগ করেই তিনি ক্ষান্ত।

তাহলে, যজমান শব্দের ইতিহাস থেকেই অনুমান করা যায় যে, বৈদিক যজ্ঞের আদি-তাৎপর্য ও উত্তর-তাৎপর্য অভিন্ন নয়—কেননা, যজ্ঞ বলতে এককালে যৌথ-অনুষ্ঠান বোঝাতো যদিও উত্তরকালে তা বোঝায়নি। কিন্তু অতীতের ওই যৌথ-অনুষ্ঠান ঠিক কিসের উদ্দেশ্যে ছিলো? বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য সাক্ষ্য বিচার করে এবার আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান করবো।

যজুর্বেদ নামটির মধ্যেই একটা অতীতের ইংগিত আছে। যজুঃ + বেদ। যজুঃ = যজ্ + লিট্ উস্—অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছিল (বহুবচনে)।

যজ্ঞানুষ্ঠান—অর্থাৎ, আদি অকৃত্রিম অর্থে যজ্ঞানুষ্ঠান—অতীতের ঘটনা।

অতীতে, ঠিক কিসের উদ্দেশ্যে, যজ্ঞের অনুষ্ঠান? যজুর্বেদেরই একটি শাখার নাম বিশ্লেষণ করলে এ-প্রশ্নের উত্তর—অন্তত উত্তরের ইংগিত—পাওয়া অসম্ভব না হতেও পারে। শাখাটির নাম, বাজসনেয়ী সংহিতা। বাজ মানে অন্ন—ঋগ্বেদে এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার বারবার পাওয়া যায়। বাজম্ অন্নম্ সনোতি বর্ধয়তি ইতি বাজ + সন্ + অচ্ = বাজসন। তস্য কৃতি (তৎকৃত গ্রন্থ) বাজসন + ঞেয় = বাজসনেয় + স্ত্রিয়াং ঙীপ্ = বাজসনেয়ী। অতএব, এই বাজসনেয়ী নামটির মধ্যেই অন্নবর্ধক-কৌশলের—*productive technique*-এর—ইংগিত পাওয়া অসম্ভব নয়।

'যজ্ঞ ভক্ষ্য-অন্নসমেত দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন'

যজ্ঞানুষ্ঠান অতীতের ঘটনা এবং ভক্ষ্য-অন্ন লাভই সে-অনুষ্ঠানের আদি-উদ্দেশ্য। এই বিষয়গুলিরই ইংগিত পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে** বলা হয়েছে :

> যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে, 'আমি তোমাদের অন্ন হইব না,' ইহা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবতারা বলিলেন—না, তুমি আমাদের অন্নই হইবে। দেবতারা তাঁহাকে (যজ্ঞকে) হিংসা করিয়াছিলেন। হিংসিত হইয়াও তিনি দেবগণের (অন্নরূপে) প্রভূত হন নাই। তখন দেবগণ বলিলেন, এইরূপে হিংসিত হইয়াও ইনি যখন আমাদের অন্ন হইলেন না, অহো, তখন আমরা এই (প্রবর্গ) যজ্ঞের সম্ভার (আয়োজন) করিব। তাহাই হউক বলিয়া, তাঁহারা যজ্ঞের সম্ভার করিয়াছিলেন।
>
> সেই যজ্ঞের সম্ভার করিয়া (দেবতারা) বলিলেন, হে অশ্বিদ্বয়, (আমাদের কর্তৃক পীড়িত) এই যজ্ঞের চিকিৎসা কর। (কেননা) অশ্বিদ্বয়ই দেবগণের ভিষক্।

(আবার) অশ্বিদ্বয়ই অধ্বর্যু; সেইজন্য অধ্বর্যুদ্বয় ঘর্মের (প্রবর্গের) সম্ভার (আয়োজন) করেন।

অতীতের সেই হারিয়ে-যাওয়া যজ্ঞকে কী ভাবে পুনর্গঠন করতে হবে, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে এর পর তারই সুদীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই উক্তিগুলির ইংগিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে কয়েকটি বিষয় অনুমান করা সম্ভব।

প্রথমত, ব্রাহ্মণ-বর্ণিত যজ্ঞ অতীতকালের যজ্ঞের বা যজ্ঞের আদিরূপের পুনরুল্লেখ নয়—পুনর্গঠন। আদি যজ্ঞ দেবতাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলো। যজ্ঞ দেবতাদের দ্বারা হিংসিত হয়েছিলো। অশ্বিদয়-দ্বারা হিংসিত যজ্ঞের চিকিৎসা প্রয়োজন হয়েছিলো। এবং পুরাকালের কয়েকটি মন্ত্রকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে সেই আদি-যজ্ঞের বিভিন্ন অবয়ব ও প্রাণ পুনর্গঠন করবার প্রচেষ্টা হয়েছিলো।

দ্বিতীয়ত, পরবর্তী যুগে—ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে—যজ্ঞের উদ্দেশ্য ঠিক কী এ-বিষয়ে আমাদের একটা ধারণা আছে। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা যায়, আদি-পর্যায়েও যজ্ঞের উদ্দেশ্য হুবহু তাই নয়। আদি-পর্যায়ে উদ্দেশ্যটি ঠিক কী? ভক্ষ্য-অন্ন লাভ। কেননা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে "আমি তোমাদের অন্ন হইব না"—ইহা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবতারা বলিলেন, না তুমি আমাদের অন্নই হইবে।

উত্তরকালের যজ্ঞ যে অতীত যজ্ঞের পুনর্গঠনমাত্র—এ-কথা যদি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মাত্র একবার উল্লিখিত হতো, তাহলেও তার সাক্ষ্য নিশ্চয়ই লঘুমূল্য হতো না। কিন্তু বস্তুত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বারবার এই বিষয়টিরই উল্লেখ দেখা যায়।

যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রৈষদ্বারা সেই যজ্ঞকে প্রৈষ (আহ্বান) করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রৈষের প্রৈষত্ব। দেবগণ পুরোরুকসমূহ দ্বারা সেই যজ্ঞকে রুচিসম্পন্ন করিয়াছিলেন;...সেই যজ্ঞকে বেদিতে অনুবেদন (অনুকূলভাবে লাভ) করিয়াছিলেন;...সেই যজ্ঞ বেদিতে লব্ধ হইলে পর উহাকে গ্রহদ্বারা (উপাংশু প্রভৃতি দ্বারা) গ্রহণ করিয়াছিলেন;... তাহাকে লাভ করিয়া নিবিৎসমূহের দ্বারা (দেবতার উদ্দেশ্যে) নিবেদন করিয়াছিলেন...

নষ্ট দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা করিয়া, কেহ বা অধিক পাইতে ইচ্ছা করে, কেহ বা অল্প পাইতে ইচ্ছা করে। উভয়ের মধ্যে যে অধিক পাইতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে ভালো ইচ্ছা করে। সেইরূপ যে-ব্যক্তি এই প্রৈষমন্ত্রসকলকে দীর্ঘ

বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি তাহা ভালো জানে; কেননা এই যে প্রৈষমন্ত্রসকল, এতদ্দ্বারাই নষ্টযজ্ঞের অন্বেষণ হয়।। সেইজন্য (মৈত্রাবরুণ) মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রৈষমন্ত্র পাঠ করিবেন।[৬১]

অবশ্য এখানে নষ্ট যজ্ঞের পুনর্গঠন-পদ্ধতি বর্ণিত হলেও আদিকালে যজ্ঞ যে ভক্ষ্য-অন্ন লাভেরই কৌশল ছিলো—সে-কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। কিন্তু অন্যত্র তা বলা হয়েছে:

একদা যজ্ঞ ভক্ষ্য-অন্নসমেত দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, যজ্ঞ ভক্ষ্য-অন্নসমেত আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এই যজ্ঞের অনুসরণ করিয়া আমরা অন্নেরও অন্বেষণ করিব। তাঁহারা বলিলেন, কিরূপে অন্বেষণ করিব? ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা (অন্বেষণ) করিব। এই বলিয়া তাঁহারা (যজমানরূপী) ব্রাহ্মণকে ছন্দোদ্বারা দীক্ষিত করিয়াছিলেন ও তাঁহার (দীক্ষণীয়েষ্টি) যজ্ঞকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন; অপিচ (দেব-) পত্নীগণেরও সংযাগ করিয়াছিলেন। সেই হেতু এখনও দীক্ষণীয়া ইষ্টিতে যজ্ঞকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয় ও (দেব-) পত্নীগণেরও সংযাগ করা হয়। (দেবগণকৃত) সেই কর্মের অনুসরণ করিয়া মনুষ্যরাও তদ্রূপ করিয়া থাকে।…
এইরূপে উত্তরোত্তর সারবান কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ সেই যজ্ঞকে পাইয়াছিলেন…
সেই যজ্ঞকে পাইয়া দেবগণ বলিলেন, (অহে যজ্ঞ), তুমি আমাদের ভক্ষণীয় অন্নের জন্য অবস্থান কর। যজ্ঞ বলিলেন, না, কেন আমি তোমাদের জন্য অবস্থান করিব? এই বলিয়া যজ্ঞ দেবগণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা সংযুক্ত হইয়া তুমি ভক্ষণীয় অন্নের জন্য অবস্থিতি কর। (যজ্ঞ বলিলেন), তাহাই হইবে। সেইহেতু অদ্যাপি যজ্ঞ ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা সংযুক্ত হইয়া দেবগণের নিকট হব্য বহন করিয়া থাকেন।[৬২]

শুধু তাই নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই এমন ইংগিত পাওয়া অসম্ভব নয় যে, পরবর্তী যুগে পুনর্গঠিত ওই যজ্ঞের সঙ্গে শ্রেণীসমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণীরই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো:

প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; যজ্ঞসৃষ্টির পর ব্রহ্ম ও ক্ষত্রের সৃষ্টি করিলেন ও ব্রহ্মক্ষত্রের পর এই দ্বিবিধ প্রজার সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মের অনুরূপ হুতাদ এবং ক্ষত্রের অনুরূপ অহুতাদ সৃষ্টি করিলেন। এই যে ব্রাহ্মণগণ, ইহারাই হুতাদ (হুতশেষভোজী) প্রজা; আর রাজন্য বৈশ্য ও শূদ্র, ইহারাই অহুতাদ। যজ্ঞ তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল; ব্রহ্ম ও ক্ষত্র যজ্ঞের অনুগমন

করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের যে-সকল আয়ুধ তাহার সহিত ব্রহ্ম ও ক্ষত্রের যে-সকল আয়ুধ তাহার সহিত ক্ষত্র,—তাহার অনুগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞের যে-সকল আয়ুধ তাহাই ব্রহ্মের আয়ুধ; আর অশ্বযুক্ত রথ, কবচ ও বাণযুক্ত ধনু—ইহাই ক্ষত্রের আয়ুধ। ক্ষত্রের আয়ুধে ভয় পাইয়া যজ্ঞ না ফিরিয়া পলাইতে লাগিল; ক্ষত্র তাহাকে ধরিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্ম তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ও তৎপরে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার গতি (পথ) রোধ করিলেন। এইরূপে (পথ) রুদ্ধ হইলে যজ্ঞ দাঁড়াইল এবং ব্রহ্মের নিকট আপনারই আয়ুধসকল দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সেই হেতু অদ্যাপি যজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

তখন ক্ষত্র সেই ব্রহ্মের অনুগমন করিয়া তাহাকে বলিলেন, আমাকে এই যজ্ঞে আহ্বান কর। ব্রহ্ম বলিলেন আচ্ছা, তাহাই হইবে; কিন্তু তুমি আপনার আয়ুধসকল ফেলিয়া দিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ লইয়া ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হও। "তাহাই হউক" বলিয়া ক্ষত্র আপন আয়ুধ ফেলিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেইহেতু অদ্যাপি ক্ষত্রিয় যজমান আপন আয়ুধ ফেলিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হন।[৭৩]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সামাজিক পটভূমিতে কীভাবে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভেদাদি প্রকট হয়ে পড়েছিলো তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যে যজমান যজ্ঞ আরম্ভ করে, সে ব্রাহ্মণেরই শরণ লয়; কেননা যজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ।··· ব্রহ্মের শরণাপন্ন সেই যজমানকে ক্ষত্র হিংসা করিতে পারে না। আর "ব্রহ্ম মা ক্ষত্রাদ্ গোপায়তু" এই মন্ত্রাংশ বলিলে ব্রহ্ম সেই যজমানকে ক্ষত্র হইতে রক্ষা করেন। আর "ব্রহ্মণে স্বাহা" বলিলে ব্রহ্মকে প্রীত করা হয়; ব্রহ্ম প্রীত হইয়া তাহাকে ক্ষত্র হইতে রক্ষা করেন।···[৭৪]

কিংবা

যে ব্যক্তি রাষ্ট্র লাভ করে সে ক্ষত্রের শরণ লয়; রাষ্ট্রই ক্ষত্রস্বরূপ। ক্ষত্রের শরণাপন্ন সেই যজমানকে ব্রহ্ম হিংসা করিতে পারেন না। আর ক্ষত্র তাহাকে ব্রহ্ম হইতে রক্ষা করিবে, এই উদ্দেশে "ক্ষত্রং মা ব্রাহ্মণো গোপায়তু" বলা হয়; আর "ক্ষত্রায় স্বাহা" বলিলে ক্ষত্রকে প্রীত করা হয়; ক্ষত্র প্রীত হইয়া তাহাকে ব্রহ্ম হইতে রক্ষা করেন।···[৭৫]

কিংবা

ব্রহ্ম ক্ষত্রের পূর্ববর্তী; ব্রহ্ম পূর্ববর্তী থাকিলে ক্ষত্রিয় যজমানের রাষ্ট্রও উগ্র হইয়া অন্যের নিকট ব্যথা পায় না।···[৭৬]

কিংবা

> ক্ষত্র নিশ্চয়ই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মও ক্ষত্রে প্রতিষ্ঠিত…[৬৭]

কিংবা

> ব্রহ্ম ক্ষত্রের পূর্ববর্তী; ব্রহ্ম পূর্বে থাকিলে যজমানের রাষ্ট্র উগ্র হইবে না এবং অপরের নিকট ব্যথা পাইবে না। সপ্তদশ স্তোম বৈশ্যস্বরূপ এবং একবিংশ স্তোম শূদ্রবর্ণের অনুরূপ। এতদ্বারা বৈশ্যকে ও শূদ্রবর্ণকে ক্ষত্রিয়ের বর্ত্মানুগামী করা হয়।…[৬৮]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যুগে যে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ঘটেছিলো, এ-বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা অবশ্যই নিঃসন্দেহ, যদিও সেগুলি খণ্ড ও সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রমাত্র। অধ্যাপক কীথ্[৬৯] যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রাজনৈতিক পটভূমি প্রসঙ্গে বলছেন,

> The political references do not hint at any great kingdoms, but at a large number of petty princes, who, despite their titles and claims to sovereignty, were doubtless rulers of limited portions of territory.

কিন্তু এই রাষ্ট্রশক্তি যে প্রাক্-বিভক্ত প্রাচীন সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপরই আবির্ভূত হয়, সে-বিষয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা সচেতন হতে চান না বলেই ঋগ্বেদের সমাজ থেকে—ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশে যে সাম্যজীবনের আভাস পাওয়া যায় তা থেকে—এই ব্রাহ্মণ-বর্ণিত রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব কাহিনী আজো আমাদের কাছে অস্পষ্ট। আর এই কারণেই অস্পষ্ট হয়ে থেকেছে বৈদিক যজ্ঞের ইতিহাসটুকুও।

আমাদের যুক্তি অনুসারে, বৈদিক সমাজে রাষ্ট্রশক্তির এই আবির্ভাব এবং বৈদিক যজ্ঞের উপরোক্ত রূপান্তর, উভয়ই হলো বৈদিক মানুষদের জীবনে একটি মূল পরিবর্তনের দ্বিবিধ পরিণাম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচনাকালে এই মূল পরিবর্তনটি প্রকট হয়েছিলো, কেননা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা ওই দ্বিবিধ পরিণামেরই সুস্পষ্ট পরিচয় পাই।

ঋগ্বেদের সাক্ষ্য অনুসারে অনুমান করা যায়, অতীতে বৈদিক মানুষেরাও সমাজ-বিকাশের প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়ে—আদিম সাম্যাবস্থায়—জীবন-যাপন করতেন। তখনো তাঁরা লেখার হরফ আবিষ্কার করেননি; মুখেমুখে গান রচনা করতেন। পার্থিব সুখ-সম্পদের কামনাই সে-গানের প্রাণবস্তু। এ-সম্পদ কিন্তু একার জন্য নয়—সকলের জন্য, সমষ্টির জন্য : 'আমার' নিজের জন্য চাওয়া

নয়, 'আমাদের' সকলের জন্য চাওয়া। এবং এ-সম্পদ কারুর একার নয় বলেই তাতে সকলের সমান অধিকার—সমান অংশ, সমান ভাগ, সমান ভগ। অতএব এ-পর্যায়ে সমবণ্টন বা অংশবণ্টনের প্রসঙ্গও স্বাভাবিক। কোথাও কোথাও দেখা যায় মানুষেরা নিজেরাই অংশবণ্টনের কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন; কিন্তু প্রধানত দেবতাদের উপরই তার দায়িত্ব ছিলো। কিন্তু বৈদিক দেবতাদের তখনো আধুনিক আধ্যাত্মিক অর্থে দেবত্বপ্রাপ্তি ঘটেনি। তাই প্রায়ই তাঁদের 'সখা' বলে এবং কখনো বা 'নরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং আদিম সাম্যসমাজের পরিচায়ক হিসেবে শুধুই যে ঋগ্বেদের মানুষেরাই পরস্পরের সঙ্গে সমান তাই নয়, দেবতারাও পরস্পরের সঙ্গে সমান; এমনকি অতীতে দেবতারাও যে মানুষের সঙ্গে সমান ছিলেন বা মানুষেরাও দেবতাদের সঙ্গে সমান হয়েছিলেন—তার স্মৃতিটুকুও ঋগ্বেদ থেকে বিলুপ্ত হয়নি। স্বভাবতই, দেবতারাও মানুষের মতো সচেতনভাবে একত্র তাঁদের ভাগ গ্রহণ করতেন এবং সভায় গমন করতেন।

অন্যান্য প্রাচীন সমাজের মতোই বৈদিক সমাজের প্রাচীন পর্যায়েও সমবণ্টনের কৌশল হিসেবে অক্ষের ব্যবহার হতো কিনা তা ভেবে দেখবার অবকাশ আছে। হয়তো বৈদিক সভাতে এই কৌশলে অংশ-বণ্টন হতো বলেই সভাস্থান এবং দ্যূতগৃহ অনেকাংশেই অভিন্ন ছিলো। এই কারণেই অক্ষকে মহৎগণের সেনানী এবং ব্রাতর রাজা বলে কল্পনা করা হয়েছিলো কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই সভা বা বিদথই ছিলো ধন-বিভাগ বা অংশ-বণ্টনের স্থান।

অতএব, ঋগ্বেদের অন্তত প্রাচীনতর অংশগুলিতে রাষ্ট্রশাসনের উল্লেখ অস্বাভাবিক হবে। এবং সে-উল্লেখ দেখা যায় না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, সে-পর্যায়ে বৈদিক সমাজের শাসন পরিচালনের কাজ কী ভাবে চলতো? ট্রাইব্যাল সমাজে যে-ভাবে চলে—অর্থাৎ, সভা-সমিতির উপর নির্ভর করেই। এইদিক থেকেই আমরা ঋগ্বেদে সভা, সমিতি ও বিদথের অমন অসামান্য গৌরবকে বোঝবার চেষ্টা করেছি। ঋগ্বেদোত্তর সাহিত্যে সভা, সমিতি ও বিদথের এই অতীত গৌরব ম্লান হয়েছে এবং মহাভারতাদিতে তা বিলুপ্ত হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়, সভা-সমিতির মহিমার পরিবর্তে জেগে উঠছে ব্রহ্ম-সমর্থিত ও ক্ষত্র-শাসিত রাষ্ট্রশক্তির মহিমা। এ-রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো কী করে? ঐতিহাসিক বিবর্তনের সাধারণ নিয়ম হিসেবে আমরা জানি, জ্ঞাতিভিত্তিক প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপরই রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়:

> ...the state was built on the ruins of the gentile constitution.[৭৭]

বৈদিক মানুষদেরও প্রাক্-বিভক্ত প্রাচীন জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজ কালক্রমে ভেঙে গিয়েছিলো এবং তারই ধ্বংসস্তূপের উপর আবির্ভূত হয়েছিলো শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরিভাষায় নবপর্যায়ের শাসক-শ্রেণী বলতে প্রধানতই ক্ষত্র এবং শাসন-যন্ত্রের নাম রাষ্ট্র—যদিও ওই ক্ষত্র ব্রহ্ম-সমর্থিত বা ব্রাহ্মণ-সমর্থিত।

আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, বৈদিক মানুষদের জীবনে এই মৌলিক পরিবর্তনটিরই আর-এক পরিণাম হলো বৈদিক যজ্ঞের রূপান্তর। সে-রূপান্তরের মূল কথা কী? সংক্ষেপে: অতীতে অনুষ্ঠান-নির্ভরতা (ritual) সত্ত্বেও যা ছিলো লোকায়তিক কামনা-চরিতার্থতার—অন্ন-লাভের—যৌথ পদ্ধতি, কালক্রমে তা শুধুই যে লোকোত্তরের কল্পনায় অনুষ্ঠান-মাত্রে পরিণত হলো তাই নয়, সামগ্রিক স্বার্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে নিযুক্ত বলেও কল্পিত হলো।

অতীতে কী রকম ছিলো? ধনী যজমানের পক্ষে অর্থব্যয় করে ঋত্বিক নিয়োগের পরিচয় নেই; তার বদলে যজমান নিজেই যজ্ঞকর্মে অংশগ্রহণ করতেন। যজমান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই তার একমাত্র প্রমাণ নয়; ঋগ্বেদে দেখা যায় সোমসবন, হবিপ্রদান প্রভৃতি ঋত্বিক-কর্ম যজমান স্বয়ংই সম্পাদন করছেন। আরো উল্লেখযোগ্য হলো, যজমান বলতে ব্যক্তিবিশেষ নন—অনেকে; তাই 'যজমানগণ'। কিন্তু ঋগ্বেদের সাক্ষ্য অনুসারেই দেখা যায়, যজমানের সঙ্গে হোতা, ঋত্বিক প্রভৃতির পার্থক্য ক্রমশই ফুটে উঠছে। তখনো কিন্তু অসি-ক্নীতীরে যজমান এবং হোতার মধ্যে প্রভেদ ফুটে ওঠেনি: অসিক্নীতীরে যজমানই যেন হোতা। ঋগ্বেদের অর্বাচীনতম অংশে আমরা দেখছি, যজ্ঞ কর্মের সঙ্গে এবং যজ্ঞকর্ম-সম্পর্কিত জ্ঞানের সঙ্গে যজমানের কোনো সম্পর্কই নেই: সমস্ত যজ্ঞকর্মই যখন ঋত্বিকের উপর নির্ভরশীল তখন আর যজমানের পক্ষে চৈতন্যের প্রয়োজন কী? এর সঙ্গে প্রাচীনকালের সোমসবনকারী যজমান-গণের তুলনা করলে বৈদিক যজ্ঞে কতোখানি রূপান্তর ঘটেছিলো তার আভাস পাওয়া যেতে পারে।

অতএব, অনুমিত হয় উত্তরকালে যজ্ঞের যাই পরিণতি হোক না কেন, অতীতে তা যৌথ কর্মপদ্ধতিই ছিলো।

কিন্তু সেই যৌথ-কর্মপদ্ধতির উদ্দেশ্য তখন কী? লোকোত্তর নয়; লোকায়তিক। অন্নলাভ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তার ইংগিত অস্পষ্ট নয়। "যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে 'আমি তোমাদের অন্ন হইব না', ইহা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন"। "একদা যজ্ঞ ভক্ষ্য-অন্নসমেত দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, যজ্ঞ ভক্ষ্য-অন্নসমেত আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এই যজ্ঞের অনুসরণ করিয়া আমরা অন্নেরও অনুসরণ করিব"।

যা চলে গেলে ভক্ষ্য-অন্নও চলে যায়, যাকে অনুসরণ করলে ভক্ষ্য-অন্নেরও অনু-সরণ করা হয় তাকে অন্নলাভের পদ্ধতি বা উপায় হিসেবেই চেনবার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। অতএব আমরা যজ্ঞের আদিরূপকে অন্ন-লাভের যৌথ কৌশল বা প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজের যৌথ উৎপাদন-কৌশল বলেই গ্রহণ করতে চেয়েছি, যদিও কালক্রমে তা লোকোত্তরের মোহে এবং ব্যষ্টি-স্বার্থে নিযুক্ত হতে দেখা যায়। স্বভাবতই, আমাদের যুক্তি অনুসারে বৈদিক মানুষদের প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজ ভেঙে শ্রেণীসমাজের আবির্ভাবই এ-পরিবর্তনের মূল কারণ বলে প্রতীত হয়েছে।

ঋগ্বেদে ব্যষ্টিস্বার্থের আবির্ভাব

ঋগ্বেদের রচনাকাল অত্যন্ত সুদীর্ঘ এবং এ-কথা মনে করবার নিশ্চয়ই কোনো কারণ নেই যে, এই সুদীর্ঘ যুগ ধরে বৈদিক মানুষদের সমাজ-জীবন অপরিবর্তিত ছিলো। ঋগ্বেদ সংহিতায় কী ভাবে প্রাচীন সাম্য-সমাজের স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাওয়া সম্ভব তার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি; এবার সে-সমাজে ভাঙন ধরবার আভাস ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যেই কী ভাবে দেখতে পাওয়া যায় তার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করবো।

ঋষভং মা সমানানং সপত্নানাং বিষাসহিম্।
হন্তারং শত্রূণাং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাম্॥
অর্থাৎ,
—(হে ইন্দ্র,) আমাকে সমানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর, শত্রুদিগের পরাজয়িতা কর, শত্রুদিগের হন্তা এবং গরুদিগের মধ্যে গোপতি কর॥ ঋগ্বেদ : ১০.১৬৬.১॥

অভিভূরহমাগমং বিশ্বকর্মেন ধাম্না।
আ বশ্চিত্তমা বোব্রতমা বোঽহং সমিতিং দদে॥
অর্থাৎ,
আমি সর্বকর্মকারী শক্তির দ্বারা তোমাদিগকে (শত্রুদিগকে) অভিভূত করিতে আসিয়াছি; তোমাদের সমস্ত চিত্ত, কর্ম এবং সমিতিকে আমি অপহরণ করিলাম॥ ঋগ্বেদ : ১০.১৬৬.৪॥

যোগক্ষেমং ব আদায়াহং ভূয়াসমুত্তম আ বো মূর্ধানমক্রমীম্॥
অধস্পদান্ম উদ্বদত মণ্ডূকাইবোদকান্মণ্ডূকা উদকাদিব॥

অর্থাৎ,

—তোমাদিগের (সপত্নদিগের) প্রাপ্ত ধনের অধিকারী হইয়া এবং আত্মসাৎ করিয়া আমি শ্রেষ্ঠ হইয়াছি এবং তোমাদের মস্তকে উঠিয়াছি; পদতল হইতে তোমরা চিৎকার করিতেছ, ভেকের ন্যায়।। ঋগ্বেদ : ১০.১৬৬.৫ ।।

এখানে শুধুই যে শত্রুদের পদদলিত করবার কামনা ফুটে উঠেছে তাই নয়,—'আমাদের' কথাকে পদদলিত করে 'আমাকে', সামগ্রিক স্বার্থকে ধূলিসাৎ করে, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খাকে চূড়ান্ত মর্যাদা দেওয়ার পরিচয়ও অস্পষ্ট নয়। কেননা, শত্রুজয় এবং শত্রুধন অপহরণ করবার প্রসঙ্গ ঋগ্বেদে বিরল নয়; কিন্তু, আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, যেখানে প্রাচীন পর্যায়ের সমান-জীবনের স্মৃতি ম্লান হয়নি সেখানে ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে, অগ্নিকে উদ্দেশ্য করে সেই জিত-ধনের অংশ বণ্টন করে দেবার কামনাই জানানো হয়েছে।

শুনঃশেপ-এর কাহিনী

সংহিতার পর ব্রাহ্মণ। ঋগ্বেদের প্রধান ব্রাহ্মণ বলতে ঐতরেয়। রচনাকালের দিক থেকে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলই সবচেয়ে অর্বাচীন। তাই এই দশম মণ্ডলের রচনাকালের সঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচনাকালের খুব বেশি ব্যবধান থাকার কথা নয়।

স্বভাবতই, বৈদিক সমাজে যে-পরিবর্তনের ফলে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে আমরা ওইভাবে প্রাচীন সমষ্টিজীবনকে ব্যক্তিস্বার্থের নিচে অবদলিত হতে দেখি, তারই অনুবৃত্তি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শ্রেণীবিভাগ-আবির্ভাবের বিভীষিকাকে আরো প্রকট করে তুলেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ[১১] থেকে শুনঃশেপ-এর কাহিনী উদ্ধৃত করবো।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের ছেলে হয়নি। বরুণের কাছে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, 'আমার পুত্র হউক, তদ্দারা তোমার যাগ করিব'। বরুণ বললেন, তাই হোক। তখন তাঁর রোহিত নামে পুত্র জন্মালো! বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে বললেন, 'তাহলে তুমি এই পুত্র দিয়ে আমার যাগ করো'। হরিশ্চন্দ্র সময় নিতে লাগলেন: ছেলে একটু বড়ো হোক, ইত্যাদি। সন্নাহ-প্রাপ্তি (ধনুর্বান, কবচাদি ধারণ) হবার পর রোহিত অরণ্যে প্রস্থান করলেন এবং অরণ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে চেপে ধরলেন;

হরিশ্চন্দ্রের উদরী রোগ উৎপন্ন হলো। রোহিত ষট্ সংবৎসর অরণ্যে বিচরণ করলেন।

> এবং সূয়বসের পুত্র ক্ষুধাপীড়িত অজীগর্তকে দেখিতে পাইলেন। এই অজীগর্তের শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ শুনোলাঙ্গুল নামে তিন পুত্র ছিল। তিনি সেই অজীগর্তকে বলিলেন, অহে ঋষি, তোমাকে একশত (গাভী) দিতেছি, আমি ইহাদের (তোমার পুত্রদের) মধ্যে একজনকে নিষ্ক্রয়রূপে দিয়া আপনাকে মুক্ত করিব। তখন অজীগর্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, আমি ইহাকে কিছুতেই দিব না। মাতা (অজীগর্তের পত্নী) কনিষ্ঠকে (টানিয়া লইয়া) বলিলেন, আমি ইহাকে দিব না। তাঁহারা উভয়ে মধ্যম শুনঃশেপকে দান করিলেন! তখন অজীগর্তকে একশত (গাভী) দিয়া তিনি সেই শুনঃশেপকে লইয়া অরণ্য হইতে গ্রামে আসিলেন। (তদনন্তর) তিনি পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, অহো, আমি এই ব্যক্তিকে নিষ্ক্রয় (মূল্য) স্বরূপ দিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চাহি। তখন হরিশ্চন্দ্র রাজা বরুণকে বলিলেন, আমি এই ব্যক্তিদ্বারা তোমার যাগ করিব। বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা অধিক আদরণীয়। এই বলিয়া তাঁহাকে রাজসূয় নামক যজ্ঞক্রতু অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। হরিশ্চন্দ্রও রাজসূয়ের অভিষেক অনুষ্ঠানের দিনে শুনঃশেপকে পুরুষ (মনুষ্য) পশুরূপে নির্দেশ করিলেন।
>
> সেই হরিশ্চন্দ্রের (রাজসূয় যাগে) বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা ও অয়াস্য উদ্গাতা হইয়াছিলেন ; পশুর উপকরণের পর নিযোক্তা (যূপে বন্ধনকর্তা) পাওয়া গেল না। সেই সূয়বসের পুত্র অজীগর্ত বলিলেন, আমাকে আর একশত (গাভী) দাও, আমি ইহাকে নিয়োজন (যূপে বন্ধন) করিব। তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে আর একশত গাভী দিলেন ; তিনিও নিয়োজন করিলেন।
>
> উপকরণ ও নিয়োজনের পর আপ্রীমন্ত্র পঠিত ও পর্যাগ্নিকরণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে বিশসন (বধ) কর্মের জন্য কাহাকেও পাওয়া গেল না। তখন অজীগর্ত বলিলেন, আমাকে আর একশত (গাভী) দাও, আমি ইহার বিশসন (বধ) করিব। তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে আর একশত (গাভী) দিলেন। তখন তিনি অসি (খড়্গ) শানাইয়া (তীক্ষ্ণ করিয়া) উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রতিফলিত বৈদিক সমাজের একটা ছবি এখানে পাওয়া

যাচ্ছে : ক্ষুধাপীড়িত পিতা একশত গাভীর বিনিময়ে পুত্রকে বিকিয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, আরো একশত গাভীর লোভে পুত্রকে যূপে বদ্ধ করতে অগ্রসর হচ্ছে। আরো একশত গাভীর প্রলোভনে খড়্গ শানিয়ে স্বয়ং পুত্রকে বধ করতে উদ্যত হচ্ছে।

এর পাশে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের সেই ধুয়াটি মনে রাখা যায় : বৃহৎ বদেম বিদথে সুবীরাঃ—আমরা সভায় উচ্চকণ্ঠে বীর পুত্রের কামনা জানাই। ব্রাহ্মণ সাহিত্য যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদেরই পূর্বপুরুষদের কাছে এইটিই ছিলো একটি প্রধানতম কামনা। কিন্তু ইতিমধ্যে বৈদিক মানুষদের সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সে পরিবর্তনের দরুন বৈদিক মানুষদের চিন্তা-চেতনাও অনেকখানি রূপান্তররিত হয়েছে। এখানে তার সামান্য আলোচনা তুলবো।

বরুণের ইতিবৃত্ত : দেবতার রূপান্তর

প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর শ্রেণীসমাজের আবির্ভাব-প্রসঙ্গে এঙ্গেলস্[১২] বলছেন, the greed for wealth divided the members of the gentes···

লোভ। বৈদিক সাহিত্যে দেখতে পাই সমাজে এই লোভ যতোই সর্বশক্তি হয়ে উঠছে ততোই পরিবর্তন ঘটছে বৈদিক দেবতার চরিত্রেও। ওই লোভই হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেবচরিত্রের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বরুণের কী রকম পরিণতি ও রূপান্তর ঘটেছে শুনঃশেপের কাহিনী অবলম্বন করেই তা দেখা যাক।

> হরিশ্চন্দ্র বরুণ রাজাকে প্রার্থনা করিলেন, আমার পুত্র হউক, তদ্দ্বারা তোমার যাগ করিব। (বরুণ বলিলেন) তাহাই হউক। তখন উহার রোহিত নামের পুত্র জন্মিল। তখন বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, তদ্দ্বারা আমার যাগ কর। তিনি তখন বলিলেন, (জন্মের পর অশৌচকালে) দশ দিন গত না হইলে পশু মেধ্য (যাগযোগ্য) হয় না; ইহার দশদিন উত্তীর্ণ হোক, তখন তোমার যাগ করিব। বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক।
> পরে দশদিন উত্তীর্ণ হইলে বরুণ বলিলেন, দশ দিন উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখন এতদ্দ্বারা আমার যাগ কর। তিনি বলিলেন, যখন পশুর দাঁত ওঠে, তখন সে মেধ্য হয়; ইহার দাঁত বাহির হউক, তখন তোমার যাগ করিব। বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক।

> পরে তাহার দাঁত উঠিলে বরুণ বলিলেন, ইহার দাঁত উঠিয়াছে, এখন এতদ্বারা আমার যাগ কর। তিনি বলিলেন, পশুর দাঁত যখন পড়িয়া যায় তখন সে মেধ্য হয়; ইহার দাঁত পড়ুক, তখন তোমার যাগ করিব। বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক।
>
> পরে তাহার দাঁত পড়িলে বরুণ বলিলেন, ইহার দাঁত পড়িয়াছে, এখন এতদ্বারা যাগ কর। তিনি বলিলেন, পশুর দাঁত যখন আবার জন্মে, তখন সে মেধ্য হয়; ইহার দাঁত আবার উঠুক, তখন তোমার যাগ করিব। বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক।
>
> পরে তাহার দাঁত আবার উঠিলে বরুণ বলিলেন, ইহার দাঁত আবার উঠিয়াছে, এখন এতদ্বারা আমার যাগ কর। তিনি বলিলেন, ক্ষত্রিয় যখন সন্নাহ (ধনুর্বাণ কবচাদি) ধারণে সমর্থ হয়, তখন সে মেধ্য হয়। এ সন্নাহ প্রাপ্ত হইলে তোমার যাগ করিব। বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক।
>
> পরে সেই (বালক) সন্নাহ প্রাপ্ত হইলে বরুণ বলিলেন, এ সন্নাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন এতদ্বারা আমার যাগ কর। তাহাই হউক বলিয়া হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন; হায়, তোমাদ্বারা আমাকে ইহার যাগ করিতে হইবে। তাহা হইবে না, এই বলিয়া সেই রোহিত ধনু গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন ও সংবৎসর ধরিয়া অরণ্যে বিচরণ করিলেন।
>
> তখন বরুণ ইক্ষ্বাকুবংশধরকে চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার উদরী রোগ উৎপন্ন হইল……[৭৩]

আমরা আমাদের জীবনে একধরনের মানুষকে পাওনা-আদায়ের জন্যে এইভাবেই হানা দিতে দেখেছি; চলতি কথায় তাদের বলি কাবুলিওয়ালা। ইংরেজী সাহিত্যে আমরা এই রকমেরই একটি চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি; তার নাম সাইলক। আর, আমরা বরুণকে দেখেছি ঋগ্বেদে—সে-বরুণ কিন্তু এ-বরুণ নয়। সে-বরুণ মানুষকে শুধু দিচ্ছেন, মানুষের কাছ থেকে পাওনা-আদায়ের জন্যে তাঁকে হানা দিতে দেখা যায়নি।

ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে প্রতিবিম্বিত সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে প্রতিবিম্বিত সমাজের যে কতোখানি পার্থক্য, তা বরুণের রূপান্তর থেকেই অনুমান করা অসম্ভব নয়। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের বরুণের ওই কাবুলিওয়ালা-রূপটিকে আমরা দেখলাম; এবার ঋগ্বেদের বরুণকে দেখা যাক।

মিত্র ও বরুণ সুমধুর বারি বর্ষণ করেন (৫. ৬৩. ১), বৃষ্টিরূপ ধন ও অমরত্ব দান করেন (৫. ৬৩. ২), মেঘ ও বৃষ্টি দ্বারা অন্তরীক্ষে সূর্যের রক্ষা বিধান করেন (৫. ৬৩. ৪), মেঘকে অন্নসাধক প্রভাব্যঞ্জক বিচিত্র গর্জনধ্বনিতে মুখর করে তোলেন (৫. ৬৩. ৬), উপকারক-দ্বারা যজ্ঞ রক্ষা করেন এবং পূজনীয় রথের ন্যায় সূর্যকে অন্তরীক্ষে ধারণ করেন (৫. ৬৩. ৭)। মিত্র ও বরুণের বাঞ্ছিত প্রদত্ত সুখ সকল স্থানেই ব্যাপ্ত আছে (৫. ৬৪. ২); তাঁহারা

অন্ন, ধন ও কল্যাণবিষয়ে যজমানদের প্রতি বিশেষরূপে বদান্য হন (৫. ৬৪. ৬)—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইরাবতীর্বরুণ ধেনবো বাং মধুমদ্বাং সিন্ধবো মিত্র দুহ্রে।
ত্রয়স্তস্থুর্বৃষভাসস্তিসৃণাং ধিষণানাং রেতোধা বি দ্যুমন্তঃ॥
অর্থাৎ,
—হে বরুণ, হে মিত্র, তোমাদের দ্বারা ধেনুগুলি দুগ্ধবতী, নদীগুলি মধুক্ষরা; (তোমাদের আজ্ঞায়) রেতযুক্ত তিনটি কামবর্ষী স্থান বিশেষরূপে দীপ্তিযুক্ত হইয়াছে॥ ঋগ্বেদ: ৫. ৬৯. ২॥

বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপেষস্পতী দানুমত্যাঃ।
বৃহন্তং গর্তমাশাতে॥
অর্থাৎ,
—বৃষ্টিকারী যে গতিযুক্ত দ্যুলোক, হে অন্নের পতি, তোমাদের (মিত্র ও বরুণ) দানশীলতার জন্যই তাহা শ্রেষ্ঠ; তোমরা মহৎ গর্তকে আশ্রয় কর॥ ৫. ৬৮. ৫॥

আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্।
মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ॥
অর্থাৎ,
—হে মিত্রাবরুণ, তোমরা আমাদের গোশালাটিকে ঘৃতসিক্ত কর, আমাদের বাসস্থানগুলিকে মধুসিক্ত কর, হে শোভনকর্মদ্বয়॥ ঋগ্বেদ: ৩. ৬২. ১৬॥

সং যা দানূনি যেমথুর্দিব্যাঃ পার্থিবীরিষঃ।
নভস্বতীরা বাং চরন্তু বৃষ্টয়ঃ॥
অর্থাৎ,
—হে মিত্রাবরুণ, তোমরা আমাদিগের দানের উপযোগী ধন এবং পার্থিব অন্ন আমাদিগের মধ্যে দান কর; তোমাদিগের জলযুক্ত বৃষ্টি (আমাদিগের মধ্যে) সঞ্চরণ করুক॥ ঋগ্বেদ: ৮. ২৫. ৬॥

ঋগ্বেদের এই দাতা বরুণটিরই প্রেতের মতো, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উত্তমর্ণ বরুণটি পাওনা-আদায়ের জন্যে বারবার হানা দিচ্ছে! ঋগ্বেদে আর যাই হোক আদায়ের ফিকিরে বরুণ বিভীষিকা সৃষ্টি করছেন—একথা কল্পনা করা যায় না।

শুধু তাই নয়, ঋগ্বেদে দেখি বরুণের সঙ্গে যজমানদের একটা রীতিমতো বন্ধু-সম্পর্ক। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনাল্ড[১৪] বলছেন,

> Varuna is on a footing of friendship with his worshipper who communes with him in his celestial abode and sometimes sees him with the mental eye.
>
> য আপির্নিত্যো বরুণ প্রিয়ঃ সন্ত্বামাগাংসি কৃণবৎসখা তে।
> মা ত এনস্বন্তো যক্ষিন্ ভুজেম যন্ধি ষ্মা বিপ্রঃ স্তবতে বরূথম ॥
> অর্থাৎ,
> —হে বরুণ, যে তোমার সমীপে পাপ করিয়াছিল, সে এখন তোমার প্রিয় ও নিত্যবন্ধু ; তোমার আত্মীয়স্থানীয় আমরা যেন পাপযুক্ত না হই, আমরা যেন ভোগ করিতে পারি, বিপ্ররূপ তুমি স্তুতিকারীকে অনিষ্টনিবারক গৃহ প্রদান কর ॥
> ঋগ্বেদ : ৭. ৮৮. ৬ ॥

কিন্তু ঋগ্বেদে বরুণের চরিত্রে যেটা সবচেয়ে মহান দিক তা হলো তাঁর নৈতিক গৌরব। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোন্যাল বলছেন,

> The anthropomorphism of Varuna's personality is more fully developed on the moral than the physical side. The descriptions of his person and his equipment are scanty, more stress being laid on his personality......
> The spies (স্পশঃ) of Varuna are sometimes mentioned. They sit down around him (1. 24. 13). They behold the two worlds; acquainted with sacrifice they stimulate prayer (7. 87. 3)......
> In marked contrast with Indra, Varuna has no myths related of him, while much is said about him (and Mitra) as upholder of physical and moral order......They are the guardians of the whole world (2. 27. 4).......The order (ঋত) of Mitra and Varuna is established where the steeds of the sun are loosed (5. 62. 1.)......[৭৫]
> As a moral governor Varuna stands far above any other deity. His wrath is roused by sin, the infringement of his ordinances, which he severely punishes (7. 86. 3-4). The fetters (পাশাঃ) with which he binds sinners, are often mentioned (1. 24. 15, etc). They are cast sevenfold and threefold, ensnaring the man who tells lies, passing by him who speaks truth (A. V. 4. 16. 6.). Mitra and Varuna are barriers, furnished with many fetters, against falsehood (7. 65. 3)......Together with Mitra, Varuna is said to be a dispeller, hater and punisher of

falsehood (1. 151. 2, etc)......On the other hand, Varuna is gracious to the penitent. He unties like a rope and removes sin (2. 28. 5; 5. 85. 7-8). He releases not only from the sins which men themselves commit, but from those committed by their fathers (7. 86. 5)......[১৬]

বরুণের এই নৈতিক গৌরব প্রসঙ্গে অধ্যাপক কীথ্[১৭] বলছেন,

But more important than these physical attributes of the god are his moral qualities, his control of the order of the world in its ethical aspect no less than in its physical, his connexion with the worshipper as the saviour in time of peril and distress, the freer from sin, the merciful god, as well as the punisher of the sinner.

ঋগ্বেদে বরুণের যে-পরিচয় তার মধ্যে এই নৈতিক গৌরবের দিকটির কথাই আমাদের পক্ষে বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন; কেননা, অধ্যাপক কীথ্[১৮] যেমন বলছেন,

it is essential to note that this side of Varuna's nature is one which steadily disappears in the later texts...

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের পাওনা-আদায়কারী কাবুলিওয়ালা বরুণটির পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি; এবং উত্তরযুগের সাহিত্যে বরুণ যে কী বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তার পরিচয় অধ্যাপক কীথ্কে অনুসরণ করেই আমরা একটু পরে আরো স্পষ্টভাবে দেখতে পাবো। এই চারিত্রিক পরিবর্তন যে কতোখানি মৌলিক তা হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে আমাদের পক্ষে ঋগ্বেদ বর্ণিত বরুণের নৈতিক ঐশ্বর্যের কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার।

ঋগ্বেদে দেখা যায় নৈতিক নিয়মের চূড়ান্ত দায়িত্ব বরুণেরই উপর।

পরি স্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টা উভে পশ্যন্তি রোদসী সুমেকে।
ঋতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো য ইষয়ন্ত মন্ম॥

অর্থাৎ,
—বরুণের অনুচরগণ মঙ্গল-উদ্দেশ্যে স্বর্গ ও পৃথিবী পরিদর্শন করে, তাঁহারই ভয়ে ঋতযুক্ত, ক্রান্তদর্শী যজ্ঞধীর বিজ্ঞগণ তাঁহার উদ্দেশ্যে স্তুতি প্রেরণ করেন॥
ঋগ্বেদ: ৭, ৮৭, ৩॥

ঋগ্বেদে দেখা যায় অনৃত বা মিথ্যার বিরুদ্ধে বরুণের কঠোর বিধান।

> যুবং বস্ত্রাণি পীবসা বসাথে যুবোরচ্ছিদ্রা মন্তবো হ সর্গাঃ।
> অবাতিরতমনৃতানি বিশ্ব ঋতেন বিশ্ব ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে॥
> অর্থাৎ,
> —হে মিত্রাবরুণ, তোমরা স্থূল বস্ত্রদ্বারা আচ্ছন্ন কর; তোমাদের সৃষ্টি ছিদ্রহীন ও মননযুক্ত; (তোমরা) অনৃতকে ধ্বংস করিয়াছিলে এবং বিশ্বকে ঋতের সহিত যুক্ত করিয়াছিলে॥ ১. ১৫২. ১॥

> ইমে চেতারো অনৃতস্য ভূরের্মিত্রো অর্যমা বরুণো হি সন্তি।
> ইম ঋতস্য বাবৃধুর্দুরোণে শগ্মাসঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধাঃ॥
> অর্থাৎ,
> —মিত্র, অর্যমা ও বরুণ—ইহারা প্রভূত অনৃতের হন্তা; অদিতির অহিংসিত সুখকর পুত্রগণ গৃহে ঋতকে বর্ধিত করিয়াছিলেন॥ ঋগ্বেদ: ৭. ৬০. ৫॥

বরুণ শুধু অনৃত-হন্তা নন, ঋতের পালক, ঋতের বর্ধক। বস্তুত, ঋতের সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্কের দিক থেকেই বরুণের নৈতিক গৌরবের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। ঋতের কথা আমরা একটু পরেই তুলবো। তার আগে, এখানে, অধ্যাপক রথ্-এর একটি মতবাদ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

অধ্যাপক রথ্[৭৯] অনুমান করছেন যে, ঋগ্বেদ রচিত হবার যুগেই বৈদিক কবিদের কল্পনায় ইন্দ্রের গৌরব বরুণের চেয়ে অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ আগে বরুণই ছিলেন বৈদিক মানুষদের প্রধানতম দেবতা এবং তাঁরই গৌরব সর্বাধিক। যতোই দিন গিয়েছে ততোই বরুণের গৌরব ম্লান হয়েছে এবং তারই জায়গায় ইন্দ্রের গৌরব চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে—এ-পরিবর্তন ঋগ্বেদ রচিত হবার সুদীর্ঘ যুগটির মধ্যেই সাধিত হয়েছে। এই মতের পক্ষে একটি প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়েছে যে, ঋগ্বেদের সবচেয়ে অর্বাচীন অংশে—দশম মণ্ডলে—বরুণের গৌরব-বর্ণনায় একটিও সূক্ত নেই; অপরপক্ষে পঁয়তাল্লিশটি সূক্ত ইন্দ্রের মহিমায় মুখর। কিন্তু অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোন্যাল[৮০] বলছেন, সূক্তসংখ্যা-নির্ভর এ-জাতীয় যুক্তির মূল্য খুব বেশি নয়। কেননা সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদে বরুণের তুলনায় ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত সূক্ত অনেক বেশি: তৃতীয় মণ্ডলেও বরুণের উদ্দেশ্যে কোনো সূক্ত নেই, কিন্তু ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বাইশটি সূক্ত আছে; দ্বিতীয় মণ্ডলে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে তেইশটি সূক্ত, তুলনায় বরুণের উদ্দেশ্যে মাত্র একটি।

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোন্যাল-এর এ-যুক্তি নিশ্চয়ই স্বীকার্য: সূক্তসংখ্যার দিক থেকে বৈদিক দেবতাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করবার প্রচেষ্টা

নির্ভরযোগ্য নয়। তবুও আমরা বৈদিক সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকেই অধ্যাপক রথ্-এর এই মতবাদটির পক্ষেই কিছু সমর্থন পেতে পারি।

> তং ব ইন্দ্রং ন সুক্রতুং বরুণমিব মায়িনম্।
> অর্থাৎ,
> —(হে মরুৎগণ), তোমরা ইন্দ্রকে শোভন যজ্ঞ বিশিষ্ট মায়াযুক্ত বরুণের ন্যায় (দেখিবে)॥ ঋগ্বেদ : ৬. ৪৮. ১৪ ॥

'মায়া'র আলোচনায় আমরা পরে প্রত্যাবর্তন করবো। আপাতত প্রশ্ন হলো, উপরের উদ্ধৃতি থেকে কি এই কথাই অনুমান করা যায় না যে, ইতিপূর্বে বরুণকে যে-চোখে দেখা হতো ইন্দ্রকেও সেই চোখে দেখবার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—অর্থাৎ বরুণের অতীত গৌরবই ইন্দ্রের উপর আরোপ করার আয়োজন হচ্ছে? অন্যত্রও এ-জাতীয় আভাস পাওয়া যায়।

> ত্বং নো মিত্রো বরুণো ন মায়ী পিত্বো ন দস্ম দয়সে বিভক্তা।
> অর্থাৎ,
> —মিত্র ও বরুণের ন্যায় মায়াযুক্ত হইয়া, হে দর্শনীয় (ইন্দ্র), তুমি আমাদিগের অন্নের বিভক্তা ও দাতা হও॥ ঋগ্বেদ : ১০. ১৪৭. ৫ ॥

এর থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, এককালে মিত্র ও বরুণই মায়াযুক্ত হয়ে অন্নের দাতা ও বিভক্তা ছিলেন; এই ঋকটির রচনাকালে ইন্দ্রকেও সেই গৌরবে গৌরবান্বিত করে তোলবার আয়োজন হচ্ছে।

ইন্দ্রের পক্ষে এইভাবে বরুণের গৌরবময় স্থান অধিকার করবার পিছনে একটা ঐতিহাসিক কারণও থাকা স্বাভাবিক বা সম্ভব। কেননা, পশুপালন-নির্ভর ট্রাইবের পক্ষে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দিকে যে-অগ্রগতি, তার একটি প্রধানতম অঙ্গ হলো যুদ্ধের উৎসাহ-বৃদ্ধি। পশুপালন-জীবী ট্রাইবদের পক্ষে শ্রেণীসমাজের দিকে অগ্রসর হওয়া প্রসঙ্গেই এঙ্গেলস্[৮১] বলছেন,

> The military commander of the people—*rex, basileus, thiudans*—became an indispensable and permanent official. The wealth of their neighbours excited the greed of the peoples who began to regard the acquisition of wealth as one of the main purposes in life. They were barbarians: *plunder appeared to them easier and even more honourable than productive work* War, once waged simply to avenge

aggression or as a means of enlarging territory that had become inadequate, was now waged for the sake of plunder alone and became a regular profession.

এঙ্গেলস্ দেখাচ্ছেন, এ-অবস্থায় ধন বলতে প্রধানতই গোসম্পদ। এমনকি, *cattle assumed the function of money and served as money already at this stage*[৮২]। বৈদিক সমাজে কী ভাবে তা শুরু হয়েছিলো শুনঃশেপের উপাখ্যানেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি: একশত গাভীর বিনিময়ে অজীগর্ত তাঁর পুত্রকে বিক্রয় করলেন। আর এই গাভীর কামনাই যে কীভাবে বৈদিক মানুষদের জীবনে যুদ্ধের উদ্দীপনা যোগাতে শুরু করেছিলো আমরা তারও আভাস পেয়েছি গবিষ্টি বলে শব্দটির মধ্যেই: গবিষ্টি মানে গরু পাবার ইচ্ছা, গবিষ্টি মানেই যুদ্ধ।

আমাদের যুক্তির বর্তমান পর্যায়ে মন্তব্য হলো, বৈদিক মানুষদের জীবনে যতোই লুণ্ঠন ও লোভের প্রভাব বর্ধিত হয়েছে,—যতোই বর্ধিত হয়েছে যুদ্ধের উদ্দীপনা—ততোই তাদের দেবলোকেও ওই যুদ্ধের দেবতা, লুণ্ঠনের দেবতা, বীর ইন্দ্রের গৌরব বেড়ে চলা স্বাভাবিক। এই ইন্দ্রের গৌরবই যদি সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে তাহলে অনুমান করতে হবে পশুপালনমূলক অর্থনীতির বিকাশের ওই পর্যায়টির বৈশিষ্ট্যই সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদ সংহিতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

কিন্তু অতীতের স্মৃতি হিসেবেই হোক বা বাস্তবিক পক্ষে প্রাচীন রচনার পরিচায়ক হিসেবেই হোক, ঋগ্বেদ সংহিতাতেই এমন একটি দেবতার অতীত গৌরবের আভাস পাওয়া যাচ্ছে যাঁর মহিমার প্রধান কথা ওই লুণ্ঠন-অপহরণ-মূলক যুদ্ধ নয়—তার বদলে যিনি ছিলেন অন্নের বিভক্তা, অনৃতের হন্তা, ঋতের পালক। তাঁর নাম বরুণ। এবং কালক্রমে, বৈদিক ঋষিরা যতোই যুদ্ধকে মহত্তম বৃত্তি বলে সম্মান করতে শিখেছিলেন ততোই তাঁদের সাহিত্যে বরুণের মহিমাকে অবদলিত করে ইন্দ্রের মহিমা প্রধান হয়ে উঠেছে।

এভির্ন ইন্দ্রাহভির্দশস্য দুর্মিত্রাসো হি ক্ষিতয়ঃ পবন্তে।
প্রতি যচ্চষ্টে অনৃতমনেনা অব দ্বিতা বরুণো মায়ী নঃ সাৎ॥
অর্থাৎ,
—হে ইন্দ্র, দুষ্ট মিত্ররূপী বাধাদানকারী মানবদল আসিতেছে; তাহাদের নিকট হইতে ধন কাড়িয়া লইয়া আমাদিগকে এই পুণ্য দিনে দান কর। মায়াবী বরুণ আমাদিগের মধ্যে যে অনৃত দেখেন তুমি তাহা দ্বিধাবিভক্ত করিয়া অপনোদন কর॥ ঋগ্বেদ: ৭. ২৮. ৪॥

এই লোভ, এই লুণ্ঠন, এই যুদ্ধকে বরুণ তখনো অসত্য বা অনৃত হিসেবেই দেখছেন। অর্থাৎ অমোঘ ন্যায়ের পালক বরুণের স্মৃতির সঙ্গে এই লোভ ও লুণ্ঠনের সামঞ্জস্য থাকছে না। তাই লুণ্ঠনের নেতা ইন্দ্রের কাছে কামনা জানানো হচ্ছে, অতীতকালের অমোঘ ন্যায়ের মানদণ্ডে যা আজ অন্যায়, অনৃত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে সেই অনৃতবোধকে দ্বিধাবিভক্ত করো, অপনোদন করো।

বৈদিক মানুষেরা যখন এই কামনা করতে শিখেছেন তখন তাঁরা শ্রেণী সমাজের কতোখানি কাছাকাছি এসে পড়েছেন বেদাবিদেরা তার আলোচনা করবেন। আপাতত আমাদের দ্রষ্টব্য হলো, বৈদিক সমাজের এই পরিবর্তনটির ফলে শুধুই যে অতীত দেবতার স্থানে নতুন দেবতার গৌরব ফুটে উঠছে তাই নয়, অতীতের দেবতার চরিত্রেরও বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে।

কেননা, মানব-ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের সামনে এমনকি বৈদিক দেবতারাও অসহায়ের মতো। তাঁদের চরিত্রের প্রধানতম উপকরণ বলতে এই মরলোকের মানুষদেরই ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্খা—শেষ পর্যন্ত যার উৎস হলো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আর মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। অতএব, ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে মানুষের মৌলিক অভিজ্ঞতায় পরিবর্তন দেখা দিলে, তাদের ধ্যানধারণা ও আশা-আকাঙ্খায় বিপর্যয় ঘটলে, দেবতার চরিত্রেও বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়।

বৈদিক সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি যখন এই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ক্ষুধাপীড়িত পিতা শতগাভীর বিনিময়ে পুত্রকে বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে,—শুধু তাই নয়, আরো শতগাভীর প্রলোভনে পুত্রকে যূপে বদ্ধ করতে এবং আরো শতগাভীর লোভে শানিত অসি হস্তে তাকে বধ করতে অগ্রসর হচ্ছে—তখন? তখন নিশ্চয়ই অনুমান করতে হবে যে, প্রাচীন কালের জ্ঞাতি-সম্পর্কের গুরুত্বকে ধূলিসাৎ করে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের চূড়ান্ত নিয়ন্তা হিসেবে দেখা দিয়েছে একটি নতুন শক্তি, তার নাম লোভ, লিপ্সা, লালসা। অতএব, অতীতের সেই বরুণ—সেই সখা, সেই দাতা, সেই প্রিয় ও নিত্যবন্ধু, সেই ঋতের পালক অনৃতের হন্তা—তাঁর পূর্বপরিচয়ও অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা দেখছি, অতীত বরুণেরই প্রেত, পাওনা-আদায়ের লোভে অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

আরো কথা আছে। অতীতের সেই বরুণ, সেই সত্য ও ন্যায়ের রক্ষক বরুণ—তাঁর নিয়ম ছিলো অত্যন্ত কঠোর।

Varuna's ordinances are constantly said to be fixed, the epithet *dhrita-vrata* (ধৃতব্রত) being preeminently applicable to

him...the gods themselves follow Varun's ordinance...Even the immortal gods cannot obstruct the ordinances of Mitra and Varuna...Mitra and Varuna are lords of order (ঋত) and light, who by means of order are the upholders of order...[৮৩]

ঋগ্বেদে বারবার বরুণের পাশ-এর উল্লেখ দেখা যায়,—এই পাশ দিয়ে তিনি অন্যায় আচরণকারিদের বন্ধন করেন (৬. ৭৪. ৪; ১০. ৮৫. ২৪, ইত্যাদি)।

মনে রাখা দরকার, বরুণের এই যে কঠোরতা তা ন্যায়ের খাতিরে, সত্যের খাতিরে, প্রাচীন জ্ঞাতি-ভিত্তিক সমাজের সহজাত নীতিনিষ্ঠার খাতিরে। ফলে, লোভ, লিপ্সা, লালসার প্রভাবে বরুণের চরিত্র থেকে ওই নীতিনিষ্ঠার প্রেরণাটুকু অস্পষ্ট হয়ে এলে বাকি থাকে শুধু কঠোরতা। দেবতাটি তখন ভয়ঙ্কর, বিভীষিকার উৎসমাত্র। উত্তরকালের সাহিত্যে আমরা বরুণকে সেই ভয়ঙ্কর মূর্তিতেই দেখি—দুঃস্বপ্নের মতো। অধ্যাপক কীথ্[৮৪] বলছেন,

It must be admitted that the figure of Varuna does not increase in moral value in the course of the development of the Vedic religion...Varuna is remembered as the god who has fetters and becomes in the Brahmanas a dreaded god, whose ritual in some measure is assimilated to that of the demons and the dead. After the performance of the bath, which ends the Agnistoma sacrifice, the performer turns away and does not look back to escape from Varuna's notice[1], and in the ceremony of that bath when performed after the horse sacrifice, a man of peculiar appearance is driven into the water and an offering made on his head, as being a representative of Varuna[2]: this form of the expulsion of evils, which is a common idea throughout the world, shows Varuna reduced to a somewhat humble level, and degraded from his Rigvedic eminence.

১। তৈত্তিরীয় সংহিতা: ৬. ৬. ৩৫; মৈত্রায়নীয় সংহিতা: ৪. ৮. ৫.

২। আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্র: ১৩. ১৯. ১ ইত্যাদি।

"নিঃস্বত্তি হইতে আমাদের দূরে রাখ"

a fall from the simple moral grandeur of the ancient gentile soceity[৮৫] : **Engels.**

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপাখ্যান অনুসারে, যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হয়ে শুনঃশেপ বরুণের—অতীতের সেই বরুণের—স্মৃতি উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কামনা জানিয়েছিলেন—

বাধস্ব দূরে নির্ঋতিং পরাচৈঃ
কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥
অর্থাৎ,
—নিঃঋতি হইতে আমাদিগকে দূরে রাখ, কৃত পাপের মোহ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করো ॥ ঋগ্বেদ : ১.২৪. ৯ ॥

ঋতের যা বিপরীত তারই নাম নিঃঋতি। ঋতহীনত্ব। পিতা যখন অর্থের প্রলোভনে মেধ্য পশুর মতো পুত্রকে বধ করতে অগ্রসর হয় তখন স্বভাবতই ঋতহীনতার আশঙ্কা জাগে। আর তখন অতীতের সেই প্রিয় ও নিত্যবন্ধুর কথাও মনে পড়ে। কেননা, অতীতে এই বরুণই ছিলেন ঋতের পালক, ঋতের রক্ষক।

আ রাজানা মহ ঋতস্য গোপা
সিন্ধুপতী ক্ষত্রিয়া যাতমর্বাক্।
ইলাং নো মিত্রা বরুণোত বৃষ্টিমব দিব ইন্বতং জীরদানূ ॥
অর্থাৎ,
হে রাজন্, হে মহান ঋতের পালকদ্বয়, হে নদীগুলির পতি, হে ক্ষত্রিয়দ্বয়, তোমরা দুই জন আমাদের অভিমুখে আগমন কর ; হে মিত্রাবরুণ, হে শীঘ্র-দানকারী, তোমরা আমাদিগকে অন্ন ও বৃষ্টি অন্তরীক্ষ হইতে প্রেরণ কর ॥ ঋগ্বেদ : ৭. ৬৪. ২ ॥

ঋতেন যাবৃতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী।
তা মিত্রাবরুণা হুবে ॥
অর্থাৎ
যাঁহারা ঋত দ্বারা ঋতকে বর্ধিত করেন, যাঁহারা ঋতের প্রকাশকর্তা, সেই মিত্রা-বরুণকে আহ্বান করি ॥ ঋগ্বেদ : ১. ২৩. ৫ ॥

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা।
ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥
অর্থাৎ,
—হে মিত্রাবরুণ, তোমরা ঋতের দ্বারা ঋতকে বর্ধিত কর ও ঋতকে স্পর্শ কর, যজ্ঞকে বর্ধিত করিবার জন্য পরিব্যাপ্ত হও ॥ ঋগ্বেদ : ১.২.৮ ॥

ঋতেন ঋতমপিহিতং ধ্রুবং বাং সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্যশ্বান্।
দশ শতা সহ তস্থুস্তদেকং
দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যম্ ॥
অর্থাৎ,
—যে স্থানে সূর্যের অশ্বগুলি মোচন করা হয়, সেই ঋত ঋতের দ্বারা আবৃত ; সেই স্থানে দশশতের সহিত অবস্থানকারী সেই এক (মিত্রাবরুণ)-কে, দেবতা-শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে, দেখিয়াছিলাম ॥ ঋগ্বেদ : ৫.৬২.১ ॥

ঋত মানে কী ? আমাদের পক্ষে এ-প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়া কঠিন। কেননা ঋগ্বেদের কবিদের কাছে এই ঋতই ছিলো সেই প্রাচীন অবিভক্ত সমাজের আদিম নীতিবোধ। নীতিবোধের চেতনার দিক থেকে প্রাচীন সমাজের সঙ্গে আধুনিক সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আমাদের আধুনিক চেতনায় প্রাকৃতিক নিয়ম, জীবন সংগ্রাম, কর্তব্য, দায়িত্ব প্রভৃতির ধারণা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ; আদিম সমাজে তা ছিলো না। নৈতিক জীবনের নিয়মও প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই অমোঘ। এঙ্গেলস্[৮৬] যেমন বললেন,

> there was as yet no distinction between rights and duties ; the question of whether participation in public affairs, blood-revenge or atonement of injuries was a right or a duty never confronted the (Iroquois) Indian ; it would have appeared as absurd as the question of whether eating, sleeping or hunting was a right or a duty.

তার কারণ,

> the tribe, the gens and their institutions were sacred and inviolable, a superior power, instituted by nature, to which the individual remained absolutely subject in feeling, thought and deed.[৮৭]

প্রাচীন সমাজের এই আদিম অখণ্ড নৈতিক চেতনার দিক থেকেই আমরা ঋগ্বেদের ঋতকে বোঝবার চেষ্টা করবো। ঋত মানে সত্য, ঋত মানে যজ্ঞ, ঋত মানে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম, ঋত মানে অমোঘ নৈতিক নিয়ম—আরো অনেক কিছু। ঋতের বর্ণনায় অধ্যাপক কীথ্[৮৮] বলছেন,

(ঋগ্বেদে) বারবার প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার নাম

ঋত।...বৈদিক ভারতে শব্দটি ত্রি-অর্থবাচক: বিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা, যজ্ঞের বিধি, পৃথিবীতে নৈতিক জীবনের নিয়মানুবর্তিতা।...ঋত অনুসারেই প্রভাতে উষাদের আবির্ভাব হয়: ঋত অনুসারেই পিতৃগণ আকাশে সূর্যকে স্থাপন করেছেন, সূর্য ওই ঋতেরই উজ্জ্বল মুখ এবং গ্রহণের অন্ধকার সেই ঋতেরই বিপরীত। সংবৎসর হলো দ্বাদশ অর-বিশিষ্ট ঋতের রথচক্র। নব-গাভীর ধারোষ্ণ দুগ্ধ হলো ঋতের দ্বারা বর্ধিত গাভীর ঋত। জল ও ওষধির মধ্যে লুকোনো আগুন (অগ্নি) অরণি কাষ্ঠের ঘর্ষণে ঋতজাত ও ঋতের অঙ্কুর। ঋতের আদেশ অনুসারেই নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক স্তর থেকে সহজেই ঋতের ধারণা নৈতিক ও যজ্ঞ-সম্পর্কীয় ধারণায় পর্যবসিত হয়।

এমনকি, স্বয়ং দেবতারাও ঋত হইতে জাত ও ঋতস্বরূপ।

পবমানঃ ঋতঃ কবিঃ সোমঃ।
অর্থাৎ,
রক্ষাকারী সোম, যিনি ঋত ও কবি॥ ঋগ্বেদ: ৯.৬২.৩০॥

ঋতেন য ঋতজাতো বিবাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ॥
অর্থাৎ,
—যিনি (সোম) রাজা ও দেবতা, ঋত হইতে জাত, (তিনি) ঋতের দ্বারা ঋতকে বৃহৎরূপে বর্ধিত করেন॥ ঋগ্বেদ: ৯.১০৮.৮॥

দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতো যং নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ॥
অর্থাৎ,
—তুমি হবির্দ্বারা স্নাত হইয়া, হে ঋতজাত অগ্নি, কণ্বকে দীপ্যমান করিয়াছিলে এবং তোমাকে মনুষ্যগণ নমস্কার করে॥ ঋগ্বেদ: ১.৩৬.১৯॥

অশ্বিদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—

রথো হ বাম্ ঋতজাঃ
অর্থাৎ,
—(হে অশ্বিদ্বয়), তোমরা ঋত হইতে জাত, তোমাদের রথ...॥ ঋগ্বেদ: ৩.৫৮.৮॥

অগ্নিও ঋতজাত, ঋতের জ্ঞাতা এবং সত্যস্বরূপ—

ঋতজাত পূর্বীঃ

অর্থাৎ,

—(হে অগ্নি) তুমি পুর্বকালে ঋত হইতে জাত হইয়াছিলে ॥ ঋগ্বেদ : ২.২০.২ ॥

অগ্নির্বিদ্বান্ ঋতচিদ্ধি সত্যঃ

অর্থাৎ,

—অগ্নি বিদ্বান, ঋতর জ্ঞাতা এবং সত্যস্বরূপ ॥ ঋগ্বেদ : ১.১৪৫.৫ ॥

মরুৎগণ সম্বন্ধেও একই কথা,

কো বেদ নূনমেষাং যত্রা মদন্তি ধূতয়ঃ।
ঋতজাতা অরেপসঃ ॥

অর্থাৎ,

—ইহাদিগের (মরুৎদিগের) বাসস্থান কেই বা জানে? সেখানে শত্রুদিগের ত্রাসকারীগণ আনন্দে থাকেন, তাঁহারা ঋত হইতে জাত বলিয়াই পাপবিহীন ॥ ঋগ্বেদ : ৫.৬১.১৪ ॥

দেবতারা শুধুই ঋতজাত নন ; তাঁরা ঋতের আচরণও করে থাকেন।

ঋতং বদন্নৃতদ্যুম্ন সত্যং বদন্ সত্যকর্মন্।
শ্রদ্ধাং বদন্ সোম রাজন্ধাত্রা সোম পরিষ্কৃত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥

অর্থাৎ,

—(হে সোম), ঋতের দ্বারা দীপ্তিযুক্ত, ঋত বলিতে বলিতে, সত্য বলিতে বলিতে তুমি সত্যকর্মা হইয়াছ ; শ্রদ্ধা বলিতে বলিতে, হে সোম, শোভমান হইয়া যজমানের দ্বারা পরিষ্কৃত অবস্থায়. তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে, হে সুন্দরকান্তি, পরিস্রুত হও ॥ ঋগ্বেদ : ৯. ১১৩. ৪ ॥

ঋতধীতয় আ গত সত্যধর্মাণো অধ্বরং।
অগ্নেঃ পিবত জিহ্বয়া ॥

অর্থাৎ,

—হে ঋতকর্মযুক্ত সত্যধর্মা বিশ্বদেবগণ, তোমরা যজ্ঞে আসিয়াছ, অগ্নির জিহ্বাদ্বারা তোমরা পান কর ॥ ঋগ্বেদ : ৫. ৫১. ২ ॥

কিন্তু শুধু দেবতাই নন ; গাভীগুলিও ঋত আচরণ করতে করতে ঋতযুক্ত হয়েছিলো এবং পুষ্টিলাভ করেছিলো।

মক্ষু কনায়াঃ সখ্যং নবগ্বা ঋতং বদন্ত ঋতযুক্তিমগ্মন্।
দ্বিবর্হসো য উপ গোপমাগুরদক্ষিণাসো অচ্যুতা দুদুক্ষন্॥
অর্থাৎ,
—শীঘ্র কমনীয় (স্থান হইতে প্রেরিত) সখ্যযুক্ত নয় মাসের গাভীগুলি ঋত বলিতে বলিতে ঋতযুক্ত হইয়াছিল ; দুই-লোকে যাহারা পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাদিগের হইতে দক্ষিণাবিহীন (যজমানগণ) নিশ্চিত ফল দোহন করিয়াছিলেন॥ ঋগ্বেদ : ১০. ৬১. ১০॥

আরো দ্রষ্টব্য হলো, অতীতে এই ঋতই ছিলো জীবনোপায়—ধনলাভের উপায়, অন্নলাভের উপায়, গাভীলাভের উপায়—কিংবা, অন্তত, সেই উপায়ের প্রধানতম অঙ্গ।

ঋতং যতী সরমা গা অবিন্দৎ
অর্থাৎ,
ঋতকে প্রাপ্ত হইয়া সরমা গরুগুলি লাভ করিয়াছিল॥ ঋগ্বেদ : ৫. ৪৫. ৭॥

ঋতং বর্ষিষ্ঠমুপ গাব আগুঃ।
অর্থাৎ,
—(বিশ্বদেব) ঋতকে বহুল করিয়া গরুগুলি পাইয়াছিল॥ ঋগ্বেদ : ৩. ৫৬. ২॥

ঋতং সপন্তো অমৃতমেবৈঃ॥
অর্থাৎ,
—ঋতদ্বারা সমবেত হইয়া (অগ্নি) অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইল॥ ঋগ্বেদ : ১. ৬৮. ৪॥

ঋতজ্যেন ক্ষিপ্রেণ ব্রহ্মণস্পতির্যত্র বষ্টি প্র তদশ্নোতি ধন্বনা।
তস্য সাধ্বীরিষবো যাভিরস্যতি নৃচক্ষসো দৃশয়ে কর্ণযোনয়ঃ॥
অর্থাৎ,
—ব্রহ্মণস্পতি ক্ষিপ্র ঋতরূপ-জ্যাবিশিষ্ট ধনুদ্বারা যাহাই কামনা (করেন) তাহাই ব্যাপ্ত করেন ; সেই মনুষ্যের উপায়জ্ঞ, যাহার দ্বারা হিংসা করেন, সেই অব্যর্থ তীরগুলি তাঁহার কর্ণ হইতে জাত॥ ঋগ্বেদ : ২. ২৪. ৮॥

অস্য মে দ্যাবাপৃথিবী ঋতায়তো ভূতমবিত্রী বচসঃ সিষাসতঃ।
যযোরায়ুঃ প্রতরং তে ইদং পুর উপস্তুতে বস্যুর্বাং মহো দধে॥
অর্থাৎ,
—হে রক্ষাকর্ত্রী দ্যাবাপৃথিবী, ঋতের কামনা করিয়া বাক্যের দ্বারা তোমাদিগকে তুষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল ; তোমরা অন্ন প্রকৃষ্টভাবে উৎপন্ন কর, ধনকামনা করিয়া তোমাদিগের স্তুতি করি॥ ঋগ্বেদ : ২. ৩২. ১॥

এই ঋতই হলো প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত সমাজের সেই অখণ্ড নীতিবোধ, এঙ্গেলস্ যাকে বলেছেন, *the simple moral grandeur of the ancient gentile society*। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি (পৃ. ২৩৩), মহাবস্তু অবদান প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ থেকেও এই নীতিবোধটির স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়নি : "সুখনিবাসে থাকিয়া তাঁহারা প্রীতিভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। তাঁহারা যাহা করেন সকলই ধর্ম।" এ-নীতিবোধ স্বাভাবিক এবং সহজাত, মানবচেতনার অপরিহার্য অঙ্গ—তাই প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই অমোঘ, প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই স্বাভাবিক। কিংবা, যা একই কথা, প্রকৃতির চেতনা এবং এই নৈতিক নিয়মের চেতনা তখনো এক অখণ্ড সামগ্রিক চেতনারই অঙ্গীভূত।

বৈদিক ঋষিরা তারই নাম দিয়েছিলেন, ঋত।

আর অতীতের সেই বরুণ—সেই প্রিয় ও নিত্যবন্ধু বরুণ—তাঁর নৈতিক ঐশ্বর্য বলতেও এই ঋত, এই আদিম অখণ্ড নীতিবোধ। তিনি ঋতের পালক, ঋতের বর্ধক। তিনি শুধু দেন—মানুষের গোশালাগুলি ঘৃতসিক্ত করেন, বাসস্থানগুলি মধুসিক্ত করেন (৩.৬২.১৬) ; তাঁর জলযুক্ত বৃষ্টি মানুষদের মধ্যে সঞ্চরণ করে (৮.২৫.৬)।

আর উত্তর সাহিত্যে দেখি, এই বরুণই পরিণত হয়েছেন এক বিকট বিভীষিকায় : পাওনা-আদায়ের জন্যে তাঁর হানা দেওয়ার যেন বিরাম নেই, স্নানের পর মানুষ পিছন ফিরে তাকাতে ভয় পাচ্ছে—বরুণের আতঙ্কে আতঙ্কিত!

বরুণের এই অদ্ভুত রূপান্তর ঘটলো কী করে?

লোভে লালসায় মানবসমাজ তখন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তখন ক্ষুধাপীড়িত পিতা শত-গাভীর আশায় পুত্রকে বিক্রয় করছে, শত-গাভীর প্রলোভনে পুত্রকে যূপে বদ্ধ করতে অগ্রসর হচ্ছে, শত-গাভীর লালসায় শানিত অসি হস্তে অগ্রসর হচ্ছে এই পুত্রকেই বধ করবার জন্য।

যূপে-বদ্ধ পুত্র ওই অতীত-বরুণের স্মৃতিই উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কামনা জানিয়েছিলেন,

> নিঋতি থেকে আমাদের দূরে রাখো
> আমাদের কৃতপাপ থেকে আমাদের মুক্ত করো।

মায়া : ভাববাদের আবির্ভাব

অতীতের সেই বরুণ শুধুই যে ঋতযুক্ত ও ঋতজ্ঞ তাই নন, মায়াবীও।

ধর্মণা মিত্রাবরুণা বিপশ্চিতা ব্রতা রক্ষেথে অসুরস্য মায়য়া।
ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ সূর্যমা ধত্থো দিবি চিত্র্যং রথম্ ॥
অর্থাৎ,
—হে প্রাজ্ঞ মিত্রাবরুণ, তোমরা ধর্মদ্বারা ও অসুরের মায়াদ্বারা যজ্ঞসমূহ রক্ষা কর, ঋতদ্বারা এই বিশ্বভুবনকে দীপ্যমান কর, সূর্যকে তাহার বিচিত্র রথসহ ধারণ করিয়া থাক ॥ ঋগ্বেদ : ৫. ৬৩. ৭ ॥

ঋতস্য বুধ্ন উষসামিষণ্যন্বৃষা মহী রোদসী আ বিবেশ।
মহী মিত্রস্য বরুণস্য মায়া চন্দ্রেব ভানুং বি দধে পুরুত্রা ॥
অর্থাৎ,
—উষাগুলিকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঋতের মূল বৃষ্টির সাহায্যে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; মিত্র ও বরুণের মহতী মায়া চন্দ্রের ন্যায় নিজপ্রভা বহুলভাবে প্রসারিত করিয়াছিল ॥ ঋগ্বেদ : ৩. ৬১. ৭ ॥

স্বভাবত অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোন্যাল মন্তব্য[৮৯] করছেন,

> The divine dominion of Mitra and Varuna is often referred to with the word *Maya.*

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, উত্তরকালে, বিশেষত বেদান্ত-দর্শনের প্রভাবে, মায়া বলতে আমরা যা বুঝতে শিখেছি ঋগ্বেদে মায়ার অর্থ মোটেই তা নয়। ঋগ্বেদের 'মায়া' প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোন্যাল[৯০] মন্তব্য করছেন,

> It has an almost exact parallel in the English word 'craft', which in its old significance meant 'occult power, magic', then 'skilfulness, art' on the one hand and 'deceitful skill, wile' on the other. The good sense of *Maya*, like that of *asura* (which might be rendered by 'mysterious being') is mainly connected with Varuna and Mitra, while its bad sense is reserved for demons.

আমরা আগেই দেখেছি, প্রাচীন-সমাজে উৎপাদন-কৌশল অনুন্নত বলেই শ্রমের অপরিহার্য অঙ্গ ছিলো জাদুশক্তিতে বিশ্বাস। ঋগ্বেদের 'মায়া' শব্দটির মধ্যে আমরা হয়তো তারই আভাস পাই: মায়া হলো কৌশল, প্রজ্ঞা, ক্ষমতা এবং সেইসঙ্গে জাদুশক্তিও। এবং প্রাক্‌-বিভক্ত

পর্যায়ে কর্মকৌশলের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়নি বলেই এই মায়াই তখন দেবতাদেরও পরম গৌরবময় শক্তি হিসেবেই কীর্তিত হয়েছে।

এই মায়ার দ্বারাই বরুণ সূর্যকে পৃথিবী থেকে পৃথক করেছিলেন।

ইমামূ ম্বাসুরস্য শ্রুতস্য মহীং মায়াং বরুণস্য প্র বোচম্।
মানেনেব তস্থিবাঁ অন্তরিক্ষে বি যো মমে পৃথিবীং সূর্যেন॥
অর্থাৎ,
—অসুরের হননোপযোগী এই মহৎ বিখ্যাত মায়ার কথা বলিতেছি—যাহার দ্বারা বরুণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া যেন দণ্ডের দ্বারা সূর্যকে ও পৃথিবীকে পৃথক করিয়াছিলেন॥ ঋগ্বেদ: ৫. ৮৫. ৫॥

এই মায়াই মিত্রাবরুণের আয়ুধের মতো।

মায়া বাং মিত্রাবরুণা দিবি শ্রিতা সূর্যো জ্যোতিশ্চরতি চিত্রমায়ুধম্।
অর্থাৎ,
—হে মিত্রাবরুণ, তোমাদের মায়া স্বর্গকে আশ্রয় করিয়াছে এবং সূর্যরূপে বিচিত্র আয়ুধ হইয়া ইহা পরিভ্রমণ করিতেছে॥ ঋগ্বেদ: ৫. ৬৩. ৪॥

কিন্তু শুধু মিত্রাবরুণই নন; অন্যান্য দেবতাদের কর্মকৌশলকেও ঋগ্বেদে মায়া বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইন্দ্র যে গাভী নির্মাণ করেছিলেন তাও এই মায়ার দ্বারাই।

তদিন্ন্বস্য বৃষভস্য ধেনোরা নামভির্মমিরে সক্ম্যং গোঃ।
অন্যদন্যদসূর্যং বসানা নি মায়িনো মমিরে রূপমস্মিন্॥
অর্থাৎ,
—অভিলাষ-পূরণকারীর হবনীয় গাভীকে মায়াযুক্ত ইনি (ইন্দ্র) 'ধেনু' এই নামের দ্বারা নির্মাণ করিয়াছিলেন; অন্যান্য অসূর্য-শক্তিকে পরাজিত করিয়া ইনি ইহাদিগকে (প্রকৃত) রূপে (মায়াদ্বারা) নির্মিত করিয়াছিলেন॥ ঋগ্বেদ: ৩. ৩৮. ৭॥

এমনকি ইন্দ্রের যে-রণকৌশল তারও নাম মায়া। মায়ার দ্বারাই তিনি মায়াবী শুষ্ণকে পরাজিত করেন।

মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ।
অর্থাৎ,
—মায়াসমূহদ্বারা ইন্দ্র, হে মায়াবী শুষ্ণ, তোমাকে পরাজিত করিয়াছিলেন॥ ঋগ্বেদ: ১. ১১. ৭॥

এবং এই মায়ার দ্বারাই তিনি মায়াযুক্ত মৃগকে বধ করেছিলেন।

ত্যং মায়িনং মৃগং তমু ত্বং মায়য়াবধীঃ
অর্থাৎ,
—তুমি (ইন্দ্র) মায়াদ্বারা সেই মায়াযুক্ত মৃগকে বধ করিয়াছিলে॥ ঋগ্বেদ : ১. ৮০. ৭॥

ইন্দ্র যে ধনদাতাকে পর্যুদস্ত করেছিলেন তাও এই মায়ার দ্বারাই, মায়ার সাহায্যেই।

মায়াভির্ধনদাং পর্যভূবন্‌...............
............নির্জ্যোতিষা তমসো গা অদুক্ষৎ॥
অর্থাৎ,
—(ইন্দ্র) ধনদাতাকে মায়াসমূহ দ্বারা পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন এবং আলোকের দ্বারা অন্ধকার হইতে গরুগুলিকে দোহন করিয়াছিলেন॥ ঋগ্বেদ : ১. ৩৩. ১০॥

যে-পার্থিব ধনের এবং নিরাপত্তার কামনাকেই সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদের মূলসূত্র হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়, তা লাভ করবার কৌশলকেও মায়া বলা হয়েছে।

রেবদ্বয়ো দধাথে রেবদাশাথে নরা মায়াভিরিতঊতি মাহিনম্‌।
অর্থাৎ,
—(হে মিত্রাবরুণ), তোমরা দুইজন ধন এবং অন্ন ধারণ কর; তোমরা নেতা, আমাদিগকে মায়াসমূহ অবলম্বনে ধন (ও অন্ন) দান কর, তোমরা মহৎ॥ ঋগ্বেদ : ১. ১৫১. ৯॥

এবং মায়ার সাহায্যেই মিত্রাবরুণ অমোঘ নিয়মের ধারক হন।

যা বো মায়া অভিদ্রুহে যজত্রাঃ পাশা আদিত্যা রিপবে বিচৃত্তাঃ।
অর্থাৎ,
—হে যজনীয়গণ (আদিত্যগণ), তোমাদের মায়া এবং পাশসমূহ বিদ্রোহী শত্রুর উদ্দেশ্যে প্রসারিত॥ ঋগ্বেদ : ২. ২৭. ১৬॥

এই মায়ার দ্বারাই ইন্দ্র স্বর্গকে পতন থেকে স্তব্ধ করেছিলেন।

অস্তভ্নাৎ মায়য়া দ্যামবস্রসঃ।
অর্থাৎ,
—(ইন্দ্র) মায়াদ্বারা স্বর্গকে পতন হইতে স্তব্ধ করিয়াছিলেন॥ ঋগ্বেদ : ২. ১৭. ৫॥

আমরা ইতিপূর্বে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, আদিতে ওই পার্থিব ধনলাভের পদ্ধতিকেই যজ্ঞ বলা হতো—এমন কথা অনুমান করবার সুযোগ আছে। এবং ঋগ্বেদে ধন-লাভ-কৌশলের নামান্তর যদি মায়াই হয় তাহলে যজ্ঞের সঙ্গেও মায়ার সম্পর্ক দেখতে পাওয়া উচিত। বস্তুত ঋগ্বেদেই এ-সম্পর্কের ইংগিত খুঁজে পাওয়া যায়।

মায়ার দ্বারাই হোতা ব্রতকে ঊর্ধ্বে ধারণ করেন।

এতি প্র হোতা ব্রতমস্য মায়য়োর্ধ্বাং দধানঃ
অর্থাৎ,
—হোতা ব্রতকে মায়ার দ্বারা ঊর্ধ্বে ধারণ করিয়া এইদিকে আসিতেছে॥ ঋগ্বেদ : ১. ১৪৪. ১. ॥

মায়ার দ্বারাই অগ্নি ভুবনসমূহকে পবিত্র করেন।

স বহ্নিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ পবিত্রবান্ পুনাতি ধীরো ভুবনানি মায়য়া।
ধেনুং চ পৃশ্নিং বৃষভং সুরেতসং বিশ্বাহা শুক্রং পয়ো অস্য দুক্ষত॥
অর্থাৎ,
—পিতামাতার পুত্র সেই বহ্নি (অগ্নি) পবিত্র, ধীর; তিনি মায়ার দ্বারা ভুবনসমূহকে পবিত্র করেন; তিনি চিরকাল ধরিয়া শুক্লবর্ণ গাভী এবং শোভন রেতঃযুক্ত বৃষভ হইতে শুক্র এবং দুগ্ধ দোহন করেন॥ ঋগ্বেদ : ১. ১৬০. ৩॥

এবং মায়াবীদের মায়া অগ্নির মধ্যেও সংস্থাপিত হয়েছিলো।

যাশ্চ মায়া মায়িনাং বিশ্বমিন্ব ত্বে পূর্বীঃ সংদধুঃ পৃষ্টবন্ধো॥
অর্থাৎ,
—মায়াবীদের যে-সমস্ত মায়া, হে জিজ্ঞাসুদিগের বন্ধু, বিশ্বম্ভর (অগ্নি), তাহা পূর্বেই তোমাতে সংস্থাপিত হইয়াছে॥ ঋগ্বেদ : ৩. ২০. ৩॥

মায়া প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের আরো অনেক মন্ত্র উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু আমাদের মূল যুক্তির পক্ষে তার প্রয়োজন নেই। কেননা, আমাদের যুক্তির দিক থেকে শুধু এটুকু প্রতিপন্ন করাই প্রয়োজন যে, বৈদিক মানুষেরা এককালে মায়া বলতে কর্মকৌশলই বুঝতেন এবং তখন তাঁরা প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়ে জীবনযাপন করতেন বলেই তাঁদের ধ্যানধারণায় শ্রম বা কর্মকৌশল নিন্দিত হয়নি। তাই ঋগ্বেদে মায়া তো নিন্দিত নয়ই; বরং এই মায়ার গৌরব-বর্ণনাতেই ঋগ্বেদ যেন ভরপুর। মায়ার গৌরবের সঙ্গে প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়ের সম্পর্ক কী রকম

ছিলো এবং সেই প্রাক্‌-বিভক্ত সমাজ-সংগঠন ভেঙে যাবার পর ঋগ্বেদেরই পরের অংশে মায়ার গৌরব কী ভাবে ক্ষুণ্ন হতে শুরু করেছে এখানে তারই সামান্য উদাহরণ উদ্ধৃত করবো।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, বৈদিক সমাজের প্রাক্‌-বিভক্ত পর্যায়ের একটি প্রধান পরিচয় হলো সভা। ঋগ্বেদে দেখি, অগ্নি মায়ার দ্বারাই এই সভাসমূহকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

> হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদেতি মায়য়া। বিদথানি প্রচোদয়ন্‌॥
> অর্থাৎ,
> —মৃত্যুহীন হোতা দেবতা (অগ্নি) সভাসমূহকে অনুপ্রেরিত করিবার জন্য সম্মুখে মায়াযুক্ত হইয়া আসিতেছেন॥ ঋগ্বেদ : ৩. ২৭. ৭॥

কিন্তু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল রচিত হবার সময় ওই বৈদিক সভায় ভাঙন ধরেছিলো বলেই অনুমান হয়; কেননা তা না হলে বৈদিক কবি অতীতের স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করে সমিতিতে সমান হবার জন্য অমন ব্যাকুল আবেদন (পৃ. ৫৬৮) ঘোষণা করবেন কেন? এবং এই দশম মণ্ডলেই দেখা যায় মায়া যেন বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে—যে-মায়া দেবতাদের প্রধানতম কৌশল ছিলো, যে-মায়াদ্বারা দেবতারা সভাসমিতিকে অনুপ্রেরিত করতেন, সেই মায়াই নিষ্ফল ও বন্ধ্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

> উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।
> অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাঁ অফলামপুষ্পাম্‌॥
> অর্থাৎ,
> (হে ব্রহ্মণস্পতি) তুমি এই সখ্যে স্থির নিশ্চয় হইয়াছ; কেহ আর সংগ্রামে ইহার অনুগমন করে না। এই ব্যক্তি ধেনুবিহীন হইয়া মায়ার দ্বারা বিচরণ করে, সে নিষ্ফল পুষ্পবিহীন বাক্য শ্রবণ করে॥ ঋগ্বেদ : ১০. ৭১. ৫॥

ভাষ্যে সায়ণ বলছেন,

> যথা বন্ধ্যা পীনা গৌঃ কিং দ্রোণমাত্রং ক্ষীরং দোগ্ধীতি মায়ামুৎপাদয়ন্তী চরতি যথা বন্ধ্যো বৃক্ষোঽকালে পল্লবাদিযুক্তঃ সন্‌ পুষ্প্যতি ফলতীতি ভ্রান্তিমুৎপাদয়ং-স্তিষ্ঠতি তথা…
> অর্থাৎ,
> —যেমন কোনো বন্ধ্যা স্থূল গাভী,—হয়তো অল্প দুগ্ধ দান করে,—এইরূপ ভ্রম উৎপন্ন করিয়া বিচরণ করে, যেরূপ নিষ্ফল বৃক্ষ অকালে পল্লবাদি যুক্ত হইয়া—ইহা হয়তো পুষ্প ও ফল ধারণ করে, এইরূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ।

আরো পরে—বেদান্তে—এই মায়া বলতে শুধুমাত্র, মিথ্যা, অনৃত ও ভ্রান্তিই বুঝিয়েছে। তারই নাম হয়েছে মায়াবাদ এবং এই মায়াবাদই ভারতীয় দর্শনে ভাববাদের প্রধানতম ভিত্তিস্তম্ভ।

ঋগ্বেদে মায়ার কথা আছে; কিন্তু বৈদান্তিক অর্থে মায়াবাদ নেই—বড়ো জোর ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশে মায়াবাদের আভাস দেখা দিয়েছে। মায়াবাদের পরিবর্তে ঋগ্বেদে দেখা যায় দেবতাদের কৌশল ও প্রজ্ঞারই নাম হলো মায়া। ঋতের পালক ঋতজ্ঞ সখা ও নিত্যবন্ধু বরুণের প্রধানতম শক্তির নাম মায়া; তারই সাহায্যে তিনি যজ্ঞসমূহকে রক্ষা করেন, চন্দ্রের ন্যায় নিজপ্রভা বহুল-ভাবে বিস্তারিত করেন; মায়ার সাহায্যেই তিনি অন্তরীক্ষে অবস্থান করে সূর্যকে পৃথিবী থেকে পৃথক করেন এবং এই মায়াই তাঁর আয়ুধের মতো। ইন্দ্রেরও প্রধানতম কৌশল বলতে এই মায়াই: মায়ার সাহায্যেই তিনি গাভীগুলি নির্মাণ করেছিলেন, মায়ার দ্বারাই তিনি মায়াবী শুষ্ণকে পরাজিত করেন, মায়াযুক্ত মৃগকে বধ করেন এবং এমনকি ধনদাতাকে পর্যুদস্ত করেন। যে-পার্থিব ধন এবং নিরাপত্তার কামনা সমগ্র ঋগ্বেদের মূলসূত্র তা লাভ করবার কৌশলও ওই মায়াই। মায়ার দ্বারাই হোতো ব্রতকে উর্ধ্বে ধারণ করেন, অগ্নি ভুবনসমূহকে পবিত্র করেন এবং সভাগুলিকে অনুপ্রাণিত করেন। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

এই হলো ঋগ্বেদে মায়ার কথা। এ-কথা আর যাই হোক, বেদান্তের মায়াবাদ নয়। বস্তুত, সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদের মূল সুরটিই মায়াবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। পৃথিবীকে বা পার্থিব বস্তুকে অলীক বা মিথ্যা মনে করে কোনো এক চিন্ময় সত্তার কল্পনায় বিভোর হবার পরিচয় ঋগ্বেদে নেই। তার বদলে মেয়েলি ব্রতের ছড়াগুলির মতোই—বা আফ্রিকার দিন্‌ক ট্রাইবদের কবিতার মতোই—সহজ সরলভাবে একান্ত পার্থিব সম্পদের কামনা ব্যক্ত করাই বৈদিক মন্ত্রগুলির মূল কথা। তাই বৈদিক চিন্তাচেতনাকে যদি একান্তই কোনো দার্শনিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে তাকে বস্তুবাদ বলতে হবে—সে-বস্তুবাদ যতো অস্ফুট, যতো অচেতন, যতো আদিমই হোক না কেন। কেননা এখানে পরকাল বা পরলোকের কথার কোনো পরিচয় নেই, পরিচয় নেই চিন্ময় জগৎকারণের কোনো কল্পনার। তার বদলে শুধু কামনা—একান্ত পার্থিব সহজ সরল কামনা।

এবং পার্থিব কামনা-পরিপূরক কৌশল হিসেবেই ঋগ্বেদে মায়ার

মহিমায় মুখর। অতএব, ঋগ্বেদে মায়ার যে কথা তাও ওই অস্ফুট ও আদিম বস্তুবাদী চেতনারই অঙ্গীভূত।

কিন্তু বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকেরাই—বৈদান্তিকেরাই—ঋগ্বেদের এই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী ও প্রাক্-ভাববাদী চেতনার ধ্বংসস্তূপের উপর ভাববাদের প্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন এবং সে-ভাববাদের প্রধানতম ভিত্তি বলতে মায়াবাদই। এবং এই মায়াবাদ প্রসঙ্গে মায়া শব্দ আর আদিম সমাজের *craft* বা কৌশল নয়; তার বদলে বন্ধ্যা-ধারণা, মিথ্যা, মরীচিকা। আমরা দেখাতে চাইছি, মায়া শব্দের এই অর্থ-বিপর্যয়টির অন্তরালেই ভাববাদের জন্মকাহিনী প্রচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব নয়। অতএব, ভাববাদের উৎস-সন্ধানে অগ্রসর হতে হলে মায়া শব্দের অর্থ-বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

বেদ আর বেদান্তের মধ্যে একটা যুগান্তরের ইতিহাস রয়েছে—প্রাচীন প্রাক্-বিভক্ত পর্যায় থেকে প্রকট শ্রেণীবিভক্ত পর্যায়ে এসে পড়ার ইতিহাস। বেদের পর ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পর উপনিষদ বা বেদান্ত। ঋগ্বেদের যুগের শেষেই—এবং ব্রাহ্মণের যুগে আরো স্পষ্টভাবে—প্রাক্-বিভক্ত প্রাচীন সাম্য-সমাজ ভেঙে পড়বার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। প্রাক্-বিভক্ত সমাজে সকলেই সমানভাবে যৌথশ্রমে অংশ গ্রহণ করে। তাই শ্রম বা কৌশল বা *craft* সে-পর্যায়ে নিন্দিত বা হেয় বলে পরিগণিত নয়। কিন্তু সমাজের এই যৌথ সংগঠন ভেঙে যতোই শ্রেণীবিভাগ ফুটে উঠতে থাকে—সমাজের শাসক মহল শ্রমের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে যতোই মুক্ত হয়—ততোই এই শ্রম হেয় বা হীনবৃত্তি বলে পরিগণিত হতে থাকে। কেননা, নবপরিস্থিতিতে যে-শ্রেণীর মানুষের উপর এই শ্রমের দায়িত্ব সামাজিকভাবে তারা মর্যাদাহীন হয়ে দাঁড়ায়। এই নবপরিস্থিতিতে কী ভাবে মানব-চেতনায় ভাববাদের আবির্ভাব হয় তার সাধারণ যুক্তি আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি (পৃ.৮২ এবং ৫৪৩)। ভারতীয় দর্শনের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে ভাববাদের আবির্ভাব প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, যে-উপনিষদ বা বেদান্তে এই ভাববাদের আবির্ভাব তার নাম জ্ঞানকাণ্ড। বেদান্তে শুধু যে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে বিরোধ কল্পিত হয়েছে তাই নয়, কর্ম নিন্দিত হয়েছে এবং একমাত্র জ্ঞানেরই গৌরব স্বীকৃত হয়েছে। অতএব যে-মায়া বা *craft* এককালে বৈদিক মানুষদের মধ্যেই পরম গৌরবময় শক্তি বলে পরিগণিত ছিলো কালক্রমে তাই হেয়, নিন্দিত ও মিথ্যাবোধক হয়ে দাঁড়ালো।

পূর্বপক্ষ বলবেন, বেদান্তে যে-কর্মের নিন্দা তার নাম যজ্ঞকর্ম—তাকে সাধারণভাবে শ্রম বললে অর্থবিকৃতি হবে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, আদিতে এই যজ্ঞই ছিলো অন্নলাভের উপায়; যজ্ঞের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

স্বভাবতই উত্তর-যুগের উদ্ভাবন। তবু দ্রষ্টব্য এই যে, বৈদান্তিক চিন্তার মধ্যে অমন আধ্যাত্মিক প্রলেপ সত্ত্বেও কর্মকে স্বীকার করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের মূল যুক্তি এইখানেই সমাপ্ত হতে পারতো। কেননা, মায়াবাদ বা বৈদান্তিক ভাববাদ অত্যন্ত সুপরিচিত এবং আমাদের যুক্তির দিক থেকে তার বিশদ-বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু এটুকুই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, বৈদিক সাহিত্যে সমাজ-বিকাশের প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়ের বহু স্মারক পাওয়া যায়। তার থেকে প্রমাণ হয়, অন্যান্য মানবজাতির মতোই বৈদিক মানুষেরাও এককালে সমাজবিকাশের প্রাক্-বিভক্ত পর্যায়েই জীবন-যাপন করতেন। তাঁদের চিন্তাচেতনাও তখন মূলতই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী। কিন্তু এই সমাজ-সংগঠন ভেঙে যাবার ফলে, কালক্রমে, তাঁদের কাছে কর্ম নিন্দিত হয় এবং তারই ফলে তাঁদের চেতনায় আবির্ভাব হয় ভাববাদের—ঋগ্বেদের মায়ার গৌরবের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে ওঠে বৈদান্তিক মায়াবাদ।

কিন্তু এইখানেই আলোচনার শেষ না করে আমরা মায়া-প্রসঙ্গে আর একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই।

ঋগ্বেদে মায়া অবশ্যই বরুণাদি দেবতাদের *craft* বা কৌশল হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু শুধু দেবতাদেরই নয়, অসুরদেরও। বস্তুত ঋগ্বেদে মায়া যে প্রধানতই অসুর-শক্তি-বোধক ছিলো তা অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে; কেননা, 'অসুরস্য মায়য়া' বা ওই জাতীয় কথা ঋগ্বেদে বিরল নয়।

> চিত্রেভিরভ্রৈরুপ তিষ্ঠথো রবং দ্যাং বর্ষয়থো অসুরস্য মায়য়া ॥
> অর্থাৎ,
> —বিচিত্র মেঘসমূহের দ্বারা তোমরা (মিত্রাবরুণ) সরবে স্বর্গকে বর্ষণ করিতে থাক অসুরের মায়ার সাহায্যে ॥ ঋগ্বেদ: ৫. ৬৩. ৩ ॥

তাহলে দেবতাদের এই মায়া আসুরী বৈশিষ্ট্য বলেই পরিগণিত হতে পারে। কালক্রমে বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকদের কাছে মায়া নিন্দিত হয়েছিলো। কিন্তু সম্ভবত অসুর বলে বর্ণিত মানুষগুলির মন থেকে মায়ার মহিমা এ-ভাবে মুছে যায়নি। আর হয়তো সেই কারণেই তাদের চেতনাও প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী—এবং সেই অর্থে লোকায়তিকই—হয়ে থেকেছিলো। আমরা ইতিপূর্বে ঋগ্বেদ থেকেই অসুরদের লোকায়তিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি: "হে ইন্দ্র, যাহারা নিজেদের মুখে অন্নহবি প্রদান করিত তুমি মায়াসমূহের দ্বারা

সেই মায়াবাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলে।” আমরা আরো দেখেছি, তন্ত্র ও সাংখ্যকে অসুরমত বলেই গ্রহণ করবার সম্ভাবনাও সংকীর্ণ নয়। এই কারণেই কি সাংখ্যে প্রকৃতি বা অচেতন-জগৎকারণের নামান্তর হিসেবে মায়ার গৌরব অক্ষুণ্ণ থেকেছে? বেদান্তমতেও মায়াই জগৎকারণ; কিন্তু মায়া মানে মিথ্যা, তাই জগৎ মিথ্যা। অপরপক্ষে, সাংখ্যমতে এই মায়াই চূড়ান্ত সত্য। আর হয়তো তাই-ই প্রাক্-অধ্যাত্মবাদী বৈদিক চেতনার ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে বৈদান্তিক বাদরায়ণ ওই সাংখ্যমতকেই প্রধানতম প্রতিপক্ষ হিসেবে খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন।

পাদটীকা
গ্রন্থপঞ্জী
শুদ্ধিপত্র
নির্দেশ-পঞ্জী

পাদটীকা

উদ্ধৃতির কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আমরা অনেক সময় ইটালিক টাইপ ব্যবহার করেছি। পাদটীকায় উল্লিখিত ইংরেজী গ্রন্থাবলীর পূর্ণনামের জন্য গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য। খণ্ড বোঝাবার জন্য মোটা হরফ ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ হরফ পৃষ্ঠা নির্দেশক।

ভূমিকা

১ T. W. Rhys Davids DB **2**:166-72.
২ R. Garbe in ERE **8**:138.
৩ G. Tucci in PFIPC-1925, 36.
৪ S. N. Dasgupta HIP **3**:515-6.
৫ T. W. Rhys Davids *op. cit.* **2**:170-1.
৬ বৃহস্পতি-সূত্র ২:৫,৮,১২,১৬,২৯ এবং ৩:১৫—লোকায়তিকদের চোর, নরকগামী প্রভৃতি বলা হয়েছে।
৭ G. Tucci *op. cit* 36.
৮ S. K. Belvalkar & R. D. Ranade HIP **2**:459.
৯ S. Radhakrishnan IP **1**:271 ff.
১০ J. Muir in JRAS-1862, 299 ff.
১১ S. N. Dasgupta *op. cit* **3**:529, 531.
১২ G. Tucci *op. cit.* 40.
১৩ H. P. Shastri L 5-6.
১৪ T. W. Rhys Davids *op. cit.* **2**:172.
১৫ R. Garbe in ERE **8**:138.
১৬ T. W. Rhys Davids *op. cit.* **2**:172.
১৭ L. DE LA VALLEE POUSSIN in ERE **8**:494.
১৮ S. Radhakrishnan *op. cit.* **1**:278. "The substance of this doctrine is summed up by a character in the allegorical play of Prabodhacandrodaya."
১৯ J. Taylor P 4:"The work was written by Krishna Misra of Mithila...to expose, ridicule and contradict the ideas of Buddhists, Jainas, Charwakas, Kapalikas and other sects which had taken hold of the public mind in his days...."
২০ S. Radhakrishnan *op. cit.* **1**:272, 274, 283-5.
২১ সর্বসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ tr. Rangacarya. *Introduction.*
২২ J. Muir *op. cit.* 299 ff.

২৩ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১০৯ সর্গ।

২৪ বিষ্ণুপুরাণ ৩.১৮.১৪-২৬।

২৫ G. Tucci *op. cit.* 40-3.

২৬ G. Tucci *op. cit.* 40 : "*Loka* never had in Sanskrit the meaning of nature for which it is used *pradhana*, or *prakriti* or *svabhava*; so that Buddhist texts, when discussing cosmological questions, in order to avoid misunderstanding, are obliged to prefix to *loka* the word *bhajana*, when they conceive the cosmos as a material thing ; while *loka* in itself has rather the meaning of human world or class of beings *lokayatra*, *lokokti*, *lokavada*, *devaloka*. Therefore the interpretation we have to give to the name *lokayata* is quite different. It is but a science which has for its only object the *loka*, that is this world ; and this interpretation is quite in accordance with the Chinese translation of the word by Shun She or Shun su : 'those who follow the world or the customs of the world.' Therefore this Lokayata which has for its aim the *lokayatra* is the forerunner of *niti* and *arthasastra*, that is of the science which was attributed by Brahmanical sources also to Brihaspati, from whom Lokayata is called *Barhaspatya* as well as *Barhaspatyamata* had the meaning of *niti* ; in his translation of *Lalitavistara* Devakara, in order to render the name of the *Barhaspatyamata* included in the list of sciences known by the Young Bodhisatta, use the Chinese expression *wang lung*, that is the doctrine of the king"...

২৭ H. P. Shastri L *passim*.

২৮ এই গ্রন্থের পৃ. ৯৬ দ্রষ্টব্য।

২৯ এই গ্রন্থের পৃ. ৪৩৫-৬ দ্রষ্টব্য।

৩০ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম ৭৮-৮৭।

৩১ D. R. Shastri SHIMSH.

৩২ T. W. Rhys Davids *op. cit.* 2:172.

৩৩ *Ibid.*

৩৪ *Ibid.*

৩৫ *Ibid* 2:166.

৩৬ T. W. Rhys Davids BI 38-46; DB 2:96-107. cf. R. Fick SONIBT ch. 8.

৩৭ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য : ১.১.২।২.২.২।৩.৩.৫৩।

৩৮ অর্থশাস্ত্র (রাধাগোবিন্দ বসাক) ১:৬।

৩৯ T. W. Rhys Davids DB 2:46, cf. *op. cit.* 2:14, 110, 139, 166.

৪০ S. K. Belvalkar and R. D. Ranade HIP 2:403.

৪১ cf. E. B. Cowell SDS *preface* vii.

৪২ বিশ্বকোষ ১৪:৫৬৫।

৪৩ E. B. Cowell *op. cit.* vii.

৪৪ ব্রহ্মসূত্র ২. ১. ১১।

৪৫ সর্বদর্শনসংগ্রহ ১-২।

৪৬ ঐ ৩ cf. S. N. Dasgupta HIP 3:533f.

৪৭ ন্যায়কুসুমাঞ্জলি : ৩.৫.৬। cf. S.N. Dasgupta *op. cit.* 3:539.

৪৮ বুদ্ধঘোষ : সুমঙ্গলবিলাসিনী ১:২৪৭। cf. T.W. Rhys Davids *op. cit.* 2:167.

৪৯ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:512-3.

৫০ T. W. Rhys Davids *op. cit.* 2:167-8.

৫১ শুক্রনীতিসার ৪.৩.৫৫।

৫২ মনু : ৭.৪৩।

৫৩ মনু : ২.১১ ॥ ৪.৩০।

৫৪ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:518.

৫৫ ভাগবত পুরাণ : ১১.১৮.৩০ cf. S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:518

৫৬ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:518

৫৭ অর্থশাস্ত্র (বসাক) ১:১।

৫৮ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:514.

৫৯ H. P. Shastri L 4.

৬০ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:536.

৬১ G. Tucci *op. cit.* 36 : "according to the unknown author of the marginal notes to the *apabhramsa* work, *Tisatthimahapurisa gunalankara* of Pupphadanta, the Purandara named in the text was a *carvakamate-granthakarta*."

৬২ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:536.

৬৩ *Ibid* 3:536n.

৬৪ R. Garbe in ERE 8:138.

৬৫ S. K. Belvalkar & R. D. Ranade HIP 2:459.

৬৬ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম ৩৭ এবং E. B. Cowell SDS 2.

৬৭ এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬৮ এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬৯ এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৭০ মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ) ২৯০।

৭১ T. W. Rhys Davids DB 2:169.

৭২ R. Garbe IACOPVMCSS *preface* xx.
৭৩ R. Fick SONIBT 241-2.
৭৪ T. W. Rhys Davids *op. cit.* 2:170.
৭৫ The Harsa-Carita of Bana (Tr. E.B. Cowell & F.W. Thomas) 236.
৭৬ মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ) ১৩২৭-৮।
৭৭ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : ২.৩৭।
৭৮ আধুনিক বিদ্বানেরা সাধারণত এই দুটি ধারাকে আর্য এবং আর্যপূর্ব আখ্যা দেন। কিন্তু এই জাতিগত আখ্যা গ্রহণ করতে আমরা দ্বিধাবোধ করেছি। গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৭৯ J. Muir JRAS-1862, 310.
৮০ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:517-8.
৮১ বিষ্ণুপুরাণ : ৩.১৮।
৮২ মৈত্রী উপনিষদ : ৭.৮.৯।
৮৩ T. W. Rhys Davids *op. cit.* 2:167.
৮৪ *Ibid* 2:86.
৮৫ *Ibid* 2:171-2.
৮৬ এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৪৩৫ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
৮৭ এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৩৭ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
৮৮ এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৩৯ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
৮৯ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:২৭৪-৮৩।
৯০ ঐ ২:২৮৪।
৯১ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (১৬.৬) শ্রীধরভাষ্য দ্রষ্টব্য।
৯২ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:২৯৪-৫।
৯৩ J. Muir OST 3:95.
৯৪ W. W. Hunter IGI 4:183.
৯৫ *Ibid* 4:176.
৯৬ *Ibid* 4:174.
৯৭ এই গ্রন্থের পৃ. ২৪৪-৮ দ্রষ্টব্য।
৯৮ মহাপরিনিব্বানসুত্ত দ্রষ্টব্য।
৯৯ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : ভারতদর্শনসার ১৪৯।
১০০ S. K. Belvalkar & R. D. Ranade *op. cit.* 2:427f.
১০১ সাংখ্যকারিকা ২১—গৌড়পাদভাষ্য।
১০২ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:527.
১০৩ ক্ষিতিমোহন সেন : ভারতের সংস্কৃতি ১১।
১০৪ এই গ্রন্থের পৃ. ৩৭৯-৮৬ দ্রষ্টব্য।
১০৫ O. M. Ehrenfels MRI.
১০৬ S. K. Dikshit MG.

১০৭ A. L. Basham HDA 22-3.
১০৮ Tr. T. W. Rhys Davids DB 2:65ff.
১০৯ H. Jacobi in SBE 45 : xx-xxi ; A. L. Basham HDA 17.
১১০ B. M. Barua HPIP 325ff.
১১১ T. W. Rhys Davids *op. cit.* 2:73-4.
১১২ সুমঙ্গলবিলাসিনী ১.১৬৫। cf. A.L. Basham HDA 15n.
১১৩ T. W. Rhys Davids *op. cit.* 2:73n.
১১৪ A. L. Basham *op. cit.* 18.
১১৫ *Ibid* ch. iii & iv.
১১৬ *Ibid* 286.
১১৭ *Ibid* 101ff.
১১৮ *Ibid* Ch. vi-ix.
১১৯ *Ibid* 224-5.

প্রথম পরিচ্ছেদ

১ E. B. Cowell SDS 2n. cf. S. N. Dasgupta. HIP 3:515 cf. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম ৩৭।
২ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:514.
৩ গুণরত্ন : তর্কন্যায়দীপিকা ৩০০—"লোকা নির্বিচারাঃ সামান্যা লোকাস্তদ্বদাচরন্তি-স্মেতি লোকায়তা লোকায়তিকা ইত্যপি"।
৪ মাধবাচার্য : সর্বদর্শনসংগ্রহ ১।
৫ শঙ্করাচার্য : ব্রহ্মসূত্রভাষ্য : ১.১.১ : "দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতজনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ"।
৬ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:514-5.
৭ *Ibid* 3:515n.
৮ হরিভদ্র : ষড়্দর্শনসমুচ্চয় ৮১ শ্লোক।
৯ St. Petersburg Dictionary-তেও লোকায়ত শব্দের অর্থ করা হয়েছে materialism. cf. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : বঙ্গদর্শন—শ্রাবণ ১২৮১, "ইহলোক ঐ দর্শনের সর্বস্ব, তজ্জন্যই উহার ঐরূপ নামকরণ হয়"।
১০ মণিভদ্র : ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের টীকা, ৮১ শ্লোক।
১১ *Ibid.*
১২ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:514.
১৩ পাণিনি ৭.৩.৪৫।
১৪ G. Tucci (in PFIPC-1925 : 35) এ-বিষয়ে আরো তথ্য উল্লেখ করেছেন। R. Garbe (ERE 8:138) আরো একটি প্রমাণ হিসেবে ভাস্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (৩.৩.৫৩) উল্লেখ করেছেন।

১৫ J. Nehru DI 80.
১৬ *Ibid* 77.
১৭ T. W. Rhys Davids DB 2:167. cf. S. N. Dasgupta *op. cit.* 3: 513.
১৮ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:512n.
১৯ *Ibid* 3:512.
২০ সর্বদর্শনসংগ্রহ ৫।
২১ হরিভদ্রের ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের গুণরত্ন ও মণিভদ্রের টীকা দ্রষ্টব্য।
২২ যথা…"the fundamental characteristic of Indian thought was an idealistic one": G. Tucci PFIPC-1925, 35.
২৩ *Philosophy for the Future* দ্রষ্টব্য।
২৪ H. K. Wells *Pragmatism: Philosophy of Imperialism* ইত্যাদি।
২৫ S. Radhakrishnan HPEW 1:21.
২৬ মৈত্রী উপনিষদ ৭. ৮. ৯।
২৭ বিষ্ণুপুরাণ ৩.১৮।
২৮ মনু ৪. ৩০।
২৯ মনু ২. ১১ ইত্যাদি।
৩০ S. N. Dasgupta HIP 3:532.
৩১ *Ibid.*
৩২ অর্থশাস্ত্র (রাধাগোবিন্দ বসাক) ১:৬।
৩৩ মনু ১০. ১১৬ ॥ cf. SBE 25:86, 106sq., 420sq., 420n.
৩৪ SBE 14:176.
৩৫ শঙ্করভাষ্য ব্রহ্মসূত্র : ১. ১. ১।
৩৬ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:514.
৩৭ M. Monier-Williams SED 906.
৩৮ H. P. Shastri L 6.
৩৯ *Ibid.*
৪০ বিশ্বকোষ ৫:২০২।
৪১—৪৩ আমরা পৃ. ৫০৯-১১তে এই মতগুলির উল্লেখ করেছি।
৪৪ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:527.
৪৫ *Ibid.*
৪৬ T. A. G. Rao EHI Vol. I. Part I.
৪৭ J. Marshall MIC 1:51.
৪৮ ঋগ্বেদ ২. ২৩. ১।
৪৯ বাজসনেয়ী সংহিতা ২৩. ১৯।
৫০ ঋগ্বেদ ২. ২৩. ১. cf. R. G. Bhandarkar VS 147ff.
৫১ A. Avalon PT *preface* x.
৫২ ব্রহ্মসূত্র ১. ১. ১ ॥ "অথ" শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে শঙ্কর রামানুজ প্রমুখের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৫৩ K. Marx and F. Engels GI ইত্যাদি।

৫৪ G. Thomson R 9.

৫৫ ক্ষিতিমোহন সেন : ভারতের সংস্কৃতি, ভূমিকা।

৫৬ J. Nehru DI 57, 60, 68, 78.

৫৭ A. B. Keith RPVU 18, 24, 33, 54, 91, 92 ইত্যাদি।

৫৮ বাঙালীর ইতিহাস: নীহাররঞ্জন রায়। ভারতের সংস্কৃতি: ক্ষিতিমোহন সেন। S. Radhakrishnan HPEW, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৫৯ *Ibid.*

৬০ B. H. Kirman TMM 29.

৬১ I. P. Pavlov LCR Chapters 11, 20, 21 ইত্যাদি।

৬২ G. Thomson R 7.

৬৩ K. Marx and F. Engels GI 20: "Division of labour only becomes truly such, from the moment when a division of mental and material labour appears. From this moment onwards, consciousness *can* really flatter itself that it is something other than consciousness of existing practice, that it is *really* conceiving something without conceiving something real; from now on consciousness is in a position to emancipate itself from the world and to proceed to the formation of 'pure' theory, theology, philosophy, ethics, etc."

৬৪ F. Engels DN 288-9.

৬৫ শঙ্করমতে জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, কর্ম পুরুষতন্ত্র। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১. ১. ৪। কালীবর বেদান্তবাগীশের তর্জমা ১:১০৫-৮ দ্রষ্টব্য।

৬৬ F. Engels SUS (Karl Marx, Selected Works 1:179)

৬৭ H. L. Morgan AS 562.

৬৮ *Ibid* 561; cf. G. Thomson AA 426 "...such a study must be undertaken by scholars, who, like Morgan, believe that 'a mere property career is not the final destiny of mankind'."

৬৯ K. Marx and F. Engels C 209.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১ C. Caudwell IL.

২ F. Engels OFPPS.

৩ H. L. Morgan AS.

৪ G. Thomson AA এবং SAGS.

৫ G. Thomson SAGS 36.
৬ H. P. Shastri L.
৭ D. R. Shastri SHIMSH.
৮ H. P. Shastri *op. cit.* 5.
৯ এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
১০ H. P. Shastri *op. cit.* 6.
১১ এই গ্রন্থের ৪৩৫-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
১২ A. Barth RI 214.
১৩ *Ibid.*
১৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কপালকুণ্ডলা।
১৫ প্রবোধচন্দ্রোদয়।
১৬ R. G. Bhandarkar VS 128.
১৭ আনন্দগিরি : শঙ্করবিজয় ॥ সপ্তদশ প্রকরণ, পৃ. ১১৫ ॥
১৮ অর্থশাস্ত্র (রাধাগোবিন্দ বসাক) ১:৮।
১৯ H. P. Shastri *op. cit.* 6.
২০ বাৎস্যায়ন : কামসূত্রম্ ১.২,২৯-৩০।
২১ F. Engels OFPPS 61.
২২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম ৮২।
২৩ M. N. Dutta RVS 801n.
২৪ মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ) ১০৯।
২৫ SBE 12:194, 257sq., 261sq., 277, 281, 334, 336, 337sq., 381, 386, 388sq., 395sq., 398. 41:15, 56, 171, 179sq., 192, 199, 211sq., 215, 219sq., 222, 239sq., 248sq., 254, 349, 384sq., 391.
২৬ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) ৬-৭।
২৭ এই গ্রন্থের ৪৩৫-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২৮ ঐ।
২৯ JAS (s) *XIX*-1953 No. 1, Page 7.
৩০ E. T. Dalton DEB 196.
৩১ E. Westermarck HHM 30.
৩২ *Ibid* cf. J. Frazer GB ch. xi.
৩৩ JAS (s) *XIX*-1953 No. 1, Page 7.
৩৪ E. T. Dalton *op. cit.* 196.
৩৫ J. Frazer GB 135-6.
৩৬ *Ibid.* ch. xi.
৩৭ *Ibid.*
৩৮ এই গ্রন্থের ৪৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৩৯ H. P. Shastri *op. cit*, 4.
৪০ সর্বদর্শনসংগ্রহ ২।

৪১ R. E. Hume TPU 191.
৪২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) ১৩৮।
৪৩ SBE. 1:21.
৪৪ R. E. Hume *op. cit.* 188.
৪৫ ছান্দোগ্য উপনিষদ : ১. ৮. ১।
৪৬ ঐ : ১. ২. ১৩।
৪৭ S. Radhakrishnan IP 1:149.
৪৮ যথা, রামানুজ সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা এই ব্যাখ্যা স্বীকার করবেন না। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১.১.১ দ্রষ্টব্য।
৪৯ S. Radhakrishnan *op. cit.* 1:149.
৫০ T. W. Rhys Davids BD 2:161.
৫১ ছান্দোগ্য উপনিষদের শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।
৫২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) ২৩৫।
৫৩ দুর্গাদাস লাহিড়ী : ঋগ্বেদ সংহিতা ২৯।
৫৪ ঐ ৩১।
৫৫ M. Monier-Williams SED.
৫৬ অর্থশাস্ত্র (রাধাগোবিন্দ বসাক) ২:২০৯।
৫৭ হরিবংশ ৩৮ অধ্যায়।
৫৮ মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ) ২১৫।
৫৯ ঐ ৭৫৬।
৬০ ঐ ২৩৮।
৬১ H. H. Risley PI 793.
৬২ A. K. Iyer MTC 1:248.
৬৩ E. Thurston and Rangacari CTSI 1:'*Bholia*'
৬৪ ক্ষিতিমোহন সেন : জাতিভেদ ৯৮-১০৭।
৬৫ ঋগ্বেদ : ৭. ১৮. ১৯।
৬৬ ঐ।
৬৭ ঋগ্বেদ : ৭. ১৮. ৬।
৬৮ শতপথব্রাহ্মণ ১৩. ৫. ৪.৯।
৬৯ কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ৪. ১.।
৭০ ক্ষিতিমোহন সেন : জাতিভেদ ৯৮।
৭১ ঐ।
৭২ ঐ।
৭৩ ঐ ৯৯।
৭৪ ঐ।
৭৫ ঋগ্বেদ : ৯. ১১৪. ২।
৭৬ A. A. Macdonell VM 153.
৭৭ *Ibid.*

৭৮ ক্ষিতিমোহন সেন : জাতিভেদ ৯৯।

৭৯ ঐ ৯৯-১০১।

৮০ A. A. Macdonell *op. cit.* 153.

৮১ H. L. Morgan AS 86.

৮২ *Ibid* 170.

৮৩ E. W. Hopkins in PAOS-1894. CLIV.

৮৪ Oldenberg ইত্যাদি। A. B. Keith RPVU 46, 47, 49, 54, 74 ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৮৫ W. E. Armstrong in EB 22:315.

৮৬ A. Moret and G. Davy FTE Part II.

৮৭ *Ibid* 5.

৮৮ *Ibid* 14.

৮৯ G. Thomson SAGS ch. xiv.

৯০ ছান্দোগ্য উপনিষদ ১.৩.৬।

৯১ G. Thomson FP ch. I.

৯২ G. Thomson SAGS 445.

৯৩ *Ibid* 446.

৯৪ *Ibid.*

৯৫ *Ibid.*

৯৬ *Ibid.*

৯৭ *Ibid* ch. xiv.

৯৮ *Ibid.*

৯৯ J. E. Harrison AAR 30.

১০০ *Ibid* 30f.

১০১ G. Thomson SAGS 440.

১০২ *Ibid*

১০৩ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার ব্রত ৩।

১০৪ ঐ ৫২-৩।

১০৫ ঐ ২।

১০৬ ঐ ২-৩।

১০৭ ঐ ৪-৫।

১০৮ ঐ ৭।

১০৯ ঐ ২১ ইত্যাদি।

১১০ ঐ ৮।

১১১ J.E. Harrison AAR 37.

১১২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার ব্রত ২১।

১১৩ প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য সংক্রান্ত তথ্যাবলি অধ্যাপক জর্জ টম্সনের রচনায় দ্রষ্টব্য।

১১৪ R.E. Hume TPU 184.
১১৫ আধুনিক আধ্যাত্মিক অর্থে উপাসনা নয়। এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
১১৬ G. Thomson SAGS ch. 14.
১১৭ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) ৫৬।
১১৮ ঐ ২৩৮-৪০ এবং ৪৫০-৫১।
১১৯ ঐ শুনঃশেপের উপাখ্যান। এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
১২০ S.A. Dange IPCS ch. 2.
১২১ G. Thomson SAGS ch. 14 দ্রষ্টব্য।
১২২ সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জানবার কথা ৮:৫৮
১২৩ ঐ : ৮:৬৩-৬৪।
১২৪ Moncalm OTS.
১২৫ G. Thomson SAGS 451.
১২৬ *Ibid* 443.
১২৭ চার্বাক নামের গুণরত্ন প্রদত্ত ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের ৪৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
১২৮ F. Engels OFPPS ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
১২৯ *Ibid* 7.
১৩০ F. Engels LF, AD ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।
১৩১ G. Thomson AA 421 ; SAGS 43 ; FP 43-4, ইত্যাদি।
১৩২ বেদান্তসার প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।
১৩৩ H. L. Morgan AS 3.
১৩৪ *Ibid* 10-1, 56.
১৩৫ *Ibid* 17-8.
১৩৬ G. Thomson SAGS 34.
১৩৭ G. Childe MMH 51.
১৩৮ G. Thomson *op. cit.* 35.
১৩৯ *Ibid* 85.
১৪০ F. Engels OFPPS 30.
১৪১ G. Thomson *op. cit.* 85-6.
১৪২ *Ibid* 57 : "To tell the whole story from beginning to end would not only reveal the present as a continuation of the past—it would lift the veil on the future. There's the rub."
১৪৩ K. Marx & F. Engels C 209.
১৪৪ *Ibid.*
১৪৫ কর্ণপর্ব ৩৪:১১৯।
১৪৬ এই গ্রন্থের ২৩২-৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
১৪৭ G. Thomson SAGS 155: আমেরিকার ইরোকোয়া এবং ভারতের খাসিদের মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত। অন্যান্য ভারতীয় দৃষ্টান্তের জন্য O. R. Ehrenfels-এর MI দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১ G. W. F. Hegel PH 147.
২ *Ibid* 148.
৩ *Ibid* 149.
৪ Moreland IDA 22; R. P. Dutt IT 48.
৫ Census of 1871-2. cf. W. W. Hunter IGI 4:164-5.
৬ যথা, Queen's Proclamation of 1858. See R. P. Dutt IT 286-7. cf. H. Maine VCEW 46.
৭ এ-জাতীয় প্রচারের চূড়ান্ত জবাব হিসেবে Castro *GH* দ্রষ্টব্য।
৮ A. Mitra CWB 1951—TCWB 7.
৯ বাজসনেয়ী সংহিতা ২৩. ১৯।
১০ ঋগ্বেদ ২. ২৩. ১।
১১ W. Crooke RFNI 250.
১২ ক্ষিতিমোহন সেন: জাতিভেদ ৬৪।
১৩ H. Mitra in VQ 1931-32, 1935.
১৪ A. Getty G.
১৫ ঋগ্বেদ ২. ২৩. ১। cf. R. G. Bhandarkar VS 149.
১৬ এই গ্রন্থের ৩০৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
১৭ K. P. Jayaswal HP.
১৮ R. C. Majumder CLAI.
১৯ ক্ষিতিমোহন সেন: জাতিভেদ ৬৪।
২০ M. Monier-Williams SED 343.
২১ অতুলচন্দ্র গুপ্ত: শিক্ষা ও সভ্যতা ১৪৪।
২২ ঋগ্বেদ ২. ২৩. ১ ॥ ১০. ১১২. ৯ ॥ cf. P. V. Kane HD 2:213.
২৩ বিশ্বকোষ ৫:২০৫।
২৪ A. Getty G Plates দ্রষ্টব্য।
২৫ বিশ্বকোষ ৫:২০৫। cf. P. V. Kane HD 2:716 cf. A. Getty G 22.
২৬ A. Coomarswamy in BBMFA 26 (1928):30.
২৭ M. Monier-Williams *op. cit.*—'*Gana*'.
২৮ *Ibid.*
২৯ *Ibid.*
৩০ বিশ্বকোষ ৫:২০২।
৩১ শিক্ষা ও সভ্যতা ১৪৪।
৩২ R. G. Bhandarkar VS 147.
৩৩ *Ibid.*

৩৪ *Ibid.*

৩৫ মানবগৃহ্য সূত্র ২. ১৪।

৩৬ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১.২৭১-৬। cf. R. G. Bhandarkar VS 145.

৩৭ মানবগৃহ্যসূত্র ২.১৪।

৩৮ P. V. Kane HD 2:xi.

৩৯ P. V. Kane প্রভৃতির গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৪০ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১.২৭১-৬।

৪১ পঞ্চানন তর্করত্ন : ঊনবিংশসংহিতা ১৫৭।

৪২ শিক্ষা ও সভ্যতা ১৪৪।

৪৩ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১.২৯৩ ইত্যাদি।

৪৪ বিশ্বকোষ ৫:২০২।

৪৫ M. Monier-Willams *op. cit.* 343.

৪৬ বৌধায়ন ২.৫.৮৩-৯০ ॥ SBE 14:254. cf. P. V. Kane *op. cit* 2:213.

৪৭ বিশ্বকোষ ৫:২০২।

৪৮ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ : গণেশখণ্ড ॥

৪৯ T. A. G. Rao EHI 1:60.

৫০ B. N. Datta SISP 13.

৫১ শিক্ষা ও সভ্যতা ১৪৪।

৫২ Introduction to A. Getty G xv.

৫৩ A Getty G *Plates* xix & xxiii (a) & (b).

৫৪ *Ibid* 43.

৫৫ *Ibid* Plates xviii (a) & (d).

৫৬ *Ibid* 43.

৫৭ A. Getty GNB 160-1.

৫৮ *Ibid.*

৫৯ *Ibid.*

৬০ H. H. Wilson RSH. অক্ষয়কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।

৬১ B. N. Datta SISP 28. "It is said that the words Sudra means *one who grieves*"...

৬২ *Ibid* 28ff.

৬৩ শিক্ষা ও সভ্যতা ১৪০-১।

৬৪ মনু ৩.১৬৪।

৬৫ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ড।

৬৬ বিশ্বকোষ ৫;২০২।

৬৭ ঐ : "গণপতিতত্ত্ব নামক গ্রন্থের মতে গণেশই পরব্রহ্ম"...।

৬৮ A. Getty G 5.

৬৯ *Ibid*—Quotations in Title pages.

৭০ A. Coomarswamy BBMFA 26 (1928) 30—"the figure of

Ganesa appears suddenly and not rarely in the Gupta period." cf. P. V. Kane HD 2:215 & 725.

৭১ JRAS April, 1898. cf. A. Coomarswamy. BBMFA 26 (1928)—30 ; A.Getty G. 3.

৭২ ERE 6:175.

৭৩ M. Monier-Williams SED 343 : "and to denote his sagacity, has the head of an elephant."

৭৪ R. G. Bhandarkar VS 149.

৭৫ Introduction to A. Getty G xxi.

৭৬ Kennedy HM 353f.

৭৭ T. G. N. Rao EHI Vol. I Part I.

৭৮ বরাহপুরাণ। cf. H. Mitra in VQ-May 1935, 105.

৭৯ শিবপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ। cf. H. Mitra *op. cit.* cf. A. Getty G 5.

৮০ ERE 2:808.

৮১ বিশ্বকোষ ৫:২০২।

৮২ H. Mitra *op. cit.* 105. cf. A Getty G 7 ; T. G. N. Rao EHI Vol. I. Part I.

৮৩ মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি।

৮৪ ERE 2:808.

৮৫ A. Getty G 5.

৮৬ F. Engels AD 470-2.

৮৭ A. Getty G xxiv.

৮৮ ক্ষিতিমোহন সেন : জাতিভেদ ৬৪।

৮৯ H. Mitra *op. cit.* 1935, 104.

৯০ ঋগ্বেদ ২. ২৩. ১।

৯১ বাজসনেয়ী সংহিতা ২৩. ১৯।

৯২ M. Monier-Williams *op. cit.* 548.

৯৩ *Ibid.*

৯৪ বিশ্বকোষ ১০·১২৬-৭।

৯৫ এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯৬ H. P. Shastri AV 2.

৯৭ ক্ষিতিমোহন সেন : জাতিভেদ, ৬৪।

৯৮ G. Thomson AA 2.

৯৯ R. P. Dutt IT 314.

১০০ K. P. Jayaswal HP 1:vi.

১০১ Modern Reivew : 1919, March.

১০২ Amrita Bazar Patrika : 1919, 20th F

১০৩ H. L. Morgan AS 47-154.

১০৪ সভাপর্ব ২৭.১৬।

১০৫ K. P. Jayaswal HP 1:156.

১০৬ P. V. Kane HD 2:66.

১০৭ *Ibid* 2:67.

১০৮ পাণিনি ৫.২.২১ ও ৫.২.৫২।

১০৯ P. V. Kane *op. cit.* 2:67.

১১০ প্রভাখ্যটীকা ৩০৭।

১১১ A. A. Macdonell SED—*Gana.*

১১২ H. H. Wilson SED—*Gaṇa.*

১১৩ M. Monier-Williams SED 343.

১১৪ J. F. Fleet in JRAS-1915, 138.

১১৫ *Ibid.*

১১৬ cf. G. Thomson SAGS 97.

১১৭ JRAS 1914:413-4, 745-7 ; 1915:138-40, 533-5, 802-4.

১১৮ K. P. Jayaswal HP 1:29 cf. F. W. Thomas JRAS-1915, 534. R. G. Bhandarkar in IA-1913, 161 cf. J. F. Fleet JRAS 1914 : 745f. cf. R. G. Bhandarkar VS 104.

১১৯ K. P. Jayaswal HP 1:27-8.

১২০ *Ibid* 1:28.

১২১ *Ibid* 1:28.

১২২ *Ibid* 1:29.

১২৩ H. L. Morgan AS 105.

১২৪ Jataka 1:422 cf. K. P. Jayaswal *op. cit.* 1:30.

১২৫ K. P. Jayaswal *op. cit.* 1:31-2.

১২৬ *Ibid* 1:35.

১২৭ পাণিনি ৫.৩.১১৪ ॥

১২৮ মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ) ১১১৫-৭।

১২৯ K. P. Jayaswal *op. cit.* 1:36.

১৩০ *Ibid.* 1:38.

১৩১ H. L. Morgan AS 393.

১৩২ F. Engels OFPPS 257ff.

১৩৩ H. L. Morgan AS 393ff.

১৩৪ এই কারণে অধিকাংশ লেখকই *tribe* শব্দটিকে প্রায় নির্বিচারে ব্যবহার করে থাকেন।

১৩৫ G. Thomson SAGS ch. iii.

১৩৬ H. L. Morgan AS Part III.

১৩৭ যদিও অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে বিবাহ-সম্পর্ক পরিবর্তিত হতে তুলনায়

বেশি সময় লাগতে পারে; তাই এ-অনুমান যন্ত্রচালিতের মতো করা সঙ্গত নয়।

১৩৮ উত্তরে খাসি এবং দক্ষিণে নায়ারদের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। O. R. Ehrenfels MI দ্রষ্টব্য।

১৩৯ G. Thomson SAGS 155.

১৪০ *Ibid.* 71-2.

১৪১ বিশ্বকোষ ৫:১৯৮।

১৪২ ঐ।

১৪৩ ঐ ৫:২০০।

১৪৪ মনু ৪.২১৯।

১৪৫ কাত্যায়ন ২২.১১.২ cf. বিশ্বকোষ ৫:২০০।

১৪৬ কর্ণপর্ব ৪৪.৪৫।

১৪৭ P. V. Kane HD 2:376.

১৪৮ মনু ২.৩৯।

১৪৯ বিশ্বকোষ ২০:১০১।

১৫০ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : ব্রাত্য। 'প্রাচী'-অগ্রহায়ণ ১৩৩০।

১৫১ ঐ।

১৫২ পাণিনি ৫.৩.১১৩।

১৫৩ ঋগ্বেদ ১০. ৩৪. ১২।

১৫৪ বিশ্বকোষ ১০:১০১।

১৫৫ P. V. Kane HD 2:386.

১৫৬ *Ibid.*

১৫৭ বিশ্বকোষ ১০:১০৩।

১৫৮ শান্তিপর্ব ১০৭।

১৫৯ ঐ।

১৬০ ঐ।

১৬১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম ১৪২।

১৬২ ঐ ১৪৫।

১৬৩ cf. W. W. Hunter IGI 4:177 "the whole village feasts, hunts and worships together...So strong is the bond of race, that expulsion from the tribe was the only Santhal punishment."

১৬৪ দুঃখের বিষয়, আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই এ-ভাবে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট নন।

১৬৫ এই তথ্য সংশোধন-সাপেক্ষ। শুদ্ধিপত্র দ্রষ্টব্য।

১৬৬ বিশ্বকোষ ১৫:৪৬৯।

১৬৭ A. Moret & G. Davy FTE 115ff.

১৬৮ *Ibid.* 128ff.

১৬৯ *Ibid.* 133.

১৭০ ক্ষিতিমোহন সেন: জাতিভেদ ১০০: "মাতঙ্গ অর্থ হস্তী। মহাভারত ও পুরাণের বহু স্থলেই মাতঙ্গ চণ্ডালদের কথা পাই"।
১৭১ E. Thurston & Rangacari CTSI- *Ane.*
১৭২ T. W. Rhys Davids BI 23.
১৭৩ P.V. Kane HD 4:215, 725.
১৭৪ বিশ্বকোষ ৫:৪২৮।
১৭৫ অর্থশাস্ত্র (রাধাগোবিন্দ বসাক) ২:২০৮।
১৭৬ cf. W. W. Hunter IGI 4:177.
১৭৭ *Ibid* 4:191ff.
১৭৮ অর্থশাস্ত্র (রাধাগোবিন্দ বসাক) ২:২০৮-১২।
১৭৯ ঐ ২:২০৯-১২।
১৮০ ঐ ২:২০৯।
১৮১ *Epigraphia Indica* 1:243; 18:304.
১৮২ অর্থশাস্ত্র (বসাক) ২:২০৯।
১৮৩ ঐ ২:২১০।
১৮৪ W.W. Hunter IGI 4:165.
১৮৫ অবশ্যই ব্যবসাদার, ধর্মপ্রচারক, আড়কাঠি প্রভৃতির কৃপায় বর্তমান ভারতের ট্রাইব্যাল সংগঠনগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক কৃত্রিমতা প্রবেশ করেছে।
১৮৬ W.W. Hunter *op. cit.* 4:171.
১৮৭ *Ibid* 4:174.
১৮৮ *Ibil* 4:183.
১৮৯ *Ibid* 4:172.
১৯০ *Ibid* 4:179.
১৯১ R.C. Dutta PB 11.
১৯২ F. Engels OFPPS 268.
১৯৩ M. Wilks HSSI.
১৯৪ G. Campbell MI.
১৯৫ H.S. Maine VCEW.
১৯৬ *Ibid* 51.
১৯৭ G.W.F. Hegel PH 161.
১৯৮ এই গ্রন্থের ২৬১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।
১৯৯ J.E.Lipps in GA (Ed. Boas)516.
২০০ B.H. Baden-Powell IVC 4,5.
২০১ *Ibid.*
২০২ M.Wilks HSSI 114.
২০৩ *Ibid* 111.
২০৪ *Ibid* 112-13.

২০৫ A.B. Keith & A. A. Macdonell VI 2:214-5.

২০৬ IA-1910, 199-204 cf. K.P.Jayaswal HP 2:180.

২০৭ cf. Nilakantha, quoted by K.P. Jayaswal HP. 2:177. :
"The king's right is limited to the collection of tax therefrom. Therefore what is technically called at present as 'gift of land' etc. (by the king) does not mean giving away of land but a mere creation of allowance."

২০৯ K.P. Jayaswal HP 2:181.

২১০ R.P. Dutt IT 215ff.

২১১ K.P. Jayaswal *op. cit.* 2:181.

২১২ *Ibid.* 2:174ff.

২১৩ *Ibid.* 2:180.

২১৪ *Ibid.* 2: §345.

২১৫ *Ibid.* 2:181.

২১৬ *Ibid.*

২১৭ B.H. Baden-Powell IVC 5.

২১৮ G.W.F. Hegel PH 161.

২১৯ K. Marx C 357-8.

২২০ SAGS 151 থেকে অনুমান হয় অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনেরও খানিকটা যেন এই রকমেরই মত।

২২১ K. Marx C 334.

২২২ F. Engels OFPPS 160.

২২৩ W. W. Hunter IGI 4:192.

২২৪ F. Engels *op. cit.* 254-6.

২২৫ K. Marx BRI.

২২৬ P. V. Kane HD 2:19 "The number of works dealing with the origin and characteristics of the caste system in India is legion."

২২৭ P. V. Kane *op. cit.* 2:19ff. দ্রষ্টব্য।

২২৮ R. Fick SONIBT 1-2. cf T. W. Rhys Davids BI *preface.*

২২৯ T. W. Rhys Davids BI and R. Fick SONIBT.

২৩০ Fick *op. cit.* 10.

২৩১ *Ibid.*

২৩২ *Ibid.*

২৩৩ *Ibid.*

২৩৪ *Ibid.* 4-7.

২৩৫ *Ibid.* 2-3.

২৩৬ কিন্তু ট্রাইব ও কাস্ট-এর মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় এবং প্রভেদই বা কী সে-বিষয়ে আলোচনা তাঁরা তোলেন না।

২৩৭ R. V. Russell & Hiralal TCCPI 2:26, 39, 80.

২৩৮ H. L. Morgan AS 86.

২৩৯ *Ibid.* 124ff.

২৪০ G. Thomson AA ch. 2.

২৪১ *Ibid.*

২৪২ H. L. Morgan AS 84-5, 73.

২৪৩ ERE 3:232.

২৪৪ অবশ্যই মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কানে (HD 2:24) এই পঞ্চায়েতকে জাতি-ব্যবস্থার অপরিহার্য লক্ষণ মনে করেননি ; তার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি প্রধানতই ব্যবস্থাটির স্মৃতিশাস্ত্র-বর্ণিত রূপের প্রতিই দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছেন। E. Senart (Cl 66-73) পঞ্চায়েতকে জাতি-ব্যবস্থার অপরিহার্য লক্ষণ মনে করেন।

২৪৫ ERE 3:233. অন্যান্য লেখকও *caste*-এর আলোচনা-প্রসঙ্গে বিনা-দ্বিধায় *tribe* শব্দ ব্যবহার করে থাকেন।

২৪৬ R. Fick in ERE 6:353-88 ; P. V. Kane HD 2:479-501.

২৪৭ বিশ্বকোষ ৫:৫০০।

২৪৮ ঐ।

২৪৯ স্মৃতিশাস্ত্র-বর্ণিত জাতি-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে রিস্-ডেভিড্স্ বা ফিক্-এর মন্তব্য স্বভাবতই স্মৃতিশাস্ত্র-বর্ণিত গোত্র-ব্যবস্থা প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য।

২৫০ বিশ্বকোষ ৫:৫০০।

২৫১ পাণিনি ৪.১.১৬২।

২৫২ প্রভাখ্য-টীকা।

২৫৩ বিশ্বকোষ ৫:৫০৩।

২৫৪ বিশ্বকোষ ৫:৫০৩-৪। ক্ষিতিমোহন সেন-এর জাতিভেদ এবং M. Monier-Williams SED দ্রষ্টব্য।

২৫৫ যথা মাহিলীদের মধ্যে (ক্ষিতিমোহন সেন : জাতিভেদ ১০২) একটি গোত্রের নাম হস্তোয়ার—সংস্কৃত তর্জমায় আমরা তাকেই বলবো কাশ্যপ। বস্তুত, এই কাছিমের নাম থেকেই ক্লানের নামকরণ করবার দৃষ্টান্ত অ-ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যেও দুর্লভ নয়—H. L. Morgan AS দ্রষ্টব্য।

২৫৬ বিশ্বকোষ ৫:৫০৩-৪।

২৫৭ রাসেল প্রমুখের রচনা দ্রষ্টব্য। cf. ERE 3:233 "castes are divided not only into sub-castes or endogamous groups, within whose limits marriage must take place, but also into exogamous sections—septs, *gotras* or clans—the members of which are regarded as so closely related that they are not allowed to intermarry."

২৫৮ R. Fick SONIBT ch. 12.

২৫৯ এই প্রসঙ্গে ফিক্-উদ্ধৃত দশব্রাহ্মণ-জাতক (SONIBT 217ff) বিশেষ

চিত্তাকর্ষক। cf. ERE 3:231. "In most parts the *dom* is a scavenger and basket-maker, but in Kashmir he is a cultivator, in Kumaon a stone-mason, in Assam a fisherman and in the Orissa states a hewer and splitter of wood."

২৬০ ERE 8:238.

২৬১ G. Thomson AA 44.

২৬২ *Ibid*. 45.

২৬৩ T. W. Rhys Davids BI 38f.

২৬৪ E. Senart CI cf. Ibbetson PC.

২৬৫ যদিও বিদ্বান-বিশেষ এই প্রথারই ভূয়সি প্রশংসা করেছেন। যথা: S. Low VI 262-3; Abbe Dubois—see Kane HD 2:20.

২৬৬ K. Marx FRBRI.

২৬৭ অন্তত বাংলা দেশের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তা নয়। এই গ্রন্থের পৃ. ৪০০-৪০১ দ্রষ্টব্য।

২৬৮ এ-বিষয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত বোধহয় মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের শক্তিভাষ্য।

২৬৯ H. S. Maine VCEW *Lectures* 1 & 2.

২৭০ *Ibid*. 20.

২৭১ *Ibid*. 39.

২৭২ *Ibid*. 52.

২৭৩ Quoted in LPI 131.

২৭৪ K. Marx C 358.

২৭৫ H. S. Maine *op. cit*. 55-6.

২৭৬ *Ibid*. 21-2. মেইন অবশ্যই ট্রাইব্যাল শব্দ ব্যবহার করছেন না; তার বদলে বলছেন, "India, because it is the great repository of verifiable phenomena of ancient usage and ancient judicial thought..."

২৭৭ *Ibid*. 57-8.

২৭৮ *Ibid*. 53-4.

২৭৯ *Ibid*.

২৮০ *Ibid*. 13-4.

২৮১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলার ব্রত ৩ এবং ৯।

২৮২ ঐ ১৮-২৩।

২৮৩ ঐ ৮।

২৮৪ G. Thomson SAGS 33.

২৮৫ *Ibid*. 33.

২৮৬ F. Engels OFPPS 259ff.

২৮৭ *Ibid*. 259.

২৮৮ G. Childe WHH, S. Piggot PI ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

২৮৯ G. Childe A 78-93.

২৯০ বর্তমান ঐতিহাসিক গবেষণা ক্রমশই এ-সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী হচ্ছে।
২৯১ পাণিনি ৪.৩.৯ এবং ৫.৩.১১৪।
২৯২ K. P. Jayaswal HP 1:ch. v.
২৯৩ T. A. G. Rao EHI 1:287.
২৯৪ *Ibid.* 1:294
২৯৫ *Ibid.* 1:295.
২৯৬ *Ibid.* 1:95-6.
২৯৭ *Ibid.* 1:52-63.
২৯৮ G. Thomson AA ch. 1.
২৯৯ অর্থশাস্ত্র (বসাক) ২০৯।
৩০০ জয়সওয়াল মজুমদার প্রমুখের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৩০১ T. A. G. Rao EHI 1:52-63.
৩০২ *Ibid.* 1:54.
৩০৩ বৃহৎতন্ত্রসার (বসুমতী) ৩১।
৩০৪ cf. Colebrooke ME 1:212.
৩০৫ বিশ্বকোষ ৫:২০৬।
৩০৬ ঐ ৫:২০৮।
৩০৭ ঐ ৫:২০৫।
৩০৮ P. V. Kane HD 2:716.
৩০৯ W. Crooke RFNI 250.
৩১০ A. Getty G *plate* 2c.
৩১১ T. A. G. Rao EHI Vol. I Part I.
৩১২ বিশ্বকোষ ৫:২০২।
৩১৩ A. Getty G 7; ERE 6:176; বিশ্বকোষ ৫:২০২; T. A. G. Rao EHI Vol. I Part I.
৩১৪ আনন্দগিরি : শঙ্করবিজয়, সপ্তদশ প্রকরণ।
৩১৫ "বামবাহুল্যাৎ" শব্দ দ্রষ্টব্য : পৃ. ১১৫।
৩১৬ R. Briffault M 3:2.
৩১৭ G. Thomson SAGS 41-2.
৩১৮ E. J. Krige SSZ 190.
৩১৯ ERE 1:227.
৩২০ *Ibid.*
৩২১ *Ibid.*
৩২২ R. Briffault M 3:2ff.
৩২৩ *Ibid.*
৩২৪ *Ibid.*
৩২৫ *Ibid.*
৩২৬ *Ibid.*

৩২৭ G. Thomson SAGS 150.

৩২৮ S. Piggot PI ইত্যাদি। অবশ্যই এই প্রকল্পকে সন্দেহ করা হয়েছে—P. V. Kane *Presidential Address* : *All India History Congress—16th Session*. B. K. Chatterji in CR—May 1956.

৩২৯ O. R. Ehrenfels MRI 2.

৩৩০ *Ibid.* 8.

৩৩১ R. P. Chanda IAR 150-1.

৩৩২ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বস্তুত তন্ত্র-প্রসঙ্গে আধুনিক বিদ্বানদের বেশির ভাগ আলোচনাই এই জাতীয়।

৩৩৩ J. Marshall MIC 1:51.

৩৩৪ G. Thomson SAGS 41.

৩৩৫ *Ibid.* 144.

৩৩৬ *Ibid.* 43.

৩৩৭ *Ibid.*

৩৩৮ R. Briffault M এবং G Thomson SAGS 149-50.

৩৩৯ R. Briffault M 1:96-100, 195-267.

৩৪০ G. Thomson SAGS 149ff.

৩৪১ *Ibid.* 43.

৩৪২ H. L. Morgan AS 62.

৩৪৩ R. Briffault *op. cit.* 1:316ff.

৩৪৪ H. L. Morgan *op. cit.* 10-1.

৩৪৫ R. Briffault *op. cit.* 2:251f.

৩৪৬ *Ibid.* 3:59.

৩৪৭ A. B. Keith RPVU.

৩৪৮ M. Winternitz HIL 1:64.

৩৪৯ R. L. Mitra IA ch. xx.

৩৫০ M. Winternitz *op. cit.* 64.

৩৫১ G. Childe A 78ff.

৩৫২ *Ibid.* 64.

৩৫৩ *Ibid.*

৩৫৪ F. Engels OFPPS 103.

৩৫৫ A. A. Macdonell VM 124ff.

৩৫৬ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৯২।

৩৫৭ M. Winternitz *op. cit.* 1:57 ; A. A. Macdonell HSL45 ; A. B. Keith in CHI 1:77-8.

৩৫৮ A. A. Macdonell HSL 103, VM 124ff. ; R. G. Bhandarkar VS 142ff. W. Crooke in *Folk-lore* 30:284sq., ইত্যাদি।

৩৫৯ ঋগ্বেদ ১০.৯০।

৩৬০ ঋগ্বেদ (রমেশচন্দ্র দত্ত) ১৫৭১।
৩৬১ S. Radhakrishnan IP 104, ইত্যাদি।
৩৬২ A. B. Keith RPVU 57, 186-7, 256. 366. A. A. Macdonell HSL 166.
৩৬৩ O. R. Ehrenfels MRI 2.
৩৬৪ *Ibid* 2, 98, 113.
৩৬৫ ক্ষিতিমোহন সেন : ভারতের সংস্কৃতি ১১।
৩৬৬ ঐ ১৬।
৩৬৭ বিশ্বকোষ ৫:২০৬-৭।
৩৬৮ B. A. Gupte in IA—February 1906.
৩৬৯ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার ব্রত ৫৩।
৩৭০ B. A. Gupte *op. cit.* 62.
৩৭১ R. Briffault M 3:3.
৩৭২ *Ibid.*
৩৭৩ *Ibid.*
৩৭৪ B. A. Gupte *op. cit.* 63.
৩৭৫ *Ibid.* Figure 3.
৩৭৬ *Ibid.* 63.
৩৭৭ *Ibid.* 61.
৩৭৮ T. A. G. Rao EHI 1:52.
৩৭৯ *Ibid.*
৩৮০ W. Crooke RFNI 56, 61, 176 ইত্যাদি।
৩৮১ T. A. G. Rao *op. cit.* 1:52.
৩৮২ A. Getty G 18.
৩৮৩ রাও-এর হিন্দু আইকনোগ্রাফি এবং বৃহৎতন্ত্রসার বর্ণিত বিভিন্ন দেবীর তান্ত্রিক ধ্যান দ্রষ্টব্য।
৩৮৪ G. Thomson SAGS 219.
৩৮৫ *Ibid.*
৩৮৬ *Ibid.*
৩৮৭ *Ibid.*
৩৮৮ *Ibid.* 219f.
৩৮৯ *Ibid.* 205 & 209-10.
৩৯০ বিশ্বকোষ ৩:৫৪৭।
৩৯১ ঐ ৩:৫৪৮।
৩৯২ এরেন্‌ফেল্‌স্ (MRI) মাতৃপ্রাধান্যের স্মারকের দিক থেকে ভারতের মানচিত্র দিয়েছেন।
৩৯৩ R. Briffault *op. cit.* 3:2-3.
৩৯৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার ব্রত ৬৪-৫।

৩৯৫ ঐ ৫৭।
৩৯৬ ঐ ৬৩।
৩৯৭ G. Thomson AA 21-2.
৩৯৮ R. Briffault 3:3.
৩৯৯ গয়া, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে এ-জাতীয় গাছের দৃষ্টান্ত প্রচুর।
৪০০ G. Thomson SAGS 204.
৪০১ বিশ্বকোষ ২০:৭৫৪।
৪০২ P. C. Bagchi PAPDI 10.
৪০৩ *Ibid.* 14.
৪০৪ A. Avelon PT *Preface* xvii.
৪০৫ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:৩২০।
৪০৬ F. Engels OFPPS 107.
৪০৭ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:৩২০।
৪০৮ ঐ ২:২৫৭।
৪০৯ বিশ্বকোষ ৭:৫০৭-৮।
৪১০ ঐ ৭:৫০৭।
৪১১ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:২৯৭।
৪১২ বিশ্বকোষ ৭:৫১২।
৪১৩ R. G. Bhandarkar VS 146.
৪১৪ R. Briffault *op. cit.* 2:525, 526, 530-4, 541 ; 3:129ff.
৪১৫ পৃ. ১০২-১২।
৪১৬ বিশ্বকোষ ৭:৫১৩।
৪১৭ ঐ ৭:৫১২।
৪১৮ ঐ ৭:৫১৩।
৪১৯ R. P. Chanda IAR ch. iv.
৪২০ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৯২. ৪৩-৪।
৪২১ J. Marshall MIC 1:Plate xxii-12.
৪২২ *Ibid.* 1:52.
৪২৩ R. P. Chanda *op. cit.* 131f.
৪২৪ *Ibid.* 131.
৪২৫ *Ibid.* 132.
৪২৬ *Ibid.* 134.
৪২৭ *Ibid.* 135.
৪২৮ বিশ্বকোষ ৭:৫০৮ "বঙ্গে যেরূপ শাক্তের প্রাধান্য ভারতের আর কোনো স্থলে এরূপ নাই।...এখানে যে-সমস্ত শিবোক্ত তন্ত্র পাওয়া যায়, তাহার রচনাপ্রণালী পর্যালোচনা করিলে এই গৌড়দেশে রচিত হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা হয়। তন্ত্রে যেরূপ পৃথক বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ এই গৌড় বা বঙ্গদেশে প্রচলিত"।

৪২৯ R. P. Chanda *op. cit.* 150-61.
৪৩০ *Ibid.* 133.
৪৩১ অর্থশাস্ত্র (বসাক) ১:১৪৬।
৪৩২ ঐ ১:১৪৩।
৪৩৩ ERE 12:193.
৪৩৪ মনু ২.১। cf. H. H. Wilson EL 1:248.
৪৩৫ ERE 12:193.
৪৩৬ *Ibid.*
৪৩৭ এই গ্রন্থের পৃ. ২৫৩ দ্রষ্টব্য।
৪৩৮ ERE 5:*Female Principle.*
৪৩৯ *Ibid.*
৪৪০ R. Briffault *op. cit.* 1:422-7, 451-60, ইত্যাদি।
৪৪১ *Ibid.* 1:451.
৪৪২ ERE 5:828.
৪৪৩ R. Briffault *op. cit.* 1:252.
৪৪৪ A. K. Coomarswamy in EB 12:209ff.
৪৪৫ ERE 5:830.
৪৪৬ অথর্ববেদ ১৪. ২. ১৪।
৪৪৭ R. Briffault 3:54-5.
৪৪৮ J. Frazer GB 28.
৪৪৯ *Ibid.* 28-9.
৪৫০ R. Briffault *op. cit.* 3:55.
৪৫১ *Ibid.*
৪৫২ *Ibid.*
৪৫৩ J. Frazer *op. cit.* 29.
৪৫৪ R. Briffault *op. cit.* 3:59.
৪৫৫ *Ibid.* 3:55.
৪৫৬ *Ibid.* 3:54.
৪৫৭ *Ibid.* 3:55.
৪৫৮ J. Frazer *op. cit.* 29.
৪৫৯ *Ibid.* 119.
৪৬০ W. Crooke *op. cit.* 242.
৪৬১ R. Briffault *op. cit.* 3:56.
৪৬২ W. Crooke *op. cit.* 242.
৪৬৩ *Ibid.*
৪৬৪ E. Thurston CTSI 1:144 ; 6:20, 355 ; 3:103 ; 7:193.
৪৬৫ *Ibid.* 3:103.
৪৬৬ *Ibid.* 7:226.

৪৬৭ B G xxiii (1884) 45.
৪৬৮ E. Thurston *op. cit.* 1:205.
৪৬৯ *Ibid.* 2:359.
৪৭০ *Ibid.* 4:364.
৪৭১ BG xii (1880) 117 ; xx (1884) 132.
৪৭২ H. H. Risley TCB 1:39.
৪৭৩ *Ibid.* 2:201, 229.
৪৭৪ E. T. Dalton DEB 194 ; H. H. Risley TCB 2:102.
৪৭৫ R. Briffault *op. cit.* 3:55.
৪৭৬ *Ibid.* 3:54.
৪৭৭ *Ibid.* 3:57.
৪৭৮ *Ibid.* 3:54ff.
৪৭৯ বিশ্বকোষ ১৪:৫৫০।
৪৮০ ঐ।
৪৮১ ঐ। (শুদ্ধিপত্র দ্রষ্টব্য)
৪৮২ ঐ।
৪৮৩ R. Briffault 3:58.
৪৮৪ *Ibid.*
৪৮৫ *Ibid.*
৪৮৬ *Ibid.*
৪৮৭ *Ibid.*
৪৮৮ *Ibid.*
৪৮৯ J. Frazer *op. cit.* 136.
৪৯০ G. Thomson R 10.
৪৯১ R. P. Chanda *op. cit.* ch. iv.
৪৯২ M. Monier-Williams RTLI 57-8.
৪৯৩ E. W. Hopkins RI 542.
৪৯৪ Oppert OII 574.
৪৯৫ J. Marshall *op. cit.* 1:48.
৪৯৬ G. Thomson SAGS 246.
৪৯৭ J. Marshall *op cit.* 1:51.
৪৯৮ S. Radhakrishnan HPEW 401.
৪৯৯ *Ibid.* 402.
৫০০ O. R. Ehrenfels MRI-এর শুরুতেই এই মানচিত্র দ্রষ্টব্য।
৫০১ J. Marshall *op. cit.* 1:57.
৫০২ *Ibid.*
৫০৩ G. Thomson SAGS 238. cf. G. Thomson AA 4 : "Since the function of all social institutions, alien or indigenous, is to

satisfy some need, the origin of this or that custom is not explained by saying that this was borrowed from abroad. As Ferguson remarked, 'nations borrow only what they are nearly in a condition to have invented themselves' ".

৫০৪ G. Thomson SAGS 239.

৫০৫ *Ibid.* 238.

৫০৬ *Ibid.* 246.

৫০৭ *Ibid.* 245.

৫০৮ *Ibid.* 246.

৫০৯ J. Marshall *op. cit.* 1:52.

৫১০ ERE 10:244.

৫১১ *Ibid.*

৫১২ *Ibid.*

৫১৩ *Ibid.*

৫১৪ *Ibid.*

৫১৫ *Ibid.* 10:242. cf. G. Thomson SAGS 243.

৫১৬ *Ibid.*

৫১৭ *Ibid.*

৫১৮ ERE 5:129.

৫১৯ E. H. Blakeney SCD 79.

৫২০ M. J. Herskovits MHW 395. Aurignacian figurine in ivory, known as the Venus of Lespugue (Honte-Garonne, France): front, side and rear views.

৫২১ *Ibid.* 394. The Aurignacian 'Venus' carved in low relief, from Lanssel, Dordogne.

৫২২ S. Corbian in *Man*-September 1935 No. 159 p 144.

৫২৩ J. Marshall *op. cit.* 1:Plate xiii, 7.

৫২৪ *Ibid.* 1:52.

৫২৫ J. Marshall ASI 1911-2 pl. xxiii, 40.

৫২৬ বিশ্বকোষ ১৩:২২১।

৫২৭ A. A. Macdonell VM 45. এই গ্রন্থের পৃ. ৫৬৯ দ্রষ্টব্য।

৫২৮ বিশ্বকোষ ৭:৫২৭।

৫২৯ ঐ।

৫৩০ ঐ ৭:৫২৮।

৫৩১ ঐ।

৫৩২ ঐ ৭:৫২৯।

৫৩৩ ঐ ৭:৫৩০।

৫৩৪ ঐ ৭:৫০৪।

৫৩৫ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:২৫১।
৫৩৬ বিশ্বকোষ ৭:৫৪৭।
৫৩৭ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:২১৯।
৫৩৮ ঐ ২:২৭৫।
৫৩৯ ঐ ২:২৭৭।
৫৪০ ঐ ২:২৮৩।
৫৪১ অনেকাংশেই মনোবিকলন-পদ্ধতির সঙ্গে তুলনীয়।
৫৪২ বিশ্বকোষ ১৫:৫৪৫।
৫৪৩ ঐ।
৫৪৪ বৃহৎতন্ত্রসারে বিভিন্ন যন্ত্রের চিত্র দ্রষ্টব্য।
৫৪৫ বৃহৎতন্ত্রসার দ্রষ্টব্য।
৫৪৬ R. G. Bhandarkar VS 146. cf. S. K. Dikshit MG 216-7.
৫৪৭ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:২৬৫।
৫৪৮ বৃহৎতন্ত্রসার (বসুমতী) ৭৪-৫।
৫৪৯ বিশ্বকোষ ৭:৫৪১।
৫৫০ ERE 10:196.
৫৫১ ERE 5:829.
৫৫২ ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি (বসুমতী) ১:২৩৯।
৫৫৩ ঐ ১:২৪০।
৫৫৪ G. Thomson SAGS 206.
৫৫৫ S. C. Roy ASB : xii, 920-1. cf. W. Crooke RFNI 71. "Nudity is essential in many magical rites and appears prominently in rain-magic."
৫৫৬ কলকাতার দেহাতিদের মুখেও এই বিশ্বাসের পরিচয় শুনেছি।
৫৫৭ See S. C. Roy *op. cit.* 920 ; অবশ্য পরে ক্রুক্ (RFNI 71) এই মত পরিবর্তন করেছেন।
৫৫৮ S. C. Roy *op. cit.* 920.
৫৫৯ W. Crooke PRFNI (1896 Ed.) 68.
৫৬০ R. Briffault *op. cit.* 3:4.
৫৬১ বিশ্বকোষ ৭:৫২২।
৫৬২ R. Briffault *op. cit.* 2:435-6.
৫৬৩ *Ibid.*
৫৬৪ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত বর্ণিত গৌরীগয়ণ প্রথার বিবরণ : আবুল হাসানৎ যৌনবিজ্ঞান ১:২৪০।
৫৬৫ বিশ্বকোষ ৭:৫৩১।
৫৬৬ ঐ ৭:৫৩২।
৫৬৭ সুখময় ভট্টাচার্য : তন্ত্রপরিচয় ৫৬-৭।
৫৬৮ ঐ ৫৬।

৫৬৯ বিশ্বকোষ ৭:৫২৬।

৫৭০ ERE 5:79.

৫৭১ ঋগ্বেদ ৪. ৪৮. ৩।

৫৭২ JAS (s) xix—1953, No. 1.

৫৭৩ ERE 5:80.

৫৭৪ *Ibid*-5:79.

৫৭৫ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:২৫৪-৩০৭।

৫৭৬ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম ৮৩।

৫৭৭ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:৩২১।

৫৭৮ R. Briffault *op. cit.* 3:196.

৫৭৯ *Ibid.*

৫৮০ *Ibid.*

৫৮১ *Ibid.*

৫৮২ *Ibid.* 3:197.

৫৮৩ *Ibid.* 3:196-7.

৫৮৪ *Ibid* 3:198.

৫৮৫ *Ibid.*

৫৮৬ *Ibid.*

৫৮৭ *Ibid.*

৫৮৮ *Ibid.* 3:199.

৫৮৯ *Ibid.*

৫৯০ J. Frazer GB 136.

৫৯১ G. Thomson AA 130ff.

৫৯২ R. Briffault *op. cit.* 3:197.

৫৯৩ D. Sen CHA 375ff.

৫৯৪ S. K. Dikshit MG 30-6.

৫৯৫ *Ibid* 32-3.

৫৯৬ S. N. Dasgupta HIP 3:533.

৫৯৭ গুণরত্ন : তর্করহস্যদীপিকা ৩০০।

৫৯৮ S. N. Dasgupta PA দ্রষ্টব্য।

৫৯৯ শ্লোক ৮২।

৬০০ S. N. Dasgupta HIP 3:529.

৬০১ *Ibid* 3:528-9.

৬০২ বিশ্বকোষ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩:৩১৮।

৬০৩ ঐ।

৬০৪ SBE 12:54, 59, 64, 110sq., 113sq., 125sq., 144sq., 150, 153-8, 171, 198sq., 265sq., 297, 310sq.; 26:14, 30-2, 74sq., 93, 98sq.,

105sq., 115, 131, 142, 147, 175sq., 240, 249, 252, 279, 291, 301, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৬০৫ ছান্দোগ্য উপনিষদ ১. ২. ১।

৬০৬ ERE 2:157.

৬০৭ ERE 4:444.

৬০৮ ERE 4:411-510.

৬০৯ J. Marshall 1:79ff.

৬১০ ERE 4:476.

৬১১ ERE 4:479-84.

৬১২ D. R. Shastri SHIMSH 1-3.

৬১৩ প্রথমত, ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এই পর্যায়-বিভাগের সমর্থনে বিশেষ কোনো তথ্য সত্যিই উল্লেখ করেননি, বা করতে সমর্থ হননি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "As the literature of this school is now entirely lost except what has reached us in fragments, we are quite unable to give here verbetim, all the original *sutras* of this school that represents its various aspetcs and phases. But there are passages both in *sutra* and *sloka* which embody in substance these different stages of the *lokayata* school (P. 2)". কিন্তু সূত্র এবং শ্লোকলব্ধ তথ্য ঠিক কী এবং কী ভাবেই বা তা লেখকের পরিকল্পিত পর্যায়-বিভাগকে প্রমাণিত করে—এ-প্রশ্নের সদুত্তর সত্যিই তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বরং তার পরিবর্তে কষ্ট-কল্পনা এবং পরস্পর-বিরোধী মন্তব্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে সে-জাতীয় কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করাই পর্যাপ্ত হবে। যথা:

তথাকথিত প্রথম পর্যায়ের বর্ণনায় লেখক বলছেন,…"it was a mere tendency to opposition. It called in question all kinds of knowledge, immediate and mediate, and all evidence, perception as well as inference. In that period its name was Barhaspatya (P. I)." লেখকের মতে, যে-বৃহস্পতির নাম থেকে সম্প্রদায়টির প্রথম পর্যায়ের ওই নামকরণ হয়েছিলো তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তিই ছিলেন (P. 3) এবং ঋগ্বেদেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়—অর্থাৎ, ঋগ্বেদের বৃহস্পতিই এ-সম্প্রদায়ের আদিগুরু (P. 9)। যদি তাই হয় তাহলে নিশ্চয়ই আশা করা অন্যায় হবে না যে, লোকায়ত-সম্প্রদায়ের প্রথম পর্যায়টির উপরোক্ত বর্ণনার সঙ্গে লেখক বৈদিক বৃহস্পতির কোনো যোগাযোগ—বা অন্তত যোগাযোগের কোনো ইংগিত—প্রদর্শন করবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু লেখক তা করেননি। এবং ঋগ্বেদের বৃহস্পতি যে সত্যিই called in question all kinds of knowledge, immediate and mediate,—এ-কথা প্রতিপন্ন করা একান্তই অসম্ভব। অবশ্যই ডক্টর শাস্ত্রী বলছেন, 'From the earliest Vedic times, there were people who denied the existence of

even the Vedic deities. The Vedic hymns pointedly refer to scoffers and unbelievers (P. 6-7)." কিন্তু প্রশ্ন হলো, এর সঙ্গে বৃহস্পতির সম্পর্ক কী ? বৈদিক সাহিত্যে কি এ-জাতীয় কোনো ইংগিত পাওয়া যায় যে, বৃহস্পতিই ওই scoffers and unbelievers-দের অগ্রগামী ছিলেন ? নিশ্চয়ই তা যায় না। এমনকি ডক্টর শাস্ত্রী নিজেও সে-কথা দাবি করতে পারছেন না। তার বদলে ঋগ্বেদের বৃহস্পতি প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করছেন, "Some of the verses of the Vedic hymns ascribed to Brihaspati are very noble in thought. Whatever may be said of his followers, his own teachings were of an elevated character. Brihaspati had many followers and all of them were independent thinkers raising objections against the current superstitions. It is perhapes for his freedom of thought that he was regarded as the priest—the adviser—the counsellor of Indra, the king of the gods" (P. 9). প্রথমত, এই উক্তির সঙ্গে পুর্বোদ্ধৃত উক্তিগুলির সঙ্গতি নেই। দ্বিতীয়ত, এই উক্তির বিভিন্ন অংশও তথ্য-প্রতিষ্ঠিত নয়। বৈদিক বৃহস্পতির যে সত্যিই বহু অনুগামী ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই যে স্বাধীন চিন্তাশীল ছিলেন ও সমসাময়িক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সকলেই যে আপত্তি তুলেছিলেন—এ-বিষয়ে লেখক কোনো প্রমাণই দেননি ; প্রমাণ দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভবও নয়। অতএব বক্তব্যগুলি নেহাতই লেখকের কল্পনাপ্রসূত। দ্বিতীয়ত, স্বাধীন চিন্তার গুণেই যে বৈদিক বৃহস্পতি দেবগুরু বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন—এ-জাতীয় মন্তব্যের সমর্থনে অন্তত বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে কোনো তথ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ ডক্টর শাস্ত্রী লোকায়তর ইতিহাসের যে-স্তরবিভাগ করেছেন তা আগাগোড়াই এ-জাতীয় ঐতিহাসিক তথ্য নিরপেক্ষ এবং একান্তই কাল্পনিক কয়েকটি theory-র উপর প্রতিষ্ঠিত।

৬১৪ D. R. Shastri *op. cit.* 35-6.

৬১৫ *Ibid.* 39.

৬১৬ *Ibid.* 36.

৬১৭ *Ibid.*

৬১৮ W. Crooke in *Folk-lore* xxv. "The Holi : a Vernal Festival of the Hindus."

৬১৯ *Ibid.*

৬২০ M. Monier-Williams SED—তন্ত্র। cf. শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২.১.৩ "কপিলস্য তন্ত্রস্য" ইত্যাদি।

৬২১ বিশ্বকোষ ৭:৫০৪।

৬২২ R. Briffault *op. cit.* 1:461sq.

৬২৩ ERE 12:192.

৬২৪ বিশ্বকোষ ৭:৫০৮।

৬২৫ ERE 12:192.

৬২৬ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:২৫৯।

৬২৭ ঐ ২:২৫৯-৬০।

৬২৮ cf. G. Thomson SAGS 239.

৬২৯ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:২৭৪।

৬৩০ ঐ ২:২৮০-১।

৬৩১ ঐ ২:২২০।

৬৩২ S. Dasgupta ORC 27.

৬৩৩ *Ibid.* xxxiv.

৬৩৪ *Ibid.*

৬৩৫ বিশ্বকোষ ৭:৫৪৭।

৬৩৬ ERE 12:194.

৬৩৭ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম ৭৮।

৬৩৮ ঐ ৮৫।

৬৩৯ ঐ ১০৬ ইত্যাদি।

৬৪০ D. Sen CHA 351. "There are hundreds of these sects silently working in Bengal"...

৬৪১ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:৩২৫।

৬৪২ D. Sen CHA 337.

৬৪৩ S. Dasgupta ORC 90.

৬৪৪ M. M. Bose PCSCB 42.

৬৪৫ *Ibid.* 42.

৬৪৬ *Ibid.* 42-3. অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে ৮০ বছরের বৃদ্ধ যদিও পুরুষ হয়েই থাকে তবুও তার কামনাবাসনার উপসম হয়; কিন্তু এ-উপসম ক্ষয়জনিত। অপরপক্ষে যুবক যদি সযত্ন-সাধনার ফলে নিরপেক্ষ-দশায় পৌঁছুতে পারে তাহলে তার ইন্দ্রিয়াদি সক্রিয় থাকবে এবং তবুও বহিঃপ্রকৃতির সংবেদনে সে বিচলিত হবে না। অধ্যাপক বসুর এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় : সহজিয়ারা স্ত্রী-পুরুষ-নিরপেক্ষ অবস্থায় পৌঁছুবার সাধনা করে না—স্পষ্টই স্ত্রীভাবে সাধনা করতে চায় এবং স্ত্রীলোক কামনা-বাসনা রহিত নয়। তাছাড়া যে-শান্ত সমাহিত অবস্থাকে অধ্যাপক বসু সহজিয়া-সাধনার লক্ষ্য বলছেন তা সম্প্রদায়ান্তরের পক্ষে প্রাসঙ্গিক হলেও অন্তত সহজিয়াদের বেলায় অপ্রাসঙ্গিক, কেননা সহজ-সাধনা রিরংসার উপরই প্রতিষ্ঠিত। cf. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : (বৌদ্ধধর্ম ৭১) "এই সকল সহজপন্থীর শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, যদি তোমার বোধিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে পঞ্চকাম উপভোগ কর"।

৬৪৭ S. Dasgupta *op. cit.* 115-6.

৬৪৮ *Ibid.* 120.

৬৪৯ *Ibid.* 121ff.

৬৫০ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম ৬৯।

৬৫১ S. Dasgupta *op. cit.* 136.
৬৫২ *Ibid,*
৬৫৩ *Ibid.* 134.
৬৫৪ S. K. Belvalkar & R. D. Ranade HIP 2:81, 451.
৬৫৫ *Ibid.* 81.
৬৫৬ *Ibid.* 451-2.
৬৫৭ A. E. Gough PUAIM 18.
৬৫৮ *Ibid.* 19.
৬৫৯ S. Dasgupta *op. cit.* 134.
৬৬০ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : ভারতদর্শনসার ১৬৬।
৬৬১ J. Frazer GB 138.
৬৬২ *Ibid.*
৬৬৩ S. Dasgupta *op. cit.* 108, 165, 220, 226, 262-3 ইত্যাদি।
৬৬৪ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:২৮৭।
৬৬৫ ঐ ২:২৮৮।
৬৬৬ ঐ।
৬৬৭ ঐ ২:২৮৭।
৬৬৮ ঐ ২:২৮৮।
৬৬৯ ঐ ২:২৮৪-৫।
৬৭০ S. Dasgupta *op. cit.* 103-7.
৬৭১ মণীন্দ্রমোহন বসু : সহজিয়া সাহিত্য, ভূমিকা ||৶০।
৬৭২ ঐ ভূমিকা ||০।
৬৭৩ M. Bose PCSCB 44.
৬৭৪ *Ibid.* 45.
৬৭৫ মণীন্দ্রমোহন বসু : সহজিয়া সাহিত্য, ভূমিকা ||/০।
৬৭৬ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : রচনাবলী ২:২৯২।
৬৭৭ ঐ ২:৩০১।
৬৭৮ ঐ ২:২৯৪-৫।
৬৭৯ ঐ ২:৩০৫-৬।
৬৮০ ঐ ২:২৮৫-৬।
৬৮১ B. N. Seal PSAH 218.
৬৮২ অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের সাম্প্রতিক রচনা এর ব্যতিক্রম FP ch. 1.
৬৮৩ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রচনাবলী ২:২৫৫-৬ ইত্যাদি।
৬৮৪ B. N. Seal *op. cit.* 218ff.
৬৮৫ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ : প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ১০৭।
৬৮৬ ERE 4:140.
৬৮৭ *Ibid.*

৬৮৮ M. M. Bose PCSCB 45.
৬৮৯ ERE 4:140.
৬৯০ *Ibid.* 4:175.
৬৯১ *Ibid.* 4:126.
৬৯২ G. Thomson FP 90-1.
৬৯৩ *Ibid.* 154.
৬৯৪ সাংখ্যকারিকা ২১, গৌড়পাদভাষ্য।
৬৯৫ বিশ্বকোষ ৭:৫০৭।
৬৯৬ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম ৩৭।
৬৯৭ H. Zimmer PI 282—সাংখ্যকারিকাকে লেখক আরো পরে (পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি) রচিত বলে বিবেচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও (বৌদ্ধধর্ম ৩৮) একই মত পোষণ করেন।
৬৯৮ সাংখ্যকারিকা ৭০।
৬৯৯ ঐ ৭১।
৭০০ শঙ্করাচার্য : ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২. ৪. ৯।
৭০১ S. N. Dasgupta HIP 1:213.
৭০২ S. K. Belvalkar & R. D. Ranade HIP 2:412.
৭০৩ *Ibid.* 2:413f.
৭০৪ H. H. Wilson SK 160.
৭০৫ P. B. Chakravarti ODSST দ্রষ্টব্য।
৭০৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : রচনাবলী (সাহিত্য-সংসদ) ২:২২২।
৭০৭ মণীন্দ্রমোহন বসু : সহজিয়া সাহিত্য ৫২।
৭০৮ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : ভারতদর্শনসার ১৪৯-৫০।
৭০৯ S. K. Belvalkar & R. D. Ranade *op. cit.* 2:428.
৭১০ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২. ২. ৭। নিম্নোদ্ধৃত তর্জমা কালীবর বেদান্তবাগীশ ২:১৪০।
৭১১ ERE 11:191.
৭১২ P. R. T. Gurdon K xix-xx.
৭১৩ G. Thomson SAGS 153.
৭১৪ K. Marx. & F. Engels C 210.
৭১৫ ERE 6:706.
৭১৬ R. Garbe SPB *Preface* ix.
৭১৭ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : বৌদ্ধধর্ম ৩৭।
৭১৮ S. K. Belvalkar & R. D. Ranade *op. cit.* 2:415.
৭১৯ S. N. Dasgupta *op. cit.* 1:213.
৭২০ S. K. Belvalkar & R. D. Ranade *op. cit.* 2:418f.
৭২১ *Ibid.* 2:420f.
৭২২ *Ibid.* 2:426f.
৭২৩ E. H. Johnston ES.

১২৪ S. K. Belvalkar & R. D. Ranade *op. cit.* 2:416.
১২৫ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২. ১. ১২। তর্জমা—কালীবর বেদান্তবাগীশ ২:৪৭।
১২৬ ঐ ২. ১. ১। তর্জমা—কালীবর বেদান্তবাগীশ ২:৮।
১২৭ ঐ। কালীবর বেদান্তবাগীশ ২:১০।
১২৮ R. Garbe IACOPVMCSS *Preface* xx-xxi.
১২৯ H. Zimmer PI 281.
১৩০ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১. ৪.১। তর্জমা—কালীবর বেদন্তবাগীশ ১:৪৯৭।
১৩১ P. B. Chakravarti ODSST 4.
১৩২ *Ibid.*
১৩৩ তর্জমা—কালীবর বেদান্তবাগীশ ২:১২৩-৪।
১৩৪ তর্জমা—কালীবর বেদান্তবাগীশ ২:১২৮।
১৩৫ কালীবর বেদান্তবাগীশ : সাংখ্য-দর্শনম্ ২২১-২।
১৩৬ R. Garbe SPB *Preface* দ্রষ্টব্য।
১৩৭ S. N. Dasguta *op. cit.* 1:213.
১৩৮ R. Hume TPU.
১৩৯ বরং আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি (পৃ. ৫৩৬), গীতা-বর্ণিত অসুরমতের সঙ্গেই সাংখ্যের আদিরূপের সংযোগ অনুমান করা যায়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত মতটিই যদি আদি-অকৃত্রিম সাংখ্য হতো তাহলে অবশ্যই বাদরায়ণ সাংখ্য-খণ্ডনের জন্য অতো আয়োজন করতেন না।
১৪০ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২. ১. ২.।
১৪১ R. Garbe IACOPVMCSS *Preface* xii.
১৪২ F. Engels LF 19.
১৪৩ R. Garbe *op. cit. Preface* xix.
১৪৪ S. N. Dasgupta *op. cit.* 3:527.
১৪৫ মৈত্রায়নীয় উপনিষদ ৭. ৮. ৯।
১৪৬ বিষ্ণুপুরাণ ৩. ১৮. ১৪-২৬।
১৪৭ গীতা ১৬. ৬।
১৪৮ ঐ ১৬. ৮।
১৪৯ কারিকা ৭০।
১৫০ SBE 14:260sq.
১৫১ ঋগ্বেদ ষষ্ঠ মণ্ডল।
১৫২ ঋগ্বেদ ৬. ২৭. ৫।
১৫৩ ঋগ্বেদ ৬. ২৭. ৬ দ্রষ্টব্য।
১৫৪ M. Wheeler IC 18.
১৫৫ ঋগ্বেদ ১. ৫১. ৫।
১৫৬ গুণরত্ন : তর্করহস্যদীপিকা ৩০০।
১৫৭ E. H. Johnston ES দ্রষ্টব্য।
১৫৮ বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮১।

১৫৯ চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দর্শন শাখার সভাপতির অভিভাষণ।
১৬০ সেণ্ট পিটার্সবার্গ অভিধান দ্রষ্টব্য।
১৬১ K. Marx C 177f. Contrast শঙ্কর : ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১. ১. ৪। কালীবর বেদান্তবাগীশ ১:১০৭।
১৬২ F. Engels DN 288-9.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১ M. Winternitz HIL 65n.
২ ERE 4:704ff.
৩ F. Engels OFPPS 259ff. G. Thomson SAGS 33.
৪ G. Childe A 78-93.
৫ ERE 4:705.
৬ M. Winternitz *op. cit.* 64.
৭ ERE 2:351.
৮ ERE 4:708.
৯ ERE 4:709.
১০ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : রচনাবলী ৩:৫২৮।
১১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (ত্রিবেদী) ১২১-২।
১২ A. A. Macdonell VM 65.
১৩ ERE 4:707.
১৪ *Ibid.*
১৫ *Ibid.*
১৬ G. Thomson SAGS 158.
১৭ A. A. Macdonell *op. cit.* 27.
১৮ *Ibid.* 45.
১৯ ERE 4:707.
২০ *Ibid.*
২১ G. Thomson SAGS 97.
২২ S. Freud GISA 25. ফ্রয়েডের মতে কোপার্নিকাস ও ডারউইনের মতোই তাঁর আবিষ্কারও মানবাত্মার সনাতন অভিমানকে আহত করে বলেই এর

বিরুদ্ধে মানবমনের স্বাভাবিক প্রতিবন্ধ জাগে। সমালোচনা—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ফ্রয়েড-প্রসঙ্গে, ১-২৩।

২৩ M. Winternitz *op. cit.* 67-8.

২৪ F. Engels OFPPS 163.

২৫ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : রচনাবলী ৩:৪৯৬।

২৬ ঐ ৩:৪৯৪।

২৭ M. Monier-Williams SED—*bhaga.*

২৮ A. A. Macdonell *op. cit.* 45-6.

২৯ G. Thomson AA 38-9, 41-3.

৩০ A. B. Keith & A. A. Macdonell VI *: svagnin.*

৩১ G. Thomson AA 42.

৩২ A. B. Keith & A. A. Macdonell *op. cit.* 1:2.

৩৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (ত্রিবেদী) ৪৭২, ৪৭৫, ৪৯১।
cf. A. B. Keith & A. A. Macdonell *op. cit.* 2:458.

৩৪ SBE 42:88, 391.

৩৫ SBE 41:106ff.

৩৬ সায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য। cf. A. B. Keith & A. A. Macdonell *op. cit.* 1:2.

৩৭ A. B. Keith & A. A. Macdonell *op. cit.* 1:2. ; ঋগ্বেদ ১০. ১১৬. ৯।

৩৮ *Ibid* 2:426.

৩৯ H. L. Morgan AS. 73. cf. K. P. Jayaswal HP 1:11-2 "the *Samiti* was the national assembly of the whole people or *visah ;* for we find 'the whole people' or *samiti,* in the alternative, electing and re-electing the *rajan* or 'king' (Rigveda 10. 173. 1 & Atharvaveda 6. 87. 1 ; 6. 88. 3 ; 3. 4. 2). The whole people were supposed to be present in the Assembly. The functions of the *samiti* may be gathered from different references. We have already noticed the most important business of the *samiti,* to wit, electing the *rajan.* It could also re-elect king who had been banished. They were thus a sovereign body from the constitutional point of view."

৪০ H. L. Morgan *op. cit.* 84.

৪১ A. B. Keith & A. A Macdonell *op. cit. Sabha & Samiti.*

৪২ *Ibid* 2:430.

৪৩ *Ibid.*

৪৪ JAOS XII:148-52.

৪৫ G. Thomson SAGS ch. 3 & 4.

৪৬ ঋগ্বেদ-সংহিতা (দুর্গাদাস লাহিড়ী) ১।

৪৭ ঐ ২।
৪৮ ঐ ৩।
৪৯ G. Thomson SAGS 440.
৫০ *Ibid.*
৫১ J. Harrison AAR 36-7.
৫২ A. B. Keith RPVU 2:345 ; VBYS *Introduction* cxxxii.
৫৩ A. B. Keith VBYS *Introduction* cxxxv.
৫৪ A. B. Keith RPVU 49.
৫৫ *Ibid* 49n.
৫৬ A. B. Keith VBYS *Introduction* cxxxiii.
৫৭ *Ibid* cx.
৫৮ M. Monier-Williams SED—যজমান।
৫৯ ছান্দোগ্য উপনিষদ : প্রথম অধ্যায়, দশম ও একাদশ খণ্ড।
৬০ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (ত্রিবেদী) ৫৬।
৬১ ঐ ১৮৩-৪।
৬২ ঐ ২৩৮।
৬৩ ঐ ৪৫০।
৬৪ ঐ ৪৫১।
৬৫ ঐ।
৬৬ ঐ ৪৬৭।
৬৭ ঐ ৪৬৯।
৬৮ ঐ ৪৭০-১।
৬৯ A. B. Keith RVB 45.
৭০ F. Engels OFPPS 276.
৭১ বৈদিক সাহিত্যে শুনঃশেপ-এর কাহিনীর অন্যান্য উল্লেখও পাওয়া যায়। A. B. Keith RVB 61-8.
৭২ F. Engels OFPPS 268.
৭৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (ত্রিবেদী) ৪৪১-৪।
৭৪ A. A. Macdonell VM 27.
৭৫ *Ibid.* 23-4.
৭৬ *Ibid* 26.
৭৭ A. B. Keith RPVU 1:97.
৭৮ *Ibid.*
৭৯ A. A. Macdonell *op. cit.* 65.
৮০ *Ibid.*
৮১ F. Engels OFPPS 267.
৮২ *Ibid.* 261.
৮৩ A. A. Macdonell *op. cit.* 26.

৮৪ A. B. Keith *op. cit.* 1:247-8.

৮৫ E. Engels OFPPS 163.

৮৬ *Ibid.* 258.

৮৭ *Ibid.* 163.

৮৮ A. B. Keith *op. cit.* 1:83.

৮৯ A. A. Macdonell VM 24.

৯০ *Ibid.*

গ্রন্থপঞ্জী

সংস্কৃত ও বাংলা বই-এর পুরো নাম সাধারণত গ্রন্থমধ্যে বা পাদটীকাতেই ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এখানে শুধুমাত্র পাদটীকায় সংক্ষেপে উল্লিখিত ইংরেজী গ্রন্থাদিরই তালিকা দেওয়া হলো।

REFERENCE BOOKS & JOURNALS

ASB : Anthropological Society of Bombay.
ASI : Archaeological Survey of India.
BBMFA : Bulletin of the Boston Museum of Fine Arts.
BG : Bombay Gazetteer.
CHI Cambridge History of India.
CR : Calcutta Review.
EB : Encyclopædia Britannica 14th. Ed.
ERE : Encyclopædia of Religion and Ethics (Ed. Hastings).
IA : Indian Antiquary.
JAOS Journal of the American Oriental Society.
JAS(s) Journal of the Asiatic Society (Bengal)—Science
JRAS Journal of the Royal Asiatic Society.
PAOS Proceedings of the American Oriental Society.
PFIPC Proceedings of the First Indian Philosophical Congress.
SBE Sacred Books of the East (Ed. Max Muller).
VQ Viswabharati Quarterly.

OTHER WORKS

Avelon A. Principles of Tantra. London 1914
Baden-Powell B. H. The Indian Village Community. London 1896
Bagchi P. C. Pre-Aryan and Pre-Dravedian in India. Calcutta 1929
Barth A. Religions of India. London 1914
Barua B. M. A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy. Calcutta 1921
Basham A. L. History and Doctrines of the Ajivikas. London 1951
Belvalkar S. K and Ranade R. D. History of Indian Philosophy. Poona 1927
Bhandarkar R. G. Vaisnavism Saivism and Minor Religious Systems. Strassburg 1913

Blakeney E.H. (Ed.) Smith's Smaller Classical Dictionary. London 1940

Boas F. (Ed.) General Anthropology. New York 1938

Bose M. M. Post-Caitanya Sahajia Cult of Bengal. Calcutta 1930

Briffault R. The Mothers. London 1952

Caudwell C. Illusion and Reality. London 1937

Campbell G. Modern India. London 1853

Castro Geography of Hunger

Chakravarti P. B. The Origin and Development of the Samkhya System of Thought. Calcutta 1952

Chanda R. P. Indo-Aryan Races. Rajsahi 1916

Childe G. The Aryans. London 1926

— Man Makes Himself. London 1936

— What Happened in History. London 1942

Colebrooke H. T. Miscellaneous Essays. Madras 1872

Cowell E. B. (Tr.) *Sarva-Darsana Samgraha.* London 1914

—and Thomas F.W. (Tr.) The *Harsacairta* of Bana

Crooke W. Religion and Folk-lore of Northern India. Oxford 1926

— Popular Religion and Folklore in Northern India. London 1896

Dalton ET Descriptive Ethnology of Bengal. Calcutta 1872

Dange S. D. India from Primitive Communism to Slavery. Bombey 1949

Dasgupta S. Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature. Calcutta 1946

Dasgupta S. N. History of Indian Philosophy. Cambridge 1921-55

— Philosophical Essays. Calcutta 1951

Dikshit S. K. The Mother Goddess. Poona

Dutt M. N. Rigveda Samhita. Calcutta 1906

Dutt R. P. India Today. Bombay 1947

Dutta B. N. Studies in Indian Social Polity. Calcutta 1944

Dutta R. C. The Peasantry of Bengal. Madras 1874

—and others Land Problem in India. Madras 1874

Ehrenfels O. R. Mother Right in India. Hyderabad 1941

Engels F. Anti-Duhring. Moscow 1947

— Dialectics of Nature. London 1941

— Ludwig Feuerbach etc. Moscow 1949

— The Origin of the Family. Private Property and the State. Moscow 1952

— Socialism Utopian and Scientific

Fick R. The Social Organisation in North-East India in Buddha's Time. Calcutta 1920

Frazer J. The Golden Bough (Abridged Edition). London 1949

Frend S. A General Introduction to Psycho-analysis. New York 1943

Garbe R. Introduction to Aniruddha's Commentary to the Original Parts of Vedantin Madhava's Commentary on the Samkhya Sutras. Calcutta 1892

— (Ed.) *Samkhya Pravacana Bhasya.* (H. O. S.)

Getty A. Ganesa. Oxford 1936

— The Gods of Northern Buddhism. Oxford 1928

Gough A. E. Philosophy of the Upanisads and Ancient Indian Metaphysics. London 1882

Gurdon P. R. T. The Khasis. London 1914

Harrison J. Ancient Art and Ritual. London 1935

Hegel G. W. F. Lectures on the Philosophy of History. London 1914

Herskovits M. J. Man and His Works. New York 1949

Hopkins E. W. Religions of India. London 1895

Hume R. E. Thirteen Principal Upanisads. Oxford 1951

Hunter W. W. The Imperial Gazetteer of India. London 1881

Ibbetson D. Punjab Castes. Lahore 1916

Iyer A. K. Mysore Tribes and Castes

Jayaswal K. P. Hindu Polity. Calcutta 1924

Johnston E. H. Early Samkhya. London 1937

Kane P. V. History of Dharmasastra. Poona 1930-41

Keith A. B. The Religion and Philosophy of the Veda and the Upanisads (Harvard Oriental Series) 1925

Rigveda Brahmana (H. O. S.) 1925

The Veda of the Black Yajus School (H. O. S.) 1914

—and Macdonell A. A. Vedic Index of Names and Subjects. London 1912
Kennedy V. Hindu Mythology. London 1831
Kirman B. H. This Matter of Mind. London 1952
Krige E. J. Social System of the Zulus. London 1936
Low S. Vision of India
Macdonell A. A. Vedic Mythology. Strausburg 1898
— Sanskrit English Dictionary. Oxford 1924
— A History of Sanskrit Literature, London 1905
Maine H. Village Communities in the East and West. London 1890
Majumder R. C. Corporate Life in Ancient India. Calcutta 1922
Marshall J. Mohenjodaro and the Indus Civilization. London 1938
Marx K. Capital. Moscow 1951
— Selected Works. Moscow 1946
— British Rule in India
— Future Results of British Rule in India
Marx K. and Engels F. German Ideology. London
— Correspondences. Calcutta 1945
Mitra A. Census of West Bengal—1951
Mitra R. L. Indo-Aryans. Calcutta 1881
Monier-Williams M. Sanskrit English Dictionary. Oxford 1899
— Religious Thought and Life in India
Moreland India at the Death of Akbar
Moret A. and Davy G. From Tribe to Empire London. 1926
Morgan H. L. Ancient Society. Calcutta
Muir J. Original Sanskrit Texts
Oppert The Original Inhabitants of India
Nehru J. The Discovery of India. London 1951
Pavlov I. P. Lectures on Conditioned Reflexes (Tr. Gantt). New York 1941
Piggot S. Pre-Historic India. London 1950
Radhakrishnan S. Indian Philosophy. London 1923.
— (Ed.) History of Philosophy Eastern and Western. London 1952
Rangacarya (Tr.) *Sarvasiddhantasarasamgraha*

Rao T. G. N. — Elements of Hindu Iconography. Madras 1914
Risley H. H. — The Tribes and Castes of Bengal. Calcutta 1891
— The People of India. Lodon 1915
Rhys Davids T.W. — Buddhist India. Calcutta 1950
— Dialogues of Buddha. Oxford 1899
Russell R.V. and Hiralal R. B. — Tribes and Castes of the Central Provinces in India. London 1916
Seal B. N. — Positive Science of the Ancient Hindus, London 1915
Sen D. C. — Caitanya and His Age. Calcutta 1922
Senart E. — The Castes in India
Shastri H. P. — Lokayata. Dacca 1925
— Absorption of the Vratyas. Dacca 1926
Shastri D. R. — A Short History of India Materialism Sensationalism and Hedonism. Calcutta
Taylor J. (Tr.) — *Probodhachandrodaya*. Bombry 1886
Thomson G. — Religion. London 1950
— Æschylus and Athens. London 1946
— Studies in Ancient Greek Society. London 1949
— First Philosophers. London 1955
Thurston E. and Rangacari — Castes and Tribes of Southern India. Madras 1909
Wells H. K. — Pragmatism : Philosophy of Imperialism
Westermark E. — The History of Human Marriage. Lodon 1921
Wheeler M. — The Indus Civilization. Cambridge 1953
Wilks M. — Historical Sketches of the South of India. London 1810
Wilson H. H. — The Religious Sects of the Hindus. Madras 1904
— Sanskrit English Dictionary
— Essays and Lectures,
— (Tr.) *Samkhyakarika*. Calcutta 1887
Winternitz M. — A History of Indian Literature. Calcutta 1927
Zimmer H. — Philosoply of India. London 1951

নির্দেশ সূচী

শুদ্ধিপত্র

প্রথমে অশুদ্ধ পরে শুদ্ধ এবং আগে পৃষ্ঠাসংখ্যা পরে পংক্তিসংখ্যা প্রদর্শিত হয়েছে। যথা—
'দ্বিজ' : 'বরুণ' ১৫৯, ২৭॥ অর্থাৎ, ১৫৯ পৃষ্ঠায় ২৭ পংক্তিতে 'দ্বিজ'-র পরিবর্তে 'বরুণ' হবে।

কিম্চিৎ : কিঞ্চিৎ ৫১, ১২॥ মুগ্ধধার্মিকান্ধ্যম : মুগ্ধধামিকান্ধম্ ৫১, ১৪। অস্তিততয়া : অস্তিত্বতয়া ৫১, ২৫॥ Laucus : Laukas ৬৩, ১৬॥ মহাযানী : মহাযান ৬৫, ৯॥ বেলভেকার : বেলভেলকার ৬৭, ২২॥ মার্সেল : মার্সাল ৬৮, ৩৪॥ 'দ্বিজ' : 'বরুণ' ৮৩, ৩ ; ১৫৯, ২৭॥ ক্ষোয়া : খোয়া ৮৬, ৮॥ প্রয়োগ-পটুত্বের : প্রয়োগ-পটুত্বের ৯৪, ২৮॥ প্রজোয্য : প্রযোজ্য ৯৭, ১৯॥ মিথুনাশক্ত : মৈথুনাসক্ত ৯৭, ২৬॥ কাপালিকী : কাপালিকা ৯৯, ৪ এবং ৮॥ মিথুন : মৈথুন ১০১, ২৩ এবং ২৮ ; ১০২, ৩ ; ১১৪, ১৮॥ ভোগাশক্তি : ভোগাসক্তি ১০১, ৩২॥ অধ্বয্যু : অধ্বর্য্যু ১০৪, ১২ এবং ১৩॥ পুনান্নব : পুনন্নিব ১০৪, ২০॥ নৃগৃহ্য : নিগৃহ্য ১০৪, ২৩॥ গৃহ্বীয়াঃ : গৃহ্নীয়াঃ ১০৪, ২৫॥ ধ্যাঙ্কম্ : ধাঙ্কম্ ১০৪, ২৬॥ গ্রহনমোক্ষৌ : গ্রহণমোক্ষৌ ১০৪, ২৬॥ তাদিগরৌ : তাদিগিরৌ ১০৪, ২৭॥ স্ত্রী : স্ত্রীঃ ১০৪, ৩০॥ প্রজপতি : প্রজাপতি ১০৬, ১২॥ স্ত্রীয়ং : স্ত্রিয়ং ১০৬, ১২॥ সমিদ্ : সমিধ্ ১০৭, ৪॥ আহুত্যৈ : আহুত্যৈঃ ১০৭, ১৫॥ ঋষি : ঋষি ১০৭, ২৩ ; ১০৮, ১৩॥ ইত্যয়শা : ইত্যযশা ১০৭, ৩০॥ স্থানসংকুলনের : স্থানসংকুলানের ১১১ : ৬॥ লোকাতিকদের : লোকায়তিকদের ১১২, ৬॥ তন্ধ : তন্ত্ৰ ১০২, ২৩॥ চক্রঃ : চক্রুঃ ১২৩, ২৬॥ স্তোস্তমান : স্তোষ্যমান ১২৪, ৭॥ সর্পিল গতিতে ঘোরা হয় নড়াচড়া করা হয় ১২৪, ৮॥ আসস্পূ : আসস্পূ ১২৪, ৯॥ সৃক্কটি : সৃক্কটি ১২৪, ২৩॥ অহুমহন : অহুমত্তন ১২৪, ২৬॥ দলব্য : দালাভ্য ১২৫, ৫॥

আসনায়াম্ : অশনায়াম্ ১২৭, ১৬ ॥ মাণ্ডক্য : মাণ্ডুক্য ১২৮, ১৫ এবং ৩০ এবং ৩১ ; ১৩৩, ১১ এবং ১২; ১৩৬, ২৩ ॥ প্রতিশাখ্য : প্রাতিশাখ্য ১২৮, ২৯ ॥ বৃঞ্চিগণ : বৃষ্ণিগণ ১৩০, ৩৪ ॥ কুর্মরূপের : কূর্মরূপের ১৩২, ২২ ॥ ম্যাকডোন্যাল্ড : ম্যাকডোন্তাল ১৩৩, ৯ ; ২১৯, ৮ ; ২৫৮, ২৫ ॥ শূনঃশেপ : শুনঃশেপ ১২৩, ২০ এবং ২২ ॥ নিষ্ক্রয় : নিষ্ক্রিয় ১৩৯, ১৮ ॥ এবোং : এবোৎ ১৪৩, ১৮ ॥ মূর্দ্ধা : মূর্দ্ধা ১৪৪, ৪ ॥ পক্ষীমাতার : পক্ষিমাতার ১৫২, ১ ॥ যজ্ঞে : অনুষ্ঠানে ১৫৪, ৭ ॥ অসনায়ম : অসনায়াম ১৫৫, ১৯ ॥ কামগানস্তেষ্ঠে : কামগানস্তেষ্টে ১৫৬, ৪ ॥ সর্পিল গতিতে ঘুরেছিলো : নড়াচড়া করেছিলো ১৫৯, ৯-১০ ॥ reality : future ১৬৪, ৭ ॥ tend : tends ২২৮, ৯ ॥ প্রধাণত : প্রধানত ২৩৭, ১৪ ॥ সাক্রান্ত : সংক্রান্ত ২৩৭, ১৫ ॥ কৃলোৎপলিণী : কুলোৎপলিণী ২৩৭, ২৫ ॥ Such : Each ২৯৭, ৬ ॥ ষষ্ঠীক : ষষ্টিক ৩৫০, ৪ এবং ৬ ॥ কূর্মীদের : কম্মদের ৩৭৪, ৩৪ ॥ ঋগ্বেদে : নিরুক্তে ৩৭৭, ৫ ॥

একান্ত অসাবধানতাবশত সবচেয়ে মারাত্মক যে-ভ্রান্তি থেকে গিয়েছে তার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। ৯৪ পৃষ্ঠার ইংরেজী উদ্ধৃতিটি হওয়া উচিত : It is necessary to face the risk of error in order to discover truth. G. Thomson SAGS 36.

পাদটীকা ১৬৫, তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অশোকের শিলালিপির সঙ্গে মেলাবার সময় দেখেছি, এই তথ্যটি ভ্রান্ত। বরং বিরুদ্ধ তথ্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব ময়ূর-টোটেম্ বিশিষ্ট কোনো ট্রাইবের সঙ্গে মৌর্য-সাম্রাজ্যের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রকল্পটি সংশোধন-সাপেক্ষ হতে পারে।

পাদটীকা ২০৮, তৃতীয় পরিচ্ছেদ : IA-1910, 190-204.